

সমরেশ মজুমদার

প্রিয় আমার



গ্রন্থসূচি

জীবন	৭
যৌবন	৫৩
ছায়া পূর্বগামিনী	৮৭
হৃদয় আছে যার	১৬৫
সূর্য ঢলে গেলে	২৩৯
সহজপুর কত দূর	৩৩৫

জীবন

[প্রথম প্রকাশ, মাস ১৩৯৭]

pathagor.net

এমন বিকেলে আমার মন খুব ভাল হয়ে যায়। সারা দুপুর জুড়ে সূর্যটাকে মুড়ে রাখার পর হঠাৎ মেঘগুলো খানখান হয়ে গিয়ে আকাশের এখানে ওখানে সের্টে থাকে যখন, ঠিক তখনই অদ্ভুত এক মারাবী আলো নেমে আসে পৃথিবীতে। এই আলো না লাল না সোনালি, নীল আছে কি নেই ধরা যায় না। কিন্তু কেমন রঙিন হয়ে ওঠে চরাচর। এই সময় আমি আমার সমস্ত ব্যক্তিগত দুঃখ ভুলে যেতে পারি। কে কবে আমায় অপমান করেছিল, কোন্ প্রিয় মানুষ কষ্ট দিয়ে চলে গিয়েছে এসব একটুও মনে পড়ে না।

পাঁচতলার জানালা দিয়ে দূরের গাছ, ভিক্টোরিয়ার চূড়া দেখামাত্র আমি টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। ঘড়ি বলছে এখনও চেষ্টা করলে আমি নীলাকে ধরতে পারি। এই স্বপ্নের বিকেলে নীলা পাশে থাকলে আমি স্বর্গের লোভ বর্জ্যে ত্যাগ করতে পারি।

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে লিফটের বোতাম টিপলাম। আমার ভেতরে একটা ছটফটানি ছিল নিশ্চয় কারণ শরীরের ওজন এক একবার এক এক পায়ে রাখছিলাম। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল ওই অপরাধ আলো মুছে কেবল প্রতিদিনের বিবর্ণ বিকেলটা যে কোন মুহূর্তেই ফিরে আসতে পারে।

আমার নিজস্ব গাড়ি আজ গ্যারোজে। ট্যাক্সি পেতে হবে। অথচ কি আশ্চর্য, নীচে নামতেই একটা ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন। এরকম ঘটনা কলকাতায় ঘটলে মনে করতে হবে কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। কিন্তু যেই আমি আকাশটার চেহারা অপরিবর্তিত দেখলাম তখনই মনে হল ট্যাক্সি ড্রাইভার নিশ্চয় আমার আত্মীয়। এই রঙিন বিকেলে আমার মতই ওঁর মন ভাল হয়ে গিয়েছে। তাই আজ আলাদা ব্যবহার করে একটুও প্রতিবাদ না জানিয়ে যেদিকে যেতে বললাম সেদিকেই চললেন।

এমন বিকেল শেষ কবে এসেছিল মনে নেই। নৃথের স্মৃতিতে বড় ভাড়াটা খুলে পড়ে।

আজ কলকাতার রাগুয় কোন বিশুদ্ধতা নেই। সবাই গাড়ি চালাচ্ছে নিয়ম মেনে। কেউ ভুট পাকাচ্ছে না। কল্লনার অতীত একটি সময়ে আমরা প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে পৌঁছে গেলাম। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে রাজী আছেন কিনা! ভদ্রলোক নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন।

ট্যাক্সি থেকে নেমে একটুও ইতস্তত না করে গেট পেরিয়ে কলেজের ভেতরে ঢুকলাম। এই কলেজে একসময় আমার জীবনের তিনটি অত্যন্ত মূল্যবান বছর কেটেছে। তখন জীবন অন্যরকম ছিল।

নীলাকে ঠিক কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। ও কলেজে এসেছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগে বের হয় না বলে জানি। সেই সময়টা এখনও আসেনি। কিছু ছেলেমেয়ে হুড়িয়ে ছিটিয়ে কথা বলছে। দুটি মোটামুটি সূত্রী মেয়ে মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখল। দেখামাত্র দুজনে চাপা কিছু মন্তব্য করল।

আমি উপেক্ষা করলাম। এরা এখন নেহাতই মেয়ে। পিঠ চওড়া না হলে মেয়েদের শরীরে ঠিকঠাক পূর্ণতা আসে না। ওটার জন্যে একটা বয়সে পৌঁছাতে হয়।

এইসময় একটি রুগ্মছেলেকে আসতে দেখলাম। পাভামা পাণ্ডাবির সঙ্গে যে দাড়িটা তার অবিকল প্রতিরূপ আমি আমাদের সময়েও দেখেছি। একটু আঁতেল আঁতেল ভঙ্গি আছে বলে আরও পরিচিত। আমি তাকে বললাম, 'আপনি নিশ্চয়ই এই কলেজের ছাত্র?'

'অবশ্যই।' গভীরমুখে জানাল সে।

'তাহলে নীলাকে চেনেন নিশ্চয়ই।'

'নীলা? নীলা কসু? না চিনে উঠায় নেই।'

আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না এটা শোনার পর আমার খুশী হওয়া উচিত কিনা?

তাই বললাম, 'ওকে আমার দরকার। কোথায় পাব?'

'একটু আগে পাশের মাঠটায় দেখেছিলাম।' ছেলেটি চলে গেল।

এবার খুশী হলাম। তাহলে ওকে পাওয়া যেতে পারে। আমি দ্রুত মাঠের কাছে চলে এলাম। যদিও এখন মরসুম শেষ তবু মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে। লাইনের এপাশে কিছু ছেলেমেয়ে টেঁচিয়ে তাদের উৎসাহ দিচ্ছে। এরা কত বড় মূর্খ! এমন রোদের বিকেলটা শুধু ওই গোলাকার বস্তুটির দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে গেল।

পাকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে গিয়েও সামলে নিলাম। আমাদের সময় কলেজ

কম্পাউন্ডের মধ্যে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। সেইটে মনে পড়ল। পুরনো দিনের অনেক নিয়মকানুন স্থানবিশেষে মনে পড়ে গেলে মানতে বেশ ভাল লাগে।

আমি আকাশের দিকে তাকানাম। কাঁচের মত রোদ। হ্যাঁ, মনে হল এবার ঠিকঠাক তুলনাটা করলাম।
আঃ, কি সুন্দর! না, এটাও ঠিক বলা হল না। আমাদের উচিত এখনই, একটু দেরি না করে, বাংলা ভাষায় কিছু কিছু নতুন প্রতিশব্দ তৈরি করে নেওয়া।

এইসময় গলার শেষ পর্দায় স্বর তুলে চৈঁচিয়ে উঠল নীলা, 'কি ব্যাপার?'

দেখলাম ছেনেমেরদের জটলায় দাঁড়িয়ে সে হাত নাড়ছে। এখান থেকে, দূরত্বের কারণেই কান দিয়ে বেশ লক্ষ্য করছিল আমার। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম।

এবার নীলা ছুটেতে শুরু করল। সাদা বিনাসের প্যাণ্টের সঙ্গে লাল চুল্লিও পাট। পালো সাদা জুতো। ওর উচ্চতা ঠিক পাঁচ সাড়ে পাঁচ। শরীরে ব্যক্তিগত মেন মেই। ছোট্ট সময় মনে হল পৃথিবীটা আরও সুন্দর হল। কোমর ছাড়িয়ে নিত্য পর্বত নাট্যে থাকা টান-টান সিঁড়ি চুল ফুলে ফেঁপে উঠেছে ছোট্ট ছন্দে। এক দমে আমার সামনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে নীলা বলল, 'কি ব্যাপার? তুমি এখানে।' তারপরেই চোখ ঘুরিয়ে ঠোট ফুলিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আই, এটা তুমি কি করেছ? আমার কথা কেন শোননি?'

আমি খতমত হয়ে সূত্র না ধরতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেন? কি করেছি?'

চোখ ঘুরিয়ে সে বলল, 'এই স্মার্টমেটে শার্টটা কেন পরেছ? লাল গেঞ্জিটাও তোমাকে কি হ্যান্ডসাম আর স্মার্ট দেখায় তুমি জান না।'

'দূর! ওটা পরলে খিঁচী দেখায়!'

'ছাই! খুব জান তুমি! আমার কথা একদম গুনতে চাও না। কেন এসেছ?'

'এই রকম একটা কাঁচের মত আলো দেখতে পেয়ে আর কান্ন করতে ইচ্ছে করল না।' আমি হাসলাম, 'কোথাও বসতে ইচ্ছে করছিল।'

নীলা আমার কনুই জড়িয়ে ধরল। দৃশ্যটি চোখে পড়ামাত্র দূরের জটলার কেউ অজুত একটা শব্দ ছুড়ে দিল আমাদের দিকে। নীলা ঘুরে দাঁড়াল, 'ননসেন্স। আই মান্ট টিচ হিম এ শুড লেনন।

আমি আটকানাম ওকে, 'ঠিক আছে। ওসবে কান না দেওয়াই ভাল।

গেটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি, এমন আলো দেখতে পাওয়ায় তুমি আমার কাছে এসেছ?'

'সন্দেহ হচ্ছে কেন?'

'শুভ। ইউ আর বিউটিফুল।' শেষ শব্দটা অজুতভাবে উচ্চারণ করল নীলা।

আমরা এমন কনুই জড়া জড়ি করে হাঁটছি দেখে অনেকেরই বুক ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছে। এমন মুহূর্তে নিন্দেকে সুখী রাজপুত্র বলে মনে হয়। পৃথিবীর মানুষেরা বুকে গ্রহুর অসুখ পুষে রাখে। সুখের ছবি দেখলেই সেইসব অসুখগুলো খুব বেড়ে যায়।

গেটের বাইরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম, 'আমরা এসে গিয়েছি।'

ভদ্রলোক হাসলেন। নীলাকে দেখলেন, কিছু বললেন না।

নীলা জিজ্ঞাসা করল : 'আমরা কোথায় যাব?'

'যেদিকে দু-চোখ যায়।' কবিত্ব করলাম আমি।

ট্যাক্সিওয়ালা বললেন, 'তাহলে একটু অসুবিধে আছে। তেল ভরে নিতে হবে।'

নীলা বলল, 'আমারও অসুবিধে হবে। সঙ্গে ছটার মধ্যে বাড়িতে ফিরতে হবে।'

অগত্যা বলতে হল, 'তাহলে গঙ্গার ধারে চলুন। নদীর জলে রোদ দেখব।'

নীলা বলল, 'ফ্যান্টাস্টিক!'

ট্যাক্সিতে বা গাড়িতে পাশে বসলেই আমার বাথ জড়িয়ে ধরা নীলার অনেক দিনের অভ্যাস। আজও ট্রাফিক সিগন্যালে ট্যাক্সি দাঁড়ানোমাত্র ফুটপাথের লোকেরা আমাদের দেখতে লাগল। এইসময় আমার ঈষৎ আড়ম্বর হয়, নীলার হয় না।

হঠাৎ ট্যাক্সিওয়ালা বললে, 'মনে হয়েছিল আজ বৃষ্টি হবে।'

নীলা সোজা হল, 'বৃষ্টি হলে আগনার ভাল লাগে?'

'না, মন খারাপ হয়ে যায়।' ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

আমি বললাম, 'এখন আপনার মন নিশ্চয়ই ভাল।'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ সন্ধে না হয়।'

'আজ ভাড়াভাড়া সন্ধে হবে না।' আমি গভীর গলায় বললাম। তারপর মনে পড়তেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কোন্‌ স্কুলে পড়তেন?'

'মেট্রোপলিটন।'

'আরে, কি আশ্চর্য! আমিও তো ওখানে পড়তাম।'

এই সময় নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের স্কুল খুব ভাল ছিল, না?'

জানতে চাইলাম, 'কেন? হঠাৎ এ কথা কেন?'

'বাঃ, ওখান থেকে পাস করে প্রেসিডেন্সিতে পড়েছি, তাই।'

'হ্যাঁ ভালই ছিল।' বলেই খেয়াল হল এই ট্যাক্সি ড্রাইভার ভদ্রলোকও স্কুলে পড়েছেন। ফার্স্ট ডিভিশনের ছাত্র কি ট্যাক্সি চালায়?

গে হোটেলের সামনে আমি ওকে থামতে বললাম। ভাড়া মিটিয়ে নামতে নামতে ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কোন্‌ ইয়ারে স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়েছেন?'

'নিম্নাটি শ্রিতে।'

চমকে উঠলাম। ওটা তো আমার হামার সেকেন্ডারি দেবার বছর। অথচ একে আমি কিছুতেই চিনতে পারছি না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'নামটা জানতে পারি?'

'আমাকে এখন সবাই রতনদা বলে ডাকে।' ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করে ট্যাক্সিটাকে সামান্য এগিয়ে পার্ক করলেন।

নীলা ততক্ষণে এগিয়ে যাচ্ছিল গঙ্গার দিকে। জোরে পা চালিয়ে ওকে ধরতেই বলল, 'একটা ট্যাক্সিওয়ালার সঙ্গে কি এত কথা বলছিলে?'

'এমনি।' আমি ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম।

আমরা গঙ্গার গায়ে দাঁড়লাম। আহা, রোদের রঙ পালটাচ্ছে। সেই কাঁচ-কাঁচ ভাবটা আর নেই। একটু একটু করে আমার ঝপের বিকেলটা চলে গেল। সন্ধে হতে এখনও যথেষ্ট দেরি। আমি নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'চা খেলে কেমন হবে?'

'গুড।' নীলা যেন স্বভাব ফিরে পেতে চাইল।

আমরা দোতলায় জানলার ধারে টেবিল পেলাম। পাশেই গঙ্গার প্রচুর নৌকো ভাসছে। একটা লঞ্চ জলে ঝেঁউ ভুলে চলে গেল। একটু একটু করে বিষয় হয়ে উঠছে চরাচর। হঠাৎ নীলা বলল, 'মা সাঁতার জানতো না, না?'

আমি চমকে উঠলাম। ঠিক এখন এই মুহূর্তে নীলা মায়ের কথা বলে উঠতে পারে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। ও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেইজন্যে মা জলে নামতে চাইত না, না?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকেও তুমি সাঁতার শেখালে না।'

'আগে যেজনো লোকে সাঁতার শিখতো, তার কোন দরকার নেই। অবশ্য শিখতে চাও শেখো।'

'তাহলে আমাকে কোন ক্লাবে ভর্তি করিয়ে দাও।'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু ভর্তি হলে পুরোটা না শিখে ছেড়ে দেওয়া চলবে না।'

কথাগুলো শুনে হাসল নীলা। চা আর ফিশ ফিঙ্গারের হুকুম দিলাম আমি। ফিশ ফিঙ্গার খেতে খুব ভালবাসে ও। এখন জানলা দিয়ে জনৈক দিকে যে ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে তাতে বোঝা যাচ্ছে ও ঠিক ওর মধ্যে নেই। এবং এই ভঙ্গিটা আমাকে কষ্ট দিল।

প্রতিটি মানুষের কিছু নিজস্ব ভঙ্গি আছে, পৃথিবীর অন্যান্য মানুষের আচরণে যা খুঁজে পাওয়া যায় না। ওই একটি ভঙ্গিতেই তাকে চেনা যায়। কিন্তু নীলার এই ভঙ্গিটি ওর একান্ত নিজস্ব নয়। ওটা ছিল অনন্যার। একটু উদাস হলে অনন্যা এই ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকত।

কখনও-কখনও বাবা-মায়ের কিছুটা সন্তান পায়। নীলা পেয়েছে, যত দিন যাচ্ছে তত যেন বেশি করে

পাচ্ছে। আর একজনের নিজস্ব ছিল যা তার নিজের করে ফেলেছে অজান্তে। অথচ নীলা কখনই অনন্যাকে দ্যাখেনি। এই যে একটু আগে বলল অনন্যা জলে ভয় পেত, সেই গল্প ও আমার মুখেই শুনেছে। অনেক কথাই শুনতে শুনতে নিজের হয়ে যায়। ওরও হয়েছে।

ওই ভগিটাকে বেশিক্ষণ দেখতে পারলাম না আমি। চাপা গলায় ডাকলাম, 'নীলা!'

ও মুখ ফেরাল চকিতে। চোখ ছোট করল।

'কি ভাবা হচ্ছে?'

'আমি? ওহো!' হাসল ও। হাসলে বড় সুন্দর দেখায় মেয়েটাকে। তারপর বাঁ হাতের আঙ্গুর কপালের ওপর খসে পড়া চুলের গুচ্ছটাকে ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে বলল, 'আমি ওই জন দেখছিলাম। আগের চেহারা বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলেরও ছবি পালটে যায়। কি মিল।'

'আজ কলেজে কি হল বল!'

'নাথিং নিউ!'

'তোমার বয়স্কেন্ডরা?'

'দূর! ওদের ম্যাচিওরিটি কবে আসবে কে জানে!'

আমার মজা লাগল। মাত্র উনিশ প্লাসে নীলা কি নিজেকে খুব ম্যাচিওরড্ ভাবছে? হেসে জিহ্বাসা করলাম, 'কিরকম?'

নীলা বলল, 'শ্যামলকে তো তুমি চেনো? আমাদের বাড়িতে এসেছে!'

মনে করতে চাইলাম। অনেকেই আসে। অনেক বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখেছি আমার ড্রইংরুম ওদের দখলে। টেবিলে খাওয়ার প্লেট কাপ ছড়ানো। আট দশটা ছেলেমেয়ে প্রায়ই ঘরটাকে নরক বানিয়ে যায়।

প্রথম প্রথম খুব খারাপ লাগত। মনে মনে চটতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেনে নিলাম। মেনে নেওয়ার পর দেখলাম আমার উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই। হ্যাঁ, কিছু পয়সা নষ্ট হয় বটে, তা সেটা যে কোনও ভাবে হত।

নীলা যখন কলেজে ঢুকল তখন বাঁধে ফুটো পেয়ে যেভাবে জলের ফোয়ারা ছুটে আসে ঠিক সেইভাবে ছেলেরা আসতে শুরু করেছিল। কোন ছেলেকে ওর পাশে দেখলেই মনে মনে আঁতকে উঠতাম। কিন্তু যখন দেখলাম বিশেষ একজন নয়, একাধিক ছেলে আসছে আড্ডা মারতে তখন মন নিশ্চিন্ত হল। অথচ এখন চট করে শ্যামলকে চিনতে পারলাম না।

নীলা সেটা বুঝতে গেরে ধরিয়ে দিল, 'ওই যে, চকরাবকরা ব্যাগি পরে, লাল মারুতি চালায়। মাথায় মিঠুনের মত চুল রেখেছে। তুমি দেখেছ!'

এবার মনে পড়ল। আট-দশটা ছেলের সঙ্গে দুতিনটে মেয়ে। ছেলেগুলোকে আলাদা করে চেনা মুশকিল। তবে শ্যামলকে দেখে আমার ভাল লাগেনি। এই বড়লোকদের ছেলের টিপিক্যাল ছাপমারা চেহারার সঙ্গে আমার কোন ভাব থাকতে পারে না। এরা পড়াশুনা ছাড়া বাপের কালো টাকায় সব কিছু করতে পারে। আমি ভেবে পাইনি শ্যামল কি করে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছে। পরে জেনেছিলাম, চেহারা এমন সড়েও ছাত্র হিসেবে নাকি যথেষ্ট ভাল।

বললাম, 'সে কি করল?'

নীলাকে এবার গল্প বলার নেশায় পেল, 'তুমি অপালাকে চেনো না। খুব স্ট্রুট কাট মেয়ে। যা সজ্জা তা মুখের ওপর বলে দেয়। ওর বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার। মা কলেজে পড়ায়। কলেজে ঢুকেই ছেলেদের তুই-তোকাকি করে কথা বলেছে, সেই অপালাকে প্রপোজ করেছে শ্যামল!'

শুনে কেমন যেন হালকা হয়ে গেলাম। ভাল লাগল। বললাম, 'বাঃ, ওডু!'

'তুমি তো ওডু বলছ, ওদিকে শ্যামলের অবস্থা খারাপ।'

'কেন?'

'অপালা ওকে সবার সামনে পাগল বলেছে।'

'কারণ?'

'কাল বিকেলে নাকি বাড়ি পৌঁছে দেবার সময়ে শ্যামল প্রপোজ করে। তখন অপালা কিছু বলেনি। আজ যখন আমরা সবাই আড্ডা মারছি তখন অপালা এসে শ্যামলকে ডেকে বলে, আমি ভেবে দেখলাম তুই পাগল। শুনে আমরা এমন ভাবার কারণ জিহ্বাসা করলাম। তখন অপালা বলল, শ্যামলটা আমাকে

প্রপোজ করেছে, আমাকে নাকি ভালবেসে ফেলেছে, সম্পর্কটা স্টেডি করতে চায়। শুনে, জানলে, শ্যামলও লজ্জা পেল। সুকান্ত ওর হয়ে বলল, এটা তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমাদের সামনে বলছ কেন? অপালা বলল, মোটেই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আমি শুধু বলতে চাই ওর সঙ্গে আমার কিছু মিল নেই। এখানে আমরা পড়তে এসেছি, সেই সুবাদে বন্ধুত্ব। তার মানেই প্রেমে পড়ে প্রপোজ করতে হবে? তুই কি বুঝতে পারছিস সুকান্ত, আমি যা বলতে চাইছি।’

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘শ্যামল কি জবাব দিল?’

নীলা হাসল, ‘শ্যামল হঠাৎ খুব স্মার্ট হয়ে বলল, বোঝা-না-বোঝা আমার প্রভেদ। তোমার বক্তব্যটা জানিয়ে দেবার জন্যে ধন্যবাদ।’

আমরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করলাম। নীলা খুব তাড়া দিচ্ছিল বাড়ি ফেরার জন্যে। ছটা প্রায় বাজবো বাজবো। বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি পেতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। নীলা রাগ করছিল। আমি বললাম, জীবনে কোন জিনিসকে একেবারে মাস্ট করে ফেলো না। পরিবেশ এবং পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে চেষ্টা কর।’

নীলা হাত নাড়ল, ‘এবরিবডি হ্যাজ হিঙ্গ ওন প্রভেম বাবা, তাই না?’

এই কথাটা আমিই ওকে বলেছি একসময়। মানুষ জীবনের নকবই ভাগ যদি পরের জন্যে বেঁচে থাকে তাহলে অন্তত দশ ভাগ সে নিজের জন্যে রেখে দেবে। দেওয়া উচিত। সেখানে কারো নাক গলাবার অধিকার নেই। যা বাবা স্বামী সন্তান কার নয়। সেটুকু তার নিজস্ব সমস্যা। সমাধান কিভাবে হবে তা সে নিজেই ঠিক করবে।

আমরা একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকি। বিয়ের অনেক পর এই ফ্ল্যাট পেয়েছি আমরা। তিনটে ঘর, একটা বিশাল খাওয়ার জায়গা, দুটো টয়লেট।

তখন খুব বেশি রোজগার ছিল না। সরকারি এই ফ্ল্যাটটার ভাড়াও বেশি নয়। এত বছরে খুব একটা বাড়েনি। তবু তার মধ্যেই অনন্যা চমৎকার সাজিয়েছিল আমাদের বাসস্থান। তিনতলায় এবং দক্ষিণ-খোলা হওয়ায় প্রচুর হাওয়া দিনরাত।

ফ্ল্যাটের তিনটে চাবি। একটা আমার, দ্বিতীয়টা নীলার আর তৃতীয়টা দোতলার মিস্টার গুপ্তার বাড়িতে থাকে। যদি কেউ হারিয়ে ফেলি তাহলে মিস্টার গুপ্তার বাড়ি থেকে চেয়ে নেব। কিন্তু এখন পর্যন্ত হারিয়ে ফেলার সমস্যা পড়তে হয়নি।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে দেখি আমাদের কক্ষে মেয়েটা একটা প্যাকেট হাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে নীলা বলল, ‘সরি যমুনাদি। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ না?’

যমুনা মাথা নাড়ল, কিছু বলল না। নীলা দরজা খুলল। এবার কিছুক্ষণ ধরে ফ্ল্যাটের সমস্ত জানলা খোলার পালা চলবে। দরজা জানলা বন্ধ ঘরে একটা গুমোট বাতাস থাকে। সেইটে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত একটা অস্বস্তি হয় আমার।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলতে লাগল। তারপর বাথরুমের দরজা বন্ধ হবার শব্দ পেলাম। আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

কলকাতা এখন অন্ধকার সরাতে বিন্দু বিন্দু আলো জ্বলেছে। আমি খুব উঁচুতে দাঁড়িয়ে নেই। তবু দূর থেকে দেখলে অন্ধকার বেশ ভারী দেখায়।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে এই আলো আঁধার দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে শ্যামলের মুখটা ভেসে উঠল। হঠাৎ ওই ছেলেটির জন্যে আমার একটা খারাপ লাগা তৈরি হল। আর এই আমিই একসময় মনে মনে বেশ বিরক্ত ছিলাম ওর সম্পর্কে। কারণ আমার মনে হত নীলাকে ভুল বোঝাতে পারে। ব্যাপারটা যে ভুল বোঝানো তা কোন কারণ ছাড়াই আমি ভাবতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আজ যখন জানলাম নীলা নয়, অপালা নামক একটি মেয়ের প্রতি ও আকৃষ্ট এবং মেয়েটি সবার সামনে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন খারাপ লাগা তৈরি হল।

নীলা আমাকে সব কথা বলে। এটা আমার বিশ্বাস। এখন পর্যন্ত বিশ্বাসে চিড় ধরার কোন কারণ ঘটেনি। ওকে আমি গত উনিশ বছর ধরে অকপট হতে শিখিয়েছি। আমার এটাই আনন্দ। কলেজে ঢোকান

‘তাহলে আমার ভাইয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করতে গিয়েছিল কেন?’

‘আপনার ভাই?’

‘অবাক হবার ভান করো না! তুমি আজ অনুর কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে নাওনি? সত্যি কথা বল। খেতে চাওয়ার নাম করে আলাপ জমিয়ে প্রেম করার মতলব?’

‘বিশ্বাস করুন, আমি বলিনি কিছু।’

‘আবার মিথ্যে কথা?’ মুখ ধমধমে হয়ে গেল মহিলার, ‘তুমি কি ভেবেছ? তোমার কলেজের প্রিন্সিপাল আমার স্বামীর বন্ধু। ইচ্ছে করলে তোমাকে কলেজ থেকে বের করে দিতে পারি, তা জানো?’

‘আমি আবার বলছি আমি আপনার ভাইখিকে কিছু বলিনি।’

‘তাহলে তোমার নাম ঠিকানা আমি পেলাম কোথায়?’

‘আমাদের এক বন্ধু ওকে মিথ্যে করে বলেছে। ও মজা করতে চেয়েছিল।’

‘তাই নাকি? দাঁড়াও।’ ভদ্রমহিলা উঠে ঘরের কোণে রাখা টেলিফোন তুলে ডায়াল করলেন। যে ধরল তার সঙ্গে খানিক কথা বলে অনুরকে চাইলেন। একটু বাদে বললেন, ‘অনু শোন, এখানে তোমার দাদু আছে, আমি যা বলছি তা শুনে হ্যাঁ কিংবা না বলবি। আজ কলেজের গেটে যে তোমার সঙ্গে কথা বলছিল তার চেহারা কি এইরকম—’, মহিলা আমার দিকে তাকালেন, ‘লম্বা, শ্যামলা, কোঁকড়া চুল, বাদিকের কপালে ছোট্ট কাটা দাগ আছে। এইরকম? না? ঠিক বলছিস? আচ্ছা রেখে দে।’ তারপর নিজেই রিসিভার নামিয়ে রেখে দরজায় গিয়ে ডাকলেন, ‘হরিধন, হরিধন।’

বুড়ো ড্রাইভার এল। ভদ্রমহিলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কলেজের গেটে এর সঙ্গেই তুমি অনূদিদিকে কথা বলতে দেখেছ, না?’

বুড়ো আমার দিকে তাকাল। চোখ পিটিপিটি করল, তারপর মাথা নেড়ে বলল, ‘নাঃ। সে তো ছিল মোটোসোটা। এ নয়।’

‘যাও এখান থেকে।’ খুব হতাশ গলায় কথাগুলো বলে ভদ্রমহিলা ফিরে এলেন সোফায়।

আমি মহিলার দিকে তাকিয়ে বসে আছি। কাউকে দিক্‌ব্রান্ত হলে বোধহয় এমনি দেখায়। উনি আঁচলে কপাল মুছলেন। একটু নার্ভাস? হতেও পারে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আমি বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। মেয়ে আমাকে তোমার নাম বলেছিল, ঠিকানাটাও গুর কাছে পেয়েছি।’

‘আমি তো আগেই বলেছি, আপনি ভুল করেছেন। অবশ্য আপনার দোষ নেই। অতীত ঐর সঙ্গে কথা বলার সময় নিজের পরিচয় হিসেবে আমার নাম বলেছিল।’

‘কী ভয়ঙ্কর! এসব ছেলে তো খুন পর্যন্ত করতে পারে! এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে তোমরা?’

‘না, ব্যাপারটা নেহাতই মজার ছিল।’

‘মজা? কি বলছ তুমি? জানো, আমার বাপের বাড়ি কী কনজারভেটিভ? আমি জোর করে ওকে ভর্তি করিয়েছি প্রেসিডেন্সিতে। মেয়ে ভাল রেজাল্ট করেছিল কিন্তু কো-এডুকেশনে পড়ানোতে বাবা দাদা কারও মত ছিল না। আমিই দায়িত্ব নিয়েছিলাম। ভাল কলেজ, ভাল পড়াশুনা দরকার বলে ওঁদের বুঝিয়েছিলাম। এখন কিছু একটা হয়ে গেলে আমার মুখ থাকবে?’

‘কিছু একটা হবে বলে মনে করছেন কেন?’

‘আর কি বাকি রইল? মেয়ে কলেজ থেকে ফিরে হাসিতে ভেঙে পড়ল।’

‘হাসিতে?’ আমি এবার অবাক। কলেজের গেটে যাকে নির্বাক দেখেছি তার আবার হাসি কেন?

‘হ্যাঁ, বলে কিনা পেটুক ছেলে, আমার কাছে টাকা চাইল! আসলে এইসব করেই তো শুরু হয়। বাংলা সিনেমার গল্প সব।’

‘তাহলে আপনার উচিত আমাদের বন্ধু অতীনের সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু আপনাকে আমি বলতে পারি, অতীনের কোন অন্য মতলব নেই। সে সব মেয়ের সঙ্গে একইভাবে কথা বলে। সবাই ওকে পেটুক বলে জানে। মনের ভেতরে কোন প্যাঁচ নেই।’

এইসময়ে দরজায় এক ষ্ট্রোট এসে দাঁড়ালেন। ভদ্রলোকের পোশাক ভাবভঙ্গি দেখলে একজন ব্রিটিশ সাহেব বলে ভুল হবে। যেহেতু দরজা খোলাই ছিল তাই তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে ছড়িতে শরীরে ভর রেখে আমার দিকে তাকালেন, ‘হ ইজ দিস জেন্টলম্যান?’

ভদ্রমহিলা যেন বনতে হয় এমন গলায় বললেন, ‘বিকলে ফোনে তোমাকে এর কথা বলেছিলাম।’

‘ষ্ট্রেন্ড! উনি এখানে এলেন কি করে?’

‘আমি নিয়ে এসেছি।’

‘নিয়ে এসেছি মানে? জোর করে? ওহো! উনি যদি তোমায় অপমান করতেন? আমি তোমাকে নিষেধ করেছিলাম এ ব্যাপারে প্রসিড করতে—! ইনি যখন এখানে এসেছেন তখন মনে হচ্ছে নেহাতই ভালমানুষ।’

ভদ্রলোক এবার ঘরে ঢুকলেন। আমি বৃকতে পারছিলাম ইনি ভালরকম মদ্যপান করে এসেছেন। উলটোদিকের সোফায় বসে সরানরি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কিহে! তুমি কি অনুর প্রেমে পড়েছ? লভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট?’

ভদ্রমহিলা বিরক্ত হলেন, ‘আঃ, এ সে ছেলে নয়।’

‘সেই ছেলে নয় মানে?’

‘যে কথা বলেছিল অনুর সঙ্গে সে এর নাম ব্যবহার করেছিল।’

‘আই সি। তাহলে তো তুমি একজন ইনোসেন্ট ছাত্রকে এখানে ডেকে নিয়ে এসে অপমান করেছ! যখন জানলে যে এ নয় তখন এখানে নিয়ে এলে কেন?’

‘আমি এখানে নিয়ে আসার পর জানতে পেরেছি।’

‘হম্। তুমি অনুর সঙ্গে পড়?’

‘আমরা এক কলেজে পড়ি।’

‘তোমাকে উনি কিভাবে এখানে এনেছেন আমি জানি না। তোমার খারাপ লাগছে না?’

‘লাগছিল। তবে ওঁর সঙ্গে আলাপ হবার পর তেমন লাগছে না।’

‘শুভ। আমার উচিত তোমাকে একটু ভালরকম আপ্যায়ন করা। রাগ, দুটো গ্লাস আর স্কচ নিয়ে এসো। খুব অন্যায় করা হয়েছে ওর ওপর।’

ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন, ‘কি বলছ তুমি? ওকে মদ খাওয়াবে?’

আমি হতভম্ব, বললাম, ‘না, না, ওসব আমি খাই না।’

‘আই সি। তাহলে আমার স্ত্রীর হয়ে তোমার কাছে অ্যাপোলজি চাইছি।’ ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, ‘আমার নাম এ কে রায়। যদি কোন সাহায্য করতে পারি খুশী হব।’

উনি ভেতরে চলে গেলে ভদ্রমহিলা বললেন, ‘ওঁর দোষ নেই। ছোটবড় বিচার করেন না। শুধু এই কারণেই আমার ব্যাপার বাড়িতে উনি যান না। তুমি কিছু মনে করো না।’

‘না না। ওঁকে আমার ভাল লেগেছে। এবার আমি যেতে পারি?’

‘হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু একটা কথা বলব?’

‘বলুন।’

‘তোমাকে—, মানে—, একটু অনুর ওপর লক্ষ্য রাখবে?’

‘বুঝলাম না।’

‘মানে অন্য ছেলেরা যেন ওর সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা না বলে।’

‘আমি কি করে সেটা পারব? আমার কথা কেউ শুনবে কেন?’

‘তুমি আমাকে এসে বলে যাবে।’

আমি হাসলাম। তারপর চুপচাপ বেরিয়ে এলাম। ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে কয়েক পা এলেন। এবং আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, তিনি দুর্গানাম উচ্চারণ করছেন।

হ্যাঁ, আমার যাত্রা শুভ হয়েছিল। আমার পকেটে একটাও পয়সা ছিল না। পুরোটা পথ হেঁটে যখন হোস্টেলে ফিরেছিলাম তখন মধ্যরাত। দুটো পা ব্যথায় টনটন করছিল। প্রচণ্ড রাগ আমাকে জেদী করেছিল। উনি আমাকে ওঁর গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যেতে পারতেন। সেটাই তো উচিত ছিল।

সেই বয়সেই বুঝেছিলাম এই ঘটনাটা গল্প করে বলার বিষয় নয়। একজন মধ্যবয়সী মহিলা কাউকে ইলোপ করে মাঝরাতে ছেড়ে দিলে গৌরব বাড়ে না। হোস্টেলের বন্ধুদের আমি অন্য গল্প বলেছিলাম।

কিন্তু পরদিন কলেজে গিয়েই অনন্যাকে খুঁজে বের করলাম। ওর সঙ্গে কথা বলিনি। দূর থেকে দেখেছি সুবর্ণার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওকে দেখামাত্র, ওর মুখের দিকে তাকানোমাত্র আমি যেন

কেমন নরম হয়ে গেলাম। ওই চিবুক এবং চোখ এত নিষ্পাপ যে কোন ক্রোধ নিয়ে ওর সামনে দাঁড়ানো পাপ বলে মনে হয়েছিল।

তিনদিন পরে আমি একা কলেজের গেট পেরিয়ে ঢুকছি, এমন সময় সুবর্ণা আমার সামনে দাঁড়াল, 'ওনুন! আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

সুবর্ণার নাম আমি পরে ছেনেছিলাম। আর পাঁচটা মেয়ের মতই ও সপ্রতিভ। আমি দেখতে পেলাম দূরে অনন্যা দাঁড়িয়ে আছে মুখ নিচু করে, একা।

সুবর্ণা বলল, 'আমার বন্ধু অনন্যা খুব লজ্জিত। কদিন থেকে আপনাকে একা পাচ্ছিলাম না বলে বলা যাচ্ছিল না। ওর পিসি যে এমন কাণ্ড করবে ভাবতে পারেনি। তাই আপনার কাছে ও ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে।'

আমি অনন্যাকে দেখলাম। সে এদিকে তাকাচ্ছে না। বললাম, 'ক্ষমা চাওয়ার কি দরকার, যখন ওঁর পিসেমশাই আগেই ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন।'

'না, না, সত্যি বলছি, ও খুব লজ্জা পেয়েছে।'

'উনি কি কথা বলতে পারেন না সময় বিশেষে?'

'মানে?'

'এখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা বাড়িতে গিয়ে রিপোর্ট করতে পারেন অথচ এসব কথা আপনাকে দিয়ে বলাচ্ছেন! নিজের মুখে 'ক্ষমা চাইতে' কি সস্ত্রমে লাগছে?'

'না। আসলে ও খুব লজ্জুক। কোনদিন ছেলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়নি।'

এবার আমার কেমন একটা মায়া এল। মাথা নেড়ে ঠিক আছে বলে চলে এসেছিলাম।

এরপরে মাঝেমাঝেই সুবর্ণা আর অনন্যাকে দেখতাম। অনন্যা আমাকে দেখামাত্র মুখ নামাতো আর সুবর্ণা পরিচিতির হাসি হাসতো। এর কিছুদিন বাদে ওকে আমি প্রথমবার কফি হাউসে দেখি। তিনটে মেয়ে যাদের মধ্যে সুবর্ণাও আছে, কোণের টেবিলে বসেছিল। কি একটা কারণে হঠাৎ কলেজ ছুটি হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত ওকে ফেরত নিয়ে যাওয়ার গাড়ির আসার সময় হয়নি। আমাকে অন্য টেবিলে দেখামাত্র মুখ নামিয়েছিল সে।

কিছুক্ষণ পরে দেখলাম অতীত ওদের টেবিলে গিয়ে চেয়ার টেনে বসল। ও যে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জমিয়ে নিয়েছে তাও বোঝা গেল। সেদিন আমার খুব দীর্ঘা হয়েছিল। ওরা যদি গল্প করত নিজেদের মধ্যে, কোন পুরুষ ছাড়া কফি খেত এবং চলে যেত তাহলে আমার সন্তি হত। অতীনের কোন মতলব নেই, জানি, ওবু একজন পুরুষের সঙ্গে এত কথা বলার কি দরকার? জীবনানন্দের কবিতা মনে পড়েছিল, বোলো নাকো কথা ওই যুবকের সাথে। মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

দিন পনেরো বাদে মিসেস রায় এক বিকেলে আমার হোস্টেলে এলেন। খুব উদ্ভ্রান্ত দেখাচ্ছিল ওঁকে। আমি কাছে যাওয়ায় বললেন, 'কি সন্ধানাশের কথা বল দেখি। অনু কথা নুকোচ্ছে।'

খুব রাগ হল। তাঁর ভাইঝি কি করছে তাতে আমার কি। সেটা বলতে যাওয়ার আগেই উনি হাত নেড়ে বললেন, 'আমার মাথার ঠিক নেই তাই তোমার কাছে এলাম।'

বললাম, 'কি হয়েছে?'

'তোমায় কি বলব! রোজ কলেজ থেকে ফেরার পর দেখি এক হাঁটু ধুলো!'

'ধুলো?'

'হ্যাঁ, তাই তো বলছি। অথচ কলেজে যায় আসে আমাদের গাড়িতে। তাহলে বল অত ধুলো লাগবে কি করে? নিশ্চয়ই কলেজে এসে বেরিয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। আর ওই যে এক সঙ্গী হয়েছে, সুবর্ণা, ওকে চাপ দিয়েও কিছু বের করতে পারি না।'

'আপনার ভাইঝি কি বলে?'

'সে তো আকাশ থেকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে।'

'তাহলে ধুলো লাগছে কি করে?'

'তাই তো সমস্যা। এর মধ্যে হয়েছে কি জানো, বাড়িতে আবদার ধরেছিল মাটিনী শো-তে সিনেমায় যাবে বলে। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা। আমার বাপের বাড়িতে তো মেয়েদের একা সিনেমায় যাওয়ার চল নেই। সুবর্ণা আর ও যাবে। টিকিট কাটিয়ে এনে ঝি-এর সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল। লেডিস সিট। ঝি হল-

এ ওদের ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে বসেছিল। সিনেমা ভাঙলে ঝি-এর সঙ্গে বাড়িতে ফিরে এসেছিল। এদিকে আমাদের এক আত্মীয় নাকি ওইসময় হৃদোর মুখে ওদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুটকা খেতে দেখেছেন। তিনি ট্রাম থেকে দেখতে পেয়ে বাড়িতে এসে খবর দেন। অনুর বাবা সিনেমা হল্-এর সামনে গিয়ে আপহ্লা করছিল। সিনেমা ভাঙতে যখন মেয়ে তার বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে এল তখন তো সে হাঁ! আত্মীয়ের দেখাটা ঠিক নয় বলে মনে করল। কিন্তু আমিও তো ওই বাড়ির মেয়ে। সবর চোখে ধুলো দিনেও আমাকে ঠকাবে কি করে!

হেসে ফেললাম, 'ব্যাপারটা কি?'

'শোন, দুটো সিনেমা হল পাশাপাশি আছে। এর ভেতর দিয়ে ঢুকে ওর দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসা যায়। ঝিকে বাইরে বসিয়ে নিশ্চয়ই ওরা তাই করেছে। ঘুরে-টুরে সিনেমা ভাঙার চাইনে ফের চলে এসেছে। ঝি ভাবল যার সঙ্গে এল, তার সঙ্গেই ফিরছে।'

'উনি স্বীকার করেছেন?'

'স্বীকার করলে তো দুঃখ ছিল না। কাউকে এসব বলতেও পারছি না। মেয়ে আমার মিথ্যে কথা বলতে শুরু করেছে। এভাবে মিথ্যে বলতে বলতে স্ত্রী একদিন যেখানে পৌঁছে যাবে সেখান থেকে তো ওর পক্ষে ফেরা সম্ভব হবে না। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!'

আমিও একমত হলাম। মিথ্যেবাদীরা কোনদিন শান্তি পায় না। হঠাৎ ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সঙ্গে ওর কথাবার্তা হয়?'

মাথা নাড়লাম, 'না! আমার সঙ্গে ওর আজ পর্যন্ত আলাপই হয়নি।'

'ওমা, একি কথা? ও যে প্রায়ই তোমার নাম করে কত কথা বলে!'

'আমার নাম করে?' এবার আমার চমকবার পাল।

'হ্যাঁ। তুমি নাকি কলেজে প্রফেসরের সঙ্গে এমন তর্ক করেছিলেন যাতে প্রফেসর খুব রেগে যান। কিন্তু যুক্তি দিয়ে তোমাকে হারাতে পারেননি। অনু তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কেন বয়স্কদের সঙ্গে তর্ক করেছে তাতে তুমি বলেছ বড়রা যদি ভুল বলেন তাহলে বিনীত হয়ে তাঁকে সেটা বুঝিয়ে দেবার নাম তর্ক নয়। এরপর একদিন ওদের ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে সারাদিনের জন্য ডায়মন্ডহারবার বেড়াতে যাচ্ছিল কিন্তু তুমি অনেকে বলেছ তোমার বাড়ির লোকজন যা পছন্দ করেন না তা না করলে যদি কোন অসুবিধা না হয় তাহলে করো না। তোমার পিসিমাকে কৈফিয়ত দিতে হতে পারে।'

আমি কি বলব বুঝে পাচ্ছিলাম না। এ কি মেয়ে রে বাবা! এ তো মিথ্যের জাহাজ! যার সঙ্গে আমি একটাও কথা বলিনি সে নিজের প্রয়োজনে তার পিসির কাছে আমার নামে এস্তার কথা বানিয়ে বলে গেছে। হঠাৎ মনে হল এই মহিলার কাছে অন্তত এ ব্যাপারে সত্যি কথা না বলছি ভাল। ভদ্রমহিলা আরও কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে গেলেন।

আমি বুঝতে পারছি উনি এখন আমাকে খুব কাছের মানুষ বলে মনে করছেন। তাঁর এই সমস্যা নিয়ে কথা বলার লোকও বেশি নেই! একেত্রে আমাকে বেছে নিয়েছেন। আমার ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগছিল না। তবে মেয়েটি, যার নাম অনু, সে কেন আমাকে নিয়ে গল্প তৈরি করে আর ভুলেও আমার সঙ্গে কথা বলে না! অবশ্য গল্পে আমাকে ও বেশ ভাল চরিত্রের মানুষ বলে দেখিয়েছে, আমি খোজ নিলাম। ওদের ক্লাসের কোন ছেলে ইদানীং প্রফেসরের সঙ্গে তর্ক করেনি অথবা ডায়মন্ডহারবার বেড়াতেও কেউ যায়নি।

ঠিক পরের দিন বিকেলে ওর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলাম। দেখামাত্র মুখ নামিয়ে চলে যাচ্ছিল, আমি কথা বললাম, 'সুবর্ণা আজ আসেনি?'

মাথা নাড়ল সে। যেন সেটাই উত্তর।

'আপনার পিসিমা আমার হোস্টেলে আবার এসেছিলেন।'

এবার দৃষ্টি পায়ের দিকে। ঠোঁট নড়ল না।

বললাম, 'এখন এমন ভাব করছেন যে দেখে মনে হচ্ছে কথা বলতে জানেন না। অথচ এখানকার সব কথা টেপ করে পিসির কাছে গিয়ে বাজাতে অসুবিধে হয় না। অবশ্য ভালই করেছেন। আমি যা বলেছি তা ঠিকঠাক ওঁকে বলেছেন। কেউ ভুল বললে বিনীত হয়ে সত্যি কথাটা বলবেন, পিসিকে দুঃখ দেওয়া হবে এমন কাজ করবেন না।'

এবার সে চকিতে চোখ তুলল। আর আমার মনে হল বৃকের ভেতর কেউ যেন সার্চ লাইটের আলো

ফেলল। সেই আলোয় তীব্রতা নেই, অধুত স্নিগ্ধ আরামদায়ক। আমার মনে চমৎকার আনন্দ তৈরি হয়ে গেল। অনন্যা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রাগ করেছেন?'

কপট গলায় বললাম, 'মিথো কথা বলা আমি পছন্দ করি না।'

'কারও ক্ষতি না করে বললেও?' তার মাথা ঝেঁপে হেলানো।

'সেটা অবশ্য ভাবার বিষয়। আর একটা কথা, আপনি গাড়িতে আসা-যাওয়া করেন, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো দেখা যায় কেন?'

নে হাসল। তারপর বলল, 'আমাদের বাড়ির মেয়েরা জেলখানায় বাস করবে বলে ছেলেরা স্থির করেছিল। আমি যখন সুযোগ পেয়েছি তখন সেই সুযোগ কেন কাজে লাগাব না! ক্লাস না থাকলেই আমি আর সুবর্ণা তাই হাঁটতে বের হই।'

'হাঁটতে? ডরদুপুরে কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে ভাল লাগে?'

'যাকে কখনও হাঁটতে দেওয়া হয় না তার কাছে দুপুরের কিংবা রাতের কোন পার্থক্য নেই। রাস্তা বাড়িঘর এমন কি আকাশটাকেও সব সময় নতুন বলে মনে হয়।'

'তা বেশ। কিন্তু আপনার ভুলের জন্যে আমি যে বিপদে পড়েছিলাম, তার বেলায়?'

'আমার ভুল নয়। অতীন্দা আমাকে ভুল বুঝিয়েছিল?'

'মানলাম। কিন্তু এখানে কি হচ্ছে তা পিসিকে গিয়ে বলতে হবে?'

'আমি নিজে যেতে বলিগি। আমাদের ড্রাইভার কথা বলতে দেখেছিল। পিসি ওর কাছে শুনে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল। তখন না বলে উপায় ছিল না।'

'বোঝা গেল।'

'আমি তো এজন্যে ফমা চেয়েছি।'

'আপনি চাননি, সুবর্ণা আপনার হয়ে চেয়েছিল।'

'একই হল না?'

'কি করে হবে? কেউ যদি সুবর্ণাকে কিছু বলে সেটা আপনাকে বলা হবে?'

'বেশ, তাহলে আমিই ফমা চাইছি। পরে পিসেমশাই আমাকে সব বলেছিলেন।'

'পিসেমশাই? ও। আমার ভাল লেগেছে ওঁকে। আচ্ছা, উনি কি করেন?'

অনন্যা একটা ইংরেজি কাগজের নাম করে ভদ্রলোকের পুরো পরিচয় দিল। আমি এবার হতভয়। বাল্যকাল থেকেই দেখে এসেছি ওই কাগজটি আমাদের বাড়িতে নিয়মিত আসে। আমার পিতামহ একটু-একটু করে ওই কাগজটির প্রতিটি পাতাই আমার মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সম্পাদকীয় পাতায় প্রতি সপ্তাহে একটি বিশেষ কলম খুব জনপ্রিয় ছিল, মনে আছে। সেই কলমটির লেখক যে এই ভদ্রলোক তা জেনে বিশ্বাসের সীমা রইল না।

'উনি আমার সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছেন?'

'আমি বলব না!' হেসে মুখ ফেরাল অনন্যা।

'কেন? খুব খারাপ কিছু?'

'না-না। বলেছেন, ছেলেটা নেহাতই ভালমানুষ। টু ওড।'

'কেন?'

'উনি বলেছেন ওঁকে যদি রাতদুপুরে কেউ তুলে আনত তাহলে মজা দেখিয়ে দিতেন। আর এনেও যাওয়ার সময় ট্যাক্সি ভাড়াটা আদায় করে নিয়ে যেতেন। ওই সময়টুকু নষ্ট হল বলে ক্ষতিপূরণ চাইতেন। আপনি এসব কিছুই করেননি।' অনন্যা ঘড়ি দেখল।

'আমরা কি অনেকক্ষণ কথা বলছি?'

'হ্যাঁ। আমার ড্রাইভার এসে গিয়েছে।'

'আর একটা কথা, আপনার পিসিমা তারপরেও কেন এলেন আমার কাছে?'

'আপনাকে উনি বেশ বিশ্বাস করে ফেলেছেন।'

'আমাকে উনি লক্ষ্য রাখতে বলেছেন আপনার ওপরে।'

যাড় বেঁকিয়ে সে বলল, 'বেশ তো, রাখবেন। আপনাকেও সঙ্গে হাঁটতে হবে কিন্তু।'

'ছায়া থাকলে হাঁটতে রাজী আছি। আচ্ছা, আপনার বাবা-মা এসব জানেন?'

‘মাথা খারাপ! তাহলে তৎক্ষণাৎ আমার বলছে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।’ অনন্যা হাসল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, ‘মিসিকে নিষেধ করে দেব আপনার কাছে যেতে?’

‘নাঃ। ভাইঝি আমার সম্পর্কে কি বলছে তাহলে সেটা জানা যাবে না!’

‘আমি ষাই?’

‘বেশ। আবার কবে দেখা হবে? কাল থেকে ছুটি পড়ে যাচ্ছে।’

সে এক মুহূর্ত ভাবল। তারপর বলল, ‘আমি রোজ একটার সময় নাইটেরিতে আসব।’

‘বাবা, তোমার ফোন।’ নীলা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কখন টের পাইনি।

‘কে করছে?’

‘কে এক মিসেস মুখার্জী, নাম বলতে চাইল না।’

মিসেস মুখার্জী? আমি মুখ মনে করতে চাইলাম।

‘হ্যাঁ। একটু সন্দেহজনক মহিলা।’

‘কেন?’ হেসে ফেললাম।

‘প্রথমে নামারটা যাচাই করলেন, তারপর ইয়ে মানে বলে তোমার নাম উচ্চারণ করে জানতে চাইলেন আছ কিনা। আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বললেন, নাম বললে বুঝতে পারবেন না, বলুন মিসেস মুখার্জী টেলিফোন করছেন।’

এতক্ষণ এই বারান্দায় বসে আমি একটি স্বপ্নের ছায়াছবি দেখছিলাম। এখনও আমার মনে তার রেশ ছড়ানো। এসময় এরকম ফোনকে উৎপাত মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যেই নীলা বলল ভদ্রমহিলার কথাবার্তা সন্দেহজনক অমনি আমার উৎসাহ বেড়ে গেল।

আমি এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুললাম, ‘হ্যালো!’ ওপ্রান্তে কোন সাড়া না থাকায় দ্বিতীয়বার হ্যালো বলতে হল। আমাদের বাড়ির নিয়ম হল কারও টেলিফোন এলে তাকে ঘরটি ছেড়ে দেওয়া। ইদানী একারণে আমার খুব কষ্ট হয়। নীলার বেশ কিছু ফোন আমাকে ঘর ছেড়ে যেতে শাস্তি দেয় না।

এখন নীলাও ঘরে নেই। অথচ ওপাশে কারও সাড়া নেই। আমি অনেকবার হ্যালো বললাম। লাইনটা এখনও জীবিত। যিনি টেলিফোন করেছেন তিনি ইচ্ছে করেই আমার গলা শুনে কথা বলতে চাইছেন না। অথচ নীলাকে বলেছিলেন কথা বলতে চান। বাধ্য হয়ে টেলিফোন নামিয়ে রেখে ভাবতে লাগলাম মিসেস মুখার্জী বলে কাউকে আমি চিনি কিনা। মিসেস যখন তার একজন মিস্টার নিশ্চয়ই থাকবে। এই মুহূর্তে আমি অন্তত পাঁচজন মুখার্জীকে মনে করতে পারছি কিন্তু তাদের কীরা এমন কাণ্ড কখনই করবেন না।

আমি বিবাহিত কিন্তু বিপত্নীক। আমার দ্ব্যস্ত শরীর এবং সৌন্দর্য নাকি অনেক যুবকের কাছে দর্শ্যর বস্তু। আমার মেয়ে আমাকে রঙচঙে পোশাকে সাজাতে খুব ভালবাসে। ওর বন্ধুরা নাকি প্রথমবারে আমাকে ওর বয়ফ্রেন্ড বলে ভেবেছিল। মাঝবয়সী প্রেমিক নাকি আত্মকাল অনেক মেয়ের থাকে। তা এসব শুনে আমার তো বেশ ভাল লাগার কথা। লাগেও। কিন্তু নীলা চলে আসার পর আমার কোন বান্ধবী নেই। অনন্যা চলে গেলে অনেকেই মনে করেছিলেন সেরকম হতে পারে। এমন কি দূর মঞ্চস্থলে বসে আমার পিতামাতাও দ্বিতীয়বার ক্রী গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ওঁদের অভ্যুহাত ছিল নীলা, নীলা ছোট্ট, ওর জন্যেই এটা করা দরকার।

করিনি। করতে ইচ্ছে হয়নি। তাই বলে মহিলাদের আগ্রহ আমার সম্পর্কে নেই একথাও বলছি না। তবে তাঁরা বেশিরভাগই বিবাহিতা, স্বামী এবং সন্তান থাকা সত্ত্বেও কোন না কোন অভাববোধে ভুগছেন। আমি এসব মানুষকে এড়িয়ে চলি। খামকা ঝামেলায় কে পড়তে চায়। তাছাড়া আর একটি সত্তা আছে, আমার কাছে কোন মানুষী আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে তার চেহারা, ভঙ্গি, ব্যবহার এবং কথায়। নীলা পনোরোতে পা দেবার পর থেকেই আমি ওর বিকল্প কোন নারীকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম না।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসামাত্র নীলার সঙ্গে চোখাচোখি হল, ‘কেসটা কি?’

‘বুঝলাম না!’

‘উনি তোমার সঙ্গে কথাই বললেন না?’

‘না।’

‘আমাকে যারা ফোন করে, মানে তুমি ধরে দাও, তারা কিন্তু কথা বলে।’

‘হ্যাঁ। কিন্তু আমি ফোন ধরেছি—।’ কথা শেষ করতে পারলাম না, আবার ফোন বাজল। আমি পিছিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে হ্যালো বললাম। দুবার, তিনবার। কোন সাড়া নেই। অথচ যিনি ডায়াল করেছিলেন তিনি রিসিভার নামাচ্ছেন না। লাইন কেটে দিয়ে বললাম, ‘এটা নিশ্চয়ই তোমার ফোন। আমার গলা পেয়ে সাড়া দিল না।’

‘তাই যদি হয়, ওরা কাওয়ার্ড, এক নম্বরের গাধা।’

‘ওদের নিষেধ করতে পারো তো এভাবে বিরক্ত করতে।’

‘আশ্চর্য! আমাকে কি কেউ বলবে তোর বাড়িতে ফোন করেছিলাম কিন্তু এক ভদ্রলোক ধরতে নামিয়ে রেখেছি। আর যদি কেউ বলেই ফেলে তাহলে তাকে আমি ছেড়ে দেব?’ বলে অদ্ভুত ভাবে হাসতে লাগল নীলা।

আমি সন্দেহ করলাম, ‘কি হল?’

‘কিন্তু এই ফোনটা তো সেই ভদ্রমহিলাও করতে পারেন!’

‘কেন ভদ্রমহিলা?’

‘মিসেস মুখার্জী, একটু আগে তুমি রিসিভার ধরতে যিনি কথা বলেননি!’

আমি মেয়ের দিকে তাকালুম। ওর মুখে দুটুমি। তারপর হেসে নিছের ঘরে চলে এলাম। নীলা যখন সব বড় হচ্ছে তখন থেকে টেলিফোনটা আমার কাছে প্রায় বিভীষিকার পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। প্রায়ই ফোন বাজত এবং ওপাশ থেকে কেউ সাড়া দিত না। অথচ ফোনগুলো যে নীলার জন্যে বাজছে এমন প্রমাণ আমার হাতে ছিল না। মাঝে মাঝে সাহসী কেউ আমার গলা পেয়েও দূর করে বলে দিত, ‘একটু নীলাকে ডেকে দেবেন?’ স্বভাবতই আমি একটু বিরক্ত এবং সেই সঙ্গে কৌতূহলী হতাম, ‘কে বলছে?’ চটপট উত্তরে আসত, ‘আমি অনিতার দাদা।’

‘কি দরকার ওর সঙ্গে?’

প্রশ্নটা করামাত্র লাইন কেটে যেত। আমি জিজ্ঞাসা করলে নীলা বলত অনীতা নামে কোন মেয়েকে ও কশিনকালে চেনে না। আর তখন থেকে একধরনের অস্বস্তি আমাকে করে যেত। কখনও সত্যি কোন ছেলে আমার প্রশ্নের জবাবে বলত, ‘দীপা ওকে কয়েকটা কথা বলতে বলেছে।’ আমি রিসিভার রেখে মেয়েকে ডাকতাম। সে এলে জিজ্ঞাসা করতাম, ‘দীপাকে চেনো?’

নীলা মাথা নাড়ত, ‘হ্যাঁ, আমার সঙ্গে পড়ে।’

‘সে নিজে টেলিফোন করতে পারে না? দাদাকে দিয়ে করায় কেন?’

‘ওদের বাড়িতে টেলিফোন নেই।’ নীলা রিসিভার তুলত। তখন আমার দেখানে দাঁড়ানো নীতিবিরুদ্ধ। চলে আসতাম কিন্তু ইচ্ছে করত ওদের কথাবার্তা শুনতে। পাশের ঘরে বসেও নীলার হাসি কানে আসত। কথা শেষ করে নীলা আমার কাছে এসে বলত, ‘দীপার দাদাটা না ভীষণ অনভ্য!’

অসভ্য শব্দটি মেয়েদের মুখে যে ঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না তা আমি জানি। গভীর গলায় জানতে চাইতাম ওই কথা বলার কারণ। নীলা হাসতে হাসতে বলত, ‘দীপার তো জড়িস হয়েছে। তাই ওর দাদা বলল বাড়ি থেকে বাচ্চা মেয়ের গত ওয়াটার বটলে করে যেন স্কুলে জল নিয়ে যাই!’

‘এই উপদেশ দেবার জন্যে ফোন করেছিল?’

‘না, না। দীপার কাছে আমার একটা বই ছিল, সেটা কিভাবে ফেরত দেবে তাই জানতে চাইছিল। আমি বলেছি কাল বিকেলে আমাদের বাড়িতে এসে দিয়ে যেতে।’

‘বিকলে, কখন?’

‘টাইমটা বলিনি। কেন জিজ্ঞাসা করছ?’

‘ওই সময় আমি বাড়িতে থাকব না, কাছের লোক নাও আসতে পারে আর তুমি দূর করে একটা উটকো ছেলেকে আসতে বলে দিলে?’

‘উটকো কেন হবে? ও তো দীপার দাদা!’

‘হতে পারে দীপার দাদা। কিন্তু তার স্বভাবচরিত্র কিরকম তা তুমি জানো?’

‘বাঃ, ওর স্বভাবচরিত্র ছেনে আমি কি করব?’

‘ছেলেটা তোমাকে একা পেয়ে বিপদে ফেলে দিতে পারে।’

‘কি বিপদ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ও আমার বন্ধুর দাদা। ক্যালকটা বয়েজে পড়ে। ভাল ছেলে। বই ফেরত দিতে এসে আমাকে বিপদে ফেলবে কেন?’

আমি আর কথা বাড়াইনি। পরদিন অফিসে মন বসাতে পারলাম না। বিকেল বিকেল বাড়িতে ফিরে এসে দেখি একটা রোগা মতন ছেলে বসে নীলার সঙ্গে গল্প করছে। ছেলেটাকে দেখে গুড়ি বয় বলে মনে হল। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ারাত্র সে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে আসছিল, আমি আপত্তি করলাম।

সঙ্গে সঙ্গে নীলা বলে উঠল, ‘এই তুমি আমার বাবাকে প্রণাম করলে কেন?’

ছেলেটি ভাব না দিয়ে হাসল।

‘ও একটু আগে বলছিল নিজের মা আর বাবা ছাড়া কাউকে চট করে প্রণাম করে না।’

ছেলেটি হাসল, ‘না, করি না। কিন্তু ওঁকে দেখে মনে হল প্রণাম করা যায়।’

আমার মনে হল ছেলেটি বড়িবাড়। অথচ রাগতে গিয়েও রাগতে পারলাম না। ওর বোনের শরীর সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

আমার অদ্ভুত একটা অনুভূতি হচ্ছিল। এই ছেলেটির সঙ্গে নীলা কি রকম স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে। আমাদের ওই বয়সে খালি বাড়িতে কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে সাহসই পেতাম না। অথচ ওরা আমাকে দেখে একটুও ভয় পেল না। ওরা কি প্রেম করছে? আমার নীলা? ওইটুকু মেয়ে! আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপরেই মনে পড়ল ছেলেটির কথা। আমাকে দেখে ওর মনে হয়েছে প্রণাম করা যায়। কথটা যদি বানানো না হয়—!

আমি আয়নার সামনে দাঁড়লাম। অনেকেই বলে আমি চেঁচা করলে নাকি ফিস্বে নামতে পারতাম। আমার মধ্যে কি সত্যি কোন নৌমা পাশু ভ্রলোক লুকিয়ে আছে যাকে আমি দেখতে পাই না অথচ ছেলেটি দেখেছে? এসব প্রশ্ন অন্য কাউকে করা যায় না। নীলাকেও না। অথচ নিজের কোন উত্তর নেই।

এসব কথা কয়েক বছর আগের। তখন নীলা ছোট। সত্যি কথা বলতে কি ওই সময়ের মেয়ের ব্যাপারে আমি আমার ছেলেবেলায় দেখা গার্জেনদের নকল করতাম। আমার কেবলই মনে হত যে কোন ব্যক্তি ছেলে এসে আমার নীলাকে ডুলিয়ে ফেলবে। এই ভয়টা তখন খুব বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে নীলাই আমার ভয়টা ভেঙে দিয়েছে। এখন তো কলেজে পড়ে। অনেক স্বাধীনতা দিয়েছি কিন্তু কখনই ও তার অপব্যবহার করেনি। ইদানীং আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছে, নীলা আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না। সমবয়সী দূরের কথা, দূতিন বছরের সিনিয়র ছেলেদের সম্পর্কে ও মন্তব্য করে ইন্ম্যটিওরড বলে। কোন ডেপথ নেই। বলে, ‘ওদের নলেজ এড শ্যালো অথচ সেটাই ওরা বোঝে না।’

এসব শুনে আমার বেশ আনন্দ হত। অতএব এ বাড়িতে ওর বন্ধুবান্ধবদের অব্যাহত দ্বার হয়ে গিয়েছিল। অফিস থেকে ফিরে হঠাৎ দেখতে পেতাম দশ বারোটি ছেলেমেয়ে বাইরের ঘরে আড্ডা মারছে। কেউ কেউ সিগারেটও খাচ্ছিল। আর আমার পয়সায় নানান রকম খাবার। আমি রাগ করতাম না। নীলা যে কোন লপেটামার্কি ছেলের সঙ্গে ভিক্টোরিয়ার গাছের তলায় অথবা পর্দা-ফেলা রেন্দুরেণ্টের কেবিনে গিয়ে বসছে না এটাই আমাকে আরাম দিত।

খাবার টেবিল সাজিয়ে যমুনা আমাদের ডাকতে এল। আমরা খোতে বসলাম। এখন নীলা একটা সুন্দর হাউসকোট পরেছে। আজকাল অনেক মেয়ে ম্যাক্সি আর নাইটির পার্থক্য বুঝতে পারে না। খুব কদর্য লাগে। নীলার রুচি অসম্ভব ভাল। এটা সে পেয়েছে অনন্যার কাছ থেকে। রঙে রঙে। অনন্যা দিনরাতের সময়গুলো চারটে ভাগে ভাগ করত। চার ভাগে চার রকম রঙ। সুন্দর লাগত ওকে। প্যান্টের সঙ্গে চটি পরলে চটে যেত।

ছেলেবেলায় পাওয়ার ব্যাপারে খুব বাছবিচার ছিল নীলার। এটা খাব না, ওটা খাব না-র জ্বালায় অস্থির হতাম। ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে মাছ মাংস এবং ডিম ছাড়া বাড়িতে কোন তরকারি হত না। তাও মাছ বলতে কাটাপোনা, ছোট মাছ আনাই যেত না। এ ব্যাপারেও অনন্যার সঙ্গে ওর চমৎকার মিল। তবে অনন্যা মাংস খোতে চাইত না। কাজের মেয়েটি যে রান্না করত তখন তার বেশ সুবিধে

হত এতে। কাজ কমে যেত। একটু বড় হবার পর অবশ্য নীলার এসব বিদ্‌ঘুষ্টে আবদার অনেক কমেছে। মনে হচ্ছে মেয়েটা মানাতে শিখেছে।

খেতে খেতে নীলা আমায় বলল, 'জানো, আজ একটা দারুণ চিঠি পেয়েছি!'

'কার?'

'রবীন সামন্তর।'

'সে আবার কে?'

'কে তা আমি কি করে বলব? তবে ঠিকানা আছে।'

'পোস্টে এসেছে?'

'না।' হাসল নীলা, 'যমুনা খখন সন্ধ্যাবেলায় কাজ করতে আসছিল তখন ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। যমুনা নিতে চায়নি প্রথমে।'

নীলা এবার দূরে দাঁড়ানো যমুনার দিকে তাকাতাই সে হেসে মুখ ফেরাল।

এই এক জ্বালা। গত তিন-চার বছর ধরে আমাদের লেটার বয়ে প্রায় চিরকুট পড়ে। নীলা আই লাভ ইউ, চলে এস নীলা ইত্যাদি কথা ফুলঝুরি সেখানে। যেহেতু লেটারবয় আমিই খুলতাম তাই সেসব নীলার চোখে পড়ার কথা নয়। তবে ও স্বর্ধন কলেজে যায় তখন পথে গিওনের সঙ্গে দেখা হরে যাওয়া খুব স্বাভাবিক ঘটনা। আমি সহজ হবার চেষ্টা করলাম, 'কি লিখেছে রবীনবাবু?'

'দাঁড়াও আসছি।' নীলা উঠে পড়ল।

আমি বাধা দিলাম, 'ওটা খুব জরুরী ব্যাপার নয়। অন্তত খেতে খেতে খাওয়া ছেড়ে ওঠার মত জরুরী কি? নয় তো। তাহলে আগে খাওয়া শেষ করো। এইসব টেবিল-ম্যানারগুলো যে কোন শিক্ষিত মানুষের জানা উচিত।'

'সরি। তুমি না মাঝে-মাঝে মাস্টারমশাই হয়ে যাও।'

আমরা টুকটাক গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ করলাম। গল্পের বিষয়বস্তু হরেক রকম। ওদের কলেজের ছোকরা লেকচারার থেকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মানুষ, কিছুই বাদ গেল না। কিন্তু এসব কথা আলোচনার তলায় মনের মধ্যে রবীন সামন্তর চিঠিটা কিন্তু খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে আমরা টিভির সামনে বসলাম। খুব নিচু স্বরে টিভিকে কথা বলতে দিয়ে ওকে বললাম, 'নিয়ে এসো তোমার চিঠি।'

নীলা উৎসাহিত হল। একটা খাম থেকে চিঠিটা বের করল। তারপর সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল, 'তুমিই পড়। নিজে না পড়লে ঠিক বুঝতে পারবে না।'

পড়লাম,

ডিয়ার মিস নিলা। তুমি আমাকে চিনিবে না। তাই চিনিলে কিন্তু জানিবে আমার জীবন-মরণে, দিন রাতে তুমিই আছ। তোমার বাবাকে বাবা বলিয়া মনে হয় না। উনি কি সত্যি তোমার বাবা? মনে হয় না। তাহা হইলে তুমি ওর সঙ্গে আছ কেন? যাহা হোক, তোমার যদি সত্যি কোন সাহায্যের দরকার হয় তাহা হইলে জানাও। আমি জান কবুল করিয়া দিব। আমার বয়স একুশ। পাবলিক আমাকে আর মিঠুনকে আলাদা করিতে পারে না। এপাড়া ওপাড়ার কত মেয়ে যে আমাকে লভ লেটার দিয়াছে তাহার হিসাব নাই। কিন্তু আমি শুধু তোমার, আর কাহারও না।
• পত্রপাঠ জবাব দিও। আমার ঠিকানা, তিন, দিলদার লেন, কলিকাতা। ইতি তোমারই রবীন সামন্ত (দিলদারের মিঠুন)।

ভেতরে ভেতরে যে আঙনটা ফণা তুলছিল সেটা জুড়িয়ে গেল নীলার হাসি শুনে। খিলখিল করে হাসছে মেয়েটা। হাসতে হাসতে বলল, 'কী ইন্টারেস্টিং না?'

'ছেলেটার স্ট্যান্ডার্ড বুঝতে পারছ?'

'ওঃ, এ নিয়ে কে মাথা ঘামাচ্ছে!' মুখের সামনে বাঁ হাত নাড়ল নীলা, 'কিন্তু ও সন্দেহ করছে যে, তুমি আমার বাবা কিনা। ও আমাকে তোমার হাত থেকে উদ্ধার করতে চায়।'

এবার আমি হাসলাম, 'ঠিকানাটা কি যেন। লোকাল থানায় খবরটা দিয়ে দিই।'

'ওমা, কেন?'

'এদের প্রথমেই শায়েস্তা করা দরকার।'

‘সত্যি, তুমি কিস্যু বোঝ না।’

‘মানে?’

‘এটা কি ভাববার বিষয় হল? ফালতু একটা ছেলের ব্যাপারে খানায় যাবে? তাছাড়া সত্যি বলতে কি ও তো আমাদের ক্ষতি কিছু করেনি, বরং উপকার করতে চেয়েছে।’

‘তুই বড্ড বাজে বকছিস।’

‘না, শোন, আমার মনে হল, এর উত্তর দেওয়া দরকার। ঠিক ওর ভাষায়।’ নীলা আর একটা কাগজ বের করল, ‘আপনাকে আমি দেখি নাই কিন্তু বর্ণনা পড়িয়া চিনিতে পারিতেছি। যাহা হউক, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যিনি আমাকে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে পারিবেন তাঁহাকেই স্বীকার করিব। ভারতীয় নারীর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার দৃষ্টান্ত পাবিনী। যদি ঘটনাটা না জানেন তাহা হইলে জানিয়া লইবেন।’ মুখ তুলল নীলা। সেই মুখে কৌতুক, ‘কেমন হয়েছে?’

‘ভাল। কিন্তু এটা দেবার দরকার নেই।’

‘ওমা কেন?’

‘ও প্রশ্নই পাবে। উত্তরে আর একটা চিঠি লিখবে। হয়তো পাওয়ামাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ করতে বসে যাবে। ভয়ঙ্কর ব্যাপার।’

‘তুমি বলছ এটা পোস্ট করব না?’

‘না, ইগনোর হিম।’

‘তুমি?’

‘আমি মানে?’

‘তুমি খানায় যাচ্ছ নাকি?’

‘দূর!’

আমরা কিছুকণ চিঠি দেখলাম। এই সময় আবার টেলিফোন বাজল। নীলা এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল, ‘হ্যালো? হ্যাঁ, আছেন, আপনি কে কথা বলছেন? ও, ধরুন।’

রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে নীলা আমার দিকে তাকাল, ‘মিসেস মুখার্জী তোমাকে ডাকছেন। উনি তোমার সঙ্গে দরকারী দরকার বলছেন।’

চট করে উঠে পড়লাম। রিসিভারটা নিয়ে হ্যালো বললাম। ওপাশে কোন সাড়া নেই। তিন-চারবারেও তিনি নিরুত্তর রইলেন। খুব রাগ হয়ে গেল, টেঁচিয়ে বললাম, ‘আপনি কে বলুন তো? কেন এভাবে ডিস্টার্ব করছেন?’

এবার ওপাশে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ বাজল। আমি অসহায়ভাবে মেয়ের দিকে তাকালাম। মেয়ে হাসল, ‘ভদ্রমহিলার গলা কিন্তু দারুণ রোমান্টিক, তুমি শুনতে পাচ্ছ না!’

চলে এলাম নিজের ঘরে। এরকম রসিকতার কোন মানে বুঝতে পারছি না। নীলার সঙ্গে কথা বলছেন অথচ আমি ধরলেই নিশ্চূপ! কে হতে পারে? মাথায় ঢুকছে না কিছু।

স্বীকার করতেই হবে, এক ধরনের অস্থিতি আমাকে আকর্ষণ করল। এ যেন পরিষ্কার জামা পরে বাইরে বেরুনের পর আবিষ্কার করা পিঠে একটু ময়লা লেগে রয়েছে। কেবলই মনে হচ্ছে নীলা আমায় ভুল বুঝছে না তো। অনন্যা ছাড়া অন্য কোন নারীতে আজ পর্যন্ত আমি তেমনভাবে আসক্ত হইনি। নীলাকে আমি ঠিক নারী বলে মনে করি না।

কথাটা মাথায় আসতেই সেন সাহেবের কথা মনে পড়ল। আমারই সহকর্মী। স্ত্রী বিগতযৌবনা, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। পারছেজে থাকায় ভাল পয়সা করেছেন। উনি বলেন, মুখের ওপরই বলে থাকেন, ‘মেয়ে মানুষের সঙ্গ দুপুরে, আর সন্ধ্যায় মদিরা। দুটো একসঙ্গে কিছুতেই নয়।’

লোকটার চেহারা যৌবনের চিরুমাত্র নেই। কিন্তু প্রতি সপ্তাহে দু-দিন দুপুরে কাজের অফিসায় বেরিয়ে যান। কলকাতার চার-পাঁচটি জায়গায় ওঁর জানাশোনা পুরুষ বা মহিলার ফ্লাট আছে। সেখানে নাকি ভদ্রবাড়ির মেয়েবউরা শ’তিনেক টাকার জন্যে সঙ্গ দিতে আসে। সেনসাহেবের মতে এরা ঠিক পাবলিক ওম্যান অথবা কলগার্ল নয়। স্বামীসংসারকে লুকিয়ে একটু একটু রোজগার করতে আসে। বেশিরভাগই মদ খেতে চায় না। সেনসাহেবের টেম্পারামেন্টের সঙ্গে খুব ভাল মানিয়ে যায়। এই গল্পগুলো

ভদ্রলোক নির্দিষ্ট করে থাকেন। আমার অফিসের এক ম্যাসাজী ব্রৌট নাকি সেনসাহেবের সঙ্গে এই রকম এক ক্লাসে গিয়ে সভ্যতা যাচাই করে এসেছেন।

এই সেনসাহেব এক সকালে অফিসে এসে হাউহাউ করে আমায় বললেন, 'তুমি তো ছুপা রুস্তম ভাই! বউ মারা যাওয়ার পর বিয়ে করলে না, নিজে কে ব্রহ্মচারী বানিয়ে রেখেছিলে, মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাউভারি পার হতে না আর তলে তলে এই?'

হেসে বললাম, 'কি বলছ বুঝতে পারছি না।'

'পারছ না? কাল বিকেলে লেকের ফুটপাথ ধরে কার হাত ধরে হাঁটছিলে হে? দারুণ দেখতে। যেমন লক্ষা তেমন গড়ন। স্মার্ট পরা দেখে মনে হল বিকেলে ভোরের ফুল।'

আমি রেগে যেতে পারতাম। কিন্তু রাগলাম না। বললাম, 'আপনি স্মার্ট দেখেছেন, ফিগার দেখেছেন কিন্তু মুখ দ্যাখেননি।'

'আহা, ইচ্ছে করলে দেখতে পারতাম। কিন্তু তোমাকে ডিস্টার্ব করতে চাইনি।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'কে হে মেয়েটি?'

'আমার মেয়ে।'

যেন মুখে মাছি পড়েছে ভদ্রলোকের। অবিশ্বাস ফুটে উঠল চোখে তারপরই। একদম ভেতর থেকে শব্দ দুটো ছিটকে এল, 'যাঃ! সত্যি?'

'হ্যাঁ। নিজেকে দিয়ে সবাইকে যাচাই না করে মন্তব্য করার আগে একটু জিজ্ঞাসা করে নেবেন সেনসাহেব। ও আমার মেয়ে নীলা, আমার খুব বন্ধু।'

সেনসাহেব আর কথা বাড়াননি। আমার খারাপ লেগেছিল অন্য কারণে। নীলা এখন এত বড় হয়ে গিয়েছে যে সেনসাহেবের মত আধবুড়ো মানুষও ওকে নিয়ে রসের ভাবনা ভাবে। অতএব আমি নীলাকে নারী বলে মনে করি বা না করি, অন্য লোকদের চোখে ও ইতিমধ্যে নারী হয়ে গিয়েছে। তা সে রবীন নামস্ত কিংবা সেনসাহেব বেই হোক।

মাথা থেকে ভাবনা সরাবার জন্যে টেপারেকর্ডারে ক্যাসেট চাপিয়ে ঘরের আলো নিবিয়ে দিলাম। বাইরে থেকে যেটুকু আলো আসার কথা তার থেকে বেশি আলো আসায় বুঝলাম আভ সন্ধে পেরিয়ে চাঁদ উঠেছে। রেকর্ডারে সন্ধ্যা মুখার্জির গান বাজছিল। একসময় আমি আর অনন্যা এই গানগুলো খুব ভালবাসতাম। অনন্যা সন্ধ্যা মুখার্জির সঙ্গে গলা মেলাতো। এখন এই গান শুনলেই আমি অভ্যস্ত নস্ট্যালজিক হয়ে পড়ি। এক ছুটে মন চলে যায় দুই আড়াই দশক পেছনে। 'ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত!' আমার বুক ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে আমি নিজের অভ্যস্ত ছবি আঁকতে শুরু করেছিলাম। এই সময় আমার কাঁধে নীলার স্পর্শ পেলাম। চোখ বন্ধ করেও আমি এই স্পর্শ চিনতে পারি। আমি চোখ খুললাম না। নীলা আমাকে স্পর্শ করে দাঁড়িয়ে রইল ততক্ষণ যতক্ষণ না গানটা শেষ হয়। পরের গান আরম্ভ হবার আগেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই গানগুলো মা শুনতে খুব ভালবাসতো, না?'

আমি মাথা নাড়লাম, মুখে কিছু বললাম না।

সে বলল, 'তোমার ভাল লাগে এখনও?'

'লাগছে।'

'আমার খারাপ লাগে না।'

ও ভাল লাগে বলল না। আমাদের অল্প বয়সের অনেক ভাল লাগা ওর কাছে মোটেই আকর্ষণীয় নয়। মনে আছে আঠারো বছর বয়সে শেষের কবিতা পড়ে তিনদিন বিম মেরে ছিলাম। লাভণা না অমিত, কাকে ভালবাসব, অমিত হতে চাইলেও লাভণা টানতো বড়, মনে হত বকুল বিছানো পাথে লাভণারা উদাসী বিকেলে অমন অবলীলায় চলে যায়।

নীলাকে শেষের কবিতা পড়তে দিয়েছিলাম। পড়ে বলল, 'বাবা! রবীন্দ্রনাথ এটা লিখলেন কি করে? এমন সাজানো কথাবার্তা, বানানো সম্পর্ক, কাউকে রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না।'

আমি খুব ধাক্কা খেয়েছিলাম। সেই সঙ্গে রাগ হয়েছিল খুব। ওর মা থাকলে হয়তো এই কথা বলার জন্যেই মেয়ের সঙ্গে ব্যালাপ বন্ধ করে দিত। সেই রাতে আমি আবার শেষের কবিতা পড়লাম। অনেক

অনেক বছর পরে পড়তে পড়তে মনে হল নীলা খুব বেশি ভুল বলেনি। তবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ভো বলেছেন, কথাগুলো যদি বানানো হয় দোষ কি! হিরে বসানো সোনার কুল কি সত্যি? তবু সত্যি নয়?

আমাদের আর একটা বই ছিল খুব প্রিয়। সে ছেলেবেলায় যে বইটি আমাদের রহস্য রোমাঞ্চ জগতে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিল। নীহাররঞ্জনের কালো ভ্রমর। বারো বছরের এই আমি এক বৃষ্টির রাতে শীত বাঁচাতে চাদের মুড়ি দিয়ে বইটা পড়তে পড়তে উত্তরজনার আগুন পুইয়েছিলাম। পরে অনন্যাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি তারও একই অনুভূতি হয়েছিল। তেরো বছরে নীলা হার্ডি বয়েস থেকে উত্তরিত হয়েছে আগাখা ত্রিস্টিতে। ওকে পড়তে বলাই ভুল হয়েছিল আমার। পড়ে হেসে খুন। আমি আর যাচাই করতে চাইনি। এত বছর পরে নতুন করে পড়তে ইচ্ছে করেমি কালো ভ্রমর। যা আমার ভাল লাগায় নৈটে আছে তা থাক চিরদিনের জন্যে। নষ্ট করে তো কোন কিছু লাভ হবে না।

কিন্তু আমাদের যা কিছু ভাল লাগার বস্তু তাই ওর কাছে হাস্যকর তাও তো নয়। চাঁদের পাহাড় পড়ে দক্ষণ উজ্জ্বল হয়েছিল নীলা। সঙ্গে সঙ্গে বিভূতিভূষণ পড়তে শুরু করল। অবশ্য কয়েকটি পড়ার পর বলে বসল, 'যিনি চাঁদের পাহাড় লেখেন তিনি এত স্পীডলেস উপন্যাস লেখেন কেন? শুধু বর্ণনা আর বর্ণনা।'

আমার খুব ভয় ছিল, ওর যদি পথের পাঁচালী ভাল না লাগে। ভয়েই জিজ্ঞাসা করিমি কোনদিন।

এসব কি জেনারেশন গ্যাপের কারণে? তাহলে রবীন্দ্রনাথের যেসব গান শুনে অনন্যা আনমনা হত সেইসব গান কানে এলেই ও একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ে কি করে? রবীন্দ্রনাথের গান প্রায়ই ওকে গুন গুন করতে গুনি। অথচ আর পাঁচটা মেয়ে যেমন কথা শেখার আগেই আঁকার কুলে ভর্তি হয়, গান নাচের আশ্রয় নিয়মিত যায়, আমি ওকে চেষ্টা করেও পারিনি। সেই সময় বালিকা নীলা বলত, 'ডান্নাগে না।' আমি ওকে ওর মত করে বড় হতে দিয়েছিলাম। অতএব জেনারেশন গ্যাপটোপ আমি বুঝি না। এমন হতে পারে আমাদের অল্প বয়সে বোধবুদ্ধি কম ছিল, ক্ষুদ্র জিনিসকে ভাল লাগা দিয়ে অনেক বড় করে ফেলতাম। আর তার স্মৃতি বহন করে চলেছি পরবর্তীকালে একটুও যাচাই না করে। পঁয়ত্রিশ বছর আগের ছবি পথের পাঁচালি দেখে নীলা যদি বলে ফ্যান্টাস্টিক তাহলে আর গ্যাপের কথা ওঠে না। আমরা যা আবেগ দিয়ে আঁকড়ে ধরতাম ওরা তা যুক্তি দিয়ে বিচার করে, এই যা।

'তুমি ঘুমোবে না?'

'একটু বাদে।' আমি ওর আঙুল স্পর্শ করলাম।

'আমার ঘুম পেয়েছে।' বলে নীলা মুখ নামিয়ে আনল। আমি আমার দুই গালে ওর ঠোঁটের স্পর্শ পেলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীরে সুখের ঢেউ বয়ে গেল। আহ! এই মুহূর্তটির জন্যে আমি যে কোন মূল্য দিতে রাজি আছি। চুহনের পর নীলা ফিসফিস করে কিছু বলল। আচকাল কেউ এখন গুনতে চাইলে কথাগুলো বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমি পারি। হয়তো নীলার ঠোঁট থেকে শব্দগুলো বাইরে বের হচ্ছে না কিন্তু আমার আর ওর রক্তে সেগুলো মিশে গেছে। নীলা বলল, 'আমি তোমাকে খুঁঁব ভালবাসি বাবা, আমি তোমাকে কখনও দুঃখ দেব না।'

নীলার যখন তিন বছর বয়স তখন ওকে আমি মজা করেই বলেছিলাম, 'তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না, শুধু দুঃখ দাও।' ও সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেছিল, 'আমি তোমাকে খুঁঁব ভালবাসি, আমি তোমাকে কখনও দুঃখ দেব না।' তখন নীলা আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোতো। ঘুম থেকে ওঠার সময়, কুলে যাওয়ার সময়, রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় আমাকে হাম না খেলে ও অন্ধকার দেখত। প্রতিটি দিন ও আমাকে এই আদর করে এসেছে। প্রতিটি রাতে গুতে যাওয়ার আগে ও ওই কথাগুলো বলেছে। প্রথমে কথাগুলো শোনা যেত, ধীরে ধীরে শব্দ মরল। এখন ঠোঁট নাড়া এবং ফিসফিসানিতে অন্য কেউ না বুঝলেও আমি বুঝতে পারি।

নীলা চলে গেল ওর ঘরে। আমরা কেউ রাতে শোওয়ার সময় দরজা বন্ধ করি না। ওর ঘরের আলো নিবে গেলে আমি ভল্যুম কমিয়ে দিলাম। টেপে এখন সফ্যা মুখার্জি গাইছেন, 'এ শুধু গানের দিন, এ লগন গান শোনাবার।' নীলার ঘুমের যাতে অসুবিধা না হয় তাই গান বাজছিল একেবারে নিচু আওয়াজে।

আঠারো বছরের মেয়ে তার বাবাকে হাম খায় না। অস্তিত্ব আমার দেখা কোন বাবা নিয়মিত এই সৌভাগ্যের অধিকারী নন। লোকে গুনলে নিশ্চয়ই অবাক হবে। আমাদের বাড়িতে যমুনার আগে যে কাজ

করত সেই মহিলাটিও হাঁ হয়ে গিয়েছিল দেখতে পেয়ে। তাই নিয়ে গল্প করেছিল বস্তুতে ফিরে গিয়ে। এটা যেন এক ধরনের অপরাধ। অদ্ভুত ব্যাপার। মেয়ে আমার কাছে বদলালো না, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কে কোন ফাটল ধরেনি, তাহলে পনেরো বছর আগে যা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক তা আজ দৃষ্টিকটু হবে কেন?

আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি দিদি বা বোনেরা একটু বড় হতে শুরু করলেই বাবার ধারে কাছে যেতেন না। তখন তাদের যা কিছু ব্যাপার তা মায়ের সঙ্গে। আমার দিদি পনেরো বছর বয়সে বাবাকে যদি হাম খেতে যেত তাহলে নিশ্চয়ই বাবার স্ট্রোক হত, মায়ের হার্ট অ্যাটাক কিংবা নীলার সেই হামাগুড়ি দেবার বয়স থেকে প্রতিটি দিন ও যা করে এসেছে তা বন্ধ করার কোন অবকাশই আসেনি। তিন থেকে চার, চার থেকে পাঁচ, বছরগুলো এসেছে গিয়েছে, দিনের পর দিন গড়িয়ে গেছে, ও এবং আমি একই জায়গায় সম্পর্কটাকে রেখেছি। ওর কোনদিন আচমকা মনে হয়নি, কাল অবধি আমি তোমাকে আদর করেছি কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আর ওটা করা উচিত নয়, কারণ আমি বড় হয়ে গিয়েছি। ব্যাপারটা কি হাস্যকর শোনাতো না?

আমার পরিচিত অনেক বাবার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, তাঁরা জানেনই না কখন কবে তাঁদের মেয়েদের সঙ্গে ওই সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। তাঁরা মনে করতে পারেন শিশুকালে মেয়ে রোজ হাম খেত। অফিসে বেরুবার সময় মেয়েকে ক্রিম খেয়ে না গেলে চলত না। কেউ কেউ মনে করেন, মেয়ের সাত আট বছর বয়সে সে যখন নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতন হন তখনই ব্যাপারটায় ছেদ পড়েছিল। কেউ বলেছিলেন, মাসখানেকের জন্যে মেয়েকে ছেড়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখলেন মেয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে কখন ওই ফাঁকে। কেউ বলেছেন, মেয়ে বড় হতে শুরু করামাত্র স্ত্রী নিষেধ করেছেন ওইসব আত্মদীপনা না করতে। অর্থাৎ বাবা যে একজন পুরুষমানুষ ওই বোধ মা-ই মেয়ের মনে ঢুকিয়ে দিয়ে পাঁচিল তুলেছিলেন।

হতে পারে। কারণ প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা তাঁর নিজস্ব। কিন্তু আমি এসব বুঝতে পারি না। আমার শরীরটাও তো একসময় ছোট ছিল। সময়ের সঙ্গে কখন সেটা একটু একটু করে বড় হয়ে গেছে, রেখার পর রেখা জমেছে এবং ঘন হয়েছে তা তো বুঝতেই পারিনি। নীলার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও সেইরকম থেকে গিয়েছে। বাইরের কোন অনুশাসক আমাদের বিচ্ছিন্ন করেনি।

যমুনা চলে গিয়েছিল অনেকক্ষণ আগে। নীলার ঘর অন্ধকার। টেপেরেকর্ডার বন্ধ করে আমি নিজের বিছানায় যাওয়ার আগে একবার ওর দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এটা আমার অনেক কালের অভ্যাস। কে বলবে মেয়েটার বয়স এত হল। একেবারে বাচ্চা মেয়ের মত বালিশ আঁকড়ে ঘুমিয়ে আছে। শুতে পারলেই ঘুম আসতে দেরি হয় না। নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

স্বামী-স্ত্রীর মাপে তৈরি এই খাট আমাদের বিয়ের কিছুদিন আগে কেনা। দুটো মানুষ ঠিকঠাক শুতে পারে। নীলা শুয়েছে তিন-চার বছর পর্যন্ত। তারপর আমার একবার পয়স হল। সামান্য। কিন্তু মেয়েকে পাশে রাখা যেহেতু উচিত নয় তাই আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছিল। সেইসময় একটি আয়া দিনরাত ওর পাশে থাকত। রোজ রাতে শুতে যাওয়ার সময় মেয়ের সে কি কামা। ওই বারো দিনের বিচ্ছেদ কোন অভ্যাসকে ভেঙে দেয়নি। শুধু তারপর থেকে ওর ঘর আলাদা হয়ে গেল। একা একটি ঘরের মালিক হওয়ার মধ্যে একধরনের সুখ আছে, সেই সুখটা ও টের পেয়ে গেল।

আমার, এই এতদিন বাদেও একা শুতে খুব খারাপ লাগে। একা শুলেই নানান চিন্তা মাথায় টু মারে। হাত প্রসারিত করলেও কাউকে পাই না। মাঝরাতে উলটো-পালটা স্বপ্ন দেখে উঠে বসে খুব অস্বস্তি হয়। কেউ কাছে থাকলে তার সঙ্গে কথা বলার সুবিধে পাওয়া যায়। কথা না বললেও এক ধরনের তাপ পাওয়া যায়। এই সময়টায় আমি খুব অভাববোধ করি।

বিছানায় শুতেই আমার চোখের সামনে শ্যামল এবং তাকে সরিয়ে সেই রবীন সামন্ত এসে গেল। আমি জানি ওদের নিয়ে কোন ভয় নেই। নীলার কোন যোগাই নয় এরা। তবু কেন যে এরা নীলাকে অথবা আমাকে বিরক্ত করে। ওই বয়সে আমার অনেক বন্ধুবান্ধব অবশ্য পাড়ার মেয়েকে প্রেমপত্র লিখত। কিন্তু সেগুলো ছিল হার্মলেস। স্বপন নামের একটি ছেলে আমাকে দিয়ে প্রেমপত্র লেখাতো। ওই বয়সে খুব মজা পেতাম। আমার একটা কোটেশন নোট করার খাতা ছিল। তা থেকে উজাড় করে দিভ্যম চিঠির পাতা। স্বপন নামটা সেই করার সময় খুব ভাল লাগত না।

সেইসব চিঠির উত্তর পেয়ে স্বপন আমাকে দিয়ে আবার লেখাতে আসত। বোঝাই যায় ওই চিঠি মেয়েটির গার্জেনদের হাতে পড়ত না। তারপর একসময় সেই পর্ব শেষ হয়েছিল। কীভাবে কেমন করে তা মনে নেই, তবে স্বপনকে খুব মনমরা দেখতাম। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিত না। আমারও মনে হয়েছিল বেঁচে গেলাম। কারণ আমার কোটেশনের খাতায় আর কিছু উদ্ধৃত করার মত অবশিষ্ট ছিল না। এসবই ঠিক। কিন্তু তখন মজাটা ছিল গা বাঁচিয়ে। কোনরকম ঔদ্ধত্য দেখানোর সাহসই কারও ছিল না। কোন মেয়ে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালেই জীবন ধন্য হয়ে যেত। কিন্তু রবীন সামন্তরা তো সেই ধাঁচে গড়া নয়।

ঘুম আসছিল যখন তখনই টেলিফোন বাজল। তড়াক করে উঠে পড়লাম। নীলার ঘুম ভেঙে যাবে। একছুটে দূরত্বটা অতিক্রম করে রিসিভার তুলে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললাম, 'হ্যালো!'

ওপাশে একটু সময় নষ্ট হল। আমি দ্বিতীয়বার হ্যালো বলতেই একটি নারীকণ্ঠ জানান দিল, 'হ্যালো!'

তারপর আমার টেলিফোন নাম্বারটা উচ্চারণ করে যাচাই করতে চাইল।

আমি বললাম, 'ঠিকই। কাকে চাইছেন?'

এবার তিনি আমার নামটা উচ্চারণ করে জানতে চাইলেন ঠিক মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন কিনা। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আপনি কে বলছেন?'

'যদিও সময়টা টেলিফোন করার নয় তবু করলাম বলে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো?'

আমার তো বিরক্ত হওয়াই উচিত। কোন ইমার্জেন্সি না থাকলে এইসময় কেউ কাউকে ফোন করে না। আমি নীলার ঘরের দরজার দিকে তাকালাম। ঘর এখনও অন্ধকার! সে জেগে গেছে কিনা বোঝার উপায় নেই। বললাম, 'নিশ্চয়ই জরুরী কিছু, বলুন।'

'না, ঠিক জরুরী নয়।'

'তাহলে? আপনি কে বলছেন?'

'পরিচয় দিলে আজ আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না।'

'কখনও কি চিনতাম?'

'অবশ্যই।'

'আমার স্মৃতি খুব খারাপ নয়।'

'থাক না ও প্রসঙ্গ।'

'মাপ করবেন, আপনি কি আজ সন্ধ্যা থেকে কয়েকবার ফোন করেছেন?'

'হ্যাঁ! উত্তরটা পরিষ্কার গলায়।'

'আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন, আমার সঙ্গে বলেননি কেন?'

'সাহস হারিয়ে ফেলেছিলাম।'

'বুঝলাম। টেলিফোনে আমাকে চাইতে পারেন, কথা বলার সময় সাহসী হতে পারেননি। এতে আমি আমার মেয়ের কাছে অপ্রস্তুত হতে পারি, তা ভেবেছেন?'

'আমি খুব দুঃখিত। ক্ষমা চাইছি।'

'কিন্তু আপনি তো মিসেস মুখার্জী। একটা নাম নিশ্চয়ই আপনার আছে।'

একটু ভাবার সময় নিলেন মহিলা। তারপর বললেন, 'পারমিতা।'

'নাঃ, এ নামের কাউকে চিনি না।'

'আমি তো আগেই বলেছি আপনি চিনতে পারবেন না।'

'তাহলে ফোন করছেন কেন?'

'অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল। আজ হঠাৎই আপনার টেলিফোন নম্বর পেয়ে গেলাম।'

'ইচ্ছে হত কেন?'

'সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'নম্বরটা পেলেন কি করে?'

'আমার ছেলের ডায়েরির পাতায়।'

'সেকি? আপনার ছেলের ডায়েরির পাতায় আমার নম্বরটা কি করে লেখা হবে?'

'ও প্রেসিডেন্সিতে পড়ে।'

‘তাই বলুন! কি নাম ওর?’

‘এখনই বলতে চাই না।’

‘কারণ?’

‘তাহলে আপনি আমার অস্তিত্ব জেনে যাবেন।’

‘সে কি আমার মেয়ের পরিচিত?’

‘অবশ্যই। নইলে নম্বর পাবে কি করে?’ হাসলেন পারমিতা, ‘আপনার মেয়ের নাম আগেই শুনেছিলাম। তখন জানি না সে আপনার মেয়ে। আজ ছেলের ডায়েরিতে ওর ঠিকানার পাশে আপনার নাম দেখলাম। এরকম নাম দ্বিতীয় কোন মানুষের আছে বলে শুনিনি। তাই টেলিফোন করেছিলাম। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারিনি।’

‘নিশ্চিত হলেন কি করে?’

‘সত্যি কথা বলতে কি আমি এখনও নিশ্চিত নই। আপনি কি কখনও সুকিয়া স্ট্রীটে থাকতেন? তারপর হিন্দু হোস্টেলে গিয়েছিলেন?’ আগ্রহ অস্পষ্ট রইল না।

এবার বিস্ময় সীমা ছাড়াল। আমি আবার নীলার ঘরের দরজায় চোখ রাখলাম। মনে হচ্ছিল এত রাতে আমি একটা অনায়াস করছি। পারমিতা বললেন, ‘হ্যালো! শুনতে পাচ্ছেন।’

‘আপনার অনুমান ঠিক। কিন্তু আপনার পরিচয় না জানলে আমি আর এত রাতে কথা বলতে রাজী নই। তাছাড়া আপনার প্রয়োজনটাও যে কি তা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, নমস্কার।’ রিসিভারটা একটু অভদ্র ভাবেই নামিয়ে রাখলাম।

নিজের ঘরে ফিরে এসেও কূল পাচ্ছিলাম না। কে এই মহিলা। আমি সুকিয়া স্ট্রীটে যখন থাকতাম তখন কুলে পড়ি। সেই সময়কার কথা যখন জানেন, না, তবু কোন মুখ মনে আসছে না। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, ভদ্রমহিলা আবার আমাকে ফোন করবেন। এই নিস্তর্র রাতে সেটা ঝনঝন করে বাজবে। কিন্তু না, সময় বয়ে গেল, টেলিফোন নিঃশব্দ থাকল।

সকালটা আমাদের খুব ব্যস্ততায় কাটে। বাজার করা আমার শখ। সেটা সেরে এসে দশ মিনিট আমি আর নীলা চা খাই। তারপর তৈরি হই অফিসে যেতে। খেয়ে-দেয়ে বেরুবার সময় ভীষণ তাড়া থাকে। নীলার কলেজও এই সময়। একসঙ্গে বেরুতে যাওয়ার আগে নীলা আমার বুকের সামনে দাঁড়িয়ে আদর করে দেয়। এ সবকিছু ঘড়ির মত চলে।

আজ চা খেতে খেতে নীলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আচ্ছা, তোমার ফোন নম্বর কলেজের কত ছেলেমেয়ে জানে?’

চোখ হোট করল নীলা, ‘হঠাৎ?’

‘প্রশ্ন করো না, উত্তরটা দাও!’ আমি সামান্য গভীর হলাম।

‘তুমি আমার সঙ্গে এই গল্যায় কথা বলছ কেন?’

‘আমি স্বাভাবিক গল্যায় প্রশ্ন করছি।’

‘মোটাই না। তোমাকে খুব রাগী দেখাচ্ছে।’

এইরকম অবস্থায় আমার পক্ষে আর গভীর হয়ে থাকা সম্ভব হয় না। আমি আমার বাবাকে ওই বয়সে পালটা প্রশ্ন করতে পারতাম না। ওঁরা আমাদের সঙ্গে দূরত্ব রেখেছিলেন, আমরা এদের সঙ্গে রাখিনি। অতএব ওঁদের ভূমিকায় যখন নিজের অভ্যন্তরেই চলে যাই তখন ধাক্কা খেতেই হয়।

বললাম, ‘ঠিক আছে। তোমার ফোন নম্বর কলেজের কাউকে দিয়েছ?’

‘হ্যাঁ। তাতে কি হয়েছে?’

‘কাদের কাদের দিয়েছ?’

‘আমার বন্ধুদের।’ বেশ অবাক হল নীলা, ‘তাদের তুমি চেনো।’

‘আমার নাম ঠিকানাও কি দিয়েছ?’

‘তুমি একটু পরিষ্কার করে বল নইলে আমি বুঝতে পারছি না।’

‘বেশ! তোমার কলেজের একটি ছেলের ডায়েরিতে আমার নাম ঠিকানা এবং ফোন নম্বর লেখা আছে। ছেলেটির নাম আমি জানি না কিন্তু জানতে চাইছি।’

‘সে কি আমার ক্লাসে পড়ে?’

‘তাও জানা নেই।’

‘তার ডায়েরিতে যে লেখা আছে এই খবরটা তুমি পেলো কি করে?’

‘যিনি দেখেছেন তিনি নাম বলতে চাইছেন না।’

‘আশ্চর্য! তুমি তার কাছেই জানতে চাও। আমি কি করে খুঁজে বের করব! তাহলে তো জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে হয়।’

‘তাই করো।’

‘আমি বুঝতে পারছি না বাবা, ছেলেটির নাম জানা যদি তোমার খুব প্রয়োজন হয় তাহলে যিনি তোমাকে খবরটা দিয়েছেন তাঁর কাছেই জানতে চাওয়া স্বাভাবিক।’

‘সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।’

নীলা আমার মুখের দিকে অবাক চোখে তাকাল, ‘তুমি কি রকম হেঁয়ালি করছ!’

আমার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি ফুটছিল। সাধারণত আমি নীলাসংক্রান্ত কোন ব্যাপার ওর কাছে লুকিয়ে রাখি না। সব কথাই খোলামেলা আলোচনা করার অভ্যাস আমাদের আছে। গতরাত্রে নীলা আমার টেলিফোনে বলা কথাগুলো শুনেছে কিনা জানি না। আর যদি শোনে তাহলে নির্মাৎ অন্যরকম ধারণা করছে। এটা কিছুতেই হতে দেওয়া উচিত নয়। অতএব ওকে গতরাত্রের টেলিফোনের ব্যাপারটা বলে দিলাম। অবশ্য বলার সময় সুকিয়া স্ট্রীট এবং হিন্দু হোস্টেলের প্রসঙ্গটা উল্লেখ করলাম না।

নীলা সোজা হয়ে বসল, ‘ইন্টারেস্টিং! এই মহিলা কে?’

কাঁধ নাচলাম, ‘আমিই তো বুঝতে পারছি না।’

‘কথা শুনে মনে হচ্ছে তোমার পুরোনো কোন গার্লফ্রেন্ড।’

‘আমার সেরকম কেউ ছিল না তুমি জানো।’

‘কি করে জানব?’

‘হলে তোমাকে বলতাম। হলে তোমার মা আমার জীবনে আসতো না।’

‘দ্যাটস রাইট।’ নীলা চোখ বন্ধ করল, ‘যারা আমার ঠিকানা এবং তোমার নাম জানে তাদের মায়েরা কেউ এত স্মার্ট হবে না। ওয়েল, আমি ওদের জিজ্ঞাসা করব।’

‘টেলিফোনের ব্যাপারটা বলার দরকার নেই।’

‘ওঃ বাবা, আই অ্যাম নট দ্যাট কিড।’

আজ অফিসে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। লাঞ্চের সময় সেনসাহেব তাঁর মৃগমায় বেরিয়ে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিলেন, ‘যাই হে, একটু গায়ের ব্যথা মেরে আসি।’

সাড়ে তিনটে নাগাদ টেলিফোন এল। সেনসাহেব যে এলাকায় গিয়েছিলেন সেখানকার থানা থেকে একজন সাব ইন্সপেক্টর ফোন করলেন। তিনি জানতে চাইলেন সেনসাহেব আমাদের অফিসের একজিকিউটিভ কিনা। আমি কারণ জানতে চাইলে ভদ্রলোক বললেন, ‘ওঁকে আমরা আরেস্ট করেছি একটা ফ্ল্যাট থেকে। ওঁর সঙ্গে দুটি কলেজের ছাত্রী আছে। ওই ফ্ল্যাটে মধুচক্র চালানো হচ্ছিল।’

সেনসাহেবের সঙ্গে আমার তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না। খবরটা তখনই কর্তৃপক্ষকে জানানো দরকার ছিল। কিন্তু দুটো ব্যাপারে আমি আটকে গেলাম। সেনসাহেবের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে খবরটা শুনলে যে অবস্থায় পড়বে সেটা অনুমান করা যায়। ওদের কথা ভেবে খুব খারাপ লাগল। দ্বিতীয়ত, ওঁর সঙ্গে দুটি কলেজের মেয়ে ছিল। কোন্ কলেজের? আমার নীলাও তো কলেজে পড়ে। ওর বয়সী কোন মেয়ে সেনসাহেবের সঙ্গে এসব করতে যেতে পারে? ভাবতেই পারছিলাম না।

ঘটনার কথা কাউকে না বলে সাময়িক ছুটি নিয়ে সেই থানায় হাজির হলাম। অবাক কাণ্ড, ওখানকার ওসি আমার কলেজের সহপাঠী গৌরহরি। আমাকে দেখামাত্র হইহই করে উঠল। অনেককাল পরে দেখা। একটু ধাতস্থ হবার পর জিজ্ঞাসা করল, ‘ইঠাং থানায় কেন এসেছি। আমি তখন কারণটা বললাম।’

গৌরহরি বলল, 'লোকটা ঠিক ক্রিমিন্যাল নয়। নয় অবস্থায় ওদের ধরিনি আমরা। তবে ওই ফ্ল্যাটে যে এসব হচ্ছে খবর ছিল। আজ রেইড হবার সময় ওকে পেয়ে গেলাম। মনে হল মালদার লোক। তুই কি চাস আমি ওকে ছেড়ে দিই।'

'তার আগে আমি একটু কথা বলব।'

গৌরহরির নির্দেশে একজন সেনাই সেনসাহেবকে নিয়ে এল। লক আপ থেকে বেরিয়ে ওসির ঘরে আমাকে বসে থাকতে দেখে খুব অবাক। হেসে বললেন, 'আজ বোন্ড হয়ে গেলাম হে। লেংটি এবার ইদুরকলে।'

'এখন কি হবে আপনার তা জানেন?'

'জানি।'

'খারাপ লাগছে না?'

'ইচ্ছে করই আওনে হাত ঢুকিয়েছি যখন তখন পোড়ার জ্বালা জানি।'

'আপনার ছেলেমেয়ে স্ত্রীর জন্যে একটুও কষ্ট হচ্ছে না?'

'হলেও এখন কিছু করবার নেই। শুধু খারাপ লাগছে অন্য ব্যাপারে।'

'কি ব্যাপার?'

'ওই মেয়ে দুটো, বুঝলে, সন্তি সন্তি কলেজের ছাত্রী। ওদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।'

'কলেজের ছাত্রী?'

'হ্যাঁ।' সেনসাহেব চলে হাত বোলালেন, 'দুজনেই আজ প্রথমবার টাকা রোজগারের খান্দাম ওখানে গিয়েছিল। একজন পুরোনো পাগী ওদের এসকর্ট করেছিল।'

'কলেজের মেয়ে হয়ে এসব করতে লজ্জা করেনি?'

'নিশ্চয়ই করেছিল। এখন তো আত্মহত্যার কথাও ভাবছে। কিন্তু তখন অভাবের হাঁ এত বড় ছিল যে লোভ সামলাতে পারিনি হে।'

গৌরহরি সব শুনছিল। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার লজ্জা করে না, মেয়ের বয়সীদের সঙ্গে সময় কাটাতে গিয়েছিলেন। আপনার ওয়ান-থার্ড বয়স!'

'স্ত্রীর বয়সী হলে আপত্তি করতেন না মনে হচ্ছে। আসলে বয়েসটা কোন ফ্যাক্টর নয়। প্রয়োজন হল সামর্থ্য। পুরুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের পরিশুরক ততদিন যতদিন তাদের সামর্থ্য আছে। যদিও আজ আপনারা যে সময় গিয়ে পড়েছিলেন সে সময় সদ্য আমি ওদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলাম।'

আমার অনুরোধে মেয়েগুলোকে আনা হল। দুটি মেয়ে। একেবারে নীলার বয়সী। হাতে কলেজের খাতা আছে। শরীর এখনও ভরাট হয়নি। মেঝের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

গৌরহরিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এদের ছেড়ে দেওয়া যাবে?'

গৌরহরি হেসে কাঁধ নাচাল, যার অর্থ হল তুমি যা বল।

আমি ওদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন কলেজে পড়?'

দুজনেই চুপ করে রইল। গৌরহরি বলল, 'যফঃখলের কলেজ।'

'তোমাদের খুব অভাব?'

এবার একজন মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

'কে নিয়ে এসেছিল তোমাদের?'

'ললিভাদি।'

'তিনি কে?'

গৌরহরি ভাবাবটা দিল, 'মেয়ে দালাল।'

'এর আগে কখনও এমন করেছ?'

দুজনেই একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে না বলল।

'এই ভদ্রলোককে আগে কখনও দেখেছ?'

মেয়েদুটো মুখ তুলে সেনসাহেবকে দেখেই নামিয়ে নিল, 'না।'

'তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হলে আর কখনও অমন করবে?'

দুটি মেয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, 'কখনও না। আপনাদের পায়ে পড়ি। আর কখনও করব না। বাড়িতে জানতে পারলে মেরে ফেলবে। তাড়িয়ে দেবে।'

প্রথম শব্দ দুটো একসঙ্গে উচ্চারিত হলেও পরেরগুলো এক একজন আঙুলিছু বলছিল।

আমি গৌরহরিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করবে?'

গৌরহরি হাসল, 'তুমি জানো না অভাবের ত্যাগ্নায় ওরা আবার কোন ললিতাদিকে খুঁজে বের করবে কিনা। আর এটা যে হবে না, তা ওরাও এই মুহূর্তে বলতে পারবে না। তবে দেখে শুনে মনে হচ্ছে এখনও ফ্রেশ আছে, তাই জীবনে সুস্থ হয়ে বাস করার জন্যে আর একটা চাল দেওয়া দরকার। ঠিক আছে, তোমরা চলে যাও। আমরা কেউ তোমাদের ফলো করে বাড়ি দেখে আসছি না। কিন্তু ভবিষ্যতে যদি কোনদিন ওসব জায়গায় দেখি তাহলে ছেড়ে কথা বলব না।'

গৌরহরি সেনপাইটিকে বলল ওদের বইয়ের বের করে দিতে। সেনসাহেব বললেন, 'ধন্যবাদ।'

গৌরহরি তাকাল, 'আপনি ওঁর জন্যে বেঁচে গেলেন। আমরা জানি এই আইনে মেয়েদের শাস্তি দেওয়া যায় কিন্তু ছেলেদের বেরিয়ে যাওয়ার ফাঁক থাকে। আপনাকে আমি অন্য ধারায় জড়াতাম। যা হোক, ওখানে তো আপনাকে খরচ করতেই হত, হত না?'

সেনসাহেব তার উত্তরে পকেট থেকে পার্স বের করে তিনটে একশ টাকার নোট বের করলেন, 'এর বেশি আশ্রয় লাগত বলে মনে হয় না।'

'হাউস-ওয়াইফ হলে বেশি লাগত?'

'আপনার জো কিছুই অজানা নয়।'

বললাম, 'ব্যাপারটা বুঝলাম না।'

গৌরহরি জানাল, 'এইসব বাচ্চা মেয়েদের সঙ্গে খেলা তোমর জমে না বলে তিন শো দিলেই হয়ে যায়। অবশ্য ওর মধ্যে একশ থাকে ফ্ল্যাটের ভাড়া জন্যে। যোধপুর পার্ক, গড়িয়া, ব্রড স্ট্রীট এলাকার কিছু হাউস-ওয়াইফ আছেন যাঁরা পাকা খেলুড়ে। তাঁদের দক্ষিণা পাঁচশো পর্যন্ত, প্লাস ফ্ল্যাটভাড়া।'

'এসব বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়।'

'বাস্তব উপন্যাসের চেয়ে বিশ্বাসকর। দুপুরে আসেন, বিকেলের মধ্যে ফিরে যান। স্বামী দেবতাটি ঘুণাকরে টের পান না। ছেলেরা থাকলে বলে যান যোগ ক্লাসে যাচ্ছেন। সপ্তাহে এক দুদিন। অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর চেয়ে কম রোলগার নয়।' গৌরহরি সেনসাহেবের দিকে তাকালেন, 'ওই টাকাটা রেডক্রস ছাপ দেওয়া ব্যান্ডটায় ফেলে চলে যেতে পারেন।'

সেনসাহেব আদেশ পালন করে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে, অফিসে যাবে নাকি?'

গৌরহরি হাত নাড়ল, 'আপনি যান তো। আমাদের কিছু কথা আছে।'

সেনসাহেব অবলীলায় বেরিয়ে গেলেন। গৌরহরি বলল, 'লোকটার একটুও বিবেক দংশন হল বলে মনে হচ্ছে না। আমি মেয়ে দুটোকে ধমকাতে পারলাম কিন্তু একে পারলাম না।'

'কেন?'

'কারণ ওর পকেটে টাকা আছে। ভারতবর্ষে টাকা থাকলে সব কিছু কেনা যায়।'

'আমি না এলে কিভাবে সেটা সম্ভব হত?'

'কোর্ট থেকে বেরিয়ে যেত। অবশ্য কোর্টে যেতে হত না, অন্য কোন পুলিশ অফিসারই সুপারিশ করত। যে ফ্ল্যাট থেকে ওদের এনেছি সেখানে কোন মালিক নেই। মালিক থাকে ইংল্যান্ডে। দারোয়ানকে কড়া করে এক মন্তান ব্যবসা চালাতো। পুলিশ সেই মন্তানকে ধরতে পারেনি। দারোয়ানকে রেখে কি করব? কোন কেসই তো দেওয়া চলবে না। সেভেটি পার্সেটি কেসে এরকম ছায়ায় সঙ্গে লড়াই করতে হয়।'

'আমার এখন মনে হচ্ছে, না এলেই ভাল হত।'

'না এলে দেখা হত না।'

'কিন্তু সেনসাহেবরা—।'

বাধা দিল গৌরহরি, 'এটা ওর কাছে নেশার মতো। ড্রাগের নেশার মত, ছাড়ানো খুব মুশকিল। আজই দুটো কলেজের ছেলেমেয়েকে ধরেছি। হাসপাতালে পাঠাব, কেস হবে কিন্তু ফয়সালা হবে না। দেখবি?'

'কি করেছে ওরা?'

‘ড্রাগ নিচ্ছিল। রীতিমতো দামী জিনিস।’

‘মেয়ে?’ হঠাৎ শরীরটা কেমন করে উঠল।

‘ছেলেমেয়েতে কোন ফারাক নেই। এই দুজনের বেশ পুরোনো নেশা! নো ওয়ে টু রিটার্ন ব্যাক। মারা পড়বেই।’

‘কিস্ত কেন?’

গৌরহরি দুজনকে আনতে বলল। ছেলেটি বঁটে, মেয়েটি লম্বা। দুজনেই জিনিসের প্যান্ট আর ব্যাগী শার্ট পরেছে। দুজনের শরীরে মেদ বলে কিছু নেই, হাড়গোড় যেন দেখা যাচ্ছে। মেয়েটি যে এককালে সুন্দরী ছিল বোঝা যায়।

গৌরহরি জিজ্ঞাসা করল, ‘আমার এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে তোমরা যে যত্নশীল পাবে, তা জানো! কোনরকম কিছু নিতে পারবে না। কাল সকালের আগে তোমাদের আমি হাসপাতালেও পাঠাব না। কিন্তু যদি তোমরা আমাদের হেল্প করো তাহলে আমি সাহায্য করতে পারি। নাউ টেল মি, তোমাদের সোর্সটা কি?’

ছেলেটা এমন একটা আওয়াজ করল, যার মানে এসব কথা অনেক শুনেছে!

গৌরহরি বলল, ‘আমি তোমাদের মারব না, গায়ে হাত দেব না, জাস্ট লক আপে ফেলে রাখব। যেই তোমাদের নেশার সময় আসবে তখন মৃত্যুযন্ত্রণা কাকে বলে তোমরাই টের পাবে।’

এবার মেয়েটি বলল, ‘আমাদের কোন রেগুলার সোর্স নেই।’

‘মিথো কথা।’

‘বিশ্বাস করুন। কলেজের উলটোপিঠে একটা লোক মাঝে মাঝে বিক্রি করতে আসে, ফুচকাওয়ালার কাছেও পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে যিদিরপুর ব্রিজের নিচে যাই।’

ছেলেটি ধমকালো, ‘আঃ রীটা, স্টপ প্লিজ!’

গৌরহরি ধমকালো, ‘আই, চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেব। বাপ মা পরস্পর খরচ করে কলেজে পাঠিয়েছিল ড্রাগ খেয়ে আত্মহত্যা করতে, না?’

ছেলেটা মুখ ঘুরিয়ে নিল। বেশ বিদ্রোহী ভাব। মেয়েটি ওর কাঁধ ধরল। বোধহয় ঠাণ্ডা করতেই।

গৌরহরি বলল, ‘আমার লোক তোমাদের সঙ্গে সিভিল ড্রেন্সে যাবে, তোমরা যেখান থেকে কিনতে সেখান থেকেই আদ্য কিনবে।’

মেয়েটা বলল, ‘আজ টাকা নেই সঙ্গে।’

‘রোজ কেনো কি করে?’

‘ম্যানিজ করি।’

‘বাড়ির জিনিসপত্র বিক্রি কর? চুরি কর?’ ধমকে উঠল গৌরহরি, ‘ঠিক আছে, টাকা আমি দেব।’

ছেলেটা বলল, ‘কোঅপারেট করতে পারি একটা শর্তে।’

‘সেটা কি?’

‘কেনার পর আজকের কোটাটা নিতে দেবেন।’

‘ওঃ, হরিবল! তোমরা কি বুঝতে পারছ না এটা শ্রেফ আত্মহত্যা!’

‘উই লাইক দ্যাট।’

‘বাঃ, চমৎকার! ঠিক আছে তাই হবে। তোমাদের বাঁচানো শিবের অসাধ্য। কিন্তু সোর্সগুলোকে যদি পাই তাহলে কয়েকটা নতুন ছেলেমেয়ে বঁচে যেতে পারে।’

‘সোর্সগুলোকে তোমরা চিনতে পারো না?’ জিজ্ঞাসা করলাম।

‘বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই না। অচেনা লোককে ওরা বিক্রি করে না। এদের চেহারা দেখলেই ওরা বুঝতে পারে রেগুলার কাস্টমার। কিছু জিজ্ঞাসা করবে?’

গভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তোমরা ড্রাগ খেতে শুরু করলে কেন?’

‘বোকা-বোকা প্রশ্ন করবেন না তো!’ ছেলেটা বলল।

‘কোন কলেজে পড় তোমরা?’

‘আপনার কি কাজে লাগবে?’

‘তোমাদের কলেজের অন্য ছেলেমেয়েদের দেখেও ভালভাবে বাঁচতে ইচ্ছে হয় না?’

‘দূর!’ মাথা বাঁকান ছেলেটা, ‘আমাদের কলেজের ফর্টি পারসেন্ট ছেলেমেয়ে একটু-আধটু খায়। টেন পারসেন্ট প্রায়ই, আমরা দুচারজন রেগুলার।’

‘কিন্তু কেন?’

‘এমনি। ঘাট সড়ক বছর বেঁচে লাভ কি? কই, যাবেন না?’

মেয়েটির শরীরে একটা কাঁপুনি শুরু হল। গৌরহরি আমাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি এখন কি করবে? আমি যাই, দেখি কাউকে পাই কিনা। তোমাকে নিচ্ছি না। ওরা অরগানাইজড গ্রুপ, তোমায় চিনে ফেললে বিপাকে পড়তে পারো।’

অগত্যা আবার আসব কথা দিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এলাম। সেনসাহেব বা মেয়ে দুটিকে ইতিমধ্যে ভুলে গিয়েছি। এখন আমার মন-জুড়ে ভ্রাগ খাওয়া ছেলেমেয়ে দুটোর মুখ। এরা যে ছাত্র হিসেবে ভাল ছিল তা কথাবার্তাতেই বোঝা যায়। ছেলেটা কারণ বলতে চাইল না। কিন্তু কাগজে পড়েছি বাপ-মায়ের অবহেলা অথবা তাদের নিয়মবিরুদ্ধ জীবনযাপন, হতাশা, অন্যদের ইত্যাদির কারণে এইসব ছেলেমেয়ে ওই মরণনেশার শিকার হয়। আমি তো নীলার ক্ষেত্রে এর কোনটাই করিনি। এতএব ওর ভ্রাগ খাওয়ার কোন কারণ নেই। তবে ওর বয়সী ছেলেমেয়েরা যদি খেতে শুরু করে তাহলে কৌতূহলী হয়ে ও একদিন যোগ দিতে পারে। আর একের বদলে যদি একাধিক দিন হয়, তাহলে আর নীলাকে ফেরানো যাবে না। হঠাৎ একটা আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করল। ওই রোগা মেয়েটা তো নীলারই বয়সী। ওর বাবার মনের অবস্থা এখন কি রকম? শৈলেশদার কথা মনে পড়ল। খুব শৌখিন মানুষ। হঠাৎ আবিষ্কার করলেন ছেলে ভ্রাগ খাচ্ছে। মারধোর থেকে হসপিটাল কোনটাই বাদ গেল না। একটু ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে এসে আবার যে-কে সেই। প্রথমে বাড়ির জিনিসপত্র তারপর বউদির হার আংটি নিদেনপক্ষে শাড়ি বিক্রি করে দিয়ে টাকার ব্যবস্থা করত। বিশেষারা নাহলেহল শৈলেশদা একদিন দেখা হতে বলেছিলেন, ‘কোন থানায় জানাশোনা আছে ভাই। ছেলেটাকে ভো বাপ হয়ে বিষ খাওয়াতে পারি না। কিন্তু পুলিশ যদি ফন্স কেস দিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করে দেয় তবে তার জন্যে টাকা খরচ করতে রাজী আছি আমি।’

শৈলেশদার ছেলেকে দেখিনি আমি। কিন্তু সে কত ভাল। আর দেখামাত্র নীলার মুখ মনে পড়ছে। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়িতে ফিরে এলাম। নীলা এখনও ফেরেনি। যমুনাও কাজে আসেনি। এতক্ষণ নীলা কি করছে? ওর তো ক্লাস অনেক আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা? কলেজের মাঠের মধ্যে বসে কাগজ পাকিয়ে পাউডার টানতে পারে ওরা? কিছুই বিশ্বাস নেই। আমার অস্বস্তি হল। অনন্যার ছবির নামনে চলে এলাম। অনন্যা হাসছে। একশ পাত্তের মত সেই হাসি। বিয়ের পর একদিন শখ করে অনন্যাকে সিগারেটে টান দিতে বলেছিলাম। একটা টান দিয়েই কেশে হেঁচে সে কি বিচ্ছিরি অবস্থা। আর বছর খানেক আগে অনন্যার মেয়ে আমার জন্মদিনে স্টেট এম্ব্রপ্রেস উপহার দিয়ে বলেছিল, ‘আজ খাও।’

আমি ধরিয়েছিলাম। ভালই লাগল। সিগারেটে আমার নেশা নেই! হঠাৎ মজা করে বললাম, ‘তুই খেতে পারবি? ইচ্ছা হচ্ছে?’

‘নাও’ সে হাত বাড়াল। আমি আমারটাই এগিয়ে দিয়েছিলাম। সে কয়েকটা লম্বা টান দিয়ে ফিরিয়ে দিল। একবার কাশলও না। নাক দিয়েও সামান্য ধোঁয়া বের হয়েছিল। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘মাকেমাঝে খাস নাকি?’

সে মাথা নেড়ে না বলেছিল। এখন পর্যন্ত জানি আমার কাছে ও মিথ্যে বলবে না। আমারও তখন সেটাই বিশ্বাস হয়েছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওই টান দেওয়ার পেছনে কি কোন অভ্যাস কাজ করেনি?

কিছুক্ষণ অনন্যার ছবির নামনে বসে থাকার পর মন শান্ত হল। অনন্যার চোখ, হাসি আমাকে যেন আশ্বস্ত করল, নীলা কখনও অন্যায় করতে পারে না। আমারও মনে হল বেশি বাড়িবাড়ি ভাবছি। নীলাকে মিথ্যাবাদী ভাবার কোন কারণ নেই। আর ও যদি জানতে পারে তাহলে ওর কাছে আমি খুব ছোট হয়ে যাব। সিগারেটে টান দেওয়ার মধ্যে কোন কৃতিত্ব বা অনুশীলনের সাবলীলতা কাজ করছে এমন নাও হতে পারে। ওটা তাৎক্ষণিকভাবে হয়ে গিয়েছিল হয়তো।

বারান্দায় চেয়ার নিয়ে বসলাম। আকাশ আলো গুটিয়ে নিচ্ছে। এখনই ঝুপ করে রাত নেমে যাবে। নীলা সন্দের মধ্যে বাড়িতে ফিরবেই। ওটা ওকে কখনই বলতে হয়নি। অনন্যা ওকে ঠিক টেনে আনে। তাহলে

এখনও আসছে না কেন? এইসময় বেল বাজল। কিন্তু বেল টেপার ধরলে চেনা মানুষকে বোঝা যায়। এই বোতাম বমুন টিপেছে।

আমি খীর পারে ঘরগুলো পেরিয়ে দরজা খুলতেই নীলাকে দেখতে পেলাম, 'কী সারপ্রাইজ! তুমি এসে গেছ? কখন?'

আমি যমুনাকে দেখতে পেলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, 'যমুনা কোথায়?'

'সে তার বাড়িতে। তানার চাবি ঘুরিয়ে যখন বুঝতে পারলাম ভেতর থেকে লক্ করা তখন তোমাকে একটু অবাক করতেই যমুনার নকল করে বেল টিপলাম।'

'আচ্ছা! তা এত দেরি হল কেন?'

'সোমনাথদের বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'কে সোমনাথ?'

ও ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'আমার সঙ্গে পড়ে।'

'এত ছেলেদের বাড়িতে যাওয়ার দরকার কি?'

'ওঃ বাবা, তুমি খুব জেলাস!'

আমি উত্তর দিলাম না। সোমনাথ নামক সদা যুবক ছাত্রটিকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবার কোন কারণ নেই আমার।

নীলা ভেতরে চলে গিয়েছে। সঙ্গে হচ্ছে। এখন ও ওর করণীয় করবে। আমি আবার ব্যারান্দায় গিয়ে বসলাম। ভাগ খাওয়া মেয়েটা কি এতক্ষণ গৌরহরিকে সাহায্য করেছে? ওর মুখ খুব মনে পড়ছে। কিন্তু ওকে দেখে নীলার ভাবনা মাথায় আসার পর যে উদ্বেজনা বুকে বেড়ে উঠেছিল তা এখন নিবু-নিবু। আচ্ছা, তখন যদি নীলা বাড়িতে থাকত তাহলে আমি কি বলতে পারতাম, নীলা, তুমি কি ভাগ খাচ্ছ? অসম্ভব। কিন্তু এই সোমনাথ ছেলেটা কিরকম? ও ভাগ খেলেও খোতে পারে।

নীলা বাইরে এসে দাঁড়াতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের কলেজের সামনে কি লুকিয়ে হেরোইন-টেরোইন বিক্রি হয়? জানো কিছু?'

নীলা চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করল পালটা, 'তুমি কি করে জানলে?'

'শুনলাম ওরা কলেজগুলো টাগেট করে।'

'হ্যাঁ। আজই একজনকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল।'

'কখন?'

'দুপুরে।' নীলা বলল, 'আমাদের কলেজের কেউ কেউ খায়।'

দুপুরে শুনে একটু হালকা হলাম। এবার মনে হল গৌরহরির এলাকা সমস্ত কলকাতা জুড়ে নিশ্চয় নয়। অতএব ওই ছেলেমেয়ে দুটি নীলার কলেজের হতে পারে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'যারা খায় তাদের তুই চিনিস?'

'অনুমান করি। কেউ তো স্বীকার করে না।'

'তোদের প্রতিবাদ করা উচিত। ইউনিয়নকে বল ওদের বাঁচাতে।'

'কে বলবে? প্রমাণ কোথায়? আমরা ভাগবিরোধী সেমিনার করেছিলাম, তাতেও তো ওরা যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ওরা মাঝে মাঝে খায়।'

আমি নীলার দিকে তাকালাম, 'হ্যাঁরে, তুই খাবি না তো?'

নীলা হাঁ হয়ে আমার দিকে তাকাল। তারপর প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল। 'বাবা, তুমি কি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ? তোমার মুখে এসব কথা মানায় না।'

'মানে?'

'ইউ নো মি। ডোন্ট ইউ?'

'তা জানি!'

'তাহলে খামকা আবেল-তাবেল ভাবে যে বুড়োগুলো, তাদের মত কথা বলছ কেন?'

'চারধারে যা দেখছি তাতে খুব ভয় হয়।'

'কি দেখছ?'

এইসময় যমুনার বেল বাজল। দরজা খুলে দিয়ে এসে নীলা আমার সামনে চেয়ার টেনে বসল, 'চা বানাতে বলে এলাম। হ্যাঁ, কি বলছিলে?'

অগত্যা আজ দুপুরের ঘটনাগুলো ওকে বললাম। চূপচাপ শুনে গেল ও। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'এই সেনসাহেবের সঙ্গে তুমি কথা বল?'

'এক সঙ্গে কাজ করতে গেলে কথা বলতে হয়।'

'আর কথা বলবে না। এরাই মানুষের শত্রু।'

'চট করে কথাটা বলা ঠিক নয়।'

'কেন ঠিক নয়? আজ যদি পুলিশ রেইড না করত তাহলে মেয়েদুটোর কি অবস্থা হত? আর কোনদিন ওরা মাথা উচু করে পিঁড়িতে পারত?'

একথা আমার মাথাতেও আসেনি। বললাম, 'এতে মেয়েদেরও দোষ ছিল।'

'নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ওদের সেটা করতে বাধ্য করেছে।'

'রাষ্ট্রব্যবস্থা?'

'নিশ্চয়ই। ওদের ভালভাবে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা সরকার করেনি।'

'সরকারের পক্ষে এতটা করা সম্ভব?'

'তাহলে আইন করেছে কেন? তুমি খেতে না পেয়ে মরে যাও, কিন্তু চুরি ডাকাতি করে যদি থিদে মেটাও তাহলে জেলে যাবে। তোমাকে কেউ কাজ দেবে না, একটা পরিসাও সাহায্য করবে না কিন্তু আত্মহত্যা করতে চাইলে তোমার স্লেজ হবে। এ কেমন ব্যবস্থা?'

'সেনসাহেবের পক্ষে তো কিছু যুক্তি থাকতে পারে!'

'কোন যুক্তি থাকতে পারে না। ভুললোক বিবাহিত। সন্তান আছে। স্ত্রী আছে। তাঁর যদি এইসব বাসনা যুক্তিগ্রাহ্য হয়, তাহলে তোমার ক্ষেত্রে তো সাত খুন মাপ হবে। তুমি তো সিঙ্গল ম্যান, তুমি যাও না কেন?'

'কি যা তা বলছ? আমি হতভম্ব।'

'না, ব্যাপারটা সিরিয়াসলি দ্যাখো। আমরা অ্যাকাডেমিক আলোচনা করছি।' নীলা মাথা নাড়ল, 'না, ওই লোকটাকে ছেড়ে দিতে বলা খুব অন্যায় হয়েছে।'

'তাহলে মেয়েদুটোর কি অবস্থা হত?'

'কি হেরফের হত? যারা একবার ওখানে সৌঁছাতে পারে তারা যে আর যাবে না তাতে তুমি নিশ্চিত? যে কারণে গিয়েছিল সেই কারণটা কি দূর হয়েছে? পারবে তুমি ওদের বাঁচাতে? ওরা তো, আমরা যাকে মরণ ভাবছি, তার মধ্যেই বেঁচে থাকার পথ খুঁজে পেতে চায়। বরং একবার থানায় গিয়ে ওদের ভয় ভেঙে গেল।'

'আমি এতটা এগার্টিম ভাবতে রাজী নই।'

'তুমি জীবন থেকে এস্কেপ করতে চাইছ।'

'বড্ড বাজে বকছিস।'

'তর্কে হেরে গেলে বুড়োরা এমন বলে। তুমি কিন্তু এখনও বুড়ো হওনি।'

'ওফ্! তুই এত মাচিওরড্ হয়ে গেলি কবে?'

'আমি তো আর ছোট নই বাবা। তুমি আমাকে একটু একটু করে বড় করেছ।'

'হুম।' আমার ভাল লাগছে না। কিন্তু নীলার কথা আমি অস্বীকার করতে পারছিলাম না। নীলার এত জ্ঞানার কি দরকার ছিল? জীবনের এত জটিলতা? নারী-পুরুষের কাম ওর জ্ঞান? এত জ্ঞানল কি করে? নারী-পুরুষের সমসার ফলে সন্তানের জন্ম হয়। এই তথ্য ও স্কুলে থাকতে পড়েছে। আমি পড়িয়েছি। তবে সেই পড়ানোয় বিশদ ছিল না। কিন্তু ও সহজে বলতে পারল, সেনসাহেবের বদলে আমার পক্ষে বেশি যুক্তি ছিল ওইসব ফ্র্যাটে যাওয়ার! কি জানো মানুষ যায় তা ও জানে? হয়তো বই পড়ে জানে। দিনরাত তো বাংলা ইংরেজি বই হাতের কাছেই রেখেছে।

নীলা বলল, 'তুমি কথা দাও, সেনসাহেবের সঙ্গে কথা বলবে না?'

'আশ্চর্য! লোকটা যেতে কথা বলতে এলে বলব আপনার সঙ্গে কথা বলব না?'

'না। বলবে আপনার জীবনযাপন আমার অপছন্দ। তাই নিত্যন্ত বাধ্য না হলে আমাদের কথাবার্তা না বলাই ভাল।'

‘ঠিক আছে। তোর ইচ্ছে পূর্ণ হবে।’

‘আমার ইচ্ছে? তোমার কি ইচ্ছে হচ্ছে না? তোমার কি লোকটাকে খেঁচা করছে না?’

‘আমার ভাল লাগছিল না। খুব নোংরা মনে হচ্ছিল।’

‘তবে?’

‘ঠিক হ্যাঁ, বললাম তো।’

নীলার ঠোঁটে হাসি ফুটল। এই জেদ ও অনন্যার কাছে পেয়েছে। অনন্যাও তাই করত। যখন যুক্তি ওর পক্ষে থাকত তখন আমার কাছ থেকে কথা আদায় না করে শান্ত হত না। আমি প্রসন্ন ঘোরাতে চাইলাম, ‘হ্যাঁরে, সেই ছেলটাকে খুঁজে বের করতে পারলি? ওই যে যার ডায়েরিতে—।’

‘অসম্ভব। আমি দুতিনজন ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে বোকা বনেছি। সবাই এই নিয়ে হাসাহাসি করছে। নীলা উঠে এগিয়ে আসা যমুনার হাত থেকে চায়ের ট্রে নিল। আমার দিকে এগিয়ে দেওয়ার সময় বলল, ‘ওমা, তুমি এখনও অফিসের ডামাকাপড় ছাড়নি? কি ব্যাপার? মেন্টালি আপসেট?’

‘না, না। যাচ্ছি। চা খেয়ে নিই।’

যমুনা ভেতরে চলে গেলে আমরা দুজনে চুপচাপ চা খেলাম। কাপ রেখে নীলা হঠাৎ আমার পাশে এসে বসল। আমার চেয়ারের পাশে চেয়ার এনে দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কি হল?’

সে জবাব দিল না। আমার অনেকক্ষণ ওইভাবে বসে রইলাম। একসময় মুখ তুলে নীলা কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই টেলিফোন বাজল। কথা না বলে নীলা ছুটে গেল। তারপরেই গুনতে পেলাম সে চেষ্টা করে বলছে, ‘বাবা, আমার গলা পেয়ে লাইন কেটে দিল।’

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল কাবু হয়েছি। সারা শরীরে বেশ ব্যথা, জ্বর-জ্বর ভাব। ঠিক করলাম অফিসে যাব না। হঠাৎ ছুটি নেওয়া এমন দিনে সকালটা চমৎকার আলসিয়েতে কাটে। নীলাও চেয়েছিল ডুব মারতে। আমার শরীর খারাপ বলেই সম্ভবত একা থাকতে দিতে চাইছিল না। আমি ওকে জোর করে পাঠানাম। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ, আমি যখন নীরদ সি চৌধুরি পড়ে খুব বিরক্ত হচ্ছি অথচ পড়তে মজাও লাগছে ঠিক তখনই টেলিফোনটা বাজল। রিনিভার তুলতে ওপাশ থেকে স্পষ্ট প্রশ্ন এল, ‘আজ অফিস যাননি?’

‘না। কিন্তু এসময় আমি বাড়িতে আছি তাও আপনি জানেন?’

‘জানতাম না। হাতে কোন কাজ ছিল না। তাই নাম্বার ঘুরিয়েছিলাম।’

‘আপনার পরিচয় দিচ্ছেন না কেন?’

‘দেবার মত পরিচয় আমার নেই বলে।’

‘গত সন্ধ্যায় আপনি ফোন করেছিলেন?’

‘হ্যাঁ। আপনার মেয়ে ফোন ধরতে হঠাৎ লজ্জা করল।’

‘যাক। আপনি তাহলে লজ্জিতও হন!’

একটু চুপচাপ ওপাশে। তারপর জিজ্ঞাসা, ‘অফিসে যাওয়া হয়নি, শরীর খারাপ না তো?’

‘হ্যাঁ, ওই একটু।’

‘ওষুধ খেয়েছেন?’

‘ওষুধ খাওয়ার মত কিছু হয়নি।’

‘কেউ এসেছে বোধহয়। বেল দিচ্ছে। এখন রাগি কেমন?’ লাইনটা কেটে গেল। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। তাহলে নীলার সহপাঠীর বাড়িতে ফোন এবং কলিং বেল আছে। একটা সূত্র পাওয়া গেল। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না ভদ্রমহিলা কি চান? তবে ওঁর কথা বলার ভঙ্গী এবং গলার স্বর খুব ভাল। আমার ওই বেখাপ্পা মন্তব্যটা এড়িয়ে যাওয়াটা তো ভদ্রতারই লক্ষণ। আমি অনন্যার ছবির নামনে গিয়ে দাঁড়ানাম। অনন্যা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে।

চমৎকার আছ তুমি! বেশ মজা দেখছ!

আমার খুব রাগ হল। কিন্তু তারপরই মনে পড়ল আমি কখনও অনন্যার ওপর রাগ করিনি। আজ কেন করছি। আমি ওর ঠোটে আঙুল রাখলাম, অনন্যার ঠোটে উত্তাপ ছিল।

লোকে যাকে প্রেম করা বলে আমি আর অনন্যা তা করিনি।

ভালবাসাবাসির যেসমস্ত ফর্মুলা বাংলা ছবি উপন্যাসে দেখি তাও হয়নি আমাদের। দেখা হত কলেজের। বাইরে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই যে আমার মেয়ে সারাদিন ধরে টোটো করে ঘুরে বেড়ায়, অনন্যা তার একভাগও স্বাধীনতা পায়নি। আমরা আপনি থেকে তুমিতে নামতে পারলে ধন্য হয়ে যেতাম। আর আমার মেয়েরা তুই থেকে তুমিতে উঠতে চায়। কিন্তু কলেজেরই দেখা, চিঠির পর চিঠি লেখা—আমরা চিঠিতেই সবকথা বলে ফেলতাম। অনন্যা সেইসব চিঠি পড়ে ছিঁড়ে ফেলত। আমি দানতাম। ফাইনাল পরীক্ষার আগে অনন্যা লিখল, 'এবার আমাদের বিয়ে করা উচিত, নইলে আমার বাড়িকে আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারব না। কিন্তু ভাবছি বিয়ে করলে আমাদের চলবে কি করে? তুমি বা আমি কেউ তো রোজগার করি না। অথচ পরীক্ষার এক মাসের মধ্যে বিয়ে না হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। বাড়িতে সেই সময়ের পরে তার একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে। মন দিয়ে পরীক্ষা নাও। মুশকিল হল, বিয়ের পর তোমার সঙ্গে গাছতলাতেও থাকতে পারব না। কি যে করি!'

পরীক্ষার পরেই আমি চাকরির খোঁজে লেগে গেলাম। কিন্তু কে দেবে আমাকে চাকরি? সে এক নিদারুণ অবস্থা। অনন্যার দেখা পাচ্ছি না। পরীক্ষার পর বাড়ি থেকে বের হওয়া নিষেধ হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে ডাকে তার চিঠি পাই। কিছু একটা করবার জন্যে তাগাদা ছাড়া আর কোন কথা নেই তাতে। শেষে মরীয়া হয়ে এক সন্ধ্যায় হাতির হলাম টালা পার্কের পাশের বাড়িতে।

দরজা খুললেন বিখ্যাত সাংবাদিক মিস্টার রায়। ওঁর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছিল উনি পান করে আছেন। আমাকে চিনতে অসুবিধে হল প্রথমটা। তারপর চেনামাত্র কাঁধে হাত রেখে ভেতরে টেনে নিয়ে গেলেন, 'আমি তোমাকে টু গুড বয় বলতাম কিন্তু তুমি কি হে? ব্যাকবোনলেন?'

'মানে?' আমি হতভম্ব।

'গুনলাম তুমি আমার স্ত্রীর হয়ে দালালি করছ?'

'ভুল কথা শুনেছেন। উনি আমার কাছে যেতেন। আমি গুনতাম, এইটুকু।'

'বাস?'

'হ্যাঁ।'

'তা এখানে কি মনে করে? মিসেস রায় আপাতত পিত্রালয়ে।'

আমি সোজা হয়ে দাঁড়লাম। তারপর বললাম, 'আমরা বিয়ে করতে চাই।'

অনন্যার পিসেমশাই বললেন, 'এই আমরা কারা?'

'আমি আর অনন্যা।'

উনি চোখ বড় করে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও। আমাকে আর একটা ড্রিং নিতে হবে। তুমি? ওহো, তুমি তো খাও না।' ভেতরে গিয়ে সুদৃশ্য একটি গ্লাসে শুধু বরফের ওপর মদিরা ঢেলে ফিরে এলেন মিস্টার রায়। আমাকে ইস্তিতে সোফায় বসতে বলে বললেন, 'তার মানে অনুর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ নিবিড়?'

'হ্যাঁ। আমাদের এছাড়া উপায় নেই। আপনাদের সাহায্য চাই।'

'মাই গড! তুমি তো ডেপ্লারাস। আমি টু গুড ভাবতাম। আমার গিরিটিকে একদম নির্বোধ বানিয়ে ছেড়েছ দেখছি। ওয়েল, তুমি আমার সাহায্য চাও?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ সেই বরফ-মদে চুমুক দিলেন ভদ্রলোক। তারপর হাসলেন, 'বিরিট কামেলা হবে। সমস্ত কৌরববাহিনী আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তোমার পিসিমাও আমাকে সাপোর্ট করবে না। স্টিল আমি এটা করব। কেন করব জানো?'

আমি মাথা নেড়ে না বলেছিলাম।

'আই ওয়ান্ট টু টিচ দেম। আমার বাবাকে দেখে ওঁরা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন আমার সঙ্গে। কিন্তু কোনদিন জামাই হিসেবে আমাকে মানতে পারেননি। আমার কোন ছেলেমেয়ে হয়নি। তোমার পিসিমা তাঁর বাপের বাড়ির সঙ্গে আঁতাত রেখে গেছেন, বাধা দিইনি। কিন্তু আমাকে ওঁরা কখনই নেমস্তন্ন

পর্যন্ত করেননি। কিন্তু—'মুখ তুললেন ভদ্রলোক। 'কিন্তু বিয়ে করে তুমি অনেকে খাওয়াবে কি? চাকরি পেয়েছ?'

'না। কিন্তু শুনেছি ওর বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'হিয়েন। তোমার পিসিমাই উদ্যোগ নিয়েছেন। এক কনজারভেটিভ পরিবারের গাবলু ছেলে হল পাত্র। ওয়েল, তুমি কাল চলে এস আমার অফিসে। ঠিক চারটের সময়। একটা অ্যাপ্রিকেশন লিখে আনবে সাবএডিটরের পোস্টের জন্য। ইংরেজি ভুল হবে?'

'না।'

'ওড। ভাল ইংরেজি হলে তোমার চাকরির জন্যে আমি চেষ্টা করব। নাউ, শুডনাইট।'

চাকরিটা হয়েছিল। মিস্টার রায় নিজে ব্যবস্থা করে দিলেন আমাদের আইনসম্মত বিয়ের। সাফী হিসেবে সই করেছিলেন। অনন্যার পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, 'গো অ্যাহেড।'

কয়েকদিন বড় বয়ে গিয়েছিল। ওর বাড়ির লোকজন খেপে গিয়েছিলেন। পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল ব্যাপারটা। পিসিমা এসে আমাকে বাপান্ত করে গিয়েছেন। মিস্টার রায়ের ভূমিকা জানাজানি হয়ে যাওয়াতে ওঁর অবস্থাও অনুভব করতে পেরেছি। মাইনে পাওয়ার পর সিঁথিতে বাড়িভাড়া নিয়েছিলাম। আর একদিন সমস্ত বাধা সরিয়ে অনন্যা চলে এসেছিল আমার কাছে। আমরা সংসার শুরু করলাম।

জীবন মানে আনন্দ, জীবন মানে প্রতি মুহূর্তের উৎসব, আমি আর অনন্যা সেই আবিষ্কারের আবেগে টালমাটাল। আমাদের মাথার ওপর ছাদ রয়েছে। চার দেওয়ালের মধ্যে দরজা বন্ধ করে বসে আমরা পৃথিবী ভুলে থাকতে পারি অনায়াসে। আহা, কি আনন্দের সময় ছিল তখন। যে মেয়ে রক্ষণশীলতার বলি হয়েছিল, যার হাতেপায়ে দেওয়া ছিল নিষেধের বেড়ি সে মুক্ত হওয়ামাত্র অমন নিকটতায় ভরিয়ে দিতে পারে তা কে জানত!

মিস্টার রায়ের সঙ্গে অফিসে আমার দেখা হত। জিজ্ঞাসা করতেন, 'জীবন কেমন চলছে?'

বলতাম, 'ভাল।'

'দ্যাটস ওড। আমৃত্যু ভাল রেখো।'

ওঁর বাড়িতে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। পিসিমাই সেটা করেছিলেন। অনন্যার বাপের বাড়িতে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাঁদের যে একটি মেয়ে ছিল এই সভ্য আত্ম তারা অস্বীকার করেছেন। আমার বাবা-মা ওই বিয়েকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা অবশ্যই অনন্যার বাড়ির লোকের সঙ্গে একমত নন কিন্তু হঠাৎ একটা অজানা মেয়েকে বাড়ির বউ হিসেবে গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা। আমরা কাউকে দোষ দিইনি। কারণও বিরুদ্ধে অভিযোগ করিনি। কারণ ওইসময় পৃথিবীর তৃতীয় কোন ব্যক্তির উপস্থিতি আমাদের প্রয়োজন ছিল না।

এই সময় মিস্টার রায় মারা গেলেন। অফিসে গিয়েই খবরটা শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম টালা পার্কের বাড়িতে। খবরের কাগজের অনেক মানুষ এসেছিলেন। গতরাত্রে অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণেই মাথায় যন্ত্রণা হয়েছিল। সেই অবস্থায় বস্ত্রগানিরোধক ট্যাবলেট খেয়েছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই যা হবার তা হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বারের দেখায় একটা মানুষ আমার জন্যে যা করেছেন, যার ফলে আজ আমার সমস্ত অস্তিত্ব বর্তমান, তাঁর কাছে শুধু ঋণী বললে কিছুই বলা হয় না। শাপানে গিয়েছিলাম। ওঁর স্ত্রী মুখাণি করতে ডেকেছিলেন ভাই-এর ছেলেকে। আমি দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কেউ আমার সঙ্গে কথা বলেনি।

মৃত্যুসংবাদে অনন্যা কষ্ট পেয়েছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল ধাক্কাটা আমিই বেশি পেয়েছিলাম। ঠিক কোন পরিবেশে মিস্টার রায় আমাকে মদত দিয়েছিলেন তা আমিই জানি। ও জানতো ওর পিসেমশাই বিয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, মৃত্যুটা সেই পিসেমশাই-এর। আমার কাছে একটি রোমান্টিক হৃদয়ের মরণ বলে মনে হয়েছিল।

এরই মাঝে আমি ব্যাঙ্কে চাকরির পরীক্ষায় বসেছিলাম। পেয়েও গেলাম। অফিসারদের মাইনে খারাপ নয়। আমরা বাড়ি বদলালাম। এই সময় অনন্যার শরীরে নীলা এল। খবরটা ও আমাকে দিয়ে দিল এইভাবে,—

'জানো, একটা ঘটনা হয়েছে।'

'কি হল?'

'আমি ধারণ করেছি।'

‘ধারণা? কি?’

‘নীলা।’

‘সে কি? এসব তুমি বিশ্বাস করো?’

‘ফল দেখব তারপর বিশ্বাস’, ও হাসতে লাগল, ‘শুনেছি কার ভাগ্যে খারাপ হয় কার বরাত চড়বড় করে খুলে দেয়। আমার কোন্টে হবে কে জানে।’ ও মিটিমিটি হেসেছিল।

ওর হাতে কোন আংটি নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল সব কিছু খুলে রেখে। তাই অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিলাম, ‘তোমার নীলা কোথায়?’

ও চোখ বন্ধ করে, মুখ তুলে, লজ্জিত গলায় বলেছিল, ‘আমার পেটে।’

আনন্দ এবং ভয়—কী না তখন হয়েছিল। একটু একটু করে সময়টা এগিয়ে আসছিল। ডাক্তার যেমন বলছিলেন তেমন করছিলাম আমি। দ্বিতীয় কোন মহিলা ছিল না, যার সাহায্য পেতে পারতাম। অনন্যা নিজের শরীরে ভাবী সন্তানের স্পন্দন টের পাচ্ছিল। কি সুখী দেখাত তখন ওকে। বলেছিল, ‘নাম রাখব নীল বা নীলা।’ আমরা আগামীদিনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এমন কি ছোট্ট একটা দোলনা পর্যন্ত। ডাক্তারের দেওয়া তারিখ পেরিয়ে গেল অথচ প্রাকৃতিক যন্ত্রণা শুরু হল না। তিনি পরের দিন ওকে নার্সিংহোমে ভর্তি করতে বললেন। সেই রাতে আমার পাশে শুয়ে একফোঁটা ঘুমোয়নি অনন্যা। অথচ ওই অবস্থায় রাত জাগা উচিত নয়। আমার অনুরোধ শোনেনি সে। বলেছিল, ‘আজ শুধু তোমাকে দেখব। খুব ভালবাসো তুমি আমায়, না।’

গলার স্বরে যে সুর ছিল তা আমার ভাল লাগেনি। ওর শুভেও অবস্থি হচ্ছিল। আমি ওকে আরাম দেবার চেষ্টা করেছিলাম। হঠাৎ জানতে চাইল, ‘ধন আমি আর নার্সিংহোম থেকে ফিরলাম না। তুমি তারপরে আমাকে আর কতদিন ভালবাসবে?’

‘আমার নিঃশ্বাস যতদিন থাকবে।’

‘ইস! বানানো কথা। আবার একটা বিয়ে করবে না?’

‘এ সব কথা বলো না।’

ও আর বশেনি। আমাকে আঁকড়ে ধরে চূপচাপ রাতটা কাটিয়ে দিয়েছিল। পরদিন বেরুবার সময় বলল, ‘যাঃ, আর হল না।’

আমি অবাক হলাম, ‘কি হল না?’

ও হাসল, ‘তোমাকে তো কখনও প্রণাম করিনি, ভাবলাম বেরুবার আগে করব। কিন্তু আমি তো নিচু হতে পারছি না।’ আমি হেসে উঠেছিলাম।

ডাক্তার বললেন, তিনি অপারেশন করবেন। সিজার আজকাল আকছার হচ্ছে। বিদেশে যন্ত্রণা এড়ানোর জন্যে অনেক মা এটাকেই পছন্দ করেন। আমার দু’তিনজন বন্ধু ছাড়া কাউকে জানাবার কিছু নেই। অনন্যার নিষেধ ছিল তার খবর যেন বাপের বাড়িতে না দেওয়া হয়। অপারেশন হল। ডাক্তার জানালেন মেয়ে হয়েছে। ভাল ওচ্চনের মেয়ে।

কিন্তু তারপরেই সেই সমস্যাটা প্রকট হল যা আমার জীবন একমুহূর্তেই তছনছ করে দিয়ে গেল। অনন্যার শরীর থেকে ক্রমাগত রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে। কোন ওষুধ বা ইন্জেকশনেও তা বন্ধ হচ্ছে না। ডাক্তারের নির্দেশে ওর গ্রুপের রক্ত নিয়ে এলাম। কিন্তু যা বেরুচ্ছে তার পরিমাণ অনেক বেশি। মনে পড়ল একদিন তরকারি কাটার সময় ওর আঙুল কেটে গিয়েছিল। ওষুধ ব্যান্ডেজ সত্ত্বেও রক্ত বন্ধ করা যায়নি সামান্য ক্ষত থেকে। পুরো একটা দিন সময় লেগেছিল। ঘটনাটা মনে ছিল না আমাদের।

নীলাকে পৃথিবীতে এনে দিয়ে অনন্যা চলে গেল। আমি জানি না কেউ কখনও নিজের ঠোটে আগুন ছুঁয়েছে কিনা। ছলশুত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে হেঁটে আসার অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা বেঁচে আছেন কিনা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি বেঁচে রইলাম।

চারদিনের নীলাকে নিয়ে যখন বাড়িতে ফিরলাম তখন ওর চোখ খোলেনি। আমাদের যে কাজের মেয়েটি খুব ফাঁকি দিত, অনন্যা যাকে প্রায় প্রতিদিন বকত সে আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

নবজাতিককে কি করে বাঁচাতে হয় সেই শিক্ষা আমার থাকার কথা নয়। বন্ধুদের কেউ কেউ দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন কিছুদিনের জন্যে। আমি রাজী হইনি। তিনমাস ছুটি নিলাম। ডাক্তার মেয়ে ছাড়া কিছুই জানতাম না তখন। দিনরাতের আয়া রাখার আর্থিক সামর্থ্য ছিল না তখন। মায়ের বুকের দুধ পেল না

যে মেয়ে তাকে বিকল্প খাইয়ে, প্রতি মুহূর্তে সজাগ পাহারা দিয়ে হাত-পা ছোঁড়ার অবস্থায় নিয়ে এলাম। ওর শরীর থেকে যা বেরুতো তা পরিষ্কার করতে একটুও অবসতি হত না। প্রতিটি ভাঁজ, প্রতিটি ভঙ্গি আমার এমন পরিচিত হয়ে গেল যে সেগুলোর সামান্য পরিবর্তনও বুঝতে অসুবিধে হত না।

সমস্যায় পড়তাম ও অসুস্থ হলে। পেটের ব্যথায় কান্না আর অন্য কারণে চিংকার আলাদা করতে পারতাম না। অসুস্থ হলে আমার ঘুম চলে যেত।

আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ওই ছোট্ট শরীরটাকে পৃথিবীর সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচাব। একসময় উপড় হতে শিখল। আর চিনলো আমার গলা। আওয়াজ পেলোই মাথা ঘুরিয়ে যুঁজত। গলায় স্বর এল। আর প্রথম যেদিন সেটা স্পষ্ট হল নেদিন আমি চমৎকৃত। ও আমাকে মা বলে ডাকল। একবারই। কিন্তু আমার ভুল হয়নি। শব্দটা অবশ্যই মা ছিল। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে কঁদে উঠতেই ও চিংকার করেছিল। ওইটুকুনি মেয়ে বোধহয় কান্না সহ্য করতে পারেনি।

শেষ পর্যন্ত চাকরিটা রাখতেই আমাকে বেরুতে হল। দুপুরে ওর পাশে থাকার জন্যে একটি বন্ধাকে মাইনে দিয়ে রাখলাম। বেরুবার আগে পইপই করে বুঝিয়ে দিতাম কোন্ সময়ে কি করতে হবে। তবু মন মানত না। ছুটি ম্যানেজ করতে পারলেই ছুটে আসতাম। কোন অমনোযোগ দেখলে খেপে যেতাম খুব। পৃথিবীতে বাড়ি এবং অফিস ছাড়া তৃতীয় কোন আকর্ষণ আমার রইল না।

তখন প্রতিটি দিনেই ছিল কিছু না কিছু আবিষ্কারের চমক। মেয়ে দাঁড়াল, মেয়ে পা ফেলল। মেয়েকে হাম খেলে সে পালটা হাম দিল। আমার সমস্ত অস্তিত্বে যেমন মেয়ে তেমনি তার জন্যে আমি। অফিসে যাওয়ার সময় সে কঁদতে শিখল। কত কামাই করব আমি? জামাকাপড় ছেড়ে যতক্ষণ না বনছি ততক্ষণ কান্না থামবে না। এই করতে করতে ওর স্কুলে যাওয়ার সময় হল।

আমাদের এলাকার সেরা স্কুলে প্রথমদিন পাঠিয়ে আমার দৃষ্টিচ্যুত শেষ ছিল না। নড়তে পারিনি স্কুলের গেট থেকে। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা ছিল ভেতর থেকে ডাক আসবে। আসেনি। শুধু তাই নয়, স্কুলে যাওয়ার কথা বললে মেয়ে কখনই না বলত না। প্রতিটি বিকেলে এসে স্কুলের গল্প। বন্ধুদের এবং সেই প্রসঙ্গে তাদের মায়াদের।

ওর মা ভগবানের কাছে চলে গিয়েছেন এই কথাই সত্যি বলে জানত ও। আমি কখনও জিজ্ঞাসা করিনি মায়ের অভাব বোধ করে কিনা। কারণ আমি সেটা হতে দিতে চাইনি। বাবা এবং মা, কোন্ ভূমিকায় আমি বেশি সার্থক ছিলাম ও নিয়ে আমারই সংশয় আছে। কিন্তু দুটো জিনিস ওর অভ্যাসে এসে গেল। এক, নিভ্য আমাকে হাম খাওয়া। সেই মুহূর্তে ও আদুরে গলায় কয়েকটি শব্দ বলত যা আমাদের নিজস্ব। দ্বিতীয়ত, সব কথা খুলে বলা। আমাদের মধ্যে গোপনীয় কিছু ছিল না। আমরা দুজনেই জেনে গিয়েছিলাম, জীবনে যা ঘটবে তা দুজন দুজনকে বলবেই।

একটা ব্যাপারে আমি কিছুটা গোলামালে পড়তাম। নীলার চুল আঁচড়াতে গেলে ওর কিছুতেই তা পছন্দ হত না। বড় চুল আমার ভাল লাগলেও সেই কারণেই পার্লার থেকে এমনভাবে হাঁটিয়ে আনতাম যাতে বিপদে না পড়তে হয়। বাচ্চাদের মুখে গলায় পাউডার বোলাতে হয় জানতাম। কিন্তু ক্লাস টু-তে ওঠার পর থেকেই নীলা আপত্তি করত। মাঝে মাঝে সেন্ট ব্যবহার করলেও প্রসাধনের দিকে ওর একটুও ঝোঁক ছিল না। এমন কি মুখেও সামান্য পাউডারের প্রলেপ দিত না।

আমি ওকে পড়াতাম। দেখতাম পড়তে ও খুব ভালবাসে। ওর বয়েসে যা আমি এড়িয়ে চলাতে পারলে খুশী হতাম তাতেই ওর আগ্রহ বেশি। ফলে সকাল এবং সন্ধ্যাটুকু আমাদের চমৎকার কাটত। প্রথম হওয়াটা স্বাভাবিক ঘটনা ছিল ওর কাছে কিন্তু নম্বর নব্বুই-এর নিচে চলে এলে ওকে শান্ত করতে প্রচুর সময় লাগত আমার।

গল্পের বই পড়া ওর নেশা ছিল। সুকুমার রায় দক্ষিণারঞ্জন ছেড়ে দুম করে রবীন্দ্রনাথ চলে এল। রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা বড়দের পড়া উচিত তা বলে দিতে পারতাম কিন্তু কেন ছোটদের পড়া উচিত নয় সেই ব্যাখ্যা অসম্ভব ছিল। যদি বলতাম পড়লে বুঝতে পারবে না তবে বলত, 'কেন, পারছি তো!' আবার এর পাশাপাশি হার্ডি বয়েস সিরিজ পেলো নড়তে চাইত না। অথচ আমি যদি 'আম আঁটির ডেপু' পড়তে দিলাম ওখন কয়েক পাতা উলটে রেখে দিল। খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। পথের পাঁচালি আমার প্রিয় বই। মেয়েটা তাতে রস পাচ্ছে না? জোর করে পড়াতে চেয়েও পারলাম না। ওই বই পড়ল মেয়ে ক্লাস এইটে উঠে। পড়ে কঁদল। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা।

তারপর সেই ঘটনাটা ঘটল। সকালে উঠে বাথরুমে গিয়ে দশ বছরের মেয়েটা চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আমি ছুটে গেলাম। দরজা বন্ধ ছিল। চিৎকার করে ডাকলাম। ও দরজা খুলে ছিটকে চলে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, 'বাবা, আমার কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে মানে?'

'আমার কেটে গিয়েছে। পা গড়িয়ে রক্ত পড়ছে।'

চমকে সোজা হলাম। তাড়াতাড়ি ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। ওই মুহূর্তে আমার মাথা কাজ করছিল না। আর তখনই অনন্যাকে আর একবার—। আমি সত্যি ওর মা হয়ে গেলাম। দোকান থেকে কিনে আনা, আনাড়ি হয়েও ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে সাহস যোগানো, সব করে গেলাম আপাত নির্লিপ্ত হয়ে। আমার ছেলেবেলায় ব্যাপারটা অজানা ছিল। বিয়ের পর অনন্যা ওই একটা ব্যাপার নিয়ে কোন কথা বলতে চাইত না। গল্প করেছিল, ও নাকি প্রথমবার খুব ভয় পেয়েছিল এবং তখন ওর মা তাকে সাহায্য করেছিলেন। ওর বাবা কিছুই জানতেন না। আমি স্বামী হলেও যেহেতু ছেলে তাই আমাকে অন্ধকারে থাকতে হবে ওই ব্যাপারে।

কিন্তু প্রকৃতি মেয়েদের কিছু সহজাত দক্ষতা দিয়েছে। প্রথমবারে নার্সাসনেস খুব দ্রুত কাটিয়ে উঠল নীলা। কিন্তু খুব কষ্ট পাচ্ছিল বেচারী। আমি ডাক্তারের কাছে গেলাম। ডব্রলোক সম্ভবত এর মধ্যে আমাকে বুঝে ফেলেছিলেন। বললেন, 'দ্বিতীয়বারে যন্ত্রণা হলে খবর দেবেন।'

সেই সময় আমি ওর পাশে বসে থাকতাম। বলতাম মেয়েরা যখন নারী হয় তখন প্রকৃতি এই পরিবর্তন ঘটায়। এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার।

ও মাথা নাড়ত, 'আমি নারী হতে চাই না।'

'এটা নিয়ম।'

'ছেলেদের কেন হয় না?'

'সেটাও নিয়ম।'

'মায়ের হত?'

এমন অকপট প্রশ্নের উত্তরে আমি শুধু নীরবে মাথা নেড়েছিলাম। কিন্তু সেই চারদিন আমি তটস্থ ছিলাম। বেচারী যেন আর কষ্ট না পায়। তারপর ও স্বাভাবিক হয়ে গেল। স্কুল থেকে ফিরে এসে বলল, 'জানো বাবা, আমার দুই বন্ধুর এখনও হয়নি কিন্তু ওরা সব জানে।'

স্কুলের বান্ধবীদের কাছে জানবৃক্ষের ফল খেতে বোধহয় নীলা একটু দেরিতেই শুরু করেছিল। আর সেই সব কথা আমাকে শুনতে হত। আমি মাঝে মাঝে নিবেদন করতাম, এর সঙ্গে কথা বলো না, ওর সঙ্গে মিশো না। কিন্তু কত বলব। ওইটুকুনি মেয়েগুলো যে নরনারীর শরীর এবং তার আলোড়নের এত খবর রাখে তা আমার জানা ছিল না। আমার ধারণা হল যাদের বাড়িতে একাধিক ঘর নেই সেই সব মেয়েদের মা বাবার বেশি সতর্ক হওয়া উচিত। কিন্তু নীলা আমাকে আড়াল করত না কিছুই। এমন কি স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্রয়োজন আগে থেকে মনে করিয়ে দিত। এই সেদিন দশ ক্লাস পাস করার পর ও একদিন বলল, 'আচ্ছা বাবা, তোমার এটা কিনতে নিশ্চয়ই অস্বস্তি হয়? আমার কোন বন্ধুর বাবা কেনে না। এবার থেকে আমাকে নিয়ে দোকানে যেনো। আমি কিনে নেব।'

এখন তো আমাকে ওর সঙ্গে যেতে হয় না।

মেয়েটা চোখের ওপর বড় হয়ে গেল। এখনও আমি ওর সমস্তটাই জানি। প্রকৃতি ওর শরীরে যে পরিবর্তনটা এনেছে তা আমার জানার কথা নয়। কিন্তু এখনও পিঠে ফোড়া হলে ওই মেয়ে জামা সরিয়ে আমাকে দেখাতে সঙ্কোচ করে না। আমি ওকে আমার মত বড় করে তোলার চেষ্টা করেছি। ঠিক আমি যেমন চাই। আমার সমস্ত ইচ্ছা, ভাল লাগার পূর্ণতা ওর মধ্যে।

টেলিফোন বাজছিল। ঘড়ির দিকে তাকলাম। তিনটে বাজে। শরীরে এখন একটা ঝরঝরে ভাব এসেছে। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললাম, 'হ্যালো।'

একটু চুপচাপ, তারপরে সেই গলা বাজল, 'শরীর কেমন আছে?'

'ও আপনি! ইঁা ভাল। ভাল আছি।'

'বিরক্ত করলাম না তো!'

'নাঃ।'

‘ওভাবে বললেন? আসলে এখন আমার হাতে কোন কাজ নেই। একবার ভাবলাম হয়তো ফোন করলে বিরক্ত হবেন, হয়তো ঘুমোচ্ছেন—!’

‘কোনটাই নয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না আপনি কেন আমার টেলিফোন করছেন।’

‘আপনি নিষেধ করলে না হয় করব না।’

‘এটা আমার প্রণের উত্তর হল না।’

‘আমিও যে উত্তরটা জানি না।’ একটু নীরবতা। ‘মেয়ে ফিরেছে?’

‘না, এখনও তো সময় হয়নি।’

‘ওর বিয়ে হয়ে গেলে আপনি খুব একা হয়ে যাবেন!’

বুকের ভেতর ধক্ করে উঠল। এই নির্ভর সত্যটা ইদানীং আমার মনের আনাচে-কানাচে গুঁড়ি মারছে। আমি সেই দিনটার কথা ভাবতে চাই না। উত্তর দেবার আগেই কলিং বেলের আওয়াজ হল। আমি বেঁচে গেলাম জবাব দেবার দায় থেকে, ‘কেউ এসেছে। আমি রাখছি এখন।’

দরজা খুলতেই আমি হকচকিয়ে গেলাম। এক স্বাস্থ্যবান যুবক দাঁড়িয়ে আছে সামনে, ‘নীলা আছে?’ নেই বলতে গিয়েও সামলে নিলাম, ‘আপনি কে?’

‘আমি ওর বন্ধু।’

‘কি নাম?’

‘সায়ন দত্ত।’

‘একসঙ্গে পড়?’ এঁটু বড় ছেলেকে তুমি বলতে অসুবিধে লাগছিল।

‘না। আমি এম. এ. পড়ি। আজ ওদের কলেজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গিয়েছে তাই ভাবলাম বাড়িতে পাব। আপনি ওর কে হন?’

‘নীলা আমার মেয়ে।’

‘আচ্ছা!’ অবিশ্বাস ফুটে উঠল ওর মুখে।

‘নীলা বাড়িতে নেই।’

‘ও। আমি একটু অপেক্ষা করতে পারি?’

না বলতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু পারলাম না। বাইরের ঘরে বসতে বললাম ওকে। বসেই বলল, ‘আপনাকে খুব ইয়াং দেখায়, আই মিন নীলার বাবা হিসেবে—।’

আমি জবাব দিলাম না। চূপচাপ ভেতরের ঘরে চলে এলাম। এ আবার কি উৎপাত শুরু হল? এর মধ্যে একদিন নীলা ডালহাউসি গিয়েছিল। সেখানে ওর সঙ্গে কয়েকটা এম. এ. ক্লাসের ছাত্রের আলাপ হয়েছিল। এগুলো আমি জানি। কিন্তু তাদের বাড়ির ঠিকানা দেবার কি দরকার? সায়ন দত্ত। নামের কায়দা খুব। কথা বলার ভসিটেও। ও কি নীলার বাবা হিসেবে কোন বৃদ্ধকে আশা করেছিল? ওকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে আমি বসিও পাড়িলাম না। আমার কি জল কিংবা চা অফার করা উচিত? অসম্ভব। যমুনা এলে না হয় ভাবা যেত। তবু কিছুক্ষণ বাসে বাইরের ঘরে ঢুকলাম। ধৌওয়ার ঘর ছেয়ে গিয়েছে। দেখামাত্র সোজা হয়ে বসে বলল, ‘আমি জানি না আপনি সিগারেট খাওয়া পছন্দ করেন কিনা।’

‘তুমি খেতে পারো।’

‘আমার অবশ্য এখনও নেশা হয়নি। মাঝে মাঝে খাই।’

‘ঠিক আছে। তুমি তো সিগারেটে গাঁজা কিংবা ড্রাগও খেতে পারতে।’

‘তা পারতাম। কিন্তু খাইনি।’ অ্যাশট্রেতে সিগারেট নিবিয়ে সামান্য জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কি ব্যবসা করেন? এই সময়ে বাড়িতে আছেন তাই বলছি।’

‘না, ব্যবসা করি না।’ হোকরা কি ভেবেছিল এ-বাড়িতে নীলাকে এখন একা পাবে?

সায়ন আরও একটু উশখুশ করল। এবং তারপরেই নীলা এল। সঙ্গে আর একটি ছেলে ও মেয়ে। দরজা আমিই খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, ‘কেমন আছ তুমি? দেখি কপাল দেখি। নাঃ জ্বর আসেনি।’

‘একজন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।’

ঘরে ঢুকল নীলা, ‘আই বাস। তুই এখানে? কি ব্যাপার?’

‘চলে এলাম। অবাক হচ্ছিস?’

‘নিশ্চয়ই। ঠিকানা পেলি কোথায়?’

‘অনিলের কাছে।’ সায়ন হাসল, ‘তোরা তো ছুটি হয়ে গিয়েছিল?’

‘হ্যাঁ। আমি লাইব্রেরিতে ছিলাম। তা কি ব্যাপার বল?’

‘এমনি। জাস্ট এমনি।’

আমি চুপচাপ শুনছিলাম। নীলা আমার দিকে তাকাল, ‘বাবা, তুমি ওকে কম্পানি দেবে?’

আমি জবাব দেবার আগেই সায়ন বলল, ‘কেন?’

‘আর বলিস না, আমাদের একটা পেপার তৈরি করতে হবে। এখনই।’

‘ও, তাহলে আমি যাচ্ছি।’ সায়ন উঠে পড়ল।

‘যা তোর সুবিধে।’ নীলা কাঁধ নাচাল।

‘চলি।’ সায়ন বেরিয়ে গেল। আমি আর দাঁড়িলাম না। নিজেকে খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছিল। খামখা নীলাকে সন্দেহ করছিলাম। ও কি সুন্দরভাবে ছেলেটাকে কাটিয়ে দিল। ওর সঙ্গে যে দুজন এসেছে তাদের আমি চিনি। ছেলেটা তো বেশ নিরীহ। নীলা বলেছে ওর চেয়ে দুমাসের ছোট ছেলেটি। আমার মনে হল ওদের একটু চা খাওয়ানো উচিত।

আজ সন্দের পরে আমরা দুজনে যখন পাশাপাশি বসে আছি বালকনিতে তখন ওকে টেলিফোনের কথাটা বললাম। শুনে চোখ বড় করল নীলা, ‘এই ভদ্রমহিলা নির্বাণ তোমায় ভালবেসেছেন।’

আমি হাসলাম। হঠাৎ সে আমার ঘনিষ্ঠ হল, ‘বাবা, একটা কথা রাখবে?’

হেসে বললাম, ‘বল।’

‘আগে কথা দাও!’

‘চেষ্টা করব।’

‘তুমি এবার বিয়ে কর।’

‘অসম্ভব।’ ছটকে এল শব্দটা।

‘বাঃ। কেন অসম্ভব? আমার বন্ধুরা তোমায় দেখে ভেলাস হয় জানো?’

‘হতে পারে। কিন্তু বিয়ে আর নয়।’ বলে হাসলাম আমি, ‘তাহাড়া তোর মত এত বড় একটা মেয়ে আছে জানার পর কোন ভদ্রমহিলা রাজি হবেন না।’

‘তাহলে উনি কেন ফোন করছেন?’

‘নিশ্চয়ই বিয়ে করার জন্যে নয়।’

‘তা তুমি জানো না।’

‘ছেড়ে সে। তুই তো জানিস তোর মায়ের পর তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি—’

‘সেটা তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না বিয়ে করলে। আচ্ছা, দেখাই যাক না।’

‘কি দেখবি?’

‘আমার এক বন্ধুর দাদা টেলিগ্রাফে কাজ করে। ওকে বলব একটা অ্যাড দিয়ে দিতে। লিখব, আমার বাবা মধ্যচমিশেও যুবক, সুদর্শন, মিথুকে, স্মার্ট, ভাল রোজগার করেন। আমার মা মারা গিয়েছেন আঠারো বছর আগে। যিনি স্ত্রী হিসেবে নিভেঁকে উপযুক্ত মনে করেন তিনি যোগাযোগ করুন। আমি একমাত্র মেয়ে এবং দায় নেই।’ বলেই হাসল, ‘ফ্যাশনিস্টিক হবে।’

‘ছাই হবে। সারা শহরে আলোচনা চলবে।’

‘চলুক। নাম দেব না। বঙ্গ নামার থাকবে। গীজ না বলো না। হ্যাঁ, ফটোও চাইব।’

মেয়ের আবদারে আমারও কেমন মজা লাগল। এই নিম্নে রসিকতা করে নীলা চলে গেল পড়তে। হঠাৎ আমার মনে সন্দেহ হল। নীলা আমার বিয়ে চাইছে কেন? এতদিন তো কখনও বলেনি। ছেলেবেলায় আমাকে ও কারও সঙ্গে শেয়ার করতে চাইত না। নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন রহস্য রয়েছে। ও কি নিজে কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবছে। ওর কি মনে হচ্ছে বিয়ে করে চলে গেলে আমি একা হয়ে যাব? আর তা যাতে না হয় সেই কারণে আমাকে বিবাহিত দেখতে চাইছে? এই করে নীলা মানসিক তৃপ্তি নিশ্চয়ই পেতে পারে। কিন্তু আমি তো ইচ্ছে করলে আজ থেকে অনেক বছর আগেই ঠিক বিয়ে করতে পারতাম।

শিশুকন্যাকে মানুষ করতে আর একটি নারীকে সংসারে আনার সুন্দর একটা অভূতাত আমারও ছিল।
সন্দেহটা খুঁখু করতে লাগল। ঠিক করলাম, অপেক্ষা করব।

কাণ্ডটা করল নীলা। বিজ্ঞাপন ছাপা হতে যে আলোচনা হচ্ছে তা নিজের অফিসেই টের পেলাম। সবাই বলল, মেয়েটি খুব স্মার্ট নিশ্চয়ই, নইলে বাপের বিয়ের সম্বন্ধ করে। দিনকাল কিরকম বদলে যাচ্ছে। কিন্তু আমাকে অবাক করে কাগজের অফিস থেকে চিঠির বাড়িল আসতে লাগল। কলকাতা শহরে কত ভদ্রমহিলা একা বাস করেন, ডিভোর্সির সংখ্যা কত, বিধবা অথবা বৃদ্ধা নন এমন কতজন আছেন তার পরিসংখ্যান আমার জানা নেই কিন্তু আমাদের কাছে যাঁদের চিঠি এল তার পক্ষাশ ভাগ কুমারী, দুজন বিধবা এবং বাকি সবাই ডিভোর্সি। সন্তানসহ একা মহিলাও আছেন।

এই অবধি ঠিক ছিল। কিন্তু এর পরে মেয়ে চিঠি বাছাই শুরু করল। সেই সঙ্গে ছবি। টেবিলে স্থাপ করে ও মগ্ন হয়ে যখন এসব করত, তখন মৃদু ধমক দিতাম। পড়াশুনার কথা খেয়াল করিয়ে দিতাম। কিন্তু কে শোনে কার কথা। শেষ পর্যন্ত ও তিনটে ছবি এবং তাদের ব্যায়োডটাকে পছন্দ করল। বলল, 'এঁদের চিঠি দেবে। এবার ইন্টারভিউ নেওয়া হবে।'

এতক্ষণ ব্যাপারটা মজার ছিল। আমি রাগ করলাম। ও হাসল, 'আর একটু দেখি না।'

একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছিলাম। ছবির চেহারাগুলোর সঙ্গে অনন্যার কোন না কোন, কিছু না কিছু মিল রয়েছে। বিপরীত চেহারার সুন্দরীদের বাদ দিয়েছে নীলা। একটু অবাক হলাম। চিঠির ভাবাব এল। ভিনজনেই নীলার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। পরপর তিন রবিবার বিকেলে ওঁরা আসবেন চা খেতে। ভিনজনেই কেউ কাউকে জানেন না।

এর মধ্যে খেয়াল ছিল না, সেই টেলিফোনটা হঠাৎ বন্ধ হয়েছিল। এক রবিবারের সকালে এল। আমিই রিসিভার তুলেছিলাম, 'ও, আপনি।'

'বিরক্ত করছি?'

'না। কি খবর? অনেকদিন কোন সাড়া নেই?' আমি যেন এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছি।

'হঠাৎ কলকাতার বাইরে চলে গিয়েছিলাম। আর তখন ফোনটাও খারাপ ছিল।'

'তাই বলুন।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'ভাল নয়।'

'কেন?'

'জানি না। ছেলেটা বড় হয়ে যাওয়ার পর আজকাল খুব একা মনে হয়। ছেলেদের এই অসুবিধে হয় না। বাইরের জগৎ নিয়ে বেশ ভুলে থাকতে পারেন আপনারা।'

'বাইরে গিয়েছিলেন বেড়াতে?'

'না। ওর অফিস থেকে কিছু টাকা পাওয়া গেল। অনেক বছর পরে। তাই আনতে যেতে হল। এখনও তো ওর সাহায্যেই সংসার চলছে। মরে গিয়েও বাঁচিয়ে রাখছে আমাদের।'

'ছেলে এবার রোজগার করবে?'

'আমি সেই আশা রাখি না। করলে নিজের জন্যে করুক, তাহলেই হবে।' নিঃশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা, 'অনেক সময় নিলাম। পরে আবার করব। রাখি।'

রিসিভার রাখার পর আমার খুব খারাপ লাগছিল। ধরা যাক আমি বেঁচে নেই। অনন্যা নীলাকে বড় করে বিয়ে দিয়ে একা রয়েছে। ওর কি রকম লাগত জীবনটাকে সেই সময়? এই প্রথম আমরা সহজ স্বাভাবিক গলায় কথা বললাম। আচ্ছা ইনি ইংরেজি কাগজ কি পড়েন না? নাকি বাইরে ছিলেন তাই বিজ্ঞাপন দ্যাখেননি? অথবা দেখেছেন, পাঠিয়েছেনও চিঠি এবং ছবি, নীলা ওঁকে বুঝতে না পেরে বাতিল করছে।

প্রথম রবিবারে যিনি এলেন তাঁর সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক রয়েছেন। সম্পর্কে মামাতো দাদা। প্রাথমিক কথা এবং চা খাওয়ার পর নীলা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি গান গাইতে পারেন? মানে পুরোনো দিনের গান? বাবা খালি গলায় ওগুলো শুনতে খুব ভালবাসে।'

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, 'না ভাই, এই ব্যয়ে গান আর পারি না।'

'আপনি কি পারেন?'

হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। আমি মৃদু তিরস্কার করলাম নীলাকে। ভদ্রমহিলাকে অনুরোধ করলাম কিছু মনে না করতে। বললাম, 'আমরা গল্প করি, সেটাই উচিত হবে।'

ঘণ্টাখানেক বাদে ওঁরা চলে গেল নীলা হাত নাড়ল, 'অসম্ভব। এ চলবে না।'

'কেন?'

'কেমন নীরস। কথা বলে সুখ নেই।'

দ্বিতীয় রবিবারে যিনি এলেন তিনি সৌন্দর্য-সচেতনা। কথাও বলেন ভাল। এসেছেন দিদির সঙ্গে। ভাল চাকরি করেন। এমন ভঙ্গি করতে লাগলেন যেন আমাদের বিয়ে হবেই। আর সেইটে খারাপ লাগল নীলার। বাতিল হল।

তৃতীয় রবিবারে যিনি এলেন তাঁকে ওরু পছন্দ। মিষ্টি ব্যবহার, চেহারাটিও সুশ্রী। বিয়ের সাতদিন বাদে চলে এসেছিলেন স্বামীর সংসার থেকে। ডিভোর্স পেয়েছেন কারণ ভদ্রলোক মানসিক রোগগ্রস্ত। ইনি এসেছেন ওঁর বাবার সঙ্গে। এই ভদ্রলোক এককালে অধ্যাপনা করতেন। রসিক মানুষ।

ওরা চলে যাওয়ার পর যখন নীলা উচ্ছ্বসিত ঠিক তখনই বেল বাজল। নীলা খুলে বলল, 'কাকে চাই?'

আমি নারীকণ্ঠে আমার নাম শুনতে পেলাম।

সুবর্ণা এসেছে। আমি অবাক। নীলার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। মায়ের বাফবী শুনে সে খুব খুশী। শুনলাম টেলিফোন বই থেকে ঠিকানা পেয়েছে। ছেলেকে সঙ্গে আনেনি। আমরা কথা বলছিলাম। নীলাকে সে বলল, 'তুই একদম তোর মায়ের মত হয়েছিস।'

'তুমি এতদিন আসোনি কেন?'

'বাঃ! তোদের কিছুই জানতাম না। নিউমার্কেটে তোর বাবার সঙ্গে দেখা হল বলেই জানতে পারলাম। অবিকল অনন্যা, না?'

নীলা আমার দিকে তাকাল। কেন গোপন করেছি সেটাই জানতে চাইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আমার মা কিরকম ছিল?'

'খুব ভীতু। কিন্তু দারুণ মিষ্টি।'

'মা কি খেতে ভালবাসত?'

'মিষ্টি ছাড়া সব। বিশেষ করে ফুচকা।'

'মা কি খুব শান্ত ছিল?'

'তা ছিল। সেইসঙ্গে জেদী। আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোদের যদি বিয়ে না হয়? বলেছিল, তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।'

ওরা দুজনে নিজেদের মধ্যে কথা বলে গেল। বিষয় অনন্যা। মা সম্পর্কে যাবতীয় কৌতূহল যেন মিটিয়ে নিচ্ছিল নীলা। এর অনেক কিছুই সে আমার কাছে শুনেছে তবু যেন মন ভরছে না। একবার সে উঠে গেল চা করতে। আমি আর সুবর্ণা তখন একা। হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। বলল, 'সামান্য সামনি ক্ষমা চাইতে এলাম।'

'কেন?'

'সত্যি তুমি বুঝতে পারোনি?'

'না।'

'টেলিফোনে আমার গলা চিনতে পারোনি?'

চমকে উঠলাম। একি শুনছি। বললাম, 'তুমি?'

'হ্যাঁ আমি। আমিই কলেজে তোমার সঙ্গে প্রথমে কথা বলেছিলাম। অনন্যার সঙ্গে অনেক পরে তোমার আলাপ হয়েছিল। মনে আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'কিন্তু—'

‘আমি তখন বন্ধুর জন্যে সরে দাঁড়িয়েছিলাম।’

‘আমি কি বলব জানি না।’

‘কিছু বলতে হবে না। তবে তোমার মেয়ের কাছে মাঝে মাঝে আসতে পারি?’

‘না আসাই ভাল।’

‘কেন?’

‘ও তো অনন্যারও মেয়ে। অনন্যা জানলে কষ্ট পেত।’

আর কথা বাড়াল না সুবর্ণা। নীলা এল চা নিয়ে। গল্প করল। তারপর সুবর্ণাকে এগিয়ে দিতে গেল। আমি চলে এলাম অনন্যার সামনে। অনন্যা আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। খুব লজ্জা করছিল আমার। ফিসফিস করে বললাম, ‘আমি জানতাম না।’ তারপরেই মনে হল সুবর্ণা অনন্যার বন্ধু হতে পারে না। সুবর্ণা হুলাসী, প্রায় ধৌড়া। আর অনন্যা যুবতী। ওরা কি করে এক জায়গায় থাকবে?

নীলা ফিরে এল। হেসে বলল, ‘কি ঠিক কুরলে?’

জানতে চাইলাম, ‘কি ব্যাপারে?’

‘আমার দুজনকে পছন্দ হয়েছে।’ নীলা উলটোদিকে বসল, ‘আজ যিনি এলেন তাঁকে আর সুবর্ণা মাসীকে।’

‘কি যা তা বলছিস?’

‘ঠিকই বলছি।’

‘তোর কি মতলব বল তো? তুই কি কাউকে ভালবেসেছিস?’

‘আমি এখন পর্যন্ত কোন কথা তোমার কাছে লুকোইনি।’

‘তাহলে আমার পেছনে লেগেছিস কেন?’

‘কি করে?’

‘এইসব তোকে আমি করতে নিষেধ করেছিলাম।’

‘আমি তোমার জন্যে কিছু করিনি।’

‘করিসনি? তুই সুবর্ণাকেও কিছু বলেছিস?’

‘হ্যাঁ।’

‘কি বলেছিস?’

‘বিভ্রাপনের কথা।’

‘কি বলল ও?’

‘হাসল।’

আমি উত্তপ্ত হলাম, ‘দ্যাখ নীলা, আমি তোকে এত বছরেও একটা কথা কেন বোঝাতে পারছি না, পৃথিবীতে অন্য কোনও নারীকে ভালবাসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’

‘সেটা বুঝিনি তা কে তোমাকে বলল?’

‘বুঝলে এসব করতিন না তুই।’

‘বুঝেছি বলেই করছি।’

‘তার মানে?’

হঠাৎ নীলার স্বর বদলে গেল, ‘তুমি চাও, আমার বিয়ে হোক, আমি চলে যাই?’

টোক গিললাম, ‘এটা মানতেই হবে। এটাই নিয়ম।’

‘কিন্তু আমি যদি কোনদিন বিয়ে না করি তুমি সুখী হবে?’

হাত নাড়লাম, ‘খারাপ লাগবে। নিশ্চয়ই খারাপ লাগবে।’

‘বাবা, আমার জীবনে এখন পর্যন্ত তুমিই একমাত্র পুরুষ। আমার সঙ্গে কোন ছেলে কথা বললে বা বাড়িতে এলে তুমি দীর্ঘা কর, কর না?’

‘আমি তোর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় পাই।’

‘পুরোটা সত্যি বললে না। যা হোক, তোমার সঙ্গে কোন নারীকে আমি কিন্তু সহ্য করতে পারিনি এতকাল। কিন্তু একটু একটু করে বুঝলাম, তোমার জীবনে আমিই একমাত্র নই?’

‘কি বলছিস নীলা?’ চিৎকার করে উঠলাম।

‘এটা সত্যি বাবা।’

‘সত্যি! আমি আর কোন মেয়েকে আমার জীবনে প্রশ্রয় দিইনি। বিয়ের নামে ওই খেলা আমি খেলতে চাইনি। এবং শোন, যে ফোন করত নাম বলত না, সে সুবর্ণা। তাকেও আজ স্পষ্ট বলে দিয়েছি এখানে না আসতে।’ আমি হাঁপাচ্ছিলাম।

‘এটা অর্ধসত্য বাবা।’

‘তার মানে? তুই আমাকে অবিশ্বাস করিস?’

‘না। আমার ধারণাটা পালটেছে মাত্র।’

‘কি তোর ধারণা?’

‘তোমার জীবনে একমাত্র মহিলা ওই ভদ্রমহিলা।’ আঙুল তুলে অনন্যাকে দেখাল নীলা, ‘ওঁকে ছাড়া আর কাউকে তুমি ভালবাসনি। আমাকেও নয়। আমার মধ্যে তুমি ওঁর অভাব পূর্ণ করতে চেয়েছিলে। আমাকে বড় করেছ, নিজের মত করে গড়েছ। যা তুমি ওই মহিলার মধ্যে পেয়েছিলে আর যা পেতে চেয়েও পাওনি তার সব আমার মধ্যে তৈরি করতে চেয়েছ এত বছর ধরে। অস্বীকার করতে পার কথটা?’

‘আমি তোকে ভালবাসি না নীলা?’ ফ্যাসফ্যাসে গলায় জিজ্ঞাসা করলাম।

‘না। তুমি আমার মধ্যে দ্বিতীয় অনন্যাকে পেতে চেয়েছিলে। কিন্তু আমি নীলা।’ সে উঠে দাঁড়াল।

আমি দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইলাম। সে আমার পাশে এল, ‘সত্যিটা আজ নয় কাল তুমি জানতেই বাবা। আমি কিন্তু তোমাকে ভালবাসি। ভালবাসি বলেই ভবিষ্যতে তোমায় একা দেখতে চাইনি। আমি নীলা হলে তোমার সহ্য হবে না। আমার মায়ের যেমন হয়নি। আমার পক্ষে অনন্যা হওয়াও অসম্ভব, তাই না?’

pathagar.net

যৌবন

[প্রথম প্রকাশ, মাস ১৩৯৭]

pathagor.net

pathagar.net

থারাপ মানুষ কাকে বলে? বদ লোক? লম্পট? কুচরিত্র? স্বীকার করছি, এসবই মিলিয়ে নিতে পারেন আপনারা আমার সঙ্গে। এর যে কোন একটা অথবা সবগুলো আমার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে আমি আপনাকে দোষ দেব না। তবে হ্যাঁ, আমি কিন্তু পাবলিকলি স্বীকার করব না। কে করে মশাই? রাজনৈতিক নেতারা করেন না, ব্যবসায়ীরাও সত্যি কথা বলেন না, এমন কি একজন ধর্মীয় গুরুকে সত্যি স্বীকার করতে দেখেছি। বাইরের কথা থাক, ভেতরে ভেতরে তো জানি আমি কী মাল!

আমার সম্পর্কে একটু তথ্য দেওয়া আগে দরকার। প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম। পাস করে রেভিনিউ সার্ভিসে গেলাম। ট্রেনিং ফ্রেনিং নিয়ে প্রথমে একটু জাতের অফিসার, এখন বড়দরের। আমার বয়স আটচল্লিশ। চেহারা ফিট রাখার জন্যে রোজ সকালে তিন মাইল হাঁটি। বৃষ্টি হলেও। যেহেতু লোকের পাশে থাকি তাই হাঁটতে অসুবিধা হয় না। সাদার্ন অ্যাভিনিউ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা আটতলা কালো বাড়ি দেখেছেন নিশ্চয়ই। তার ছ'তলায় দুটো এগারোশ' স্কো: ফি: ফ্ল্যাট কিনে জুড়ে নিয়েছি। বছর আটেক আগের কথা। তখনই স্কোয়ার ফিট ছিল চারশো। এখন ভো আট দিলেও পাবেন না। তখনই প্রায় নয় লাখ বেয়িয়ে গিয়েছিল মশাই। ভাবছেন নিজের নামে কিনেছি? ককনো নয়। প্রমোটারকে বলেছিলাম তিন লাখের বেশি সাদা দেব না। আমার বউ দীপ্তি চাকরি করে। সে অফিস থেকে ধার করল, যত গয়না পারিবারিক সূত্রে পেয়েছিল তা বিক্রি করল। এবং তাতেও যখন কুলোলো না তখন শব্দর মশাই-এর কাছ থেকে ধার করল। সেই টাকার দাম মিটানো হল। ফ্ল্যাট দুটো দীপ্তির নামে। আমি শুধু ওর গহনার ডুব্রিকেট কপি তৈরি করিয়ে তিনটে স্ট্রকারে ছড়িয়ে রেখে ওকে চাবি দিয়ে দিয়েছি। যে টাকা ও ধার নিয়েছিল তার পাই পয়সা ফিরিয়ে দিয়েছি একবারেই। দীপ্তি সেটাই খেপে খেপে শোধ করে যাচ্ছে। আমার অফিসে জানিয়ে দিয়েছিলাম ওর ফ্ল্যাট কেনার কথা। জোর করে তাগাদা দিয়ে তদন্ত করিয়ে নিজের স্বপক্ষে একটা রিপোর্ট জমা দিতে পেরেছি। এ ব্যাপারে আর কোন চিন্তা নেই। আমি যে চাকরি এতকাল করছি তাতে আর কিছু না হোক অন্যের খান্নাবাজিটা চমৎকার ধরে ফেলতে পারি। দিনের পর দিন দেখে গিয়েছি লোকে কি ভাবে কালো টাকাকে সাদা বানিয়ে নেয়। আর এইসব দেখতে দেখতে এর কায়দার সঙ্গে ওর কায়দা মিশিয়ে আমি অনেকগুলো সুপার কায়দা তৈরি করে নিয়েছি যা কোন আইনেই বাতিল হবে না। ছেলেবেলায় স্কুলের অনেককেই পরীক্ষার সময় নকল করতে দেখতাম। সরল ভোলেভালা মাস্টারমশাইরা পাকা নকলবাজকে ধরতে পারতেন না। কিন্তু বিধুবাবু নামের এক নতুন মাস্টারমশাই এসেই পটাপট তাদের ধরতে লাগলেন। ঘড়ির তলায়, আস্তিনের নিচে যেখানেই টুকলির চোখা ওরা রাখত না কেন বিধুবাবু সেটা খপ্প করে আবিষ্কার করে ফেলতেন। শেষ পর্যন্ত সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে নিদ্বাণ্ডে এল মাস্টারমশাই বিধুবাবু নিজে ছাত্রাবস্থায় টুকলিমাস্টার জেনারেল ছিলেন। অতএব ওর সঙ্গে পারা যাবে না। এই আমি এখন বিধুবাবু হয়ে গিয়েছি। আমার সহকর্মী অফিসারদের মত কোন কাজ করে ফেলি না যাতে পরে আফসোস করতে হয় নিজের বোকামির জন্যে। ঘুষ নেবার জন্যে হাঁ করে বসে থাকি না আমি। কিন্তু ডিপার্টমেন্টের সবাই আমাকে ঘুষখোর বলে জানে অথচ প্রমাণ পায় না।

টাকা রোজগার করার যে নেশা তার কোন বিকল্প নেই। আমি ভ্রাণ খাইনি কখনও কিন্তু মদ মেয়েমানুষ ইত্যাদি এ নেশার কাছে শিশু। আমার শিরায় শিরায় নেশাটা ঢুকে গিয়েছে। তবে হ্যাঁ, সবসময় নিজেকে বোঝাই, বাপু হে, ভুল করেও ভুল করে ফেলো না।

এবার দীপ্তি সম্পর্কে কিছু বলি। ও আমার সঙ্গে পড়ত। সেখানেই প্রেম। এখন ভাল চাকরি করে। আমার সঙ্গে আর প্রেমট্রেন নেই। জীবনটা চমৎকার বুঝে গিয়েছে সে। একমাত্র ছেলে অনুতোষকে নিয়ে আছে ভাল। অনু খড়্গপুরে পড়ে। এখন হচ্ছে না থাকলেও আমাদের বাইশ-শো কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটের একদিকে দীপ্তি থাকে, অন্যদিকে আমি। শুধু মাঝের হলঘরে বসে দুজনে চা খাই, কাগজ পড়ি। ও তাঁতের শাড়ি পরে। অনেক খোঁজ নিয়ে দেখেছি কোন ব্যাক্সেন্ড নেই। থাকলে আমার ভাল লাগত। ওর মত হাফসুন্দরী মেয়ে সারাক্ষণ বিবেক-বিবেক ভাব নিয়ে থাকবে এটা আমার ভাল লাগে না।

ইদানীং দীপ্তির সঙ্গে আমার ঝগড়াঝাঁটি হয় না। চমৎকার আছি। আমার বিশ্বাস মানুষের সঙ্গে মানুষীর প্রেম পাঁচ থেকে কমতে শুরু করে দশ বছরে শুধু অভ্যেসে পৌঁছে যায়। ব্যতিক্রম থাকতে পারে কিন্তু বিয়ের প্রথম ছয়মাস স্বামী-স্ত্রী যে গলায় কথা বলে দশ বছর পরে তার ধার দিয়েও যায় না। আনলে

তখন কথা বলার মত কথাই খুঁজে পাওয়া যায় না। শরীরের আকর্ষণ ধীরে ধীরে ভোঁতা হয়ে যায়। তখন শুধু একসঙ্গে থাকা। আমরা একটু বেশি করেছি। কথাবার্তা না দরকার হলে বলি না। মাসের প্রথমে দশ হাজার টাকা দীপ্তিকে দিয়ে দিই সংসার চালানোর জন্যে। ও একদমই জানতে চায় না আমার মাইনে যদি কেটেকুটে চার হাজার হয় তাহলে দশ হাজার কী করে দিচ্ছি? কারণ এ বাড়ির ওয়াল টু ওয়াল কাপেট, ওয়াল গ্রাস ওয়াল, তিন কালারের তিনটে ট্যানেট, মাথ তার দেওয়াল, কমোড, আয়নার ফ্রেম এবং কোলন সাবানগুলো রঙ মিলিয়ে আর এসব চার হাজার টাকায় হয় না। অথচ যে বাড়ির জন্যে এত করছি সেখানে আমি শুধু ঘুমোতে আসি। তাতে আমার কোন দুঃখই নেই। দুঃখ আজকাল আমার হয় না। আফসোস হয়। যেমন কোন পার্টিকে দশ হাজারে বধ করার পর বুঝতে পারলাম তিরিশ চাইলেও পাওয়া যেত তখন বুকের ভেতরটা টনটন করে। তবে এখন আমি ঠিক করেছি পঞ্চাশের বেশি এক্সট্রা ইনকাম করব না। এই পঞ্চাশের মধ্যে দশ খরচ করি ওপরওয়ালার জন্যে। তবে কর্তাদের কার ইট লাগবে, কার ভি সি আর, কার মেয়ে বউ বোম্বে যাবে বলে প্লেনের টিকিট এগুলো নিয়মিত আমাকে সাপ্রাই করতে হয়। আর সেগুলো দশ হাজারে কুলোয় না বলে পার্টিদের বলে দিতে হয়। এখন পর্যন্ত দুখ দিয়ে যাচ্ছি বলে কর্তারা আমাকে ভালবাসেন। নিয়মমাফিক যে ট্রান্সফার করতে হয় তা ভেবেচিন্তেই দুখ থেকে সরে, সর থেকে স্কীরে, কিন্তু কক্ষনো জ্বলে নয়। আমার কর্তাদের দুজন এখন দিল্লীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রমোশন পেয়ে চলে গিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ নষ্ট করিনি। খোদ মন্ত্রী পরেই তাঁরা। অতএব আমার চুল হোঁয়ার সাধ্য নেই কল্পিত।

যে কথা বলছিলাম, দীপ্তি, আমার স্ত্রী, চাকরি করে। চাকরি করা মেয়ে বাজারটা বোঝে। স্বামীর সরকারী চাকরিতে কত আয় তাও তার না জানার কথা নয়। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হলে আপনার মনে হবে এমন মৃদুভাবী, শিক্ষিতা রুচিসম্পন্ন মহিলা খুব কম আছেন সংসারে। সবসময় নিজের চারপাশে একটা সুকৃটির বাতাবরণ তৈরি করে রেখে দেয়। যতদূর জানি ভদ্রমহিলার মাইনে আড়াই হাজারের কম নয়। আমি দশ হাজার দেবার পর সেই টাকায় নিশ্চয়ই হাত দিতে হয় না।

আমরা একসঙ্গে আছি, ফ্ল্যাটও ওর নামে, ফ্ল্যাট সাজানো হয়েছে যে টাকায় তার অঙ্কটা অঙ্কও অনুমান করতে পারবে যেখানে সেখানে তিনি কিছু বোঝেন না এটা নেকুস্য নেকুও মানবে না। এসবই যে আমার দুঃস্বপ্নী পয়সায় হয়েছে এবং হচ্ছে তা জেনেও তিনি না জানার ভান করে দিবা বেঁচে আছেন।

আমাদের মধ্যে অপ্রয়োজনে কথাবার্তা হয় না কিন্তু টাকাটা যখন মাসের শেষে ওর টেবিলে রেখে দিয়ে আসি তখন কিন্তু সেটা নিতে অস্বীকার করেন না। হ্যাঁ, আজ অবধি দীপ্তি কখনই আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি এত টাকা আমি পাচ্ছি কোথা থেকে। সেই বিয়ের পর পর যখন আমার মাইনে খুব কম, সাধারণ একটা বাসায় থাকতাম তখনও যেভাবে আমার দেওয়া টাকা খরচ করেছে এখনও তাই।

ওর বন্ধু নেই, কল্যাণজন বান্ধবী আছেন। সেইসব বয়স্ক বান্ধবীদের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ নেই। আমি যদি বাড়িতেও থাকি তাহলে দীপ্তি তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেয় না। কিন্তু তাঁরা তো এই ফ্ল্যাটে এসে চোখ ঘুরিয়ে আমার সাজানো বিস্ত দেখেছেন এবং তাতে দীপ্তির কম আনন্দ হয় এমন কথা ভাবতে পারি না।

যাঁরা ভাবছেন পঞ্চাশ হাজার এক্সট্রা ইনকাম মানে অনেক টাকা, তাঁরা খুব ভুল করছেন। সত্যি কথা বলছি এতে চলে না। দিনকাল খুব খারাপ। তবে লেবু বেশি চটকাতে চাই না বলেই এর মধ্যে আছি। আমার দুটো গাড়ি আছে, একটা ড্রাইভার। সাক্ষী রাখতে চাই না বলে সন্দের পর আমি মারুতি নিয়ে বের হই। প্রায়ই পার্টি দিতে হয়। ক্লাবগুলোর বিল খুব কম হয় না। সংসারে দশ দিয়ে তো দারিদ্র্য শেষ হয় না, হঠাৎ একটা দারুণ ঘর সাজাবার জিনিস দেখলাম, আট হাজার দিয়ে কিনে ফেললাম, এসব তো আছে। আমি মদ খাই। কে খায় না বলুন! পার্ক স্ট্রীটের বারগুলোর আমি কখনও ঢুকি না। আমার অনেক জুনিয়ার স্টাফরা সেখানে অল্প পয়সার মদ খেতে যায়। বাহার নামে একটি লোক আমাকে মদ সাপ্রাই করে। একেবারে খাঁটি জিনিস। শিভাস রিগ্যাল, ব্ল্যাক লেভেল থেকে গুরু করে কইটুর পর্যন্ত সব ওর স্টকে আছে। শিভাসের বোতল নেয় পাঁচ করে। হাজার দুয়েক টাকার মাল সপ্তাহে দেওয়া মানে ওখানেই মাসের আট হাজার বেরিয়ে গেল। আজকাল দিশি খেতে পারি না। নাখিং বিলো স্কচ।

আর একটা শখ আমার, সেটা জামাকাপড়ের। এক জামাপ্যাট আমি মাসে দুবার পরি না। লিভসে

স্ট্রীটের এক দরজি স্পেশ্যাল কায়দায় সেগুলো বানিয়ে দেয়। আজকাল জামাকাপড়ের যা দাম হয়েছে তা তো জানেনই।

আমাদের ছেলে অনুতোষ আই এস সি-তে পঁচাশি পার্সেন্ট নম্বর পেয়েছিল। খড়্গপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছে পরীক্ষা দিয়ে। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে যাকে আমরা স্কলার বলতাম তা কখনই মনে হয়নি। তা এসবের জন্যে কৃতিত্ব দীপ্তির প্রাপ্য। সে-ই সব করেছে। প্রায় প্রতিমাসেই একবার করে খড়্গপুরে যায় দীপ্তি। তখন আমার গাড়িটা ব্যবহার করে। অ্যাসাসাডারটা। তবে ছেলের সঙ্গে ইদানীং ওর খুব লাগছে। হস্টেলে যাওয়ার পর ও নাকি খুব স্বার্থপর হয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে অলস। জীবন দেখার চোখ বদলে গেছে। আর এসবের জন্যে আমাকে এখনও দায়ী করেনি দীপ্তি। করবে। আমি জানি। ইদানীং ছেলের ভাবভঙ্গি দেখে আমার খুব রাগ হয়। ছুটিতে যখন বাড়িতে আসে তখন দিনরাত ভি সি আর চালিয়ে বসে থাকে। ডাকলেও কানে শব্দ ঢোকে না। বাড়িতে অবশ্য তিনটে কাজের লোক আছে। তবু দীপ্তি কোথাও যেতে বললে ও নড়বে না। বেশি বললে দরজা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু নিজের স্বার্থ থাকলে গায়ে পড়ে এসে কথা বলবে। না, এর পেছনে আমার কোন হাত নেই। ওর সামনে আমি কখনই দীপ্তির সঙ্গে ঝগড়া করিনি। দুহাতে টাকা পয়সা ওজ্রাবার সুযোগও ওকে দেওয়া হয়নি। তবু ও ওইরকম বেয়াড়া হচ্ছে।

কিন্তু অনুতোষের দিকে তাকালে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করি। স্কুল ছাড়ার পরীক্ষায় ও যখন পঁচাশি নম্বর পেয়ে গেল তখন থেকেই অস্বস্তিটা মনে ঢুকেছে। ওকে যখন পড়াশুনা করতে দেখতাম তখন মনেই হত না সেকেন্ড ডিভিশনের ওপরের দিকে থাকবে। আমি খুব ভাল ছাত্র হয়তো ছিলাম না তবে খারাপও কেউ বলত না। হায়ার সেকেন্ডারির আগে তিনমাস দিনে প্রায় আঠারো ঘণ্টা পড়েছি। টেস্ট পেপারের সব ধাঁধা আমি নখদর্পণে করে ফেলেছিলাম। তবু রেজাল্ট বের হলে দেখলাম কোনমতে ষাট জুটেছে। ফার্স্ট ডিভিশনের আনন্দে নিজেকে বেশ মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল। অনুতোষ আমার সব অনুমান ব্যর্থ করে আরও পঁচিশ নম্বর বেশি পেয়েছে। নিজেকে কেমন খেলো-খেলো লাগতে শুরু করল। দীপ্তি যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমার চেয়ে আরও বেশি মূল্যবান ছাত্র সে তৈরি করতে পারে। এত নম্বর পাওয়াটা অবশ্যই কৃতিত্বের কথা কিন্তু এখন তো পরীক্ষার সিস্টেমটাই পালটে গিয়েছে। আমাদের সময় পাতার পর পাতা লিখতে হত। একেবারে নিখুঁত উত্তর লিখতেও দশের মধ্যে সাড়ে সাতের বেশি নম্বর পাওয়া যেত না। এখন তো টিক্ দিয়ে উত্তর জানাতে হয়। টিক্ ঠিক থাকলে দশে দশ। তার মানে একটু বুদ্ধিমান ছাত্রের জন্যে নম্বরের হরির লুঠ। তা এসব কথা মুখে বলতে পারিনি। বললে দীপ্তি মন্তব্য করত, আমার ছোটমন এর বেশি ভাবতে পারে না। তবে জয়েন্টটাও যখন অনুতোষ হেলাফেলা করে পাস করল তখন একটা বিদেশী কাগজের প্রবন্ধ মনে পড়ল। এখনকার ছেলেমেয়েদের মেধা নাকি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাবার যদি ষাট থাকে ছেলের পঁচাশি হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। অনুতোষের ছেলে হয়তো একশতে একশ পেয়ে যাবে। এসব চিন্তা কিন্তু আমার অস্বস্তিটাকে সরাতে বিনুগাত সাহায্য করে না। বাপ হিসেবে যে আনন্দ হয় তার সঙ্গে একটা আলাদা মানুষ হিসেবে কোন সম্পর্ক নেই এটা কি করে বোঝাই?

আমার ফ্ল্যাট, স্ট্রী এবং ছেলেকে নিয়ে আমি আছি আবার নেইও। সেই যে থাকবে কিন্তু জড়াবে না সেই গোছের ব্যাপার। ওরা ওদের মত আমি আমার—বেশ আছি। এই অবধি শোনার পর আপনারা আমাকে একটি ঘুমখোর অফিসার হিসেবেই ভাবছেন। আর যা যা প্রথমে বলেছিলাম তার কোন সূত্র পাননি। দেখুন, ঘুমখোর শব্দটা এখন আর চলে না। সেই ছেলেবেলায় শালা শব্দটা উচ্চারণ করতে আমরা লজ্জা পেতাম, ভয় হত বড়রা শুনে ফেললে আশু রাখবে না। এখন তো জলভাত হয়ে গিয়েছে। শালা বললে কেউ আর রাগ করে না। কলেজের মেয়েরাও নিজেদের মধ্যে শব্দটা অনায়াসে উচ্চারণ করে। তেমনি ঘুমখোর কথাটাও জলো হয়ে গিয়েছে। এই যে কামান কেনার জন্যে ঘুম নেওয়া হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তাতে কি রাজনৈতিক নেতাদের খুব অসুবিধে হচ্ছে? পুলিশ রাস্তায় সবার সামনে ঘুম নিচ্ছে। বিপদে পড়লে লোকে তো তার কাছেই যাচ্ছে, নাকি ঘুমখোর বলে বর্জন করছে? কোন কোন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা আন্দোলনের পাশাপাশি সেকশন থেকে ভাগের টাকা নিয়ে থাকেন এটাও সত্যি। কাজটা একটু তাড়াতাড়ি করে দেবার জন্যে কিছু টাকা খরচ করতে এখন শতকরা নব্বুইভাগ মানুষ রাজী আছেন। অন্যপথে টাকা নিতে খুব একটা আপত্তি তো দেখি না কার। তবে কেউ কম কেউ বেশি। মুশকিল হল নিজে নিলে দোষ নেই, অন্য কেউ নিলেই নীতির প্রশ্ন উঠবে। ধরুন সদাগরি অফিসে কাজ করেন,

বস আপনাকে ডেকে বলল একটা বিল খাতায় এনট্রি করবেন না, আপনাকে দুটো ইনক্রিমেন্ট দেব। কেউ জানল না আপনি কী করেছেন কিন্তু মাইনে বেড়ে গেল। সেটাও তো ঘুষ। অতএব আমি ঘুষ নিই বলে দোষ চাপালে আড়ালে আবড়ালে কথা চলতে পারে বটে কিন্তু সামান্যসামনি কেউ কিছু বলবে না।

এই যেমন সুদেব মুখার্জী। তরুণ তুর্কি নেতা ছিলেন সস্তর নালে। এখন অনেকগুলো ট্রেড ইউনিয়নের নেতা। সুদেব মানেই প্রতিবাদ এবং নাওভণ্ড তা সবাই জানেন। কাগজে ওঁর নাম তো প্রায়ই দেখতে পান। সেই সুদেব আমাদের এই মান্টিস্টোরিড বিল্ডিং-এই থাকেন। আলাপ আছে। রাজনৈতিক নেতাদের আমি সবসময় এড়িয়ে চলি। সরকারী চাকরির সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। সুদেবের ফ্র্যাটে খুব ভিড় হয় সকাল থেকেই। বোধহয় ওর পার্টির লোকজন আসে। আমি মাঝে মাঝে ভাবতাম লোকটা চাকরিবাকরি করে না, ব্যবসা আছে বলে শুনিনি, তাহলে চলে কি করে ওর? প্রায়ই কাগজে দেখি দিল্লী বোম্বে যাচ্ছে। অবশ্যই প্লেনে। প্লেনের যা ভাড়া তা দেয় কি করে? পার্টি দেয়? অসম্ভব। সুদেবের পার্টি এখন ক্ষমতায় নেই। তাছাড়া পার্টিতে অনেক নেতা। সবাই ঘন ঘন দিল্লী যায় এ ওর নামে নালিশ জানাতে। সেই যাওয়ার জন্যে প্লেনভাড়া নিশ্চয়ই পার্টি দেবে না।

একদিন একটা ছোকা এল আমার কাছে। সুদেবদা পাঠিয়েছেন। একটা উপকার করে দিতে হবে। আমার কাছে কেস আছে এমন এক পার্টির ব্যাপারে নরম মনোভাব দেখালে সুদেবদা খুশী হবেন। আমি বিপদে পড়লাম। লোকটার দু'মুঠুরী টাকার হদিস পেয়ে গেছি আমি। চাপ দিলে লাখখানেক আমার পকেটে আসবে। মাঝখানে এই প্রস্তাব। গেলাম সুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। আমাকে তিনি একটু বসতে অনুরোধ করলেন। চারজন লোক ছিল। প্রত্যেকেরই দিল্লীতে কিছু না কিছু কাজ আছে যা সুদেবকে করে দিতে হবে। সুদেবের না নেই। তবে প্লেনের টিকিট কিনে দিতে হবে। সেটা থাকবে ওপেন। চারটে প্লেনের যাতায়াতের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। তিনটে ফেরত দিলেই হাজার দশেক পকেটে এসে যাচ্ছে। বাকি একটায় চারজনের কাজ হয়ে যাবে। কাজ হলে কি পাবে সুদেব আমি জানি না। তবে আমাকে ওর অনুরোধ রাখতে হয়েছিল। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা যায় না। যদি দিন পালটায় তাহলে সুদেব আবার মস্ত্রীও হতে পারে কোন না কোন দিন। একে ঘুষ বলে কিনা আমি জানি না। কে কাকে ঘুষ দিল? আমিও কি সুদেবকে কাজটা করে আগাম দিয়ে রাখলাম না?

নিজের সম্পর্কে ভাল কথা বলা আমার অভ্যাস নেই। নিজেকে আমি আর পাঁচটা লোকের থেকে যথেষ্ট ভাল মনে করলেও ঢাক পেটাতে চাই না। আমার মন ভাল, শরীর স্বাস্থ্য ভাল। আর হ্যাঁ, উৎসাহী নারীদের প্রতি আমার বিশেষ ত্রীতি আছে। এই ব্যাপারটি নিয়ে আমার অফিসে ইদানীং খুবই ওপ্তান চলছে। অবশ্যই নিন্দে। বেশিরভাগ বসন্ততানের সক্রিয় হবার সাহসের অভাব হয় কিন্তু উঁকি মেয়ে অন্যের হবি দেখতে কেউ ছাড়ে না। প্রথমটা অপরাধ হলে দ্বিতীয়টা কেন হবে না? এ লাইনে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল গোস্বামী। না, গোস্বামীকে আমি দায়ী করব না, দোষ দেব না। ও শুধু ভগীরথের মত আমার ভীষনে একের পর এক গঙ্গা এনে দিয়েছিল। তারপর সরে দাঁড়ালেও স্রোতের ধারা আমাকে ছেড়ে যায়নি।

গোস্বামী এসেছিল মিসেস মদারামের হয়ে কেস করতে। সঙ্গে জাঁদরেল উকিল ছিল। মিসেস মদারাম চৌরসি এলাকার একটি থ্রী-স্টার হোটেলের মালিক। তখন আমি সরে এসেছি ওই জুরিসডিকশনে। ফাইল খুলে পার্টির ভ্রমা দেওয়া কাগজপত্র চোখ বুলিয়ে আমি গোটাচারেক প্রশ্ন করলাম এবং উকিল আর গোস্বামী মুখচাওয়াচাঘি করতে লাগল। ফাইল বন্ধ করে বললাম, 'এগুলোর জবাব নিয়ে আসুন আমি কেস করে দেব।' আমার ধাতটা এইরকম। কখনই নিজের মুখে পরস্যা চাই না। ফাঁদে পড়ে পার্টি নিজেই আমাকে অফার করে। তখন যেন অনুগ্রহ করছি এমন ভঙ্গি করে রাজি হই।

দুদিন পরে গোস্বামী একা এল। মাথা চুলকে বলল, 'স্যার, সারেরভার করছি ওগুলোর কোন জবাব নেই। আপনি বাঁচিয়ে দিন।'

'কিভাবে বাঁচাব?'

'আপনি জানেন স্যার। দশ হাজার এনেছি।'

'ওসব নিয়ে অফিসে আসেন কেন? আর আমি নেবো তাই বা কী করে ভাবলেন?'

গোস্বামী যেন মরমে মরে গেল। কাকুতি মিনতি করতে লাগল। আমার দয়া হচ্ছে দেখে আমাকে মিসেস মদারামের হোটеле নেমস্তন্ন করল। মিসেস নাকি বার বার করে বলে দিয়েছেন। হোটেল গিয়ে টাকা নিতে আমি একেবারেই রাজি নই। সি বি আই-কে ডেকে ফাঁদ পেতে রাখা অসম্ভব নয়।

আমার সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই এই ফাঁদে পড়েছেন। বেচারী ডি কে ধরের তো চাকরিই চলে গেল। কেসটা ছিল খুব ইন্টারেস্টিং। ধরের কাছে লিন্ডসে স্ট্রীটের সানচুয়ানির কেস ছিল। ভালমত অডিট করা ব্যালান্সশিট। ধর তার মধ্যেও ফাঁক ধরে ফেললেন। প্রায় দেড় লাখ টাকার গোলমাল। সানচুয়ানিদের মাথা খারাপ হবার উপক্রম। এই সময় ধরের কাছে বেনামী চিঠি আসতে লাগল। মহিলার হাতে লেখা সেইসব চিঠিতে সানচুয়ানির কোথায় কোথায় কালো টাকা আছে তার বৃত্তান্ত জানানো হচ্ছিল। ধর সানচুয়ানিকে ডেকে চিঠি দেখালেন। সানচুয়ানি স্বীকার করলেন চিঠিগুলো তাঁর স্ত্রীর লেখা। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর খুব বিরোধ চলছে। দুজনের বয়সের পার্থক্য অনেক। ভদ্রমহিলার বয়স্ক্রেপ্ত আছে যার পরামর্শে তিনি স্বামীর সর্বনাশ করছেন। তবে ওইসব তথ্যগুলোর সত্যতা নেই। ধর তখন মিসেস সানচুয়ানিকে সমন করলেন। তার ভাবাবে একটি ছেলে এসে জানান মিসেস অত্যন্ত পর্দানশীন মহিলা। তাঁর পক্ষে অফিসে আসা একটু মুশকিল ব্যাপার। বদলে যদি ধর ওঁদের বাড়িতে যান তাহলে স্বচ্ছন্দে কথা হতে পারে। ধর রাজী হলেন।

এক সপ্তাহেলায় সানচুয়ানির বাড়িতে পৌঁছালেন ধর। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সেখানে উপস্থিত। ধরের সামনে চিঠিগুলো নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রবল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। ধর থামাতে চাইলেন। তখন সানচুয়ানি ধরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অফার করলেন। মিসেস সানচুয়ানি একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললেন তাকেও পঞ্চাশ হাজার দিতে হবে। শেষ পর্যন্ত সানচুয়ানি এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। পুরো ব্যাপারটাই ধরের কাছে এমন বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছিল যে তিনি লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। পঞ্চাশ হাজারের দুটো প্যাকেট সানচুয়ানি দুজনকে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিসেস সানচুয়ানি তখন নিজের প্যাকেটটা ধরের হাতে দিয়ে অনুরোধ করলেন বাইরে অপেক্ষমাণ সেই ছেলেটির হাতে পৌঁছে দিতে যে তাঁর খবর নিয়ে ধরের সঙ্গে অফিসে গিয়ে দেখা করেছিল। কারণ তিনি তাঁর স্বামীকে বিশ্বাস করেন না। ধর রাজী হলেন। কথা শেষ করে তিনি যখন সানচুয়ানির বাড়ি থেকে বের হচ্ছেন ঠিক তখনই সি বি আই-এর লোকজন এসে গেল। ধরের কাছে একলক্ষ টাকা পাওয়া গেল যাতে আগে থেকে নই করা ছিল। জাল চিঠি, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া যে বানানো তা যখন ধর বুঝলেন তখন তিনি সি বি আই-এর দপ্তরে।

তিন-চারদিন গোপ্বামী আমার পেছনে ঘুরল। শেষদিন একটি সুন্দরী মহিলা এলেন ওর সঙ্গে। সুন্দরী অবাঙালী। মিসেস মসারামের আয়ীয়া। চমৎকার ইংরেজিতে বললেন, ‘আপনি হোটেল না যেতে চান, আমাদের বাড়িতে চলুন। এত বড় উপকার করলেন, একটু অনুগ্রহ করুন।’

উপকার তখনও করিনি। সবে অর্ডারটা ডিক্টেট করেছি। স্টেনোগ্রাফারকে। তখন দুপুর একটা। ডাবলাম ঘুরেই আসি। হোটেল যখন নয় তখন স্মৃতি কী? হোটেল মানেই আর পাঁচটা লোকের সামনে দিয়ে চুকতে হবে। জানাজানি কানাকানি হতে বেশি সময় লাগবে না। বাড়িতে গিয়ে যদি আমি ধরের মত বোকামি করে টাকাপয়সা না লিই, ওসব থেকে সাত হাত দূরে থাকি, তাহলে ভয়ের কিছু নেই। সুন্দরী, গোপ্বামী আর আমি ওদের গাড়িতেই চলে এলাম ক্যামাক স্ট্রীটে। লিফটে সাততলায় উঠে গোপ্বামী বেল টিপতেই কোলাপসিবল গেটের ওপাশের দরজা খুলল। একজন ঐঁড়া গোপ্বামীকে দেখে আপ্যায়ন করল। সুন্দরী তাঁকে মাসী বলে আলাপ করিয়ে দিল। মিসেস মসলরামের বোন। তিনি একটু বাদেই আসবেন। দুমিনিট বসার পরেই ঐঁড়া আমাকে বললেন, ‘আপনি যদি অনুগ্রহ করে পাশের ঘরে বসেন। আজ আমার ভানুরের এখানে আসার কথা। এক মিনিট কথা বলেই চলে যাবেন। বুড়োমানুষ তো, আপনাকে দেখে কৌতূহলী হতে পারেন।’ ঐঁড়া হাসলেন। কথা বললেন স্বচ্ছন্দ হিন্দিতে। এখানেই আমার খটকা লাগল। মিসেস মসারামের বোন অবশ্যই সিদ্ধি কিন্তু তিনি বোম্বেওয়ালীর মত হিন্দি বলছেন কী করে।

পাশের ঘরের ব্যবস্থাও খুব ভাল। গোপ্বামী বলল, ‘স্যার, একটু রিয়ার আনি?’

দুপুরে আমি মদ্যপান করি না। বিয়ারও নয়। তাছাড়া এখান থেকে অফিসে ফিরব। বললাম, ‘না। এখন নয়।’

ইঠাং সুন্দরী জিজ্ঞাসা করল, ‘আমি যেতে পারি?’

খুবই অবাক হলাম। কিন্তু সম্মতি দিলাম। ওর জন্য বিয়ার এল। খাওয়া শুরু করতেই বাইরের বেল বাজল। ঐঁড়া দরজায় এসে গোপ্বামীকে ডাকলেন। তারপর সুন্দরীকে বললেন, ‘উনি এসে গিয়েছেন। তোমরা দরজা বন্ধ করে বসো।’

গোপ্বামী সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেলে সুন্দরী দরজা বন্ধ করে বাকি বিয়ার এক চুমুকে শেষ করল।

ওর ধরন দেখে বুঝতে পারলাম নিয়মিত অভ্যাস আছে। বোতল নামিয়ে সুন্দরী পাশের টয়লেটে চলে গেল। হঠাৎ আমার খুব ভয় হল। এটাও তো ফাঁদ হতে পারে। যে লোকটা এল সে পুলিশ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাকে ফাঁদে ফেলে গোস্বামীর কী লাভ? এখনও তো ওরা অর্ডার হাতে পায়নি। আর আমি এক ভদ্রবাড়িতে বেড়াতে এসেছি। টাকা পয়সা যা নেবার তা আগেই নিয়ে নিয়েছি। দোনমনা করছিলাম এই সময় সুন্দরী বাইরে বেরিয়ে এলেন। ইংরেজি ছবিতে বিকিনি পরা যুবতীদের দেখেছি। এখন তার একটি সামনে। সোজা এসে আমার গলা গড়িয়ে ধরল। তার ঠোটে উর্বশীর হাসি।

আমি জানতে পারলাম। সুন্দরীর নাম পুলিশের খাতায় নেই। সে একটি সদাগরি অফিসে চাকরি করে। সপ্তাহে একদিন এই আন্টির বাড়িতে আসে। সেদিন আন্টি কাস্টমার ঠিক করে রাখে। পাঁচশো তার, বাকিটা আন্টির। চার দুপুরে রোজগার করলে তার হাত খরচ চলে যায়। শ্বশুর-শাশুড়ি আছে। স্বামী জাহাজে কাজ করে। বিকেল বিকেল বাড়ি ফিরে যায়। সন্ধ্যার পর মরে গেলেও থাকবে না। মাসে দুহাজার হলেই যথেষ্ট। এই ঘরের বাইরে গেলে হঠাৎ দেখা হলে কাস্টমারদের চিনতে পারে না। তার নামটা ঠিক নয়, ঠিকানা আন্টিকেও বলেনি। এবং এরাও সেটা জানতে চায় না।

সুন্দরীকে একটু সরে বসতে বললাম। সে খুব অবাক হল। তাকে বললাম জড়িয়ে বসলে সৌন্দর্য দেখা যায় না! সে যে খুব সুন্দরী তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু সেটা দেখতে হলে একটু দূরে বসতে হবে। এতে সুন্দরী খুব খুশী হল। একেবারে প্রে-বয় ম্যাগাজিনের মডেলের মত খানিকটা দূরের সোফায় পোজ দিয়ে বসে নিজেদের চলে বিনী কাটতে কাটতে বলল, 'হিন্দি টিভি সিরিয়ালে আমাকে নামাতে চেয়েছিল, জানেন? শুধু শাশুড়ির আপত্তিতে চাপ নষ্ট করলাম।'

সুন্দরীকে দুচোখ ভরে দেখার জন্যে নয়, নিজেদের বাঁচানোর জন্যেও ওকে সরাতে বাধ্য হয়েছিলাম। প্রতিটি মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল এরা আমাকে ব্ল্যাকমেইল করছে। একজন মহিলার সঙ্গে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে তার ছবিও তুলে রাখতে পারে। এরকম ভয় মাথায় থাকলে কোনভাবেই মন প্রফুল্ল হয় না।

সুন্দরী জিজ্ঞাসা করল, 'দেখা হয়েছে?'

মাথা নাড়লাম, 'তুমি যা বললে তা ঠিক?'

'কি ব্যাপার?'

'এই তোমার পারিবারিক পরিচয় সম্পর্কে?'

'মিথ্যে বলব কেন? আমি তো কোন নামধাম বলিনি যে আপনি সেখানে গিয়ে হাজির হবেন?'

'তোমার স্বামী এসব জানেন?'

'পাগল! তবে আমার স্বামীটি জাহাজে চাকরির সুবাদে যেসব দেশে যায় সেখানে গিয়ে সাধু সেজে থাকে তা আমিও বিশ্বাস করি না। কিন্তু কেউ কারও কাছে কখনই স্বীকার করব না। তা হলটা কি, আজ আপনি কি শুধু দেখেই যাবেন?'

হাসলাম, 'হ্যাঁ। কোন কোন দেখা বড় আনন্দের।'

সুন্দরী ঠোট বেঁকাল, 'যা ইচ্ছে। আমাকে মিনিমাম আধঘন্টা এই ঘরে থাকতে হবে। এটাই নিয়ম।'

গোস্বামী যেন মন্দির থেকে বেরুচ্ছে এমন ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে নিচে নেমে খুবই বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন অসুবিধা হয়নি তো? মিসেস মঙ্গারাম বার বার বলেছেন সতর্ক থাকতে। যদি ক্রটি হয় উনি আস্ত রাখবেন না।'

'এই মহিলাকে পেলেন কি করে?'

'সবই তো বুঝতে পারছেন স্যার। উনিও মিসেস মঙ্গারামের কেউ নন। আপনার মত মানী মানুষকে স্পেশাল ব্যবস্থা করতে হাউসওয়াইফকে আনা হল।'

একবার ফুটো পেলে জলের চাপ সেটাকে গুহা করে ফেলতে পারে। আমারও সেই অবস্থা হল। ওই আন্টির কল্যাণে আমি আরেক জীবন দেখলাম। প্রতিদিন দুটো করে মহিলা তাঁর ফ্ল্যাটে আসে। আন্টির কাছে কাস্টমারদের টেলিফোন নম্বর আছে। তিনি পালা করে তাদের খবর দেন। এই মহিলারা কারও স্ত্রী, কারও মা, কারও মেয়ে। এদের বয়স বাইশ থেকে বিয়াল্লিশ। একদম গরিব পরিবার থেকে যেমন আসতে তেমন বিস্তবতীও বাদ যাচ্ছে না। এদের প্রত্যেকের পারিবারিক জীবন অটুট। কেউ সন্ধ্যার পরে বাড়ির বাইরে থাকে না।

আন্টির সঙ্গে আমার ভাব হল। প্রৌঢ়ার সঙ্গে আলাদা কথা বলতে বলতে ইতিহাস স্পষ্ট হল।

ভদ্রমহিলার বাড়ি বোম্বোতে। সেখানে এক বাঙালী যুবকের সঙ্গে আলাপ। এবং প্রেম। বাড়ির অমতে বিয়ে করে কলকাতায় আসেন। সংসার ভালই চলছিল। স্বামীর বন্ধু-বান্ধবরা আসত। এবং হঠাৎই জানা গেল ভদ্রলোকের এটা দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথমপক্ষ আদালতে মামলা করেছেন। কেস চলল। মানুষটার ভালবাসা দেখে উনি তাকে প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত করেননি। বরং গ্রেপ্তারের পর জামিনের ব্যবস্থা করেছেন। এই অবস্থায় ভদ্রলোক আত্মহত্যা করলেন। তখন আন্টি অগাধ জ্বলে। কলকাতায় স্বামীর কয়েকজন বন্ধুকে ছাড়া কাউকে চেনেন না। বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ। সেই সময় স্বামীর বন্ধুরা ফ্ল্যাটে আসত। বাড়িওয়ালা এতে আপত্তি করলেন। স্বামীর বন্ধুদের মধ্যে একজন প্রকৃতই বিদ্‌শালী। ভদ্রলোক তাঁর প্রতি বেশ দুর্বল। ওই অবস্থায় তিনি নিজেকে আটকাতে পারলেন না। ক্যামাক স্ট্রিটের এই ফ্ল্যাটটি ভদ্রলোক আন্টির নামে কিনে এখানে নিয়ে এলেন তাঁকে। প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় আসার বসত। ভদ্রলোকের বন্ধুরা বান্ধবীদের নিয়ে আসতেন। কিন্তু ঈশ্বর এখানেও বাদ সাধলেন। ভদ্রলোকের পরিবার এই ঘটনাটি বরদাস্ত করতে রাজি নন। বাধ্য হয়ে তিনি আন্টির সঙ্গে সম্পর্ক ভাগ করলেন। এদিকে বন্ধুরা বান্ধবীদের নিয়ে নিয়মিত আসা যাওয়া করতে লাগল। তারা মদ খায়, আড্ডা মারে, প্রয়োজনে আড্ডাল খেঁজে। এদিকে আন্টির হাতে একটিও পয়সা নেই। শেষ পর্যন্ত একজনের পরামর্শে তিনি ওই ফ্ল্যাটে আড্ডা মারার জন্যে প্রতি সন্ধ্যায় একশ টাকা দাবি করলেন। ফলে আনাগোনা অনেক কমে গেল। সন্ধ্যার বদলে দুপুরে আসতে লাগল কেউ কেউ। এবং এইভাবেই তিনি মোটামুটি সাচ্ছল্যের মুখ দেখলেন। পুলিশের ঝামেলা নেই। তাঁর কাছে বন্ধু-বান্ধব আসতেই পারে। কোলাপসিবল গেট লাগিয়েছেন যাতে কেউ চট করে ঢুকে পড়তে না পারে। তবে ইদানীং একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার কাস্টমার হয়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। সরল বিশ্বাসে নিশ্চয়ই নয়, তবে আন্টির বলা এই গল্পে সত্যের ভাগ নিশ্চয়ই বেশি। অবশ্য মিথ্যে বললে আমার কিছু যায় আসে না।

যেসব মহিলারা এখানে আসেন তাঁদের সঙ্গে আন্টির যোগাযোগ তাঁরাই করিয়ে দেন। একজনের মারফত আর একজন। কাস্টমারের সংখ্যাও এইভাবে বাড়ে। এই মেয়েদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানার আগ্রহ ছিল খুব। কিন্তু ওই একটি ব্যাপারে ওঁরা মুখ বন্ধ করে থাকতেন। কেউ যাদবপুর, কেউ বোদপুর পার্ক অথবা বালিগঞ্জ প্লেনের নাম করতেন। কিন্তু এগুলোও সত্যি বলে বিশ্বাস করতাম না।

এক বিকেলে প্রায় ছুটি হওয়ার মুখে আন্টি আমাকে ফোন করলেন। তিনি খুব বিপদগ্রস্ত, আমার সাহায্য চাইছেন। অফিসের টেলিফোনে জানতে চাইলাম কায়দা করে, বিপদটা কী ধরনের? তিনি বললেন যে বাইরের কোন ঝামেলা নয়, সমস্যা ভেতরের।

আমি স্বছন্দে না যেতে পারতাম। এতে আমার বিবেকের কাছে কোন কৈফিয়ত দেবার ছিল না। বরং ঝামেলার কথা শুনে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হত। যদি পুলিশ রেইড করে অথবা পাড়ার ছেলেরা— না, ও পাড়ায় পাড়ার ছেলের ব্যাপারটা নেই। কিন্তু এখনও কারণ জানি না, আমি ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছে গেলাম। বাড়িটার বাইরে পুলিশের কোন ড্যান নেই। লিফট থেকে নেমে বেল টিপলাম। ঠিক তখন নিজেই খুব নার্ভাস বলে মনে হল। আন্টি দরজা খুলে আমাকে দেখে যেন বেঁচে গেলেন। কোলাপসিবলের তাল খুলে ভেতরে ঢুকিয়ে বললেন, ‘সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। কী করব বুঝতে পারছি না।’

তিনি আমাকে সোফায় বসিয়ে বৃত্তান্ত জানালেন। আজ দুপুরে কোন কাস্টমার আসেনি। শিউলী নামের একজন হাউজওয়াইফ এসেছিল দুপুরে। আন্টি দু-একজনকে টেলিফোন করবেন তার উপায় ছিল না কারণ তাঁর ফোন আফ্রা জাচল। শিউলি মাঝে মাঝে ভোদকা খায়। ওতে গন্ধ কম বের হয়। দুই-এর বেশি ওঠে না। সময় কাটাবার জন্যে তিনি ভোদকার বোতল নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে একটু গুয়েছিলেন। এখানে টেপে গান বাজছিল তার শিউলি সেটা শুনছিল। ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আন্টি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে এঘরে এসে দ্যাখেন শিউলি মাতাল হয়ে গিয়েছে। একা একা ঘোঁরকের মাথায় সে গোটাছয়ক ভোদকা খেয়ে ফেলেছে। সে নাকি এমনই মাতাল যে ইঁটতে পারছে না। কথা জড়িয়ে গিয়েছে। তিনি ওকে জোর করে বমি করার চেষ্টা করিয়ে বিফল হয়েছেন। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শিউলি সাধারণত পাঁচটার মধ্যে বাড়ি ফেরে। একটি মাতাল মেয়ে তাঁর ফ্ল্যাট থেকে বেরলে যে দুর্নাম হবে তা মানতে রাজি নন আন্টি। এফেক্টে কি করা যায়? কোন উপায় না দেখে নিচের ওষুধের দোকানে গিয়ে আমাকে ফোন করলেন। আফ্রাবাজে লোককে ব্যাপারটা না জানিয়ে আমাকে বলাই উচিত হবে বলে তিনি মনে করেছেন।

বললাম, 'ঘুমোতে বলুন। ঘুমিয়ে নেশা চলে গেলে বাড়িতে যাবে।'

'তখন তো অনেক রাত হয়ে যাবে। গিয়ে বলবে কী? বাড়িতে তো কৈফিয়ত দিতে হবে!'

'একটা কিছু বলবে। মদ খাওয়ার সময়ে মনে রাখা উচিত ছিল।'

আন্টি মানলেন না, 'আমি ওকে জানি? বড় ভাল মেয়ে। শিক্ষিতা। কখনই দুই-এর বেশি খায় না। আজকেরটা অ্যাকসিডেন্ট। আপনি ওকে সাহায্য করুন।'

'কিভাবে?'

'আপনি যদি ওকে নিয়ে লিফটে নামেন তাহলে কেউ চট করে সন্দেহ করবে না। আপনার গাড়িতে চাপিয়ে ফাঁকা জায়গায় ঘোরালে হাওয়া লেগে ওর নেশা কেটে যাবেই। তখন না হয় ওকে বাড়ির কাছে ছেড়ে দেবেন। আপনি যদি দয়া করে এই কাজটা করেন তাহলে আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।'

বুঝলাম আন্টি চাইছেন যেনতেন প্রকারে মেয়েটির এই ফ্ল্যাটের বাইরে ভদ্রভাবে বের করে দিতে। এই প্রস্তাবে রাজি হওয়া আমার উচিত নয়। কিন্তু কৌতূহল হল। আন্টিকে বললাম ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই প্রথমে।

পাশের ঘরে আন্টির সঙ্গে ঢুকে আমি চমকে উঠলাম। এতদিনে শুনেছি কলকাতা শহরে এরকম আন্টির বাড়ির সংখ্যা অগুনতি। এখানে যে সমস্ত মেয়ে দিব্যভ্রমণে আসে তাদের কলগার্ল বলতে পারা যাবে না। এই দুপুরটুকু বাদ দিলে এরা বেশি রকমের গৃহবধূ বা কন্যা। কিন্তু যে ভদ্রমহিলা খাটে শুয়ে আছেন তাঁকে ঈশ্বর সব রকম আরাম দিয়ে বড় করেছেন। সৌন্দর্য এবং স্বাস্থ্যের সঙ্গে সংস্কৃতি মিশে থাকায় আলাদা চরিত্র তৈরি হয়েছে। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন বা বইমেলায় হঠাৎ বড় দল বেঁধে এরা পারিবারিক ভ্রমণে আসেন। কিংবা উচ্চতর মহিলা সংগঠনে এই চেহারা দেখা যায়। শিউলি চোখ বন্ধ করে পড়েছিলেন। আন্টি তাকে ডাকলেন, 'কেমন লাগছে?'

'ভাল না। আমি বাড়ি যাব।' জড়ানো গলার সুর।

'এই অবস্থায় যেতে পারবে?'

'না। না।' মাথাটা দুপাশে নড়তে লাগল।

এবার আমি ঝুঁকে বললাম, 'মাগ করবেন, আপনি বমি করার চেষ্টা করুন।'

'হবে না, হচ্ছে না।'

আমি আন্টিকে বললাম ফ্রিজ থেকে বরফ আনতে। আন্টি এনে দিলে সেই বরফ ওঁর মাথায় কপালে ঘষতে লাগলাম। উনি আপত্তি করছিলেন। ওঁকে উপড় করে শুইয়ে মাথাটা খাটের বাইরে আনলাম। তারপর ধীরে ধীরে কোমরে চাপ দিতে লাগলাম। আন্টি মন্তলবটা বুঝতে পেরে টয়লেট থেকে একটা বালতি এনে মুখের নিচে রেখেছিলেন। কয়েকবারের চেষ্টায় বমি বেরিয়ে এল। হড়হড় করে ময়লা জল বালতিতে পড়তে লাগল। ভদ্রমহিলা গোঙাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওঁর মুখ মুছিয়ে আন্টি আবার শুইয়ে দিলেন। বরফ জলে ওঁর জামা ভিজে গিয়েছিল। এবার শিউলির কান্না আরম্ভ হল। নিশ্চয়ই তাঁর স্বামী বাড়িতে এসে গিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'উনি কখন বাড়িতে ফেরেন? দেরিও তো হতে পারে।'

'না। ও কক্ষনো দেরি করে না। সবকিছু নিয়মাবদ্ধ।' ককিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা, 'এত নিয়ম মেনে চলে বলেই আমার জীবনটা শুকিয়ে গেল।'

'এবার আপনি হাঁটতে পারবেন?'

শিউলি চেষ্টা করলেন। বমি করায় শরীর হালকা হয়ে গেলেও নেশা যায়নি। দাঁড়াতে গিয়ে টলে গেলেন। আন্টিকে বললাম ওঁকে এক কাপ কালো কফি দিতে। আন্টি চলে গেলে দুহাতে মুখ ঢাকলেন শিউলি, 'কী লজ্জা! কী লজ্জা!'

'খেতে গেলেন কেন?'

'মাথার ঠিক ছিল না। খুব রাগ হচ্ছিল।'

'রাগ? কেন?'

'আমার আলই মায়ের কাছে দুহাজার টাকা পাঠানোর দরকার ছিল। পাঁচশো কম পড়ায় এখানে এসেছিলাম। আমার স্বামীর কাছ থেকে আমি মরে গেলেও টাকা নেবো না মায়ের জন্যে। কী করব ভেবে পাচ্ছিলাম না, তাই!'

'গয়না বিক্রি করতে পারতেন?'

‘প্লীজ উপদেশ দেবেন না। আমি এখন কী করব?’

‘এত ভয় পাচ্ছেন কেন?’

‘ও বেশি দেরি হচ্ছে দেখলে পুলিশে ফোন করবে।’

‘সে কি? এখনই?’

‘হ্যাঁ। শুনবে আমি দুপুরে বেরিয়েছি। মাঝে-মাঝেই বেরোই।’

‘কি করে জানবে?’

‘খোঁজ করলে জানতে পারে।’

‘আপনি তো আপনার মায়ের কাছে যেতে পারেন?’

‘না। যাব না জানে। ওর নিষেধ আছে। আমি কখনও যাই না তাই।’

‘আপনি অনর্থক ভয় পাচ্ছেন। কেউ এত চট করে পুলিশে খবর দেয় না।’

হঠাৎ যেন খেয়াল হল। শিউলি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কে?’

‘আপনার বন্ধু ভাবুন।’

‘না, আমার কোন বন্ধু নেই।’

‘এবার নাহয় হল।’

‘অসম্ভব।’ তিনি হাঁটতে গিয়ে টলে গেলেন, ‘উঃ, আমার মাথা ধরেছে।’

এই সময় আন্টি আমাকে বললেন, ‘ভাগ্যিস আপনি এলেন, নইলে কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না।’

উঠে দাঁড়ালাম, ‘ওঁকে আরও ঘণ্টাভিনেক রেখে সুস্থ করে ছাড়ুন।’

‘না।’ চিৎকার করে উঠলেন শিউলি, ‘তাহলে এ জীবনেও বাড়িতে ঢুকতে পারব না।’

আন্টি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কোথায় থাকো তুমি?’

শিউলি তাকালেন, ‘লেক গার্ডেন্স।’

‘লেক গার্ডেন্সে কোথায়?’

‘ঠিকানা বলব না।’

হাসলাম, ‘নামটাও কি ঠিক?’

‘না।’

আমি উঠে দাঁড়ালাম। এবার আমার বিরক্ত লাগছিল। মাতালদের আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। তার ওপর মেয়েরা যদি মাতাল হয় তাহলে তো আরও অসহ্য। প্রথম পাঁচ দশ মিনিট হয়তো মজা লাগে কিন্তু তারপর রাগ হুবেই। আন্টিকে বললাম, ‘এই মহিলা কোনরকম কো-অপারেশন করছেন না। একে কি সাহায্য করব আমি। আমি চলি।’

আন্টি হাতছোড় করলেন, ‘রাগ করবেন না। নিজের নাম-ঠিকানা এরা নিরাপত্তার কারণেই বলে না। একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। এই আমার কাছে আসে অথচ আমিই এদের পরিচয় জানি না। তাছাড়া জানার দরকারই বা কি?’

‘এখন যদি ইনি মরে যান তাহলে পুলিশকে কি বলবেন? পরিচয় তো দিতে হবে?’

আন্টি খুব নার্ভাস হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। আমাকে মিনতি করলেন, ‘একটু দাঁড়ান প্লীজ।’

তারপর এগিয়ে গিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ওঁকে ধরে নিচে নামতে পারবে? ওঁর গাড়ি আছে, পৌঁছে দেবেন। বড় অফিসার উনি। কোন ভয় নেই।’

‘কোন ডিপার্টমেন্টে আছেন আপনি?’ শিউলি প্রশ্ন করলেন।

নেশা সামান্য কমলেও শিউলির এরকম প্রশ্নে খুব অবাক হলাম। দুপুর-বিলাসিনীদের কী প্রয়োজন এই তথ্য জানার? বললাম, ‘আপনি যেমন সত্যি কথা বলছেন না তেমনি আমিও তো মিথ্যে বলতে পারি।’

‘আপনি কেন মিথ্যে বলবেন?’ আন্টি জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি হাসলাম, ‘কথা হচ্ছে ওঁর সঙ্গে। উনি নিজের সঠিক পরিচয় না দিয়ে কি করে আমার কাছে সত্যি কথা আশা করেন!’

শিউলি অথবা অন্য নামের মহিলার নেশা এখন বেশ কিছুটা তরল। আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘আপনি আমাকে ল্যাপডাউন সাদার্ন অ্যাক্টিভিটির মোড়ে পৌঁছে দিন, সেখান থেকে আমি রিকশা নিয়ে চলে যাব। কি হবে আজ কে জানে! কেন মরতে খেলাম।’

বললাম, 'দেখুন, আমি একজন অস্বাভাবিকলশীলা মহিলাকে লিফট দিতে পারব না। পুলিশ যদি ধরে তাহলে আপনার সম্পর্কে কিছুই বলতে পারব না।'

'পুলিশ কেন ধরবে?' শিউলি চমকে উঠল।

'আপনিই ভোঁ বললেন আপনার স্বামী পুলিশকে জানাতে পারেন।' মাথা নেড়ে আশ্চর্যে বললাম, 'উনি ভাল হয়ে যাচ্ছেন, আমি এবার চলি?'

'না, শ্রীজ যাবেন না।' আত্ননাদ করে উঠলেন শিউলি, তারপর আশ্চর্যের হাত ধরলেন, 'আপনিও চলুন সঙ্গে। তাহলে কেউ সন্দেহ করবে না।'

আশ্চর্য প্রবল আপত্তি জানালেন। তার পক্ষে ফ্ল্যাট ছেড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। শিউলি আমার দিকে কাতর চোখে তাকালেন, 'আপনাদের সঠিক পরিচয় বলে দিলে আমি ভবিষ্যতে বিপদে পড়তে পারি, পারি না?' হাসলাম, 'আপনাকে ব্র্যাকমেন করব না। ঠিকানা জানানোর দরকার নেই, নাম বলুন।'

শিউলি একটু ভাবলেন, 'দময়ন্তী।'

'বাঃ, সুন্দর নাম। এবার উঠতে পারবেন?'

'একা হাঁটতে পারব না।'

'আমার হাত ধরুন।'

আশ্চর্য ওঁর জামাকাপড় ঠিক করে দিয়ে গেট খুলে দিলেন। তিন পা হাঁটার পরই বললাম ওঁর পক্ষে দুপায়ে ভর রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। লিফটের কাছে পৌঁছে যাওয়ায় আশ্চর্যের ফ্ল্যাটের গেট ও দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শিউলির মাথা আর ঘাড়ের ওপর সোজা থাকছে না। হাত ধরেও স্থির থাকতে পারছেন না উনি। বললাম, 'কিছু মনে না করলে আপনাকে সোজা রাখতে পারি।'

'লিফটম্যান এবং নিচের লোকজনের সামনে আপনার সোজা থাকা খুব দরকার।'

শিউলি ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ অনুমতি দিল। আমি ওঁর কাঁধ জড়িয়ে শরীরের সঙ্গে জুড়ে দিতেই ও সোজা হল। লিফট এসে গিয়েছিল। দরজা খুলতেই বললাম, 'চল।' বৃদ্ধ লিফটম্যান একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। উদকায় যতই গন্ধ কম হোক লোকটার নাকে না যাওয়ার কথা নয়। ভাগ্যিস অন্য ফ্লোর থেকে কেউ ওঠেনি। নিচে নেমে ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে চলে এলাম। এই অবধি ঠিক ছিল। কিন্তু কোন মহিলাকে জড়িয়ে ধরে কেউ ড্রাইভিং সিটের দরজা খোলে না। অথচ ওকে গাড়িতে হেলান দিয়ে রাখলেও সোজা থাকবেন না। অগত্যা দরজা খুলে আবার ইঞ্জিনের সামনে দিয়ে ঘুরে পাশের সিটে বসিয়ে দিলাম। এটুকু ঘটনাই অনেককে যে কৌতূহলী করে তুলছে তা বুঝতে পারলাম। এখন কয়েক মাস এদিকে আসা যাবে না। গাড়ি স্টার্ট করে একটু স্থিতি হল। আপাতত কোন ভয় নেই। সোজা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ওঁকে নামিয়ে দিলে কেউ আর আমাকে ছুঁতে পারবে না। দেখলাম সিটে বসে জানলায় মাথায় রেখেছে শিউলি। হেসে বললাম, 'ভয় নেই। পুলিশ আপনার হৃদিস পাবে না। এ দেশের পুলিশ অত সচল নয়।'

'ও বললে হবে।' গলার স্বর এখনও জড়ানো।

চমকে উঠলাম। শিউলির স্বামী কি চাকরি করেন? পুলিশে কি? সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম। উনি উত্তর দিলেন না।

বিরক্ত হলাম। যেতে উপকার করছি অথচ—। এখন এর এমন অবস্থা যে নামিয়ে দিলে নির্মাণ লোকে বুঝতে পারবে মদ খেয়েছে। মায়া হল। বললাম সেটা। কিন্তু উনি মাথা নাড়লেন, 'আমি ঠিক আছি। আটটা বেজে গেছে। আমি বাড়িতে যাব।'

ল্যান্ডাউন এবং সাদার্ন অ্যাভিনিউর মোড়ে পৌঁছোতে বেশি সময় লাগল না। শিউলি সেটা বুঝতে পারেননি। ডেকে মনে করিয়ে দিতে দরজা খুলে নামলেন। সামনেই একটা রিকশা দাঁড়িয়েছিল। কোনমতে নিজেকে তার সিটে টেনে তুললেন। আমার দিকে তাকালেন না। একটাও ধন্যবাদ না।

আমি ধীরে ধীরে গাড়িটা নিয়ে লেকের বুকেরেরা রাস্তা ধরে রিকশার পেছন পেছন চললাম। রেল ক্রসিং-এ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকায় সুবিধে হল। দু'হাতে রিক্সার দুটো হাতল ধরে সোজা হতে চাইছেন শিউলি। কেউ অনুসরণ করছে কিনা তা দেখার মত মনের অবস্থা নেই। গেট খুলল। রিক্সার পেছনে একটা ট্যাগ। তার পরে আমি। ট্যাগের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। পেছনের গাড়িগুলো আমাকে হর্ন দিচ্ছিল পাশ কাটানোর জন্যে। কিন্তু আমি কর্ণপাত না করে রিক্সাটাকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

লেক গার্ডেনের প্রান্তে যে বাড়িটার সামনে রিকশা দাঁড়াল ঠিক তার গায়ের বাড়িটাই আমাদের এক সহকর্মীর বাড়ি। দু'বার নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছি। আমি আর দাঁড়ালাম না। বাড়িটার গায়ে লেখা আছে সুখনীড়। সুন্দর দোতলা বাড়ি। শিউলি অথবা দময়ন্তী যেভাবে রিকসা থেকে নামল তাতে লুকোবার কিছু নেই। আমি আর দাঁড়ালাম না। এই ভদ্রমহিলার চেহারার সঙ্গে বাড়িটার চমৎকার মিল রয়েছে। ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই সহকর্মীর বাড়িতে গিয়ে কথা বলি। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম।

পরদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমাদের পাশের বাড়িতে কে থাকে?'

সে অবাক হল, 'কোন পাশে?'

'বাঁ দিকে!'

'কী ব্যাপার বল তো?'

আমি মিথ্যা কথা বললাম, 'শুনলাম ঐ বাড়িতে ফ্ল্যাট খালি হচ্ছে।'

'দূর! ওটা ফ্ল্যাট বাড়িই নয়!'

'তাই নাকি?' তাহলে কি ভুল হল!'

'ভদ্রলোক আই পি এস অফিসার ছিলেন। মারা গিয়েছেন। ছেলেটা রেস আর মদে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে। ব্যবসা করে শুনেছি। চেহারা দেখে মনে হয় আয় খুবই কম। বউ ওকে ছেড়ে গিয়েছে। কিন্তু এমনই ছেলেটার কপাল প্রতি মাসে বউ এসে সংসার চালাবার খরচ দিয়ে যায়।'

'বউ কোথায় থাকে?'

'বাপের বাড়িতে। বুড়ি শাশুড়ীর জন্যে নাকি এটা করে বউটা।'

আমি আর কথা বাড়াইনি। কিন্তু ছবিটা যে বদলে গেল। প্রতি মাসে ওই মহিলা দুই হাজার টাকা কার জন্যে রোজগার করেন? মাতাল অবস্থাতেও নিজের গল্পটাকে একদম উলটোভাবে বলে গেছে তখন। এ আর এক রকমের জীবন। বিশেষণের বড় অকুলান ওই জীবনের জন্যে।

আন্টির টেলিফোন এল দিন সাতেক বাদে। এতদিনে যন্ত্রটা সারানো হয়েছে। অফিসের ফোনে সব কথা বলা ঠিক নয় তা ভদ্রমহিলা জানেন। তবু আমাকে সেদিনের উপকারের জন্যে অনেকবার ধন্যবাদ জানানেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'দময়ন্তী বা শিউলি আর আপনার কাছে এসেছেন?'

আন্টির হাসি শুনলাম, 'আজ এসেছে। সেদিনের ব্যবহারে খুব লজ্জা পেয়েছে। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়।'

বললাম, 'অত দূরে তো এখন যেতে পারব না। চারটে নাগাদ উনি যদি আধ ঘণ্টার জন্যে ফুরিসে আসেন কথা হতে পারে।'

চাপা গলায় আন্টি মহিলার সঙ্গে কথা বলে জানানেন উনি আসছেন।

ফুরিসে পৌঁছে দেখলাম মহিলা ইতিমধ্যে এসে গিয়েছেন। আজ ওঁকে অনেক সতর্কিত এবং টাটকা দেখাচ্ছে। নমস্কার করতেই প্রতিমস্কার জানানেন। হেসে বললেন, 'এভাবে আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না কিন্তু মনে হল আপনাকে ধন্যবাদ জানানো আমার কর্তব্য।'

বললাম, 'ওটা এমন কিছু ব্যাপার নয় শিউলি দেবী।'

'আমার নাম কিন্তু দময়ন্তী।'

'বেশ। চা খাবেন?'

'খেতে পারি।'

আমি বেয়ারাকে ডেকে চা আর স্ন্যাক্স বললাম। তারপর সরাসরি প্রশ্ন করলাম, 'আমাকে বন্ধু ভাবতে পারেন?'

'নইলে এলাম কেন? আমি কারও সঙ্গে বাইরে দেখা করি না।'

'বেশ। যে স্বামীর বাড়িতে সম্মান পাননি বলে থাকতে পারেননি সেই স্বামীর সংসারের জন্যে এভাবে উপার্জন কেন করছেন?'

চমকে উঠলেন মহিলা। তারপর ধীরে ধীরে নুইয়ে পড়লেন। একটা বড় গাছের গোড়া কেটে ফেললে ডালপালা বোধহয় এইভাবেই মাটি ছোঁয়।

নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি জানানেন কি করে?'

'জেনেছি। কিন্তু আপনার পরিচয় জানিয়ে নয়।'

‘কাউকে কিছু বলেননি তো?’

‘না। এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন।’

ভদ্রমহিলা মুখ ফেরালেন, ‘আমি টাকা না দিলে ওরা না খেয়ে থাকবে।’

‘সেই দায়িত্ব আপনার নয়।’

‘সব কিছু তো খাডায় কলমে হয় না। আমার শ্বশুর আমাকে খুব ভালবাসেন। উনি যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন আমাকে এটা করতেই হবে।’

‘আপনার স্বামী জানেন?’

‘হ্যাঁ। তবে কিভাবে টাকা দিচ্ছি তা জানে না। বাপের বাড়ির পাশে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে বাচ্চাদের ফ্রেস করেছি। তা থেকে আমার আর আমার ছেলের খরচ মোটামুটি চলে যায়। ওরা ভাবে ওই রোজগারের টাকাই ওদের দিই আমি।’

‘কেন আপনি শ্বশুরবাড়ি ছাড়লেন?’

দময়ন্তী তাকালেন, ‘পাড়ার অনেকেই তো জানতো। কেউ বলেনি আপনাকে?’

‘আমি জিজ্ঞাসা করতে যাইনি।’

‘তাহলে আমার শ্বশুরবাড়ি ছাড়ার কথা কোথায় শুনলেন?’

‘আমার এক সহকর্মী আপনাদের পাড়ায় থাকেন। তিনি গল্পচলে বলছিলেন যে আপনার স্বামী মাতাল এবং তাদের অত্যাচারে আপনি বাড়ি ছেড়ে গিয়েছেন। উনি আপনার নাম অবশ্য বলেননি।’

‘ও। হ্যাঁ। আমার ওপূর অত্যাচার হত। বরপণ নিয়ে যে ঝামেলা শুরু হয়েছিল তা মেটেনি। আমার সেই স্বামী আমাকে ব্যবহার করে অর্থ রোজগার করতে চেয়েছিলেন, আমি রাজি হইনি। তাই অত্যাচার। ফলে বেরিয়ে গিয়েছিলাম ছেলেকে নিয়ে। ভাইরা ভেবেছিল তাদের গলগ্রহ হবে। কিন্তু আমি হইনি।’

‘তাহলে সেদিন পুলিশের ভয় পেয়েছিলেন কেন? কেন মিথ্যে গল্প বলে আন্টির বাড়ি থেকে একা বেরুতে চাননি?’

‘আপনাদের সত্যি কথাটা সেদিন বলা যেত না। শ্বশুরবাড়িতে মাতাল অবস্থায় টাকা দিতে যেতে চাইনি আমি। প্রতিবাদ জানিয়ে মাথা সোজা রেখে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম একদিন। কিন্তু ঈশ্বর সেদিন সেটাও কেড়ে নিলেন।’

‘কি রকম?’

‘আমার সেই স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। শ্বশুরের হাতে পনেরোশ’ টাকা দিতে তিনি নিলেন। তারপর করুণ গলায় বলেছেন—বউমা, তুমিও যাচ্ছ? আমি মাটিতে মিশে গিয়েছিলাম। কী লজ্জা।’

চা এল। কিছুক্ষণ চুপচাপ খেলায়। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, ‘রোজগারের এই পথ পেলেন কি করে?’

‘আর কোন পথ ছিল না। ফ্রেসের টাকা শ্বশুরবাড়িতে দিলে নিজের খেতে পেতাম না। ছেলেকেও বঞ্চিত করতে হত। এই বয়সে কেউ আমাকে দু-হাজার টাকার চাকরিও দেবে না। হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা আমায় ইস্তিত দিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে ফ্রেসে রেখে অফিসে যেতেন। সন্ধ্যাবেলায় ফেরত নিতেন। তাঁর হাত ধরেই আন্টির বাড়িতেই পৌঁছাই। প্রথম প্রথম নিজের সঙ্গে লড়াই করেছি। কিন্তু যখন বুঝলাম মাসে বার বার এলে বৃদ্ধ শ্বশুরের মুখে হাসি ফুটেছে তখন সেটাই মেনে নিলাম। কিন্তু এই যে আমি মাসে চারদিন থাকি না তাই নিয়ে বাচ্চাদের গার্জেনরা আপত্তি তুলছে। কি করব জানি না। আর সেদিনের ঘটনার পর আন্টির বাড়িতে আসার ইচ্ছেটাও চলে যাচ্ছে আমার।’ দময়ন্তী চোখ বন্ধ করলেন।

আমার মনে অনেকরকম ইচ্ছে হচ্ছিল। আমি তো দময়ন্তীকে মাসে দুহাজার অনান্যসেই দিতে পারি। তাহলে ওঁর কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু কেন দেব? দময়ন্তীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?

বিল মিটিয়ে দিলাম। দময়ন্তী আবার আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। আমরা দুজনে চুপচাপ পার্ক স্ট্রিটে নেমে এলাম। দময়ন্তী বললেন, ‘চলি। আমার ফ্রেসের বাচ্চাদের গার্জেনরা এসে পড়বে একটু বাদেই।’

আমি মাথা নাড়লাম। ভদ্রমহিলা সামান্য তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে চৌরঙ্গী রোডের দিকে হাঁটতে থাকলেন। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি জানতাম আমাদের আর দেখা হবে না।

আপনারা এতক্ষণে স্বীকার করবেন আমি সত্যি কথা বলছি। অর্থাৎ একেবারে গোড়ায় নিজের সম্পর্কে

যেসব সাইনবোর্ড দিয়েছি তা মিথ্যে নয়। আমি ডায়েরি লিখি না। লিখলে সত্যি কথা লিখতে হয়। দীপ্তি বা অনুভূতমের চেয়ে সেটা সি বি আই-এর হাতে পড়তে পারে বলেই লিখি না। কিন্তু এসবের জন্যে আমার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। একটাই জীবন, সেটাকে সবরকমে উপভোগ করে আমি বেশ আছি। কারণ কোন ক্ষতি করছি না। প্রথম প্রথম মনে হত দীপ্তিকে ঠকাচ্ছি, এখন হয় না। কারণ—আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষা দীপ্তির নেই। আর্থিক নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সুবিধের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি এমনভাবে সে আর চাইতে হয় না। এইভাবেই যদি ষাট বছর কাটিয়ে দিয়ে মরে যেতে পারি তবে একটুও আফসোস নেই। তবে অসুস্থ হলে খুব খারাপ লাগে। অল্পবল্প জ্বরজ্বাতিতে বাড়িতে থাকতে ভীষণ একা লাগে। একটু বেশি হলে নার্সিংহোমে চলে যাওয়া যায়। অনেকেই দেখতে আসে। সময়টা ভাল কাটে। অল্প কিছু হলে একদম একা।

গোস্বামী কিন্তু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছিল। ওর কাছেই খবর পেলাম আন্টি নাকি ফ্ল্যাট বিক্রি করে দেশে ফিরে যাচ্ছেন। আত্মীয়দের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সমঝোতা হয়েছে। শিউলির ঘটনার পরে আমি ওখানে যাওয়া বন্ধ করেছিলাম মাসখানেকের জন্যে। তার মধ্যেই এই পরিবর্তন। গোস্বামী আমাকে আশ্বস্ত করল। সে যেন ভেবে নিয়েছিল দ্বিপ্রাহরিক অভিযান বন্ধ হওয়ায় আমি খুব কষ্টে আছি।

একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, এই আন্টি ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে কখনই কোনরকম খারাপ ব্যবহার করেননি। পঞ্চাশের কাছাকাছি এই মহিলা সবসময় সন্ত্রম রেখে কথা বলেছেন। যদিও মাতাল হয়ে যাওয়া দময়ন্তীকে সাহায্য করার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠানো ওঁর উচিত হয়নি তবু সেই অবস্থায় উনি আর কি করতে পারতেন। আত্মীয়দের সঙ্গে সমঝোতা হওয়ায় দেশে ফিরে যাচ্ছেন, এটা সুখবর। গোস্বামী নিশ্চয়ই আগবাড়িয়ে বানানো গল্প বলবে না। কিন্তু আমার কৌতূহল হল। আন্টির ভদ্র ব্যবহারই তাঁর এই পরিবর্তন সম্পর্কে আমাকে আগ্রহী করে তুলল।

এক বিকেলে সোজা তাঁর ফ্ল্যাটে চলে এলাম। বেল টিপতেই প্রথমে ভিজ্জাসাবাদ। একটি অল্পবয়সী ছেলে আমার পরিচয় জানতে চাইছে দরজা সামান্য ফাঁক করে। বললাম। তারপরেই আন্টির গলা পেলাম। দরজা খুলে হাতছোড় করে বললেন, ‘নমস্কার, নমস্কার। আপনি আসবেন আমি ভাবতে পারিনি। আসুন, আসুন।’

ঘরটার চেহারা একই আছে। সোফায় বসার পরে ভদ্রমহিলা বাচ্চাটির সঙ্গে আলাপ করালেন, ‘আমার ভাই-এর ছেলে। বোঝেতে থাকে। আপনি কি কিছু শুনেছেন?’

মাথা নাড়লাম, ‘হ্যাঁ। শুনলাম আপনি দেশে ফিরে যাচ্ছেন।’

‘ঠিকই শুনেছেন। জানি না ঠিক করছি কিনা কিন্তু এখানে থেকে যে বৈঠক কাজ করে যাচ্ছিলাম তার থেকে তো খারাপ হবে না।’

‘আপনার ভাই এসেছেন বুঝি?’

‘এসেছিল। সে তার বউ ছেলেকে রেখে গিয়েছে। ও আমাকে আর একা থাকতে দিতে চায় না।’

‘হঠাৎ এতদিন পরে?’

প্রশ্নটি শোনামাত্র আন্টি বাচ্চাটির দিকে তাকালেন। বছর দশ-বারো বয়স। আমাদের কথা শুনেছে কিন্তু বাংলা যে বুঝতে পারছে না তা স্পষ্ট। আন্টি তাকে বললেন, ‘মুন্না, পাশের ঘরে গিয়ে কমিক্স পড় একটু। আমরা বড়রা কথা বলছি।’

মুন্না বাঁকা গলায় বলল, ‘বাবা বলে গেছে তোমার কোন দোস্ত এলে আমি যেন সামনে থেকে না যাই।’ ছেলেটি হিন্দিতে জবাব দিল।

আন্টি অবস্তি নিয়ে বললেন, ‘ঠিক কথা। তবে ইনি আমার দোস্ত নন, আমার দাদা।’

ছেলেটি আমার দিকে তাকাল, ‘ও। তাহলে ঠিক আছে।’

সে পাশের ঘরে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। আন্টি হাসলেন, ‘আমার পাহারাদার। যাতে আমি আর কোন খারাপ কাজ না করি ভাই ভাই ওকে রেখে গেছে।’

‘আপনার ভাই এ-জীবনের কথা জানেন?’

‘জানে তবে কতটা জানে তা আমি জানি না। শিউলির ঘটনার পর আমি আর কাউকে এখানে অ্যালাউ করিনি। ভাই এল হঠাৎ। এসে ক্ষমটিমা চাইল। আমাকে ভুল বুঝেছিল বলল। একা আছি বলে দেশে নিয়ে যেতে চাইলে।’

‘আপনি রাজি হয়ে গেলেন?’

‘হলাম। এভাবে একা একা আর পারছিলাম না।’

‘উনি কেন নিয়ে যাচ্ছেন আপনাকে?’

‘জানি না। হয়তো টাকার জন্যে। আমার যা আছে আর এই ফ্ল্যাট বিক্রি করলে যা পাব তা তো কম নয়। তার লোভে।’

‘টাকাটা হাতে গেলে কি ব্যবহার পাবেন তা কি আপনি ভেবে দেখেছেন?’

‘টাকাটা ও হাতে পাবে না। অত্যন্ত আমি না মরা পর্যন্ত। আমি জানি আমাদের মধ্যে স্নেহমারা ভালবাসা নেই। শুধু স্বার্থ আমাদের এক করেছে। ওর স্বার্থ আমার টাকা পাওয়া আর আমার স্বার্থ একটা পারিবারিক আবহাওয়ায় বাকি জীবন কাটানো।’

‘পারিবারিক আবহাওয়ার জন্যে এতটা করবেন?’

‘হ্যাঁ দাদা। অনেক ভেবে দেখলাম আমাদের এই ছমছাড়া জীবনে কোন শান্তি নেই।’

উঠে দাঁড়ালাম। আন্টি আমাকে নমস্কার করলেন। হঠাৎ মনে প্রশ্ন এল, যে ভদ্রলোক ভালবেসে আন্টিকে এই ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছিলেন, এই মুহূর্তে তাঁর কথা আন্টির মনে পড়ছে কিনা। জিজ্ঞাসা করতে পারিনি। তিনিও তো পারিবারিক কারণে আন্টির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

গোস্বামী এক দুপুরে আমার রিচি রোডে নিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আবার কোলাপসিবল গেট দেখলাম। এখানকার আন্টি থাকেন সপরিবারে। তাঁর দুটি বাচ্চা আছে। তারা স্কুলে পড়ে। স্বামী কর্পোরেশনে চাকরি করেন। কিন্তু বাড়ির আসবাব এবং কায়দা দেখে তা বোঝা যায় না। ভদ্রমহিলা বলে দিলেন, ‘আমাকে চারটের মধ্যে বিজনেস বন্ধ করতে হয়। বাচ্চার সাড়ে চারটের মধ্যে স্কুল থেকে ফেরে। কর্তা আসেন ছ’টায়। এগারোটো থেকে চারটে তাই বিজনেসের সময়।’

গোস্বামী আমার পরিচয় দিয়ে রেখেছিল। আন্টি বললেন, ‘স্যার, একটু অপেক্ষা করুন। এখন যে আছে তাকে আপনার চলবে না। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে একটি মেয়েকে আসতে বলেছি। দারুণ মেয়ে। রোট বেশি।’

আমি আঙ্গকাল আর কিছুতেই অবাক হই না। গোস্বামী জোর করল যে আছে তাকেই দেখাতে। পাশের ঘর থেকে একটি জড়সড় হওয়া মাঝবয়সিনীকে ডেকে আনলেন তিনি। জামাকাপড় যথেষ্ট সাধারণ এবং এলোমেলো। লজ্জায় মাথা নিচু করে আছে। নাম অঞ্জলি। আন্টি বললেন, ‘ও দুই মেয়েকে বাঁচাতে কাজ করেছে। আমিই করতে বললাম। কিছুতেই স্মার্ট হয় না। কথাও বলে না। মদ খায় না। এভাবে চললে কাস্টমাররা রাজী হবে সঙ্গী করতে? কিন্তু কে বোঝাবে।’

মহিলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। আমার খুব খারাপ লাগছিল। গড়িয়া অথবা বিরাটির নিম্নবিস্তৃ পরিবারের উচ্চাশাহীন মহিলাদের মত ঐর চেহারাপত্তর। নিজেই সাজাবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস ঐর মধ্যে নেই। নিশ্চয়ই টাকার খুব প্রয়োজন, সেই কারণেই এসেছেন এখানে, কিন্তু তা এই চেহায়ায় কতটা সম্ভব হবে? গোস্বামী ওঁকে ভেতরে চলে যেতে বললেন। মনে হল মহিলা এতে একটু দুঃখিত হলেন কিন্তু কিছু না বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন। গোস্বামী জিজ্ঞাসা করল, ‘একে কোথায় পেলেন?’

আন্টি হাসলেন, ‘এসে গেল। বড় ভাল মেয়ে।’

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কি রকম?’

আন্টি একটু ইতস্তত করলেন। তারপর ওর মুখ থেকে যে গল্পটা শোনা গেল তা একটু আলাদা রকমের।

অঞ্জলির বাবা একজন অধ্যাপক। ও একমাত্র মেয়ে। ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ত। মাত্র সতেরো বছর বয়সে প্রেমে পড়ে। ছেলোটর সঙ্গে আলাপ রাতায়। সুন্দর চেহারা। কোন বিচার না করে অঞ্জলি ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাবা-মাকে না জানিয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়েও হয়ে যায়। ছেলোটি এসে ওর বাবার সঙ্গে যেদিন দেখা করে খবরটা দেয় সেদিন প্রায় বজ্রপাতের অবস্থা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ছেলোটি একদম বেকার। ক্লাস নাইন পর্যন্ত বিদ্যে। অঞ্জলিকে অনেক বোঝানো হয়েছিল। কিন্তু প্রেমের ডাকে সে তখন দুর্বীর। বাধ্য হয়ে অধ্যাপক ঘোষণা করলেন এই বিয়ে তিনি মানেন না এবং অঞ্জলি যদি জেদ ধরে তাহলে তিনি ত্যাগকন্যা করবেন।

ছেলেটি এতটা আশা করেনি। সে ভেবেছিলে শ্বশুরের পয়সায় আরামে থাকবে। তাই অঞ্জলি যখন এক বস্ত্রে বেরিয়ে এল তখন সে খুশী হল না। গোয়াবাগানের বস্তুতে ঘর নিল সে। প্রেমের জন্য গাছতলায় যে থাকতে রাজি এ তো তার কাছে স্বর্গ। দ্বিতীয় দিনেই ঝগড়া আরম্ভ হল। একতরফা ঝগড়া। ছেলেটি বকত এভাবে চলে আসার জন্যে। দ্বিতীয় জামাকাপড়ের ব্যবস্থাও ছেলেটি করতে পারেনি, তার সেই সামর্থ্য ছিল না। শেষ পর্যন্ত একটা জনতা শাড়ি এনে দিয়েছিল। তাই পরে ঘরে বসে থাকত অঞ্জলি। মাসের অর্ধেক দিন খাওয়া ছুটত না। ইতিমধ্যে ছেলেটির অন্য গুণের প্রকাশ পেয়েছে। ভাত না জুটুক, প্রায় চুপু খায় সে। সাটা খেলে। যেদিন কিছু পায় সেদিন সামান্য খরচ দেয়। এই দুরবস্থা দেখে পাশের ঘরের বউটি অঞ্জলিকে মাঝে মাঝে সাহায্য করে। বাপের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ। ওইভাবেই সে একদিন মা হয়ে যায়।

এই সময় ছেলেটি কোনভাবে হাজারখানেক টাকা পেয়ে যায়। পুরো টাকাই সে সাটায় লাগিয়ে দেয়। আর সেটা বাজি মারে। মোটা টাকায় সে ট্যান্ডি কেনে। নিজের নাকি গাড়ি চালাতে জানত। ভাল রোজগার আরম্ভ হল। বাসা পালটালো। কিন্তু সংসারে খরচ দিত না। অঞ্জলির অবস্থা পালটালো একটু। মাসের প্রথমে দুশো টাকা দিয়ে দায়িত্ব খালাস করত তার স্বামী। বেশিরভাগ রাতেই বাড়ি ফিরত না। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানটি অঞ্জলিকে দিল। যেদিন আসত, সঙ্গে রুটি মাংস নিয়ে আসত নিজের জন্যে। স্ত্রী ও কন্যাদের অভুক্ত দৃষ্টির সামনেই তা একা একা খেত। প্রতিবাদ করলে মার খেতে হবে বলে চুপ করে থাকত অঞ্জলি। দুশো টাকায় মেয়েদের ভাতের ব্যবস্থা করত। নিজের কোনদিন ছুটত কোনদিন ছুটত না। স্বামীর কাছে টাকা চাইলেই বলত বাপের কাছ থেকে নিয়ে এসো। লোকে বলত তার স্বামী নাকি একটি নেপালি মেয়েকে রেখেছে রামবাগানে।

এই অবস্থায় অঞ্জলি আত্মহত্যা করতে পারত। না খেয়ে শরীর ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওর কাঠামোটা ভাল বলে সেটা চট করে ধরা যায় না।

বাকি গল্পটি আন্টির ভাষায় বলা যাক : 'আমার বাড়িতে একটি মেয়ে কাজ করত। অনেকদিনের লোক। সে আমাকে অঞ্জলির ব্যাপার বলে। অঞ্জলির পাশের বাড়িতেও সে কাজ করতে যায়। এখন অঞ্জলির বাড়িতে টিভি আছে, রেডিও আছে, টেবিল চেয়ার আছে কিন্তু খাবার নেই। দুশোর বেশি একটি পয়সা লোকটা দেবে না। একদিন মাঝরাতে বাড়ি ফিরে লোকটা চোঁচামেচি করে। বাড়ি থেকে বের করে দেয় অঞ্জলিকে বাচ্চা সমেত। বারান্দায় তাদের নিয়ে শুয়ে থাকে অঞ্জলি। পাড়ার লোক ঘটনাটা দেখলেও কিছু বলে না। স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে কেউ নাক গলাবে না। পরদিন সকালে আবার হাতে পায়ে ধরে মেয়েদের নিয়ে ঘরে ঢোকে অঞ্জলি। একদিন মেয়েটি এসে বলল, কাল রাতে মদ খেয়ে এসে অঞ্জলিকে এমন মেরেছে লোকটা যে ডাক্তার ডাকতে হয়েছিল, ডাক্তারকে পয়সা দিয়ে চেপে দিয়েছে তাই পাড়ার লোক কিছু বলতে পারেনি। বউটাকে বাঁচাও দিদিমনি।

'আমার ক্ষমতা কী কাউকে বাঁচাব। কিন্তু একটা মেয়ে শুধু ভালবাসার জন্যে পড়ে পড়ে মার খাবে আজকের দিনেও? বিশ্বাস হচ্ছে না। তারপর একদিন ওকে দেখলাম। আমার বাড়িতেই নিয়ে এসেছে কাজের মেয়েটি। দুপুরে বাড়ি ফিরে স্বামী ওকে বের করে দিয়েছে। বলেছে বাপের বাড়ি থেকে অন্তত পঞ্চাশটা টাকা না নিয়ে এলে আজই ফ্রিজ টিভি সব বিক্রি করে দেব। ফ্রিজে কোন জিনিস নেই, টিভি স্বামীর অনুপস্থিতিতে খোলা নিষেধ। এ-দুটো সত্যি সত্যি কেনা হয়েছিল না লোকটা কোথাও থেকে তুলে এনেছিল তাতে বেশ সন্দেহ আছে। অঞ্জলি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, কাজের মেয়েটি তাকে আশ্বাস দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। জানলাম দুদিন কিছু খায়নি সে।

প্রথমেই ওকে খেতে দিলাম। বাড়িতে বাড়তি ভাত ভাল ছিল। কিছুতেই খাবে না সে। কারণ আজ সকালে বাচ্চাদের শুধু মুড়ি দিতে পেরেছে। এ অবস্থায় তার মুখে ভাত মানায় না। আমি জোর করে খাওয়ালাম। ওর শাড়ি জামা হতকুচিহ্নত, সেলাই করা, অথচ শরীরের গড়নে ভদ্রবংশের ছাপ স্পষ্ট। একটু একটু করে আমার প্রেমের জ্বাবে ও ওর ইতিহাস বলল। দেখলাম প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে। কথা বলতে বলতে শিউরে উঠছে। ওকে অনেক বোঝালাম। পড়ে পড়ে মার খেলে কোন লাভ হবে না। ওকে প্রতিবাদ করতে হবে। স্বামী যে খেতে না দিয়ে অত্যাচার করছে এটা পাড়ার লোকদের জানাতে হবে। সে যত চিংকার করবে তার বেশি অঞ্জলিকে চোঁচাতে হবে। অবাক কাণ্ড মেয়েটা বলল কী করে সে করবে? প্রথমত তার সাহস হবে না। দ্বিতীয়ত পাড়ার লোকের কাছে স্বামীর অসম্মান হবে।

ওকে বোঝাতে পারলাম না। ওর ভয়, এসব করলে স্বামী যদি জন্মের মত তাকে ছেড়ে যায়। নিজের কথা চিন্তা করছে না, বাচ্চা দুটোর তাহলে কী হবে! বিকেল বেলায় সে ফিরে গেল। কলকাতা শহরেই এমন ঘটনা কত ঘটে যাচ্ছে রোজ আমরা জানি না। কিন্তু দিনতিনেক বাদে অঞ্জলি আবার এল। স্বামী আসছে না দুদিন হল। কাল বাচ্চাদের কিছু খেতে দিতে পারিনি, আমি যদি খাবার দিই তাহলে নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে। জিজ্ঞাসা করলাম, এভাবে কদিন চলবে? সে মাথা নিচু করে রইল। তাকে দিয়ে রোজগারের নানান ভাবনা ভাবলাম। হাতের কাজ জানে না, ভাল করে কথা বলতেও এখন পারে না। এই কয়বছরের অত্যাচার সহ্য করে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। তাই থেকে নার্ভাসনেস। যার কোন কাজ করার ক্ষমতা নেই সে বাঁচবে কি করে। স্বামী দেবতাটি কোন বাড়িতে থি-গিরি করতে দেবে না। তাতে তার প্রেস্টিজ যাবে।

আমার বাড়িতে যে সমস্ত কাস্টমার আসে তারা এই চেহারার মেয়ের দিকে চেয়েও দেখবে না। কিন্তু আমার মনে হল মেয়েটাকে যদি একটু সাজিয়ে-গুছিয়ে দেওয়া যায় তাহলে চলে যাবে। ওকে সরাসরি প্রস্তাবটা দিলাম। বললাম, কাকপক্ষীতেও জানবে না। দুপুর বেলায় এসে ঘণ্টা তিনেক থাকবে। যা পাবে তাতে বাচ্চাদের নিয়ে ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারবে। শুনে সে আঁতকে উঠল যেন আমি ওকে বলছি বাচ্চাদের বিষ খাওয়াতে। খাবার নিয়ে সে চলে গেল। কিন্তু এল দিনদুয়েক পরে। স্বামী গতরাত্রে বাড়ি ফিরেছিল একগাদা খাবার আর মদ নিয়ে। নিজেই সব খেয়েছে আর মাঝে মাঝে লোকে যেমন পাতের কাছে বসে বেড়ালকে ছুঁড়ে দেয় তেমনিই বাচ্চাদের দিয়েছে। এর পরে সে মাথা ঠিক রাখতে পারছে না।

আমার প্রস্তাবে সে রাজি হল কিন্তু দেখে মনে হচ্ছিল ওকে ভূতে ধরেছে। বারংবার জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে কিছু হবে কিনা। যদি হয় সে আত্মহত্যা করবে। তখন বাচ্চাদের কি হবে? ওকে অনেক বোঝালাম। ভাল করে স্নান করে আমার জামাকাপড় পরালাম। প্রথম দিন যখন কাস্টমারের কাছে গেল তখন মনে হল ও মোমের পুতুল। একদম সাদা। কাস্টমার বিরক্ত হয়েছিলেন। সেখানেও নাকি কেঁদেছিল। তবে ও যে নতুন তা বুঝে একশ টাকা দিয়েছিলেন। আমার কাছে ফিরে এসে ও চুপচাপ আধঘণ্টা বসেছিল। তারপর স্নান করে নিজের নোংরা জামাকাপড় পরেছিল। যাওয়ার আগে বলেছিল, 'খুব ধেন্না লাগছে। এমন করব জীবনেও ভাবিনি।'

বলেছিলাম, 'তুমি যখন ইংলিশ মিডিয়ামে পড়তে তখন কি ভেবেছিলে না খেয়ে মাতাল স্বামীর অত্যাচার সহ্য করবে? ভাবোনি তো? ওটাও যেমন সত্যি এটাও তেমনি।'

দশদিন এল না অঞ্জলি। এই দশদিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। দশ টাকা করে খরচ করে বাচ্চাদের খাইয়েছে, নিজে খেয়েছে। একদিন এল দুটো বাচ্চাকে নিয়ে। তাদের চেহারা দেখলে দুর্ভিক্ষের কথা মনে পড়ে। বকলাম খুব ওদের আনার জন্যে। বলল একা বাড়িতে রেখে আসার উপায় নেই। হৃদয়ের ঘরে দুটো বাচ্চাকে রেখে ও কাস্টমারের কাছে যেত আমার শাড়ি পরে। আন্তে আন্তে সে বেশ চালাকচতুর হল। কিন্তু জামাকাপড় চালচলনে ওই আলুখালু ভাবটা গেল না। তখন মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করত। নিজের জন্যে যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করে বাকিটা বাচ্চাদের জন্যে খরচ করত। এমন কি চামড়ার চটি ওর পায়ে দেখিনি কোনদিন। এখনও হাওয়াই পরে আসে। এইসময় একদিন এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল অঞ্জলি, 'তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। ও ভাল হয়ে গিয়েছে।'

অবাক হয়েছিলাম। গুনলাম, গতরাত্রে স্বামী বাড়ি ফিরে ওই কাণ্ড করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই আমার কথা মনে করে অঞ্জলিও সমানে চিংকার করে গেছে। স্বামীর গলার ওপরে গলা তুলেছে। সে মারতে এলে অঞ্জলিও তেড়ে গিয়েছিল। এই হৈ-ঠে শুনে পাড়ার লোক ছুটে এসেছিল। অঞ্জলি কিছু বলার আগেই তারা শাসিয়ে যায়, দ্বিতীয় দিন এই ঘটনা আর বরদাস্ত করা হবে না। এতেই কাজ হয়েছে। স্বামী ভাবতেই পারেনি তার বিরুদ্ধে এমন বিদ্রোহ করতে পারে অঞ্জলি। সকালেও তাই ভদ্রভাবে ছিল। তবে পরসাকড়ি কিছু দেয়নি। না দিক, শাড়ি ঠিক থাকলেই অঞ্জলি খুশি। বলেছিলাম এখন নাকি তার আফসোস হচ্ছে। কেন যে এতদিন পড়ে পড়ে মার খেল।

আণ্ডি হাসলেন। এসব ঘটনা বছর বারো আগের। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার বলুন তো, মেয়েটার ক্ষতি করেছি কি আমি? নষ্ট করেছি?'

বললাম, 'আমার মতামত থাক। কিন্তু পাঁচজনে তাই বলবে। আপনি কুমতলব দিয়ে ওকে দেহবিক্রি করতে বাধ্য করেছেন।'

ফোঁস করে উঠলেন মহিলা, 'কোন পাঁচজন? নিয়ে আসুন তাদের আমার সামনে। যারা ওকে খিদের সময় খাবার দেয়নি, পরনের কাপড় দেয়নি, তাদের কোন অধিকার নেই এসব বলার। এমন কি ওর খামীরও মুখ বন্ধ। তখন যদি আমি সাহায্য না করতাম তাহলে ও তো মরতই, মেয়ে দুটোও ভেসে যেত।' একটু থামলেন আন্টি। নিজেই সামলালেন, 'জানেন, এখন অবশ্য মনে হয় সাহায্য না করলে ভাল হত।'

হঠাৎ বিপরীত কথা শুনে অবাক হলাম। কারণ জানতে চাইলাম। আন্টি বললেন, 'মেয়েটা সরল, সেইসঙ্গে বোকা। এত বোকা মেয়ে আমি জীবনে দেখিনি।'

'কি রকম?'

'নিজের জন্যে একটুও ভাবল না। এখানে এসে রোজগার করেছে আর মেয়ে দুটোকে যতটা সম্ভব ভাল রেখেছে। সেই ছেঁড়া শাড়ি আর পরে না বটে কিন্তু পঞ্চাশ টাকার চেয়ে বেশি দামের শাড়ি ওর নেই। অথচ মেয়েরা ভাল স্কুলে পড়ছে। ওদের পায়ের জুতোর দাম একশ টাকার কম নয়। আগে মেয়েদের খাওয়ায়, তারপরে যা পড়ে থাকে তাই নিজে নেয়। এই বাজারে এক হাজার টাকায় কি হয় তা তো জানেন। আমার সন্দেশ ও মাসের অর্ধেকদিন না খেয়ে থাকে। এটা বোকামি নয়? অনেক বকেছি কিন্তু কে শোনে আমার কথা। ওর জেদ নিয়ে যেভাবে ছেলেবেলায় থেকেছে, মেয়েদের সেইরকম রাখছে। সেই কাঁকড়ার গল্প জানেন? বাচ্চাদের বুকে নিয়ে থাকে আর বাচ্চার স্নেহ বুকের মাংস খুবলে খেয়ে তাকে মেরে ফেলে। আমার তো জাই মনে হয়।'

'স্বামী-দেবতাটি এসব জানেন?'

'না। আমার একটা শাড়ির ব্যবসা আছে। গ্রাম থেকে শাড়ি আনিয় লোকানে বিক্রি করি। বাড়িতে বাড়িতে পাঠাই। অঞ্জলি সেই ব্যবসায় আমার কাছে কাজ করে বলে সবাইকে জানিয়েছে। শাড়ি বিক্রি করতে যে এলেম দরকার তাও অবশ্য মেয়েটার নেই। হলে ওকে এটা করতে দিতাম না। দেখুন এত কাণ্ড হয়ে গেল, ওরও বয়স বাড়ল কিন্তু একটুও স্মার্ট হল না। নিজের সাদাগোজের দিকে তাকান না। মাঝে মাঝে সকালে মেয়েদের নিয়ে এখানে আসে। তখন কাস্টমার আসার টাইম নয়। ওদের দেখে আমার গা রি-রি করে। কায়দা করা জামা স্কাট, মুখে কত কথা। বাপকে ড্যাডি বলে। খুব ধমকাই আমি। নিজেরা তো খুব আরামে আছেন, মাকে একটু দেখতে পারিস না। পনেরো বছর বয়স ডোর, বাইরে বেরোনোর সময় মায়ের চুল বেঁধে দিতে কি হয়? বড়টা হাসে। বলে, মা ওই রকম ন্যালা ফ্যাপা। ছোটটার কাছে জেনেছি, একদিন রেস্টুরেন্টে খেতে চেয়েছিল ওরা। টেবিলে বসে অর্ডার দিয়ে যুদ্ধ চোখে মেয়েদের খাওয়া দেখেছে, নিজে খায়নি। তা এই ভাবেই চলছিল। কিন্তু বোকা মেয়ের বোকামির তো শেষ নেই। রাস্তায় হঠাৎ একজন পুরোনো কাস্টমারের সঙ্গে দেখা। লোকটা ওর সঙ্গে কথা বলেছে। বাইরে দেখা করতে চেয়েছে। ও রাজি হয়নি। আমাকে এসে বলেছে। আমি ওকে নিষেধ করেছিলাম, যদি কখনও কোন কাস্টমারের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয় তাহলে না চেনার ভান করবে। বাইরে কথা বলা মানে নিজের সর্বনাশ করা। একদিন বড় মেয়েকে স্কুল থেকে নিয়ে আসছিল, হঠাৎ একজন ওকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চিনতে পারছ?' ও চিনেছিল। লোকটা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বাঃ, এই বুঝি তোমার মেয়ে? কত বয়স তোমার?'

মেয়ে ভাবাব দিয়েছিল, 'পনেরো।'

'ভূমি টিভি সিরিয়ালে অভিনয় করবে? খুব ভাল মানাবে। আমরা একটা সিরিয়াল করছি তাতে তোমার মত একটি মেয়েকে দরকার। এই নাও আমার কার্ড। কাল-পরশুর মধ্যে তোমার মাকে সঙ্গে নিয়ে এসো।'

মেয়ে ফেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। টিভি দেখে দেখে সে অনেক চঙ্ক আয়ত্ত করেছে এর মধ্যে। টিভিতে তাকে দেখলে স্কুলে পাড়ায় ভাঁট মারতে পারবে। বাড়িতে ফিরে সে বায়না ধরল যাবেই। রাত্রে বাপ ফিরলে ড্যাডি ড্যাডি বলে সোহাগ জানিয়ে নিজের ইচ্ছের কথা বলল। বাপ প্রথমেই অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকটা কে? তোমার সঙ্গে আলাপ হল কি করে?' এই প্রশ্নটা যে হবে তা অঞ্জলি জানত। উত্তরও ভেবে রেখেছিল। আমার শাড়ির ব্যবসায় কাজ করতে গিয়ে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়, তাদের একজন। বাপ মেয়েতে অনেক আলোচনা হল। টিভি সিনেমা নয়। সিনেমা লাইন খারাপ কিন্তু টিভিতে ভদ্র বাড়ির মেয়েরা কাজ করে। তাই টিভিতে যাওয়া যায়। সেখানে অভিনয় করে কত মেয়ে গাড়ি বাড়ি করে সসন্মানে আছে।

পরদিন সকালে অঞ্জলি চলে এল। বৃষ্টিপাত বলে জানাল তার একদম ইচ্ছে নেই মেয়েকে সেখানে

পাঠানো। ওকে বকুনি দিলাম। কেন সে ভদ্রলোককে চিনতে পারল? চিনি না বলে চলে গেলে লোকটা এই প্রস্তাব দিতে সাহস পেত না। অঞ্জলি মাথা নিচু করে রইল। মেয়ে যখন যাবেই আর বাপের মদত পেয়ে গেছে তখন বললাম তাকেই সঙ্গে যেতে। বাপকে যেন না পাঠায়। তাই হল। মেয়েটা সুযোগ পেল। স্যুটিং-এর দিন মেয়ে বাপকে ডেকে বলল, 'মাকে নিয়ে ওখানে যাওয়া যায় না। এমন ডার্ট শাড়ি পরে যে সবাই তাকায়।'

বাপ বউকে বলল, 'ঠিকই তো। মেয়ের সম্মান আছে। সে আর্টিস্ট। একটু সেক্সেওজ্ঞে যাও।' কিন্তু সাজবার মত ভাল শাড়িও যে ওর নেই একথা জানা দরকার বলে মনে করল না কেউ। প্রথম দিন স্যুটিং করে ফিরে এসে মেয়ের মাটিতে পা পড়তে চায় না। তার অভিনয় দেখে আরও অনেকে কাজ দেবে বলে জানিয়েছে। প্রথম দিনের স্যুটিং-এর জন্যে পাওয়া দুশো টাকা মেয়ের বাপের হাতে তুলে দিতে বাপ একশ টাকা ফিরিয়ে দিল। তিনদিন অঞ্জলি সেখানে মেয়ের সঙ্গে গিয়েছিল। সেই লোকটা তার সঙ্গে একবারও কথা বলেনি। এতে হাঁপ ছেড়ে বঁচেছিল সে। কিন্তু লোকটা সবসময় মেয়ের সঙ্গে লেপটে আছে। খুব খারাপ লেগেছিল তার, ঠিক করল এই শেষ, আর মেয়েকে এখানে নিয়ে যাবে না। কিন্তু বাড়িতে ফিরে একথা বলার আগেই মেয়ে জানানাল কাল থেকে সে আর মায়ের সঙ্গে যাবে না। সবাই ওর সাজগোজ দেখে প্রশ্ন করে। বলে, তোমার মা এত আনসোসিয়াল কেন, কথা বলে না। অন্য একটি মেয়ের মা আসে। কী স্মার্ট, কী সাজ! মা সঙ্গে গেলে তুমি খ্রিস্টিয় থাকছে না। পরপর তিনদিন তিনশো টাকা পেয়ে বাপের মেজাজ চড়া ছিল। সঙ্গে স্যাক্স রায় দেওয়া হল, ওই শাড়ির ব্যবসাই করো, তোমাকে স্টুডিওতে যেতে হবে না।

এখন সকালে বাপ গিয়ে পৌঁছে দেয়। টানা আঠারো দিন স্যুটিং। রোজ কাজ থাকে এমন নয়। কিন্তু প্রোডিউসার বলেছেন সেটে থেকে কাজ দেখলে তাতে অনেক শিখতে পারবে। মেয়েকে পৌঁছে বাপ তার ধন্দায় চলে যায়। মেয়ে ফেরে ট্যাক্সিতে। ভাড়াটা কোম্পানি দেয়। ফিরতে থায়ই রাত হচ্ছে আজকাল। বেশ রাত। দশ দিনেই মেয়ের স্বভাব বদলে গেছে অনেক। রোজগারের টাকা সংসারে দেয় না। ইতিমধ্যে একটা জিনসের প্যান্ট আর টপ কিনে ফেলেছে। পেছনে আলো ফেলে নানান চঙে ছবি তুলেছে। আমার কাছে এসে কাদে অঞ্জলি। এই বয়সে কান্টমার পাওয়া মুশকিল। তবু তাকেই সংসার চালাতে হবে। কিন্তু কার জন্যে চালাবে? যে মেয়েকে খাওয়াতে নিজে না খেয়ে থেকেছে, যাদের আরাম দিতে নিজের কষ্টকে কষ্ট বলে মনে করেনি সেই মেয়ে আজ মাকে বাতিল করেছে। তাই মনে হয় তখন যদি অঞ্জলিকে সাহায্য না করতাম তাহলে আজ ও এই আঘাত পেত না। কিন্তু আমি সেটা কি করে বুঝব বলুন।

গোব্বামী জানতে চাইল, 'মেয়েটার নাম কি? কোন্ সিরিয়ালে কাজ করছে?'

আন্টি আবার অঞ্জলিকে ডেকে পাঠালেন। অঞ্জলি এসে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখন মনে হল, সত্যি এত ঝড় যে মেয়ের ওপর দিয়ে গেছে তার উচ্ছল হয়ে থাকা সম্ভব নয়। আন্টি তাকে সিরিয়ালের নামটা জিজ্ঞাসা করতেই সে মুখ তুলল, 'কেন?'

গোব্বামী বলল, 'তোমার মেয়ে কী দলে আছে তা জানতে পারি।'

অঞ্জলি চুপ করে রইল। গোব্বামী বলল, 'ওর যাতে কোন বিপদ না হয় তার চেষ্টা করা দরকার, তাই না? তুমি যে কষ্ট করে মেয়েকে বড় করে তুলেছ—'

'না।' মাথা দোলল অঞ্জলি।

আন্টি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলছিস তুই?'

'ও যদি জানতে পারে এইভাবে পয়সা রোজগার করে ওকে বড় করেছি তাহলে আমার মুখ দেখতে চাইবে না। ঘেঁসা করবে।'

'জানবে কী করে?'

'ওই লোকটা বলে দেবে।'

'তাই বলে তুই মেয়েকে বাঁচাবি না?'

অঞ্জলি তাকাল, 'ও এখন বিলিতি সেন্ট মাখে। থায়ই রাতে বাইরে খেয়ে আসে। টিভিতে অভিনয় করে স্টার হতে পারলে যাই করুক লোকে কিছু বলবে না, কিন্তু আমি এই করে পয়সা নিই জানলে গায়ে খুঁতু দেবে। আমি মরে যেতে পারলে ভাল হত কিন্তু ছোটটা যে এখনও খুব ছোট। আমি থাকলে ওর দিদিও ওকে দেখবে না।'

আন্টি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিন্তু ছোট বড় হয়ে যে একই কাণ্ড করবে না তা কে বলতে পারে? আর একটা ধাক্কা খেতে পারিস!'

ঠোট ওলটালো অঞ্জলি, 'কী আর হবে। বিয়ে করে যে ধাক্কা খেয়েছি তার চেয়ে বড় আর কী আছে? আমার আর কিছুতেই কিছু হয় না। এই যে এখানে এর ওর সঙ্গে শুই তাতেও আমার কিছু হয় না। আমি অনেকদিন মরে গেছি দিদি।'

'ঠিক আছে, তুই যা।'

গোস্থামী আন্টির মাধ্যমে মেয়েটির নাম এবং সিরিয়ালটির হদিস জানতে পেরেছিল। এসে বলেছিল, 'স্যার, একটা কিছু করুন। অনেক পাপ করেছে এ জীবনে কিন্তু ঘটনাটা শোনার পর মনে হচ্ছে মেয়েটাকে বাঁচিয়ে একটু পূণ্য করা দরকার।'

'কী করতে চান?'

'অভিনয়ের ভূতটা ওর মাথা থেকে নামানো যায় না?'

'কী ভাবে?'

গোস্থামী উত্তর দিতে পারেনি। কিন্তু সে খবর আনল এই সিরিয়ালের প্রযোজকের। ডব্রলোকের ইমপোর্টের ব্যবসা আছে। জুরিসডিকশন বের করে জানলাম আমার এক ঘনিষ্ঠ অফিসারের কাছে ওর ফাইল আছে। তাকে জানানাম লোকটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। সেইমত ব্যবস্থা হল। লোকটার বয়স বছর ষাটেক। শরীর এখনও ঠিক আছে। বিগলিত হল সিরিয়ালের স্যুটিং দেখতে চাই বলে। তখনই নিয়ে যেতে চাইল। রাজী হলাম। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে যাওয়া হল। বেশিরভাগ শিল্পীই নতুন। পরিচালকের সঙ্গে আলাপ হল। এর নাম আগে শুনেছি। আমার চোখ খুঁজছিল ঝরনাকে। গোস্থামী সেই নামই বলেছিল। প্রযোজক আমাকে একপাশে বসিয়ে কফি খাওয়াচ্ছিলেন। এই সময় আমি ওকে দেখতে পেলাম। একটি সুন্দর ছেলে ওর কাঁধে হাত দিয়ে সেটে ঢুকল। প্রযোজক সেটা দেখামাত্র দৌড়ে গেলেন। দূর থেকে মনে হল তিনি ছেলেটিকে ভর্তসনা করছেন। মেয়েটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কাছাকাছি কর্মরত কয়েকজন ইলেকট্রিসিয়ান হেসে উঠল। একজন চাপা গলায় বলল, 'বুড়ো একাই থাকে, বুঝলি।' মেয়েটিকে দেখলাম। মাঝারি লম্বা, নেহাতই কিশোরী কিন্তু ভাবভঙ্গিতে যৌবনকে ডেকে আনার ইচ্ছে প্রবল। মুখচোখের গড়ন ভাল। যাস্ত্য খারাপ নয়। এসব সত্ত্বেও চেহারা যশস্কর কোন ছাপ নেই। এই কি অঞ্জলির মেয়ে যার জন্যে সে নিজের জীবন নষ্ট করেছে। আমি তাকিয়েছিলাম।

সম্ভবত সেটা দেখতে পেয়েই প্রযোজক মেয়েটিকে নিয়ে আমাদের সামনে এলেন, 'হেঁ হেঁ, নমস্কার কর নমস্কার কর। কত বড় অফিসার। স্যার, এ হচ্ছে আমার আবিষ্কার। দেখবেন এই সিরিয়াল টেলিকাস্ট হলে একদম হই-চই ফেলে দেবে। এর নাম নীনা সেন।' মেয়েটি নমস্কার করল। গোস্থামী আমার দিকে তাকাল। সে আন্টির কাছ থেকে অন্য নাম পেয়েছে। ঝরনা সেন। সেন যখন ঠিক আছে তখন নাম বদলে যাওয়াও অসম্ভব নয়। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি এর আগে কখনও অভিনয় করেছ?'' নীনা জবাব দেবার আগেই প্রযোজক বললেন, 'না না। একেবারে ফ্রেশ। ওর গার্জেনদের তো ইচ্ছেই ছিল না, আমার কথা ফেলতে না পেয়ে অনুমতি দিয়েছে।'

'বাঃ! স্কুলে পড়?'

'হ্যাঁ। ক্লাস ইলেভেনে।' নীনা অথবা ঝরনা জবাব দিল। গোস্থামীর রিপোর্ট অনুযায়ী ওর যে ক্লাসে পড়া উচিত তা থেকে দু-বছর বাড়িয়ে নিয়েছে। অঞ্জলির সঙ্গে কোন মিলই নেই। নাজপোশাকে অনেক স্মার্ট, চোখ ঘুরিয়ে কথা বলার কায়দা ভাল শিখেছে। মুখে সস্ত্রতি মেরামত করা হয়েছে।

প্রযোজক বললেন, 'অল্প বয়স কিন্তু সবদিকে ট্যালেন্ট। একটু কেয়ার নিলে একদিন মিসেস সেনের পজিশনে পৌঁছে যাবে।'

বললাম, 'আপনি তো আছেন।'

'হেঁ হেঁ। চেষ্টা করছি স্যার। তবে আজকালকার ছেলেছোকরাদের তো জানেন, সারাক্ষণ নভর না রাখলে একদম পাতা মুড়িয়ে খেয়ে নেবে।'

এই সময় কেউ একজন জানাল প্রযোজকের ফোন এসেছে অফিসে। তিনি চারপাশে তাকিয়ে মেয়েটিকে বললেন, 'স্যারের কাছে বসো, আমি আসছি।' তাঁকে হরতো অনেকটা দূরে যেতে হবে তাই দৌড়োলেন।

নীনাকে বসতে বললাম আমি। সে বসেই যে প্রশ্ন করল তাতে অবাধ হলাম, 'আচ্ছা, আপনি কি খুব বড় অফিসার? নিশ্চয়ই। নইলে উনি অত খাতির করতেন না।'

'আমাকে দেখে তোমার ভাই মনে হচ্ছে?'

'হুঁ। একটু আলাদা রকমের আপনি।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি একাই এসেছ? বাড়ির কেউ সঙ্গে নেই?'

'নাঃ। ড্যাডি পৌঁছে দেয় আর ওই আন্কেলের গাড়িতে ফিরে যাই।'

'তোমরা কয় ভাই-বোন?'

'ভাই নেই। আমরা দুই বোন। আপনারা কি কোন সিরিয়াল করবেন?'

গোস্বামী বলল, 'কেন তুমি ইন্টারেস্টেড?'

'হুঁ। মেয়েটি হাসল। এই হাসি বড়দের।

এই সময় প্রযোজক এসে গেলেন। খুব খুশী হয়ে বললেন, 'টেলিকাস্ট খুব শিগগির হবে। দৃশ্টিভঙ্গি কমলো। নীনা, এখানে বসে আর কি করবে? তুমি বাড়ি চলে যাও। ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি। আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি খুব ব্যস্ত থাকব।'

নীনা আদুরে ভঙ্গিতে বলল, 'একটু থাকি না?'

'উঁহু আজ নয়।'

আমরা উঠে পড়লাম। গোস্বামী জিজ্ঞাসা করল, 'ও কোন্ দিকে থাকে, আমরা তো শহরে ফিরে যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন।'

প্রযোজক বিগলিত হলেন, 'হেঁ হেঁ। আপনারা কেন কষ্ট করবেন? আসলে আজ বিকেলে স্পনসারের লোক আসবে তো। তখন নীনার কোন কাজ নেই। আপনারা নিয়ে যেতে চাইছেন এটা তো খুব ভাল কথা। ঠিক আছে, নীনা, এঁদের সঙ্গে যাও, কোন দুট্টমি করবে না। কাল সকালেই চলে আসবে। কাল তোমার স্যুটিং আছে।' গাড়িতে ওঠার আগে ভদ্রলোক নিচু গলায় গোস্বামীকে বললেন, 'এখনও ও লাইনে নতুন, পাকাপোক্ত হয়নি তাই গার্ড দেওয়া দরকার।'

আজ আমি ড্রাইভার নিয়ে এসেছিলাম। সামনের সিটে গোস্বামী বসল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলেই নীনা জিজ্ঞাসা করল, 'কবে হবে নিরিয়াল?'

গোস্বামী মুখ ফিরিয়ে বলল, 'হবে। কিন্তু তুমি তো বাচ্চা মেয়ে—'

'ইস! কে বলল, আমি বাচ্চা? মোটেই নয়। এই সিরিয়ালে আমার এক প্রেমিক আছে।'

'ও তাই নাকি?' গোস্বামী উসকে দিল, 'জীবনে নেই বুঝি?'

'মাথা খারাপ। যারা আসে তাদের পকেট একদম ফাঁকা। নিজে না দাঁড়িয়ে ওসব আমি করবই না। কল্লনাদি বলেছেন, পায়ে তলায় মাটি এলে বাবার বয়সী কোন মালদার লোককে বিয়ে করবি। তাতে সুখে থাকবি। এ লাইনে কাজ করে অল্পবয়সী ছেলেকে বিয়ে করা মানে দুঃখ পাওয়া। সব সময় ঝামেলা হবে। ঠিক কথা।'

এবার আমি তাকলাম। এই মেয়েকে আর কিছু বোঝাবার নেই। তবু বললাম, 'তোমার বয়স অল্প। এইভাবে চাপ পেতে চাইলে বিপদ হতে পারে, তাই না?'

'কিসের বিপদ?'

'তোমাকে ব্যবহার করতে পারে।'

'ইস, আমি কচি খুকি নাকি? আমি এক কি দেড় পেগের বেশি মোটেই খাই না। মরে গেলেও না। তাও জিন অথবা ভোদকা। আমার মাথা সবসময় ঠিক থাকে। গিভ অ্যান্ড টেক। আমাকে দাও আমিও দেব।'

না কিশোরী না যুবতী কোন মেয়ে এই ভাষায় কথা বলতে পারে তা আমার জানা ছিল না। সামলে নিয়ে বললাম, 'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ঝরনা নামছে।'

হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়ল সে, 'আমার আসল নাম তো ঝরনা। সিরিয়াল করতে এসে নাম পালটেছি।'

আমার আর গোস্বামীর চোখাচোখি হল। আর সন্দেহ করার কিছু নেই।

'তোমাকে কে বেশি উৎসাহিত করে? বাবা না মা?'

'বাবা।'

‘মা করে না?’

‘না। মায়ের ধারণা আমি নাকি খারাপ হয়ে যাব। ফিল্মস্টাররা তো কত কি করে, কাগজে বের হয়, কিন্তু তারা কি খারাপ হয়ে যায়?’

‘ধরো, তোমার মা যদি এসব করত?’

‘মানে?’ থমকে গেল সে।

‘ধরো, ওই যে বললে গিভ অ্যান্ড টেক—করত?’

আবার হেসে গড়িয়ে পড়ল সে, ‘আমার মাকে তো দ্যাখেননি। শাড়িটাও কায়দা করে পরতে জানে না। চেষ্টা করবে সেই ক্ষমতাও নেই। কত চেষ্টা করেও মাকে আমি মানুষ করতে পারলাম না।’

খুব রাগ হয়ে গেল। এইটুকুনি পুঁচকে মেয়ের মুখে এসব অসভ্য কথা শুনে জার ভাল লাগছে না। বললাম, ‘তুমি যেভাবে কাঙ্ক্ষা আদায় করে শিল্পী হতে চাইছ, যদি শোন ঠিক সেইভাবে টাকা রোজগার করে তোমার মা তোমাদের ছেলেবেলা থেকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তাহলে কেমন লাগবে?’

নীনা যেন চমকে উঠল। তারপর হেসে বলল, ‘দূর! আমার মাকে আপনি যদি দেখতেন তাহলে একথা বলতেই পারতেন না। মায়ের দ্বারা ওসব হবে না। তাছাড়া ড্যাভিকে মা খুব ভয় পায়, এখনও।’

হতাশ গলায় বললাম, ‘শোন, তুমি এমন করো না যা তোমার মাকে দুঃখ দেয়। তিনি তোমাকে মানুষ করেছেন।’

‘জ্ঞান দেবেন না। আজ যারা ফিল্মে নাম করেছে তাদের সবাই ভাল?’ এরপর সে নাম করে বলতে লাগল সেইসব মহিলা গিল্পীদের কথা যাঁদের সম্পর্কে গল্প আছে একদা রেড লাইট এলাকার বাসিন্দা ছিলেন অথবা যাঁরা রুমাল বদলানোর মত পুরুষ বন্ধু পালটান। বুঝলাম আমার কোন করণীয় নেই। এবং তারপরেই মনে হল এমন ভাবনা ভাবছি কেন? আমি কি সমাজসংস্কারক? কী দায় আছে আমার? পথ শেষ হয়ে আসছে। আমি লম্পট এবং চরিত্রহীন। অতএব এখন যদি চাই, এই পনেরো বছরের মেয়েটিকে নোডার্ড করতে পারি।

কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে শুধু ক্রোধ ছাড়া আর কোন রিপূর সন্ধান আমি পাচ্ছিলাম না। এই সময় নীনা জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনাদের নিরিয়ালের হিরোইনের বয়স কত?’

গোস্বামী জবাব দিল, ‘কুড়ি।’

‘বাঃ! আমি তো করতে পারি।’ সে সরে এল আমার কাছে, ‘শ্রীজ আমাকে একটা চাপ দিন না।’

হঠাৎ মাথায় অন্য চিন্তা এল। বললাম, ‘তোমার কথা মনে থাকবে। তবে কিছু করার আগে তোমাদের বাড়িতে যেতে চাই।’

অবাক হল সে, ‘ওমা, আমাদের বাড়িতে কেন?’

‘এমনি। পরিচিত হতে।’

ঝরনা কিছু ভাবল। তারপর বলল, ‘ঠিক আছে, চলুন। আদল অবশ্য বলেছিল কাউকে বাড়িতে না নিয়ে যেতে।’

‘তাহলে রাজী হচ্ছ কেন?’

‘আদলের সিরিয়াল তো শেষ!’

বুঝলাম পরিণতির আর অবশিষ্ট কিছু নেই। গাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গলির যেখানে পৌঁছলাম সেখান থেকে হাঁটতে হবে। গোস্বামী সঙ্গে না থাকলে সাহস পেতাম না। রকে বসা পাড়ার ছেলেরা ঝরনাকে দেখে আওয়াজ দিচ্ছে। হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘যা না, নিজের মা-বোনকে গিয়ে বল।’ ছেলেগুলো হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠল।

গোস্বামী চাপাগলায় ওকে ধমক দিল, ‘আঃ, কথা বলার দরকার কি।’

ঝরনা নিজেই সামলে নিল। আমার সামনে বছর পনেরো যে মেয়েটি হাঁটছে তার শরীরে ঈশ্বর বিসদৃশ রকমের যৌবন দিয়ে দিয়েছেন আগাম। শরীর সর্বত্র সমান নয়। অথচ তেজ্রে এ যে কোন ভরযুবতীকে টপকে যেতে চাইছে।

একটা একতলা বাড়ির কড়া নাড়ল সে। দরজা খুললেন লুসিফরা এক ভদ্রলোক, ‘কিরে, এত তাড়াতাড়ি?’ তারপর আমাদের দেখে যেন অবাক হলেন। ভেতরে ঢোকার পর ঝরনা তার বাবার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিল।

তিনি প্রচণ্ড খাতির শুরু করলেন। এই লোকটাই অঞ্জলিকে এতকাল ধরে ব্যবহার করে এসেছে? দেখে তা মনে হচ্ছিল না। ‘অঞ্জলি কোথায়?’

চেয়ারে বসে বললাম, ‘আপনার মেয়ে এখনও মাইনর। তাই আপনার এবং আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে এলাম। আপনার স্ত্রীকে ডাকুন।’

ভদ্রলোক মাথা চুলকালেন, ‘ইয়ে, ওর একটু জ্বর হয়েছে, শুয়ে আছে। আমাকে বললেই হবে।’

হঠাৎ পেছনের দরজায় দাঁড়ানো একটি বছর তেরোর মেয়ে বলে উঠল, ‘মিথ্যে কথা। মায়ের জ্বর হয়নি।’

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন ভদ্রলোক, ‘খাবড়া মেরে মুখ ফাটিয়ে দেব বদমাশ মেয়ে। কতবার বলেছি যে তুমি বড়দের কথায় থাকবে না! যাও, ভেতরে যাও।’

ঝরনা দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, ‘তাই বলে তুমি এঁদের সামনে চোঁচাবে? তুমি সবাইকে মা পেয়েছ, না?’

ভদ্রলোক কঁকড়ে গেলেন, ‘সরি। মাথা ঠিক ছিল না। হ্যাঁ, কি বলছিলেন যেন?’

গোস্বামী জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনার স্ত্রী বাড়িতে নেই, না?’

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, ‘হ্যাঁ। একটা জায়গায় চাকরি করে ও। এটা আমি কাউকে বলতে চাই না।’ ‘কি চাকরি?’

‘ও শাড়ির পেল্‌সওম্যান।’

‘এটা তো সম্মানজনক চাকরি।’

‘তা হোক। আমাদের বংশে কেউ এসব করেনি।’

‘টিভি সিরিয়াল করেছে কেউ আপনাদের বংশে?’

গোস্বামী প্রশ্ন করতে ভদ্রলোক আঁা বলে চূপ করে গেলেন। এবার ঝরনা এগিয়ে এল, ‘সিরিয়ালটার কথা বলুন না। শুধু আভ্যেবাহে কথা হচ্ছে।’

গোস্বামী বলল, ‘মাসখানেক ধরে দার্জিলিং-এ স্যুটিং। ওকে একা ছাড়তে পারবেন?’

‘একা? আমি যেতে পারি না?’

‘ওর মা যেতে পারেন।’

‘ওর মা? না, সে যাবে না। বড্ড কান্নের চাপ তার।’

ঝরনা বলল, ‘আমি একা গেলে ভয় কি? আপনারা তো আছেন? আমার কোন অসুবিধে নেই।’

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পারবে তো একা থাকতে?’

ঝরনা মাথা নাড়ল, ‘পারব।’

ভদ্রলোক বললেন, ‘তাহলে আপত্তি কি? ও এখানে দিনে দুশো করে পেত। আপনারা কত দেবেন?’

গোস্বামী বলল, ‘ও তো নতুন। এখন যা পাচ্ছে তাই পাবে।’

‘তার মানে ছয় হাজার?’

‘না। বেদিন স্যুটিং থাকবে সেইদিনই টাকা পাবে।’

‘আডভান্স দেবেন তো?’

‘তা দিতে আপত্তি নেই।’

‘তাহলে ঠিক আছে।’

এবার আমি কথা বললাম, ‘এই যে আপনি মেয়েকে ছেড়ে দিচ্ছেন, যদি ওর কোন ক্ষতি হয়? এটা ভেবেছেন?’

‘ক্ষতি? না-না আপনারা ক্ষতি করবেন কেন?’

‘হতেও পারে। অনেক কিছু তো আগে বোঝা যাবে না!’

হঠাৎ ঝরনা বলল, ‘আমার ব্যাপারটা আমি বুঝে নেব ড্যাডি।’

এবার না বলে পারলাম না, ‘মিস্টার সেন, আমরা কোন সিরিয়াল তুলছি না। আপনার মেয়েকে আপনি একটি অন্ধকার জগতে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিচ্ছেন। ষাট বছরের যে প্রযোজক এখন ওকে সুযোগ দিচ্ছেন তিনি ইতিমধ্যে হাতেখড়ি করে দিয়েছেন বলেই মনে হয়। তবে এখনও সময় আছে। ওকে লাইন থেকে ফেরান।’

ঝরনা টেঁচিয়ে উঠল, 'কি, সিরিয়াল করছেন না আপনারা? এতক্ষণ মিথ্যে বলেছেন? সে কি!'

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, 'আপনার স্ত্রীর খোঁজ করছিলাম, কারণ তাঁর সামনে কথাগুলো আপনাকে বলতাম।'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'কোন লাভ নেই। এই যে আমার স্ত্রী শাড়ি বেচার নাম করে বাইরে গিয়ে কার সঙ্গে কিছু করছে কিনা তা তো আমি জানি না। আমার চোখের আড়ালে ও যদি কিছু করে ওই বুঝবে। আমি কি করব? এই করে যদি ওর নাম হয় টাকা হয় তাহলে তাই হোক।'

হঠাৎ খুব অবসন্ন হয়ে গেলাম। ভারী পায়ে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা যখন গাড়ির দিকে এগোছি তখন অপ্রলিকে দেখতে পেলাম। পাশের মুদির দোকান থেকে কিছু কিনছে। সারাদিন রোজগারের চেষ্টা করে বাড়ি ফেরার সময় মেয়েদের জন্যে হয়তো খাবারের ব্যবস্থা করছে। আমাদের দেখতে পায়নি সে।

দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়লাম আমরা। এই মুহূর্তে অপ্রলি আমাদের দেখুক তা আর চাইনি আমি।

জীবনের গল্প কোন এক জায়গায় স্থির থাকে না। বড় বিশ্বয়ের যা তা হল মানুষের কল্পনার সীমা যেখানে শেষ জীবন সেখান থেকে শুরু হতে পারে। আমি যতই খারাপ হই, অবশ্য এই খারাপ সাইনবোর্ডটা ছেলেবেলায় তৈরি স্লোথ থেকে বানানো, আমাকে ঈশ্বর বলে ভাবার মানুষ কিন্তু পৃথিবীতে রয়েছে। কোন কারণ নেই, সেই আন্টির মাধ্যমে আমি অপ্রলিকে পাঁচ হাজার টাকার শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম। ফুলিয়া সমুদ্রগড়ের শাড়ি অল্প দামে কিনে দেওয়া হয়েছিল ওকে। মাস্টিস্টোরিড বাড়ির দরজায় দরজায় ঘুরে এক মাসেই বারোশো টাকা রোজগার করে ফেলল সে। আন্টিও এটা ভাবতে পারেননি। তিনি জানতেন মেয়েটার দ্বারা কিছু হবে না। কিন্তু যে পুরুষের কাছে নিজের শরীর বিক্রি করতে পারে সে দরজায় দরজায় ঘুরে শাড়ি বিক্রি করতে পারবে না? গোপন অপরাধবোধ পীড়িত মেয়েটি হঠাৎ যেন মুক্তি পেল। আর এই মুক্তি দেবার জন্যে আমি তার কাছে ঈশ্বর হয়ে গেলাম। বছরখানেক বাদে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা ফেরত দিতে এসেছিল গোস্বামীর সঙ্গে। আত্মবিশ্বাস ফিরে গেলে মানুষের চেহারা তার প্রতিফলন পড়ে। ওরও তাই হয়েছে। টাকাটা ফেরত নিতে চাইনি। কিন্তু সে বলল, 'না দিতে পারলে ছোট হয়ে যাব দাদা। আপনি আমার ভগবান। প্রতি মাসে রোজগারের টাকা থেকে পাঁচশো করে ভ্রমিয়ে আমার পাঁচ হাজার হয়ে গেছে। অনেক তো পাপ করেছে, এই টাকা ফেরত না দিলে মহাপাপ হবে।'

আমি ভাবতে পারিনি। অনেকেই তো নেয়, ফেরৎ দেবার কথা ভাবে ক'জন? ওর মত অভাবী এবং চরিত্রহীনা মহিলা তো দেবেই না। নিতে হল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন আগের কাজ করছ?'

'না।' মাথা নাড়ল সে, 'জানেন, একদিন শাড়ি বিক্রি করেছিলাম এক ফ্ল্যাটে। বউটা বলল রবিবার সকালে গিয়ে দাম নিতে। তখন স্বামী নেই। রবিবারে গিয়ে দেখি স্বামী আন্টির কাস্টমার। আমাকে দেখে খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমি না চেনার ভান করে টাকা নিয়ে এসেছি। এখন আমি আমার অতীতকে চিনি না।'

'তোমার বড় মেয়ে?'

শব্দ হয়ে গেল অপ্রলি। তারপর বলল, 'সে তার ড্যাডির সঙ্গে পার্কসার্কাসে থাকে। আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমি ছোট মেয়েকে নিয়ে এখন খুব শান্তিতে আছি দাদা। ছোটটা আমার কথা শোনে। আমার শাড়ির ব্যবসার হিসেব রাখে। স্কুলেও এবার ভাল ফল করেছে। বড় মেয়ে আর তার বাপকে আমাদের কাছে আসতে নিষেধ করেছে।'

ভাল লাগল। বললাম, 'এই যে নিজে স্বাধীন ব্যবসা করছ, এটাই তো আগে করতে পারতে।'

মাথা নাড়ল সে, 'তখন দুটো টাকা দেবার লোক ছিল না। পর পর তিনদিন না খেয়ে থেকেছি তবু কেউ পাঁচটা টাকা দেয়নি। পাঁচ হাজার টাকা আমাকে হাজার বার বিক্রি করলেও পাওয়া যেত না। এখন আমার যে শান্তি তা আপনার মত মানুষের দেখা পেয়েছিলাম বলেই হল।'

অপ্রলি চলে গেল। গোস্বামী বসেছিল। টাকাটা আমার টেবিলে। গোস্বামী বলল, 'স্যার, এরকম ঘটনা আমি আমার জীবনে দেখিনি। কল্পনাও করা যায় না।'

বললাম, 'গোস্বামী, এই টাকাটা আমি ফেরত পাব বলে দিইনি। দিয়েছি বলে মাঝে মাঝে আফসোস

করতাম। অঞ্জলি আজ আমাকে লজ্জা দিয়ে গেল। যাহোক, ওর মতন যদি কেউ থাকে যাকে এই টাকাটা দিলে জীবন পালটাতে পারবে তাকে দেওয়া যেতে পারে। আছে কেউ?’

গোস্বামী মাথা নাড়ল, ‘বিশ্বাস করতে পারছি না কাউকে।’

‘অঞ্জলিকেও তো করা যেত না।’

‘ঠিক। তবু—’ বলে হাসল, ‘আপনার সঙ্গে কমলার আলাপ করিয়ে দিলে বুঝতেন।’

‘কে কমলা?’

‘একটি দক্ষিণ-ভারতীয় মেয়ে। বাবা বাঙালী। দারুণ ফিগার।’

‘তার কথা কেন উঠল?’

‘গোস্বামীর গল্পটা এইরকম। কমলা এখন মাসে আট দিন আন্টির বাড়িতে আসে। তার রোজগার চার হাজার। মেয়েটি গ্র্যাডুয়েট। খুব স্মার্ট এবং গায়ের রঙ ময়লা হলুদ যথেষ্ট সুন্দরী। ওর বাবা একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ভাই বোন নেই। মা খুব ঠাণ্ডা মানুষ। সংসারে কোন অভাব নেই। এই কমলা বছর দেড়েক আগে একটি ছেলের প্রেমে পড়েছিল। রাস্তায় আলাপ। খুবই ভদ্র। মার্জিত। তখন কমলার জীবনে মা বাবা ছাড়া তৃতীয় কোন অস্তিত্ব নেই। আলাপের পর সেটা ঘনিষ্ঠতায় এল। কমলা ছেলেটিকে বাড়িতে নিয়ে এসে মায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। ছেলেটি থাকে গল্ফ গ্রীনে। কিন্তু তার বাড়ির লোকজন খুব রক্ষণশীল বলে কমলাকে নিয়ে যেতে পারছিল না সেখানে। ব্যাঙ্ক চাকরি পেতে যাচ্ছে সে। পেনেই বিয়ে করে আলাদা সংসার করবে। রোজই দেখা হয়। তাতে মন ভরত না। ছেলেটি একদিন তাকে আন্টির বাড়িতে নিয়ে এল। ওই বাড়ির হদিস সে নাকি এক বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিল। সেই প্রথম একঘরে ঘনিষ্ঠ হলো চরম ব্যাপারটিতে রাজি হয়নি কমলা। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে আর আপত্তি টিকল না। তখন ছেলেটি ছাড়া আর কোন কিছুই সে ভাবতে পারত না। এই সময় একদিন বিপর্যস্ত হয়ে ছেলেটি বলল, তার বোনের বিয়ে আটকে গিয়েছে। আগামীকালের মধ্যে বিশ হাজার টাকা না হলে বিয়ে ভেঙে যাবে। বিয়ে যে হচ্ছে এই গল্প সে আগেও করেছে। কমলা মনে করল ছেলেটির বিপদ মানে তারও বিপদ। ওকে সাহায্য করার জন্যে সে চুরি করল। ব্যাঙ্কের লকারে তার মায়ের যে গহনা ছিল তা থেকে পনেরো ভরি নিয়ে বন্ধক দিল কাউকে না জানিয়ে। লকারটি তার আর মায়ের নামে নেওয়া হয়েছিল। টাকাটা হাতে পেয়ে কৃতজ্ঞ ছেলেটি সেই যে ফিরে গেল আর আসেনি। পাগলের মত তাকে খুঁজে বেড়াল কমলা। গল্ফ গ্রীনে গিয়েও খোঁজ পায় না ঠিকানা না জানা থাকায়। আন্টির বাড়িতে এসেও হদিস পেল না। আন্টি তার যে বন্ধুকে চিনতেন সে আসা বন্ধ করেছে। তার ঠিকানাও জানে না। এই সময় কমলার মা একদিন একটা প্রয়োজনে লকার খুলে চুরিটা ধরতে পারলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্বামীকেও বলেননি, কারণ জানতে পেরেছেন ব্যাঙ্ক থেকেই যে তাঁর মেয়ে লকার খুলেছিল। অসুস্থতা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছাল। এবার খুব ভয় পেয়ে গেল কমলা। মাকে একা পেয়ে সে স্বীকার করল চুরির কথা। এবং প্রতিশ্রুতি দিল এক বছরের মধ্যে গয়না ফিরিয়ে দেবে।

কুড়ি হাজার এবং তার সুদ যোগাড় করা কমলার পক্ষে অসম্ভব। মা সুস্থ কিন্তু বাক্যান্যাপ বন্ধ। বাবাকেও বলতে পারছে না। যেসব চাকরি সে পেতে পারে তাতে বছরে কিছুই জমবে না। অথচ সে বিশ্বাস করে মাকে দেওয়া কথা রাখবেই। অনেক ভেবেটোবে সে আন্টির কাছে এল। ভদ্র এবং ধনী কাস্টমার পেতে অসুবিধে হল না। এক বছরের মধ্যে টাকাটা ফেরত দিয়ে গহনা এনে ব্যাঙ্কের লকারে রেখে এসেছে সে।’ গোস্বামী হাসল, ‘কিন্তু রোজগার ছাড়তে পারছে না কমলা।’

‘কেন?’

‘অভ্যাস। এই এক বছর খুব আরামে ছিল সে। ট্যান্ডি ছাড়া চড়ত না। দামী পোশাক পরত। বাড়িতে বসে টিউশ্যনি করছে। বাবা তাকে এখনও একশ টাকা হাতখরচ দেয়। কিন্তু প্রতি মাসে চার হাজার টাকার একটা আলাদা জাদু আছে। গয়না ছাড়িয়ে আনার পরেও তার টাকা জমে যাচ্ছে। অথচ বেশি খরচ করতে পারছে না। ওর বাবার যা আয় তাতে ভি সি আর কেনা সম্ভব নয়। সে নিজে কিনতে পারে কিন্তু কিনলে কৈফিয়ত দিতে হবে। সেই ভয়ে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখছে। নিজে বাড়িতে থাকে ঠিক আগের মত। তার মনে হয়, মা তাকে সন্দেহ করেন কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলে না।’

গোস্বামী থামল। অবাক হয়ে শুনছিলাম আমি। বললাম, ‘মেয়েটা তাহলে এখন পুরোপুরি প্রফেশনাল।’

মাথা নাড়ল গোস্বামী, ‘না। এটাই অদ্ভুত ব্যাপার। এসব নিয়ে কেউ আলোচনা করলে কমলার খুব

খারাপ লাগে। কিন্তু ব্যাপারটাকে ও ফুর্তি হিসেবে নিয়েছে এখন। সপ্তাহে একদিন আন্টির বাড়িতে যায়। কোন পাপ বোধ নেই। মজার সঙ্গে পাঁচশো টাকা পাওয়া। কিছুদিন আগে ওর বাবার এক তরুণ সহকর্মীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ছেলেটি ইতিমধ্যে প্রেম নিবেদন করে ফেলেছে ওকে। বাবারও অমত নেই যদি ওদের বিয়ে হয়।’

‘কমলা বিয়ে করছে?’

‘হ্যাঁ। এবং বিয়ের পর এই ঘটনাগুলো বেমানম ভুলে যাবে।’

‘পারবে? স্বামীর কাছে সেটা লুকোতে পারবে?’

ও বলে, মেয়েরা বাথরুমের দরজা বন্ধ রেখে যা যা করে তা কি স্বামীর কাছে জানাতে যায়? এই এক দেড় বছর সে বাথরুমে কাটিয়েছে ধরে নেবে।’

হাসলাম আমি, ‘কমলার গল্প শোনালেন কেন?’

‘আপনি পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য করার মানুষ খুঁজছিলেন। অঞ্জলি এসে আপনাকে টাকাটা শোধ করে দিয়ে যাবে এমন ভাবনা যেমন অবিশ্বাস্য ছিল তেমনি কমলার গল্পও বিশ্বাস করা যায় না। অথচ জীবনে এমনি ঘটে থাকে। কে বানিয়ে বলছে তা বুঝতে পারা যায় না। আপনি যাকে বাঁচার জন্যে ওই টাকা দয়া করে দিলেন সে হয়তো ওড়বার কাজে লাগবে।’ গোস্বামী উঠে দাঁড়াল, ‘স্যার, আজ আমি চলি।’

বললাম, ‘এত তাড়া কিসের?’

ইচ্ছে ছিল না তবু বসন্ত গোস্বামী। এখন এই লোকটি সম্পর্কে আমার কৌতূহল হচ্ছে। ওকে সিগারেট অফার করলাম। নিল না। বলল, ‘স্যার আমি ওসব গয়্যায় দিয়ে এসেছি।’

‘গয়্যায় দিয়ে এসেছেন মানে?’

‘মায়ের কাজ করতে গিয়েছিলাম গয়্যায়। পুরুত বলল, আপনার খুব প্রিয় কোন জিনিস মায়ের নামে উৎসর্গ করে যান যেটা আর কখনও খাবেন না। মনে পড়েছিল মা আমার নেশা একদম পছন্দ করতেন না। তৎক্ষণাৎ মদ, সিগারেট, মেয়েমানুষ মায়ের নামে উৎসর্গ করে দিলাম। গুনতে খারাপ লাগবে হয়তো, কিন্তু দিয়ে খুব হালকা লেগেছিল।’

গোস্বামীকে আমার আরও রহস্যময় মনে হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনি এসেছিলেন মঙ্গারামের কেস নিয়ে। পরে বুঝেছি ওদের কর্মচারী আপনি নন। আপনার চলে কি করে?’

‘এইসব করে। উকিলবাবুদের হয়ে আপনাদের কাছে দরবার করি।’

‘এই আন্টিদের আপনি চিনলেন কি করে?’

গোস্বামী একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘সত্যি কথাই বলি স্যার। আপনাকে আমার বেশ রহস্যময় মনে হত প্রথম প্রথম। এখানে ওখানে যেতেন, কিন্তু, মানে ওই যাকে বলে ফুর্তি লোটা, তা কখনও করেননি। ভাবতাম লোকটার উদ্দেশ্য কি। পরে বুঝলাম আপনার অবস্থা শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের মত। শুধু দেখে যেতেই আনন্দ।’

‘লোকে কিন্তু আমাকে ভুল বোঝে।’

‘তাতে আপনার বয়েই গেল। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সেটা সিগ্গটিসিগ্ন-সেভেনের কথা। উকিলবাবুদের হয়েই কাজ করি। তখন একজন জাঁদরেল অফিসার ছিলেন, শ্রীবাস্তব সাহেব। বয়স হয়েছিল কিন্তু সবসময় মালই প্রচুর খেতেন। আপনাদের দপ্তরে অনেকেই জানত শ্রীবাস্তব সাহেব একজন টেলিফোনের মেয়ের প্রেমে পড়েছেন। লোকটার নাতনীর বিয়ে হয়ে গিয়েছে তখন। সবাই হাসাহাসি করত। এই শ্রীবাস্তব সাহেবের কাছে আমাদের একটা কেস পড়েছিল যাতে খুব ঝামেলা ছিল। শ্রীবাস্তব খুব খেলাচ্ছিলেন। শেষে একদিন আমাকে ডেকে বললেন, ‘শোন, তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। কিন্তু ব্যাপারটা খুব গোপনে করতে হবে। কেউ যদি জানতে পারে তাহলে তোমাদের এই কেসের দফা রফা করে দেব।’

বললাম, ‘কাকপক্ষীতেও জানবে না স্যার।’

‘তোমার ল-ইয়ারও যেন জানতে না পারে।’

‘ঠিক আছে স্যার।’

‘তুমি সন্ধ্যাকে চেনো? আমাদের টেলিফোন অপারেটর?’

‘দূর থেকে দেখছি দু-একবার।’

‘ও রোজ দুপুরে ঘন্টা দুয়েকের জন্যে অফিস থেকে বের হয়। একেবারে ফার্স্ট আওয়ারে এসে বোর্ডে

বসে আর একটার সময় ওঠে। কিন্তু এই একটা থেকে সাড়ে তিনটে পর্যন্ত প্যান্ডা পাওয়া যায় না। আমাকে বলেছে বাড়িতে ফিরে যায় অসুস্থ থাকে দেখতে। প্রথমে বিশ্বাস করতাম, এখন করি না।'

'কেন স্যার?'

'আজকাল অনেক অনুরোধ করলে সপ্তাহে একদিন দুপুরে আমাকে সময় দেয় পার্কস্ট্রীটের রেস্টুরেণ্টে বসে কথা বলতে। আফটার অফিস ও বাড়ি ফিরে যায়। শী ইজ টাইং টু অ্যাভয়েড মি। তিনদিন সময় দিলাম, তুমি তার মধ্যে খুঁজে বের করো সে কোথায় যায় দুপুরে?'

গোশ্বামী হাসল, 'স্যার। আপনাদের মর্জিমত আমাদের চলতে হয়। তাই শ্রীবাস্তব সাহেবের আদেশ মান্য করতে বাধ্য হলাম। পরদিন ঠিক একটায় সময় দাঁড়িয়ে রইলাম অফিসের গেটে। সন্ধ্যাদেবী বের হলেন। বেশ সুন্দর সাজগোজ। খবর নিয়ে জেনেছি ভদ্রমহিলা বিয়ে-থা করেননি। ওঁকে অনুসরণ করব কি, রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে চড়ে বসলেন। কাছাকাছি আর কোন ট্যাক্সি নেই যে পেছনে যাব। ঠিক তিনটে কুড়িতে আবার অন্য একটা ট্যাক্সিতে ফিরে এলেন তিনি। দূর থেকে দেখে গেলাম ব্যাপারটা। আমারও মনে হল মাকে দেখার জন্যে যদি রোজ ট্যাক্সিভাড়া শুনতে হয় তাহলে মাইনের টাকাকাটাই খরচ হয়ে যাবে। পরদিন উকিলবাবুর কাছে তাঁর গাড়িটা চাইলাম। উনি কোন প্রশ্ন করতেন না। জানতেন আমি বাজ্রে কাজে গাড়ি ব্যবহার করব না। ঠিক পৌনে একটা নাগাদ সেই গাড়িতে বসে অফিসের গেটের সামনে এলাম। একটা পাঁচ নাগাদ সন্ধ্যাদেবী বের হলেন। সেদিন কোন ট্যাক্সি সামনে না থাকায় তিনি পার্কস্ট্রীটের দিকে হাঁটতে লাগলেন। আমিও আমার ড্রাইবারকে বললাম এগোতে। সন্ধ্যাদেবী ট্যাক্সি পেয়ে গলে আমরা অনুসরণ করতে লাগলাম। পার্কস্ট্রীট হয়ে পার্ক লেন দিয়ে ইনিয়ট রোডে ঢুকল গাড়িটা। শেষ পর্যন্ত একটা দোতলা বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সন্ধ্যাদেবী ভেতরে চলে গেলেন। দূরত্ব সামান্যই কিন্তু মিটারের বেশি বকশিশ পেল ড্রাইভার। আমি খোঁজখবর নিয়ে জানলাম বাড়িটা একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলার। নাম মিসেস জোন্স। গাড়িরে উঠতে যাব, দেখি আর একটা ট্যাক্সি এসে থামল। আর সেটা থেকে নামলেন আমারই পরিচিত একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। তিন চারবার ওঁর চেহারে ফাইল নিয়ে গিয়েছি। তিনিও এই বাড়িতে ঢুকে গেলেন।

ফিরে এলাম। তখনই এই খবরটা শ্রীবাস্তব সাহেবকে দিয়ে দিলে আমার দায় চুকে যেত। কিন্তু আমার কৌতূহল হল। শ্রীবাস্তব সাহেবকে পরদিন গিয়ে জানালাম অনেকটা এগিয়েছি। দু-একদিনের মধ্যেই পুরো ব্যাপার জানাতে পারব। শ্রীবাস্তব খুব খুশী। বললেন, 'আজ তোমাকে ফলো করতে হবে না। আজ সন্ধ্যা দুপুরে আমাকে টাইম দিয়েছে। আমরা পার্কস্ট্রীটের রেস্টুরেণ্টে লাঞ্চ করব।'

সঙ্গে সঙ্গে প্র্যান করে ফেললাম। আজ দুপুরে নিশ্চয়ই সন্ধ্যাদেবী মিসেস জোন্সের বাড়িতে যাচ্ছে না। অতএব আমি সুযোগ নিলাম। ঠিক একটা দশে সেই বাড়ির দরজার বেল টিপলাম। মিনিটখানেক বাদে একজন চাকরগোছের লোক দরজা খুললে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মিসেস জোন্স আছেন?'

'আপকো নাম?'

'বলো শ্রীবাস্তব সাহেবের কাছ থেকে আসছি।'

অপেক্ষা করতে বলে চাকরটি চলে গেল। এমন মিথ্যাচার আগে কখনও করিনি। বুক দুকবুক করছিল। কিন্তু কৌতূহল প্রবল হলে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। একটু বাদে চাকরটি এসে জানাল, 'উপর যাইয়ে। মেমসাহাব বোলাতা হ্যায়।'

একটা সিমেণ্টের সিঁড়ি খাড়া ওপরে চলে গিয়েছে। সেটা ধরে ওপরে উঠেই একটা চিলতে বারান্দা, পর্দা ফেলা ঘর। জুতোর শব্দ হতে ভেতর থেকে মহিলা কণ্ঠে ভেসে এল, 'কাম ইন প্লীজ!'

পর্দা সরিয়ে দেখলাম ত্রৌঢ়া মেমসাহেব বসে আছেন সোফায়। কোলে লোমওয়ালা সাদা ছোট্ট কুকুর। হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়েস, সিট ডাউন প্লীজ!'

গোশ্বামী রুমালে মুখ মুছল। হেঁ হেঁ হাসি নিয়ে বললে, 'এ তো অনেক দিন আগের কথা। কি বলব স্যার, তখন আমি সত্যিই হ্যান্ডসাম ছিলাম। ভাল ভাল জামাকাপড় পরেও গিয়েছিলাম। সোফায় বসে বললাম, 'আপনার কথা আমি মিস্টার শ্রীবাস্তবের কাছে শুনেছিলাম।'

'কে মিস্টার শ্রীবাস্তব?'

হঠাৎ মনে হল শ্রীবাস্তব সাহেবের সত্যিকারের পরিচয়টা দেওয়া ঠিক হবে না। বোমানুম বলে দিলাম, 'উনি হলেন গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা।'

মিসেস জোন্স মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, এরকম একজন বছর দুয়েক আগে এসেছিলেন বটে। কিন্তু গুনেছিলাম তিনি অন্য স্টেটে বদলি হয়ে গিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আবার ফিরে এসেছেন।'

'আচ্ছা! খুব ভাল। তা বলুন আমি কি করিতে পারি?'

হেসে বললাম, 'বুঝতেই পারছেন।'

'আজই? নো। আজ ইম্পসিবল। তিনটির সময় যে আসবে তার জন্যে বন্ধুর ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছে।' মাথা নাড়লেন মিসেস জোন্স।

'তাহলে কাল দুপুরে?'

'কখন?'

'ধরুন একটা থেকে দেড়টা?' ইচ্ছে করেই সময়টা বললাম।

মিসেস জোন্স একটু ভাবলেন, 'ওই সময় যে আসে তার বন্ধু আগে থেকে ঠিক করা থাকে। আপনি পরণ্ড আসুন, আমি ওকে ফ্রি করিয়ে রাখব। মেয়েটি বাঙালী ওয়ার্কিং লেডি, আপনার তিনশো পড়বে আর সে ড্রিঙ্ক নেবে না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

বাইরে বেরিয়ে ঠিকঠাক অনুষ্ঠান হচ্ছিল না। এই আটচল্লিশ ঘণ্টায় যদি মিসেস জোন্স খোঁজখবর নেন তাহলে শ্রীবাস্তব নামে কোন গোয়েন্দা অফিসার যে নেই তা জানতে পারবেন। যদি সন্ধ্যাকে ঘটনাটা বলতে গিয়ে শ্রীবাস্তব সাহেবের নাম বলেন তাহলে সে ঠিক বুঝতে পারবে।

সাহস হচ্ছিল না আর যাওয়ার। কিন্তু ওই যে বলে কৌতূহলের মা বাপ নেই, আমিও তার খপ্পরে পড়লাম। গেলাম। দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম সন্ধ্যা ঢুকে গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে আমি। পকেটে তিনশোটি টাকা রয়েছে। মিসেস জোন্স খুব হাসিমুখে আপ্যায়ন করলেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম সন্ধ্যা সেখানে নেই। মহিলা বললেন, 'পুরনো রেফারেন্সের জন্য অনেক কষ্টে ওকে রাজি করিয়েছি নতুন বন্ধুকে আজ কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে। আপনি টাকাটা দিন।'

দিলাম। গুনে নিয়ে তিনি বললেন, 'পাশের ঘরে যান। ও ওখানে আছে। খুব ভাল মেয়ে।' কয়েক পা এগিয়ে নিজেই পাশের ঘরের পর্দা তুলে ধরে বললেন, 'সন্ধ্যা, হি ইজ হোয়ার।'

ঘরে ঢুকে দেখলাম সন্ধ্যা খাটের মাঝখানে বসে আছে। মিসেস জোন্স দরজা ভেজিয়ে চলে গেলেন। আমি হাতজোড় করলাম, 'অপরাধ মার্জনা করবেন।'

এমন অবাক বোধ হয় জীবনে হয়নি সন্ধ্যা। বলে উঠল, 'তার মানে?'

খাটের পাশে যে চেয়ার ছিল তাতে বসে বললাম, 'আমি আজ এখানে এসেছি আপনার সঙ্গে আলাপ করব বলে। অন্য উদ্দেশ্য নেই।'

'আমাকে আপনি চেনেন?'

'খুব সামান্য। আপনি যেখানে চাকরি করেন সেখানে আমি যাই।'

'আপনার উদ্দেশ্য কি বলুন জো? উত্তেজিত হয়ে খাট থেকে সে নেমে পড়ছিল, আমি বাধা দিলাম, 'প্লীজ, আপনি শান্ত হন। আমার কথা আগে শুনুন। আপনার কোন ক্ষতি আমার দ্বারা হবে না।'

সন্ধ্যা আমাকে বিশ্বাস করছিল না। সে সুন্দরী। পুরুষ হিসেবে ওরকম মেয়েকে পেতে আমার খারাপ লাগত না। কিন্তু মন সেটা চাইছিল না বলেই হয়তো বোকামি করেছে। সন্ধ্যা আমার নাম জানতে চাইল। বললাম, 'কি করি তাও। ইঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে কে পাঠিয়েছে?'

বুঝলাম অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। তাই সত্যি কথাটা বললাম এই ভাবে, এখানে আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে কেউ পাঠায়নি। শুধু কৌতূহলের বশে আমি আজ এসেছি। তবে এর পেছনে একটা ঘটনা আছে।'

'কি ঘটনা?'

'আপনাকে আমি বলতে পারি একটা শর্তে। আপনি আর কাউকে সেটা জানাবেন না। তাহলে আমার খুব ক্ষতি হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যা একটু ভাবল, 'বেশ বলব না।'

'আপনাকে শ্রীবাস্তব সাহেব খুব ভালবাসেন, না?'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল সন্ধ্যা, 'আপনি ওর স্পাই?'

এবার ওকে সত্যি ঘটনাটা বললাম। শ্রীবাস্তব শুধু জানতে চেয়েছিলেন সন্ধ্যা কোথায় যায়। সেটা জেনে আমি রিপোর্ট করতে পারতাম। কিন্তু আমার নিজের কৌতূহলে তা না জানিয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। শ্রীবাস্তবের কাছে যে কেস পেডিং আছে তা বিপক্ষে যাবে যদি ওঁর কথায় রাজী না হতাম।

সব শুনে সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি চান?'

বললাম, 'আপনি কেন শ্রীবাস্তব সাহেবকে বিমুখ করছেন?'

সন্ধ্যা রেগে গেল, 'আপনি কি ভেবেছেন? একটা বুড়ো ভাম আমাকে রেস্টুরেটে খাইয়ে প্রেম নিবেদন করবে আর আমি সেটা দিনের পর দিন সহ্য করে যাব? আমার সংসারে যত অভাব থাক, তিনি একটা পয়সা সাহায্য করবেন না। শরীরের ক্ষমতা চলে যাওয়ায় শুধু গল্পো করা ছাড়া তাঁর আর কোন ইচ্ছে নেই এবং আমি সব জলাঞ্জলি দিয়ে সেটা মেনে নেব? আমার টাকার দরকার। আমার মা শয্যাশায়ী। প্রত্যেক মাসে তাঁর চিকিৎসার জন্যে হাজার টাকার ওপর খরচ হয়। আমার ভাইবোনেরা এখনও নাবালক। বাবা নেই। সংসার শুধু আমার সামান্য মাইনেতে চলে না। আমি একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসি। এসব টাকা কে দেবে? তিনি তো প্রেম করে খালাস। নাতি-নাতনী নিয়ে আছেন, আমাকে বিয়ে করে আর্থিক সম্মতি দেবেন সেই ক্ষমতাও নেই।' ইঁপাতে লাগল সন্ধ্যা। আমি হতভম্ব হয়ে ওনছিলাম। সন্ধ্যার চেহারা, সাজগোজ দেখে কে বলবে তার বাড়ির অবস্থা ওইরকম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা বলল, 'আমি তাই দুপুরে এই করি। রোজ যে রোজগার হয় তা নয়, তবু দিবা চলে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছেন, একমাত্র প্রচুর ধনী ছাড়া আমার পক্ষে কাউকে বিয়ে করাও অসম্ভব। সেরকম ধনী আমাকে বিয়ে করবেই বা কেন? আমি মদ খাই না, দুপুরে ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে আসি। কেউ যদি আমার শরীর খুবলে টাকা দেয় তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।'

'এখানে কি ভাবে এলেন?'

'আমাদের ডিপার্টমেন্টের একজন এনেছিল।'

'আন্টি আপনাকে কত দেয়?'

'দেড়শো। আপনি টাকা দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, আন্টিকে বলে আপনার টাকা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

'না, থাক। উনি যা জানেন সেটাই জানুন।'

'এই ভ্রাম্যগাটা ভাল নয়। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলেই অনেকে সন্দেহ করে। আমি তাই সামনের মাস থেকে থিয়োটার রোডে যাব।'

'সেখানে কে আছে?'

'আছে এক বাঙালী বিধবা। ব্রাহ্মণ। স্বামী খুব নামকরা লোক ছিলেন। টাকাপয়সা বেশি রাখতে পারেননি। ওঁর ওখানে গেলে কেউ সন্দেহ করবে না।'

'এই যে এখানে আসেন, পুলিশের ভয় নেই?'

'নেই আবার? আন্টি থানার সঙ্গে ব্যবস্থা করেছে বলে শুনেছি।'

'আপনাকে কখনও ধরেনি?'

'কেন বলব আপনাকে? তারপর সে ঘড়ি দেখল, 'সত্যি আপনার অন্য কোন মতলব নেই?'

'আম্বে না।'

'তাহলে চলুন, এখান থেকে বের হই।' সে খাট থেকে নেমে বলল, 'আপনি দু'মিনিট বাদে ঘর থেকে বের হবেন।'

দু-মিনিট বসে রইলাম। তারপর বেরিয়ে দেখি মিসেস জোদ একা বসে তাঁর কুকুরকে আদর করছেন। হেসে বললেন, 'বাই। আবার যেন আপনার দেখা পাই। নো প্রব্লেম?'

মাথা নেড়ে নিচে নেমে একটু জোরে হাঁটতেই সন্ধ্যার দেখা পেলাম। তখনও ট্যাক্সি পায়নি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি তো অফিসে ফিরবেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনার সঙ্গে নয়।'

'ও।'

‘আচ্ছা, শ্রীবাস্তবকে কি বলবেন?’

‘বলব—কি বলব বলুন?’

‘বলবেন, আমি বাড়িতেই যাই, মাকে দেখতে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না।
নিন।’

‘কি এটা?’

‘আমার শেয়ারের দেড়শ টাকা।’

‘অসম্ভব। আমি নিতে পারব না।’

‘তাহলে আপনি শ্রীবাস্তবকে কথটা বলবেন না?’

‘বলব। কিন্তু তার জন্যে ঘুষ দিতে হবে না।’

‘আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি?’

‘বচ্ছন্দে।’

‘আজ ছুটির পর আমার সঙ্গে দেখা করবেন?’

‘কেন?’

‘এখন বলব না। আচ্ছা চলি।’ একটা খালি ট্যান্ডি দেখে হাত তুলে তাকে থামিয়ে চলে গেল সন্ধ্যা।
তিনশ টাকার জন্যে বুক খুব খোঁক ছিল কিন্তু আমার কৌতূহলী মনটা সেটাকে সাধুনা দিচ্ছিল।

গোস্বামী থামল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ওই আপনার প্রথম আন্টির বাড়িতে যাওয়া?’

‘হ্যাঁ স্যার। ওই শুরু হল বলতে পারেন।’

‘তারপর ঘন ঘন যেতেন?’

‘ঘন ঘন ঠিক নয়। অফিসাররা চাইলে না গিয়ে পারতাম না।’

‘ঠিক এই মুহূর্তে কলকাতায় কতজন আন্টিকে আপনি চেনেন?’

চোখ বন্ধ করল গোস্বামী, ‘কলকাতায় সাতজন, কলকাতার বাইরে দুজন। মোট নজন।’

‘কলকাতার বাইরেও এইসব হয় নাকি?’

‘হয় স্যার। বারাকপুরে একজন দোদগু প্রতাপশালিনী আছেন। আর একজন বর্ধমান।’

‘সে কি? ওসব তো মফঃস্বল অঞ্চল। পাড়ার লোক অ্যালাউ করে?’

‘সে অন্য গল্প। আপনি কিন্তু সন্ধ্যার প্রসঙ্গ ছেড়ে যাচ্ছেন।’

‘হ্যাঁ, আপনাকে দেখা করতে বলেছিল, তাই তো?’

‘হ্যাঁ। ছুটির পরে দেখা করেছিলাম। অফিসের গেটে দাঁড়িয়েছিলাম, সন্ধ্যা এল। খানিকটা হেঁটে ট্যান্ডি
নিল। বলল, আপনাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব। নর্থ ক্যানলটার একটা গলিতে দুঘরের ফ্ল্যাটে ওর
বাস। ফ্ল্যাট না বলে অন্ধকূপ বলাই ভাল। সন্ধ্যার মা সত্যি শয্যাসায়ী। চার ভাইবোন ওর মুখে চেয়ে। একটা
ভাল বসার জায়গা নেই। নিজেই বলল, ‘এখন এসবের ব্যবস্থা আমি করতে পারি। কিন্তু করলে অন্য
ভাড়াটেদের চোখ টাটাবে। তারা আমাকে সন্দেহ করবে। আমি কত মাইনে পাই মা সবাইকে জানিয়ে
দিয়েছেন। বুঝতে পারছেন!’

‘অন্য কোথাও উঠে যাওয়া যায় না?’

‘না। আজ যে রোজগার আছে, কাল তা যে থাকবে এমন নিশ্চয়তা কোথায়? শরীর অচল হলেই
সব গেল। দেহপট সনে নট সকলই হারায়। আমি ভো নটী। রোজ অভিনয় করি।’

সন্ধ্যা তার মায়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিল। বলল, ‘বন্ধু।’

বিছানায় শুয়ে রুগ্ম মহিলা বললেন, ‘তবু ভাল, ওর একজন বন্ধু আছে তা জানতে পারলাম। ওর
বিয়ে হোক মা হিসেবে আমি চাই কিন্তু বিয়ের পর চলে গেলে সবাই না খেয়ে থাকবে ভাবলে আর চাইতে
পারি না।’

সন্ধ্যা এগিয়ে দেওয়ার সময় বলেছিল, ‘তাহলে বুঝতে পারছেন শৌখিন প্রেম করার কোন বিলাসিতা
আমার সঙ্গে না!’

গোস্বামী মুখ মুছলেন, ‘সন্ধ্যার কল্যাণেই থিয়েটার রোডে আন্টির সঙ্গে আমার আলাপ। তারপর
একের পর এক।’

'সন্ধ্যা এখন কোথায়?' জিজ্ঞাসা করলাম।

'তার বয়স হয়েছে। সেইসঙ্গে নানান অসুখ। লাইন ছেড়ে দিয়েছে অনেক দিন। বাচ্চাকাচ্চাও হয়নি।'

'তার মানে? সন্ধ্যা বিয়ে করেছিল?'

'হ্যাঁ। মা মরে যাওয়ার পর ভাইরা যখন দাঁড়িয়ে গেল তখন রাজী হল। এখন সংসার করছে কিন্তু ওই পর্যন্ত।'

'আপনার সঙ্গে এখনও যোগাযোগ আছে?'

গোস্থামী হাসল, 'হ্যাঁ, স্যার। ও আমারই স্ত্রী।'

গোস্থামীর সঙ্গে আমি আর কথা বলতে পারিনি। এক মুহূর্তেই মানুষটির চেহারা একদম পাণ্টে গেল আমার কাছে। যাকে এতদিন শুধু দালাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারিনি তার অন্য চেহারা দেখে আমি হতভম্ব। গোস্থামী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চূপচাপ বসেছিলাম। কাজকর্ম করতে এতটুকু ইচ্ছে হচ্ছিল না। একটা মানুষ এতসব জানার পরেও যখন ওই মহিলাকে স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি দেয় তখন নিশ্চয়ই তার পেছনে কোন কারণ থাকে। কি সেই কারণ? ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয়তো উত্তরটা জানতাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে নিজেরই লজ্জা করেছিল। ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম, গোস্থামী মেয়েটিকে স্বীকৃতি দিয়ে রক্ষা করেছিল। একটা আইডেন্টিটি ওর দরকার ছিল। কিন্তু গোস্থামী কি পেল? না সম্ভান, না শারীরিক প্রেম! হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। নইলে প্রথম আলাপে গোস্থামী নিজেকে আড়াল করত না। মেয়েটিকেও সে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলত না। তাহলে?

আজ বিকেল-বিকেল আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। বি-চাকররা পর্যন্ত যে অবাক হয়েছে তা ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম। দীপ্তি বাড়িতে আছে কিনা জানি না। অনুতোষ আজ সকালে বাড়ি ফিরেছে। সকালে বেরুবার সময় এক ঝলক দেখেছিলাম ওকে। নিজের চেয়ারে বসে রইলাম চূপচাপ, অনেকক্ষণ। হঠাৎ মনে হল, আজ মদ খাব না। আমার লিভার প্রতিটি সন্ধ্যায় মদ সহ্য করে আসছে, বছরের পর বছর সে অ্যালকোহলের আক্রমণ রোখার চেষ্টা করছে। আজ না হয় বেচারাকে বিশ্রাম দিলাম।

চেয়ারে বসেই আমি আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। একটি বয়স্ক মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওই মানুষটির চিবুকের নীচে আর একটি চিবুক। গাল ভারী। চোখের নীচে ঈষৎ ভাঁজ। আমার তরুণ বয়স, যৌবনের শরীরটাকে খেঁতো করে সময় যাকে এখন আয়নায় ধরেছে তাকে আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। আমি যদি আজ রাত নটায় খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি (মদের জন্যে ঘুম না এলে ঘুমের ওষুধ খাব), ভোর পাঁচটায় উঠে হাঁটতে বের হই, তাহলে কালকের দিনটা কেমন কাটবে?

দরজায় অনুতোষের মূর্তি! একুশ বছরের টাটকা তরুণ। ওই বয়সটা আমার এই সেদিনই ছিল। ছেলেকে আমার কাছে আসতে দেখে হাসলাম, 'আয় রে। কেমন আছিস?' এই গলায় অনেকদিন কথা বলিনি।

'তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।'

'বল্ না।'

'আমার হাজার তিনেক টাকা দরকার।'

'তিন হাজার? কি হবে?'

'দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাব।'

'দার্জিলিং-এ যেতে এত টাকা লাগে নাকি?'

'লাগবে।'

হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল। কি ভেবেছে ছেলেটা আমাকে? খুব বেশি হলে তিনশ টাকা যাতায়াত হয়ে যাবে। হোটেল সাতদিন থাকলে বড় জোর সাতশো। হাজারের বদলে তিনগুণ চাইছে।

'তুমি একা যাবে নাকি?'

'বন্ধুরা যাচ্ছে।'

'তারাও তিন হাজার করে নিচ্ছে নাকি?'

'সেটা আমার জানার কথা নয়। তুমি দেবে কিনা?'

'নো। তোমার বয়সে শুধু বেড়াবার জন্যে এত খরচ করা অন্যায্য। নিজে রোজগার করে খরচ করো।'

অবাধ্য ভঙ্গি দেখিয়ে অনুভোষ চলে গেল। আমি আয়নায দেখলাম নিভেছে ভীষণ রাগী দেখাচ্ছে। রাগলে মানুষের মুখ কুৎসিত হয়ে যায়। নিভেছে হঠাৎ এক বৃদ্ধ ভাম বলে মনে হল। তৎক্ষণাৎ মন পরিষ্কার করে মুখ সহজ করতে চাইলাম। কিন্তু রাগের ছাপ অত দ্রুত মুখ থেকে মোছে না। অনুভোষের বয়সে আমি দাঙ্গিলিং-এ গিয়েছি। বাবার কাছে একশ টাকা পেতে আমার কালঘাম ছুটে গিয়েছিল। দাম যত বাড়ুক, একশ টাকা নিশ্চয়ই এতদিনে তিন হাজার হয়নি! সেই সময় একটা দেশলাই-এর দাম ছিল ছয় পয়সা, এখন তিরিশ। একশ তাই পাঁচশ হতে পারে। আমি হাজার দিতে চেয়েছিলাম।

হঠাৎ দরজায় দীপ্তিকে দেখতে পেলাম। আমি ভাল ব্যবহার করতে চাই। কিন্তু হাসব কিনা বুঝতে পারছি না।

দীপ্তি বলল, 'তুমি ওকে রিফাউজ করেছ?'

'হ্যাঁ। ওইটুকু ছেলে তিন হাজার চাইছে! ভাবতে পারো? আর কথা বলার কি ধরন? যেন আমি একজন দেনাদার।'

'তুমি ওকে টাকাটা দেবে কি?'

'না। ইমপসিবল।'

'ঠিক আছে, আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

'তুমি দেবে?'

'হ্যাঁ। আমার রক্ত-হুল-কর পয়সা। তাই দেবো। তুমি তোমার কালো টাকায় ভুবে থাকো।'

'যা খুশী বল। কিন্তু দিলে ভুল করবে। ও প্রশ্রয় পাবে।'

'তুমি মরে গেলে গ্তো সবই ও পাবে। তখন—তখন আটকাতে পারবে? মাঝখান থেকে আমি সম্পর্কটাকে নষ্ট করি কেন?' দীপ্তি চলে গেল।

হতভাষের মত বসে রইলাম। একদিন আসবেই যখন আয়নার আমার প্রতিবিম্ব পড়বে না। আমার হাত পা মাথা নিভার ছাই হয়ে যাবে। তখন এই চরিত্রহীনতা, লাম্পটা সত্ত্বেও যে বিশাল সম্পদ আমি রেখে যাব তা সব অনুভোষ পাবে। টাকার গায়ে অশোকস্তম্ভ। শান্তির প্রতীক। সেই শান্তি লোকে কেনে অনেক মূল্য দিয়ে। শিউলি, অগ্নি, কমলা, নীনা অথবা আমি যেমন কিনেছি। না, অনুভোষকে এসব দেব না। কোন সেবাপ্রতিষ্ঠানকে উইল করে দেব। অথবা আজই সি বি আইকে সব জানিয়ে চিঠি দিই। ওরা বাহ্যেয়াপ্ত করে নিয়ে যাক। হেসে ফেললাম। আমি কি নির্বোধ? আগামীকালও তো আমাকে বাঁচতে হবে।

দীপ্তি যদি সম্পর্কটাকে নষ্ট না করতে চায়, আমি কেন করব? অনুভোষকে ডেকে পাঠালাম। তিন হাজার টাকা ওকে দেব।

যে অনেকবার চরিত্রহীন, তার আর একবার চরিত্রহীন হলে কি এমন ক্ষতি হবে?

pathagar.net

ছায়া পূৰ্বগামিনী
[প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৩]

pathagar.net

উৎসর্গ
শ্রীমতী ঝুমুর ভট্টাচার্য
শ্রী দেবকুমার ভট্টাচার্য
বহুভ্রমণে

pathagor.net

ভোরবেলায় সোজা এয়ারপোর্টে চলে এসে অতীশ দেখল দিল্লি ফ্লাইট খালি যাচ্ছে। টিকিট পেতে কোনও অসুবিধে হল না। পকেটে টিকিট না নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলে যে টেনসন হয় সেটা চলে যেতে ও দুটো খবরের কাগজ কিনে কফির স্টলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্লেন ছাড়তে তখনও কিছু দেরি রয়েছে।

গতকাল বিকেলেও তার দিল্লি যাওয়ার কথা ওঠেনি। ঠিক ছিল শোভনই আসবে কলকাতায়। প্রায় এক মাস ধরে আসছি আসছি করে শেষপর্যন্ত কাল রাতে শোভনলাল বলল, 'আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাগাদা যখন তোমার তুমিই এসো। মনিং ফ্লাইটে এলে এয়ারপোর্টে থাকব।' বাইশ লাখ যার পাওনা তার তাগাদা থাকবে না তো কার থাকবে?

'এক্সকিউজ মি!'

অতীশ সরে দাঁড়াল। লোকটা পাঁচ কাপ কফির অর্ডার দিয়ে ফিরে গেল একটু দূরে। কফির কাপ হাতে নিয়ে অতীশ দেখল লোকগুলো খুব গভীর মুখে কিছু আলোচনা করছে। একজন বলছে, বাকিরা বেশ সমীহ করেই মাথা নাড়ছে। যে লোকটা কথা বলছে তার পরনে সালোয়ার কুর্তা, হাত্য ভাল। লোকটাকে হঠাৎ চেনা-চেনা মনে হল অতীশের। কোথায় যেন দেখেছে। ঠিক এই চেহারা নয়। এই সময় অর্ডার দিয়ে যাওয়া লোকটা কফির তাগাদা দিতে এল। কফি তৈরি। ওর একার পক্ষে পাঁচটা কাপ নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ইশারা করতেই ওই একজন ছাড়া বাকিরা এগিয়ে এল।

অতীশ বুঝল ওই লোকটাই দিল্লির নেতা। কিন্তু লোকটাকে সে কোথাও দেখেছে।

কফি খেয়ে অতীশ শুধু তাদের সিকিউরিটি এনকোজারে যেতে বলা হচ্ছে। অতীশ পা চালানো। ন্যুটকেসটা চালান করে দিয়ে ছোট খোপে ঢুকে হাত ওপরে তুলে দাঁড়ানোর সময় ওর প্রতিবারের মতো এবারও মনে হল ব্যাপারটা বেশ হানাকর। যে দ্রুততায় তার কোমর পকেট হাঁটুতে আলতো আঙুল বুলিয়ে বোর্ডিং কার্ডে ছাপ মেনে সিকিউরিটির লোক কাজ সারেন তাতে মতলববাজ লোক বিপদে পড়বে না। প্লেনে গোলমাল যারা পাকাতে চায় তারা খুঁছন্দে ফুলহাতা শার্টের আঙিনের তলায় রিডলবার নিয়ে এখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

দিল্লি যাওয়ার যাত্রী আঁজ বেশি নেই। এইসময় সেই লোকটিকে আসতে দেখল অতীশ। সঙ্গীরা নেই। ব্রিফকেস হাতে নিয়ে ভারি চলে অতীশের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল লোকটা। 'এক্সকিউজ মি, আপনি কি কখনও দিল্লিতে থাকতেন?'

গলার স্বর স্মৃতির দরজা খুলে দিল, 'আরে যশোবন্ত! যশোবন্ত না?'

'জী হ্যাঁ। আরে ইয়'র, আমি তাহলে ঠিক ধরেছি।' হইহই করে তাকে ভড়িয়ে ধরল যশোবন্ত। ওর চিংকারে আশেপাশের লোকজন অবাক হয়ে তাকাল।

কথা হচ্ছিল হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে। অতীশ বলল, 'তুই বেশ মোটা হয়ে গিয়েছিস!'

যশোবন্ত বলল, 'আমি কি বাঙালির মত দুবলা থাকব? স্কুলে থাকতে তোরা আমাকে বোকা বানাতিস, আমি তোদের চামচে ছিলাম, মনে আছে?'

দুই পুরনো বন্ধু, প্রায় বাইশ বছর পর দেখা হলে যেসব কথাবার্তা বলে তাই বলতে বলতে ওরা প্লেনে উঠল। বোর্ডিং কার্ডে সিট নাম্বার পাশাপাশি না হওয়া সত্ত্বেও যশোবন্ত পাশে বসল।

যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছিস বল? চাকরি নিশ্চয়ই?'

'করতাম। এখন করি না। টিভি সিরিয়াল তৈরির ব্যবসা করছি।'

'আচ্ছা। ওলেছি অনেক পয়সা আছে ওই লাইনে।'

'খাটনি আর খামেলা কম নেই। তোর শোভনলালকে মনে আছে, আমাদের থেকে একটু সিনিয়র ছিল। পুসা রোডে ওর বাবার দোকান ছিল জামাকাপড়ের। আরে যে ক্রিকেটে করোলবাগ স্কুলের বিক্রেতা সেধুরি করেছিল।'

'ঠিক মনে পড়ছে না ইয়ার।'

'ও। সেই শোভনলাল আমার পার্টনার। ও দিল্লিতে থাকে। আমরা দুজনে সমান ক্যাপিটাল নিয়ে শুরু করেছি। সিরিয়াল দেখিস? গত মাসে আমাদের বাহান এপিসোডের সিরিয়াল 'তসবির' শেষ হল।'

'প্রফিট?'

‘হ্যাঁ। আমি কলকাতায় বসে ডিরেক্টর আর্টিস্ট টেকনিশিয়ান সামলাই। বোম্বের দুজন অভিনেতা অভিনেত্রী আছে। লো বাজেট। দুই খরচ হয় পার এপিসোডে। পাই তিনের মতো। বাহান্ন লাখ থাকার কথা। কিন্তু—’

‘কিন্তু?’

‘দিল্লিতেও খরচ আছে। শোভনলালের সঙ্গে মাণ্ডি হাউসের ভাল সম্পর্ক, তবু টাকা খরচ হয়। স্পনসরদের হাতে রাখতেও খরচ করতে হয়।’

‘তা তুই দিল্লি যাচ্ছিস ওই ব্যাপারে?’

‘হ্যাঁ। আমার পার্টনার একটু গোলমাল করছে হিসেব নিয়ে। ওর কথামতো বইশ লাখ পাওনা আমার। এখন বলছে গোলমাল ছিল, আরও কম হবে।’

‘দু-নম্বরী লোক নাকি?’

‘না না, হি ওয়াজ এ ডিসেন্ট পার্সন। এখন কি হল বুঝতে পারছি না। তুই এখন কি করছিস? কোথায় আছিস?’ অতীশ জিজ্ঞাসা করল।

‘সর্বত্র।’ যশোবন্ত হাসল।

‘বুঝলাম না।’

‘হোটেল বিজনেস। নদীতে অনেক ছল বয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। আমার মেইন বেস লুধিয়ানা। চতীগড় আস্থানাতেও হোটেল করেছি। সবই থ্রী স্টার। খেতিখামার আছে। তাই কোনমতে দিন চলে যাচ্ছে। বিয়ে করেছিলাম, বউ মরে গেল।’

‘তারপর?’

‘এখনও করিনি। দু-তিনজনকে ভাল লাগছে, কাকে করব বুঝতে পারছি না।’ যশোবন্ত এমন ধোরে হেসে উঠল যে এয়ার হোস্টেস অবাক হয়ে তাকাল।

পথটা ভালই কাটল অতীশের। এয়ারপোর্টে নামার আগে যশোবন্ত বলল, ‘দিল্লিতে কাজ শেষ করে সোজা আমার কাছে চলে আয়, হোটেল হলিডে বললে যে কেউ তোকে পৌঁছে দেবে। আমি এখন দিন পাঁচেক লুধিয়ানায় থাকব।’

অতীশ হেসে বলল, ‘তাহলে তুই ভালই আছিস।’

‘টেনসন ইয়ার, সবসময় টেনসন।’

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে যশোবন্ত চলে গেল চারজন লোকের সঙ্গে। ওরা এখানে অপেক্ষা করছিল। অতীশের মনে পড়ল কলকাতাতেও চারটে লোক ওকে ছাড়তে এসেছিল। যশোবন্ত কি চারজন বডিগার্ড ছাড়া ঘোরাফেরা করে না?

অতীশ দেখল শোভনলাল দাঁড়িয়ে আছে। কাছে বেতেই বলল, ‘ওয়েলকাম।’

অতীশ বলল, ‘আমার ইচ্ছে, আজ বিকেলের ফ্লাইটেই ফিরে যাব।’

‘বেশ তো।’

গাড়িতে উঠে শোভনলাল জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ?’

‘একথা উঠছে কেন?’

‘কাল রাতে তোমার কথা বলার ধরন আমার ভাল লাগেনি। পার্টনারশিপ ব্যবসায় যদি সমঝোতা না থাকে, তাহলে...’, শোভনলাল কথা শেষ করল না।

অতীশ বলল, ‘আমাদের শেষ এপিসোড টেলিকাস্ট হয়ে গিয়েছে অনেককাল। আমি তোমাকে পইপই করে বলেছি অ্যাকাউন্টস রেডি করে আমার শেয়ার দিয়ে দাও। কিন্তু তোমার অ্যাকাউন্টস তৈরিই হচ্ছে না। তুমি আমার ব্যাপারটা ভাবো।’

‘কি ভাবব? তুমি তো ধরেই নিয়েছ আমি টাকা মারছি?’

‘আমি কখনও একথা বলিনি শোভনলাল।’ অতীশের মেজাজ গরম হয়ে গেল।

‘সব কথা তো লোকে বলে না—বোঝায়।’

‘তুমি কি আজ অ্যাকাউন্টস দেখাতে পারবে?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘তাহলে এখন এ নিয়ে কথা বলে লাভ নেই।’

আজই কলকাতায় ফেরার ইচ্ছে নিয়ে দিল্লি আসেনি অতীশ। কিন্তু এয়ারপোর্টে শোভনলালকে দেখামাত্র মনে হয়েছিল ওর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে কথাটা বললে ভাল হয়। শোভনলাল অবশ্য জিজ্ঞাসা করতে পারত একদিনের জন্য যখন দিল্লিতে আসা, তখন সুটকেস নিয়ে আসতে গেলে কেন সে? প্রশ্নটা করেনি বলে স্বস্তি হল।

শোভনলালের গাড়ি ক্যাপিটাল হোটেলে পৌঁছে গেল। অতীশ জিজ্ঞাসা করল, ‘এখানে?’

‘দিল্লিতে এলে আমি এখানেই উঠি। মাণ্ডি হাউস, কনট প্লেস কাছাকাছি।’ ব্রিফকেস নিয়ে গাড়ি থেকে নামল শোভনলাল।

রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে শোভনলাল লিফটের দিকে এগিয়ে গেল। হোটেলটিতে সে বহুবার এসেছে তা বোঝাই যাচ্ছে চলনে। নিশ্চয়ই সেই বিলগুলোর অর্ধ অ্যাকাউন্টসে ঢোকানো আছে। কাজের জন্য কেউ যদি কয়েকদিন দিল্লিতে এসে একটু আরামে থাকতে চায়, তাহলে আপত্তি করার কিছু নেই। ব্যাপারটা শিখেছিল বেশ কয়েক বছর আগে। ব্যবসার জন্য নতুন জায়গায় গিয়ে কন্টেস্টে খুব গরিব জায়গায় থেকে পয়সা বাঁচিয়ে যদি কোনও কাজ বাগাতে চাও, তাহলে অবশ্যই সেই ব্যবসায় লাভ হবে অতি সামান্য। সামান্যতেই যারা সন্তুষ্ট তারা ওইভাবেই জীবন কাটিয়ে যায়। কিন্তু তুমি যদি চুনোপুটির বদলে রুইকাতলা ধরতে চাও, তাহলে কমপক্ষে থ্রী স্টারে থাকতে হবে, পার্টি দিতে হবে, খরচের হাতের আঙুল মুঠো করবে না। তোমার চারপাশে তারাই স্বচ্ছন্দ বোধ করবে যাদের হাতে বিশাল ব্যবসা দেবার ক্ষমতা আছে। অতএব শোভনলালের এই হোটেলে ওঠা নিয়ে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। লিফটে চেপে ওরা আটতলায় উঠে এল।

আটশ দশ নম্বর ঘরের চাবি খুলে ভেতরে ঢুকে শোভনলাল বলল, ‘এই হোটেলে এলে আমি এই ঘরেই থাকি। আর কপাল এমন, ঘরটা খালি থাকে।’ এসি মেশিন চালু করে শোভনলাল বলল, ‘যাও, একটু ফ্রেশ হয়ে নাও।’

ঘরটা বড়। ওপাশে খাট আর এপাশে টেবিলের দু-পাশে গদিমোড়া চারটে চেয়ার। তার একটাতে বসে পড়ল অতীশ, ‘দরকার হবে না।’

‘চা না কফি? বিয়ার খেতে চাইলে বলে দিচ্ছি।’ রিসিভার তুলল শোভনলাল।

‘ওসব পরে হবে। আগে এসো কাজের কথা শেষ করি।’

‘আরে। তুমি দেখছি ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে এসেছ। তোমার বিকেলের ফ্লাইটের তো অনেক দেরি আছে।’ এক পট চা দুজনের জন্য পাঠিয়ে দিতে বলল শোভনলাল, সঙ্গে চিকেন স্যাভউইচ। ব্রিফকেসটাকে টেবিলের ওপর রেখে উলটোদিকের চেয়ারে বসল সে, ‘বুঝলে অতীশ, সিরিয়াল বিজনেস দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।’

‘কেন?’

‘তুমি তো প্রোডাকশন করে খালাস, মার্কেটিং তো করছ না। এখন স্পনসররা টিপে টিপে মাল ছাড়ছে। আগে নেটওয়ার্কের প্রাইম টাইমে শ্লট পেলে পাঁচ লাখ পেতে অসুবিধে হত না, এখন দুই দিতে চাইছে না কেউ। বলে, মেট্রো চ্যানেলে শ্লট নিন।’

‘মেট্রো! সেটা তো অনেক কম লোকের কাছে যায়।’

‘ঠিক। কিন্তু ওরা বলে ফার্স্ট চ্যানেল গ্রামেগঞ্জে পাহাড়ে ভারতবর্ষ ছুড়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু ন্যানিটারি ন্যাপকিন, গাড়ি অথবা মোটরবাইক কেনার সামর্থ্য তাদের কল্পনের আছে? একটা পাহাড়ি গাঁয়ের মানুষ বিউটি কেয়ার নিয়ে মাথা ঘামাবে না। এসব ফেলে দোকালে যাবে শহরের মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তরা। বিজ্ঞাপনটা তারা দেখলেই কাজ হবে। গ্রামের গরিব কৃষক হাজারবার বিজ্ঞাপন দেখলেও কোম্পানির কোনও লাভ হচ্ছে না, ঠিক কথা। আবার মেট্রো চ্যানেলে আড়াই-এর বেশি কেউ দেবে না। তার ওপর আছে স্পনসরদের ডিম্যান্ড। বোম্বের ওই সিরিয়ালের অমুককে নিন, প্রতিটি দৃশ্য যেন একজন অল ইন্ডিয়া চেনা মুখ থাকে। আমাদের এই সিরিয়ালটা যেহেতু কলকাতায় তৈরি, তাই প্রথম দিকে সাবস্টিটিউট অ্যান্টিং পুওর—এসব বলা হচ্ছিল। কপালজোরে বাহান্নটা টেলিকাস্ট করাতে পেরেছি।’ শোভনলাল বলল।

‘তাহলে রোজ গাদা গাদা সিরিয়াল তৈরি হচ্ছে কেন?’

‘বেশি হচ্ছে বলে দাম কমছে,’ দাম কম পেলে স্ট্যান্ডার্ড নামছে। আমি জেরবার হয়ে গিয়েছি ভাই। এর চেয়ে কিছু না করে বাড়িতে বসে থাকা ঢের ভাল।’

চা এল। বেয়ারা সেগুলো পরিবেশন করে দিয়ে গেল।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অতীশ জিজ্ঞাসা করল, ‘শেয়ার অফ প্রফিট কত হয়েছে?’

‘চার করে, দুজনের আট লাখ।’ শোভনলাল জবাব দিল।

হাত কঁপে উঠে প্রেটে চা চলকে পড়ল অতীশের। নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না সে, ‘কি বললে? আট লাখ—দুজনের?’

‘আ্যাকাউন্টস দ্যাখো।’ চায়ে চুমুক দিল শোভনলাল। ‘তার মধ্যে লান্ট এপিসোডের টাকা এখনও স্পনসররা দেয়নি—এখনও আউটস্ট্যান্ডিং আছে। কিন্তু পাওয়া যাবে।’

চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল অতীশ, ‘তুমি কি বলতে চাইছ? বাহান্টা এপিসোডে আমরা মাত্র আট লাখ প্রফিট করেছি? এক কোটি ছাপ্পান্ন আমরা পেয়েছি, এক কোটি চারের মতো খরচ হয়েছে প্রডাকশনে—বাহান্ন লাখের মধ্যে ধরে নিচ্ছি—।’

হাত তুলে বাধা দিল শোভনলাল, ‘ধরে নেওয়ার কিছু নেই। কাগজে কলমে সব লেখা আছে, দেখে নাও।’ ত্রিফকেসটা খুলল সে। একটা ফাইল বের করল সেটা থেকে। কেসটা খোলাই রইল। অতীশ দেখল টুকটাক কিছু ভিনিসের পাশে কুচকুচে কালো ছোট রিভলবার গুয়ে আছে। শোভনলালের লাইসেন্স আছে। ত্রিফকেসে রিভলবার রাখা ওই অনেকদিনের অভ্যাস। কিন্তু এখন ওটা খুলে রেখে সে ইচ্ছে করেই কি তাকে দেখাচ্ছে? মেজাজটা আরও গরম হয়ে গেল অতীশের। হাত বাড়িয়ে ফাইলটা নিল।

টাইপ করা ইংরেজি হরফগুলো ক্রমশ আবছা হয়ে যাচ্ছিল অতীশের চোখের সামনে। বাহান্ন লক্ষ টাকার মধ্যে আউটস্ট্যান্ডিং বাদ দিয়ে যে পরিমাণ ঘুষ এবং পার্টি আপ্যায়নে খরচ দেখানো হয়েছে তা! একটি শিশুও বিশ্বাস করবে না। শোভনলালের দিল্লি যাওয়া-আসা, হোটেলের থাকার খরচের অঙ্কটাও বিপুল।

অতীশ ফাইলটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দিল, ‘এসব কি হচ্ছে?’

হাসল শোভনলাল, ‘বুঝলাম না।’

‘এসব বানানো, মিথ্যে। তুমি—তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ।’

‘কিরকম?’

‘বাহান্ন এপিসোডের জন্য তুমি পঁচিশ লাখ ঘুষ দিয়েছ?’

‘তুমি প্রমাণ কর, দিহিনি।’

‘আশ্চর্য। তুমি কি আমাকে নির্বোধ ভাবো?’

‘দ্যাখো অতীশ, কলকাতায় বসে প্রোডাকশন করছ। প্রতিটি এপিসোডের জন্য আমি তোমাকে দু-লাখ পাঠিয়েছি। দুজন বোম্বের আর্টিস্ট ছাড়া সবই কলকাতার। তারা কত টাকা নেয় সবাই জানে। আর প্রোডাকশন যেরকম ম্যাডমেডে, তা চালাতে আমি বহুৎ প্রবলেমে পড়েছিলাম। এইরকম মাল বানাতে যে দু-লাখ খরচ হয় না, তা একজন প্রোডাকশন বয়ও বলে দিতে পারে। কই, আমি কিন্তু তোমাকে বলিনি যে তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ! বলেছি?’ আবার হাসল শোভনলাল।

‘তা—তার মানে? আমি প্রোডাকশন থেকে টাকা সরিয়েছি?’ হতভম্ব হয়ে গেল অতীশ। নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না।

‘কলকাতায় একটা বাংলা সিরিয়ালের এপিসোড ষাট-পঁয়ষট্টিতে হয়ে যায়। হিন্দির জন্যে তোমার খরচ হতে পারে এক সওয়া—আর খরচ করার তো জায়গাই নেই। তবু আমি কিছু বলিনি, বলেছি?’

‘শোভনলাল! আমি কখনও চুরি করতে শিখিনি। আমাদের সিরিয়ালের ওটিং হয়েছে কখনও দীঘায়, কখনও দার্জিলিঙে। আউটডোরে যে খরচ হয়েছে তার ডিটেলস আমি তোমাকে পাঠিয়েছি। বোম্বের দুজন স্টার পার এপিসোড তিরিশ করে নিয়েছে, তুমি জানো? তুমি—তুমি টাকাটা মেরে দিতে চাইছ বলে আমাকে চোর বানাচ্ছ?’

‘ভদ্রভাবে কথা বল অতীশ।’

‘ছাড়! কি ভদ্রতা দেখতে চাও তুমি? আমার টাকা মেরে দিয়ে আমাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছ! নো, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না—আমার শেম্মার দাও।’

‘শেয়ার!’ তচ্ছিল্যের হাসি হাসল শোভনলাল। ‘আমি খেটেখুটে দরজায় দরজায় ঘুরে বিক্রি করলাম, আর ইনি গাছেরও খাবেন আর তলারও খাবেন!’

‘মুখ সামলে কথা বল শোভনলাল!’ চিৎকার করে উঠল অতীশ।

‘আই শালা, চুপ! একদম গলা তুলবে না। এটা দিল্লি, তোমার কলকাতা নয়। এরপর একপয়সাও দেওয়া উচিত নয় তোমাকে। যা দিতে চেয়েছি তা নিয়ে চুপচাপ কেটে পড়, ব্যস।’ হায়েনার মতো মুখ হয়ে গেল শোভনলালের।

‘তুমি আর টাকা দেবে না?’

‘না। ও কে?’

হঠাৎ খুব অসহায় মনে হল নিজেকে। সে ঝগড়া করতে পারে কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। কোর্টে গেলে অনন্তকাল মামলা চলবে, ফয়সালা হবে না। এখান থেকে খালি হাতে ফিরে গেলে! শেষ এপিসোডের দু-লাখ টাকা এখনও দেয়নি শোভনলাল। ওটা ন্যায্য পাওনা। পাওনাদাররা কলকাতায় বসে আছে। লোকটা তার পার্টনার, অথচ ঘুগাফুরেও বোঝেনি শেষ-পর্যন্ত এইরকম ব্যবহার করবে। আর শোভনলাল যে মজা পাচ্ছে তা ওর ঠোঁটের ভঙ্গি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এখন তার আত্মহত্যা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই। যারা টাকা পায় তারা কেউ বিশ্বাস করবে না যে সে প্রভাবিত হয়েছে। পৃথিবীটা এখন হঠাৎ কালো হয়ে গেল। হঠাৎ খোলা ব্রিফকেসে পড়ে থাকা রিভলবারটার ওপর নজর গেল অতীশের। শোভনলাল কি ওর মধ্যে গুলি ভরে রেখেছে? সে হিসহিসে গলায় বলল, ‘আর একবার বল শোভনলাল!’

‘কি বলব? আমি কি তোমার মতো ব্যাঙাচি নাকি? আর এক পয়সাও পাবে না। শোভনলালকে যে চোখ রাঙায় তাকে শেষ পর্যন্ত খালি হাতে ফিরে যেতে হয়।’

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র চট করে রিভলবারটা তুলে নিল অতীশ। শোভনলাল কিছু বলার সুযোগ পেল না, ট্রিগার টিপল সে। শব্দ হল। অতীশ দেখল শোভনলালের ঠোঁট কঁপে উঠল। শরীরটা একটু টলেই, কাত হয়ে পড়ে গেল চেয়ারের এক পাশে।

রক্ত বের হচ্ছে শোভনলালের বুক থেকে। প্রচণ্ড নাড়া খেল অতীশ। এ কি করল সে? শোভনলালকে সে দুম করে মেরে ফেলল! শোভনলাল কি এখনও বেঁচে আছে? সিনেমায় দেখা খুন হয়ে যাওয়া মানুষের মুখের সঙ্গে এখন ওর কোনও পার্থক্য নেই। আমি—আমি খুন করলাম? হঠাৎ একটা কান্না শরীর কাঁপিয়ে গলায় আছড়ে পড়তে চাইল। কোনক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে সেটাকে সামলালো সে। এখন কি হবে? নিশ্চয়ই পুলিশ আসবে।

না—পালাতে হবে। রিভলবারটাকে পকেটে পুরে স্টুকেস তুলে নিল অতীশ। তারপরেই ফাইল এবং শোভনলালের ব্রিফকেস নজরে এল। ফাইলে তাদের বিজনেসের অ্যাকাউন্টস রয়েছে, ব্রিফকেসে আর কি আছে তার জানা নেই। সে ব্রিফকেসও তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল।

গুলির শব্দে এর মধ্যে হোটেলের লোকজনের ছুটে আসার কথা, কিন্তু কেউ এখনও আসছে না কেন? যতই শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘর হোক, গুলির শব্দ বাইরে থেকে কেউ না কেউ শুনেছে। অতীশ স্টুকেস নামিয়ে দরজা খুলল। করিডোর ফাঁকা। সে স্টুকেস তুলে নিয়ে বাইরে এসে পা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

এক হাতে স্টুকেস অন্য হাতে ব্রিফকেস নিয়ে করিডোর পেরিয়ে দ্রুত লিফটের সামনে চলে আসতেই লিফটের খাঁচা খুলে গেল। এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই অতীশ লিফটে উঠে নিচে নামার বোতাম টিপল এবং তখনই সে বুঝতে পারল তার ঘাম হচ্ছে। লিফটের দরজা খুলতেই সে লম্বা পা ফেলতে লাগল।

একটু বাদেই অতীশ দিল্লির ফুটপাথে দু-হাতে দুটো বোঝা নিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র হঁশ ছিল না তার, কেবলই মনে হচ্ছিল ওই হোটেলের চৌহদ্দি থেকে যতটা দূরে সম্ভব তাকে চলে যেতে হবে। একটা সময় চোখ ঝাপসা হয়ে যেতে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাম গড়াচ্ছে কপাল থেকে, চোখে তারই হোঁয়া। স্টুকেসে ও দুটো জিনিস নামিয়ে ক্রমাল বের করে মুখ মুছতেই তার মনে প্রচণ্ড শীত ঢুকে গেল। এইমাত্র সে একটা খুন করে এসেছে। শোভনলাল বেঁচে

নেই—আর খুনের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। অতীশ চিৎকার করে একটা অটোরিকশাকে থামিয়ে তাতে উঠে পড়ল। ড্রাইভারকে বলল, ‘কনট প্রেস।’

তার গেলি এবং শার্ট ভিলে গেছে। রুমালটাও এখন সপসপে। অটো চলতেই মুখে বাতাস লাগায় প্রচুর আরাম হল। অটোর তিনদিক ঢাকা বলে কিরকম নিরাপদ নিরাপদ মনে হচ্ছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, ‘কোথায় নামবেন?’

নেমে পড়ল সে। ভাড়া মিটিয়ে দিতেই অটো চলে গেল। যাওয়ার আগে যেন তার দিকে অন্ত্রুত ভঙ্গিতে তাকাল। কেন তাকাল? সে তো স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই বসে ছিল!

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অতীশের মাথা কাজ করছিল না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই হোটেল থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে। পুলিশ এসেই জানতে পারবে সে শোভনলালের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিল এবং রিসেপশনের সামনে দিয়ে একা বেরিয়ে গেছে। বাস, আর দেখতে হবে না। আর কিছুক্ষণের মধ্যে তাকে খোঁজার জন্য দিমির পুলিশবাহিনী বেরিয়ে পড়বে।

এই শহরে সে বাল্যকালে ছিল। বাবা বদলি হয়ে যাওয়ায় তাকেও কলকাতা চলে যেতে হয়েছিল। এখন কোনও মুখ মনে পড়ছে না। অথচ হোটеле উঠতে তার সাহস হচ্ছিল না। পুলিশ নিশ্চয়ই হোটেলের হোটেলের তার খোঁজ করবে। এখন এই উরদুপুরে সে কোথায় যাবে? সঙ্গে সুটকেস এবং ব্রিফকেস নিয়ে কোথায় যাওয়া যায়?

আর তখনই যশোবন্তের কথা মাথায় এল। আজ হঠাৎই এয়ারপোর্টে দেখা হয়েছে যার সঙ্গে, তার কাছে কি যাওয়া যায়? অতীশের মন বলল, যায়। দমদমে চারজন লোক যাকে পৌঁছাতে আসে, দিমিতে চারজন লোক যাকে রিসিভ করে—সে নিচুতলায় মানুষ হতেই পারে না। বরং যশোবন্তের কাছে গেলে একটা-না-একটা সাহায্য পেতে পারে সে।

যশোবন্ত থাকে লুমিয়ানায়। সেখানে কি করে যাওয়া যায়? ট্রেন কখন কে জানে? আর ট্রেন ধরতে স্টেশনে যেতে হবে। এতক্ষণে পুলিশ কি স্টেশন বা এয়ারপোর্টে তার খোঁজে চলে যায়নি? অতীশের খেয়াল হল, দিমি থেকে বাসে বহু জায়গায় যাওয়ার সুবিধে আছে। সঙ্গে সঙ্গে সে আর একটা অটো ডেকে উঠে পড়ল। ওঠার সময় বুঝতে পারল তার দু পায়ে একটুও শক্তি অবশিষ্ট নেই, এতক্ষণ কিভাবে দাঁড়িয়েছিল কে জানে।

ভেজা ভেজা রুমালটাকে মুখে চেপে বসেছিল অতীশ। হ হ করে অটো ছুটে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কোন্ রাস্তা দিয়ে সে ব্যাপারে কোনও ধাঁশ ছিল না তার। নিজেকে ভীষণ দুর্বল বলে মনে হচ্ছিল। হাত পা ঝিমঝিম করছে—মাথা ঘুরছে—চোখের সামনে শোভনলালের হেলে পড়া শরীরটা বারংবার ভেসে উঠছে। যে শোভনলাল তার সঙ্গে অত্যন্ত দান্তিক হয়ে কথা বলছিল, একটা ছোট্ট গুলি শরীরে ঢোকামাত্র সে কিরকম হয়ে গেল। ওই দস্ত, ওই শরীরটার মালিকানা এক মুহূর্তেই হারিয়ে ফেলল। কিন্তু শোভনলালকে সে খুন করতে চায়নি। তার যাই হোক, একটা মানুষকে কেন সে খুন করবে, কিন্তু কি করে যে হয়ে গেল ব্যাপারটা—।

‘সাব, এসে গেছি’ অটোর ড্রাইভার গভীর গলায় বলল।

ধাঁশ এল অতীশের। এবং তখনই সে দিমির স্টেশনটা দেখতে পেল। এখানে কেন? সে তো বাস টার্মিনাসে যেতে চেয়েছিল? সে বিরক্ত হল, ‘তুমি এখানে নিয়ে এল কেন? আমি তোমাকে বাস টার্মিনাসে যেতে বলেছিলাম।’

‘না স্যার, আপনি স্টেশনের কথা বলেছিলেন।’ লোকটা প্রতিবাদ করল।

আশ্চর্য। সে নিজে স্টেশনে যেতে চাইছে না যে কারণে সেটা ভুলে গিয়ে স্টেশনের কথা বলবে কেন? আবার না বললে অটোওয়াল তাকে এখানে থামোকা নিয়ে আসবে কেন? নিজের কাছেই ধাঁধা লেগে গেল তার।

সে বলল, ‘ঠিক আছে।’

ভাড়া মিটিয়ে মাল নিয়ে নামতেই কুলি ছুটে এল। অতীশ তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘লুমিয়ানার ট্রেন কখন পাওয়া যাবে?’

‘আজি এক ট্রেন ছুট গিয়া সাব, ফির মিলেগা রাত আট বাজে।’

রাত আটটা! এখনও প্রায় সাত ঘণ্টা বাকি। এতক্ষণ এখানে থাকলে পুলিশ তাকে ঠিক ধরে ফেলবে।

কিন্তু বাস টার্মিনাসেও যদি পুলিশ তার জন্যে অপেক্ষা করে? স্টেশনের চৌহদ্দি তো বাস টার্মিনাসের চেয়ে বড়। ওখানে গিয়ে যদি শোনে চার ঘণ্টার মধ্যে বাস নেই, তাহলে? কুলির হাতে সুটকেস দেওয়ার কোনও দরকার ছিল না, তবু দু হাতে দুটো নিয়ে হাঁটার অস্বস্তি এড়াতে সেটা দিয়ে দিল অতীশ।

এসি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাটল সে। বেশি লোকজনের মধ্যে বসতে হবে না, তাকে চিনে ফেলতে পারবে না কেউ। কুলি জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, ট্রেন কো বহৎ দের হ্যায়। আপ কাঁহা ঠারেগা, ওয়েটিং রুম?'

মাথা নাড়ল অতীশ। টিকিট দেখিয়ে ওয়েটিং রুমে ঢুকে কুলিকে ছেড়ে দিল অতীশ। ওয়েটিং রুমে দুটো পরিবার আছে। গভীর গভীর মুখ। কেউ কথা বলছে না। একজন পুলিশ অফিসার দরজা দিয়ে ঢুকলেই তাকে চিনতে পারবে। একটু একটু করে অস্বস্তি বাড়তে লাগল। শেষপর্যন্ত বোঝা দুটো নিয়ে বেরিয়ে এল সে। কুলির সঙ্গে এদিকে আসার সময় দেখেছে, স্টেশনে এক জায়গায় প্রচুর লোক মালপত্র নিয়ে বসে গুলতানি করছে। বেশ ভিড় সেখানে। আলাদা করে কাউকে নজরে পড়েনি।

অতীশ সেখানে চলে এল। লোকগুলো মালপত্র নিয়ে মেঝের ওপর বসে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কোনও বেঞ্চি খালি নেই। তাদের ফাঁক গলে ও একটা দেওয়ালের ধারে এসে সুটকেস রেখে তার ওপর বসে পড়ল ব্রিককেস পাশে নিয়ে। এখন ক্রি চট করে তাকে চিনতে পারবে পুলিশ।

এই সময় পাশে বসা এক দেহাতি বুড়ো তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'সাব, আপনার শরীর কি খারাপ? এত ঘামছেন কেন?'

অতীশ রুমাল বের করে ঘাম মুছল। সে বুঝতে পারছিল তার রক্তচাপ কমে গেছে খুব। চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়ে লোকটার কথার জবাব দিল সে।

'তাহলে আরাম করে বসুন।' লোকটা একটা চাদর পেতে দিল সুটকেসের পাশে।

বিনা বাক্যব্যয়ে সেই চাদরের ওপর বসে পড়ল সে। সুটকেসটাকে পেছনে রেখে হেলান দিতেই পকেটে টাম পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মেরুদণ্ড বেয়ে হিমশ্রোত নামল। রিভলবার তখন যে পকেটে রেখেছিল তা মন থেকে উড়ে গিয়েছিল একেবারে। এখন বসতে অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। সবার সামনে পকেট থেকে ওই জিনিষটা বের করা যাবে না।

শোভনলাল রিভলবারে কটা গুলি ভরেছিল? একটা গুলি নিশ্চয়ই নয়, তাহলে ওর মধ্যে আরও গুলি রয়েছে। ট্রিগারে চাপ পড়লে বেরিয়ে আসতে পারে? শিরশির করল শরীর। কিন্তু ট্রিগারে চাপ পড়বে কি করে? ওকে ঘিরে তো খাতব দেওয়াল রয়েছে। চাপ তো সেটাই আটকাবে। কিন্তু এখন যদি পুলিশ তাকে ধরে? রিভলবার পেয়ে গেলে প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না সে-ই খুনি। শোভনলালের শরীর থেকে গুলি বের করলে সেটা আরও সহজ হয়ে যাবে। নড়ুন করে ঘাম বের হল।

'লিজিয়ে। এটা দিয়ে মুখ মুছে নিন। আরাম হবে।'

অতীশ দেখল লোকটা একটা ভেজা গামছা তার দিকে এগিয়ে ধরেছে। সেটা নিয়ে মুখে চেপে ধরতে শরীর গুলিয়ে উঠল। কী বোঁটকা গন্ধ! অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ঠাণ্ডা গামছার স্পর্শ পেয়ে চামড়া আরামও পেল। নিশ্বাস বন্ধ করে ঘাড়ে বুকে গলায় ভেজা গামছা বুলিয়ে সেটা ফেরত দিয়ে অতীশ বলল, 'থ্যাঙ্কু।' কথাটা বলেই তার খেয়াল হল, এই শিক্ষিত ভদ্রতা ওই মানুষটার সঙ্গে করা অন্যায় হয়েছে। হয়তো শব্দটার অর্থ ওর কাছে পরিষ্কার নয়, অথবা ধন্যবাদ পাওয়ার জন্যে ও কিছু করেনি। অতীশ হাসার চেষ্টা করল।

তার শরীর এত খারাপ কখনও হয়নি। সে প্রাণপণে শক্ত হতে চাইছিল। দূরে সুবেশ মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে। সে বসে আছে যাদের মধ্যে তাদের কেউ ভদ্রলোক বলে না, অথচ তার পরনে দামী জামাকাপড়—ছুতোটার দামই দেড় হাজার। একটু ভাল করে দেখলে লোকে বুঝতে পারবে এদের সঙ্গে সে বেমানান। পুলিশ তো আগেই বুঝবে। কিন্তু তার কিছু করার নেই। তার একটুও ক্ষমতা নেই এখান থেকে ওঠার। শোভনলালের শরীরটা গুলিবিদ্ধ হওয়ামাত্র কিভাবে বুলে গেল। খুন হলে মানুষের ওই অবস্থা হয়? অবশ্য হিন্দি ছবি, ইংরেজি ছবি, ফেস্টিভ্যালে দেখা জাপানি অথবা আফ্রিকান ছবিতেও গুলিতে যেসব চরিত্র মরে তাদের অনেকে ওই একই ভঙ্গি করেছে।

অতএব মনে করতেনই হবে, ওই এক জায়গায় চলচ্চিত্রনির্মাতারা অত্যন্ত জীবননিষ্ঠ।

হঠাৎ অতীশের মনে হল সে যদি চূপচাপ এয়ারপোর্টে চলে যায়? সেখানে গিয়ে কলকাতার প্রেন ধরে সন্ধ্যার মুখে বাড়ি? বনানীকে বলবে ডাক্তারবাবুকে ফোন করে বলতে তার শরীর সকাল থেকে খুব

খারাপ হয়েছে, কেবলই ঘাম হচ্ছে, সারাদিন বিছানা থেকে নামেনি। তিনি যেন একটু দেখে যান। বনানীকে একটু বোঝাতে হবে, বনানী সবাইকে বলবে সে সারাদিন শরীরের কারণে বাড়ির বাইরে যায়নি। বনানী নিশ্চয়ই একটু ঝামেলা করবে—মিথ্যে কথা বলতে ওর বেশ অসুবিধে হয়, তবে স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে বাঙালি মেয়েরা তো সব কিছু করতে পারে। বনানীই বা পারবে না কেন? সে অসুস্থ ছিল, বাড়ি থেকে বের হয়নি, ডাক্তার দেখে গেছে—অতএব দিমিত্তে আসার প্রশ্ন ওঠে না, এইরকম একটা অজুহাত খাড়া করতে পারলে পুলিশ বিভ্রান্ত হবে। সে যে দিমিত্তে এসেছিল তা পুলিশ কি করে প্রমাণ করবে?

এই অবধি ভেবে মনে বল পেল অতীশ। সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা যেন সামান্য ভাল হয়ে গেল। তা হলে এখন এখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরতে হয় প্লেনের জন্য। এখন ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ছাড়াও আরও কয়েকটা প্রাইভেট এয়ারলাইন্স দিমি কলকাতায় প্লেন চালায়। টিকিট পেতে অসুবিধে হবে না।

তারপরেই থমকে গেল সে। পুলিশ যদি এয়ারপোর্টে তার জন্য অপেক্ষা করে? হোটেলের রিসেপশনে সই করার সময় রিসেপশনিস্ট শোভনলালকে জিজ্ঞাসা করেছিল, স্যার মনিং ফ্লাইটে এলেন? শোভনলাল ঘাড় নেড়েছিল। সেই কথা ওই রিসেপশনিস্ট পুলিশকে বললে পুলিশ এয়ারপোর্টে নজর রাখবেই। অত্যাচার যে গাড়ি নিয়ে শোভনলাল স্টেশনে এসেছিল সেটা কার? নিশ্চয়ই শোভনলালের নয়। ও নিশ্চয়ই ভাড়া করেছিল সারাদিনের জন্য। সে ব্যাটা হোটেলের পার্কিং স্পটে অপেক্ষা করছে, কারণ গাড়ি থেকে নেমে হোটলে ঢোকার সময় ড্রাইভারকে কোনও পেমেন্ট শোভনলাল করেনি। ওই লোকটাকে নিশ্চয়ই পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করবে এবং জামিনে শোভনলাল তাকে স্টেশন থেকে তুলে হোটলে নিয়ে গিয়েছিল। তাহলে কি দাঁড়াল? পুলিশ তার খোঁজে স্টেশনে আসবে, না এয়ারপোর্টে যাবে? কয়েক সেকেন্ড ভাবার পর মনে হল স্টেশনেই আসবে। তাহলে এয়ারপোর্টে যাওয়া হয়তো যায়। অতীশ ওঠার চেষ্টা করল। পাশে বসা দেহাতি লোকটা বলে উঠল, 'আরে না না। এখন উঠবেন না—আপনার ট্রেন কখন?'

'রাব্রো!'

'অনেক দেরি আছে। এখন একটু আরাম করুন।'

আরাম। কিছু বলতে যাচ্ছিল অতীশ, কিন্তু ধীরে ধীরে সে বসে পড়ল। বসে চোখ বন্ধ করল। বেশ কিছুটা দূরে দুজন কনস্টেবল চারপাশে নজর বোলাতে বোলাতে আসছে। কি হবে এখন? ওরা যদি তাকে ধরে, তাহলে কালকেই কলকাতায় সব কাগজে খবরটা বের হবে—দিমিত্তি হোটলে পার্টনারকে খুনের জন্মে বাঙালি গ্রেফতার। হয়তো ছবিও থাকবে। বনানী বা খুশী সেই খবর দেখে কি করবে? ভাবতেই শিউরে উঠল অতীশ। সে চোখ খুলল না। নিজেই সেই হরিণের মতো মনে হচ্ছিল যে বিপদে পড়ে ঝোপের মধ্যে মুখ গুঁজে ভাবে নিরাপদ।

'সাব্! সাব্!' ডাকটা কানে যেতেই হৃদয়ডুড়িয়ে উঠে বসল অতীশ। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? চট করে ব্রিফকেস আর স্যুটকেসটাকে দেখে নিয়ে লোকটির দিকে তাকাল। লোকটির হাতে একটা বাটি। সেটা এগিয়ে ধরে বলল, 'আপনার একটু খেয়ে নেওয়া উচিত। পেটে কিছু গেলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে।'

অতীশের খেয়াল হল। সকালে প্লেনে যা খেয়েছিল, তারপর আর কিছুই পেটে যায়নি। এখন কোনরকম খিদে-বোধই নেই। শরীরে শুধুই অবসন্ন ভাব। দেহাতি মানুষটা আবার অনুরোধ করল। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে বাটিটা নিল সে। কি এটা? থকথকে বস্তুটি যে ছাতু তা বুঝতে একটু সময় লাগল। আঙ্গুর বাড়িতে কেউ ছাতু খাওয়ার কথা ভাবতে পারে না। ছেলেবেলায় মা মাঝেমাঝে ছাতু মাখতো। ছাতু নিয়ে করা মায়ের সেইসব এন্ডপেরিমেন্ট বেশ আগ্রহ তৈরি করত। এখন কলকাতার ফ্ল্যাটে প্রচুর দামী খাবার চুকলেও ছাতু ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। এখন বাটি হাতে অতীশের মনে হল, খেলে মন্দ হয় না। কিন্তু লোকটা তাকে চামচ দেয়নি—হাতে যত রাজ্যের ময়লা, সে একটা আঙুল গামছায় মুছে নিয়ে তাই দিয়ে ছাতু তুলে মুখে দিল। নোনতা নোনতা স্বাদ। এমন কিছু আহামরি নয়। জীবনে দ্বিতীয়বার ঠিক এই জিনিস পেলে সে খাবে না। কিন্তু এখন মন্দ লাগছে না। একটু একটু করে অনেকখানি খেয়ে ফেলল সে। বাটি নামিয়ে রাখতে লোকটা অবশিষ্ট অংশ দেখে বলল, 'ঠিক হয়, যতটুকু ভাল লেগেছে ততটুকু খাওয়া উচিত। এই গিন ভাল।'

অ্যালুমিনিয়ামের প্লাসে সে কি কখনও জল খেয়েছে? তবু সেটা গলা দিয়ে নামামাত্র চমৎকার তৃপ্তি হল। ছোট্ট টের্কুর উঠল। এবার লোকটি বলল, 'ঠিক আছে, আবার শুয়ে পড়ুন। দেহাতি লোকটিকে এখন ঈশ্বরের মত মনে হচ্ছে। খালি পেটে খাবার পড়ায় শরীর আরাম চাইছে। অতীশ স্যুটকেসে হেলান দিয়ে

চোখ বন্ধ করল। আচ্ছা, এই লোকটা আগ বাড়িয়ে তাকে এমন যত্ন করছে কেন? মতলব কি ওর? গ্রামের মানুষ সরল হয়, একথা তো এখন গল্পো হয়ে গেছে। তাহলে? লোকটা যদি শোনে যে আজ একটা মানুষ খুন করেছে এবং এখনও পকেটে রিভলবার রয়েছে। তাহলে ওর কি প্রতিক্রিয়া হবে? মনে মনে হাসল। এবং তখনই চোখের পাতায় চলে এল শোভনলাল। গুলিটা বুকে বঁধামাত্র ওর মুখ কি রকম হয়ে গেল! একপাশে ঢলে পড়ার সময় নিশ্চয়ই ওর শ্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল। উঃ।

‘সাব্! সাব্!’

ডাক শুনে চোখ খুলল সে। লোকটি এবার ব্যস্ত, ‘আপনি কোথায় যাবেন?’

‘কলকাতা।’

‘আচ্ছা। কটার সময় ট্রেন?’

‘রাত্রে।’

‘এখন তো সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমার ট্রেন এই এল বলে। আমাকে যেতে হবে যে!’

‘ও।’

‘আপনার শরীর খারাপ, একা একা কলকাতায় যেতে পারবেন?’

‘কি করব?’

‘আপনি আমার সঙ্গে চলুন, গ্রামে কিছুদিন থাকলে শরীর ভাল হয়ে যাবে, তখন কলকাতায় চলে যাবেন। আমাদের গ্রামের জল শহরের দুধের থেকেও ভাল।’

‘না, ঠিক আছে।’

‘অনেক অনেক ধন্যবাদ।’ অতীশ হাত নাড়ল।

লোকটা কি বুঝল সে-ই জানে। পৌঁটলাপুটলি নিয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে সঙ্গীদের ধরার জন্যে দৌড় শুরু করল। অতীশ দেখল চতুরটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। আর সেই শূন্য চতুরে সে একা বসে আছে। ফলে যারা ওই দিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তারা অবাক হয়ে তাকে দেখছে। এতক্ষণ জনতার আড়ালে থাকায় কারও নজর তার দিকে পড়েনি।

অতীশ উঠল। মাথাটা একটু টলে গেলেও মনে হল শরীরের দুর্বলতা কমেছে। সে সুটকেস আর ব্রিফকেস নিয়ে একটু হেঁটে একটা থামের পাশে দাঁড়াল। চারপাশে আলো জ্বলছে। ঘড়ি দেখল—সাতটা সাঁতটা। আর আধঘণ্টা পরে তার ট্রেন। এতটা সময় কিভাবে কেটে গেল সে টের পায়নি। ইঠাৎ সে দেখতে পেল একজন পুলিশ অফিসার প্রায় মার্চ করার ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। অতীশের হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। হয়ে গেল। তার আর কিছু করার নেই। না, সে ধরা দেবে না। কিছুতেই নয়। জেলে পড়ে মরার বা ফাঁসিত খোলার চেয়ে নিজেই নিজের ব্যবস্থা করবে। সুটকেস নামিয়ে রেখে সে চট করে পকেটে হাত ঢোকাল। রিভলবারটার স্পর্শ পাওয়ামাত্র মনের জোর বেড়ে গেল। অফিসার তাকে গ্রেফতার করতে এলেই সে নিজের মাথায় গুলি চালাবে। সে লোকটাকে লক্ষ্য করল। মার্চ করার ভঙ্গিতে তার সামনে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল পুলিশ অফিসার। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরের রক্তস্রোত বিপরীতে বইতে লাগল।

এ সি ফার্স্টক্লাসের দরজায় কন্ডাক্টর গার্ডকে টিকিট দেখাতে ভদ্রলোক তাকে ক্যুপটা দেখিয়ে দিলেন। অতীশ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই ধমকে গেল। এমন দৃশ্য দেখবে সে কল্পনা করেনি। প্রচণ্ড মোটা একটা লোক বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে এক সুন্দরীকে চুমু খাচ্ছে। তাকে দেখেও মেয়েটা একটু লজ্জা পেল না। সে উলটোদিকের বেঞ্চিতে সুটকেস রেখে ধপ করে বসে পড়তেই লোকটা কুৎকুতে চোখে তার দিকে তাকাল। মেয়ে ফোলা মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ল না। কিন্তু হাত শিথিল হওয়ায় মেয়েটি খানিকটা সরে গিয়ে একটু ভদ্রভাবে বসল। লোকটি সাদা পাঞ্জাবি আর পায়জামা পরে আছে। গলায় সোনার চেন। হাতে দু-মুঠো হীরের আংটি। মেয়েটির পরনে লাল গেঞ্জি আর প্যান্ট।

লোকটি কথা বলল হিন্দিতে, ‘নমস্কার। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’

‘লুধিয়ানা!’ বলামাত্র মনে হল কেন বললাম? আর একটা লোক সাক্ষী থেকে গেল।

‘আরে, আমরাও তো লুধিয়ানা যাচ্ছি। ইনি আমার ওয়াইফ, সুধা। আর আমার নাম কিষেনলাল। আপনার নাম?’ লোকটি পকেট থেকে পানপরাগ বের করে মুখে ঢালল।

‘অতীশ।’ মুখ-ফসকে বেরিয়ে গেল। নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল এইসময়।

এইসময় ট্রেন চালু হল। কিষেনলাল বলল, ‘আমি শালা বুকিং ক্লার্ককে বললাম, দুজনের জন্যে ক্যুপ চাই। যা মাল লাগে দিচ্ছি। দেখুন, আপনাকে ঢুকিয়ে দিল। ওই চার নম্বরে লোক না এলে বাঁচি। আমি একটু মালউল খাই, অনেক প্যাসেঞ্জার সেটা পছন্দ করে না। আপনার আপত্তি নেই তো?’

‘না, না। আপনি খেতে পারেন।’ অতীশ চোখ বন্ধ করল। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরায় বসে এখন আরাম লাগছে তার। সে চোখ খুলল।

‘সুধা, মাই ডালিং! সার্ভ করো।’

লোকটি হুকুম করতেই মেয়েটি ভিড়িং করে উঠে স্ত্রী-এর মতো চলে গেল একটা বাল্কেটের সামনে। সেখান থেকে ব্ল্যাক লেভেল হুইস্কির বোতল বের করল, সঙ্গে জলের বোতল এবং দুটো গ্লাস।

কিষেনলাল বলল, ‘আরে করছটা কি? তিনজন লোক—আর দুটো গ্লাস? আর একটা বের কর! কাজুর প্যাকেটগুলো চাই।’

অতীশ মাথা নাড়ল, ‘আপনারা খান।’

‘কেন? আপনি খান না? আরে মশাই, চেহারা দেখলে আমি বলে দিতে পারি কে খায় কে খায় না। অন্তত একটা কি দুটো খান, দেখবেন নার্ভ ঠিক হয়ে যাবে।’

নার্ড ঠিক হয়ে যাবে? এই লোকটা জানল কি করে তার নার্ভ বেঠিক? মুখ দেখে বোঝা যায় নাকি কে খুদী কে নয়?

অতীশ দেখল মেয়েটা তার সামনে চলে এসে গ্লাস বাড়িয়ে দিয়েছে। চোখাচোখি হতেই মেয়েটা হাসি ঠোট থেকে ভুলে নিয়ে নেটায় মোচড় দিল। ওর পেছনে বসে থাকায় কিষেনলাল দৃশ্যটা দেখতে পেল না।

এখন কারও সঙ্গে বিরোধ গেলেই সে তাকে মনে রাখবে। অতীশ গ্লাস নিল। ট্রেন ছুটে চলেছে হু-হু করে। কিষেনলাল ‘চিয়াস’ বলে চেঁচাতেই সে মুখ তুলল। মেয়েটি গ্লাস হাতে বসে আছে কিষেনলালের শরীর বেঁয়ে। তার কাঁধে কিষেনলালের হাত। সে দেখল লোকটা একবারে গ্লাসের অর্ধেকটা খালি করে সামনে রাখল। একটা কাজু মুখে পুরে বলল, ‘এটা খান। ভাল লাগবে।’

অতীশ চুমুক দিল। স্বচের স্বাদ আভ্র উপভোগ করতে পারল না সে।

কিষেনলাল জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কি করেন? চাকরি?’

‘না, ব্যবসা।’

‘ওউ। মনে হয় আপনি বাঙালি?’

‘হ্যাঁ।’

‘বাঃ। বাঙালিরা শুনেছি চাকরি করাটাই পছন্দ করে।—কিসের ব্যবসা?’

‘চায়ের বাগান আছে।’ বেগালুম মিথো বলতে পারল অতীশ।

‘চায়ের মার্কেট তো এই ক’বছর বেশ ভাল।’ দ্বিতীয়বারে গ্লাস শেষ করে মেয়েটার হাতে তুলে দিল কিষেনলাল। মেয়েটা আবার সেটা ভরে দিচ্ছিল, কিষেনলাল বলল, ‘আমার ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের ব্যবসা। আমার বাড়িতে দেখবেন সব বিদেশি মাল। শুধু জামাকাপড় আর বউ আমি বিদেশের পছন্দ করি না। আমাদের দিশি ভিনিস ও দুটোর ক্ষেত্রে টপ অফ দি ওয়ার্ল্ড।’ গ্লাস নিতে নিতে সুধার গালে টুক করে একটা চুমু খেয়ে নিল লোকটা।

মেয়েটির গ্লাস যখন শেষ তখনও অতীশের অর্ধেক হয়নি। কিষেনলালের তিন নম্বর চলছে। কিষেনলাল জিজ্ঞাসা করল, ‘লুধিয়ানায় কদিন থাকবেন?’

‘দেখি। ঠিক নেই।’

‘আরে আপনি আরাম করে বসুন না। সারারাত যেতে হবে। ওখানে আমার দু-দুটো বাড়ি আছে, কিন্তু আমি হোটেলে উঠি।’

‘হোটেল?’

‘হ্যাঁ। দুই বাড়িতে দুই বউ বাচ্চাদের নিয়ে থাকে। মেয়েদের নিশ্চয়ই জানেন, কেউ কাউকে সহ্য করতে

পারে না। হয় দিন থাকি—তিন রাত বড় বউ—এর সঙ্গে তিন রাত ছোট বউ—এর কাছে। দিনভর সুধার সঙ্গে হোটেলের।’

‘সবাই মেনে নিয়েছে?’

‘নেবে না মানে? যাবে কোথায়? মানুষ গন্ধে সব অবশ হয়ে আছে। চিন্তাবে যে তার শক্তি কোথায়? এই যে আমি মাসে একবার যাই সেটাই ওদের ভাগ্য!’

ছয় নম্বর গ্লাস পেটে চালান করেও কথা বলছিল লোকটা। এখন ওর গলার স্বর জড়িয়ে এসেছে। অতীশকে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি খাওয়ার জন্যে। আশ্বাস দিয়েছে মদের জন্যে চিন্তা না করতে, প্রচুর স্টক সঙ্গে আছে।

অতীশ বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় গ্লাস নিয়েছে। কিন্তু মদ খেয়ে একটুও ভাল লাগছে না তার। আর যত সময় যাচ্ছে লোকটার চক্ষুশব্দ তত কমতে শুরু করছে, মেয়েটা যদি ওর তিন নম্বর বউও হয়, আর একজনের সামনে ওইসব কাণ্ড কি করে করছে!

অতীশ উঠল। এইসময় রেলের লোক এসে দরজায় নক্ করল। শব্দ শুনেই মেয়েটা প্রায় হোর করে সরে এল। অতীশ দরজা খুলতেই তিনটে বোডরোল দিয়ে গেল লোকটা। রাতের খাবার দিতে হবে কিনা জিজ্ঞাসা করতেই পেছন থেকে কিম্বেনল্লিকে বলতে শুনল, ‘নেহি চাহিয়ে। আমাদের খাবার সঙ্গে আছে।’ লোকটা চলে গেল।

সুটকেসটা সিটের নিচে চালান করে দিয়ে ব্রিফকেসটা নিয়ে অতীশ বাইরে বের হল। প্যাসেঞ্জ ফাঁকা। টয়লেট—এ ঢুকে প্রথমে মুখে জল দিল সে। তারপর শরীর স্থানকা করে ব্রিফকেসটার দিকে তাকাল। এটাকে এখন হাতছাড়া করা দরকার। তার আগে দেখা যাক কি আছে ভেতরে। নিশ্চয়ই যে টাকা তাকে শোভনলাল দেবে বলেছিল তা এর মধ্যে রয়েছে। ব্রিফকেস খুলে বেসিনের ওপর রেখে ভেতরটা দেখল অতীশ। অ্যাকাউন্টসের কাগজপত্র, ব্যাঙ্কের পাশবই, সেভিং কিটস—একটা ডায়েরির পাশে একটা প্যাকেট পড়ে রয়েছে, প্যাকেটটা খুলে টাক! দেখতে পেল। দশ হাজার টাকার চারটে ব্যান্ডিল। এখনও ব্যাঙ্কের সিল খোলা হয়নি। তাহলে সে যদি শোভনলালের প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেত, তাহলে টাকাটা কিভাবে দিত? অত টাকা নিশ্চয়ই ও পকেটে রাখেনি। অতীশের মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। যাক গে, এখন এই প্রমাণগুলো সরানো দরকার। সে অ্যাকাউন্টসের কাগজগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে টয়লেটের গর্তে ফেলে দিল। সেভিং কিটসটাকেও। ডায়েরি ছিঁড়তে গিয়ে মনে হল ওটা পড়া দরকার। ভেতরে কি লেখা আছে তা জানা উচিত। হয়তো ওর মতলবের ব্যাপারটা জানা যাবে। এটা এখন থাক। এবার রিভলবার। গর্তটায় ফেলে দিলে রেললাইনে পড়ে থাকবে। না, এটা ফেলবে না সে। চরম বিপদের সামনে পড়লে এই হয়তো তাকে বাঁচিয়ে দেবে। কিন্তু ব্রিফকেসটাকে কি করে ফেলবে? ওই গর্ত দিয়ে এটা গলবে না। টাকার প্যাকেট বাঁ পকেটে কোনমতে ঢুকিয়ে ডায়েরি হাতে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে। কেউ নেই কোথাও। চেকার কোনদিকে রয়েছে কে জানে? সে পেছন দিকে তাকাল। দুটো কামরার মাঝখানের প্যাসেঞ্জের দরজা খোলা। প্যাসেঞ্জের দুপাশে যে ত্রিপলের আড়াল তার অনেকটাই ছেঁড়া বলে হ-হ করে বাতাস ঢুকছে।

অতীশ ধীরে প্যাসেঞ্জের কাছে গিয়ে এপাশ-ওপাশ দেখেই ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে ব্রিফকেস গলিয়ে আঙুল সরিয়ে নিল। একটা বিকট শব্দ হল মাত্র, তারপর যেমন চাকার আওয়াজ হচ্ছিল তাই হতে লাগল।

দুলতে দুলতে করিডোর দিয়ে ফিরছিল সে, এবার চেকারকে দেখতে পেল।

‘আপনার কোন বুথ যেন?’

হাত তুলে দেখিয়ে দিল সে।

‘টিকিটটা?’

বুকপকেট থেকে টিকিট বের করে এগিয়ে দিতেই চারটে টিক মেঝে টিকিটে মাগ বুলিয়ে ফেরত দিয়ে চেকার বলল, ‘অসুবিধে হচ্ছে না তো? আপনার কো-প্যাসেঞ্জার তো থ্রা আউট হয়ে গেছে।’

সামান্য হেসে কুপের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল সে। ঢুকেই শুনল, ‘ওয়ান মোর শেগ ডার্লিং! আমার আর এক পেগ চাই!’

‘খাও না—পুরো বোতল খেয়ে নাও!’

‘দশ বছর আগে হলে দেখতে খেয়ে নিয়েছি। আমার প্রথম দুই বউ দেখেছে।’ লোকটার হাতে ধরা গ্লাস শূন্যে দুলছিল।

মেয়েটি সেটা আবার ভরে দিল। অতীশ দেখল এবার গ্রাসের প্রায় অর্ধেকটা হইকি ঢেলে জন মিশিয়ে দিল মেয়েটা। পাতিয়ালা বলে একটা মাগ আছে হইকির। এ তো ডাবল পাতিয়ালা। লোকটা চুমুক দিল, 'সাবাস! হোয়ার ইজ ইওর গ্রাস ডার্লিং? পিও ড্রিক, বহৎ মজা আয়েগা।'

মেয়েটি তার গ্রাস ভরে অতীশের রেখে যাওয়া গ্রাসে হাত দিল। অতীশ নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আমার আর চাই না।'

মেয়েটি কথা বলল না। চোট মুচড়ে হেসে যা করছিল তা করে গ্রাসটা এগিয়ে দিল। প্রায় বাধ্য হয়ে সেটা নিল অতীশ। কিষেনলাল অনেকটা গলায় ঢালল, 'জিন্দেগী এক বহৎ লম্বি সফর হায়া। তো আজ রাতের জন্যে ছোট করে নাও।'

আর এক টোক দিল লোকটা, 'ডার্লিং, সুধা মাই ডার্লিং—একটা গান শোনাও, প্রীজ!'

'ও, নোঃ!' মেয়েটা বাড়ানো হাত থেকে সরে বসল।

'কাম অন ডার্লিং!' এখন কিষেনলালের কথা বুঝতে কষ্ট করতে হচ্ছে।

সুধা চোখ বন্ধ করল। গ্রাসটা তুলে গালের ওপর চাপল। তারপর নিচু গলায় গুনগুন করে উঠল, 'আই হ্যাভ সিন ইউ, সাম ডে সামহোয়ার, আই ডোন্ট নো।'

মেয়েটার গলায় সুর আছে তো! অর্ধেক গ্রাস খেয়ে নিচু হয়ে সুটকেস খুলে টাকার বাড়িল আর ডায়েরিটাকে ঢুকিয়ে দিল অতীশ। রিভলবারটাকে—, না, ওটা বের করতে গেলে মেয়েটার নজরে পড়ে যাবে। থাক পকেটে। সুটকেস বন্ধ করে সিটে বসে গ্রাস তুলতেই দেখল কিষেনলাল জানলার ওপর কাঁত হয়ে পড়ে আছে। ওর এখন চৈতন্যরহিত। আর ওই ভঙ্গিটা দেখেই সে শিউরে উঠল। ঢলে পড়ার মুখে শোভনলালের চেহারা ওইরকম হয়েছিল। সে চোখ বন্ধ করল।

এতক্ষণে চণ্ডীগড়ের পুলিশ শোভনলালের বউ-ছেলেকে আততায়ীর বর্ণনা দিয়েছে। আর বাখা জানিয়েছে যে, শোভনলাল তার সঙ্গে দেখা করতেই দিমি গিয়েছিল। ওই বর্ণনার সঙ্গে তার মিল স্পষ্ট। রিসেপশনিস্ট নিশ্চয়ই চেহারার বর্ণনা দিতে পারবে। এখন দিমির চারপাশে, হোটেল হোটেলে তন্মাশি চলেছে। কলকাতাতেও পৌঁছে যাবে পুলিশ। দিমি স্টেশনের সব কুলিকে প্রশ্ন করলে সেই কুলিটা নিশ্চয়ই বর্ণনা শুনে তাকে চিনতে পারবে। আর সে যে লুধিয়ানায় যাচ্ছে তা জানতে পেরে পুলিশ পরের স্টেশনে ট্রেন থামলে উঠে আসবে এখানে। ওঃ, কি দরকার ছিল কুলিটাকে লুধিয়ানার যাবে বলার?

'এল্লকিউজ মি!'

সুধার গলা শুনে তাকাল অতীশ।

'আমাকে একটু সাহায্য করবেন? এই বিশাল লাসকে শোওয়ানো আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। একটু যদি ধরেন!' হাসল সুধা।

লাস শব্দটা কানে ঝট করে লাগল। স্বামীর শরীরকে কেউ লাস বলে? সে উঠল। হইকি একটা কাজ করেছে, তার পড়ে যাওয়া রক্তচাপ আবার টেনে তুলেছে। ফলে শরীরে শক্তি ফিরেছে। কোনমতে দুজনকে মিলে কিষেনলালকে শুইয়ে দিল ওরা। সুধা দু-হাত দিয়ে ঠেলে কিষেনলালকে দেওয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'বাপস!'

'উনি ডিনার করবেন না?'

'ডিনার। এখন যদি কেউ ওকে রেপ করে যায়, ও টের পাবে না। এই লোকটার সব ভাল কিন্তু ভিবিবীর মত মদ খায়। যতক্ষণ না লাস হচ্ছে, খেয়ে যায়। ঘণ্টা চারেক পর একটু একটু করে সেপ ফিরতে শুরু করবে। ডিসগাস্টিং!'

'উনি আপনার স্বামী?'

'ফটোচাক্রে।' সুধা ব্যাগ খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করল, 'আপনার চলবে?'

'না, ধন্যবাদ।'

'ও জেগে থাকলে আমি স্মোক করতে পারি না। মেয়েদের সিগারেট খাওয়া ও পছন্দ করে না। বেশি বেশি।' সিগারেট ধরিয়ে বড় টান দিয়ে ধোয়া ছাড়ল সুধা।

'আপনি তাহলে ওঁকে বিয়ে করলেন কেন?'

'টাকার জন্যে। আগনার আপত্তি আছে?'

'না না। বিয়ে আপনি করেছেন, আমি আপত্তি করব কেন?'

‘ডিনার করবেন না?’

‘না। আচ্ছা আমি শুয়ে পড়লাম।’ বন্যামাত্র ট্রেন হইসল বাজিয়ে গতি কমাতে লাগল। অতীশ দেখল একটা স্টেশন আসছে। বন্ধ কাঁচের আড়াল সড়েও আলো দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল, ‘আমি একটু আসছি।’

কুপে থেকে বেরিয়ে সে সোজা টয়লেটে চলে এল। ট্রেনটা ধীরে ধীরে থেমে গেল। বাইরে যাত্রীদের চিংকার শোনা যাচ্ছে। কামরার বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কেউ। পুলিশ? পুলিশ এসে কুপেগুলো খুঁজে দেখবে। ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত সে এখান থেকে বের হবে না। অবশ্য পুলিশ টয়লেটেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে সুযোগ পেলে প্রাটফর্মে নেমে দাঁড়ানোই ভাল। অতীশ কি করবে বুঝতে পারছিল না। ট্রেন যখন চলতে শুরু করল তখন তার হাঁশ হল। টয়লেটের দরজা খুলে সে সাবধানে চারপাশে তাকাল। না, পুলিশ নেই। সামনের কুপেতে নতুন যাত্রী উঠেছে। চেকার তাদের সঙ্গে কথা বলছে।

নিজের কুপের দরজা ঠেলতে অতীশ আবিষ্কার করল ওটা ভেতর থেকে বন্ধ। বন্ধ কেন? স্মুটকেসে চাবি দেওয়া নেই, মেয়েটা যদি—। না, তার মন অকারণে ছোট হয়ে যাচ্ছে। সে দরজায় নক করল। ভেতর থেকে সুধার গলা ভেসে এল, ‘ক্রে?’

‘আমি। দরজা খুলুন।’

‘এক সেকেন্ড প্রীঙ্ক!’

প্রায় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে হল। দরজা খুলে গেলে কোনমতে চোখ ফেরাল অতীশ। মেয়েটা সত্যি সুন্দরী। এর মধ্যে পোশাকি পালটে রাতের পোশাক পরে নিচ্ছে। স্মিভলেস নাইট হাঁটুর নিচে নামেনি। নাইটির টকটকে লাল রঙের সঙ্গে ওর ফর্সা নগ্ন হাতের চামড়া চমৎকার সমঝোতা তৈরি করেছে।

অতীশ একটাও কথা না বলে দ্রুত খুলে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনল সে। তারপরই প্রশ্ন, ‘আপনি এতক্ষণ টয়লেটে ছিলেন?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনাকে খুঁজতে ওদিকে গিয়ে দেখতে পেলাম না তাই।’

‘কেন?’

‘ওই—আমি চেপ্ত করব, তাই।’

‘ও।’

‘আপনার গ্লাস কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।’

‘আর ভাল লাগছে না। আমি একটু ডিস্টার্বডও আছি।’ দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে বলল অতীশ।

‘সেটা যখন চুকলেন তখনই বোঝা যাচ্ছিল।’

অতীশ কথা বলল না। মনে মনে বলল, তখন তোমরা যে কাণ্ড করছিলে তাতে অন্য কিছু দেখার মত মন ছিল?

‘আলো ছেলে রাখলে অসুবিধে হবে?’

‘না, ঠিক আছে।’

‘আসলে, ভানেন, আমার না খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে।’

‘আপনি তো কয়েক পেগ খেয়েছেন, ঘুম পাচ্ছে না?’

‘নাঃ।’

‘আই অ্যাম সরি সুধা। আমি খুব ডিস্টার্বড।’

‘কি ব্যাপারে? আমাকে খুলে বলুন না? আমি হয়তো কিছু সান্ডেস্ট করতে পারি। আপনি নিশ্চয়ই ওর মত মেয়েদের ভাঙিনা করেন না।’

‘আসলে এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।’

‘হৃদয়ের ব্যাপার?’

‘না, জীবনের। গুড নাইট।’

মিনিট কয়েক চুপচাপ। হঠাৎ সুধা ইংরেজিতে গান ধরল, ‘জীবন, জীবন মানে কি? কয়েকটা দিন বেঁচে থাকা/জীবন মানে কি, শরীরটাকে সুখে রাখা/জীবন মানে কি, সুখের জন্যে তাকে ডাকা/সে মানে কে,

আমি জানি না, জানি না।' খুব নিচু গলায় গাইছিল সে। মেয়েটার গলা ভাল, মনে মনে বলল অতীশ।

'আপনাকে আমার ভাল লাগছে অতীশ।'

অতীশ? ওর নাম সুধা মনে রেখেছে?

'আসলে পুরুষমানুষ চোরের মত লোভী হয়। আপনি লোভী কিনা জানি না, তবে চোর নন—এই জন্যে ভাল লাগছে। আচ্ছা ওড নাইট, অতীশ।' তারপরেই আলোটা নিভে গেল। মেয়েটা সম্ভবত ওপরের ব্যঞ্জে চলে গেল।

ট্রেন ছুটছে ইচ্ছেমতন, থামছে হঠাৎ হঠাৎ। অথচ এই ট্রেনে তার যাওয়ার কথা ছিল না। কি দ্রুত সব পালটে গেল! বনানীর সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কথা বলা দরকার। কেউ কিছু বলার আগে ওকে ঘটনাটা জানানো দরকার। বনানী নিশ্চয়ই তার কথা বিশ্বাস করবে। সে খুশী নয়। কোনও মানুষকে সে খুন করতে পারে না। আজ হোটেল শোভনলাল পরিস্থিতি এমন করে তুলেছিল যে সে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। মাথা ঠিক রাখতে না পারা তার অন্যায়, সে মানছে। কিন্তু—

আর কিন্তু! সে যতই বলুক, পুলিশের কাছে, শোভনলালের ছেলে-বউয়ের কাছে সে খুশী। কিন্তু পুলিশ প্রমাণ করবে কি করে? এয়ারপোর্ট থেকে যে গাড়িতে সে শোভনলালের সঙ্গে হোটেল গিয়েছিল তার ড্রাইভার নিশ্চয়ই পরিচয় জানে না। হোটেলের রিসেপশনে যা করার শোভনলাল করেছে, সে কথা বলেনি। অতএব ওয়াও তার নাম পুলিশকে বলতে পারবে না। হোটেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তাকে কেউ প্রশ্ন করেনি। তাইলে? না, কোনও চান্স নেই ধরা পড়ার। হ্যাঁ, শোভনলালের বউ ছেলে তাকে সন্দেহ করতে পারে। সন্দেহ মানেই সেটা সত্যি নয়। তার জন্যে প্রমাণের দরকার হয়।

একটু ব্যস্তি এল। ঘুম আসছে না কেন? তিন পেগ মদ খেয়েছে সে, এখন তো চমৎকার ঘুমানো উচিত। হোটেল সে কোনও প্রমাণ রাখেনি, অতীশ চিন্তা করতে লাগল। অ্যাকাউন্টসের কাগজপত্র, মায় শোভনলালের ব্রিফকেস সে নিয়ে এসেছে। প্রমাণ কি থাকবে? তারপরেই শরীরটা শক্ত হয়ে গেল। ঘর থেকে বের হবার সময় সে ল্যাচ কী-র নবে হাত রেখে সেটাকে ঘুরিয়েছিল। বেরিয়ে অবশ্য জুতোর ধাক্কায় দরজা বন্ধ করেছে কিন্তু ওই নবে তার হাতের ছাপ নিশ্চয়ই লেগে গেছে। বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার অবশ্যই সেই হাতের ছাপ নেবে।

ফ্রমশ বুক চাপ অনুভব করছিল অতীশ। ট্রেনটা ধীরে ধীরে গতি কমাতে শুরু করেছে। তার মানে আর একটা স্টেশন আসছে। না, কোনও বুকি নেওয়া চলবে না। সে চট করে উঠে দাঁড়াল। তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

ট্রেন থামামাত্র সে টয়লেটের কাছে চলে এসে দেখল চেকার কামরার দরজা খুলে নিচে নামছে। সে উঁকি মেরে দেখল, সামনে কেউ নেই। কিন্তু প্রাটফর্মে নেমে দাঁড়ানোর সাহস তার হল না, সে টয়লেটে ঢুকে গেল।

ট্রেন যখন আবার চলতে শুরু করল সে বেরিয়ে এল টয়লেট থেকে। ধীরে ধীরে কুপেতে ঢুকে দরজা বন্ধ করল অতীশ। না, এভাবে তার ঘুম আসবে না। আর না ঘুমাতে সে নির্ব্যাং মরে যাবে। এত টেনশন আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না সে।

রিডিং ল্যাম্পটা জ্বালল অতীশ। তারপর কিম্বেনলালের বোতল থেকে বেশ খানিকটা হইন্ধি গ্রাসে ঢেলে সামান্য জল মেশালো। নিচে কিম্বেনলাল অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ওপরে ওর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। লোকটার ক্যালি আছে—তিন-তিনটে বউকে ম্যানেজ করে চলেছে। হইন্ধির গ্রাসে চুমুক দিল অতীশ, তারপরই সুধার সিগারেটের প্যাকেট এবং দেশলাই নজরে এল।

একটুও দ্বিধা না করে সে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে আধুন ধরাল। সিগারেটে অভ্যস্ত না হওয়ায় একটু কাশি এল। কিন্তু সামলে নিল সে। অন্ধকার কুপেতে বসে সে গ্রাসটা শেষ করল। দরজার নবে হাত দেবার আগে কেন সে একটুও ভাবল না? আফসোস হচ্ছিল এখন।

দ্বিতীয় গ্রাসে মদ ঢালতে গিয়ে দেখল বোতলে হইন্ধি নেই। যাচ্চলে! ঠিক তখনই ওপর থেকে নিচে নেমে এল সুধা, 'নতুন বোতল ভাঙবো?'

'জ্যাঁ! না, দরকার নেই।'

'দরকার না থাকলে আপনি কেন গ্রাসে হইন্ধি ঢালতে চাইছিলেন?'

'না, মানে—আসলে—।'

‘লজ্জা করার কোনও কারণ নেই।’

‘না, সত্যি দরকার নেই।’

‘আচ্ছা ট্রেন স্টেশনে থামলেই টয়লেটে যাচ্ছেন কেন বলুন তো?’

‘আমি?’

‘হ্যাঁ, আপনি। দেখে তো মনে হচ্ছে শরীর খারাপ। ভয়-ভয় পেয়েছেন বলে মনে হচ্ছে!’

‘ভয়? ভয় কেন পাবো? আচ্ছা গুডনাইট।’ সিগারেট নিভিয়ে ফেলল অতীশ। তারপর দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল। সে টের পেল, সুধা আবার তার নিভের জায়গায় ফিরে গেল। স্বপ্তি হল তার।

অতীশের এক মামার ক্যানসার হয়েছিল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাঁর যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। ডাক্তার প্রথমদিকে সাধারণ ঘুমের ওষুধ দিতেন। ঘুমিয়ে থাকলে যন্ত্রণা টের পাবেন না তিনি। কিন্তু ক্রমশ তার জোজ্ঞ বাড়তে হল। যে ট্যাবলেট খেলে সাধারণ মানুষ মড়ার মত ঘুমাবে, তা ওঁর শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া তৈরি করছিল না। শেষদিকে বেশ কয়েকটা ভারী ইনজেকশনও কাজ করেনি। মামা যন্ত্রণায় ককিয়ে গিয়েছেন—মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন ভাব আসতো বটে কিন্তু সেটা যন্ত্রণার দমকে কেটে যেত খানিকবাদেই। আশ্চর্য্যের মতো মামার কথায় মনে পড়ল অতীশের। এতটা মদ, সারাদিনের পরিশ্রম এবং টেনশনজনিত ক্লান্তি—তার দু-চোখে একফোঁটা ঘুম আসছে না। মাঝেমধ্যে যখনই ট্রেন থামছে সে কাঁটা হয়ে পড়ে থাকছে। দু-দুবার ট্রেন থামামাত্র টয়লেটে যাওয়ার সুধা তাকে সন্দেহ করছে। একটি সুন্দরী মেয়ে, যার স্বামী প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে, ট্রেনের কুপেতে মধ্যরাতে একা পেয়েও সে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে আছে, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। বিশেষ করে মেয়েটি যখন তাকে ভাব জমাতে ইঙ্গিত দিয়েছে কয়েকবার। ব্যাপারটা বনানী কি বিশ্বাস করবে? মদ খাওয়ার দোহাই দিয়ে একটা কিছু তো হয়ে যেতে পারত। অথচ এখন মনের যে অবস্থা, সেইসব কিছুর কথা ভাবতেই পারে না অতীশ।

ভোরের দিকে একটু তন্দ্রামত এসেছিল। হঠাৎ চিংকার কানে যেতেই চমকে উঠে বসল সে। প্রথমে দৃশ্যটা ধরতে পারেনি, চোখ ধাতু হলে বুঝল কিবেনলাল দাঁড়িয়ে আছে খালিগায়ে। পরনে পাজামা। তার শরীরের সব মেদ যেন বুক পেট থেকে চারপাশে খুলে পড়েছে। দৃশ্যটি বীভৎস। পাঞ্জাবি চাইছে সে, যা সুধা দিতে দেরি করায় ওই হত্কার। পাঞ্জাবি পাওয়ার পর লোকটা হাত তুলল। সেই পাঞ্জাবি সুধাকেই পরিচয় দিতে হল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নেশা দূর হয়ে গেছে ওর, এখন দেখলে কে বলবে একটু আগে পাহাড়ের মত ঘুমাচ্ছিল।

পাঞ্জাবি পরে কিবেনলাল দরজা খুলে পাশ ফিরে বেরিয়ে গেল। সবুজ টয়লেটে বাচ্ছে। অতীশ গুনল, সুধা বলছে, ‘একদিন ঠিক খুন করব আমি! মদে বিষ মিশিয়ে দেব!’

অতীশ হেসে ফেলল। কাল দুপুরের পর এই প্রথম সে হাসতে পারল।

‘আপনি হাসছেন? আমি কি পাচ্ছি বলুন? কি পাচ্ছি? আমাকে তো এখন মা করতে পারবে না হাতিটা, সে ক্ষমতাও শেষ হয়ে গিয়েছে।’

‘টাকা পাচ্ছেন। তখন তো বললেন টাকার জন্যে বিয়ে করেছেন!’

জ্বলন্ত চোখে তাকাল সুধা। অতীশ বেরিয়ে এল বাইরে। ভোরের ঘুমন্ত ট্রেনে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজ। কাউকে খুন করার পর কি অবস্থা হয় সুধা জানে না, জানলে ওই কথা মুখেও উচ্চারণ করত না।

লুঘিয়ানা আসছে। কুপেতে ফিরে এসে দেখল কিবেনলাল সাজুগুজু করে বসে আছে। সুধা বেরিয়ে গেল তার হাতব্যাগ এবং তোয়ালে নিয়ে। কিবেনলাল হাসল, ‘বলুন ভাই, কাল কিরকম ঘুম হয়েছিল? আমি তো মাল খেলে আর কিছু টের পাই না!’

‘হ্যাঁ, দেখলাম।’

‘আমার এই বউটাকে কেমন লাগল?’

‘কেমন লাগল মানে?’

‘মানে কথাবার্তা, ব্যবহার?’

‘বেশ ভদ্র।’

‘আরে মশাই, ট্রেনিং দিতে হয়েছে। বনের বাঘিনীকে ট্রেনিং দিয়ে নেড়ি কুড়ি বানানো তো কম হিন্দুতের কথা নয়! হ্যা হ্যা হ্যা! আমার প্রথম বউ ভিলেজম্যান—অল্পবয়সে খুব খারাপ লাগত। দ্বিতীয় বউ চণ্ডীগড়ের—মধ্যবিত্ত। এই মধ্যবিত্ত বউরা খুব ঝামেলা করে। আর এই থার্ড বউ দিম্মির মেয়ে। বিয়ের আগে ওর পেছন লাইন পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, ব্যাস হলো, বুঝলেন মশাই, অল্পবয়সী গ্রামের মেয়ে বেশি এক্ষেপকটিভ হয়—প্রতিবাদ করে না।’ কিষেনলাল মাথা নাড়ল।

‘তাহলে চতুর্থবার বিয়ে করুন।’

সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর জোরে শব্দ করে হাসতে লাগল কিষেনলাল। ওর শরীর দেখে মনে হচ্ছিল, পাহাড়ে ডিনামাইট চার্জ করা হয়েছে, এখনই ধস নামবে। হাসি কোনমতে থামিয়ে কিষেনলাল বলল, ‘আইডিয়াটা খারাপ বলেননি। কিন্তু সুধা বলেছে আবার বিয়ে করলে ওকে ডিভোর্স করতে হবে। ডিভোর্স মানে প্রচুর টাকা এবং ও হাতছাড়া। না মশাই, ডিভোর্স পেলেই ও কোনও ছোকরাকে বিয়ে করবে। আমার বউ অন্য কারও সঙ্গে থাকছে তা আমি সহ্য করব না— ডিভোর্স করলেও নয়।’

অতীশের তখন এসব শোনার মন ছিল না। লুধিয়ানা স্টেশনে নেমে সে কি করবে? যদি প্ল্যাটফর্মেই পুলিশ তার জন্যে অপেক্ষা করে? বাইরে বের হবার গেটেও অপেক্ষা করতে পারে। লুধিয়ানা স্টেশনটা তার জানা নেই। বাইয়ে যাওয়ার অন্য কোনও পথ সে কি করে খুঁজবে? সুধা ফিরে এল সেজেগুজে। কিষেনলালকে এড়িয়ে তার দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে হাসল।

ট্রেন থামতেই কুলির ঝাঁক উঠে এল। কিষেনলাল তাদের সামনে নিচে নামল প্রথমে। অতীশ সুটকেসটা নিয়ে পেছনে পেছনে আসছিল, হঠাৎ সুধা জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনার সঙ্গে আর একটা ব্যাগ ছিল না? যখন উঠলেন তখন তো দুটো হাতই এনগেজড ছিল।’

অতীশ মাথা নাড়ল, ‘না, ভুল দেখেছেন।’

সুধা যে উত্তরটা শুনে বেশ অবাক হল তা ওর মুখ দেখতে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। সে দ্রুত সুধাকে কাটিয়ে এগিয়ে গেল দরজার কাছে।

কিষেনলালদের লটবহর কম নয়। তিনটে কুলি মাথায় মাল তুলছে। কিষেনলাল বলল, ‘ডার্লিং, এরা তো দৌড়বে, তুমি এদের সঙ্গে এগিয়ে যাও। বাইরে ড্রাইভার আছে—আমি পেছন পেছন আসছি। আচ্ছা নমস্কার!’ শেষ কথাটা অতীশের জন্যে।

‘নমস্কার।’

‘আপনি কোন্ হোটেলে উঠছেন?’

‘হোটেলে হলিডে।’

‘কি কাণ্ড! আরে মশাই, লুধিয়ানায় এসে হোটেলে উঠলে আমরা ওখানেই উঠি। তাহলে একসঙ্গেই যাওয়া যাক। বাইরে আমার গাড়ি আছে।’

কুলিরা দৌড়াতে শুরু করলে সুধা ওদের অনুসরণ করল। কিষেনলাল তার বিশাল শরীর নিয়ে চলছে ধীরে ধীরে। অতীশ পা চালান। ভিড় কাটিয়ে সে সুধাকে ধরে ফেলল। সুধা তাকে আড়চোখে দেখল, কিছু বলল না। অতীশ হাঁটছিল আর চারপাশে তাকাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল সুধার সঙ্গে কথা বলতে বলতে গেলে পুলিশ তাকে হয়তো সন্দেহ করবে না। পুলিশ তার চেহারার একজন লোককে একা খুঁজবে—সঙ্গে মহিলা আছে ভাবতে পারবে না।

সে গায়ে পড়ে কথা বলল হাঁটতে হাঁটতে, ‘আমরা তাহলে একই হোটেলে উঠছি!’

‘তাতে আপনার কি লাভ হবে?’ চটখলদি জবাব ভেসে এল।

‘আপনি এভাবে বলছেন কেন?’ জোর করে হাসতে চেষ্টা করল অতীশ।

‘কারণ আপনি একজন মিথ্যাবাদী।’

‘সেকি?’

‘আপনার হাতে একটা ব্রিফকেস ছিল।’

‘ওঃ, ওটা খারাপ হয়ে গেছে বলে ফেলে দিলাম।’

‘খারাপ কি রাস্তায় হল?’

‘হ্যাঁ, পড়ে গিয়ে।’ অতীশ দেখল গেট এগিয়ে আসছে। সেখানে বেশ বড় জটলা। রেলের লোকের

সঙ্গে সাদা পোশাকের পুলিশ নাকি? সে দ্রুত সুধার শরীরের কাছে চলে এসে একটা ঘনিষ্ঠভাবে আনার চেষ্টা করল।

সুধা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'এভাবেই একটু চলুন, প্রীত!'' কাতরগলায় বলল অতীশ।

যেন স্বামীত্বী ওরা, এমন ভঙ্গিতে গেটের কাছে পৌঁছে টিকিট বের করল অতীশ। সেটা নিয়ে চেকার সুধার দিকে তাকাল, 'আপনার?'

সুধা বলল, 'পেছনে আসছে।'

'একটু দাঁড়ান তাহলে।'

কুলিরা এগিয়ে যাচ্ছিল, অতীশ যেন তাদের ধরার জন্যেই দ্রুত পা চালানো। পুলিশ কি তার পেছনে ছুটে আসছে? স্টেশনের বাইরে এসে কুলিরা থামতে ও পেছন ফিরে তাকাল। লোকজন বেরিয়ে আসছে কিন্তু তাদের ভেতর পুলিশ আছে কিনা বুঝতে পারল না। কে জানত সুধার টিকিট কিয়নলালের কাছে আছে।

এখানে পুতুলের মতন না দাঁড়িয়ে খোঁক সেরে গেলেই ভাল হয়। মেয়েটা এর মধ্যে তাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। সে কুলিদের একজনকে বলল, বাবুকে বলে দিতে যে তার এক বন্ধু আসায় সে চলে যাচ্ছে।

অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল সে।

এখন লুমিয়ানা শহরের ঘুম ভাঙছে। কুঁকড়ে বসে ছিল অতীশ। আর একটা ভুল করে ফেলল সে, কি দরকার ছিল কিয়নলালকে হোটেল হলিডের কথা বলা? লোকটা যদি তার খোঁজ করে ওখানে? কিন্তু হোটেলের সামনে পৌঁছে একটু স্বস্তি হল। বিশাল হোটেল তৈরি করেছে যশোবন্ত। আটতলা বাড়িটায় নিশ্চয়ই প্রচুর ঘর। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে নামতেই পোর্টার এসে স্যুটকেস তুলে নিল।

রিসেপশনের ঝকমকে আলো, সুন্দরী রিসেপশনিস্ট দেখে কে বলবে বাইরে শহরটার সবে ঘুম ভাঙছে! ডি রায় নামে ঘর নিল অতীশ। চাবি হাতে পেরে বলল, 'যশোবন্তকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?'

'উনি এখন ঘুমাচ্ছেন। নটার পর পাবেন।'

'দয়া করে ওকে বলবেন যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। প্রয়োজন আছে।' অতীশ দ্রুত লিফটের দিকে এগিয়ে গেল।

তার ঘর ছয়তলায়। জানলা দিয়ে শহরটা দেখা যাচ্ছে। জুতো গরেই বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। আঃ, কি আরাম! সঙ্গে যা আছে তাতে কদিন চলবে তার? অতীশ নিভের ওপর রেগে গেল—এই তার স্বভাব, যখনই একটু স্বস্তিতে থাকে তখনই কুড়িটা টেনে আনে। এই জানোই বনানী বলে, তুমি খুব হতাশবাদী। জীবনকে উপভোগ করতে কখনও পারবে না। ঠিকই বলে। অতীশ উঠল। জামাপ্যান্ট পালটে দাড়ি কামিয়ে ব্রাশ করে স্নান করল। তারপর একটু ঝকঝকে হয়ে রুমসার্ভিসকে বলল চা টোস্ট আর আজকের সবকটা ইংরেজি কাগজ পাঠিয়ে দিতে।

কাল দুপুরে দিম্মিতে কেউ খুন হলে আজ কি লুমিয়ানার কাগজে সেই খবর ছাপা হবে? দিম্মির কাগজ কি এখানে আসে? কখন আসে?

কুড়ি মিনিটের মধ্যে চা-টোস্ট এবং তিনটে কাগজ এসে গেল। প্রথমে তৃপ্তি করে চা-টোস্ট খাওয়ার চেষ্টা করল সে। কাগজ স্পর্শ করল না। তারপর জানলার কাছে সোফায় বলে কাগজ খুলতে লাগল। প্রথম দুটোয় তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনও খবর পেল না। বরং জানা গেল গতরাতে কলকাতায় ভূমিকম্প হয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনও প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। তবে শহরের উত্তর অংশের কয়েকটা বাড়ি ভেঙে পড়েছে। তাদের বাড়িটার কোনও ক্ষতি হয়নি তো? বেশ পুরনো বাড়িটা—সারাবো সারাবো করেও সারানো হয়নি। অতীশ টেলিফোনের দিকে তাকাল, এখনই ইচ্ছে করলে সে বনানীর সঙ্গে কথা বলতে পারে। ওকে সব কথা খুলে বললে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে। তারপরেই মনে হল, নিভের বিপদ সে আর একবার ডেকে আনবে। হোটেল রেকর্ড রাখবে তার টেলিফোনের। যশোবন্ত ঠিক কি ব্যবহার

করবে সে জানে না। দীর্ঘকাল বাসে এয়ারপোর্টে পরিচিত কাউকে দেখে উদার হয়ে নেমস্তন্ন করা হয়তো যায় কিন্তু সে খুন করে এসেছে শোনার পর তাকে ঝেড়ে ফেলাই স্বাভাবিক। হয়তো নিজের দায় নামাতে যশোবন্তই পুলিশ ডেকে আনবে। তাছাড়া আগবাড়িয়ে বনানীকে টেনশনে ফেলার কোনও দরকার নেই। বরং সুযোগ পেলে রাস্তার কোনও বুথ থেকে ওকে এস টি ডি করে জানিয়ে দেবে সে ভাল আছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। তৃতীয় কাগজটা খুলল সে। একই খবর। কিন্তু তিনের পাতায় চোখ আটকে গেল। ছোট্ট খবর। দিল্লির ক্যাপিটাল হোটেলে চণ্ডীগড়ের ব্যবসায়ী খুন। খুনী ধরা পড়েনি। তবে পুলিশের সন্দেহ, নিহত ব্যক্তি খুনীর পরিচিত ছিল। তদন্ত চলছে। খবরটা ছাপা হয়েছে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে।

হঠাৎ ঘুম পেয়ে গেল অতীশের। হয়তো স্নানখাওয়া এবং ঘরের আরাম তার শরীরকে আচ্ছন্ন করল। সে বিছানায় চলে গিয়ে বালিশ আঁকড়ে ধরল।

একটা যান্ত্রিক শব্দ যখন তাকে ঘুমের গভীর খাদ থেকে টেনে তুলল তখন দশটা বেজে গেছে। কোনমতে চোখ খুলতেই বুঝতে পারল টেলিফোনটা বাজছে। সে কোনমতে শরীরটাকে নিয়ে গেল রিসিভারের কাছে, 'হ্যালো!'

'মিস্টার রায়?' মহিলার গলা।

'সরি। রঙ নাথার।' রিসিভার নামিয়ে রাখল অতীশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফোন বাজল। রিসিভার তুলতেই মহিলা বললেন, 'এই ঘরে মিস্টার রায়ের থাকার কথা। উনি কি আছেন?'

হুড়মুড় করে স্মৃতি ফিরে এল। হোটেলের খাতায় সে নিজের পরিচয় লিখেছে ডি. রায়। অতীশ হাসবার চেষ্টা করল, 'হ্যাঁ, বলছি। আসলে এমন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—'।

'আপনি মিস্টার যশোবন্ত সিং-এর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'প্লীজ হোল্ড অন।'

অতীশ সোজা হয়ে বসল। মিনিটখানেক অপেক্ষা করতে হল। তারপর পুরুষ কণ্ঠে, 'হ্যালো।'

'হ্যালো যশোবন্ত।'

'আমি অতীশ।'

'অতীশ। সরি।'

'তোর সঙ্গে কলকাতা এয়ারপোর্টে দেখা হয়েছিল, একই ফ্লাইটে গতকাল দিল্লি এসেছি আমরা, মনে পড়ছে?'

'মাই গড। তুই কখন এলি? দাঁড়া দাঁড়া। আচ্ছা, তুই চলে আয় আমার কাছে। সেকেন্ড ফ্লোরে। ওকে?'

যশোবন্ত বলল।

'না, প্লীজ তুই এই ঘরে আয়।'

ওপাশে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ পেয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল অতীশ। এখন কোনভাবেই

ঘর থেকে বের হতে চায় না সে।

মিনিট দশেক বাসে দরজায় শব্দ হতেই সে ওটা খুলল। বেয়ারা। ট্রে নিতে এসেছে। পকেট থেকে বিল বের করে সই-এ জন্মো যখন এগিয়ে দিচ্ছে তখন যশোবন্তের গলা শোনা গেল, 'ওটা করার দরকার নেই। মিস্টার রায়ের বিল আমার অ্যাকাউন্টে যাবে।' বেয়ারা সেলাম করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজা বন্ধ করে গেল। যশোবন্ত হেসে হাত বাড়াল, 'হোয়াট এ সারপ্রাইজ!'

করমর্দন করল ওরা।

যশোবন্ত বলল, 'দিল্লির কাজ একদিনেই শেষ হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।'

'ওড। তুই আমার নেমস্তন্ন রেখেছিস বলে ধন্যবাদ। কদিন যাক, আমি ভাল গাইড দিয়ে দেব। সুন্দরী গাইড হলে কেমন হয়?' চোখ টিপল যশোবন্ত।

'আমি তোর কাছে ঘুরতে আসিনি যশোবন্ত।'

যশোবন্তের মুখের চেহারা পালটে গেল। শিকারী কুকুর যেমন শত্রুর গন্ধ পেয়ে সতর্ক হয় তেমনি ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল, 'পার্টনার টাকা দেয়নি?'

গাথা নাড়ল অতীশ, 'না।'

‘ঠিকানা দে।’

‘ও এখন কোনও ঠিকানায় নেই।’

‘তার মানে?’

অতীশ খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে খবরটার ওপর আঙুল দিয়ে যশোবন্তকে দেখিয়ে দিল। খবরটা পড়ে যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, ‘কি করে হল?’

ছেড়ে রাখা প্যাণ্টের পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে টেবিলে রাখল অতীশ। তারপর একে একে সব ঘটনা খুলে বলল।

রিভলবারটা তুলে নিল যশোবন্ত। ঘুরিয়ে দেখল, তারপর ওটা থেকে বাকি গুলি বের করে নিল। তারপর হেসে বলল, ‘সো মিস্টার রায়, তুমি এখন বিপদে পড়েছ।’

‘হ্যাঁ, যশোবন্ত। আমি কি করব? রাস্তা বলে দাও, প্লীজ।’

যশোবন্ত রিসিভার তুলে দিম্মির একটা নাম্বার চাইল। তারপর বলল, ‘যদি তুমি তোমার পার্টনারের মত ওই হোটেল একটা ঘর নিতে আর টিনার পর রিসেপশনকে জানাতে তোমার পার্টনার দরজা খুলছে না, তাহলে পুলিশের পক্ষে প্রমাণ করা মুশকিল হত তুমিই খুনী। অবশ্য যা হয়ে গেছে তা নিয়ে পোস্টমর্টেম করার কোনও মানে হয় না।’

টেলিফোন বাজল। যশোবন্ত কথা বলল, ‘হ্যাঁলো! হ্যাঁ, কি খবর? আচ্ছা কাল তোমার ওখানে যে মার্ভারটা হয়েছে তার খবর কি? ইন্টারেস্টড না হলে আমি ফোন করব কেন? হঁ হঁ—আচ্ছা! আজ জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে? তোমরা কাউকে মৃতের সঙ্গে হোটেলের চুকতে দ্যাখনি? টেল ইউর স্টাফ—এটা বলতে। ওকে।’

ফোন নামিয়ে যশোবন্ত বলল, ‘ক্যালাস।’

‘কি হল?’

‘ক্যাপিটালের মালিক বলল আজ পুলিশ হোটেলের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসবে। ওরা সন্দেহ করেছে যে লোকটা শোভনলালের সঙ্গে চুকেছিল সে-ই খুন করেছে এবং যাওয়ার সময় একটা ব্রিফকেস নিয়ে চুকেছিল। বের করার সময় ওর আর এক হাতে ব্রিফকেস ছিল। আমি কি বললাম সেটা তো গুনলি!’

‘কিন্তু শোভনলালের ড্রাইভার আমাকে দেখেছে।’

‘দেখলেও দেখবে না আর। কারণ সে-ও হোটেলের স্টাফ।’ যশোবন্ত উঠে দাঁড়াল, ‘এর আগে কখনও খুন করেছিস?’

‘খুন। কেন খুন করব? চমকে উঠল অতীশ।

‘খুন কেন করে? তুই কেন করলি?’ হাসল যশোবন্ত।

‘তুই বিশ্বাস কর, এটা কি করে হয়ে গেল আমি নিজেই বুঝতে পারছি না? জীবনে আমি কখনও কাউকে খুন করা দূরে থাক, আঘাতও করিনি।’ অসহায় গলায় বলল অতীশ।

‘ঠিক হয়। তুই কয়েকটা দিন এখানে থাক। আমার হোটেলের তুই সম্পূর্ণ নিরাপদ। সারাদিন ঘরেই থাকিস। ইচ্ছে হলে সন্দের পর হাওয়া খেতে যেতে পারিস। তবে না যাওয়াই ভাল। আমি দেখছি কি করা যায়।’ যশোবন্ত চলে গেল।

দিম্মি থেকে পালাবার সময়ে টেনশনে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তখন প্রতিটি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল এই বুঝি পুলিশের থাকা তার ঘাড়ে এসে পড়ল। আর আশ্রয় প্রায় গোটা দিন এই ঘরে শুয়ে বসে ইঁপিয়ে উঠল অতীশ। আশ্চর্য কাণ্ড, বিছানায় শুয়েও তার ঘুম আসল না। সোফায় বসে টিভি চালিয়েও সেটায় মন দিতে পারছে না। সারাদিন আর যোগাযোগ করেনি যশোবন্ত। অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে তবু ফোন করেনি অতীশ। যশোবন্ত সকালে যাওয়ার সময় রিভলবারের গুলিগুলো নিয়ে গিয়েছে, রিভলবারটা পড়ে ছিল টেবিলে। অতীশ ওটাকে আড়াল রেখেছে। ঘরে বেয়ারারা আসছে খাবার নিয়ে বিভিন্ন সময়ে, ওদের চোখে রিভলবার পড়া ঠিক নয়। গুলি নিয়ে যাওয়ার যত্নটা আপাতত অকেজো। ভুল করে না ইচ্ছে করেই যশোবন্ত গুলি নিয়ে গিয়েছে বুঝতে পারছে না অতীশ। লোকটার ওপর অত্যাধি ভরসা করা ঠিক হচ্ছে কি? কিন্তু আর কি করতে পারে সে? অন্য কোন পথ তো খোলা নেই।

শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে জানলার বাইরে সন্ধ্যা নামতে দেখল সে। আলো জ্বলে উঠল ঘরে।

দরজায় শব্দ হল। বিকেলে চা দিয়ে গিয়েছিল বেয়ারা, চায়ের পট ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। দরজা খুলল সে। বেয়ারাই—কিন্তু তার হাতে হইন্ধির বোতল। নিঃশব্দে টেবিলে রেখে চায়ের কাপ ডিস পট নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, অতীশ জিজ্ঞাসা করল, ‘আমি তো তোমাকে হইন্ধি আনতে বলিনি!’

‘মালিক পাঠিয়ে দিয়েছেন।’ বেয়ারা দরজা টেনে দিয়ে চলে গেল।

হইন্ধি বিদেশি। তাহলে যশোবন্ত তার আরামের কথা ভাবছে। কিন্তু তার যে কোনও কিছু খেতেই ইচ্ছে করছে না সেটা। ও কি করে বোঝাবে? আর একটু রাত হলে সে ঘর থেকে বের হ'ল। দরজায় চাবি দিয়ে লিফট এড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল। ওপাশে রিসেপশন। সেদিকে না তাকিয়ে সোজা দরজার দিকে পা বাড়াল। দরজায় দাঁড়ানো দারোয়ান তাকে দেখে কপালে হাত হোঁয়ালো।

রাত্তায় নেমে পকেটে হাত ঢুকিয়ে অতীশ খানিকটা হাঁটল। দু-পাশে সাজানো দোকান। জায়গাটা পাঞ্জাবীদের তা বোঝা যাচ্ছে। একটা এস টি ডি বুথের সামনে গিয়ে দু-পাশে দেখে চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল। বুথটা খালি। কিন্তু কলকাতার কোড্‌ নম্বরটা জিজ্ঞাসা করে জানতে হল। মন খুঁতখুঁত করতে লাগল তার। কেউ এখান থেকে ইচ্ছে করলে খবরটা নিতে পারবে।

নাম্বারগুলো খোরালো অতীশ। এনগেজড শব্দ হচ্ছে। কার সঙ্গে কথা বলছে বনানী এইসময়? নাকি পুলিশ লাইনের দখল নিয়ে রেখেছে তাকে ধরবে বলে? প্রায় মিনিটখানেক অপেক্ষা করার পর আবার ডায়াল করল সে—এবার রিং হচ্ছে।

‘হ্যালো?’ বনানীর গলা।

‘আমি বলছি।’

‘ও। কি ব্যাপার বল তো? কাল সকালে পৌঁছে ছত্রিশ ঘণ্টা পরে সময় পেলো?’

তার মানে বনানী এখনও ছানতে পারেনি, পুলিশ এখনও পৌঁছায়নি? এই প্রথম একটু ভাল লাগল অতীশের। বনানী আবার বলল, ‘হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ?’

‘হ্যাঁ। লাইনটা ডিস্টার্ব করছে।’ মিথ্যে কথা বলল অতীশ।

‘তুমি কবে ফিরছ?’

‘ঠিক বলতে পারছি না। একটু ঝামেলায় পড়েছি।’

‘টাকা দিচ্ছে না?’

‘না।’

‘তোমার ফোন-নাম্বার বল।’

‘আমি আদ্রই এখান থেকে পাঞ্জাবে যাচ্ছি। তুমি চিন্তা করো না। আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। রাখছি।’ বনানীকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল অতীশ। ফোনের টাকা মিটিয়ে রসিদ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে সেটা ছিঁড়ে ফেলল সে। বনানী কি তার কথা শুনে কোনও অস্বস্তিতে পড়বে? তার পাঞ্জাব যাওয়ার কথা শুনে কোনও অস্বস্তিতে পড়বে? তার পাঞ্জাব যাওয়ার কথা শুনে ভাববে শোভনলালের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে! ঝামেলা শুনে হয়তো ভাল লাগবে না, এই পর্যন্ত। তবু যোগাযোগ তো হল।

সে হোটেলের দিকে ফিরে আসছিল, দূর থেকে দেখল কিম্বেনলাল দুটো ছেলের সঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা গাড়িতে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সিগারেটের দোকানের আড়ালে চলে গেল সে। প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে হল তাকে। কিম্বেনলালের গাড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পর সে হোটেলে ঢুকে পড়ল।

দরজা বন্ধ করে সিগারেটের প্যাকেটটা টেবিলে রাখতেই অ্যাশট্রের পাশে রাখা হোটেলের ছাপমারা দেশলাই—এর পাতা নড়রে এল। সিগারেট খায় না সে, কলেজে থাকতে দু-একবার খেয়ে দেখেছে—ভাল লাগেনি। সে কতকাল আগের কথা। বনানীর সঙ্গে কথা বলার পর তার ভাল লাগছিল। বনানী এককালে বলত, ছেলেদের দু-একটা সিগারেট খাওয়া উচিত। ঠোটে সিগারেটের গন্ধ নাকি অন্য মাদকতা আনে এমন কথা সে বই-এ পড়েছে। এসব বিয়ের কিছুকাল পরের কথা। এখন আর কথাগুলো বনানীর নিজেরই মনে নেই। মাদকতা খোঁজার দিন তার শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু আজ সিগারেটের প্যাকেটটা খুলে একটা ধরাল অতীশ। ভেবেছিল খুব কাশি হবে, অস্বস্তিতে পড়বে—কিন্তু কিছুই হল না। বরং ধোঁয়া শরীরে ঢোকার পর নার্ভগুলো বোধহয় আরাম পেল। সোফায়

বসে চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে টানতে সেই আরামটাকে উপভোগ করছিল সে, হঠাৎ টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে বেজে উঠতেই চমকে সোজা হয়ে বসল। কে টেলিফোন করছে? তারপরই হেসে ফেলল সে, যশোবন্ত ছাড়া আর কারও তো করার সম্ভাবনা নেই।

সে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যাঁ, বল।'

ওপাশে চুপচাপ। তারপর নারীকণ্ঠ জিজ্ঞাসা করল, 'এক্সকিউজ মি, আমি কি মিস্টার রায়ের সঙ্গে কথা বলছি?'

রায়। তাহলে রিসেসপশনিস্ট। সে গভীর হল, 'ইয়েস স্পিকিং।'

'আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো এই হোটেলে ওঠেননি। কিন্তু একটু আগে আপনাকে হোটেলে ঢুকতে দেখে বুঝলাম এই কথাটা সত্যি বলেছিলেন।'

'আপনি কে কথা বলছেন?'

'মিথ্যেবাদীদের আই কিউ সাধারণের চেয়ে বেশি হয় জানতাম।' কথাটা বলেই মহিলা হাসলেন। এবং তখনই অতীশ বুঝল বাইরে বেরিয়ে সে কী ভুল করেছে। কিম্বদন্তীকে এগিয়ে দিতে কি সুধা নেমেছিল? নিশ্চয়ই। তারপর রিসেসপশনে চেক করে জেনে গেছে সে কত নম্বর ঘরে এবং কি নামে আছে? সে ট্রেনে পাঠিয়ে দেবার সময় নাম বলেছিল, উপাধি তো বলেনি। অতীশ নামটা কি সুধা মনে রেখেছে? তাহলে ডি রায় দেখে! সে হাসার চেষ্টা করল, 'ও—আপনি! তাই বলুন।'

'আপনি আমার ঘরে আসুন। রুম নম্বর চারশ আটশ।' টেলিফোনের লাইন কেটে গেল। অতীশ কি করবে বুঝতে পারছিল না। নিজেকে খুব বোকা বোকা মনে হচ্ছিল তার। তারপরেই মনে হল কেউ ডাকলেই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে? ফোন তুলে অপারেটরকে বললে কেমন হয় তাকে যেন আর লাইন না দেওয়া হয়। ভাবনাটা বাতিল করল সে। এটা করলে আরও চিহ্নিত হয়ে যাবে।

দরজায় শব্দ হল। সুধা এই ঘরে চলে এল? সে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখল যশোবন্ত দাঁড়িয়ে, 'ওড ইভনিং!'

'ওড ইভনিং।'

'বেরিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ, একটু।'

'কোন দরকার থাকলে বললেই হত। চেষ্টা করবি বাইরে যাওয়া এড়িয়ে যেতে।'

'কেন কিছু হয়েছে?'

'শোভনলালের কেসটা যে এনকয়ারি করছে তার নাম প্রবীণ কাপুর। লোকটা খুব চালাক, যাকে বলে এফিসিয়েন্ট, ঠিক তাই। সবচেয়ে খারাপ খবর হল, ঘুম খায় না।'

'ঘুম?'

'আরো হ্যাঁ। দ্যাখ অতীশ, তোকে বাঁচতে হলে ঢাকা খরচ করতে হবে।'

'কত?'

'অ্যামাউন্টটা আমি এখনই বলতে পারব না। রাজী আছিস?'

'আমি বাঁচতে চাই যশোবন্ত।'

'সবাই চায়। এখন মন দিয়ে শোন। শোভনলালের ছেলেকে পুলিশ দিঙ্গিতে নিয়ে গিয়েছে বডি আইডেন্টিফাই করার জন্য। ওর বাবা কেন দিঙ্গি গিয়েছিল সেইকথা নিশ্চয়ই সে পুলিশকে বলছে। এদিকে আমার কথা অনুযায়ী ক্যাপিটাল হোটেলের কর্মচারীরা কাপুরকে বলেছে ওরা শোভনলালের সঙ্গে কাউকে ওর ঘরে যেতে দ্যাখেনি। কিন্তু একটা গোলমাল হয়ে গিয়েছে।'

'কি?' অতীশের গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল।

'শোভনলালের পাশের ঘরে কানপুর থেকে আসা একটা ফ্যামিলি আছে। তাদের একজন বলেছে শব্দ শুনতে পেয়ে দরজা খুলে বাইরে তাকিয়েছিল। করিডোর ফাঁকা দেখে দরজা বন্ধ করার সময় লক্ষ্য করে শোভনলালের ঘর থেকে একটা লোক এক হাতে স্যুটকেস অন্য হাতে ব্রিফকেস নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। লোকটার মুখ দেখতে পায়নি। পেছন থেকে যা মনে হয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছে। সেই ঘটনার সঙ্গে শোভনলালের ছেলে যদি তোর নামে এক-আই-আর করে তো কাপুর ঠিক মিলিয়ে নেবে।'

অতীশ মনে করতে পারল না পাশের ঘরের দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে ছিল কিনা। সেদিকে তাকাবার মত মানসিকতা তখন ছিল না।

যশোবন্ত রিসিভার তুলে চণ্ডীগড়ের লাইন চাইল। ওটা শোভনলালের নয়।

‘হ্যালো! তোমাকে এখনই একটা কাজ করতে হবে—ঠিকানাটা লিখে নাও। হুউস নাম্বার টু জিরো ফোর, সেকটার থার্ট ফাইভ এ। বাড়ির মালিক শোভনলাল দিল্লিতে মারা গিয়েছে। ওর স্ত্রীকে বলবে ওর স্বামীর খুনের ব্যাপারে পুলিশের কাছে কারও নাম যেন এফ-আই-আর না করা হয়। শোভনলালকে কে খুন করেছে ওরা জানে না, কিন্তু কোন সন্দেহের কথা পুলিশকে যেন না বলে। বললে ওর ছেনে দিল্লি থেকে আর ফিরে আসবে না। ক্লিয়ার? টিম নিয়ে যাবে। একঘণ্টার মধ্যে কনফার্ম করো।’ রিসিভার নামিয়ে রাখল যশোবন্ত।

অতীশ বলল, ‘কিন্তু ভদ্রমহিলা তো চণ্ডীগড়ে আর ছেনেটা বলছিস দিল্লিতে। সেই ছোকরা যদি এর মধ্যে এফ-আই-আর করে দেয়?’

‘দেবে না। দিল্লিতে ওর কাছে আমার লোক পৌঁছে গেছে। এসব প্রবলেম নয়। আমি শুধু কাপুরকে নিয়ে ভাবছি। এখানকার এস.পি.-র সঙ্গে কাপুরের বস-এর বন্ধুত্ব আছে। আই পি এস-এ ওরা একসঙ্গে ট্রেনিং করেছে। এস পি বলল, কাপুর অন্য ধাতে গড়া। তাই কিছুদিন পর পর ট্রান্সফার হয়। এক্ষেত্রে হয়তো সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আচ্ছা, শোভনলালের ব্রিফকেসটা কোথায়?’

‘ওটা আমি ফেলে দিয়েছি।’

‘কোথায়?’

‘রাত্রের ট্রেনে। লাইনের ধারে পাথরের ওপর যে স্পীডে পড়েছে এখন আর চেনা যাবে না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।’

‘কি ছিল ব্রিফকেসে?’

‘অ্যাকাউন্টসের কাগজপত্র। সেগুলো ছিড়ে আমি টয়লেটের গর্তে ফেলে দিয়েছি। ওই রিভলবারটাও ছিল—আর কিছু টাকা।’

‘কত?’

‘এখনও শুনে দেখিনি। পঁচিশ ত্রিশ হবে।’

‘তাহলে তোকে যে টাকা দিতে সে রাব্বী ছিল সেটা কোথায়? নিশ্চয়ই সঙ্গে এসেছিল। কিন্তু ওর হাতে ব্রিফকেস ছাড়া কিছু ছিল না। সকালে হোটеле চেক ইন করে গাড়ি নিয়ে তোকে আনতে এয়ারপোর্ট গিয়েছিল। যেহেতু সঙ্গে কোনও জামাকাপড় নিয়ে যায়নি, তখন ওর প্ল্যান ছিল তোর সঙ্গে কথা শেষ করেই চণ্ডীগড়ে ফিরে যাওয়ার। তাহলে টাকাগুলো রাখল কোথায়?’ কথাগুলো বলতে বলতে ভাবছিল যশোবন্ত। হঠাৎ মুখ তুলল, ‘ব্রিফকেসের ভেতর গোপন চেম্বার ছিল না তো? চেক করেছিলি?’

‘না।’

‘করা উচিত ছিল। ব্রিফকেস ভেঙে গেলেও টাকাটা ঠিক থাকতে পারে। আর ওই জায়গাটায় যদি আজ কেউ যায়, অত টাকা পেয়ে নিশ্চয়ই মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। ঠিক কোন্ জায়গায় ফেলেছিস?’

‘অত রাতে আমি চলন্ত ট্রেন থেকে কি করে বুঝব কোন্ জায়গায় পড়েছে।’

‘ঠিক হ্যাঁ।’ যশোবন্ত উঠে দাঁড়াতেই টেলিফোন বাজল। সে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে আলতো গল্যায় বলল, ‘হ্যালো।’

ওপাশের কথা শুনে রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে প্রশ্ন করল, ‘মেমেটা কে?’

‘কোন্ মেয়ে?’

‘যে তোকে ঘরে যেতে বলেছিল?’

‘ও, ট্রেনে আলাপ হয়েছিল।’

‘ও জানল কি করে তুই এখানে আছিস?’

‘বোধহয় সন্দের সময় যখন বাইরে বেরিয়েছিলাম তখন দেখেছে।’

‘কথা বল।’

অতীশ রিসিভার কানে নিয়ে কোনও আওয়াজ পেল না। সে বলল, ‘হ্যালো।’

‘এতক্ষণ কি করছিলেন?’ সুধার গলা।

‘কিছু না।’

‘তাহলে চুপ করে ছিলেন কেন? আপনি যদি ভাল চান চলে আসুন।’ সুধা টেলিফোন রেখে দিল।

অতীশ বলল, ‘মাথা খারাপ হয়ে যাবে আমার।’

‘দেখতে কেমন?’ যশোবন্ত হাসল।

‘ভালই। এখানকার এক ব্যবসায়ীর তৃতীয় পক্ষের বউ।’

‘ওহো, কিয়নলালের? লোকটা কিন্তু সাপের মত, সাবধান। তুই মাল খাস না? বোতল খোলা হয়নি দেখছি।’

‘ইচ্ছে করেনি।’

‘আরে ইয়ার, বন্ধ ঘরে বসে সবসময় দুশ্চিন্তা করলেই তোর সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? ভেবে তুই কি করবি? আমি তো চেষ্টা করছি।’

‘তা ঠিক। কিন্তু..., আচ্ছা চণ্ডীগড়ে তুই কার সঙ্গে কথা বললি?’

‘এসব প্রশ্ন করিস না। তোর কাজ হওয়া নিয়ে কথা, কি করে হচ্ছে জানার কোনও দরকার নেই। তুই এখন ফুর্তি কর। মাল খা, পেশাদারী মেয়ের সঙ্গে ফুর্তি করতে পারিস, কিন্তু হোটেলের বাইরে যাস না আর ওই সাপের লেজে পা দিস না।’

‘তুই সাপ-সাপ বলছিস কেন?’

‘দু-দুটো বউকে এই শহরের এই দুই বাড়িতে রেখে যে তিন নম্বরকে নিয়ে হোটеле ওঠে সে সহজ লোক নয়। কোন্ বউ এটা মেনে নেবে? এখানে যে কদিন থাকবে প্রতি রাতে এক এক বউ-এর সঙ্গে কাটায়। যে বউ-এর কাছে রাতে থাকবে তার ছেলেরা হোটেলের নিতে আসে—এরকম মাল আমি কখনও দেখিনি।’

‘তোর সঙ্গে কিরকম সম্পর্ক?’

‘হোটেলটা আমার আর সে ভাড়া দিয়ে থাকে। গুডনাইট।’

যশোবন্ত বেরিয়ে যাওয়ার পরই অতীশের মনে হল, লোকটা এর মধ্যেই পাল্টে গেছে। দমদম এয়ারপোর্টে যেরকম আন্তরিক ব্যবহার করেছিল সেটা আর এখন নেই। এখন সে ওর মুঠোর মধ্যে, এমন ভঙ্গি কথাবার্তা এসে গিয়েছে। প্রশ্ন করলে বেশ হেঁয়ালির সঙ্গে জবাব দিচ্ছে। যশোবন্ত তাকে টাকা খরচের কথা বলল, কত টাকা লাগবে বলল না। ও কি তাকে মুরগী হিসেবে দেখছে? এই ফাঁকে কিছু টাকা হাতিয়ে নেবে?

একটা প্রতিবাদী মন তৈরি হয়ে গেল অতীশের। কিন্তু সে কি ভাবে প্রতিবাদ করবে ভেবে পাচ্ছিল না। পুলিশের হাতের ছায়া তাঁর হাতের উপর এসে পড়েছে। তার নিজের কোনও নিষ্কৃতির পথ জানা নেই। যশোবন্তের ওপর তাকে নির্ভর করতেই হবে। কিন্তু যা হকুম করবে তাই তাকে শুনতে হবে কেন? আর তখনই তার মনে হল সুধার সঙ্গে দেখা করা উচিত। ও যখন দূবার ফোন করেছে তখন নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। অবশ্য সে এটা স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করতে পারত যদি যশোবন্ত তাকে ভয় না দেখাতো। এখন যশোবন্তের কথা না মানার জন্যই সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

চারতলার অটোশ নম্বর দরজার পাশের বোতাম টিপল অতীশ। দশ সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলল। সুধা দাঁড়িয়ে আছে দুধসাদা খাটো স্কার্ট পরে। মাথার চুল ফুলে ফেঁপে রয়েছে। সুধা হাসল, ‘সময় হল শেষ পর্যন্ত। আসুন।’

অতীশ ঘরে ঢুকতেই সে দরজা বন্ধ করে বলল, ‘আমিই আপনার ঘরে যেতে পারতাম কিন্তু উপায় নেই। পুরনো বউ-এর সঙ্গে প্রেম করতে করতে তিনি ঠিক এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর আমাকে ফোনে বলবেন—আই লাভ ইউ ডার্লিং। যতক্ষণ না তার সেপ চলে যাচ্ছে ততক্ষণ আমাকে ওটা শুনতে হবে। আসলে আমি ঘরে আছি কিনা সেটাই পরখ করতে চায়। গলা শুনলে নিশ্চিত হয়।’

‘এসব আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার।’ অতীশ বলল।

হঠাৎ অতীশের সামনে চলে এল সুধা, ‘আপনি কে?’

‘তার মানে?’ হকচকিয়ে গেল অতীশ।

‘ট্রেনে নাম বলেছিলেন অতীশ। হোটেলের খাতায় লিখেছেন ডি রায়। অর্থাৎ আপনি আপনার পরিচয় লুকোতে চান। যে কোনও স্টেশনে ট্রেন থামতেই আপনি টয়লেটে চলে যাচ্ছিলেন, কারণ আপনি নিজেকে

আড়াল করতে চান। আপনার ব্রিফকেস আমি নিজের চোখে দেখেছি। সেটা আপনি রানিং ট্রেন থেকে বাইরে ফেলে দিয়েছেন। নিজের জিনিস কেউ ট্রেন থেকে ফেলে দেবে না।' চোখ ছোট করে তাকাল সুধা।

'আমার ব্যাপারে আপনি এত ভাবছেন কেন?' অতীশ একটু দিশেহারা হয়ে পড়ছিল।

'কারণ নিপাট ভদ্রলোকরা আমাকে একটুও টানে না।'

'তার মানে আমি ভদ্রলোক নই?'

'মোটাই না। আপনার মধ্যে দু-নম্বরী ব্যাপার আছে। হয় আপনি স্মাগলার, নয় ডাকাত, নয়তো খুনটুন করেছেন। মোদা কথা পুলিশ আপনাকে খুঁজছে।' সুধা বলামাত্র টেলিফোন বেঞ্চে উঠল। সুধা জিভে বিরক্তি প্রকাশ করল। তারপর রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো! হ্যাঁ, কি আর করব, বসে বসে হইকি আছি আর বোর হচ্ছি। নাঃ, টিভি খুলতে ভাল লাগছে না। সত্যি? হাউ মাচ?' অদ্ভুত হাসি হেসে উঠল মেয়েটা। তারপর থ্যাঙ্ক বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

'কিষেনলালজী?'

'এখনই কথা জড়িয়ে গেছে। এক ঘণ্টা বাদে ফোন করতে পারবে বলে মনে হয় না। বলল, সমুদ্রে যত ঢেউ ওঠে তার থেকে বেশি আমাকে ভালবাসে। ওর মেজ বউ ওকে তখন কাছ খাইয়ে দিচ্ছিল। লোকটার বুকোর পাটা আছে। হইকি খাবেন?'

'না।'

'এখন সবসময় অ্যান্ডারস্ট্যান্ডিং থাকতে হচ্ছে?'

'তার মানে?'

'হইকি গেয়ে যদি নেশা হয়ে যায়, তাহলে পালাবার দরকার হলে পারবেন না—এই কারণে ভয়ে উপোস করছেন! ঠিক কিনা?'

'আপনি কি চান বলুন তো?'

'আমি? আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতে চাই না। তবে আপনি আমাকে এড়িয়ে চললে আমার মাথা গরম হয়ে যাবে এবং শুখন রাগের মাথায় পুলিশকে ফোন করে আপনার কথা বলেও দিতে পারি। আমার মাথা অল্লেই গরম হয়ে যায়।' প্রাসে হইকি ঢালল সুধা।

'আপনাকে এখানে নিয়ে এসে হোটেলে একা রেখে কিষেনলাল যা করছেন তাতে আপনার মাথা গরম হচ্ছে না?' কথা ঘোরাতে চাইল অতীশ।

'ঠিক ধরেছেন। হচ্ছে না কারণ লোকটা আমাকে টাকা দিচ্ছে।'

হঠাৎ অতীশ শান্ত হয়ে গেল। সে বলল, 'আপনি কি আমার থেকে টাকা চাইছেন?'

'এখনও চাইনি। তবে প্রয়োজন হলে চাইব। আপনি আমাকে না জানিয়ে হোটেল থেকে উধাও হয়ে যাবেন না। অবশ্য গেলেও পুলিশকে আপনার ছবি দিতে পারব।'

'ছবি? আমার ছবি আপনি কি করে পাবেন?'

প্রাসে চুমুক দিতে দিতে ব্যাগ খুলে একটা ছবি বের করে সামনে ধরল সুধা, 'এটা আপনার ছবি তো? অর্থাৎ হবার কিছু নেই, হোটেলের যখন ঢুকছিলেন তখন গোটা তিনেক ছবি তুলেছিলাম আপনার—আপনি টেরও পাননি। এই ছবিটা যদি হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলেন, তাতে আপনার কোনও লাভ হবে না—আরও দুটো ছবি তোলা আছে। পোলারয়েড ক্যামেরার সুবিধা হল, শুৎক্ষণাৎ ছবি তোলা যায়। হইকি তাহলে খাবেন না?'

অতীশ নিজেই এগিয়ে গিয়ে প্রাসে ঢেলে নিল খানিকটা। জল মিশিয়ে বলল, 'আপনি দেখছি বেশ আঁটঘাট বেঁধে কাজ করেন। তো কিষেনলালজী এসব জানলে খুশী হবেন?'

'হবে না। কিন্তু আপনি পুলিশের হাতে পড়বেন। আচ্ছা কি করেছেন, বলুন না? দেখে মনে হয় ডাকাতি করার লোক আপনি নন। স্মাগলিং কিংবা রেপ?'

'কোনটাই নয়।'

'তাহলে অফিসের অথবা কোনও বন্ধুর টাকা মেরে পালাচ্ছেন?'

'এটাও হল না।'

'তাহলে? না, আপনি খুন করতে পারেন না। পেশাদার খুনী এত নার্ভাস হয় না। আপনি নিশ্চয়ই বিবাহিত মানুষ। বউ-এর সঙ্গে ঝামেলা হলে পুলিশকে ভয় পাবেন কেন?'

‘আমি পুলিশকে ভয় পাচ্ছি আপনাকে কে বলল?’

‘পাচ্ছেন না? বেশ, এখনই আমার সঙ্গে থানায় চলুন। গিয়ে বলবেন আপনার নাম ডি রায়, দিল্লি থেকে আসছেন। আপনার ড্রিফকেন্স চুরি হয়ে গিয়েছে।’ হানল সুধা, ‘কি, পারবেন যেতে? পারবেন না।’ গ্রাসটা শেষ করল সুধা।

‘আপনি আমাকে এই ঘরে ডেকে নিয়ে ঠিক কাজ করেননি!’

‘কেন?’

‘কিষেনলালজী এটা পছন্দ করবেন না।’

‘আপনি কি ঢাকঢোল পিটিয়ে এই ঘরে এসেছেন?’

‘তা নয়।’

‘আপনার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। কাল রাতে ট্রেনে যখন কিষেনলাল স্ত্রান হারিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন আমি আপনার সঙ্গে যা ইচ্ছে করতে পারতাম। ঘুম ভাঙার পর কিষেনলাল এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি। যে লোকের নিজের শরীরে অভ্রম ঘা রয়েছে সে অন্যকে জামাকাপড় পরা দেখতেই পছন্দ করে।’ সুধা সোফায় বসল।

অতীশ দাঁড়িয়েছিল, সুধার দিকে তাকিয়ে তার হঠাৎ-ই মনে হল, এই মেয়েটা তার চেয়ে বরসে অনেক ছোট। এবং যথেষ্ট সুন্দরী। কিষেনলালের সঙ্গে এর জীবন কি আদৌ সুখে কাটছে? জীবনের কথা মনে হতেই সে একটু গুটিয়ে গেল। মৃত্যুর খাঁড়া তার মাথার উপর ঝুলছে, যে কোনও মুহূর্তেই পুলিশ তার পরিচয় জেনে যাবে। যশোবন্ত ইতিমধ্যেই তাকে কজা করে নিয়েছে বলে ভাবছে। আবার সুধা তার মত করে এগোচ্ছে—সে কি করবে?

‘খুব ভাবনায় পড়েছেন?’

সুধার গলা শুনে নিজেকে সামলে গ্রাস শেষ করে সে বলল, ‘এবার চলি।’

আপনাকে আমি এত তাড়াতাড়ি ছাড়ছি না।’

‘তার মানে?’

‘বসুন না। গল্প করি। আমি কি দেখতে এত খারাপ?’

‘আপনি আমাকে প্রভোক করার চেষ্টা করছেন?’

‘করছিই তো! যদি আপনার চৈতন্য হয়।’

‘আমি যদি প্রভোকড হই?’

‘আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তবে তার আগে আপনাকে বলতে হবে কেন আপনি পুলিশকে ভয় পাচ্ছেন? কি করেছেন আপনি?’

‘তার মানে আপনি আমাকে ব্ল্যাক মেল করছেন?’

‘না। আপনাকে আমি সাহায্য করতে চাইছি।’

‘সাহায্য? কেন? আপনি তো আমাকে চেনেনই না।’

‘কে বলল?’

‘আশ্চর্য। আপনি আমাকে গতকালই প্রথম দেখলেন। তখন নাম শুনেছেন অতীশ। আজ এই হোটেলের রেজিস্ট্রারে নাম দেখেছেন ডি রায়। এতে কতটুকু চিনলেন?’

‘আপনি যা বললেন তা দিয়ে কি মানুষ চেনা যায়? গতরাতে আপনি আমাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে আপনি যা খুশী করতে পারতেন। কিন্তু করেননি। এইটুকুই আপনার পরিচয়, যা আপনাকে চেনার পক্ষে যথেষ্ট। দোহাই, এবার বলবেন না আপনি কিষেনলালের মত প্রাকৃতিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। অবশ্য বললেও আমার কিছু এসে যায় না।’

‘আমি গতকাল খুব ডিস্টার্বড ছিলাম। খুবই টেনশন হচ্ছিল। আমার শরীরও ভাল ছিল না। মদ খেতেও ইচ্ছে হচ্ছিল না। গতরাতে আমি চূপচাপ শুয়ে থেকেও ঘুমাতো পারিনি। এ অবস্থায় ওসব ভাবনা আমার মাথায় আসার কথা নয়।’

‘কি নাম বলে ডাকব আপনাকে?’

‘কেন?’

‘বলুন না।’

‘ওই অতীশই বলুন।’

‘অতীশ, আপনি আমার পাশে এসে বসবেন? প্লীজ! ওহো, আপনার আমার গ্লাস শেষ হয়ে গিয়েছে, একটু ভরে দেবেন?’

অতীশ দুটো গ্লাসে মদ ঢেলে জল মিশিয়ে একটা সুধার হাতে দিয়ে পাশে বসল। সুধা চুমুক দিয়ে বলল, ‘আজকে আমার দ্রুত নেশা হচ্ছে।’

‘আর থাকেন না তাহলে।’

‘দূর! হ্যাঁ, টেন মি—কী করেছেন?’

‘আমি কিছুই করিনি।’

‘আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, না?’

অতীশ চূপ করে রইল। পাশে সরে এল সুধা, ‘বলুন, বিশ্বাস করতে খুব অসুবিধে হচ্ছে? ভাবছেন আমি আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব?’

এই সময় টেলিফোন বাজল। সুধা চট করে ঘড়ি দেখল, ‘এখনও তো একঘণ্টা হয়নি!’ সে রিসিভার ধরে হ্যালো বলল।

ওপাশে কি হচ্ছে তা অতীশ জানে না। সে সুধাকে বলতে শুনল, ‘তুমি এখন আর কথা বলতে পারছ না? ঘুমিয়ে পড়—হ্যালো, প্লীজ, ঘুমিয়ে পড়।’

সুধার কপালে তাঁত পড়ল। খুব বিরক্ত দেখাচ্ছিল ওকে। হঠাৎ সে চিংকার করে উঠল, ‘ই দা হেল ইউ আর! আমার সঙ্গে কথা বলার সাহস হয় কি করে? ওকে রিসিভারটা দিন—আই ওয়াণ্ট হিম রাইট নাও। এখনই ওকে হোটেল চলে আসতে হবে! ...হ্যালো! হ্যালো! হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার বউ আমার সঙ্গে কেন কথা বলল? আমি ওর হকুম কেন শুনব। তুমি চলে এসো—এখনই! কি? ওঃ, ঠিক আছে, কালই এসো। ওডনাইট।’ রিসিভার নামিয়ে রাখল সুধা।

‘আমি কি যেতে পারি?’ অতীশ জিজ্ঞাসা করল।

‘কেন?’

‘আপনি খুব আপসেট!’

‘এটা না করলে কিয়নলাল আজ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত না।’

‘তার মানে?’

‘ওর বউ আমাকে উপদেশ দিচ্ছে আর আমি সেটা মেনে নিচ্ছি শুনলে ওর মনে সন্দেহ আসত। ভাবত আমি কোনও ধান্দা করছি। আমি প্রতিবাদ করায় ও খুশী হল। ভাবল আমি ঠিকই আছি।’

‘তার মানে আপনি অভিনয় করলেন?’

‘না। ওর বউ আমার সঙ্গে কথা বলার সাহস পাচ্ছে দেখে আমি সত্যি রেগে গিয়েছিলাম। যাক গে, আপনি এখনও উত্তরটা দেননি।’

গ্লাস খালি করে নামিয়ে রাখল অতীশ, ‘এই উত্তরটা আমার পক্ষে এখনই দেওয়া সম্ভব নয়। ওডনাইট।’ দ্রুত দরজায় চলে এসে সেটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল অতীশ। লম্বা লম্বা পা ফেলে লিফটে উঠে নিজের ঘরে ফিরে এল।

ঘরে ঢুকে ছইকির বোতলটা চোখে পড়ামাত্র সেটা খুলল সে। গ্লাসে ঢেলে জল মিশিয়ে জানলার সামনে দাঁড়াল। সুধা কি চায়? কিয়নলালের নিশ্চয়ই প্রচুর টাকা আছে—অর্থাৎ সুধার টাকার অভাব নেই, অথচ তার ওপর ভাল ফেলে সে ওটিয়ে তুলতে চাইছে। কেন?

অতীশের মনে হল আজ রাত্রেই এখান থেকে চলে গেলে কেমন হয়? একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা! কোনও পাহাড়ি শহরে গিয়ে ঘরভাড়া নিয়ে সে থাকতে পারে, যেমন ডালহৌসি। খুব কম মানুষ সেখানে বেড়াতে যায়। তার কাছে যে টাকা আছে তাতে অন্তত একটা বছর কোনমতে কি কাটাতে পারে না? যশোবন্ত এবং সুধার হাত থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র রাস্তা।

আজ সন্ধ্যা থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি। এমন কি ডিনারের সময় গেরিয়ে যাচ্ছে, তবু তাও করা হয়নি। অতীশ বুঝতে পারছিল তার নেশা হচ্ছে। মাথা ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। ফোন করে ডিনার চাইবে নাকি? অতীশ ফোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, এইসময় সেটা শব্দ করে উঠল।

অতীশের মনে হল ডিনারের ব্যাপারে খোঁজ করছে। 'সে রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই যশোবন্তের গলা শুনেতে পেল, 'অতীশ, কাজ এগিয়েছে।'

'বুঝলাম না।'

'এটা তোকে বুঝতে হবে না। শুধু জেনে রাখ, শোভনলালের স্ত্রী কথা দিয়েছে ভোর বিরুদ্ধে এফ-আই-আর করবে না। কিন্তু ওর ছেলে এখন দিল্লিতে। ছেলে কি করছে তা মহিলা জানে না। কিন্তু সে ফোন করলে নিষেধ করে দেবে।'

'মহিলা জানে আমিই—।'

'কারও মনের কথা জানার দরকার নেই। কিন্তু তোকে কালই এখান থেকে চলে যেতে হবে। হোটেলের খাকা ঠিক হচ্ছে না।'

'চলে যাব? কোথায় যাব?'

'ভেবে দেখি। গুডনাইট।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ধপ করে বসে পড়ল অতীশ। এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না মানে নিশ্চয়ই কোনও সমস্যা হয়েছে যা যশোবন্ত তাকে বলল না। যশোবন্ত যেন তার বস্ এমন ব্যবহার করছে। যদি ওর কথা সত্যি হয়, ফোন করে চম্ভীগড়ে শোভনলালের সদ্যবিধবা স্ত্রীকে এফ-আই-আর না করাতে রাজী করতে পেরেছে—তাহলে নিশ্চয়ই দারুণ কাজ করেছে। আর এই কাজ যে সে করতে পারবে না। সদ্য খুন হওয়া স্বামীর আততায়ীকে ধরতে চাইছে না তার স্ত্রী এমনটা ভাবা যায়? যারা গিয়েছিল তাদের নিশ্চয়ই কুখ্যাতি আছে, খুনের পর খুন করেও তারা অতীশের মত ভয়ে কঁকড়ে থাকে না। শোভনলালের স্ত্রী সেটা বুকেই মুখ বন্ধ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু দিল্লির পুলিশ অফিসার কাপুর সম্পর্কে যশোবন্ত যা বলেছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে লোকটা কি এত সহজে তাকে ছেড়ে দেবে। একটা বর্ণনা লোকটা পেয়েছে। আর শোভনলালের ছেলে তো তার হাতের মুঠোয়। মাথা খারাপ হবার উপক্রম হল অতীশের। শোভনলালের বউ যদি শেষ পর্যন্ত মরীয়া হয়ে কাপুরকে জানিয়ে দেয় সে লোক পাঠিয়ে প্রাণের ভয় দেখিয়েছে, তাহলে? যা কিছু রহস্য ছিল তা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে যাবে কাপুরের কাছে। উপকার করার বদলে যশোবন্ত তাকে আরও অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলছে। কি উদ্দেশ্য ওর?

খালি পেটে মদ খেতে খেতে নেশা হয়ে যাচ্ছিল অতীশের। আর সেই সঙ্গে অনেক অনেক সময় বাদে ঘুম এল। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল সে। একটা গভীর অন্ধকার কুয়োর মধ্যে সে হৈ-হুলা করে নেমে যাচ্ছিল। প্রথম দিকে একটা ক্ষণভাবনা কাজ করছিল, হাত বাড়িয়ে কিছু ধরে নিজে থেকে আটকাবার—শেষে তাও চলে গেল।

ক্যাপিটাল হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নেমে একটু দাঁড়াল কাপুর। দীর্ঘকায়, ফর্সা, দামী গগলস পরা মানুষটিকে দেখে হোটেলের দারোয়ান সোজা হয়ে দাঁড়াল। কাপুর হোটেলটাকে দেখছিল। দিল্লির অভিজাত হোটেলের পর্যায়ে পড়ে না বটে কিন্তু এদের হোটেল বেশ চালু। সমস্ত ভারতবর্ষের লোক দিল্লিতে কোন না কোন ধান্দায় এসে এই রকম হোটেলে ওঠা পছন্দ করে। যত সব দু-নন্দরী ব্যাপার বছন্দে এইরকম হোটেলে করা যায়। মুশকিল হল হোটেলের মালিক সেসব চেপে রাখে যতটা সম্ভব। পুলিশকে জানালে খদ্দেরদের আস্থা চলে যাওয়ার ভয়ে মুখে কুলুপ এঁটে রাখে। এই যে এখানে একটা খুন হয়েছে, এদের একজন প্রায় নিয়মিত খদ্দের, তবু মুখ খুলছে না কেউ। অথচ প্রথমদিন খুনের খবর দেওয়ার সময়, ডেডবডি নিয়ে যাওয়ার পরও এদের কথাবার্তায় একটা সহজ ভাব ছিল। পরদিন হঠাৎই সেটা চলে গেল। এখন কেউ কিছু দ্যাখেনি, কেউ কিছু শোনেনি এমন ভাবভঙ্গি। কাপুর মাথা নাড়ল। তারপর হোটেলের ভেতর ঢুকে পড়ল।

রিসেপশনে খাড়া ছিল তারা কাপুরকে দেখে সন্ত্রস্ত। সেখানে পৌঁছে কাপুর একটু হেসে বলল, 'আমি আবার এলাম।'

যে মেয়েটি চার্জে ছিল সে জিজ্ঞাসা করল, 'বলুন, আমরা কি করতে পারি?'

'আমি এখানে বেড়াতে আসিনি। আপনি গতকাল মিথ্যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন কেন?'

'আমি? না স্যার, যা জানি তাই বলেছি।'

‘বলেননি।’

‘আমি কি বলব স্যার! আপনি বরং আমাদের মালিকের সঙ্গে কথা বলুন। উনি বলেছেন কোন প্রয়োজন হলে ওঁর সঙ্গে কন্টাক্ট করতে।’

‘আমার এখন ওঁকে কোনও প্রয়োজনই নেই। আর আমি যদি এখন মিথ্যে স্টেটমেন্ট দেবার অপরাধে আপনাকে ধরে নিয়ে যাই তো আপনাকেই যেতে হবে—ওঁকে নয়। তাই তো?’

মেয়েটির নাকে ঘাম ঝলল।

কাপুর বলল, ‘খাতাটা বের করুন। হ্যাঁ, ভদ্রলোক সকাল সাতটায় হোটেল এসেছেন। আপনি ডিউটিতে ছিলেন। ওঁর সঙ্গে কি ছিল মনে আছে?’

মেয়েটি বলল, ‘আমি তো গতকাল বলেছি।’

‘আজ আবার বলুন।’

‘উনি একটা ব্রিফকেস নিয়ে এসেছিলেন।’

‘কদিন থাকবেন বলেছিলেন?’

‘ওটা ওপুন রেখেছিলেন।’

‘একটা লোক সঙ্গে কোনও জামাকাপড় না নিয়ে এসে হোটেল চেক ইন করছে দেখে কিছু প্রশ্ন মনে আসেনি আপনার? নাকি দু-চার সপ্তাহের জন্যে ঘরভাড়া দেওয়ার রেওয়াজ এই হোটেলের চালু আছে! বলুন?’

‘না স্যার। আমি জেবেছিলাম ওর ব্রিফকেসে হয়তো কিছু পোশাক আছে। অনেকে সেরকম নিয়ে আসেন। এর আগেও উনি একবার এইভাবে এসেছেন।’ মেয়েটি জানাল।

‘সাতটার সময় হোটেল এসে উনি কোথায় বেরিয়েছিলেন?’

মেয়েটিকে এবার বেশ নার্ভাস দেখাল। সে একটু সময় নিয়ে বলল, ‘জানি না স্যার।’

‘কখন ফিরলেন?’

দশটার একটু পরে।’

‘একা?’

‘আমরা কাউকে ওঁর সঙ্গে দেখিনি স্যার।’

‘আপনারা কেউ গতকাল বলেননি যে হোটেলের আসার পর উনি আবার বেরিয়েছিলেন। আমি নেহাতই আন্দাজে কথাটা জিজ্ঞেস করলাম আর আপনি উত্তর দিলেন!’ কাপুর বিরক্ত হল, ‘একটা মানুষ খুন হয়েছে, অথচ তার খুনীকে ধরতে আপনারা পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না! যেটুকু সময় শোভনলাল এখানে ছিল তাতে কি কি বিল ওর নামে হয়েছে?’

‘চেক আপ করতে হবে স্যার!’

‘একটা লোক কদিন আগে মারা গিয়েছে অথচ তার বিল এখনও রেডি করেননি, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। পেঙ্গিং বিলের ফাইলটা দেখি!’ হাত বাড়াল কাপুর।

মেয়েটি বাধ্য হয়ে একটা ফাইল এগিয়ে দিল। কাপুর দেখল তাতে অন্তত গোটা ত্রিশেক বিল ফাইল করা হয়েছে, ‘এত বিল পেমেন্ট হয়নি?’

‘না স্যার।’

‘অফিসের অ্যাকাউন্টে যারা এই হোটেল এসে ওঠে সেগুলো?’

‘সেগুলো আলাদা।’

শোভনলালের বিল দেখতে পেল কাপুর। কম্পিউটার থেকে বের করল।

একদিনের রুম রেন্ট, এক ছোট পট চা, এক বড় পট চা, দু ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের জন্যে হোটেলের গাড়িভাড়া বাবদ যা পাওনা হয় তা লেখা রয়েছে।

‘সিম্পল কাপ চায়ের পটের দাম কত?’

‘সভেরো টাকা।’

‘তিরিশ টাকা তাহলে ডাবলের?’

‘হ্যাঁ স্যার।’

‘শোভনলালের ডেডবডি যে অফিসার হোটেল থেকে নিয়ে যায় তার রিপোর্টে দেখেছি ওই ঘরের

টেবিলে দুটো কাপ ছিল। দুটো কাপই ব্যবহৃত। আপনাদের কথা অনুযায়ী ওই দু কাপ চা শোভনলাল একা খেয়েছিল, তাই তো?’

‘না স্যার। নিশ্চয়ই উনি ওর গেস্টের জন্যে চা বলেছিলেন। কিন্তু সেই গেস্ট কখন কিভাবে ওঁর ঘরে গিয়েছে তা আমরা লক্ষ্য করিনি।’

‘যে বেয়ারা ওই চা সার্ভ করেছে তাকে ডাকুন।’

‘ইয়েস স্যার।’ মেয়েটি টেলিফোনে চাপা গলায় কিছু বলল কাউকে। তারপর মুখ তুলে বলল, ‘স্যার, আপনি যদি এখানে না দাঁড়িয়ে আমাদের মালিকের ঘরে বসে কথা বলেন তাহলে সুবিধে হয়। বাইরের লোকজন এখানে আসছে তো—।’

‘ঠিক আছে।’

মেয়েটির নির্দেশে একটি বেয়ারা ওকে নিয়ে এল যে ঘরে সেই ঘরে কেউ নেই। চেয়ারে বসল কাপুর। মেয়েটি তাকে ওখান থেকে সরিয়ে দিল যাতে মালিকের সঙ্গে আলোচনা করতে পারে। দরজায় শব্দ হল। একটি বেয়ারা ঢুকে নমস্কার করল।

‘তুমি সেদিন সকালে আটশ দশ নম্বর ঘরে চা সার্ভ করেছ?’

‘জী স্যার।’

‘মিথ্যে কথা বললে তুমি বিপদে পড়বে। কি নাম তোমার?’

‘জাহাঙ্গীর।’

‘বেশ। চা নিয়ে ঘরে ঢুকে তুমি দুজন লোককে দেখলে—কে হোস্ট কে গেস্ট তা চিনলে কি করে?’

‘স্যার, সকালে আমি ওঁকে চা দিয়েছিলাম।’

‘ওড। ওরা তখন কি করছিল?’

‘কথা বলছিল। আমি ঢুকতে চূপ করে যায়।’

‘গেস্টের চেহারা কি রকম? কোনও বৈশিষ্ট্য নজরে পড়েছে?’

‘না স্যার। আমি অবশ্য ভাল করে দেখিনি।’

‘কেন?’

‘আমার কাজ ছিল—চা দিয়ে আসা। তাই করেছিলাম।’

কাপুর লোকটির দিকে তাকাল। লোকটা এবার চালাক হবার চেষ্টা করছে। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘গতকাল যখন পুলিশ জিজ্ঞাসা করেছিল তখন লোকটার কথা বলোনি কেন?’

‘না স্যার, গতকাল কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেনি। আমার ডিউটি অফ ছিল।’

কাপুর উঠে দাঁড়াল, ‘তুমি আমাদের সাহায্য কর। ওই লোকটাকে আমার চাই। একটু ভেবে দ্যাখ, ওর চেহারার কিছুটাও মনে পড়ে কিনা।’

বেয়ারা মাথা নিচু করল। ভাবতে ভাবতে মাথা নাড়ল, ‘না স্যার, কিছু মনে পড়ছে না।’

কাপুর বেরিয়ে এল। রিসেপশনকে বলল শোভনলালের ঘরটা খুলে দিতে। বডি নিয়ে যাওয়ার পর হোটেলের ওই ঘর পুলিশ সিল করে গিয়েছিল। গতকাল আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও হোটেল কর্তৃপক্ষ ওই ঘর কাউকে বরাদ্দ করেনি। ভেতরে ঢুকে চূপচাপ দাঁড়াল কাপুর। যে কোনও আরামদায়ক হোটেলের ঘর এইরকম হয়। আততায়ী খুন করেছে এখানে। লোকটার সঙ্গে আধেয়াত্র ছিল। খুন করে নিঃশব্দে বেরিয়ে গিয়েছে। পাশের ঘরের লোক গুলির আওয়াজ পেয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছে একটি লোক একহাতে স্মুটকেস অন্য হাতে ব্রিফকেস নিয়ে লিফটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটার দুটো হাতে যদি মাল থাকে, তাহলে দরজা খুলতে তার একটাকে নিচে রাখতে হয়েছে। বডি নিয়ে যাওয়ার আগে এ-ঘরের সব জায়গার হাতের ছাপ নেওয়া হয়েছে। তাহলে দরজার নবন আততায়ীর হাতের ছাপ থাকবে, চায়ের কাপেও থাকা উচিত। ফিরে গিয়ে ওগুলো নিয়ে বসতে হবে।

কাপুর সোফায় বসল। গতকাল খুলে দেবার পর নিশ্চয়ই এই ঘর পরিষ্কার করা হয়েছে। এখন কিছুই পাওয়া যাবে না। পাওয়ার থাকলে সেদিনই তার অধস্তন অফিসাররা পেয়ে যেত। কিন্তু এই হোটেলের লোকজন সত্যি কথা বলছে না।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে লিফট পর্যন্ত গেল। লোকটা লিফট খুলেছিল—কিন্তু তারপরে এত লোক ওখানে হাত দিয়েছে যে কোন ছাপ আলাদা করা যাবে না। কাপুর নিচে নামল। দূরে রিসেপশন। লোকটা

এখান থেকে বেরুতে গেলেও দারোয়ানের নজরে পড়বেই। অথচ দারোয়ানও বলেছে কাউকে সে বেরুতে দ্যাখেনি। এটা অসম্ভব ব্যাপার। তাহলে তো বিল না মিটিয়ে অনেকেই চুপচাপ মালপত্র নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে পারে!

হোটেলের সামনে থেকেই লোকটা নিশ্চয়ই কোনও গাড়িতে উঠেছিল। মৃতের ঘরে কোনও জিনিসপত্র পাওয়া যায়নি। মৃতের ব্রিককেসটা নিয়ে আততায়ী বেরিয়ে গেছে। প্রথমে মনে হয়েছিল স্যুটকেসটাও সে ওই ঘর থেকে নিয়ে গেছে, কিন্তু এরা বলছে শোভনলাল শুধু ব্রিককেস নিয়ে হোটেলে ঢুকেছিল। তাহলে? স্যুটকেস হাতে নিয়ে কেউ খুন করতে আসে?

কাপুর রিসেপশনের দিকে এগিয়ে গেল, 'মিস্টার ভার্মা কোথায়?'

'উনি দিল্লি গিয়েছেন স্যার।'

'কবে ফিরবেন?'

'ঠিক বলতে পারব না স্যার।'

'ফেরামাত্র আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।'

কাপুর হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এল। গাড়িতে ওঠার আগে চারপাশে তাকাল। না আততায়ী দু-হাতে মালপত্র নিয়ে হেঁটে যেতে পারে না—এখান থেকেই গাড়িতে উঠেছে। সেটা দারোয়ানের নজরে না পড়ে উপায় নেই। শোভনলালেন ব্রিককেসে এমন কিছু ছিল যার জন্যে আততায়ী ওকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে। আর আততায়ী দিল্লির লোক নয়। স্থানীয় মানুষ স্যুটকেস হাতে হোটেলে খুন করতে আসবে না।'

কিন্তু রিসেপশন যদি মিথ্যে কথা বলে থাকে? যদি স্যুটকেসটা শোভনলালের হয়? ইঠাৎ মনে পড়ে গেল কাপুরের, গাড়িতে না উঠে সোজা ফিরে গেল হোটেলে। মেয়েটিকে বলল, 'যে গাড়ি শোভনলালকে দু ঘণ্টা কুড়ি মিনিটের জন্যে বাইরে নিয়ে গিয়েছিল তার ড্রাইভারকে এখনই এখানে ডাকুন।'

মেয়েটিকে খুব নার্ভাস দেখাল। কিছু একটা বলার চেষ্টা করতেই কাপুর হাত তুলল, 'আমি কোনও অজুহাত শুনতে চাই না। এখন পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে—মাইকে ওর গাড়ির নাম্বার বলে এখানে আসতে বলুন।'

মেয়েটি বাধ্য হল আদেশ মান্য করতে। কাপুর সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছে চলে গেল। একটু বাদেই লোকটাকে দেখা গেল হোটেলের দিকে এগিয়ে আসতে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ড্রাইভার?'

'জী।'

'শোভনলালকে নিয়ে সেদিন সকালে কোথায় গিয়েছিলে?'

'শোভনলাল!'

'যে এই হোটেলে খুন হয়েছে?'

'এয়ারপোর্ট।'

'কাউকে রিসিভ করতে গিয়েছিলে নিশ্চয়ই, লোকটার নাম কি?'

'জানি না স্যার।'

'লোকটার হাতে কিছু ছিল?'

'হ্যাঁ স্যার, একটা ছোট স্যুটকেস।'

'তারপর? ওকে নিয়ে শোভনলাল সোজা এই হোটেলে ঢুকেছে, তাই তো?'

'না স্যার!'

'তাহলে? এয়ারপোর্টে যে লোকটা তোমার গাড়িতে উঠেছিল সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল? সত্যি কথা বল, নইলে ভীষণ বিপদে পড়বে।'

'রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। হনুমান রোডের মুখে।'

'ঠিকানা জানো?'

'না স্যার। ওরা বাংলায় কথা বলছিল—আমি বাংলা বুঝি না।'

'বাংলা? তার মানে লোকটা বাঙালি?'

'বোধহয় তাই স্যার।'

'চেহারা কি রকম?'

ড্রাইভার ভাবতে লাগল। কাপুর বলল, 'ঠিকঠাক মনে কর।'

‘অনেকটা ফারুক শেখের মতো ভালমানুষ ভালমানুষ।’

‘ফারুক শেখ? সে কে?’

‘স্যার, ফিল্ম আর্টিস্ট!’

‘হোটেল থেকে তোমাকে বলা হয়নি পুলিশের কাছে কোনও কথা চেপে যেতে?’

‘না স্যার।’

গাড়িতে উঠল কাপুর। সনিড কোন ক্লু পাওয়া গেল না। ড্রাইভারটা সব সত্যি বলছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে গেলে চারপাশ থেকে হৈ-হৈ শুরু হয়ে যাবে। এই হোটেলের মালিক মিস্টার ভার্মার প্রভাব কম নয়। শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে মারধোর করার পর বোকা বনতে সে রাজী নয়। কিন্তু তার এলাকায় খুন করে কেউ হাওয়া হয়ে যাবে এটা সে কিছুতেই মেনে নেবে না।

আপাতত জানা যাচ্ছে, আততায়ী বাঙালি। সকালের ফ্লাইটে কলকাতা থেকে এসেছে। সঙ্গে একটা স্যুটকেস ছিল। তাকে এয়ারপোর্টে আনতে গিয়েছিল শোভনলাল, তার মানে ওই লোকটিকে বেশ গুরুত্ব দিত শোভনলাল। ড্রাইভারের বিবৃতি অনুযায়ী সেই লোক ফেরার পথে হনুমান রোডে নেমে গিয়েছে। কথটা সত্যি হলে রিসেপশনের স্টেটমেন্ট মিথ্যে হচ্ছে না। হতে পারে, লোকটা নেমে গিয়েছিল আগে, তারপর হোটеле এসে খুন করেছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যেখানে নেমেছিল সেখানে স্যুটকেসটা রেখে আসবে সে। সেটা না করায় সন্দেহ হচ্ছে দায়িত্ব নিতে চাইছে না বলে কারও নির্দেশে ওই হোটেলের সব কর্মচারী একসঙ্গে মিথ্যে বলছে। আততায়ীকে লুকোতে চাইছে ওরা। একজন বাঙালিকে কেন হোটেলের মালিক অথবা অন্য কেউ খঁচাচে চাইবে? একটা লোক হোটেল এসেছিল, চা খেয়েছে, খুন করেছে অথচ তাকে কেউ দ্যাখেনি!

অফিসে ঢুকেই খবরটা পেল কাপুর। দিগ্গি থেকে একশ কিলোমিটার দূরে রেললাইনের পাশে প্রচুর টাকা ছড়িয়ে ছিল। দুজন গ্রামবাসী সেটা প্রথম দ্যাখে। দেখে তারা নিজেরা টাকাটা আত্মসাৎ করতে চায়। কিন্তু ভাগাভাগি সমান না হওয়ায় ঝামেলা আরম্ভ হয়ে যায়। কাছাকাছি থানায় খবর চলে যায়। পুলিশ গিয়ে প্রায় সত্তর হাজার টাকা উদ্ধার করে। সন্দেহ করা হচ্ছে চলন্ত ট্রেন থেকে ওই টাকা ছড়িয়ে পড়েছে। না ছড়িয়ে যা পাওয়া যায়নি এমন টাকা অনেক থাকতে পারে। গরিব গ্রামবাসীরা রেললাইনের দু-পাশের ঝোপঝাড়জলা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। একটা ব্রিককেস পাওয়া গিয়েছে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায়—তার মধ্যে কিছু ছিল না।

খবরটার শেষ অংশ কাপুরকে উত্তেজিত করল। ব্রিককেস-ভর্তি টাকা কেউ ইচ্ছে করে ট্রেনের বাইরে ছুঁড়ে ফেলবে না। যদি কেউ ছিনতাই করে পালাতে গিয়ে ফেলে দিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই যার গেছে সে পুলিশকে জানাতো।

আধ ঘণ্টা ধরে টেলিফোনে যে খবর কাপুর পেল তার সারমর্ম হল, কেউ কোন স্টেশনে এইরকম ডায়েরি করেনি। কাপুর সঙ্গে সঙ্গে রাজা পুলিশের বড়কর্তাকে টেলিফোন করল। করে জানল এই পড়ে পাওয়া টাকার রহস্য এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। সে অনুরোধ করল ওই ব্রিককেসটির জন্যে—সে তদন্ত করছে এখন একটি মার্ভার কেসের সঙ্গে ওই ব্রিককেসের সংযোগ আছে কিনা সেটা যাচাই করা দরকার।

এইসময় থানা থেকে ফোন এল। শোভনলালের ছেলে তার বাবার মৃতদেহ নিয়ে চণ্ডীগড়ে রওনা হতে চাইছে এখনই। ওদের ট্রাক তৈরি।

কাপুর জিজ্ঞাসা করল, ‘ওকে জেরা করেছেন?’

ওসি বললেন ‘সামান্য। এত আপসেট হয়ে আছে যে কথা বলার অবস্থায় নেই।’

‘ওকে একটু অপেক্ষা করতে বলুন, আমি আসছি।’

মিনিট দশেকের মধ্যে থানায় পৌঁছে গেল সে। ওসির টেবিলের উলটোদিকে বসে ছেলোট বসছিল, ‘কেন আমাকে আপনারা যেতে দিচ্ছেন না? যত সময় যাবে তত বড়ি নষ্ট হবে।’

ওসি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কাপুরকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন। নিজের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে পাশে সরে গেলেন। কাপুর সেই চেয়ারে বসল।

ছেলেটির ব্যস ডেইশ-চব্বিশ হবে। ফর্সা, রোগা এবং বুদ্ধিদীপ্ত। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে ওর ওপর দিয়ে বেশ ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

কাপুর বলল, ‘আপনাকে দেরি করিয়ে দেবার জন্যে দুঃখিত।’ তারপর ওসিকে জিজ্ঞাসা করল, ‘বড়ির চারপাশে ভাল করে বরফ দিয়ে দেওয়া হয়েছে?’

ওসি পাশের চেয়ারে বসে বললেন, ‘হ্যাঁ স্যার। তবে যা গরম—।’

কাপুর ছেলেটির দিকে তাকাল, ‘আপনি এখন খুব আপসেট হয়ে আছেন, কিন্তু আপনার বাবার মৃত্যু যেহেতু একজন খুনীর হাতে হয়েছে তাই আমাদের দায়িত্ব বেড়ে গিয়েছে। আপনি বাবার মৃত্যুর জন্যে কাকে সন্দেহ করছেন?’

ছেলেটি বলল, ‘এই কথাটা আমি এর আগে কয়েকবার বলেছি। আমি কারও নাম মনে করতে পারছি না।’

‘আপনার বাবা কবে দিমি এসেছিলেন?’

‘যেদিন খুন হয়েছেন তার আগের রাতে চণ্ডীগড় থেকে রওনা হন।’

‘কেন?’

‘ব্যবসার কাছে। বাবা সিরিয়ালের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেইজন্যে তাঁকে প্রায়ই দিমিত্তে আসতে হত।’

‘উনি সঙ্গে কি নিয়ে এসেছিলেন?’

‘একটা ব্রিফকেস ছাড়া কিছু আনেননি।’

‘আচ্ছা! এখানে কার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন?’

‘আমি জানি না। ব্যবসার ব্যাপারে বাবা আমার সঙ্গে আলোচনা করতেন না।’

‘সেদিন এয়ারপোর্টে উনি গিয়েছিলেন একজন বাঙালি ভদ্রলোককে রিসিভ করতে। আপনি অনুমান করতে পারেন তিনি কে?’

‘বাঙালি?’

‘হ্যাঁ। হনুমান রোডের কাছে থাকেন!’

‘আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে বাবার পার্টনার বাঙালি, তিনি থাকেন কলকাতায়। দিমিত্তে নাকি অনেক আগে থাকতেন, সেইসময় থেকে বাবার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব। কিন্তু রায় আদলের কোনও বাড়ি দিমিত্তে নেই বলেই আমি জানি।’

‘পুরো নাম কি?’

‘অতীশ রায়।’

‘আপনি মনে হয় ভাল চেনেন!’

‘হ্যাঁ, উনি খুব ভাল মানুষ।’

‘এই ভদ্রলোক কি আপনার বাবাকে খুন করতে পারেন না?’

‘নো। অশুভ আমার তা মনে হয় না। উনি খুব নরম প্রকৃতির মানুষ।’

‘পেছন থেকে দেখতে ওঁকে কিরকম লাগে, বর্ণনা দিন!’

ছেলেটি ভাবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, ‘অনেকদিন দেখিনি, গুলিয়ে যাচ্ছে। তবে লম্বা, কাঁধ চওড়া, মাথার চুল কমে গিয়ে একটু টাক পড়েছে।’

‘মাথায় টাক পেছন থেকে দেখা যায়?’

‘না, ঠিক তা নয়—।’

‘ফার্নক শোখের মত দেখতে?’

‘অ্যাঁ! হ্যাঁ, কিছুটা।’

‘তাহলে এই রায়কেই আপনার বাবা এয়ারপোর্ট থেকে এনেছিলেন! কিন্তু তিনি পরে হোটেলে গিয়েছেন কিনা—, ওঁর ফোন নাম্বার জানা আছে?’

‘এখানে কোথায় উঠেছেন জানি না। তবে কলকাতার নাম্বার বাড়িতে লেখা আছে।’

‘আপনি এখনই চণ্ডীগড়ে ফোন করে নাম্বারটা জেনে নিন।’

ছেলেটি টেলিফোন টেনে নিয়ে এস টি ডি করল। লাইন পাওয়া গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—‘হ্যালো,

সুন্দরলাল বলছি। মা কেমন আছে? হ্যাঁ, দাও। হ্যালো মা, আমি দিল্লির পুলিশ থানা থেকে বলছি। একটু বাদেই ট্রাক নিয়ে রওনা হচ্ছি, কিন্তু পুলিশ বাবার পার্টনার রায় আদলের টেলিফোন নাম্বার চাইছে—অ্যা! ও—ও। কিন্তু... ঠিক আছে। রাখছি।' ছেলেটা ফোন রেখে দিল।

কাপুর লক্ষ্য করছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে বলতে ছেলেটার মুখের চেহারা হঠাৎ বদলে গেল। প্রথমে চোমাল শব্দ হল, তারপর ভয়ের ছায়া পড়ল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'নাম্বার নিয়েছেন?'

রুমালে মুখ মুছল ছেলেটি, 'না। মায়ের মনের অবস্থা এখন কিছু খুঁজে দেখার মত নেই। আচ্ছা আমি যেতে পারি?'

'সুন্দরলাল! আমি চাই আপনার বাবার খুঁচা ধরা পড়ুক। এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার। আপনি একটা স্টেটমেন্ট দিন। যাদের সন্দেহ হয়, তাদের নাম বলুন।'

সুন্দরলাল বলল, 'আমি একটু ভেবে বলব। চট করে কোনও নাম মনে আসছে না।'

'তার মানে আপনার বাবার কোনও শত্রু ছিল না?'

'থাকলেও আমি জানি না।'

'আপনি এ ব্যাপারে কোনও ডায়েরি করতে চান?'

'না। এখনই না।'

'ওনুন। আপনার বাবা চণ্ডীগড় থেকে আসার সময় ব্রিককেসে কত টাকা নিয়ে এসেছেন সেটা জানেন?' কাপুর অসহিষ্ণু হয়ে উঠল।

'না। বাবা আমাকে কিছু বলে আসেননি।'

'ঠিক আছে। আপনার বাবার শেষকৃত্য আগামীকালের মধ্যে হয়ে যাবে বলে আশা করছি। হয়ে যাওয়া মাত্র আপনি চণ্ডীগড় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।' কাপুর উঠে দাঁড়াল। ওসি-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ওঁর ফোন নাম্বার ঠিকানা নোট করা আছে?'

ওসি বললেন, 'ইয়েস স্যার।'

সুন্দরলাল তার বাবার মৃতদেহ নিয়ে চণ্ডীগড় রওনা হল। কাপুরের মনে হচ্ছিল ফোনে কথা বলার সময় থেকেই ছেলেটা কেমন বদলে গেল। সে ওসিকে জিজ্ঞাসা করল তিনি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন কিনা।

ওসি বললেন, তিনিও এ ব্যাপারে একমত। গতকাল চণ্ডীগড় থেকে এসে ছেলেটা খুব কান্নাকাটি করেছিল। যে কোনও সন্তানই বাবার অকস্মাৎ মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে। বডি আইডেন্টিফাই করার পর ও খুব ইমোশনাল হয়ে পড়ে। তখন ওকে আমি ত্রেসার দিইনি। আজ সকাল থেকে প্রশ্ন করেছি। তখন বলেছে ওর বাবা খুব ক্রিন জীবনযাপন করেনি। যার সঙ্গে ব্যবসা করেছে সে-ই বাবার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ এনেছে। ইদানীং সিরিয়াল ব্যাবসায় নেমেছিল। 'তসবীর' বলে সিরিয়াল ওরাই প্রোডিউস করেছিল। সুন্দরলাল বলেছিল বাবাকে কেউ খুন করতে পারে বলে সে ভাবতেও পারেনি। কারণ তার বাবা সঙ্গে সবসময় বিদেশি রিভলভার রাখতো।

'লাইসেন্সড?' কাপুর জানতে চাইল।

'জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সেটা—সুন্দরলাল জানে না। কিন্তু হোটেলের ঘরে আমরা কোনও অস্ত্র খুঁজে পাইনি, অথচ ফোনটা করার পর ও একদম পালটে গেল। আমার মনে হয় স্যার, ওকে ইনস্ট্রিকশন দেওয়া হয়েছে মুখ না খুলতে!'

'সুন্দরলাল তো ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলল। তিনি—'

'আমার জানি না টেলিফোনে কে কথা বলেছে।'

কাপুর কাজের মধ্যে ফিরে গেল। ফিস্কারথ্রিস্ট রিপোর্ট মিলিয়ে দেখল। দরজার নবে অনেক আঙুলের ছাপ। বিশেষজ্ঞের মতে বাঁ হাতের দুটো আঙুলের ছাপও রয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে কোন ল্যাটা লোক দরজা খুলে বের হয়েছে। চায়ের কাপে যে আঙুলের ছাপ তার সঙ্গে দরজার নবের কোনও ছাপের মিল নেই। তাহলে যে চা খেয়েছে সে ল্যাটা ছিল না! অথচ পেয়ালার আঙুলের ছাপের সঙ্গে দরজার নবের কোন ছাপের একটুও মিল নেই? ফাঁপরে পড়ল কাপুর। হঠাৎ মনে হল, এমনও তো হতে পারে, বাঁ হাতে ব্রিককেস ছিল লোকটায়! সেটা মেঝের ওপর নামিয়ে বাঁ হাত দিয়ে নব ঘুরিয়েছে।

কাপুর খুব হতাশ হচ্ছিল। এখন পর্যন্ত অনুমান ছাড়া কোনও সলিড প্রমাণ সে পায়নি। অবশ্য

এয়ারপোর্টে গিয়ে কোনও বাঙালিকে রিসিভ করার ব্যাপারটাকে যদি সে জোর দেয়, তাহলে ওই থেকে একটা সূত্র পাওয়া যেতে পারে। লোকটা যদি শোভনলালের পার্টনার হয় তাহলে দিল্লিতে থেকেও হোটেলে দেখা করতে আসেনি কেন? মৃত্যুসংবাদ সব কটা স্থানীয় কাগজে বেরিয়েছে, টিভিতে বলেছে। পার্টনার খুন হয়েছে ওনলে ওর তো ছুটে আসা উচিত। অথচ লোকটা আসেনি। অপরাধী না হলে কেউ এভাবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে না। কাপুর লোক পাঠাল মান্টি হাউসে। টিভির কর্তাদের কাছে তসবীর সিরিয়ালের প্রযোজকদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে।

বিকেলবেলায় প্যাকেট এল। রাজ্য পুলিশ তৎপর হয়ে পাঠিয়েছে। প্যাকেট খুলে দেখা গেল ভেঙে ভুবড়ে যাওয়া একটা ব্রিফকেস। এখন যা চেহারা এবং অবস্থা তা এর মালিকের কাছেও অচেনা বলে মনে হবে। পরীক্ষা করার পর দুটো তথ্য পেল কাপুর। এই ব্রিফকেসের ভেতর গোপন চেহারা ছিল। যতই ভেঙে দুমড়ে যাক, চেহারের ফাঁকটা বোঝা যাচ্ছে। তার মানে টাকাগুলো ওখানেই লুকনো ছিল। আততায়ী খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে ব্রিফকেসটাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলেছে। ব্রিফকেসের সামনের দিকের একটি অংশ এখনও অটুট, সেখানে ইংরেজি এস অক্ষরটি জ্বলজ্বল করছে। সাধারণত ডানদিকেও এরকম আর একটি অক্ষর থাকে। জায়গাটা উড়ে যাওয়ায় সেখানে কি ছিল তা বোঝা যাচ্ছে না।

তবু কাপুরের ধারণা হল এটাই শোভনলালের ব্রিফকেস। কিন্তু সেই সঙ্গে ধন্দ শুরু হয়ে গেল। এটা পাওয়া গিয়েছে দিল্লি ছাড়িয়ে যে লাইন পাঞ্জাবে যাচ্ছে তার পাশে। অর্থাৎ আততায়ী দিল্লি থেকে পাঞ্জাবে যাচ্ছিল। কলকাতার বাঙালি হলে সে কেন পাঞ্জাবে যাবে? তাহলে কি চণ্ডীগড় থেকে শোভনলালের কোনও পুরনো শত্রু দিল্লিতে এসে খুন করে ফিরে গেল? কিন্তু সে এত ঝুঁকি নেবে কেন? কাজটা তো সে চণ্ডীগড়েই অনায়াসে করতে পারত।

কাপুর তার একজন স্টাফকে নিউ দিল্লি স্টেশনে পাঠাল। পরণ্ড দিন দুপুর বারোটোর পর পাঞ্জাবগামী যেনব ট্রেন ছেড়েছে তার কোনটার বাঙালি উপাধির কোন মানুষ টিকিট কেটেছে কিনা। কাটলে তাদের সম্পর্কে ডিটেলস নিয়ে আসতে। আর সেই সঙ্গে কুলিদের কাছে খোঁজখবর নেওয়া, পরণ্ড দুপুরে কোনও বাঙালি বাবু একহাতে স্যুটকেস অন্যহাতে ব্রিফকেস নিয়ে স্টেশনে ঢুকেছিল কিনা। এটা অবশ্য কারও মনে থাকার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া সময়টা দুপুরের বদলে রাতেও হতে পারে। বোঝাই যাচ্ছে রাতে যে ট্রেন ছেড়েছে তা থেকেই ব্রিফকেস পড়েছিল। তবু একটা চাপ নেওয়া, যদি কেউ কিছু মনে রাখে।

মান্টি হাউস থেকে খবর সংগ্রহ করে লোক ফিরে এল। ‘তসবীর’ সিরিয়ালের প্রযোজক ছিল যে সংস্থা তার দুজন অংশীদার। একজন শোভনলাল অন্যজন অতীশ রায়। এদের দিল্লিতে কোনও ঠিকানা নেই। চণ্ডীগড়ে মূল অফিস এবং শাখা অফিস কলকাতায়। কাপুর মিলিয়ে দেখল চণ্ডীগড়ের অফিসের ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার শোভনলালের বাড়ির। কলকাতা অফিসের নাম্বারে সে ফোন করল। একজন ভদ্রমহিলা ফোন ধরলেন। কাপুর ভদ্র গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘মিস্টার অতীশ রায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।’

মহিলা জবাব দিলেন, ‘উনি নেই। আপনি কে বলছেন?’

‘কোথায় পাওয়া যাবে ওঁকে?’

‘উনি দিল্লিতে গিয়েছেন ব্যবসার কাজে। কে বলছেন?’

‘আমি সিরিয়ালের ব্যাপারেই বলছি মান্টি হাউস থেকে। উনি দিল্লিতে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেননি। ওঁর পার্টনারও কি দিল্লিতে এসেছেন?’

‘হ্যাঁ। তার সঙ্গে দেখা করতেই উনি দিল্লি গিয়েছেন।’

‘কবে ফিরবেন কিছু বলেছেন?’

‘না।’

‘অনেক ধন্যবাদ।’ লাইন কেটে দিল কাপুর। তারপর মনে মনে বলল, ‘এই লোকটাকে আমার চাই। একে পেলে অনেক রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।’

টেলিফোন বাজল। স্টেশন থেকে কর্মচারীটি জানাচ্ছে, ‘স্যার, পরণ্ড সারাদিনে একটি বাঙালির নাম পাচ্ছি। রাতের ট্রেনে রওনা হয়েছে। এ রায়—অনেকে বলছে রায় টাইটেল নাকি ননবেঙ্গলিদেরও হয়। তাই ঠিক—।’

‘কোন স্টেশনের টিকিট কেটেছিল?’

‘লুথিয়ানা!’

‘আচ্ছা ঠিক আছে, চলে এসো।’ কাপুর রিসিভার নামিয়ে রাখল।

সারাটা রাত ভো বটেই, সারাদিন ঘুমিয়ে কাটাল অতীশ। শেষ পর্যন্ত বিকেল পেরিয়ে তার ঘুম ভাঙতেই মনে হল ঠোট গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। সে টিং হয়ে শুলো এবং তখনই বুঝতে পারল গতরাতে মাতাল হয়ে গিয়েছিল। ডিনার করা হয়নি, জামাপ্যান্ট প্যানটায়নি, কাটা গাছের মত বিছানার পড়ে গিয়েছিল। ওইসময় যদি পুলিশ আসতো তাহলে কিছুই করার ছিল না। সে ঠিক করল ওইভাবে গোথ্রাসে আর মদ খাবে না। কলকাতাতেও সে কখনও মাতাল হবার মত মদ্যপান করে না। কি যে হল গতরাতে!

টয়লেট থেকে বেরিয়ে শরীরটা তাজা লাগল। টেলিফোনে চা এবং খবরের কাগজ বলেছিল। বেয়ারা সেগুলো দিয়ে যেতে চোখ রাখল—প্রথম পাতায় খবরটা... রেল লাইনের ধারে টাকা উড়েছে। পাঞ্জাবগামী চলন্ত ট্রেন থেকে কেউ টাকাভর্তি ব্রিককেন্স ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। গ্রামবাসীরা সেই টাকা নিয়ে মারপিট শুরু করার পর পুলিশ হস্তক্ষেপ করেছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যার টাকা হারিয়েছে সে পুলিশের কাছে কোনও ডায়েরি করেনি। পুলিশ তদন্ত করছে।

খবরটা পড়ে চায়ের কথা ভুলে গেল অতীশ। যাচ্ছেলে! তাহলে ওই ব্রিককেন্সে টাকা ছিল এবং সে বুঝতে পারেনি! মেনে নিলো যে টাকাটা শোভনলাল তাকে দিত সেটাই চোরা খোপে রেখে দিয়েছিল? ওখানে টাকা আছে জানলে ব্রিককেন্সটা ফেলে দেবার প্রবন্ধই উঠত না। টাকার শোকের পাশাপাশি আর একটা ভয় শিরদাঁড়া স্পর্শ করল। আজ নয় কাল পুলিশ জানতেই পারবে ব্রিককেন্সটা কার? এবং সেই সঙ্গে তারা এও জেনে যাবে শোভনলালের খুন্সী দিল্লি থেকে পাঞ্জাবে চলে এসেছে। নিজের মৃত্যুবাণ সে অলোস্তেই রেখে দিয়ে এসেছে ট্রেন লাইনের ধারে। ছুঁড়ে ফেলার আগে একবারও মনে হয়নি একথা। ঠাণ্ডা চা গলায় ঢালতেই দরজায় শব্দ হল।

অতীশ দরজা খুলতেই যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, ‘কাগজ দেখেছিস?’

মাথা নিঃশব্দে নাড়ল অতীশ।

‘তুই কিরকম বুদ্ধ ভেবে দ্যাখ! টাকা তো গেল, প্রমাণও রেখে এলি।’ ঘরে ঢুকল যশোবন্ত, ‘শোভনলালের ডেডবডি নিয়ে ওর ছেলে আজই চণ্ডীগড় ফিরে গিয়েছে। রাতে শেষকৃত্য হবে। কিন্তু তোর কি হয়েছে?’

‘মানে?’

‘আমি তো ভেবেছি তুই সুইসাইড করেছিস। ফোন বেজে গেছে ধরিসনি। হোটেলের মাস্টার-কী দিয়ে দরজা খুলে বেয়ারা দেখে গেছে মড়ার মত ঘুমোচ্ছিস। আমি নিষেধ করেছিলাম ডাকতে। কাল রাতে কত পেগ মাল খেয়েছিস?’ বলতে বলতে বোতলটা তুলে চোখের সামনে ধরে সে মাথা নড়ল, ‘নাঃ, খুব বেশি তো খাসনি! তাহলে?’

‘শরীরটা কাহিল হয়ে পড়েছিল—অত টেনশন—।’

বোতল নামিয়ে রেখে যশোবন্ত বলল, ‘শোভনলালের ছেলে এখন পর্যন্ত পুলিশকে কোনও স্টেটমেন্ট দেয়নি। তোর ফোন নাম্বার চেয়ে দিল্লি থেকে ফোন করেছিল বাড়িতে, তখনই বোধহয় ওকে মুখ খুলতে নিষেধ করে দিয়েছে বাড়ির লোক।’

‘আমার ফোন নাম্বার?’

‘হ্যাঁ। তুই শোভনলালের পার্টনার, তো নম্বর পুলিশ চাইতেই পারে।’

‘তুই জানলি কি করে?’

‘সেটা জানি বলেই আমি বলছি। যাক গে, শোভনলালের ফ্যামিলিকে ম্যানেজ করা গেছে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়েছে ওরা ভয় পেয়েছে বলে। ভয় দেখিয়ে বেশিদিন মানুষকে বশে রাখা যায় না। ওরা অবশ্য এখনও জানে না খুন তুই করেছিস আর তোর জন্যে ওদের ভয় দেখানো হচ্ছে। আমার লোক আজ শোভনলালের সংস্কার হয়ে গেলেই ওর ছেলের সঙ্গে কথা বলবে। ছেলেটা কি বলে তার ওপর তোর ভাগ্য নির্ভর করবে।’

‘তার মানে?’

‘কেনটা চালাতে টাকা চাই। এর মধ্যে আমার ভাল টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। তোর কাছে এখন কত টাকা আছে ক্যাশ?’ যশোবন্ত সরাসরি জানতে চাইল।

‘হাজার পঞ্চাশেক।’

‘দূর! ওটা তো এই হোটেলের বিল মেটাতেই চলে যাবে।’ হাসল যশোবন্ত।

‘আমি চেষ্টা করে কলকাতা থেকে কিছু টাকা আনাতে পারি।’

‘কলকাতা থেকে টাকা আনাতে গেলে পুলিশের কাছে ফেঁসে যাবি। কিন্তু টাকাটা আমার এখনই চাই। যারা সাহায্য করবে তারা হাত পেতে বসে আছে। টাকা না পেলে কেউ এগোবে না। তুই ভাব, আমিও ভাবি। আর হ্যাঁ, টাকার ব্যবস্থা হলে কালই তোকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।’

‘চলে যাব?’

‘হ্যাঁ। ত্রিফকেনটা আমাকে চিন্তায় ফেলেছে। এখান থেকে নব্বই কিলোমিটার দূরে আমার একটা খামার বাড়ি আছে, জায়গাটার নাম শক্তিমানপুর—চারপাশে মাঠ আর ক্রেত, ওখানে থাকবি হাওয়া ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত। গুড নাইট।’ যশোবন্ত চলে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল অতীশ। তাঁরপর রুম সার্ভিসকে বলল খাবার দিতে, প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছে তার। খাওয়া শেষ করে মনে হল, যশোবন্ত অকারণে তার ওপর চাপ দিচ্ছে। মুখ বন্ধ করার জন্যে টাকা টাকা করছে ও, সেটার কোনও হিসেব কখনও পাওয়া যাবে না। কাল যে অন্ধ ও বলেছিল তত টাকা বনানী মরে গেলেও যোগাড় করতে পারবে না। তাহলে তার ফ্রাট বিক্রি করতে হয়। সেটা করার চেয়ে তার আত্মহত্যা করা উচিত। তখনই মনে হল কেন সে আত্মহত্যা করবে? সঙ্গে পঞ্চাশ হাজার আছে। এই টাকা নিয়ে কোথাও পালিয়ে গেলে কেমন হয়? যশোবন্তকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। যে লোকটা তাকে হোটেলের এসে উঠতে নেমস্তন্ন করেছিল, সেই এখন পরোক্ষে বলে গেল বিল মেটাতে!

বনানীর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল খুব। সব কথা খুলে বলা উচিত। কিন্তু কথা বলতে গেলে হোটেলের বাইরে যেতে হয়। ঘর থেকে লাইন চাইলে সবটাই যশোবন্ত জেনে যাবে। এখন তার কাছে যশোবন্ত আর পুলিশ একই ব্যাপার।

টেলিফোন বাজল। তিনবারের বার রিসিভার তুলল সে। পুরুষকণ্ঠ। সাড়া দিতেই চোঁচিয়ে উঠল ওপারে, ‘আরে আপনি মোশাই এই হোটেলের আছেন অথচ আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, এ কেমন কথা! চলে আসুন, আমার ঘরে চলে আসুন!’

‘কে বলছি? আমি কিষেনলাল। টেরেনে আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, মনে নেই?’

‘ও।’

‘চারশো আঠাশ নম্বর ঘর। চলে আসুন।’

রিসিভার নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল অতীশ। এটা কি রকম ব্যাপার হল? লোকটা জানল কি করে সে এই ঘরে আছে? সুধা বলেছে? আশ্চর্য! তাছাড়া এখন সঙ্গে নাটটা। গতকাল এর আগেই কিষেনলাল বেরিয়ে গিয়েছিল ওর বউ-এর কাছে। আজও তো আর এক বউ-এর বাড়িতে যাওয়ার কথা। তাহলে?

মিনিটখানেক বাদে সে উঠল। একা ঘরে বসে থাকলে দুশ্চিন্তা বারংবার ছোবল মারে। কিছুতেই স্বস্তি পায় না সে। তার চেয়ে কথা বলতে পারলে একটু অন্যমনস্ক থাকা যাবে। চারশো আঠাশ নাম্বারের দরজায় পৌঁছে গেল সে।

দরজা খুলল সুধা। যেন তাকে চেনে না এমন ভাব করে সরে দাঁড়াল। কিষেনলাল বিহানায় বসে আছে কোলবাঁলিশ পায়ের ওপর নিয়ে। বলল, ‘আসুন, আসুন। কি তাহজ্বব কথা, আপনি এখানে আছেন জানডাম না! তা সুধা বলল কাল ওর ক্যামেরায় ছবি তুলেছিল। সেই ছবি দেখে পরে জেনেছে আপনিও এখানে। শুনে রিসেপশনে ফোন করলাম। এই হোটেলের এখান একজন বাঙালিবাবু আছে—আপনাকে ধরে ফেললাম ফোনে।’

সোফায় বসল অতীশ। কিষেনলাল হঠাৎ বিচিয়ে উঠল, ‘দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কার মুখ দেখছ, অ্যা! ঘরে মেহমান এসেছে, স্চ চালাও!’ তৎক্ষণাৎ সুধা হুকুম মান্য করল।

গ্রাস হাতে নিয়ে কিষেনলাল বলল, 'নিম গুরু করুন। আরে মশাই, মুখ বন্ধ করে কি মাল খাওয়া যার? আমার ছোটবউ খুব গোসা করে আছে আজ।'

'কে বলেছে? আমি কারও ওপর রাগ করিনি।'

'হা-হা-হা।'

'আপনি আজ আর বের হননি?'

'নাঃ, দুপুরের খবর হল যে বউ-এর কাছে যাওয়ার কথা তার খুব জ্বর এসেছে। তা গেলে তো পেশেন্টের সেবা করতে হবে। আমার চেয়ে ওর ডাক্তার নার্স দরকার এখন। তা আপনি কদিন থাকবেন এখানে?'

'ঠিক নেই।'

'বহু ভারী ব্যবসার কাজ নিয়ে এখানে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে।'

'না, সে রকম নয়।'

হঠাৎ সুধা বলল, 'আজ কাগজে দেখলাম যে ট্রেনে আমবা এসেছি সেই ট্রেন থেকে কেউ টাকাভর্তি ব্রিফকেস বাইরে ফেলে দিয়েছিল। সকালে গ্রামের লোক তার কিছু টাকা খুঁজে পেয়েছিল।'

'সেকি? টাকাভর্তি ব্রিফকেস? ফেলে দিয়েছিল? কে?'

'কে তা পুলিশ এখনও জানতে পারেনি।'

'কার টাকা?'

'কোনও চুরি-ছিনতাই-এর টাকা! যার গেছে সে-ও চেপে গেছে।'

'আরে শালা, বাইরে না ফেলে আমাকে দিয়ে দিতে পারত!'

'আমার মনে হয় বাইরে ফেলতে চাননি—'

'তাহলে?'

'কাউকে দিয়ে ব্রিফকেসটা পাচার করতে চেয়েছিল। পুলিশের ভয়ে মাঝরাস্তাতে সাহায্য পায়নি, কিন্তু যে লোকটা নিয়ে পালাচ্ছিল তার হাত থেকেই পড়ে গেছে।'

'না না, এ ঠিক হল না। পড়লে ট্রেনের মধ্যেই পড়ত, বাইরে পড়বে কেন?' এক চুমুকে গ্রাস শেষ করে ফেলল কিষেনলাল।

অতীশ বুঝতে পারছিল সুধার উদ্দেশ্য কি? এসব কথা যে তাকে শোনানোর জন্যে তাতে সন্দেহ নেই। হঠাৎ সুধা বলল, 'আপনি আজ সারাদিন কি করলেন, ব্যবসা?'

কিষেনলাল নতুন গ্রাস নিয়ে মাথা নাড়ল, 'আপনি দুপুর থেকে ঘরে ছিলেন না, টেলিফোন করলে নো-রিপ্লাই হচ্ছিল।'

'হ্যাঁ, ওই একটু।' বাক্য শেষ না করে হাসার চেষ্টা করল অতীশ।

কথা বলছিল কিষেনলালই। ক্রমশ তা অসংলগ্ন হয়ে গেল—লোকটার কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, চোয়াল খুলে গেল, হাত থেকে গ্রাস খসে পড়তেই সুধা সামান্য ঠেলল। সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল কিষেনলাল। তার মাথা বালিশের ওপর তুলে দিয়ে সুধা জিজ্ঞাসা করল, 'আজ সারাদিন কোথায় ছিলেন?'

'বললাম তো!'

'না, আপনি হোটেল থেকে বের হননি। আমি রিসেপশন চেক করেছি।'

'শরীর কাহিল ছিল। সারাদিন ঘুমিয়েছি।'

'সর্বনাশ! দিন গ্রাসটা।'

'না, আর খাব না আজ।'

'আপনাকে আর খেতে বলতাম না আজ। ওটা সরিয়ে দেবার জন্যে চেয়েছিলাম।'

'ওঁর ঘুম ভেঙে যেতে পারে।'

'না, ভোরের আগে ভাঙবে না। ওর নিভারের অবস্থা ভাল নয়। ওখুঁ খেতে হচ্ছে—সেই সঙ্গে অ্যালকোহলও খাচ্ছে। কদিন বাঁচবে জানি না।'

'ওকে মদ খেতে দিচ্ছেন কেন?'

'আমি দেবার কে? তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীর কথা শোনার মত মানুষ এ নয়। তা ছাড়া যে চলে যাবে তার তাড়াতাড়ি যাওয়াই ভাল। আমি ইঁপিয়ে উঠছি। রোজ রাতে এই এক দৃশ্য দেখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।'

‘আপনি ডিভোর্স করছেন না টাকার লোভে?’

‘কথাটা অংশত সত্য। বাকিটা হল, সেটা করতে চাইলে ও আমাকে মেরে ফেলবে।’

অতীশ কিষেনলালকে দেখল। বিশাল চর্বির পাহাড় যেন পড়ে আছে। জেগে থাকলে টাকার জোরে লোকটা সমস্ত ক্ষমতা কিনে রাখে। অথচ এখন কী অবস্থা!

‘ত্রিফকেন্সে টাকা ছিল জানতেন না?’

‘আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।’

‘পুলিশ জানে আপনি ত্রিফকেন্স নিয়ে এসেছেন?’

‘কী জানি।’

‘অতীশ, আপনি এখনও আমার কাছে সহজ হতে পারছেন না?’

অতীশ স্পষ্ট তাকাল, ‘আপনি কি চাইছেন?’

‘কিছু না। আপনার কাছে কি এখন পর্যন্ত কিছু চেয়েছি? আপনাকে আমার ইন্টারেস্টিং চরিত্র বলে মনে হচ্ছে। আপনার আচার-আচরণের মধ্যে অপরাধীর গন্ধ আছে বলেই আপনি আমাকে আকর্ষণ করেছেন। অপরাধী অথচ সেটা আপনার পেশা নয়।’ সুধা হাসল।

‘আপনার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে আমার ব্যক্তিগত কথা আপনাকে বলতে যাব কেন? আপনি জানতে পারলে আমার বিপদ।’

‘আপনি বিবাহিত?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘আপনার দ্বী জানেন?’

‘না।’

‘কেন?’

‘ওর পক্ষে মেনে নেওয়া সহজ হবে না জানি বলেই জানাইনি।’

‘আপনি এখান থেকে কবে পালাচ্ছেন?’

‘পালাচ্ছি? তা বটে—আগামীকাল।’

‘কোথায়?’

‘শক্তিমানপুর।’ মুখ-ফসকে নামটা বেরিয়ে এল।

‘সেটা কোথায়?’

‘আমি জানি না। পাল্লাবেই। আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে।’

‘কে নিয়ে যাবে?’

‘আমার এক পরিচিত। আচ্ছা উঠি।’

‘দাঁড়ান। এই কার্ডটা রাখুন। আমরাও কাল দিগ্বিজে ফিরে যাব। যদি কোনও দরকার লাগে, জানাবেন।’ সুধা একটা ছোট্ট সুন্দর কার্ড এগিয়ে ধরল। ‘ওটা নিয়ে চোখ বোলালো অতীশ। তারপর পকেটে রেখে দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

বরে চুকে ডিনারের অর্ডার দিয়ে টিভি খুলল সে। সুধা তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। মহিলা ঠিক কি চায় তা বুঝতে পারছে না সে। তার উপকার করতে চাইছে কেন আগবাড়িয়ে? ট্রেনের এক রাত্রের সহযাত্রীকে ভাল লেগে গেল? কিন্তু সে বিবাহিত জানা সত্ত্বেও জো ভাবনাটা পালটালো না। অবশ্য দু-বার বিবাহিত পুরুষকে যে স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে সে ওসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

রাত্রের খাওয়া শেষ হতেই দরজায় শব্দ হল। অতীশ দরজা খুলে দেখল দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় নিজেদের শক্তির ওপর ওরা বেশ আস্থাশীল। একজন বলল, ‘বস্ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে বলেছেন।’

‘বস্—বস্ কে?’

দুজন পরস্পরের দিকে তাকাল। একজন জবাব দিল, ‘যশোবন্তজি।’

‘কোথায় যেতে বলেছে?’

‘আপনি চিনবেন না।’

‘কিন্তু সে যেতে বলেছে তার প্রমাণ কি?’

‘রিনেপশনে ফোন করুন।’

অতীশ ফোন করল। এখন ডিউটিতে একটি পুরুষ। লোকটি জানাল যারা ওর দরজার দাঁড়িয়ে আছে তারা মালিকের কাছে মানুষ। সন্দেহ করার কিছু নেই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে বাইরে পা রাখল অতীশ। সুটকেস ওদের একজন বইছে। গভীরমুখে হোটেল থেকে বেরিয়ে ওরা একটা গাড়িতে ওকে নিয়ে উঠে পড়ল।

এখন ভাল রাত। রাস্তা ফাঁকা বললেই চলে। মিনিট দশেকের মধ্যে গাড়িটা একটা বাগানওয়াল বাড়ির গেটে পৌঁছে যেতে উর্দিপরা লোক পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। ড্রাইভার যশোবন্তের নাম করতে গেট খুলে গেল। একটা বাংলোবাড়ি। সামনে গাড়ি থামল। দুজনের একজন গাড়িতে থাকল, অন্যজন তাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। দোতলার ঘরে যশোবন্ত আর ভারী চেহারার একজন মদ্যপান এবং গল্প করছে। তাকে দেখে যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, ‘কোন অনুবিধে হয়নি তো।’

নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বলতে দ্বিতীয় লোকটি বলল, ‘বসুন।’

যশোবন্ত বলল, ‘ইনি আমার বন্ধু। তোমার কেসটা ইনি দেখছেন।’

লোকটি হাত তুলল, ‘আমি দেখার ক্বে? যা করবেন ওপরওয়ালাই করছেন। দেখুন ভাই, খুন খুব খারাপ ব্যাপার। চুরিচামারি চিটিংবাড়ি ম্যানেজ করে দেওয়া যত সহজ, খুন ম্যানেজ করে দেওয়া তার ডাবল শক্ত। তবে হ্যাঁ, যতক্ষণ কেউ আপনার নামে ডায়েরি না করছে ততক্ষণ আপনি বাইরে থাকতে পারেন।’

‘কিন্তু আমি তো ক্রিমিন্যাল নই। শোভনলালকে খুন করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। এটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা।’ কাতর গলায় বলল অতীশ।

‘মে বি। আপনি যা বলছেন তা হয়তো সত্যি। কিন্তু একজন প্রফেশনাল কিলারও প্রথম খুন করার আগে খুন্সী হয় না। আর আপনি যা দুর্ঘটনা বলছেন তা আইনের চোখে খুন। ভাল উকিল দিলে ফাঁসির বদলে যাবজ্জীবন হতে পারে, এই যা।’ ভদ্রলোক নিস্পৃহ গলায় বলে যাচ্ছিলেন। অতীশ হতাশ চোখে যশোবন্তের দিকে তাকাল।

যশোবন্ত বলল, ‘কিন্তু একটা রাস্তা তো বের করতেই হবে। অতীশ আমার বন্ধুমানুষ।’

‘তা তো ঠিক। আপনি আমাকেও ফাঁসিয়ে দিলেন। একজন খুনের আসামী আমার এই বাংলায় বসে আছে অথচ আমি পুলিশকে জানাইনি, এটা আমার অপরাধ হিসেবে ধরা হবে।’

‘আপনি কি করে জানলেন ও খুনের আসামী? এখন পর্যন্ত পুলিশ ওর নামে ঘনিয়া জারি করেনি। এখন পর্যন্ত আপনার কোনও সমস্যা নেই।’

ভদ্রলোক প্রাস তুলে নিলেন, ‘সবই তো বুঝলাম। এখন প্রত্যেকে এমন ভান করে থাকে যেন সবাই সত্যিসাবিত্রী। আগে রেস্টুরেণ্টে এক টাকার চা খেলে দশ পয়সা প্লেটে রাখলে বেয়ারা সেলাম করত। এখন পাঁচ টাকার চা খেয়ে দু টাকা রাখলে ওদের মুখে হাসি দেখতে পাবেন না। কি, ঠিক কিনা? খরচ এত বেড়ে গেছে।’

যশোবন্ত বলল, ‘আপনি খরচের জন্য চিন্তা করবেন না। মানুষের জীবন টাকার থেকে অনেক দামী। যে করেই হোক অতীশকে বাঁচাতেই হবে।’

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, ‘মুশকিল হল হোটেলটা কাপুরের জুরিসডিকশনে। আর ডিপার্টমেন্টের সবাই জানে ও একেবারে আলাদা। জেন্দী, একগুঁয়ে—কখনও হার মানতে চায় না।’

‘ট্রান্সফার করে দেওয়া যায় না?’

‘আন্টিমেটলি তাই করতে হবে, দেখা যাক। তবে আমার কিছু করার আগে যদি কাপুর এর কাছে পৌঁছে যায় তাহলে আর কোনও চাপ নেই।’

‘পৌঁছাতে যাতে না পারে তার ব্যবস্থা করছি।’

‘ঠিক আছে। শুভ লাক।’ মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক।

অতীশকে নিয়ে নিচে নেমে এল যশোবন্ত, চাপা গলায় বলল, ‘তোর কাছে যা আছে তা থেকে চল্লিশ এখন দে।’

‘চল্লিশ?’

‘হ্যাঁ। ওটা তো শোভনলালের টাকা।’

‘আমার সুটকেসে আছে। কিন্তু হোটেলের বিল—।’

‘বন্ধু হিসেবে তোকে আমি নেমস্তন্ন করেছিলাম—কাউকে নেমস্তন্ন করে বাঙালিরা বিল ধরিয়ে দেয় নাকি? আমি জানি না!’

গাড়ির পেছনের সিটে রাখা সুটকেসের ভেতর থেকে চারটে দশ হাজার টাকার বাতিল বের করে যশোবন্তের হাতে তুলে দিল সে। যশোবন্ত বলল, ‘এটা এখনই অ্যাডভান্স হিসেবে দিতে হবে, তুই ইচ্ছে করলে নিজের হাতে দিতে পারিস।’

বেশ চেষ্টা করে হাসল অতীশ, ‘তাকে বন্ধু বলে মনে করেছি তাকে অবিশ্বাস করা মানে নিজেকে প্রতারণা করা।’

যশোবন্ত কাঁধ ঝাঁকাল, ‘তুই গাড়িতে উঠে পড়। তাকে ওরা আমার ফার্মহাউসে রেখে আসবে। সব কিছু ওখানে আছে, কোন প্রব্রেম হবে না। ওখানে তুই নিরাপদে থাকবি। তবে কখনই শক্তিমানপুর বাজারে আসিস না। তাকে দেখলেই স্থানীয় মানুষ সন্দেহ করবে। ফার্ম হাউসের ভেতরে থাকলে তোর কোনও ভয় নেই। গুড নাইট।’

‘ফার্ম হাউসটা কার?’

‘আমার।’ যশোবন্ত বাংলায় ঢুকে পড়ল।

সেই রাতে গাড়ি ছুটেছিল ষ-৮ করে। পাঞ্জাবের রাস্তাঘাট বেশ ভাল। কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ভাল করে বুঝতে পারছে না অতীশ। মাঝখানে একবারই অমৃতসর লেখা মাইলস্টোন নজরে পড়েছিল। তার দু-পাশে বসা দুজন লোক মুখ বন্ধ করে রয়েছে, যশোবন্ত যা বলে দিয়েছে তাই করবে ওরা।

মধ্যরাতে হাইওয়ে ছেড়ে সরু রাস্তা ধরল গাড়ি। একটা বাজারমত এলাকা ছাড়িয়ে গেল ব্রহ্মগতিতে। আরও কিছুটা যাওয়ার পর কাঁচা পথে গাড়ি ঝাঁক নিল। মিনিট দশেক বাদে গাড়ি খামতেই দুটো লোক দু-পাশের দরজা খুলল।

অতীশ নেমে দাঁড়াল। বেশ ঘন গাছপালার মধ্যে আলো জ্বালা একটি বাড়ির গেটের সামনে সে দাঁড়িয়ে। গেট খুলছে একজন। এগিয়ে গিয়ে তাকে নিচুগলায় হুকুম পৌঁছে দিল—যশোবন্তের লোক। লোকটা এগিয়ে এসে তাকে সেলাম করে সুটকেস তুলে নিতেই সঙ্গে আসা লোকদুটো আবার গাড়িতে উঠে বসল। অতীশ কিছু বলার আগেই গাড়িটা ফিরে গেল ওদের নিয়ে।

‘আইয়ো, সাহাব।’

লোকটাকে অনুসরণ করে অতীশ মিনিট পাঁচেক হেঁটে একটা বাংলাবাড়িতে চলে এল। অন্ধকারে জায়গাটা বোঝা যাচ্ছে না। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে একটা ঘরের দরজা খুলে সুটকেস রাখল লোকটা। আলো জ্বালিয়ে বলল, ‘আমার নাম কর্তার। সাহেবের কি রাতের খাওয়া হয়ে গেছে?’

অতীশ মাথা নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বলল।

‘তাহলে যদি কোন দরকার না থাকে শুয়ে পড়ুন। তবে তার আগে বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিন।’ লোকটা এগোল।

‘এখানে আর কেউ থাকে না?’

‘না, সাহাব। কিন্তু আপনার কোন ভয় নেই। এখানে একটা সাপও ভুল করে আসবে না। তবে—।’ লোকটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মাথা নেড়ে কথা শেষ না করে বেরিয়ে গেল।

লোকটি ব্যস্ত। মুখে পাকা দাড়ি। মাথায় পাগড়ি নেই কিন্তু ছোট কাপড়ে চুল আটকে রেখেছে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার পর অতীশ দরজা বন্ধ করল। বাংলাটা বেশ চমৎকার সাজানো। ঢুকেই ড্রইংরুম। সোফা টি ভি সেট থেকে শুরু করে পায়ের তলায় কার্পেট—সবই রয়েছে। ওপাশে আরও দুটো বন্ধ দরজা। অতীশ সুটকেস রেখে ঘরে ফিরে এল। জানলা বন্ধ। ঘরে শীততাপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। বিছানা হোটেলের থেকে ভাল।

সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে আয়নায় নিজের মুখ দেখল সে। সারাদিন দাড়ি না কামিয়ে অদ্ভুত চেহারা হয়ে গেছে। বাথরুমে সাবান, শ্যাম্পু, অর্ডিকোনল, ধবধবে ডোয়ালে—কী নেই! একটা প্রথম শ্রেণীর হোটেলের আরামের সমান ব্যবস্থা এখানে।

পোশাক পালটে আলো মিডিয়ে শুয়ে পড়ল সে। চারপাশে বাতাস ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। নীতভাপনিমগ্নতার বস্তুটা সে চালু করেনি। কি মনে হতে অন্ধকারেই উঠে একটা জানলা খুলে দিল। বাইরে দুটো আলো জ্বলছে। তাতে একটা রাস্তা আর কিছু গাছগাছালি দেখা যাচ্ছে। আকাশ নির্মল। এই তাহলে যশোবন্তের ফার্ম হাউস!

আজও ঘুম আসছে না। এপাশ ওপাশ করেও চোখ বন্ধ হচ্ছে না, শরীরের প্রতিটি শিরায় যেন ব্যথা ছড়িয়ে পড়েছে। তিনদিন আগে সে কী ছিল, এখন কোথায়? বনানী কি এতক্ষণে সব জেনে গিয়েছে? ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার। হঠাৎই মনে হল, বিয়ের পর এত বছর একসঙ্গে থেকেও বনানীর সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। একসঙ্গে থাকতে থাকতে একটা অভ্যাস তৈরি হয়েছিল মাত্র। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বনানীকে তার খুব প্রয়োজন। ওকে বন্ধু বলে ভাবতে খুব ইচ্ছে করছে।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে এল। কেউ যেন বাংলোর সিঁড়িতে উঠে দাঁড়িয়েছে। দরজাটা বন্ধ, তাই যে উঠল সে ভেতরে ঢুকতে পারবে না। করতাল সিং বলল এই বাংলায় কেউ থাকে না। তাহলে সিঁড়ি বেয়ে উঠল কে? একটু বাদেই শব্দটা থেমে গেল। মনে পড়ল এই বাংলায় সম্পর্কে তাকে আশ্রয় করতে গিয়ে করতাল সিং সব কথা বলার পরও 'তবে' শব্দটা ব্যবহার করেছিল—বাকীটা সম্পূর্ণ করেনি। তার মানে এখানে ভৃত-প্রভেদের আনাগোনা আছে নাকি? হেসে ফেলল সে। ভীতনে যে ওসব আমল দিল না সে এ নিয়ে ভাববে? চাপে পড়ে মন দুর্বল হয়ে গেল নাকি? যা হোক, এখন তার কিছুই করার নেই। যশোবন্তের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেই যখন ও যা চাইবে তাই করতে হবে। এইরকম অবস্থাকে কি বলা যায়—অবিশ্বাস করেও সাহায্য নেওয়া?

ভোরের দিকে একটু হুসুভাব এসেছিল। কানে শব্দ আসতেই সে চোখ মেলল। কয়েক সেকেন্ড লাগল খাতক হতে। ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘর পেরিয়ে দরজা খুলতেই অতীশ দেখল একটি স্বাথ্যবতী পাগ্গাবী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সালোয়ার কামিজ এবং ওড়না দেখে বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে আসেনি। অতীশ সরে দাঁড়াতেই শব্দ করে পা ফেলে ভেতরে চলে গেল। কোন কোন মানুষ কাজ করার সময় শব্দ না করে করতে পারে না। মেয়েটি ওপাশের দরজা খুলে ভেতরে চলে গেল। অতীশ অনুমান করল এ কাজের লোক। কিন্তু তার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি মেয়েটি। ঘরন দেখে বোঝাই যাচ্ছে তার অস্তিত্ব ও জানে।

অতীশ সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতেই মন ভাল হয়ে গেল। বাংলোর চারপাশে সবুজ গাছগাছালিতে ভোরের রোদ পড়েছে। হাওয়া দিচ্ছে—মাঃ কাছাকাছি কোথাও বেশ কিছু প্রাণী সমন্বরে ডাকছে। ডাক অনুমান করে সে এগিয়ে যেতেই গাছের ওপাশে নম্রা বাংলাদেশ খাল দেখতে পেল। আর সেই খালের জলে ছোটোছোটো করে ডাকছে প্রচুর রাজহাঁস। দুশাটি বড় মনোবহু। এপাশে বিশাল তারের নেটে খাঁচা তৈরি করা হয়েছে। খাঁচার একপাশে মুরগী, অন্যপাশে ঘুঘু জাতীয় পাখি। ঠাণ্ডা করলে বোঝা যায়, ঘুঘু না—আবার পায়রাও না। গিজগিজ করছে। তারপরেই মাঠ। মাঠে এমন সবুজ গমক্ষেত আগে দ্যাখেনি সে।

'সাহাব!'

ডাক শুনে পেছনে তাকাল সে। করতাল সিং দাঁড়িয়ে আছে।

'একটু গলতি হয়ে গেছে সাহাব। আপনার বেড টি দেওয়া হয়নি।'

'ঠিক আছে।'

'চা রেডি। এখানে নিয়ো আসবে?'

'না। আমিই যাচ্ছি।' ঘরে ফিরে এল অতীশ। টয়ালেট থেকে পরিষ্কার হয়ে বেরতেই দেখল টেবিলে চায়ের পট কাপ চিনি দুধ এবং বিস্কুট দেওয়া হয়ে গিয়েছে। জানলার পাশে বসে সেগুলো পূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে খেল সে।

করতাল সিং এসে দাঁড়াল, 'সাহাবের অভ্যাস তো জানি নে। ব্রেকফাস্ট লাগে কি করলে ভাল লাগবে যদি বলে দেন!'

'ডোমার যা ইচ্ছে তাই কর। আমার কোনও অভ্যাস নেই। আছে, এই যে ফার্ম হাউস—এটা দেখাশোনা করে কে?'

‘পাঁচজন লোক আছে। তারা এখান থেকে আধ কিলোমিটার দূরে থাকে। রাত্রে এদিকে আসার হুকুম নেই। দিনের বেলায় না ডাকলে বাংলোর কাছে আসবে না।’

‘কেন?’

‘তাই হুকুম। এদিকের সব কাজের ভার আমার ওপর। আপনার যখন যা দরকার আমাকে বলবেন, আমি আনিয়ে দেব।’ কর্তার সেলাম করে চলে গেল।

যশোবন্ত সম্পর্কে তার কোনও ধারণাই ছিল না। স্থলজীবনের স্মৃতি দীর্ঘদিনের ব্যবধানে মুছে গিয়েছিল। দমদম এয়ারপোর্টে দেখা হবার পর এবং প্লেনে পাশাপাশি বসে আলাপ করে মনে হয়েছিল ও একজন সফল হোটেল ব্যবসায়ী এবং সেই সঙ্গে কিছুটা প্রতিপত্তি হয়েছে। হোটেলে যাওয়ার পর আর একটা দিক তার সামনে খুলে গেল। শুধু হোটেল ব্যবসার সাফল্য নয়, অপরাধ জগতের একজন ডন হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। এইরকম লোককে হয় অন্ধ হয়ে বিশ্বাস করতে হয়, নয় সম্পর্ক ত্যাগ করে দূরে সরে থাকা উচিত। তার পক্ষে দ্বিতীয়টা আর করা সম্ভব নয়। পাঞ্জাব-হরিয়ানার পুলিশ নিশ্চয়ই তার অস্তিত্ব এখন জেনে গিয়েছে এবং সেটা যশোবন্তের কল্যাণে। সে যেন একটা ইঁদুর, যে ওদের খাঁচায় গোরা আছে, শুধু কাপুর নামক একজন সুস্থ পুলিশ অফিসারকে চিলের মত ছৌঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে যেতে দেবে না বলে পরিকল্পনা করছে। আর এই পরিকল্পনার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের কথা বলে রেখেছে যশোবন্ত। সে অসহায় তার কিছু করার নেই।

কিন্তু এখানে এই শক্তিম্যানপুরের ফার্ম হাউসে এসে যশোবন্তের আর এক পরিচয় পেল অতীশ। এই বিশাল জায়গা নিয়ে তৈরি এত সুন্দর খামার বাড়িটার মালিককে যে সে শুধু ব্যবসায়ী নয়, তার রুচির প্রশংসা না করে পারা যায় না। যেটুকু সে এর মধ্যে দেখেছে তা ছবির মত লেগেছে। কিন্তু এত ব্যস্ত মানুষ এখানে এসে কদিন থাকে?

চা খেয়ে অতীশ বেরিয়ে পড়ল। বাইরের ঘরে তখন সেই মেয়েটি ঝড়ন নিয়ে আসবাবপত্র পরিষ্কার করছে। আড়চোখে দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল। কথা না বলে মাটিতে পা রাখল অতীশ। মেয়েটি কে? কর্তার সিং-এর কেউ হবে। নিশ্চয়ই এই বাংলায় কাজকর্ম করে, অথচ কর্তার সিং পরিচয় করিয়ে দেয়নি।

কাল রাত্রে যাদের নিছক গাছপালা বলে মনে হয়েছিল, আজ বুঝতে পারল সেগুলো অকারণে এখানে নেই। প্রতিটি গাছ কোন না কোন ফলের। ভারি ভাল লাগছিল তাদের তলায় দাঁড়াতে। পাখি ডাকছে খুব। পাঞ্জাবের যে রুক্ষতার কথা সে শুনে এসেছে তার সঙ্গে কোন মিল নেই। ওপাশে গরু ডাকছে। অতীশ এগোল। সুন্দর শেডের তলায় স্বাস্থ্যবতী গরুরা দাঁড়িয়ে আছে। শুনল সে—বত্রিশটা। তাদের বাছুরগুলো রয়েছে ঠিক সামনের শেডে। অর্থাৎ গরুর দুধের ব্যবসা আছে এখানে। তৃতীয় একটি শেডের নিচে কয়েকটি ঝাঁড়কে দেখতে পেল হির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। পাহাড়ের মত চেহারা এক-একটির।

গতরাত্রে যে গেট দিয়ে ঢুকেছিল তার কাছাকাছি আসতেই একটা দু’ঘরের বাড়ি চোখে পড়ল। সাধারণ চেহারা। একটা বাচ্চা মেয়ে তাকে দেখেই বাড়ির দিকে ছুটে গেল। আর তারপরই হস্তদস্ত হয়ে বেরিয়ে এল কর্তার সিং। দৌড়ে তার সামনে পৌঁছে বলল, ‘সাহাবের কি কোন দরকার হয়েছে? ইস, আমি একদম বলতে ভুলে গিয়েছি। আর ওই হস্তদস্তটা ওখানে কি করছে? ও তো বলতে পারত, বাইরের ঘরের দরজার পাশে বোতামটা টিপলেই আমার এখানে আওয়াজ হবে। তাহলে সাহাবকে এতদূরে হেঁটে আসতে হত না।’

অতীশ হাসল, ‘এখানেই তুমি থাকো?’

‘হী, সাহাব। বলুন কি করতে হবে?’

‘কিছু না। আমি একটু চারপাশ ঘুরে দেখতে বেরিয়েছি।’

দুশ্চিন্তার রেখাগুলো মুখ থেকে উধাও হয়ে গেল কর্তার সিং-এর। সে বলল, ‘চলুন, আমি আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি।’

ওরা হাঁটতে লাগল, ‘এই দিকটায় মকাই লাগানো হয়। মকাই যখন বড় হয় তখন সাহাব দেখতে খুব ভাল লাগে। কিছুদিন আগে সব কেটে নেওয়া হয়েছে বলে এখন আপনি ন্যাড়া জমি দেখতে পাচ্ছেন।’

অতীশ আদিগন্ত নয় জমি দেখতে গেল। কত জমির মালিক যশোবন্ত?

এইসময় একটা ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। করতার সিং বলল, 'চলুন সাহাব বাংলায় ফিরে চলুন। ওরা আসছে।'

'করা?'

'এই ফর্ম হাউসে যারা কাজ করে। ওরা জানে না মালিকের দোস্ত এখানে আছে। মালিকও চায় না এখনই কেউ জানুক।' করতার সিং ঘুরে দাঁড়াল। কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বাধ্য হল ফিরে যেতে। করতার সিং দ্রুত পা চালাল।

ইটতে ইটতে সে জিঙ্কস করল, 'তোমার মালিকের সঙ্গে কখন কথা হল?'

'কাল। উনি খুব জরুরী না হলে ফোন করেন না।'

'ও, এখানে ফোন আছে তাহলে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওঁকে ছাড়া অন্য কোথাও ফোন করা নিষেধ।'

অতীশ তাকাল। নিষেধের একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে। বাংলার সামনে এসে সে ডিশ অ্যান্টেনা দেখতে পেল। টিভির পর্দায় অনেক চ্যানেল দেখার সুবিধে রেখেছে যশোবন্ত। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই লোকজন কখন চলে যাবে?'

'কেন সাহাব?'

'আমি তো নারাদিন ব্যক্তিগত বন্দী হয়ে বসে থাকতে পারব না।'

করতার সিং তাকাল। সেটা দেখে অতীশের সন্দেহ হল লোকটা কি তার বিষয়ে কিছু জানে? একজন সামান্য কর্মচারীর কাছে যশোবন্ত কি গোপন-ব্যাপারে গল্প করবে?

করতার সিং বলল, 'তিনটের মধ্যে ওদের ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

অতীশ একাই বাংলায় ঢুকে পড়ল। ঘরে ঢুকে টিভিটা চালাতে গিয়ে বুঝল জানলাদরজা বন্ধ করতে হবে ছবি দেখার জন্যে। সকালবেলায় সেটা করতে পছন্দ হল না। সে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে স্যুটকেস খুলল। রিভলবারটা এখনও তার কাছে রয়ে গেছে। গুলি বের করে নেওয়ার পর এটা একটা হাতুড়ির চেয়ে অর্থহীন। অথচ পুলিশ যদি এখন এটা তার কাছে পায় তাহলে আর দেখতে হবে না! এই খামারবাড়ির যে কোন একটা জায়গায় ফেলে দিলে কেমন হয়? তারপরই মনে হল রিভলবারটা ফেলার আগে যশোবন্তের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মনে হওয়ামাত্র তার মনে ক্রোধ হল। এই যে এখন প্রতিটি ব্যাপারে যশোবন্তের অনুমতি নিতে হচ্ছে, এটা কাঁহাতক ভাল লাগে। যশোবন্ত যেন তারও মালিক হয়ে গিয়েছে।

রিভলবার স্যুটকেসে রেখে দিয়ে সে ডায়েরিটা বের করল। ডায়েরি লেখার অভ্যেস তার নেই। ঠিকানা, ফোন নম্বার ছাড়া মাঝে মাঝে ছোটখাটো হিসাবনিকাশ ওতে করে সে। আজ মনে হল ঘটনাটা লেখা উচিত। চিঠির আকারে লিখলে ভাল হয়। কারুর সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গিতে লিখলে সহজ হবে। বনানীকে লিখবে? হ্যাঁ, যা যা ঘটেছে তা খোলাখুলি লিখে বলবে যাতে তাকে বনানী ভুল না বোঝে। টেলিফোন সব কথা বলা যায় না, বললেও বোঝানো সম্ভব হয় না।

ডায়েরি টেবিলে নিয়ে গিয়ে কলম খুলল অতীশ। কি ভাবে শুরু করবে? দমদম এয়ারপোর্ট থেকে, যেখানে যশোবন্তের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? ঝরঝর করে একটা পাতা লিখে ফেলতেই মনে হল বড্ড ধীরগতিতে সে এগোচ্ছে। এত বিশদে লিখলে এই খামারবাড়িতে পৌঁছাতে একশ পাতা লেগে যাবে। তাছাড়া সব কথা লিখতে হলে সুধার কথাও লিখতে হয়। সুধার ব্যাপারটা বনানীর তো ভাল লাগবে না। আর শোভনলালকে খুনের সঙ্গে সুধার কোন সম্পর্ক নেই। যদিও সুধা তাকে ব্র্যাকমেল করতে পারত। ওর ছবি সে তুলেছে। তবে এখন সে সুধার ধরাছোঁয়ার বাইরে। শক্তিমানপুরের এই খামারবাড়ি খুঁজে তাকে আবিষ্কার করতে সুধা কখনও পারবে না। অবশ্য সে শক্তিমানপুর নামটা মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল। জায়গাটা কোথায় খুঁজে বের করতে পারলেও বাজার এলাকা থেকে এতদূরে সুধা আসবে কি করে? এটুকু ভাবতেই সুধার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। মেয়েটি বুদ্ধিমতী। তার সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেনি। একটু ভয় দেখাবার চেষ্টা করলেও সবসময় বলেছে বন্ধু হিসেবে সাহায্য করতে চায়। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারলে ভাল হত।

লেখা শুরু করল অতীশ। প্রথম পাতাটা যেভাবে লিখেছিল তারপর আর হাত সরতে চাইছে না। শব্দ লিখে কোটে দিতে হচ্ছে। সেইসময় পায়ের শব্দ হল। একটু জোরেই। সে মুখ তুলে দেখল মেয়েটি খাবারের ট্রে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সে উঠেই মেয়েটি আবার ফিরে গিয়ে ওপাশে ডাইনিং টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখল।

এগিয়ে গিয়ে চেয়ার টেনে বসে অতীশ হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি কথা বলতে পার না?'

মেয়েটি ভবাব না দিয়ে শব্দ করে চলে গেল সামনে থেকে।

অতীশের তখন মনে হল মেয়েটি সত্যি বোবা। হয়তো কানেও শোনে না। শোনে না বলে পায়ের চাপে শব্দ হচ্ছে জোরে তা টের পাচ্ছে না। খাবার শেষ হবার আগেই এক লম্বা গ্লাসভর্তি দুধ দিয়ে গেল মেয়েটা:

অতীশ আপত্তি করল। ইশারায় বোঝাল, সে দুধ খায় না, ওটার দরকার নেই।

মেয়েটি চোখ বড় করে দেখল। তারপর গ্লাসটা তুলে নিয়ে চলে গেল। খাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে এল অতীশ। এখন এক কাপ চা দরকার। কর্তার সিং বলেছিল দরজার পাশে বোতাম আছে, সেটা টিপলে সে আওয়াজ টের পাবে। কিন্তু এক কাপ চায়ের জন্যে বেচারাকে এতদূরে ছুটিয়ে আনার কি দরকার! তারপরেই কর্তার সিং এক কথা মনে পড়ল। একটু আগে তাকে দেখে কর্তার সিং ছুটে এসে আক্ষেপ করছিল কেন বোতাম টিপে তাকে না ডেকে অতীশ কষ্ট করে হেঁটে গেল! কর্তার বলেছিল, 'ওই হতচ্ছাড়িটা এখানে কী করছে? ও তো বলতে পারত, বাইরের ঘরের দরজার পাশের বোতামটা টিপলেই আমার এখানে আওয়াজ হবে।' ও তো বলতে পারত—মানে মেয়েটা কথা বলতে পারে? অবশ্যই। এই মেয়েটি তার সঙ্গে অভিনয় করছে।

পায়ের শব্দ শোনা গেল। মেয়েটি আসছে। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল চায়ের কাপ হাতে নিয়ে। অতীশ ইচ্ছে করেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি ওটা?'

মেয়েটির ঠোঁটের একটা পাশ কঁচকে গেল। যেন এরকম নির্বোধ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনও মানে হয় না। কাপ প্রেট অতীশের পাশের টুলে নামিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল সে, অতীশ ডাকল, 'শোন, তুমি বোবা নও—তাহলে কথা বলছ না কেন?'

মেয়েটি দাঁড়াল। অতীশের দিকে পেছন ফিরে বলল, 'কথা বললে আমাকে সত্যি সত্যি বোবা করে দেওয়া হবে!'

'তার মানে?' চমকে উঠল অতীশ।

'ভিত টেনে ছিঁড়ে দিলে তো মানুষ বোবা হয়ে যায়।'

'আশ্চর্য! কে তোমার ভিত টেনে ছিঁড়ে দেবে?'

'যারা এখানে কাজ করার হুকুম দিয়েছে।'

'কার হুকুমে তুমি এখানে কাজ করছ?'

'মালিকের।'

অতীশ বুঝল, মালিক হচ্ছে যশোবন্ত। এ কি অদ্ভুত আদেশ! এখানে কাজ করবে অথচ কথা বলতে পারবে না! সে হেসে বলল, 'তোমাদের মালিক আমার বন্ধু। আমি তাকে বলব যে তোমার ওপর এই আদেশ যেন সে তুলে দেয়।'

'আপনি তাহলে আমার কৃতি করবেন।'

'ও! বেশ বলব—তুমি কথা বলো না একটাও, এতে আমার অসুবিধে হচ্ছে।'

'তাহলে উনি আমাকে এখান থেকে সরিয়ে দেবেন।' সে হঠাৎ সচকিত হল। তারপর দ্রুত শব্দ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যময়। সারাটা সকাল চূপচাপ ওয়ে থাকল অতীশ। আর লিখতে ইচ্ছে করছিল না। এর মধ্যে মেয়েটি একবার এসে কাপ-ডিশ তুলে নিয়ে গেছে। তার পায়ের শব্দে সেটা টের পেয়েছে অতীশ। ওয়ে থাকার কারণে একটু কিছুনি লাগছিল, হঠাৎ দরজায় শব্দ হতে চোখ খুলে দেখল কর্তার সিং দাঁড়িয়ে, 'সাহাব কি নান করার আগে বিয়ার খাওয়া পছন্দ করেন? ঠাণ্ডা বিয়ার এনেছি।'

এই অভ্যাস কোনদিনই ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের পার্লামেন্ট দু-তিনবার খেয়ে সে দেখেছে ভাত বেশি

খাওয়া হয়ে যায় আর তারপরে জনের ঘুম পেয়ে যায়। এখানে যখন কিছুই করার নেই তখন কেতে আপত্তি কি? করতার সিং যত্ন করে বিয়ার গ্লাস আর প্রেটে কাঁচুবাদাম এনে দিয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়ান।

প্রাসে চুমুক দিয়েই শরীর বেশ শান্ত হল। কি আরাম! এই পাঞ্জাবী বিয়ার বেশি তেতো নয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে একাই থাকো?'

'না সাহাব। বালবাচ্চা আছে। বেশি বয়সে বিয়ে করে মুশকিলে পড়েছি।'

'তোমার আর কী এমন বেশি বয়স।'

করতার সিং খুশি হল। সামান্য হাসল।

'এই মেয়েটি যে এখানে কাজ করে, সে তোমার কে হয়?'

'কেউ না সাহাব।'

'মেয়েটা কি বোবা? কথা বলেনি একটাও।'

মাথা নাড়ল করতার সিং, 'দুঃখের কথা আর কি বলব সাহাব! মালিকের দয়ার শরীর তাই ওকে আশ্রয় দিয়েছে। অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছিল যার সঙ্গে সেই লোকটা ছিল দুঃখবী। ট্রাক ড্রাইভারের খানাসীগিরি করত। গ্রামে থাকত না। বউ বড় হচ্ছে—অথচ কাছে স্বামী নেই। বুঝতেই পারছেন অবস্থা! বহিরের লোক দূরের কথা, নিজেই ভ্রূপূর দেবরবাই ঠোকরাতে চায়। শেষপর্যন্ত ও নিজেই স্বামীর কাছে ভলদ্বারে চলে যায়। সে বাটা খানাসীর নিজেই থাকার ভায়গা নেই, ড্রাইভারের আশ্রয়ে থাকে। চলে আসার জন্যে বউকে ধরে ওর মারল সে। তখন ড্রাইভার তাকে খামিয়ে একটা মাথা গোঁজার ভায়গা দিক করে দিল। ড্রাইভারটা ভেবেছিল এই করে সে মেয়েটার কাছে পাত্তা পাবে। কিন্তু ভুল ভেবেছিল। মাথা পেয়ে ড্রাইভার অন্য পনিকল্পনা নিল। খানাসীকে 'বাখাল মাল টাকে নিয়ে কোথাও গেলে বউকে একা ফেলে রাখা দিক হলে না। খানাসী এর বউকে শাস্তি করল। হাইওয়েতে গাড়ি কাবাপ হয়েছে এটা অজুহাত দেখিয়ে ড্রাইভার খানাসীকে অন্য একটা ট্রাকে চাপিয়ে পাঠাল মিস্ত্রি ওকে জানতে। সেই নির্জন হাইওয়ের পাশে দাঁড় করানো ট্রকে খানাসীর বউ-এর ওপর কাঁপিয়ে পড়ল ড্রাইভার। মেয়েটা নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল—প্রাণপণে চেল দিয়েছিল লোকটাকে। ট্রাক থেকে ছিটকে পড়তেই শেজান থেকে এসে একটা প্রাইভেট কার লোকটাকে চাপা দেয়। সেই দৃশ্য সঙ্গে মেয়েটা ভয়ে পালানোর থাকে। তার কানাকাপড় ছিঁড়ে নিয়েছিল—শরীর দেখা যাচ্ছিল, আর তাই দেখে পেছন বাওয়া করে এসেছিল চাপা দেওয়া গাড়ির আরোহীরা। মেয়েটাকে ধরে ইজ্ঞে লুঠ করেছিল তারা। কিন্তু শেষমুহুর্তে মরীয়া হয়ে গিয়ে ও একটি লোকের গোপন সঙ্গে এমন আঘাত করে যে সে আর উঠতে পারে না। ওই সময় আমাদের মালিক দুটো গাড়ি নিয়ে ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁকে দেখে লোকগুলো পালিয়ে যায়। আহত লোকটি বাঁচেনি। মেয়েটিকে তুলে ইজ্ঞেতের সঙ্গে এই খামার বাড়িতে নিয়ে আসেন মালিক। ওকে জিজ্ঞাসা করেন খানাসী স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায় কিনা। সেই থেকে ওর মাথা সাহাবয় দিক কাজ করে না। ও যেতে চাননি ফিরে। মালিক এখন ওকে এই বাংলার কাছে বহাল করেন। ও এখানে কাবও সঙ্গে কাব বলে না। আমি দশবার জিজ্ঞাসা করলে একবার জবাব দেয়। তবে মেয়েটা ভাল কোন বদদেয় নেই—ওর একটা ছাড়া।'

'কি সেটা?'

'রাত দুপুর পর্যন্ত বাগানে একা একা ঘুরে বেড়ায়, পান গায়। দুটো আড়াইটের আগে ঘুমাতে যায় না। বোধহয় ওই স্মৃতি ওকে ঘুমাতে দেয় না।' করতার সিং বলল, 'ও চুপচাপ থাকে বলে আপনি কিছু মনে করবেন না সাহাব।'

একজন মানুষকে সামনে দেখলে একরকম ধারণা তৈরি হয়, আবার তার ইতিহাস ওনলে সেই ধারণা বদলে যায়। শুধু মানুষ কেন, যে কোন জিনিস—একটা পাথর সম্পর্কেও এই কথা বলা যেতে পারে। মেয়েটির জন্যে ব্যারাপ লাগছিল তার। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশ্নও থেকে গেল। মেয়েটি মুখ খুললে ওর ছিভ টেনে ছিড়ে ফেলা হবে বলে ও বিশ্বাস করে। এমন হুমকি নিশ্চয়ই ওকে দেওয়া হয়েছে। কেন? কিন্তু করতার সিংকে প্রশ্নটা করা মানেই ওকে জানিয়ে দেওয়া যে মেয়েটির সঙ্গে তার কথা হয়েছে।

দুটো বিয়ার খাওয়ার পর মান করলে শরীর জুড়িয়ে যায়। খোঁচে বসে অতীশ দেখল করতার সিং তখনও দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির রম্মা ভাল। অবশ্য মশলার আধিকা রয়েছে। সে অনেকটা খেয়ে গিল।

করতার সিং বিদায় নেবার আগেই সে বিছানায় চলে গেল। তার প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছিল। ঘটনাটা ঘটার পর এভাবে সে একবারও ঘুমোয়নি।

লুধিয়ানায় বাঙালির সংখ্যা কম নয়। ঠিক একজনকে খুঁজে বের করা মানে খড়ের গাদায় সূচ খোঁজার চেষ্টা। কাপুর সেটা জানে। কলকাতা পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করে সে অতীশ রায়ের বাড়ির নাম্বারে যত ফোন আসবে তার হদিস নিতে পারছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত অতীশ রায় তার স্ত্রীকে ফোন করেনি। একটা লোক যদি অপরাধ না করে তা হলে এভাবে উধাও হয়ে যাবে কেন? কাপুরের ধারণা নিশ্চয়ই ব্যবসা-সংক্রান্ত হিসেব নিয়ে শোভনলালের সঙ্গে অতীশের কোন ঝামেলা হয়েছিল এবং তার পরিণামে এই খুন। মুশকিল হল শোভনলালের পরিবার এ ব্যাপারে মুখ খুলতে চাইছে না।

কাপুর চেয়েছিল অতীশের বিরুদ্ধে কোর্ট থেকে একটা হলিয়া বের করতে, কিন্তু বড় সাহেব তাকে বলেছেন নিদিষ্ট প্রমাণ বা অভিযোগ ছাড়া ওই কাজ না করতে। লোকটার নাকি ওপরমহলে খুব প্রভাব আছে, বেকায়দায় পড়লে সামলাতে মুশকিল হয়ে পড়বে। এই ব্যাপারটাই কাপুর বুঝতে পারছে না। এর মধ্যে সে অতীশ সম্পর্কে যেসব তথ্য পেয়েছে তাতে ওকে প্রভাবশালী ভাবার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। তা হলে? পুলিশ ইচ্ছে করলে একজন নিরাপরাধ লোককেই ফাঁসিয়ে দিতে পারে, অতীশের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে প্রমাণের দরকার হয়ে গেল? কাপুরের পক্ষে বড়সাহেবের আদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়, কিন্তু—। সে ঠিক করল প্রমাণ যোগাড় করবেই।

আর একটা তথ্য কাপুরকে বিভ্রান্ত করেছে। কলকাতা পুলিশ জানাচ্ছে অতীশ রায়ের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সবাই বাঙালি—শুধু শোভনলালই অবাঙালি এবং চণ্ডীগড়ে থাকে। পাঞ্জাব হিরিয়ানার ওর আর কোনও বন্ধুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তা হলে সে গেল কোথায়?

আশ্রয়ের লোভে মানুষ তার কাছেই যায় যাকে সে বন্ধু বলে মনে করে। কাপুর নিশ্চিত, অতীশ রায় পাঞ্জাবে এসেছে। এমন হতে পারে চণ্ডীগড়েই যাবে। হয়তো শোভনলালের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে টাকাপয়সা চাইবে। ওই খুন যে টাকাপয়সার কারণে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শোভনলাল সম্পর্কে চণ্ডীগড়ের পুলিশ জানিয়েছে অর্থকরী ব্যাপারে ওর সঙ্গে অনেকেরই ঝামেলা হয়েছে। এর আগে অনেকের টাকা মেঝে দিয়েছে ও। অতীশের সঙ্গে সেরকম করে থাকতে পারে। খুন করার পরেও অতীশ সেই টাকা উদ্ধারের জন্যে চণ্ডীগড়ে বেতে পারে। কিন্তু চণ্ডীগড়ে গেলে সে লুধিয়ানায় যাবে কেন?

কাপুর লুধিয়ানার নেমে পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করল। ভদ্রলোক তো ওর আসার কারণ জেনে হেসে ফেললেন, 'মিস্টার কাপুর, আপনি খুব উদ্যমী অফিসার বলে আমি শুনেছি, কিন্তু এই শহরে বিশেষ একজন আগন্তুককে কিভাবে ধরবেন? আর সে এখানে আছে কিনা তাও জানান না!'

কাপুর পকেট থেকে ছবিটা বের করল, 'এটা গতকালই আমি কলকাতা থেকে আনিয়েছি। এই লোকটার ছবি আমি সবকটা পুলিশ স্টেশন পাঠাতে চাই।'

বড়সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, এটা করা যেতে পারে।'

'খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে চাই।'

'কিভাবে? আপনি ওয়াটেড বলতে চান?'

'না—মিসিং বলব। যে খবর দেবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে।'

'এই বিজ্ঞাপন ছাপার খরচ কে দেবে?'

কাপুর তাকাল। পুলিশের নিজস্ব কিছু তহবিল আছে যা থেকে তদন্তের সুবিধের জন্যে খরচ করা যেতে পারে। কিন্তু ভদ্রলোক এমন ভান করছেন যেন কিছুই জানেন না। বড়সাহেব বললেন, 'একটা কাজ করুন। আপনি মৃত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ওরা নিশ্চয়ই আততায়ীকে শাস্তি দিতে চায়। ওরা নিশ্চয়ই বিজ্ঞাপনের খরচ দিতে আপত্তি করবে না।'

কাপুর বলল, 'সেইটাই আফসোসের। শোভনলালের পরিবার এ ব্যাপারে কোনও উৎসাহ দেখাচ্ছে না, এমন কি কোনও স্টেটমেন্টও দেয়নি।'

'সেকি? তাহলে তো মুশকিল। যে পরিবারের লোক মারা গেল তারা যদি বদলা না নিতে চায় তা

হলে আমরা কি করতে পারি? ঠিক আছে, আমি ছবিটা কপি করিয়ে সবকটা থানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যদি চান তা হলে হোটেলগুলোয় খোঁজ নিয়ে আসতে পারেন।’

কয়েক দিন ধরে কাপুর লক্ষ্য করছিল তার ওপরতলার সাহেবরা খুব নিয়মনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। যে কাজগুলো সবাই স্বচ্ছন্দে করে যেত সেই কাজগুলো এখন করার আগে আইন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। হ্যাঁ, এটাও ঠিক—এসবই হয়তো ভগ্নে বি চালা হবে। ওই অতীশ রায় লুধিয়ানা কেন, পাণ্ড্রাবের হয়তো ধারে কাছে নেই, আদালত গাড়ি বদল করে সিমলার পাহাড়ে অথবা কাশ্মীরে চলে যেতে পারে। সেরকম হলে তাকে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে—।

কাপুর ভেবেছিল সে চতুর্গুণে যাবে। শোভনলালের পরিবারের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে। তার সন্দেহের কথা ওদের জানিয়ে সতর্ক করে দেবে। হোটেল ফিরে গিয়ে সে চূপচাপ কেসটা নিয়ে ভাবছিল। তার নিজের কোনও ভুল হচ্ছে না তো? এই অতীশ রায় অতীশ রায় করে ব্যাস হয়ে সে আসল খুনীকে এড়িয়ে যাচ্ছে না তো? অতীশ ছাড়া অন্য কেউ তো শোভনলালকে খুন করে যেতে পারে। ওই যাদের সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়ে শোভনলালের গোলমাল ছিল তাদের কেউ? সেই সব মানুষের একটা তালিকা তৈরি করলে কেমন হয়—করে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে তদ্রাশ নেওয়া দরকার। এসবই ঠিক, কিন্তু অতীশ রায় গা-ঢাকা দেবে কেন?

লুধিয়ানা পুলিশের হেডকোয়ার্টাসে ফোন করল সে। জানল, পুলিশ প্রায় প্রতিটি হোটেল ছবি পাঠিয়েছে কিন্তু কোন সূত্র সাওয়া যায়নি। ওই চেহারার কোন লোককে কেউ নাকি দ্যাখেনি। শেষ পর্যন্ত কলকাতা পুলিশকে ফোন করল কাপুর। কলকাতা পুলিশ জানাল অতীশ রায় এখনও ফেরেনি। তার বাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

এই খবরটা বেশ নিশ্চিত করল কাপুরকে। কোন স্বাভাবিক মানুষ তার পরিবারকে না জানিয়ে এভাবে ডুব দেবে না, যদি না সে অপরাধ করে থাকে।

বিকেলবেলায় টেলিফোন এল। হোটেল হলিডেতে তাকে এখনই যেতে হবে।

হোটলে পৌঁছাতেই একজন পুলিশ অফিসার এগিয়ে এলেন, ‘স্যার, এই হোটলে ডি রায় নামে এক ভদ্রলোক দু-রাত ছিলেন। রিসেপশনিস্ট মহিলা এখন ছুটিতে আছেন, যে বেয়ারা ওর ঘরে যেত সে বলছে এই ছবির সঙ্গে তেমন মিল নেই।

‘তেমন মিল নেই বলতে? কিছু মিল নিশ্চয়ই পেয়েছে? চলুন।’

কাপুর হোটেলের খাতা পরীক্ষা করল। ডি রায়, কলকাতা। অতীশ রায় জেনেগুনেই ডি রায় লিখতে পারে এবং সেটাই স্বাভাবিক। রিসেপশনে যে ছিল তাকে কাপুর জিজ্ঞাসা করল, ‘এই ভদ্রলোক হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছেন?’

‘হ্যাঁ স্যার।’

‘কোথায় গিয়েছেন?’

‘সেটা বলে যাননি। বোধহয় নিজের বাড়িতেই ফিরে গিয়েছেন।’

‘আপনারা জিজ্ঞাসা করেননি? এখানে কলাম আছে—কোথায় যাচ্ছে তা জানাবার!’

‘তাড়াহুড়োয় অনেক সময় সেটা করা হয় না। এই দেখুন, এদের স্কেডেও হয়নি।’ লোকটা আরও কয়েকটা নামের পাশের কলামটা সাদা দেখালো।

কাপুর মাথা নাড়ল, ‘এই ডি রায় কি অন্য লুধিয়ানায় এসেছিলেন?’

লোকটি খাতায় আঙুল রাখল—‘বিজনেস।’

‘হঁ। উনি কি হোটলে বসে থাকতেন, না বাইরেও যেতেন?’

‘কাজেকর্মে বাইরে যেতেন। সেটাই তো স্বাভাবিক।’

‘কোনটা স্বাভাবিক তা আমি আপনার কাছে জানতে চাই না।’

কাপুর বিরক্ত হয়ে কথাগুলো বলতেই একজন এগিয়ে এল। বেশ কর্তৃত্ব নিয়ে বলল, ‘প্রত্যেকবার ঘরে বিল পাঠানো হত, এবার কি হল?’

‘এখানে একটু প্রবলেম হয়েছে স্যার। দুঃখিত। আপনার বিল এখন রেডি।’

লোকটি ফোন্টার এগিয়ে দিল। কাপুর লোকটিকে দেখল। বিশাল মোটা এই লোকটিকে সে কোথায় যেন দেখেছে। যে মহিলা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন এদিকে পেছন ফিরে তিনি ঐর সঙ্গে। টাকাপয়সা

মিটিয়ে কিষেনলাল বিন নিয়ে পাশ ফিরতেই কাপুরকে দেখতে পেয়ে অবাক হল। সে বলল, 'আরে নমস্কার! আপনি এখানে?'

'আপনাকে ঠিক—'। কাপুর কথা শেষ করল না।

'আমি একজন সামান্য ব্যবসায়ী! দিল্লিতে থাকি। আপনাকে আমি চিনি। তা এই হোটেলই উঠেছেন নাকি? ভাল হোটেল। লুধিয়ানায় এলে এখানেই থাকি।'

'আপনি কবে এসেছেন?'

'এই তো দিন তিনেক আগে।'

কাপুর বলল, 'আমি এক ভদ্রলোকের খোঁজে এখানে এসেছিলাম। এসে শুনছি তিনি চলে গিয়েছেন।' তারপর রিসেপশনের লোকটির দিকে ফিরে বলল, 'যে বেয়ারা ওর ঘরে সার্ভ করেছে তাকে চাই। আর যে মহিলা রিসেপশনে ছিলেন তার ঠিকানাটা বলুন। এটা জরুরি।'

কিষেনলাল বলল, 'মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং কেস নিয়ে এসেছেন! আগে আমি শার্লক হোমস খুব পড়তাম—লোকটা কি করেছে?'

কাপুর পকেট থেকে ফটোগ্রাফ বের করে সামনে রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে আঁতকে উঠল কিষেনলাল, 'আই বাপ!'

'আপনি একে চেনেন?'

'নিশ্চয়ই। আমরা একসঙ্গে দিল্লি থেকে ট্রেনে এসেছি।'

'আচ্ছা!' কাপুর পুলকিত হল।

'কিন্তু এই ভদ্রলোককে কেন খুঁজছেন আপনি?'

'একটা খনের সঙ্গে সম্ভবত ইনি জড়িত।'

'হায় ভগবান! ইনি? একে দেখে তো মনেই হয় না। ট্রেনের একটা কুপে আমরা তিনজন ছিলাম। হ্যাঁ, ইনি খুব কম কথা বলেছেন। এমন কি এই হোটলে আমাদের ঘরে যখন ডেকে আনলাম তখনও চুপচাপ ছিলেন।' জোরে জোরে কথা বলছিল কিষেনলাল। এই সময় সুধা এগিয়ে এসে বলল, 'আমরা কি ট্রেনটা মিস করব? এরপর তো—' সে কাঁধ নাচাল। তারপর দূরে সরে গেল।

কিষেনলাল বলল, 'সরি ডার্লিং, লেটস গো।'

কাপুর বাধ্য দিল, 'দাঁড়ান। আপনাকে আমার কয়েকটা প্রশ্ন আছে।'

'আরে মশাই, আমরা ট্রেন মিস করব আর দেরি করলে।'

'কটায় ট্রেন আপনাদের?'

'সাড়ে ছটা।'

'এখনও অনেক দেরি আছে। ভদ্রলোক আপনাকে তার নাম বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ—জাতীশ।'

কাপুর অবাক হল। লোকটা হঠাৎ সত্যি কথা বলতে গেল কেন?

'আপনারা কতক্ষণ গল্প করেছেন ট্রেনে?'

'কতক্ষণ আমি না ঘুমিয়ে পড়েছি।'

'তারপর উনি জেগেছিলেন?'

'আমার ওয়াইফ বলল লোকটা নাকি তখনই ঘুমিয়ে পড়েছিল।'

'ও! হোটলে আপনি ওকে ডাকতেই আপনার ঘরে চলে গেল?'

'না। প্রথমে যেতে চাইছিল না, তারপর গেল। আমরা দু-চারটে গল্প করলাম। তারপর শরীফ লোকের মতো ও নিজের ঘরে ফিরে গেল। আচ্ছা চলি, নমস্কার।' কিষেনলাল হাঁটা শুরু করল।

কাপুর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনার দিল্লির ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার দিন।'

কিষেনলাল পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিল।

সেটার চোখ বুন্ডিয়ে কাপুর সুধার পাশে চলে এল, 'ম্যাডাম?'

'ইয়েস!' হাঁটতে হাঁটতে বলল সুধা।

'ওই লোকটিকে আপনার কি মনে হয়েছে?'

'নি আবার মনে হবে। পুরুষেরা যেমন হয়।'

‘আমি বুঝলাম না।’

কিবেনলাল এগিয়ে গিয়েছিল গাড়ির কাছে। সুধা দাঁড়িয়ে পড়ল কিছু দূরে। হেসে ফেলল সে, ‘আমার দামী ড্রাক হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে নির্জন কুপেতে আপনি কি করতেন?’

‘আমিও ঘুমিয়ে পড়তাম।’ কাপুর ভাব দিল।

‘উনিও তাই করেছিলেন।’ সুধা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। কাপুর ওদের চলে যাওয়া দেখল। কিবেনলালকে ওর মোটামুটি বাস্তবিক মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ওর স্ত্রী একটি চিড়! বেশি বয়সে যদি অল্পবয়সী মেয়েকে কেউ বিয়ে করে তাহলে কি এই অবস্থা হয়? মিসেস কিবেনলাল কোন কথাই বলতে চাইলেন না—এর একটা অর্থ, উনি লোকটার প্রসঙ্গ এড়াতে চান। কেন? সে ঠিক করল দিল্লীতে ফিরে গিয়েই সে ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করবে। হয়তো কথা বলতে বলতে কোন ক্লপেয়েও যেতে পারে।

তবে একটা ব্যাপার ভেবে কাপুরের ভাল লাগছিল। ওই অতীশ রায় এই লুধিয়ানা শহরে এসেছিল, কিন্তু কাল রাতে সে গেল কোথায়? সে লোক্যাল পুলিশকে জানাল, দ্রুত খোঁজ নিতে যে গতকাল কোন বঙ্গসন্তান লুধিয়ানা ছেড়ে যাওয়ার টিকিট কেটেছে কিনা? লোকটা সম্ভবত ডি রায় নাম ব্যবহার করেছে।

বেয়ারা এবং রিসেপশনিষ্ট মেয়েটিকে ঘেরা করে চাকলাকর কোন তথ্য বের করতে পারল না কাপুর। কিন্তু দিল্লির হোটেলের দ্বারা এখানেও তার মনে হচ্ছিল এরা যতটা জানে ততটা বলছে না। হোটেলের বদনাম বা ঝামেলা হয় এমন কিছু বলার ঝুঁকি নিচ্ছে না। সে শেষপর্যন্ত ঠিক করল হোটেলের মালিকের সঙ্গে দেখা করবে। রিসেপশনের লোকটি বলল, ‘আপনি অপেক্ষা করুন, মালিক এখনই এসে যাবেন।’

সে লাউগ্রে বসল। লুধিয়ানা পুলিশের একজন অফিসার তার পাশে এসে দাঁড়াল, ‘স্যার।’

‘হ্যাঁ, বলুন।’

‘এই হোটেল এবং এরকম আরও কয়েকটা হোটেলের মালিক মিস্টার যশোবন্ত কিন্তু খুব ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষ। পুলিশ, মিনিষ্ট্র—এমন কি দিল্লিতেও ওর যোগাযোগ আছে।’

‘কেন?’

‘কেন মানে?’

‘আপনার আমার ওসব হয় না, ওর কি করে হল?’

‘তা জানি না স্যার।’

‘খবরটা দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।’

একটু বাদেই লাউগ্রে বসে কাপুর দেখতে পেল একটা দামী গাড়ি এসে থামল হোটেলের দরজায়। গাড়ি থেকে চটপট দুজন লোক নেমে এসে দরজা খুলে দিতেই যে মধ্যবয়সী লোকটি নেমে এল, চোখ বন্ধ করেও তার পরিচয় বলা যেতে পারে। দুজন সামনে, দুজন পেছনে প্রায় পাহারা দেবার মতো করে নিয়ে আসছিল। কাপুরদের সামনে এসে লোকটা দাঁড়িয়ে একটু ঝুঁকেই নমস্কার করল, ‘কী অনায়াস কথা, আপনাকে এরা এখানে বসিয়ে রেখেছে। হি হি হি! আপনি আসুন—ভেতরে আসুন।’

লোকটির বিনয় দেখার মতো, মনে মনে ভাবল কাপুর, কিন্তু অনুসরণ করল। পাশের একটা দরজা দিয়ে ওরা যে ঘরে ঢুকল সেই ঘর অফিসরুম। যশোবন্তের সঙ্গীরা বাইরেই দাঁড়িয়ে গেল। যশোবন্ত বলল, ‘বসুন স্যার—বলুন, আপনাকে কিভাবে সেবা করব? চা কফি না অন্য কিছু?’

হাত নেড়ে প্রস্তাবটাকে সরিয়ে দিয়ে কাপুর জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি আমায় চিনলেন কি করে? এর আগে তো কখনও পরিচয় হয়নি।’

‘একি বলছেন! আপনি আমার হোটলে এসেছেন আর চিনতে পারব না?’

‘হঁ। কেউ আক্রমণ করতে পারে এমন ভয় পাচ্ছেন কেন?’

‘ভয় না স্যার, ওটা সত্যি ঘটনা। এই পাঞ্জাবে উগ্রপন্থীদের কেউ বিশ্বাস করতে পারে? পুলিশ কমিশনার সাহেব নিজেই বললেন বডিগার্ড রাখতে। তবে জেনে রাখুন, ওদের কাছে যেসব অস্ত্র আছে তার সব কটাই আইনসম্মত।’ কথাটা বলে হাসল যশোবন্ত, ‘বলুন, আর কি করতে পারি?’

‘আমি আর কে কাপুর। দিল্লি পুলিশে—’

হাত তুলে কথা শেষ করতে দিল না যশোবন্ত, ‘আরে কী লজ্জায় ফেলছেন! আপনার কথা কে না

জানে। এমন সৎ অফিসার পুলিশে আছেন বলে সবাই গর্ব করে। কিন্তু আমার হোটেলে কি কোন সমস্যা হয়েছে?’

‘দিল্লিতে একটা খুন হয়েছে। আমাদের সন্দেহ সেই খুনী আপনার হোটেলে অন্য নামে ছিল। তাকে দেখেছে এমন দুজন মানুষের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অথচ আপনার হোটেলের কর্মচারীরা এমন ভাব করছে যেন তারা কিছুই জানে না। এই ব্যাপারটা বিস্ময়কর।’ কাপুর বলল।

‘আশ্চর্য! লোকটা খুনী জেনেও ওরা তাকে সাহায্য করেছে? আমি এখনই ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ওদের আর এখানে কাজ করতে হবে না।’

‘লোকটি যে খুনী তা ওরা বোধহয় জানে না।’

‘তার মানে?’

‘আপনার হোটেলের যাতে বদনাম না হয়, সেভাবেই ওর কথা এড়িয়ে যাচ্ছিল।’

‘আই সি। লোকটি তো এখন হোটেলে নেই?’

‘না।’ কাপুর মাথা নাড়ল।

‘মিস্টার কাপুর, আপনিই বলুন, এখানে এসে কেউ থাকতে চাইলে সে খুনী না জোচ্চোর তা এরা বুঝবে কি করে? এই হোটেলের ম্যানেজার খুব কড়া মানুষ। গোলমাল আছে এমন সন্দেহ হলে রুম রিফিউজ করেন। তা এফেরে ভ্রমলোককে দেখে নিশ্চয়ই কারও মনে হয়নি কোনও গোলমাল আছে।’

‘বুঝলাম। কিন্তু লোকটা’ চেক আউট করেছে রাত্রে।’

‘দিনের অথবা রাতের যে কোনও সময়েই চেক আউট করা যেতে পারে।’

‘মিস্টার যশোবন্ত, আমি আপনাদের সহযোগিতা চাইছি।’

‘এ কি বলছেন স্যার! আমরা সবসময় আপনাদের সেবা করে আসছি। আপনার যদি সন্দেহ থাকে তাহলে কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন। লোকটার নাম কি জানতে পারি?’

‘অতীশ রায়।’

‘ঠিক আছে। আমি আমার সব কটা হোটেলকেই জানিয়ে দিচ্ছি এই নামে কেউ যদি আসে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়।’

কাপুর উঠে দাঁড়াল। কোনও কথা না বলে বেরিয়ে এল সে।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধ্যা। এখানে অন্ধকার নামে একটু দেহিতে। চোখেমুখে জল দিলেও শরীর থেকে আলস্য যাচ্ছিল না। অতীশ বাইরে বেরিয়ে এল। পাখিদের চিংকারের সঙ্গে হাঁসদের হাঁকাহাঁকি মিলে গিয়ে তুমুল কাণ্ড হচ্ছে এখন। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে জলের ধারে এসে দাঁড়াল। কয়েকশ হাঁস এখন জল ছেড়ে উঠে এসে সমানে চোঁচিয়ে যাচ্ছে। অতীশকে দেখামাত্র তাদের কেউ কেউ তেড়ে এল। প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিল অতীশ, দ্রুত সরে এসেছিল খানিকটা—তারপরে সাহস করে এগিয়ে গেল। যারা তেড়ে এসেছিল তারা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

‘সাহাব, আপনার চা।’

অতীশ চমকে উঠল। লোকটা যে কখন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। চায়ের কাপ নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে বলল সে, ‘কী সুন্দর লাগছে এদের।’

‘হ্যাঁ সাহাব। একটু ভাল ব্যবহার করলেই দেখবেন এরা আপনার বন্ধু হয়ে বাবে। এখন রাত নামছে বলে ওরা ভয়ে পেয়ে চোঁচাচ্ছে। অন্ধকারকে কে না ভয় পায়। তবে আপনি আর বাইরে থাকবেন না—চলুন।’ করতার সিং বলল।

‘কেন? বাইরে তো বেশ লাগছে।’

‘ও।’

‘তুমি তোমার কাজে যাও। একলা থাকতে আমার ভালই লাগে।’

‘আমি আপনার হুইকির ব্যবস্থা করে রেখেছি। কখন ডিনার খাবেন বলুন, আমি এসে আপনাকে দিয়ে যাব।’ করতার মুখ তুলল।

‘ডিনার কি তৈরি?’

‘হ্যাঁ সাহাব। হটবল্লে রাখা আছে। ওই মেয়েটা তো রাত্রে এখানে থাকে না, তাই আমাকেই ডিনার দিতে আসতে হবে।

‘কোন দরকার নেই। তুমি হটবল্লে টেবিলে রেখে দাও। আমি নিজেই নিয়ে নেব। কখন খাব তা নিজেই জানি না।’

‘ঠিক আছে সাহাব, আপনার যেমন ইচ্ছা।’ অতীশের হাত থেকে খালি কাপ নিয়ে করতার সিং ফিরে গেল। এখন পাতলা অন্ধকার পৃথিবীতে। সে গমক্ষেতের সামনে এসে দাঁড়াল। আদিগন্ত ছড়িয়ে থাকা ফসলের ওপর হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। কী শান্ত, সুন্দর পৃথিবী। অথচ তার পেছনে মৃত্যু তাড়া করছে। একমুহূর্তের উদ্বেজনা তার জীবনটাকে তছনছ করে দিয়ে গেল। এভাবে কতদিন সে একা চোরের মতো নুকিয়ে থাকবে? যশোবন্ত এই যে আশ্রয় দিয়েছে তার বিনিময়ে সে টাকা নেবে। হয়তো ও ভাবছে চাপ দিলেই টাকা পেয়ে যাবে—কিন্তু অত টাকা দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই এটা জানার পর যশোবন্ত নিশ্চয়ই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। হয়তো পুলিশের হাতে তুলেও দেবে। তার চেয়ে সোজা খানায় গিয়ে পুলিশকে সব কথা খুলে বলাই ভাল।

সে ধীরে ধীরে চলে এল পাখির খাঁচার পাশে। পাখিরা এখন খাঁচার মধ্যে স্থির হয়ে বসে। ওদের বাইরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। আর কী আশ্চর্য, খাঁচার ওপরে দুটো পাখি বসে রয়েছে পাশাপাশি। তাদের মাথার ওপর উন্মুক্ত আকাশ, তবু তারা রয়েছে ওখানে। রাত নামল বলে বন্দী হয়ে থাকা জাতভাইদের কাছাকাছি হয়ে নিজেদের নিরাপদ ভাবছে।

বাংলোয় ফিরে এল সে। করতার সিং আলোগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। টিভির নব ঘোরালো। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দি ফিল্মের সেই সব নাচগান শুরু হয়ে গেল। আচ্ছা, দিম্মিতে এখন কি হচ্ছে? শোভনলালের খুন নিয়ে কি দিল্লি পুলিশ এখনও ব্যস্ত আছে? খুনীকে ধরার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে? এখন অনেক খুনের কথা কাগজে বের হয় যা দুদিন যেতে না যেতেই চাপা পড়ে যায়। আর খুনী কখনও ধরা পড়ে কি না বোঝা যায় না। তার ক্ষেত্রেও কি এমন হচ্ছে? বনানীকে একটা ফোন করা দরকার। করতার সিং জ্বালিয়ে গিয়েছে, এখন থেকে ফোন করা যাবে না। নিশ্চয়ই শক্তিমানপুরের বাজারে গেলে টেলিফোন বৃথ পাওয়া যাবে। সেখানে যাওয়া অবশ্য যশোবন্তের কথা অনুযায়ী ঠিক হবে না। ছটফট করতে লাগল সে। এখন থেকে বাজারটা কত দূরে জানতে পারলে এই অন্ধকারে একবার না হয় খুঁকি নিত। বনানী নিশ্চয়ই খুব ভাবছে। বেশি ভাবলে ওর প্রেসার বেড়ে যায়। আর যদি বনানী এর মধ্যে জেনে যায়? যদি পুলিশ ওকে জানিয়ে দেয়? একথা নিশ্চতভাবে বলা যেতে পারে, বনানী কোন খুনীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না। সে স্বামী হলেও নয়। তাই পুলিশ কিছু বলার আগে তার উচিত ছিল ওকে সব কথা খুলে বলার।

টিভিটা বন্ধ করে দিতেই কানে শব্দ এল। একটা গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ। গতকাল এখানে আসার পর এইরকম আওয়াজ কানে আসেনি। পুলিশের গাড়ি নয় তো? সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দূরে গাছপালার আড়ালে একটা গাড়ি যে এসে থামল তা বোঝা যাচ্ছে। যশোবন্তের এখানে পুলিশ এলে ও জানবে না? আর পুলিশ যদি আসে তো আসুক, ও ধরা দেবে—সব কথা খুলে বলবে। বড়ছোর একটা ফাঁসি হবে—নয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সেটা যেন কত বছর?

এবার গাড়িটাকে এগিয়ে আসতে দেখল। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অতীশ দেখল দামী গাড়ি থেকে নেমে এল যশোবন্ত আর একজন মহিলা। এরকম কেতাদুরস্ত মহিলাকে সাধারণত হিন্দি সিরিয়ালে দেখা যায়। চারপাশে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, ‘ফ্যান্টাস্টিক! আপনি নিশ্চয়ই এখানে থাকবেন?’

যশোবন্ত হো হো করে হেসে উঠল। ততক্ষণে করতার সিং ছুটে এসে একটু দূরে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছে। যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, ‘সাহেব কোথায়?’

‘বাংলোতে।’

‘সেবাযত্ন ঠিকঠাক হচ্ছে তো?’

‘জী মালিক।’

যশোবন্ত মেয়েটিকে ইশারা করে বাংলোর সিঁড়ি ধরে উপরে উঠে গেল। ওর পেছনে মেয়েটি এবং করতার এগিয়ে যেতে অতীশ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়িতে পা রাখল। ওরা তাকে খুঁজতে অরুণ করার আগে সে কথা বলল, ‘কী দৌভাগ্য!’

‘আরে তুই কোথায় ছিলি? বাইরে নাকি?’

‘হ্যাঁ। কাঁহাতক ঘরে বসে থাকা যায়।’

‘তা অবশ্য। তবে কম্পাউন্ডের বাইরে যাস না। এখানে যারা কাজ করে তারা নিশ্চয়ই তোর এখানে থাকার কথা জানে না।’

‘সম্ভবত না—তোর আদেশ এরা ঠিকঠাক পালন করছে।’

‘আরে ভাই, আমি যা করছি তা তোর ভালোর জন্য। যাক গে, তা কেমন লাগছে তোর আমার এই ফার্ম হাউস?’

‘দারুণ!’

‘ধন্যবাদ। করতার হইন্ডি লাগাও। ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?’

‘সাহাবের ঘরে বোতল রেখেছিলাম।’ করতার দাঁড়িয়ে গেল।

‘আরে না না, সাহাবের স্টকে হাত দিয়ে না। গাড়িতে ভাল জিনিস আছে, তাই দিয়ে আন্ত সেনিট্রেট করব। নিয়ে এসো—আয় বোস।’

ওরা তিনজন বসল।

যশোবন্ত বলল, ‘মনে হচ্ছে তোকে এখানে বেশিদিন থাকতে হবে না। সব নাইন ঠিক হয়ে গিয়েছে—ওধু একজননের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। এই তুমি দ্যাখো না, গাড়ি থেকে জিনিসপত্র ঠিকঠাক নামাচ্ছে কিনা। প্রীজ।’

মেয়েটির মুখে কপট স্মিটমান চলকে উঠল, ‘বারে, এই তো ডেকে এনে আমায় বসতে বললে। ঠিক আছে বাবা, আমি অদ্বকারে গাছপালা দেখছি।’

মেয়েটি বেরিয়ে গেলে যশোবন্ত গলা নামাল, ‘ঠিক এক ঘণ্টা বাদে তোকে এখান থেকে মিনিট পনেরো দূরে যেতে হবে। গাড়িতেই যাবি—আমার লোক নিয়ে যাবে।’

‘কেন?’

‘টাকার জন্যে।’

‘টাকা?’

‘ইয়েস। এত খরচ হচ্ছে, হবেও, টাকা লাগবে না।’

‘কে দেবে টাকা?’

‘গেলে দেখতে পারি। দিতে না চাইলে, কম দিতে চাইলে চাপ দিবি। আরে তুই তো এখন নরম ভদ্রলোক নোস, একটা খুনের এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে।’ হানল যশোবন্ত। তারপর গলা পালেটে বলল, ‘তোর বউকে ফোন করতে হবে?’

‘মানে?’

‘আরে হঠাৎ গা-ঢাকা দিয়েছিস, প্রেম-ট্রেন থাকলে নিশ্চয়ই টেনশনে আছে। তুই বললে আমি খবর দিয়ে দিতে পারি। অবশ্য এখানে আছিস তা বলব না। বউ হোক আর যাই হোক, পুলিশ যে পেট খেঁচে কথা বার করবে না তা কে বলতে পারে!’ যশোবন্ত কথা শেষ করতে না করতেই করতার সিং ফিরে এল রয়াল স্যানুটের বোতল নিয়ে। গ্লাস জন বরফ এসে গেল।

‘করতার, ধীনা কোথায়?’

‘ও তো রাতে এখানে থাকে না মালিক।’ করতার সরে দাঁড়াল।

‘কোথায় থাকে?’

‘মালিকের মনে নেই, ওকে ওপাশে একটা ঘর দিয়েছেন।’

‘ওকে ডাকো—মুরগী বানাক।’

‘মালিক!’

‘বল।’

‘আমি বানিয়ে দিলে অসুবিধে হবে? রাতে ওর মাথা ঠিক থাকে না।’

‘অ। ঠিক হয়। ওই মেমনাহেবকে ডেকে দাও।’ করতার বেরিয়ে গেলে যশোবন্ত বলল, ‘এই মেয়েটি একসময় পাঞ্জাবি ছবিতে অ্যাক্টিং করত। ছবিতে সুবিধে করতে পারেনি—আরে এসো। অন রক চলবে?’

‘কি এটা, রয়াল স্যানুট? চলবে।’ মহিলা গ্লাস তুলে নিলেন।

‘চিয়ান্স!’ দুজনের গলা উচুতে শোনাল।

‘নীলম, মিট মাই ফ্রেন্ড রায়। হিন্দি সিরিয়ালের প্রোডিউসার। আমরা যাকে বলে হুন ফ্রেন্ড, ঠিক তাই।’ যশোবন্ত পরিচয় করিয়ে দিল। অতীশ লক্ষ্য করল যশোবন্ত তার প্রথম নামটা বলল না।

নীলম হাত বাড়াল, ‘হাই!’

অতীশকে হাত স্পর্শ করতে হল, ‘হাই!’ মেয়েটির হাত কী খড়খড়ে।

‘নীলম ভাল অভিনেত্রী। শুনতেই পাচ্ছি, ভাল হিন্দি বলে। বাল্যবন্ধু হিসেবে আমি আশা করব তুই নেস্টেট প্রোডাকশনে ওর কথা ভাববি।’ যশোবন্ত বলল।

নীলম চোখের কোণে তাকাল, ‘কি জানি, ওঁর হয়তো আমার চেহারা পছন্দ হচ্ছে না!’

অতীশ বলতে বাধ্য হল, ‘না না, আপনি যথেষ্ট সুন্দরী।’

যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার স্ট্যাটিস্টিকস্ কত?’

‘থার্মি সিন্স টোয়ান্টি এইট থার্মি সিন্স। হায়েট পাঁচ সাড়ে ছয়।’

যশোবন্ত বলল, ‘গুনলি?’

অতীশ ভেবে পাচ্ছিল না যশোবন্ত এসব বলছে কেন? যার মাথার ওপর মৃত্যুর খাঁড়া ঝুলছে, তাকে এই অনুরোধ করা মানে রসিকতা নয়?

‘দেখলে, উনি কোনও কথাই বলছেন না। আর একটা দাও।’ গ্লাস নামাল নীলম।

‘কি রে, বল! সুন্দরী নারীকে দুঃখ দিতে নেই।’

‘আশ্চর্য, আমি কখন দুঃখ দিলাম! ঠিক আছে, মনে থাকবে।’

এই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। যশোবন্ত বলল, ‘যা, তুই ঘুরে আয়।’

‘তুই যাবি না?’

‘যেতাম। কিন্তু একজন মহিলাকে একা ফেলে রেখে দুজনের চলে যাওয়া অভদ্রতা হবে না? তুই যা, চটপট ঘুরে আয়।’ যশোবন্ত গ্লাস হাতে উঠে অতীশকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

সিঁড়িতে পা রেখে অতীশ দেখল দুজন লোক নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সে নামতেই ওরা হাঁটতে লাগল। গেটের কাছে এসে অতীশ দেখল আরও একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। লোকদুটোর ইশারায় সেই গাড়িতে উঠে দেখল সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশ আরও দুজন ইতিমধ্যেই বসে আছে। গাড়ি ছুটল।

কে টাকা দেবে, কাকে চাপ দিতে হবে? ব্যাপারটা অত্যন্ত রহস্যময়।

অন্ধকার চিরে হেডলাইট ছুটে যাচ্ছে। এরা সবাই যশোবন্তের কর্মচারী। এদের কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। মিনিট পনেরো বাদে একটা টিলার ধারে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। চারধার সুনসান। এখানে কোন মানুষ বাস করে বলে মনে হয় না। চূপচাপ সময় যাচ্ছিল। দশ মিনিট বাদে আর একটা গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। আলো দুটি এগিয়ে আসছে। কুড়ি গজ দূরে এসে গাড়িটা থেমে গেল।

দরজা খুলল। দুজন লোক দ্রুত নেমে দরজা খুলতেই যে নামল তাকে দেখে অবাক হয়ে গেল অতীশ। যদিও তার চোখে রুমাল ভাঙা কিছু বাঁধা, তবু সে চিনতে পারছে। একজন সেই বাঁধন খুলে দিল।

অতীশ গাড়ি থেকে নামল। একটু দূরে সুন্দরলাল দাঁড়িয়ে আছে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে। ছেলেটা তাকে দেখছে। এতদিন, শোভনলাল বেঁচে থাকতে যখনই দেখা হয়েছে তখনই বলেছে, নমস্কে আকল। ওকে আভ নিয়ে এল যশোবন্ত। পৃথিবীর শেষভম লোক সুন্দরলাল যাকে সে এখানে আশা করেছিল। সে এগিয়ে গেল। তার দুপাশে দুজন অন্ত্রধারী। কিছু করার নেই—সুন্দরলালের মুখোমুখি দাঁড়াল অতীশ।

সুন্দরলাল রোগা, তরুণ, মুখে এখনও কৈশোরের ছাপ।

অতীশ বলল, ‘আই অ্যাম সরি সুন্দর। কিন্তু তোমার বাবা যেভাবে আমাকে চিট করতে চেয়েছিল তাতে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি।’

‘ইটস অল রাইট।’ সুন্দরলাল ভাঙা গলায় বলল।

‘কিন্তু আমার টাকা চাই। তোমার বাবা আমার টাকা মেরে দিয়েছে, সেই টাকা তো সে সঙ্গে নিয়ে মর্গে যায়নি।’

‘আমি জানি না তিনি নিয়ে গিয়েছেন কিনা। তবে আমাদের জান্যে যে ক্যাশ রেখে গেছেন তার পরিমাণ খুব সামান্য।’ সুন্দরলাল বলল।

‘বাঃ! কিন্তু আমি তার কাছে প্রায় ছাব্বিশ লাখ টাকা পাই।’

‘আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন কিন্তু অত টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার মা-ও একথা আপনাকে বলতে বলেছেন।’

‘তাহলে তুমি কেন এসেছ?’

‘আমি কোনরকমে দশ লক্ষ টাকা জোগাড় করতে পেরেছি। এটা নিয়ে যদি আপনি আমার পিতৃঋণ মাফ করে দেন তাহলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।’ ব্যাগটা এগিয়ে দিল সুন্দরলাল।

অতীশ মাথা নাড়ল, ‘অসম্ভব! ছবিশের বদলে দশ পেলে আমার কোনও সমস্যার সমাধান হবে না। আমার পাওনাদাররা অপেক্ষা করছে।’

‘আমি আপনাকে সত্যি কথা বলছি, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।’

‘তোমার বাবা যে টাকা সরিয়েছিল তার হদিস যদি জানা না থাকে তাহলে সেটা খুঁজে বের করো। মোদ্দা কথা পুরো টাকা আমার চাই।’

‘বেশ। হদিস পেলে আমিই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। বাবার কাজকর্ম সম্পর্কে যদি আমার অথবা আমার মায়ের শ্রদ্ধা থাকত তাহলে অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতাম না। তাছাড়া—’, সুন্দরলাল একটু থেমে বলল, ‘একটা মানুষের জীবনের দাম কি যোল লক্ষ টাকার চেয়ে কম? আমরা তো মুখ বন্ধ করেই আছি।’

ব্যাগটা মাটিতে নামিয়ে সুন্দরলাল ফিরে গেল। দূরে দাঁড়িয়ে অতীশ দেখল ওর চোখ আবার বেঁধে দেওয়া হল। ওরা গাড়িতে উঠতেই সে ব্যাগটা তুলে নিয়ে ফিরে এল। দ্বিতীয় গাড়িটা বাঁক নিয়ে বেরিয়ে যেতে সে খোলা দরজা দিয়ে পেছনের আসনের মাঝখানে বসে পড়ল। গাড়ি চলা শুরু করল।

এতদূর কথা বলার পর এখন শরীরে অদ্ভুত ক্লান্তি অনুভব করল সে। শোভনলালের ছেলে সুন্দরলালকে যে যশোবন্ত চণ্ডীগড় থেকে টাকাসমেত তুলে আনতে পারে তা অতীশ কল্পনাও করতে পারেনি। কতটা শক্তিশালী সংগঠন থাকলে এমনটা করা যায়! সুন্দরলাল নিঃশেষ ইচ্ছায় সুড়সুড় করে চলে আসেনি। কিন্তু চোখ বন্ধ থাকলেও ও যদি এলাকাটা চিনতে পারে? নাঃ। সন্দেহটা উড়িয়ে দিলে সে। একে রাতের অন্ধকার, তার ওপর চোখের ওপর আড়াল— সুন্দরলালের পক্ষে কখনই এখানে চিনে আসা সম্ভব নয়। কিন্তু ছেলেটা বুদ্ধিমান। ওর বাবাকে খুন করার জন্যে অতীশকে যে যোল লক্ষ টাকা ছেড়ে দিতে হবে তা স্পষ্ট বলে দিয়েছে। এখন অতীশের মনে হচ্ছে এই দশ লক্ষ টাকা সে নাও পেতে পারত। শোভনলালের পরিবারের কাছে টাকা চাওয়ার সাহস তার কখনও হত না। অথচ ছেলেটা দশ লক্ষ টাকা দিয়ে গেল—কী ভাব্জব ঘটনা।

গাড়িটা গেটেই রইল। দুজন রক্ষী তাকে বাংলো পর্যন্ত পৌঁছে দিল। সিঁড়ি বেয়ে ওপর উঠে দেখল যশোবন্ত টিভি দেখছে। টিভিতে পবনপুত্র হনুমান হচ্ছে। রিমোট টিপে ওটা বন্ধ করে যশোবন্ত বলল, ‘কত দিয়েছে?’

‘দশ।’

‘যাক, দুই বাড়িয়েছে। প্রথমে বলেছিল আটের বেশি দিতে পারবে না। নিশ্চয়ই ওনে নিসনি! আরে ভাই, টাকা আর মেয়েছেলে জরিপ করে নিতে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে ছেলেটা দু-নম্বরী করবে না। বাপের স্বভাব পায়নি। তুই লাকি।’

‘লাকি?’

‘নয় তো কী? আর ফাঁসি তো হবে না, জেলও হবে না। তবে কিছুটা সময় লাগবে। ওখান থেকে আট লাখ টাকা বের করে দে। না, ঠিক আট নয়—চল্লিশ কম দিস। ওটা তো অ্যাডভান্স করেছিস!’ যশোবন্ত বলল।

বিনা বাক্যব্যয়ে ব্যাগ খুলে একশ টাকা বান্ডিলগুলো বের করল। ছিয়াত্তরটা বান্ডিল নিয়ে যশোবন্ত বলল, ‘ওহো, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মেয়েটা একদম আউট হয়ে গিয়েছে। রয়্যাল স্যানিট যদি বিয়ারের মতো খায়—। আউট হয়ে যাওয়া মেয়েদের আমি একদম সহ্য করতে পারি না। ও এখানে থাক, পরে গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাব। তার বউকে ফোন করতে হবে?’

‘না।’

‘ও কে—ওড নাইট!’ দরজার কাছে চলে গেল যশোবন্ত ব্যাগ হাতে নিয়ে।

টোবিলের ওপর চক্কিশটা বান্ডিল পড়ে আছে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে যশোবন্ত একবার ঘুরে

দাঁড়াল—‘বাংল্যের বাইরে যাস না। দিল্লির পুলিশ অফিসার কাপুর এখন লুধিয়ানায়। আমার হোটেলের তোর খোঁজে এসেছিল। এখান থেকে খবর নিক হবে না, কিন্তু বাইরের কেউ যেন তোকে না দেখে।’
নেমে গেল যশোবন্ত।

চূপচাপ বসে রইল অতীশ। তারপর গ্রাসে ঘইকি ঢালল। দুটো বরফের টুকরো তাতে ফেলতেই কানে গাড়ির শব্দ ভেসে এল। ওরা চলে যাচ্ছে—নিপুণ অপারেশন। তার আট লক্ষ টাকা বেরিয়ে গেল। দু চুমুক দিতেই মনে হল, তার টাকা কেন? এ টাকা সে কখনও পেত না। যশোবন্ত তো তার উপকার করেছে। উলটে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার পাইয়ে দিয়েছে। ভাবতেই মন হালকা হয়ে গেল।

‘সাহাব!’

সে মুখ ফেরাল, করতার সিং দাঁড়িয়ে আছে।

‘আপনি কখন ডিনার খাবেন বললে আমি চলে আসব।’

‘বলেছি তো, হটবক্সে রেখে তুমি চলে যাও।’ অতীশ গ্রাস রেখে টেবিল থেকে টাকার বাউলগুলো তুলে ঘরে চলে এল। স্টুকেস খুলে সেগুলো ঢুকিয়ে রাখার পর স্থিতি হল। যদিও করতার সিং টাকাগুলো দেখেছে, তবে ওকে নিয়ে কোনও দৃষ্টিস্তর নেই। সে জল হইকি গ্রাস নিজের ঘরে আনিয়ে নিল। এর মধ্যে করতার চিকেন রোস্ট করেছিল তার মালিকের ছকুম অনুযায়ী, সেটাও প্লেটে সাজিয়ে দিল। দিয়ে বলল, সাহাব, দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।’

অতীশ মাথা নাড়ল, ‘তুমি যাও, আমি দিচ্ছি।’

করতার ইতস্তত করছিল, চলে গেল না।

অতীশ জিজ্ঞাসা করল, ‘কিছু বলবে?’

‘হটবক্সে দুজনের খাবার আছে। ওই মেমসাহাব যদি ঘুম থেকে উঠে যেতে চান, তাহলে ওকে সেটা বলে দেবেন।’ করতার জানাল।

‘মেমসাহাব!’ অতীশের এতক্ষণে মনে পড়ল—নীলম, যশোবন্ত যাকে সঙ্গে নিয়ে এসে আউট হয়ে গেছে এই অপরাধে ফিরিয়ে নিয়ে গেল না।

‘মেমসাহাব কোথায়?’

‘ওপাশের ঘরে ঘুমাচ্ছেন, মনে হয় না সকালের আগে উঠতে পারবেন।’

‘তাহলে তো চুকেই গেল।’

‘তবে যদি ওঠেন?’

‘তুমি কি ভেবেছ ওকে খাওয়ার জন্যে আমি সারারাত জেগে বসে থাকব? যার খাবার দরকার হবে সে নিজেই খুঁজে নেবে—চল।’ অতীশ উঠে দাঁড়াল। করতার নেমে গেলে দরজা বন্ধ করে আলো নিভিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল। মুরগী আর স্কচ খেতে খেতে তার হঠাৎ মনে হল, অনেকদিন বাদে মাথার ওপর থেকে পাহাড়টা সরে গেছে। অবশ্য ওই টাকা হাতিয়ে যশোবন্ত তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। সম্ভাবনাটা থাকছেই। আর তা যদি না করে তাহলে নিশ্চয়ই কয়েকদিনের মধ্যে সে কলকাতায় ফিরে যেতে পারবে।

আর যদি উলটেটা হয়? অতীশ ঠিক করল সে পালাবে। হিমালয়ের কোনও নির্জন জায়গায় সাধুসন্ন্যাসীদের আশ্রমে যদি সে চলে যায়, তাহলে পুলিশ কি তার খোঁজ পাবে? জেলে পচার চেয়ে সেই জীবন নিশ্চয়ই অনেক শান্তির। অথবা এই দু লক্ষ টাকা নিয়ে কোনও নির্জনে চলে গিয়ে একেবারে অনাড়ম্বর জীবনযাপন?

পাঁচ পেগ খাওয়ার পর অতীশ বুঝতে পারল তার নেশা হয়েছে। এখন আর উঠে গিয়ে হটবক্স খুলে রাতের খাবার খেতে ইচ্ছে করছে না। সে ঘড়ির দিকে তাকাল—রাত পৌনে বারোটো, এবার শুয়ে পড়লে হয়। জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। বাইরেটা অস্পষ্ট। পৃথিবী তার সমস্ত কষ্ট হজম করে শান্ত সমাহিত হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর আর কোথাও কি এমন নির্জন জায়গা নেই যেখানে সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে? ভোগবিলাসের দরকার নেই, অতি সাধারণ কিন্তু শান্তিতে দিনগুলো কাটিয়ে দিলেই সে খুশি হয়।

হঠাৎ অতীশের মনে হল কেউ যেন হেঁটে যাচ্ছে। চট করে নিজেকে পর্দার আড়ালে নিয়ে গেল সে। গাছপালার মধ্যে দিয়ে আসা সেই মূর্তিটাকে আর এখন দেখা যাচ্ছে না। তারপরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল। দরজাতেই আঘাত বাজল। তারপর সব চূপচাপ। ও নিশ্চয়ই বীণা। সে তো রাতে ঘুরে বেড়ায়।

জানলা খুলে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে কেন সে ঘুমাতে যায়নি? অতীশ এটুকু বুঝল, ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে বাবে। সে আলো নিভিয়ে দিল। তারপর বিছানায় শুতে যেতেই ওপাশে শব্দ শুনতে পেল। আলো জ্বলে উঠল। এবং তারপরেই নারীকণ্ঠে শুনতে পেল, 'কোই হ্যায়? বেয়ারা?'

নেশা হওয়া সত্ত্বেও অতীশ বুঝতে পারল নীলমের ঘুম ভেঙেছে। এখন জানান দেওয়া মানে ওর সঙ্গে কথা বলা। কিন্তু তার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। ঘুম আসছে খুব। সে বালিশে মাথা রাখল। নীলম বলছে, 'কেউ নেই নাকি? বেয়ারা? মাই গড, আমি কি একা এখানে? যশোবন্ত—যশোবন্ত?' বেশ জোরে ডাকল নীলম।

কয়েক নেকেন্ড বাদে দরজার ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকতেই অতীশ বুঝতে পারল নীলম সুইচ খুঁজে পেয়েছে। নীলমের গলা শুনতে পেল, 'কেউ নেই! আমাকে এখানে রেখে দিয়ে চলে গেল! সেরকম অবশ্য কথা হয়েছিল—উঃ! টেবিলে ওটা কি?' আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ, 'দুস! এখন কে খাবে? যাই শুয়ে পড়ি—কিন্তু একবার ঘুম ভাঙলে—হইকির বোতল কোথায়?'

আওয়াজটা দরজার সামনে পৌঁছে গেল। তারপর নীলমের গলা, 'কে? কেউ কি এ ঘরে আছেন?' অতীশ সাজা দিল না। বালিশে গাল চেপে সে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করতে লাগল। তারপরেই টের পেল ঘরের আলোটা জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নীলমের গলা থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল; কিছুক্ষণ সময় নিল যেন, তারপর অতীশ শুনল, 'মিস্টার রায়, মিস্টার রায়! দূর, কী ঘুম রে বাবা!'

জোরে জোরে পা ফেলে নীলম চলে গেল এখন থেকে। যাওয়ার সময় আলো নিভিয়ে যায়নি। ঘুমের জন্য যদি বিছানা থেকে নেমে আলো নেভায়, তাহলে নীলম বুঝে বাবে সে জেগে ছিল। চোখ বন্ধ করে থাকার কারণে আলো জ্বলে রাখা সত্ত্বেও কিছুনি ভাবটা চলে এল এবং শেষ পর্যন্ত কখন ঘুমিয়ে পড়ল তা অতীশ নিজেই জানে না। ঘুমের মধ্যে সে যেন শুনতে পেল কেউ তাকে ডাকছে। বনানীর গলা বলে মনে হল। সে একটা গভীর খাদের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর বনানী ওপর থেকে ঝুঁকে তাকে ডেকে চলেছে। তৎক্ষণাৎ তার খুব মনখারাপ হয়ে গেল। সে চিৎকার করে জানান দিতে চাইল কিন্তু গলা থেকে স্বর বের হল না। সে যখন ছটফট করছে তখন ওপর থেকে একটা দড়ি নেমে এল। সেই দড়ি দু হাতে ধরতেই তার শরীর হ হ করে ওপরে উঠতে লাগল। ওপরে ওঠামাত্র তার ঘুম ভেঙে গেল, চোখে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল। সদ্য আসা ঘুম ভেঙে যাওয়ার ক্লান্তি এল, অবসাদ তার মুখে বিরক্তির ছবি স্পষ্ট করল। সে চোখ মেনতে পারল না প্রথমে। মনে হল আলো নিভিয়ে দিলে আবার ঘুমোতে পারবে। সে মাথা তুলে উঠে বসতেই শুনতে পেল, 'কুন্তকর্ণের চেয়ে আপনি কম কিছু নন!'

সে দেখতে পেল এবার। নীলম সোফার বসে আছে, হাতে গ্লাস।

'আপনি?' জড়ানো গলা নিছের কানেই অচেনা মনে হল অতীশের।

'শেষ পর্যন্ত ঘুম ভাঙল।' হাসি ফুটল ঠোঁটে। এবং তখনই চোখে পড়ল—এর মধ্যে পোশাক পালটেছে নীলম। তার অঙ্গে এখন আকাশী নীল রাতের পোশাক। দুটো বাহ মুক্ত। হাতের দাঁড়ের মতো নিটোল। হাঁটু পর্যন্ত বিদ্যুৎ নাইটি বড় মোলায়েম।

'আপনি আছেন?' অতীশ ভান করল।

'কেন, আপনি জানতেন না?'

'কি করে জানব? আমি ফিরে এসে দেখলাম আপনি নেই!'

'আপনার বন্ধু আমাকে ফেলে রেখে গেছে। অবশ্য বলেছিল, কয়েকদিন থাকতে হতে পারে কিন্তু নিজে চলে যাবে বলেনি!'

'যাওয়ার আগে বলে যায়নি?'

'নাঃ। আমার ঘুম ভাঙলে দেখলাম শুয়ে আছি অন্ধকার ঘরে। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! ডাকাডাকি করছি কিন্তু কারও সাজা নেই। তারপর আপনাকে আবিষ্কার করে পড়ে প্রাণ এল। আমি একদম একা ঘুমোতে পারি না।'

'ঘুমিয়েছিলেন তো?'

'ওঃ, ওটা হইকির প্রভাবে। বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম অল্প সময়ে।'

'তাহলে আবার ওটা নিয়ে বসলেন কেন? যান, শুয়ে পড়ুন।'

'আপনি আমাকে শুয়ে পড়তে বলছেন?' হাসল নীলম।

‘ঠিক তাই।’

‘এখন এই বাংলায় আমরা দুজন ছাড়া কেউ নেই।’

‘একটু আগে যখন আপনি ঘুমোছিলেন তখনও কেউ ছিল না।’

‘কিন্তু আমার যে একা ঘুমোতে ভয় লাগে!’

হঠাৎ গলার স্বর পালটান অতীশ, ‘কিছু যদি মনে না করেন, যশোবন্ত কি আপনাকে আগেই আমার কথা বলে এখানে নিয়ে এসেছে?’

‘আপনি বুদ্ধিমান।’

‘কিন্তু এই যে আপনি চলে এলেন, থাকলেন, আপনি তো আমাকে জানেন না! আমার খুব খারাপ অসুখ থাকতে পারে—পারে না?’

‘খারাপ অসুখ!’

‘ধরুন ভিডি, এড্‌স!’

‘অসম্ভব।’

‘আপনি কি করে নিশ্চিত হচ্ছেন?’

‘তাহলে যশোবন্ত আমাকে নিয়ে আসিত না।’

‘ওর সঙ্গে বৎ বছর পরে কুর্দীন আগে দেখা হয়েছে, তাছাড়া একজন পুরুষের পক্ষে আর একজন পুরুষের ওই রোগ আছে কি না জানা সম্ভব নয়।’ অতীশ গভীর মুখে বলল, ‘যান, নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন।’

‘এখানে আমার নিজের ঘর কি করে পাব?’

‘বাঃ, যে ঘরে এতক্ষণ ঘুমোছিলেন!’

‘ওখানে তো যশোবন্ত আমাকে ওইয়ে দিয়ে গেছে।’ নীলম কথাটা বলামাত্র সিঁড়িতে আবার শব্দ হল। ঘরের ভেতর থেকে সেটা ভৌতিক শোনা। খুব অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল নীলম। চাপা গলায় বলল, ‘কি ব্যাপার?’

‘জানি না।’

নীলম ছুটে এল অতীশের পাশে, ‘কাউকে ডাকা যায় না?’

‘এত রাতে কে আসবে?’ সে মুখ ফেরাতেই নীলমের ব্যক্তিগত সৌন্দর্য দেখতে পেল। অনেক—অনেকদিন এইরকম নারী অতীশ দেখেনি। অথচ কি আশ্চর্য, তার শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। দেখতে ভাল লাগলেও শরীর দারুণভাবে নির্লিপ্ত।

নীলম ফিসফিস করে বলল, ‘আপনি এতক্ষণ আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলেন?’

‘যা ভাল মনে করেন তাই ভাবুন।’

‘যদি বলি ওই অসুখগুলো আমারও আছে।’ নীলম শব্দ করে হাসল, ‘আচ্ছা, আমাকে কি খুব নির্বোধ মনে হয়? যে পুরুষের ওইসব অসুখ আছে, সে আগাম কাউকে জানিয়ে দেয় না। এখন বলুন তো, আমি কি দেখতে খুব খারাপ?’

‘আপনি পরমাসুন্দরী।’

বলামাত্র টুক করে নাইটির বাঁধন খসিয়ে দিল নীলম, ‘আলোটা কি জ্বলবে?’

ঠিক সেইসময় সিঁড়িতে আবার শব্দ বাজল। চকিতে পোশাক ঠিক করে নিয়ে নীলম চাপা গলায় বলল, ‘কে?’

সাপিনী যখন ফণা তোলে তখন ইদুরছানা বিবশ হয়ে অপেক্ষা করে। অতীশ সেই অবস্থা থেকে দ্রুত মুক্তি পেল শব্দটার জন্যে। বলল, ‘এখানে বোধহয় কোনও প্রেতাত্মা বোরাফেরা করে। কাল রাতেও আওয়াজ শুনেছি।’

‘মাই গড!’ চোখ বড় হয়ে গলে নীলমের। মুখে আতঙ্কের চিহ্ন স্পষ্ট।

‘চোখ বন্ধ করে গুয়ে পড়ুন।’

‘অসম্ভব। আমি একা ঘুমোতে পারব না।’

‘তাহলে এখানেই—।’ অতীশ বিছানা থেকে নেমে পড়ল।

‘ওকি। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?’

‘শব্দটা নতুন কোনও প্রত্যয় করছে কিনা দেখে আসি।’

‘না, যাবেন না। যে যা করছে বাইরে করুক—আপনার কি দরকার?’

‘আমার মনে হয় এই বাংলাতে কোনও মেয়ে খুন হয়েছিল। তার প্রেমিক সেই খুনটা করেছিল। তারপর থেকেই কোনও নারীপুরুষকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখলেই ও ফ্রেপে যায়।’

‘সর্বনাশ! কিন্তু গতকাল তো আপনি একা ছিলেন? তখনও তো শব্দ শুনেছিলেন?’

‘তা অবশ্য! হয়তো ভেবেছিল আমার সঙ্গে কোনও মহিলা আছে।’

‘যাঃ! প্রত্যয়্যারা ভাবে নাকি? ওরা তো সব দেখতে পায়। ঠিক আছে, আপনি ওপাশে গুয়ে পড়ুন, ঘনিষ্ঠ হতে হবে না।’

আলো নেভাতে দিল না নীলম। বিছানার একপাশে গুয়ে পড়ল অতীশ। মাঝখানে ফুট দুয়েরকের ব্যবধান। অতীশের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল বাইরে বেরিয়ে বীণাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আসে। মেয়েটা আজ নিজের অজান্তে তার উপকার করল। সে হোসে ফেলল। শব্দ হল।

‘হাসছেন কেন?’

‘কেউ বিশ্বাস করবে আমরা এভাবে গুয়ে আছি অথচ—।’

‘আমি কোনও পেরীকে চটাতে চাই না।’

‘ঠিক কথা।’ অতীশ চোখ বন্ধ করল। প্রচণ্ড শরীর খারাপ হলে, অনেকবার টয়লেটে গেলে লোভনীয় খাবার সামনে দেখেও মুখ ঝিরিয়ে নিতে মানুষ বাধ্য হয়। নীলমকে দেখে মন প্রলুব্ধ হচ্ছে বটে কিন্তু বনানীর প্রতি সং থাকতে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছে এমন ভাবার কারণ নেই। শোভনলালকে খুন করার পর থেকে শরীর এবং মনে যে আলোড়ন হয়ে গেল তার প্রতিক্রিয়া থেকে যে আজ রাতেও মুক্ত হয়নি তা একটু আগে সে আবিষ্কার করল। পৃথিবীর ওই আদিম রিপুটি তার শরীর থেকে এখন উধাও হয়ে গিয়েছে। এখন নীলমকে প্রশয় দেওয়া মানে এক লজ্জাজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া। একজন পুরুষের কাছে তার চেয়ে অপমানের কিছু নেই।

ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল। বেল বাজছে। ধড়মড় করে উঠে বসল অতীশ। আলো জ্বলছে। নীলম তার দিকে পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। আশ্চর্য, এইসময় ওর মুখ বালিকার মত হয়ে গেছে। কোন অভিজ্ঞতার ছাপ নেই সেখানে।

অতীশ বসার ঘর পেরিয়ে দরজা খুলতেই করতার সিংকে দেখতে পেল। লোকটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

‘কি ব্যাপার?’

‘সাহাব, মালিক গাড়ি পাঠিয়েছেন। আপনাকে এখনই যেতে হবে।’

‘কোথায়?’

‘তা তো জানি না সাহাব!’

অতীশের ইচ্ছে হল বিদ্রোহ করতে। মাত্র কিছুটা সময় সে ঘুমাতে পেরেছে, শরীরে এখনও প্রচুর ক্লান্তি। সে যেন পুতুল আর যশোবন্ত তাকে নাচাচ্ছে। কিন্তু সে কিছুই করতে পারল না। প্রতিবাদ করলে ওই করতারই তাকে বলবে এখান থেকে চলে যেতে। অতএব তাকে দ্রুত তৈরি হতে হল। নীলম তখনও ঘুমোচ্ছে।

ওকে ডাকতে যেতে করতার বাধা দিল, ‘মেমসাহাবকে ঘুমাতে দিন। মালিক পরে ওঁর জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।’

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে অতীশ অ্যাসাসাডারের পেছনের সিটে বসে দু-পাশের অন্ধকার দেখতে লাগল। ড্রাইভারের পাশে এখন একটি মাত্র লোক, পেছনে কেউ নেই। কি এমন ঘটল যে সাতভাড়াভাড়ি তাকে এখান থেকে সরিয়ে নিচ্ছে যশোবন্ত? তাহলে কি ওই কাপুর নামের অফিসারটা জানতে পেরেছে সে কোথায় আছে? এই খামারবাড়িতে কি আজই হানা দেবে পুলিশ? তাই যদি হয়, তাহলে তাকে যশোবন্তের কাছে আর একবার কৃতজ্ঞ হতে হবে।

নীলমের মুখটা মনে পড়ল। বনানীকে বিয়ে করার পর আজ পর্যন্ত সে দ্বিতীয় কোনও নারীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করেনি। কিন্তু আজ রাতে যে অবস্থা হয়েছিল তা যদি স্বাভাবিক অবস্থায় হত তাহলে

কোনও নীতিবোধ কি তাকে ঠেকাতে পারত! আর একটু পরে ঘুম থেকে উঠে নীলম দেখবে সে নেই। আর কোনদিনই তাদের হয়তো দেখা হবে না—এই রাতটার স্মৃতি মেয়েটা কতদিন মনে রাখবে?

ঘুমিয়ে পড়েছিল অতীশ। হঠাৎ গাড়িটা থামতে চোখ মেলে দেখল একটা পেট্রল পাম্প সামনে। ড্রাইভার তেল নিচ্ছে। আলো ফুটে গিয়েছে এর মধ্যে। আকাশ পরিষ্কার। পৃথিবীটাকে কী সুন্দর শান্ত লাগছে এইসময়।

‘সাব্, চা—।’

অতীশ দেখল ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটি চা নিয়ে এসেছে। ভাল লাগল। ধন্যবাদ জানিয়ে গ্লাসটা নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, ‘লুথিয়ানা আর কত দূরে?’

লোকটা বলল, ‘আমরা তো অনেকক্ষণ লুথিয়ানার রাস্তা ছাড়িয়ে এসেছি সাব্। আপনি ঘুমিয়েছিলেন বলে বুঝতে পারেননি।’

‘আমরা কোথা যাচ্ছি?’

‘দিল্লি।’ লোকটা সরে গেল সামনে থেকে।

দিল্লি। চমকে গেল অতীশ। তাকে দিল্লিতে নিয়ে যাচ্ছে কেন যশোবন্ত? মতলবটা কি? ওখানে পুলিশ নিশ্চয়ই তাকে হনো হয়ে খুঁজছে, ওখানে নিয়ে যাওয়া মানে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া।

অতীশ চায়ের গ্লাস হাতে গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল—পালাতে হবে, কিন্তু স্যুটকেসটা রয়েছে ডিকিতে। টাকাপয়সা জাম্বুকাপড় সব ওটার মধ্যে। ওগুলো ছাড়া পালিয়ে গিয়ে সে কিছুই করতে পারবে না।

গাড়িতে ওঠার সময় কর্তার সিং ডিকিতে স্যুটকেস তুলে দেওয়ার পর ড্রাইভার চাবি ঘুরিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল। লোকটার কাছে স্যুটকেস চাইলে রাজী হবে? দ্বিতীয় লোকটা ফিরে এল, ‘হয়ে গেছে সাব্?’

অতীশ গ্লাসটা দেখল। তারপর চুমুক দিল।

দুপুরের মুখে দিল্লিতে ঢুকে গেল গাড়ি। ড্রাইভার জানে কোথায় তাকে যেতে হবে। অতীশ দেখল গাড়ি যেখানে এসে দাঁড়াল সেখানে কোনো কোট পরা উকিলরা ঘোরাফেরা করছে। গাড়ি থামামাত্র তাদের একজন দরজা খুলে তার পাশে উঠে বসল। লোকটার হাতে কাগজপত্র।

‘নমস্কার। আমি সুনীল গুপ্তা। আপনার কেসটা আমি হ্যান্ডেল করছি।’

‘আমার কেস?’

‘হ্যাঁ। আপনার আগাম জামিনের জন্য এখনই দরখাস্ত করতে হবে। লাঞ্চার আগেই যাতে মুপেফ হিয়ারিং দেন তার ব্যবস্থা করেছে। নিন, এখানে সই করুন। টাইপ করা একটা অ্যাপ্লিকেশন এবং কয়েকটা কাগজপত্র সামনে ধরল সুনীল গুপ্তা।

‘এসব কি?’

‘আগাম জামিনের জন্য যেসব কাগজ লাগে তাতে সই করতে হবে আপনাকে। আজ ভোরে আমাদের জানানো হয়েছে। আমি বলেই এত তাড়াতাড়ি সব রেডি করতে পারলাম—নিন, সই করুন!’

‘আগাম জামিন আমি কেন নেব?’

‘আচ্ছা লোক তো! আগাম জামিন নিলে পুলিশ আপনাকে অ্যারেস্ট করতে পারবে না। লড়াই করার সময় পাবেন। আশ্চর্য, আপনি আগাম জামিন নেবেন আর নিজেই সেটা জানেন না! সময় নষ্ট না করে সই করুন।’

অনেকগুলো সই করতে হল। কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে সুনীল গুপ্তা বললেন, ‘শুনুন। আমাদের বক্তব্য হবে, আপনি সেইদিন হোটেল গিয়েছিলেন ব্যবসার ব্যাপারে শোভনলালের সঙ্গে কথা বলতে। সেখানে চা খেয়েছেন। কথাবার্তা ভালভাবেই শেষ হয়েছিল। শোভনলাল আপনাকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। হোটেল থেকে বেরিয়ে আপনি সিংলা চলে যান। দিল্লিতে কি হয়েছে তা জানেন না। আপনি সিংলার যে গেস্টহাউসে ছিলেন তার বিল সাবমিট করছি। ফিরে এসে পুরনো কাগজে খবরটা পড়েন। আপনার আশঙ্কা হচ্ছে, যেহেতু খুনের দিন আপনি হোটেল গিয়ে শোভনলালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তাই পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে—এর ফলে আপনার সম্মানহানি হবে, এই কারণে আপনি

কোর্টের কাছে আগাম জামিন চাইছেন।' সুনীল গুপ্তা একটু চূপ করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'যা বললাম তা মনে রাখতে পারবেন?'

নীলবে মাথা নাড়ল অতীশ, 'হ্যাঁ'।

সুনীল গুপ্তা নেমে গেল গাড়ি থেকে।

অতীশ চূপচাপ বসে রইল। ড্রাইভার এবং তার সঙ্গী খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুজন পুলিশ অফিসারকে হেঁটে যেতে দেখল সে। ওরা এদিকে ডাকাল না। এখন তার আগাম জামিন হয়নি, এ সময় ওকে গ্রেফতার করলে কিছুই করতে পারবে না যশোবন্ত। কিন্তু এত কাণ্ড যশোবন্ত তার জন্যে করল অথচ নিজে এল না?

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সুনীল গুপ্তাকে হস্তদস্তভাবে আসতে দেখল সে, 'চলুন!' অতীশ গাড়ি থেকে নামতেই ড্রাইভারের সঙ্গী তার পিছনে চলে এল।

অতীশের অন্তর্ভুক্তি হচ্ছিল। তার নিরাপত্তার কারণে না তাকে নজরে রাখার জন্যে লোকটা ওইভাবে হটছে তা সে জানে না। যশোবন্তের সন্দেহ আছে বোধহয়, সে পালিয়েও যেতে পারে। সুনীল গুপ্তা ওকে প্রায় জনমানবশূন্য কোর্টরুমে নিয়ে এল। দুজন কর্মচারী বসে আছে অলসভাবে। সামনের বেঞ্চগুলো ফাঁকা। একটু বাদেই মুসেফ এলেন। কর্মচারীরা উঠে দাঁড়িয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে ওরাও উঠল। মুসেফ কোনদিকে না তাকিয়ে সামনে রাখা ফাইল খুললেন। একবার নজর বুলিয়ে চোখ তুলতেই সুনীল গুপ্তা তার বক্তব্য পেশ করল।

মুসেফ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এফিডেবিট?'

হ্যাঁ স্যার, করা হয়ে গেছে।' সুনীল গুপ্তা জবাব দিলেন, 'ফাইলেই আছে।'

মুসেফ বললেন, 'এ ক্ষেত্রে আগাম জামিন দেওয়া হল। অর্ডার পরে নিয়ে যাবেন।'

সুনীল গুপ্তা বললেন, 'ধন্যবাদ স্যার।'

বাইরে বেরিয়ে এসে অতীশ জিজ্ঞাসা করল, 'আমি তো কোনও এফিডেবিট করিনি?'

'করেছেন। অতগুলোই সই করলাম কি জন্যে? এ নিয়ে আপনি দয়া করে মাথা ঘামাবেন না। যান।' করিডোরে তাকে ছেড়ে দিয়ে সুনীল গুপ্তা চলে গেল।

এতক্ষণ বাদে নিজেকে হালকা মনে হচ্ছিল অতীশের। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারবে না। কি করে এই হুকুম এত তাড়াতাড়ি পাওয়া গেল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সত্যি তার কোনও দরকার নেই। কলকাতার হাইকোর্টে অ্যান্নিকেশন করলে কেন এনলিস্টেড হতে তো বেশ সময় লাগে। এখানে হয়তো তাড়াতাড়ি হয়।

'চলুন সাব্।'

লোকটির অস্তিত্ব খোয়ালে ছিল না। এবার সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায়?'

'গাড়িতে। মালিক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'মালিক? যশোবন্ত কি দিল্লিতে এসেছে?'

'হ্যাঁ। আসুন।'

অতএব যেতে হল। এখন সে শর্তসাপেক্ষে স্বাধীন। এই শর্ত কোর্টের কাছে যতটা, তার ডের বেশি বোধহয় যশোবন্তের কাছে।

গাড়ি তাকে নিয়ে এল পুসা রোডের একটা গেস্টহাউসে। লোকটি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতেই যশোবন্তকে দেখতে পেল। সে একা নয়, আর এক ভদ্রলোক বসে আছে। যশোবন্ত হৈ-হৈ করে উঠল, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম! গুণ দেখে বুঝতে পারছি রাতে ঘুম হয়নি। আরে ওইরকম জ্বালাময়ী মহিলা পাশে থাকলে কোনও পুরুষমানুষ ঘুমাতে পারে না। সকালে তো ব্রেকফাস্টও হয়নি। যা, স্নানটান করে একেবারে লাগ্ন খেয়ে নে। তারপর লম্বা ঘুম দিয়ে ফ্রেশ হয়ে কাজ শুরু করা যাবে।' যশোবন্ত এমন ভঙ্গিতে কথা বলল যেন সে তার ছেলের সঙ্গে কথা বলছে।

অতীশ বলল, 'আজ কোর্টে—।'

'ওসব কথা বিকেলে হবে। তাকে যা বললাম তাই কর্।' বাধা দিল যশোবন্ত।

যশোবন্তের প্রতিটি নির্দেশ অবহণ মান্য করল অতীশ। খাওয়াদাওয়ার পর বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করে

জানতে পারল, যশোবন্ত বেরিয়ে গেছে। বিছানায় শোওয়ামাত্র ঘুম এসে গেল। টেনশনে এবং পরিশ্রমে শরীর কাহিল হয়ে পড়েছিল খুব।

বিকলে ঘুম ভাঙামাত্র মনে হল যে আত্ম মুক্ত। আগাম জামিন নেওয়া থাকলে পুলিশ কিছু করতে পারে না। তাহলে এখন কলকাতায় ফোন করা যেতে পারে। ঘরেই টেলিফোন ছিল। রিসিভার তুলে নাম্বার ঘোরাতে না ঘোরাতেই শুনতে পেল, এস টি ডি করার সুবিধে এই টেলিফোনে পাওয়া যাবে না।

একটু হতাশ হল সে। তাহলে বাইরে বেরিয়ে কোনও বুথ থেকে করতে হয়। জামাকাপড় পালটে নিল সে। স্যুটকেসটা বন্ধ করে সে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল বেয়ারা চা নিয়ে আসছে। অতএব চায়ের জন্যে বসতে হল। কাপ হাতে নিয়ে সে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এস টি ডি বুথ কাছাকাছি আছে?'

'হ্যাঁ স্যার, গেটের পাশেই।'

চা শেষ করে সে বাইরে বের হল। না কেউ পাহারায় নেই। তাহলে তাকে পাহারা দেবার জন্যে নয়, তার নিরাপত্তার জন্যেই যশোবন্ত লোক রেখেছিল। বুথ চুকে কলকাতার নাম্বার ডায়াল করল সে। টেলিফোন বাজছে, বনানীর গলা শুনতে পেল সে, 'হ্যালো!' টোক গিলল অতীশ। বনানীর গলা একটু চড়ল, 'হ্যালো?'

'বনানী, আমি বলছি।'

ওপাশ থেকে কোনও কথা এল না। বনানী একদম চূপচাপ।

'আমি এতদিন তোমাকে ফোন করার সুযোগ পাইনি। আত্ম আগাম জামিন পেয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই সব শুনেছ। কিন্তু কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল তা তুমি জানো না—বনানী, হ্যালো, বনানী।'

'আমি কোনও কিছু জানতে চাই না।' বনানী কেটে কেটে বলল।

'কিন্তু তুমি আমাকে ভুল বুঝে না, প্রীত!'

'আমি টেলিফোনে কোনও কথা শুনতে চাই না। তোমার যদি কিছু বলার থাকে তাহলে সামনে এসে বলো। আমি রেখে দিচ্ছি।' বনানী রিসিভার রেখে দিল, কিন্তু লাইনটা ডেড হয়ে গেল না। অতীশ বুঝতে পারছিল লাইনে উলটো দিকে কেউ আছে। সে দুবার হ্যালো বলল। তারপর রিসিভার নামিয়ে বেগে বিন মিটিয়ে দিল। এতক্ষণে তার মনে হল বাড়িতে টেলিফোনে নিশ্চয়ই কেউ আড়ি পেতেছে। সেটা পুলিশ ছাড়া আর কে করবে? বনানীর ব্যবহারে বুকে যে বাষ্প জমেছিল মুহূর্তেই তা উধাও হয়ে গেল। বনানী নিশ্চয়ই জানে বাড়িতে টেলিফোনে আড়িপাতা হচ্ছে। তাই তাকে বাঁচাতে সে কথা বাড়িতে চায়নি। টেলিফোনে কথা না বলে সামনাসামনি বলতে বলা মানে তো তাই। সে যদি সত্যি কথা বনানীকে টেলিফোনে বলত, তাহলে পুলিশ সেটা রেকর্ড করে স্টেটমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করত। উঃ, খুব বাঁচা বেঁচে গেছে সে। বনানীর কাছে কৃতজ্ঞ হল এবার।

গেটহাউসে ঢুকতেই গাড়িটা চলে এল। সামনে দেহরক্ষী, পেছন থেকে যশোবন্ত নামল। নেমেই চিৎকার করল, 'একি! তুই কোথায় গিয়েছিলি?'

'টেলিফোন করতে।'

'টেলিফোন? কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'মাই গড! তোর বাড়ির ফোনের ওপর পুলিশ ওয়াচ রাখছে—প্রতি কথা রেকর্ড করা হচ্ছে—তুই এটা কি করলি?'

অতীশ তাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলতে শান্ত হল যশোবন্ত, 'নাঃ, তোর বউ-এর বুদ্ধি আছে—তোর থেকে অনেক বেশি বুদ্ধি। কিন্তু পুলিশ এতক্ষণে জেনে গেছে তুই কোথেকে ফোন করেছিস—গাড়িতে ওঠ, বেয়ারা সাহেবের স্যুটকেস দিয়ে যাও।'

'কোথায় যাচ্ছি?'

'চল না।'

'আশ্চর্য, পুলিশ জানলে অসুবিধে কোথায়? আমাকে তো অ্যারেস্ট করতে পারবে না, ভয় পাওয়ার কি আছে?' প্রতিবাদ করল অতীশ।

'ভয় নয়—বল সবসময় নিজের কোর্টে না রেখে অন্যের কোর্টে ফেলে দেখতে হয় সে কি ভাবে খেলে! রিভলবারটা কোথায়?'

‘সুটকেসে।’

ততক্ষণে বেয়ারা সুটকেস পৌঁছে দিয়েছে গাড়িতে। গাড়ি চলতে শুরু করলে যশোবন্ত শান্ত গলায় বলল, ‘আমরা এখন থানায় যাচ্ছি।’

‘থানা!’ প্রায় চিৎকার করে উঠল অতীশ।

‘হ্যাঁ। তোর কোনও ক্ষতি তো এখন পর্যন্ত হয়নি—হয়েছে?’

‘কিন্তু থানায় গিয়ে আমি কি করব?’

‘বসে থাকবি।’

থানার সামনে গাড়ি দাঁড়াল। যশোবন্ত তার দেহরক্ষীকে নির্দেশ দিল গাড়িতেই বসে থাকতে। ওরা থানায় ঢুকল। সোজা ওসি-র ঘরে।

ওসি-র সামনে তখন দুজন লোক। ভদ্রলোক যশোবন্তকে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন, ‘আরে, কি আশ্চর্য! আপনি? হঠাৎ?’

‘একটু ভুল্লরি তাই নিজেই এলাম।’ যশোবন্ত কাঁধ ঝাঁকাল।

সঙ্গে সঙ্গে ওসি লোকদুটোকে বলল, ‘আপনারা একটু বাইরে অপেক্ষা করুন, ব্লীজ!’ একজন কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু ওসি হাত নাড়লেন, ‘না, পরে বলবেন। ব্লীজ, যান।’

ওরা চলে গেলে যশোবন্ত চেয়ার টেনে বসে অতীশকে ইশারা করল বসতে। ওসি নিজের চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করল, ‘বলুন কি করতে পারি?’

‘কয়েকদিন আগে চণ্ডীগড়ের শোভনলাল নামের যে লোকটা এখানকার হোটেল খুন হয়েছিল সেই কেসের কি অবস্থা?’ যশোবন্ত প্রশ্ন করল।

‘ওটা কাপুর সাহেব দেখছেন। উনি একজন বাঙালিকে সন্দেহ করছেন। ওই লোকটা গা-ঢাকা দিয়েছে। কলকাতা থেকে সেদিন দিমিত্তে এসেছিল, কিন্তু আর কলকাতায় ফিরে যায়নি।’ ওসি জানালেন।

যশোবন্ত হাসল, ‘উনি গা-ঢাকা দেননি। এখান থেকে সিমলায় গিয়েছিলেন বেড়াতে। ফিরে এসে ঘটনাটা জানতে পারেন। সিমলাতে উনি আমার গেস্টহাউসে ছিলেন—আপনাদের ধারণাটা ঠিক নয়।’

‘আপনি লোকটাকে চেনেন?’

‘নিশ্চয়ই। এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি অতীশ রায়, যাকে আপনি এবং আপনার কাপুর সাহেব খুঁজে বেড়াচ্ছেন।’

‘সেকি?’ ওসি উদ্বেজিত হয়ে সোজা হলেন, ‘আপনি অতীশ রায়?’

‘হ্যাঁ।’

‘শোভনলালকে মার্ভার চার্জে আপনাকে আমরা খুঁজছি। আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন? এক মিনিট—’

ওসি কি করবেন ঠাওর করতে না পেরে টেলিফোনের নাম্বার ঘোরাতে আরম্ভ করলেন, যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি অত উদ্বেজিত হচ্ছেন কেন?’

ওসি জবাব দিলেন না। লাইন পাওয়ায় চুপে উঠলেন, ‘স্যার, শর্মা বলছি, শোভনলাল মার্ভার কেসের অতীশ রায়কে পাওয়া গিয়েছে। হ্যাঁ স্যার, আমার সামনেই বসে আছে—হ্যাঁ।’ রিসিভার নামিয়ে রেখে রুমালে মুখ মুছে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইনি সেই অতীশ রায় তো?’

‘আপনারা এখনও কলকাতা থেকে ছবি আনাননি?’

‘ও হ্যাঁ! তাই তো! ওসি উঠে আলমারি থেকে একটা ফাইল বের করে সেটা খুলে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিলেন। ওটা নিয়ে টেবিলে ফিরে এসে বললেন, ‘আপনাকে অনেক ধন্যবাদ যশোবন্তজী। তবে আপনি যদি ওঁকে এখানে না নিয়ে এসে আমাদের বাইরে কোথাও যেতে বলতেন, তাহলে—বুঝতেই পারছেন, আমাদের দামটা বাড়ত।’

‘তবে আপনি এমনিতেই বা মূল্যবান—দয়া করে আর দাম বাড়াবেন না!’

কয়েক মিনিটের মধ্যে ঝড়ের মত ঘরে ঢুকলেন কাপুর সাহেব। চুপে চেয়ার ছেড়ে ওসি সারো দাঁড়ালেন। যশোবন্তকে গ্রাসা না করে অতীশের সামনে দাড়িয়ে কাপুর ইংরেজিতে প্রশ্ন করল, ‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’

‘সিমলায়।’ অতীশের গলা শুকিয়ে কাঠ।

‘সিমলা।’

‘হিলটপ গেস্টহাউস।’ যশোবন্ত জবাব দিল।

‘আপনি এখানে?’

ওসি বললেন, ‘উনি মিস্টার যশোবন্ত সিং। বিখ্যাত ব্যবসায়ী। অনেকগুলো হোটেলের মালিক। বড়সাহেবও ওঁকে ভালভাবে জানেন।’

‘আমি ওঁকে চিনি। লুধিয়ানায় ওঁর হোটеле আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিন্তু আপনি কি করে জানলেন এই লোকটি সিমলার হিলটপে ছিল?’

‘কারণ ওই গেস্টহাউসটা আমারই।’

‘আই সি! মিস্টার রায়, শোভনলালকে মার্ডার করার অভিযোগে আপনাকে আমরা গ্রেফতার করছি। অফিসার—।’ কাপুর ওসি-র দিকে তাকালেন।

যশোবন্ত বলল, ‘এক মিনিট—অভিযোগটা কে করেছে?’

‘তার মানে?’ কাপুরের কপালে ভাঁজ পড়ল।

‘আপনি বললেন মার্ডার করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছেন, নিশ্চয়ই কেউ ওই অভিযোগ করেছে—তাই তো?’

‘না, সেটা কেউ করেনি এখন পর্যন্ত। তবে ঘটনাগুলো প্রমাণ করছে ইনি ওই খুন করেছেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে কোনও কৈফিয়ত দিতে আমি রাজী নই। আপনাদের যা বলার কোর্টে গিয়ে বলবেন।’

‘কিন্তু কোর্টে আপনাদের নিষেধ করেছে ওকে অ্যারেস্ট করতে।’

‘তার মানে?’

‘মিস্টার রায় আগাম জামিন পেয়ে গেছেন।’ যশোবন্ত অর্ডারের জেরপ্ত কপি বের করে কাপুরের হাতে দিল।

কাপুরের মুখের চেহারা বদলে গেল, ‘আ-চ-ছা! আপনারা দেখছি—। ওয়েল, আমি কোর্টে মুক্ত করব। এইভাবে যদি খুনীকে কোর্ট আগাম জামিন দিয়ে দেয়—।’

‘মিস্টার কাপুর! আপনি বোধহয় ঠিক বলছেন না, একজন দায়িত্ববান সরকারি অফিসার হয়ে আপনি কোর্টকে সমালোচনা করতে পারেন না—সেটাও অপরাধ।’

কাপুর তাকাল। তারপর ওসি-র খালি চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, ‘আপনারা তাহলে কি কারণে এখানে এসেছেন?’

যশোবন্ত হাসল, ‘আমরা কেউ জানতাম না এখানে ওই কাণ্ড হয়েছে। রায় হোটেল গিয়ে শোভনলালের সঙ্গে দেখা করেছিল। ব্যবসা-সংক্রান্ত কথাবার্তা হয়। চা খায়। শোভনলাল ওকে লিফট পর্যন্ত এগিয়েও দেয়। ওখান থেকে বেরিয়ে বাসে চেপে রায় চলে আসে চণ্ডীগড়ে। সেখান থেকে সিমলায়—’

কাপুর গর্ভে উঠল, ‘মিথ্যে কথা। উনি ট্রেনে উঠেছিলেন। রাত্রে ট্রেনে উঠেছিলেন। রাত্রে ট্রেনে ওঁর দুই সহযাত্রী আমাকে সেকথা বলেছে। উনি নামেন লুধিয়ানায়। হলিডে হোটলে ডি রায় নামে রুম বুক করেন। সেখানে ওই ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা উঠেছিলেন। ওঁরা ওকে ওই হোটলে দেখেছেন। আমি এটা প্রমাণ করে দেব।’

যশোবন্ত নিচু গলায় বলল, ‘মানুষমাত্রই ভুল করে।’

কাপুর জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি জানেন যে আপনার হোটলে উঠেছিল?’

‘হ্যাঁ, স্যার।’

‘এখন বুঝতে পারছি আপনার হোটেলের লোকজন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করছিল না কেন? আপনি ওকে বাঁচাতে চাইছেন।’

যশোবন্ত বলল, ‘কাপুর সাহেব, আমার ক্ষমতা কতটুকু যে আপনার হাত থেকে ওকে বাঁচাবো! আচ্ছা ধরা যাক, হোটেল থেকে বেরিয়ে ও দিল্লি শহরটা ঘুরে বেরিয়ে রাত্রে ট্রেনে লুধিয়ানায় গিয়েছিল। উঠেছিল আমারই হোটলে। সেখান থেকে আমরা সিমলায় চলে যাই—এতে অনায়াস কোথায়?’

‘আশ্চর্য!’ কাপুর অবাক হয়ে গেল।

‘আপনি যেদিন আমার হোটলে এসেছিলেন সেদিন একজন হোটেলমালিক হিসেবে যে ব্যবহার করা

উচিত তাই আমি করেছিলাম। পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে হোটেল ব্যবসা চালানো যায় না। কিন্তু আমি আজ এখানে এসেছি ওর বন্ধু হিসেবে। যাকগে, ও আগাম জামিন পেয়েছে। তাই বলে ভাববেন না যে ও পালিয়ে যাবে। কেউ যদি এর মধ্যে ওর বিরুদ্ধে ঠিকঠাক অভিযোগ করে, তাহলে আপনি কোর্টে মুক্ত করবেন। আমরা কনস্টেট করব না। তবে দয়া করে কাউকে সাজিয়ে অভিযোগ লেখাবেন না।’

‘তার মানে?’

‘শোভনলালের আত্মীয়স্বজন অথবা খুন হতে দেখেছে এমন কেউ এই অভিযোগ করলে আমরা মেনে নেব—আপনি কদিন সময় চান?’

‘উনি এখন কোথায় আছেন?’

‘আপাতত আপনার এই থানায়। আমি আপনার শান্তির জন্যে একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। ও এই সাতদিন এখানেই থাকুক। যদি লকআপে রাখতে চান, তাহলে দয়া করে আলাদা, একা রাখবেন। খাবারদাবার আমার লোক পৌঁছে দেবে। আপনার চোখের ওপর রইল। পানাবার কোনও চাপ পাবে না। সাতদিনের মধ্যে যদি আপনি সলিড কোনও প্রমাণ না পান বা কেউ যদি অভিযোগ জানাতে না আসে, তাহলে রায়কে আপনি ছেড়ে দেবেন—ও কে?’ যশোবন্ত উঠে দাঁড়াল।

অতীশ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। যশোবন্তের প্রস্তাবে সে আঁতকে উঠল, ‘লক-আপেই যদি ঢুকতে হয় তাহলে আগাম জামিন নিয়ে কি লাভ হল?’

কাপুর মাথা ন্যড়ল, ‘আপনি আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছেন মিস্টার সিং। এখন ওঁকে লক-আপে রাখলে আদালত অবমাননার দায়ে আমি পড়ব। কিন্তু উনি থানায় থাকবেন—এই ঘরে—রাত্রে শোওয়ার একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দেওয়া হবে।’

‘অনেক ধন্যবাদ মিস্টার কাপুর।’ অতীশকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে যশোবন্ত বেরিয়ে গেল।

কাপুর অতীশের দিকে তাকাল, ‘মিস্টার রায়, শোভনলালকে আপনি কেন খুন করলেন?’

‘আমি খুন করিনি।’

‘যে রিভলবার দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিলেন সেটা কোথায়?’

‘আমি কি করে জানব।’ উত্তরটা দিয়েই বুকের ভেতর ছাঁক করে উঠল। এখন যদি যশোবন্ত তার লোক দিয়ে স্যুটকেসটা এখানে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে ওটা সার্চ করলেই কাপুর রিভলবার পেয়ে যাবে।

কাপুর বলল, ‘আমি আপনার সব খবর জেনেছি রায়। আপনি অত্যন্ত ভদ্রলোক। আপনার স্ত্রীও সবাব প্রশংসা পান। আপনার মত লোক কি করে এমন কাজ করলেন?’

‘আমি কোনও কাজই করিনি।’

‘শোভনলালের ব্রিফকেসে যে টাকা ছিল আপনি জানতেন না?’

‘না।’

‘তাই ওটা ট্রেনের দরজা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন?’

‘দরজা দিয়ে কেন?’

‘জানলা দিয়ে ফেলা যায় না। আপনি এসি কোচে ছিলেন।’

‘এসব আমার জানা নেই।’

‘কিন্তু আমরা জানব। আজই।’ কাপুর উঠে পড়ল। ওসি-কে বাইরে নিয়ে গিয়ে কিছু বলে বেরিয়ে গেল। ওসি ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। হেসে বললেন, ‘আপনার বন্ধু দারুন লোক। তবে মুশকিল হল, কাপুর সাহেব মচকাবে তবু ভাঙবে না। মিস্টার রায়, আমার কোনও কিছু দরকার নেই—শুধু রিভলবারটা—, ওটা চাই।’

অতীশ অবাক হবার ভান করল, ‘কোন রিভলবার?’

ওসি ভিত্তে আলতো শব্দ করলেন, ‘ঠিক আছে, ওটা যশোবন্তজীর সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব।’ এইসময় প্রথমে বসা লোকদুটো ঢুকল।

একজন বলল, ‘অনেকক্ষণ বসে আছি স্যার।’

‘আমার কিছু করার নেই মিস্টার আগরওয়াল।’

‘এসব বলে আমাকে ভোলাতে পারবেন না। এর আগে আপনাকে দশ হাজার দিয়েছি, আর কত দিতে হবে বলুন—ঝামেলা শেষ হয়ে যাক।’

ওসি চকিতে অতীশের দিকে তাকান, 'রায়, আপনি একটু বাইরে যান।'

'কেন?' অতীশের হঠাৎ মজা লাগল।

'এরা একটু প্রাইভেট কথা বলতে চাইছেন।'

'উনি তো বলেই দিয়েছেন, আগে দশ হাজার—।'

'আপনি বাইরে যাবেন কিনা?' ধমকে উঠলেন ওসি।

'কি করে যাই বলুন? কাপুর সাহেব অর্ডার করে গেছেন আমাকে এই ঘরে থাকতে হবে। আদেশ কি করে অমান্য করি বলুন! বেশ, ওঁকে ফোন করুন—উনি যদি বলেন তাহলে নিশ্চয়ই যাব।'

ওসি বললেন, 'আচ্ছা টেটিয়া লোক তো!'

থানায় রাত কাটানোর কোনও অভিজ্ঞতা অতীশের ছিল না। একটার পর একটা কেস আসছে। কেউ আসামী—কেউ অভিযোগকারী। অভিযোগ মানেই পরস। যে অভিযোগ করছে তাকেও যেমন টাকা দিতে হচ্ছে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ নে-ও দিতে বাধ্য হচ্ছে। প্রথম দিকে একটু সন্কোচ ছিল অতীশের জন্যে—চোখের সামনে একটা লোক শিবের মত বসে আছে, সব কথা আলোচনা করতে হচ্ছে ঠারঠারে, এটা কতক্ষণ পারা যায়! তা শেষপর্যন্ত ওই চোখের পর্দা সরে গেল। বড়বাবু বাড়ি গেলে মেজবাবু এলেন—তার কোনও সন্কোচ নেই।

সাত-সাতটা দিন কিছুকাল কাটবে ভেবে পাচ্ছিল না অতীশ। নিজেকে বলির পাঠার মত মনে হচ্ছিল। যে কোনও মুহূর্তে কেউ একজন এসে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে আর তার বারোটা বেঞ্চে যাবে! এই যে সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকা, তা সামান্য কমল একের পর এক মানুষের আনাগোনা। তাকে শুতে দেওয়া হয়েছিল একটা খাটিয়ায়। ছাব্বোপোকার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে প্রথম রাতটা কাটল। যশোবন্ত তার লোক দিয়ে নতুন জামা গেঞ্জি তোয়ালে পাঠিয়েছিল। খাবার টিফিন-কারিয়ায়ে। কিন্তু দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম পাঠায়নি। পরদিন সকাল থেকেই অস্বস্তি।

সকাল দশটায় কাপুর এল, সঙ্গে কিষেনলাল।

কাপুর জিজ্ঞাসা করল, 'দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা?'

কিষেনলাল বলল, 'আরে হ্যাঁ, ইনিই তো। রায় রায়, আপনাকে দেখে তো মশাই আমার খুনী বলে মনেই হয়নি। একজন খুনীর সঙ্গে হোলনাইট একটা কুপেতে ট্রাভেল করেছি ভাবলেই—।' মাথা নাড়ল লোকটা।

অতীশ প্রতিবাদ করল, 'আপনি আমার বিরুদ্ধে এই প্রচার করেছেন?'

'মানে?' কাপুর জিজ্ঞাসা করল।

'কোনও প্রমাণ আদালতে দাখিল না করে আপনি আমাকে খুনী বলেন কি করে?'

সঙ্গে সঙ্গে কিষেনলাল বলল, 'আরে। আপনি তখন বললেন, রায়বাবু খুন করে দিল্লি থেকে পালিয়েছিল, তাই আমি বললাম।'

'কথটা উনি বলেছেন, আমি না।' কাপুর জবাব দিল।

সঙ্গে সঙ্গে কিষেনলালের স্টেটমেন্ট রেকর্ড করল। কিষেনলাল বলল, 'দির্ঘ স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার একটু আগে যে লোকটা তার কুপেতে ঢুকেছিল তাকে বেশ নার্ভাস লাগছিল।'

অতীশ বলে উঠল, 'যে কেউ নার্ভাস হবে। কুপেতে ঢুকে যা দৃশ্য দেখেছিলেন!'

কাপুর জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখেছিলেন?'

'উনি ওই চেহারা নিয়ে একটি সুন্দরী মহিলাকে চুমু খেয়েই যাচ্ছিলেন। আমি যে ঢুকেছি তা কেয়ারই করছিলেন না।'

কিষেনলাল হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'আরে। এ তো অদ্ভুত মানুষ! আমি আমার স্ত্রীকে চুমু খাবো কি খাবো না তাতে আপনার কি? আপনার পারমিশান নিয়ে খাবো?'

'পাবলিক প্লেসে আপনি ওই কাজ করতে পারেন না।'

'পাবলিক প্লেস! এসি ফার্স্ট ক্লাসের কুপে পাবলিক প্লেস হল? যে কোনও বেডরুমের থেকে ওটা প্রাইভেট।' ভোর গলায় বলল কিষেনলাল।

কাপুর বললেন, 'রায়, আপনি বাধা দেবেন না। বলুন আপনি।'

কিষেনলাল বলল, 'আর কি বলব। আলাপ হবার পর ড্রিঙ্ক অফার করেছিলাম, বেশি খাননি। মাঝেমধ্যেই টয়লেটে যাচ্ছিলেন। কথা কম বলছিলেন। তারপর আমার থার্ড ওয়াইফ বলল উনি একই হোটেল আছেন। আমি আমার ঘরে ইনভাইট করলাম। সেখানেও ড্রিঙ্ক করেননি।'

'কি কথা হয়েছিল?' কাপুর জিজ্ঞাসা করল।

'ড্রিঙ্ক করার সময় যে কথা হয় তা আমি পরের দিন মনে রাখতে পারি না। তবে এটা মনে আছে, ঐকে খুব ডিস্টার্বড লাগছিল।'

'আপনার স্ত্রীর মনে আছে?'

'থাকতে পারে। আমি তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'আপনার স্ত্রীর শরীর কবে ঠিক হবে?'

'সে আমি কি করে বলব বলুন! আজ সকাল অবধি কিছু বলেনি। আপনি যাওয়ার পরই শরীর বিগড়ে গেল।'

'মিস্টার কিষেনলাল! আমি এই ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে যদি আপনার বাড়িতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বনি, তাহলে আপনার আপত্তি হবে?'

'একি বলছেন? এটা তো আমাকে জিজ্ঞাসা না করেও আপনি করতে পারেন!'

স্টেটমেন্টে সই করিয়ে একটা ছোট টেপেরকর্ডার নিয়ে কাপুর বলল, 'চলুন আপনাকে একবার ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাব।'

অতীশ প্রথমে ভাবল প্রতিবাদ করবে। তারপর রাজী হল। সুধা অনুস্থ, না, অনুস্থতার অভ্যুত্থান দেখিয়ে এখানে আসেনি? একমাত্র সুধাই বলতে পারে সে তার হাতে ত্রিফকেন্স দেখেছে। সে তাকে সাহায্য করবে বলেছিল, সামনে দেখলে কি বিপদে ফেলতে চাইবে? সেইজন্যই তার যাওয়া উচিত।

প্রমাণের কোনও রাস্তা খোলা নেই। কাপুর একটু দিশেহারা অবস্থায় এখন। তার ওপর বড় সাহেব আজ সকালেই তাকে ঝঁপিয়ে করেছেন যশোবন্ত সিং সম্পর্কে। ওই লোকটা নাকি মন্ত্রীদের কাছেও চলে যেতে পারে। খবর নিয়ে কাপুর জেনেছে রায়ের আগাম জামিনের জন্যে কালই প্রথম কোর্টে মুক্ত করা হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তা পেয়েও যায়। এই ব্যাপারটা সত্যি বিশ্বয়কর! অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝে গিয়েছে, এই রায় লোকটা বেশ নার্ভাস টাইপের। ওর কোনও ক্ষমতা নেই। যশোবন্তের মদত ছাড়া ও এক পা চলেতে পারবে না। একজন বড় শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার মধ্যে বেশ উত্তেজনা আছে কিন্তু পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একাংশ যশোবন্তের হয়ে ইতিমধ্যে যে গান গাইতে শুরু করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রমাণ নেই—খুন করতে কেউ দ্যাখেনি। শোভনলালের ত্রিফকেন্স নিয়ে হোটেল থেকে কেউ যদি ওকে বের হতে দেখত তাহলেই হয়ে যেত। কিষেনলালকে জিজ্ঞাসা করলেই বলছে তার কিছুই মনে পড়ছে না। এখন কাপুরের মনে হচ্ছে, কিষেনলালের স্ত্রীই একমাত্র ভরসা। লুধিয়ানার হোটেল ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে বেশ রহস্য করে কথা বলেছেন। আমার স্বামী ড্রিঙ্ক করে ঘুমিয়ে পড়লে আপনি কি করতেন? এই প্রশ্ন যে মহিলা করতে পারেন তিনি খুব সাধারণ নন। ত্রিফকেন্স হাতে উনি নিশ্চয়ই রায়কে দেখেছেন—যে করেই হোক ওঁর স্টেটমেন্ট চাই।

কিষেনলালের বাড়িতে পৌঁছে বাইরের ঘরে বসে সুধাকে খবর পাঠানো হল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করার পর কিষেনলাল নিজেই গেলেন ভেতরে। এবার সুধা এল, ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল, 'আরে মিস্টার রায়, আপনি?'

কিষেনলাল পেছনে ছিল। বলল, 'তোমাকে তো বললাম, ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে মার্চার চার্জ! অফিসার তোমার স্টেটমেন্ট চায়!'

অতীশ বলল, 'সরি মিস্টার কিষেনলাল! আমাকে অ্যারেস্ট করা হয়নি।'

কাপুর এসব কথায় কান না দিয়ে বলল, 'গ্যাডাম, আপনার শরীর খারাপ—আপনাকে ডিস্টার্ব করছি বলে দুঃখিত। রায়কে আপনি চেনেন, ওঁকে প্রথম কোথায় দেখেছিলেন?' টেপেরকর্ডার অন করল সে।

'ট্রেনে।'

'তখন ওর সঙ্গে কি ছিল?'

'ওঁর হাতে স্ট্রিকেন ছিল।'

‘আর কিছু? মনে করার চেষ্টা করুন। একটা ব্রিফকেস—মনে পড়ছে?’

কাপুর বেশ উত্তেজনা নিয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

সুধা তাকান অতীশের দিকে। তারপর বলল, ‘ব্রিফকেস!’

‘হ্যাঁ।’ কাপুর বলল।

এক-দুই-তিন, সেকেন্ডগুলো যেন গোটা পৃথিবীর নিঃশ্বাস আটকে রাখছে বলে মনে হল অতীশের। শেষ পর্যন্ত মাথা নাড়ল সুধা, ‘না, মনে পড়ছে না।’

কিষেনলাল বলল, ‘তখন কি জানতাম পরে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন তা হলে ঠিক দেখে মনে রেখে দিতাম।’

কাপুর খুব হতাশ হল, ‘তার মানে আপনি বলতে চাইছেন ব্রিফকেস ওঁর হাতে থাকলেও থাকতে পারে, আপনি মনে করতে পারছেন না! বেশ, আপনার স্বামী বলেছেন, উনি যখন উঠে টয়লেটে গিয়েছেন, তাই তো?’

‘হ্যাঁ।’

‘তখন কি ব্রিফকেস নিয়ে বেরিয়েছেন, খালি হাতে ফিরেছেন, ভেবে দেখুন!’

‘নাঃ, ওঁর হাতে ব্রিফকেস ছিল না।’

কাপুর এবার সত্যি হতাশ হল। গভীর গলায় বলল, ‘সে রাতে ঠিক কি কি হয়েছিল, মানে উনি কি কি করেছিলেন সেটা বলুন।’

‘উনি যখন কুপেতে ঢুকলেন তখন আমার স্বামী একটু বাড়াবাড়ি করছিলেন। আমি ওঁর তৃতীয় স্ত্রী বলেই বাড়াবাড়ি।’ হাসল সুধা।

অতীশ বলল, ‘কাপুর সাহেব, জিজ্ঞাসা করুন, আগের দুটো বিয়ে ডিভোর্স হয়েছে কিনা, নইলে এটা হাইলি ইন্টারেস্টিং!’

‘ওটা আপনার বিষয় নয়। আপনি চুপ করুন।’

‘উনি এলেন। কিষেনলালজী আলাপ করলেন। আমার মনে হল লোকটি বেশ গভীর। কথা বলতে ইচ্ছুক নন। ওকে হাইকি অফার করা হল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা নিলেন। কিষেনলালের সেস একটু বেশি মদ পড়লেই চলে যায়। সে রাতেও গিয়েছিল। মাঝে দু-তিনবার বাইরে গিয়েছিলেন। আমার একার পক্ষে কিষেনলালের শরীর ঠিক করে শুইয়ে দেওয়া সম্ভব নয় বলে উনি সাহায্য করেছিলেন। তারপর আমাকে অবাক করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।’ সুধা বলল।

‘অবাক করে কেন?’ কাপুর জানতে চাইল।

‘মদের প্রাণ হাতে বেশীভাগ পুরুষ এমন পরিস্থিতিতে কাজে লাগায়। উনি ভদ্রলোক বলে কাজে লাগাননি। সকালে স্টেশনে নেমে উঠাও হয়ে যান—ব্যাস!’

আরও কিছু প্রশ্ন করার পরেও তেমন কোন তথ্য পেল না কাপুর। তারপর সে সরাসরি জিজ্ঞাসা করল, ‘কিষেনলালজী, আপনি তিনটে বিয়ে করেছেন? এগুলো কি আইনসম্মত?’

‘বিলকুল।’ কিষেনলাল মাথা নাড়লেন।

‘আগের স্ত্রীদের আপনি ডিভোর্স করেছেন?’

‘আমার প্রাইভেট ব্যাপারে আপনি হাত দিচ্ছেন কেন স্যার?’

‘প্রাইভেট ব্যাপার! আপনি একটার পর একটা বিয়ে করলে সেটা আর প্রাইভেট ব্যাপার থাকে না। এর জন্যে আপনার জেল হবেই—ম্যাডাম, আপনিও রেহাই পাবেন না।’

‘ও আমাকে বিয়ে করেছে। আমি তো ওকে বিশ্বাস করেছি।’ সুধা বলল।

কিষেনলাল মাথা নাড়ল, ‘ঠিক। আগের দুটো বিয়ে ডিভোর্স না করে কেন থার্ড টাইম বিয়ে করব? আমি কি পাঁঠা? সব পেপার আমার কাছে আছে।’

‘তবে যে আপনি বলেছেন লুইয়ানায় আপনার দুই স্ত্রী দুই বাড়িতে থাকেন! তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে আপনি প্রায়ই যান! বলেননি?’

‘সেটা সত্যি কথা। সুধাকে নিয়েই যাই। সুধা হোটেলে থাকে। আমি একরাত এর কাছে, অন্যরাত ওর কাছে থাকি।’

‘সেটা আপনি পারেন না।’

‘আরে মশাই, ওরা তো একা থাকে না। বাচ্চারা বড় হয়েছে, তারাও থাকে। পুরনো সম্পর্ক রিনিউ করলে সবাই খুশি হয়। আমার প্রথম বউ-এর কাছে যাওয়া বেআইনি এটা আগে প্রমাণ করুন তারপর না হয় ভাবা যাবে।’ কিবেনলাল সাফ জানিয়ে দিলেন।

ফেরার পথে কাপুর বিড়বিড় করছিল, ‘অদ্ভুত! এটা ভারতবর্ষ বলেই সম্ভব!’

সাতটা দিন কেটে গেল। এই সাতদিনে ওসি প্রায় বন্ধু হয়ে গেল অতীশের। লোকটা যে কি পরিমাণে পয়সা কামাচ্ছে তা এখন অতীশের জানা। আর জানে বলেই সম্পর্ক সহজ। উদ্রলোক শেষপর্যন্ত বললেন, ‘আরে মশাই, আপনাকে আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্ট ব্যাক করছে, কাপুর আর কি করবে! শুধু আমার কথাটা ভাববেন। রিভলবারটা আমায় দিন—রিভলবার ছমাদো আমার হবি।’

সপ্তম দিনে যশোবন্ত এল। ওসি তাকে সাদরে বসান।

যশোবন্ত বলল, ‘কাপুর সাহেব কোথায়? কেউ কি অভিযোগ করেছে বা কোন প্রমাণ?’

‘না, না। কোন প্রবলেম হয়নি।’

‘তা হলে কোর্টকে কি বলছেন?’

‘বলতে হবে তদন্ত চলছে।’

‘তার চেয়ে বলে দিন আসামীর বিদেশে চলে গেছে।’

‘বিদেশে?’

‘হ্যাঁ। কোর্ট আপনাদের আর চাপ দিতে পারবে না।’

‘কিন্তু সেক্ষেত্রে তো আসামীর নাম দিতে হবে!’

‘দেবেন। ভারতবর্ষে কোটি কোটি নাম রয়েছে। এটা করলে কেউ আর ‘জাগাদা দেবে না। নিশ্চিত থাকতে পারবেন। তা হলে আমরা যেতে পারি?’

‘হ্যাঁ।’

‘কাপুরসাহেবের অনুমতি লাগবে নাকি?’

‘না-না, উনি বলে দিয়েছেন।’ ওসি উঠে দাঁড়ালেন, ‘মিস্টার রায়, আমারটা—।’

যশোবন্ত অতীশের দিকে তাকাল। অতীশ বলল, ‘রিভলবার!’

‘ওহো, ওটা রেখে তুই কি করবি? বিলিতি জিনিস। দু লাখের ওপর দাম। ইনি চাইছেন, একে দিয়ে দে। তোর সঙ্গে আছে?’

‘না, স্যুটকেসে।’

ওসিকে নিয়ে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। গাড়ির ডিকি খুলে স্যুটকেস থেকে রিভলবার বের করল অতীশ। যশোবন্ত সেটা নিয়ে রুমালে ভাল করে মুছে রুমালসুদ্ধ ওসির হাতে তুলে দিল। ওসি বলল, ‘দারুন জিনিস!’

‘হ্যাঁ, দারুন।’ যশোবন্ত উত্তর দিল।

যশোবন্ত ওকে নিয়ে এল সেই ক্যাপিটাল হোটেলে। অতীশের নামে ঘর বুক করে বলল, ‘বন্ধু এখন থেকে তুমি মুক্ত। এই কপিটা রাখো। তোমার আগাম জামিনের অর্ডার।’

‘কিন্তু এর ফয়সালা—।’

‘হবে না। অন্তত বিদেশ থেকে আসামী না ফেরা পর্যন্ত। তুই বিশ্বাস কর। কাল ভোরে তোকে আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যেতে হবে।’ অর্ডারের কপিটা ধরিয়ে দিয়ে যশোবন্ত চলে গেল।

জানখাওয়া শেষ করে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল অতীশ। আঃ, আজ থেকে সে প্রায় মুক্ত! প্রায় ব্যাপারটা যদিও একটা খঁুত রেখে দিল—যাক গে, এখন তাকে পাহারা দেবার কেউ নেই। দিল্লিতে বেদিন এই হোটেলে এসেছিল শোভনলালের সঙ্গে তখন কে জানত এত দুর্ভোগ তার কপালে আছে! অনেক—অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। অনেক টাকা, মানসম্মান, সম্পর্ক। হ্যাঁ, বনানীর সঙ্গে সম্পর্কটা আবার সহজ হবে কি না কে জানে!

এসব চিন্তা অবশ্য পরে করা যাবে। এখন আরামসে একটা ঘুম দরকার। হঠাৎ তার মনে পড়ল সুধাকে। সুধা যদি মিথ্যেকথা না বলত, তাহলে কাপুরের হাত থেকে সে ছাড়া পেত না। সুধাকে তার কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার।

অতীশ উঠল। স্যুটকেস খুলে সুধার দেওয়া কার্ড বের করে ওই নাম্বারের টেলিফোনের বোতাম টিপল। বাজছে—তারপরই সুধার গলা, 'হ্যালো!'

'এখন কেমন আছেন? শরীর ভাল?'

'আমি তো কখনই খারাপ ছিলাম না! কে আপনি?'

'আমি অতীশ রায়।'

'আ-চ-হা!'

'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনার ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না।'

'কোথেকে কথা বলছেন?'

'ক্যাপিটাল হোটেল। রুম নাম্বার তিনশো এগারো।'

'ওরা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ, এখন আমি মুক্ত।'

'ঠিক আছে, আমি আসছি।'

সুধা আসছে! এই প্রথম শিহরণ অনুভব করল অতীশ। কেন আসছে? ঘুম মাথায় উঠল। সুধা যে তাকে পছন্দ করছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বনানী? দূর! কি আজীবনে কথা ভাবছে সে।

বনানী তাকে চিরকাল খুঁজলে মনে করবে? হ্যাঁ, খুন সে করেছে। যশোবন্তের চেঁচায় সে এখনও আইনের চোখে খুঁজি না হলেও সত্যিটা সত্যি থেকেই যাচ্ছে। যে কেউ এ কথা জানবে সে-ই তার দিকে ভয়ের চোখে তাকাবে। খুনীকে কেউ কি বিশ্বাস করে? সে নিজে কি করত?

সুধা এল ঘণ্টাখানেক বাদে। পরনে সাদা শাড়ি, সাদা জামা। দরজা খুলে মুগ্ধ হয়ে গেল অতীশ। সুধা সেটা লক্ষ্য করল।

একটুও ভূমিকা না করে সুধা বলল, 'আমি আপনাকে কেন বাঁচালাম তা নিয়ে নিশ্চয়ই খুব ভাবছেন! আপনাকে যখন প্রথম দেখি তখনই মনে হয়েছিল আপনি খুব ডিস্টার্বড আছেন। খুব প্রবলেমে পড়েছেন। এমন কোন অন্যায় করেছেন যে পালানো ছাড়া পথ নেই। আপনাকে আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনি স্বীকার করেননি, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আপনাকে আমার ভাল লেগে গিয়েছিল।'

'আমি জানি সুধা।'

'এখন জানলাম আপনি খুন করেছেন।'

'কিন্তু সেটা হঠাৎই। রাগের মাথায়। আমি ইচ্ছা করে কিছু করিনি।'

'আপনি তো বিবাহিত?'

'হ্যাঁ।'

'সেই ভদ্রমহিলা কোন অন্যায় করেননি। তাই তাকে দুঃখ দিয়ে আপনাকে আমার সঙ্গে থাকতে বলতে পারি না। ঠিক কিনা?'

'না—মানে—।'

'এখানে কোন না নেই। আপনি অবিবাহিত হলে না হয় ভাবা যেত।'

'তা হলে তুমি কেন এলে?'

'আপনাকে ঋণমুক্ত করতে।'

'কিভাবে?'

'আপনি একটা খুন করেছেন, কিম্বেনজী বলল আপনি আগাম জামিন নিয়েছেন—। এই অবস্থায় আর একটা খুন করলে পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করবে না?'

'তার মানে?' চমকে উঠল অতীশ।

'একটা খুন করার পর আপনার নার্ভ নিশ্চয়ই আর সাধারণ মানুষের মত নেই। যতক্ষণ কেউ খুন করছে না ততক্ষণ সে একরকম, কিন্তু একটা খুন করলে দশটা খুন করা তার কাছে ভালের মত সহজ!'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?' ভূমি থেকে আপনিতে উঠে গেল অতীশ অজান্তেই।

'আমার ঋণ শোধ করতে আপনি আর একটা খুন করবেন।'

'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?' চৈড়িয়ে উঠল অতীশ।

‘নাঃ, খুব ঠাণ্ডা মাথায় বলছি। বেশ কিছুদিন ধরে আমি আপনার মত একটা লোকের উপকার করতে চাইছিলাম যে আমার কথা শুনবে—’

‘আপনি কাকে খুন করতে চান?’

‘সেটা পরে বলব—আগে আপনি রাজী হন।’

‘আমার পক্ষে রাজী রওয়া সম্ভব নয়।’

‘তাহলে কাপুরকে ডেকে নতুন করে স্টেটমেন্ট দিতে হয়।’

‘তাহলে আমাকে ব্র্যাকমেল করছেন!’

‘কথাটা সত্যি—খুব সত্যি।’

অতীশ অসহায় চোখে তাকাল। সুধা হাসল, ‘যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের কত খুন করতে হয়—মনে করুন আপনি একজন সৈনিক, আমার হয়ে যুদ্ধ করছেন।’

অতীশ মাথা নাড়ল, ‘না। আমাকে দিয়ে ওই কাজ আর হবে না।’

সুধা বলল, ‘বেশ। মুখের ওপর যখন না বলেই দিলেন তখন আর এখানে কি করব? চললাম—’ সে দরজার দিকে এগোল।

অতীশ ডাকল, ‘শুনুন!’

সুধা নীড়াল। অতীশ বলল, ‘আপনি ভেনেগুনে আমাকে বিপদে ফেলছেন কেন?’

সুধা বলল, ‘বিপদ আপনাকেই ডেকে আনছেন। আপনি আপত্তি জানিয়ে দেওয়ায় আমি তো কিছু বলিনি—চলেই যাচ্ছি।’

অতীশ এগিয়ে এল। দুহাতে দুটো কাঁধ ধরল, ‘সুধা, শ্রীজ!’

‘আমি আমার প্রেমিক ছাড়া কাউকে আমার কাঁধ স্পর্শ করতে দিই না। আপনাকে কি আমার প্রেমিক বলে ভাবতে পারি?’ সুধার চোখ ছোট হল।

‘হ্যাঁ—ইয়েস!’ কথা খুঁজে পাচ্ছিল না অতীশ।

বাঁ হাত তুলে অতীশের গাল স্পর্শ করল সুধা, ‘তাহলে রাজী হয়ে যাও। প্রেমের জন্যে মানুষ কত কি করে, তুমি সামান্য কাজটা করতে পারবে না?’

‘তারপর?’

‘তারপর আমাদের সামনে গোটা জীবন পড়ে থাকবে। আমি আর কারও দ্বিতীয় স্ত্রী হতে রাজী নই, কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা অটুট থাকবে—রাজী?’

‘আমার—আমার ভয় করছে।’

‘কোন ভয় নেই।’ সুধা হাসল, ‘আমি তো আছি। শোন, আগামী সপ্তাহে আমরা মুম্বই যাচ্ছি। এ সি স্ট্রিপারের চারটে বার্থ ও কিনে নিয়েছে। বলছে, কোন লোক নেবে না। তুমি ওই ট্রেনে উঠবে—সেকেন্ড ক্লাসে। রাতে ট্রেন কোন স্টেশনে থামলে এ সি কোচে চলে আসবে। কোন স্টেশনে আসতে হবে আমি টাইম টেবিল দেখে বলে দেব। রাত সাড়ে নটার মধ্যে। তারপর আসতে গেলে কন্ডাক্টর গার্ডের নজরে পড়ে যাবে। ওই সময়ে যাতে ওর অবস্থা মদের কল্যাণে কাহিল হয়ে থাকে সেই ব্যবস্থা আমি করব। আমি তখন কুপ থেকে বেরিয়ে কন্ডাক্টর গার্ডের সঙ্গে কথা বলব। তুমি কাজ শেষ করে বেরিয়ে যাবে। সেকেন্ড ক্লাস, তবু নিজের নামে টিকিট কেটে না। রিভলবারের দরকার নেই। তুমি একটা ধারালো সরা ছুরি ব্যবহার করবে।’ ব্যাগ খুলল সুধা, ‘এটা রাখো।’

‘কিবেনলাল—?’ অশ্রুতে নামটা উচ্চারণ করল অতীশ।

‘হ্যাঁ। আই ওয়াণ্ট টু গेट রিড অফ হিম! আর পারছি না!’

‘কিন্তু যদি ধরা পড়ে যাই?’

‘বোকামি না করলে ধরা পড়বে না। তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। পাঁচ মিনিট আমি বাইরে থাকব। তার মধ্যেই তোমাকে এ সি কোচ থেকে নেমে সেকেন্ড ক্লাসে ফিরে যেতে হবে। আর হ্যাঁ, অন্তত দু মাসের মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে না। ও-কে?’ সুধা একটা লম্বা প্যাকেট ওর হাতে দিল।

হঠাৎ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল অতীশ, জিজ্ঞাসা করল, ‘এটা কি?’

‘খুলে দেখো।’ সুধা ওর বাঁ হাত ধরল, ‘যোগাযোগ করব—চললাম।’

দরজা বন্ধ করে প্যাকেটটা খুলল অতীশ। সরু লম্বা মেটালের বাস। বাস খুলতেই জিনিবস্টা দেখতে

পেল। আধ ইঞ্চি চওড়া সফ্র পাতলা অথচ প্রচণ্ড শক্ত আর ধারালো ইস্পাতের ফলার এক প্রান্তে হাতল রয়েছে। হাতলে হাত রেখে বহিরে বের করতেই সেটা ঝকঝকিয়ে উঠল। এই বস্তু যে কোন মানুষের শরীরে সামান্য চাপ দিলেই পুরোটা চুকে যাবে।

ছুরিটা হাতে নিয়ে সে চারপাশে তাকাল। এবং তখনই আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল। হাসল সে—অবিকল একজন খুনীর হাসি। খুব তৃপ্তি লাগল। অস্ত্রটাকে বায়ে ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ল অতীশ। সুধা যা বলে গেল সেটা করা কিছুই না। ওইরকম বিশাল লাশ সুধাকে সারাজীবন বন্দী করে রাখবে এটা হতে দেওয়া যায় না। ক্রমশ নিজেকে বেশ শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছিল তার।

পরদিন সকালে যশোবন্ত এল। বলল, 'তাড়াতড়ি তৈরি হয়ে নে—যেতে হবে।'

'কোথায়?' গভীর গলায় বলল অতীশ।

গলার স্বরে ঈষৎ অবাক হল যশোবন্ত। বলল, 'একটা কর্তব্য করতে।'

'দ্যখ ভাই, আমি আর কোন কর্তব্য করতে পারব না। প্রচুর হয়েছে। এবার আমি কলকাতায় ফিরে যেতে চাই। তবে আরও কয়েকটা দিন দিল্লিতে থাকতে হবে।'

'দিল্লিতে থাকতে হবে কেন?'

'সব ব্যাপারে প্রশ্ন করিস কেন? আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে।'

'ও।' যশোবন্ত এমন ভাবে তাকাল যে অতীশ হঠাৎই মিইয়ে গেল। সুধা চলে যাওয়ার পর থেকে যে জোর সে পাচ্ছিল তা মুহূর্তেই উধাও। অতীশ বলল, 'অবশ্য তুই আমার যে উপকার করেছিস তা আমি কখনও ভুলব না। অবশ্য তোকে আমি ওই কারণে টাকাও দিয়েছি।'

যশোবন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি হয়েছে?'

'আমার? আমার কি হবে?'

'তাহলে তৈরি হয়ে নে।'

'কিন্তু কোথায় যাব সেটা আমার জানা দরকার।'

'পুলিশ হাত গুটিয়ে নিয়েছে জানামাত্র আমার ওপর তোমার বিশ্বাস চলে গেল?'

'না। তখন আমি এণ্ড নার্ডাস ছিলাম যে তুই যা বলেছিস মেনে নিয়েছি।'

'এখন তাহলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিস। কিন্তু তোকে যেতে হবে।'

'তুই জায়গাটার নাম বলতে চাইছিস না কেন?'

'শুনবি? চণ্ডীগড়—'

'চণ্ডীগড়।' চমকে উঠল অতীশ।

'তৈরি হয়ে নে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে যে গাড়িতে সে উঠল তার পেছনে আরও একটা গাড়ি। পেছনের গাড়িতে মানুষের সংখ্যা পাঁচ। কয়েক ঘণ্টার রাস্তা, কিন্তু তেমন কোন কথা বলেনি যশোবন্ত। এত লোকজন নিয়ে সে কেন চণ্ডীগড়ে যাচ্ছে তার ব্যাখ্যাও করেনি। কিন্তু চণ্ডীগড় শহরে ঢোকার মুখে যশোবন্ত বলল, 'শোভনলালকে তুই খুন করেছিস, যে তোকে ঠকাচ্ছিল তাকে শাস্তি দিয়েছিস—এতে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু শোভনলালের স্ত্রী তো কোন দোষ করেনি। আমরা ওর ওখানে যাচ্ছি।'

'তোমার কি মাথাথারাপ হয়েছে?'

'না, ঠিক আছে। পাঞ্জাবের ছেলে বাপের খুনের বদলা নেবে না, এ হতে পারে না।'

'তার মানে?'

'বাপ খুন হল। সঙ্গে সঙ্গে অতগুলো টাকা চাপে পড়ে খুনীকে দিয়ে আসতে হল। ডয়ের চোটে কোন এফ-আই-আর দূরের কথা, স্টেটমেন্ট পর্যন্ত দেওয়া গেল না, সুন্দরলাল এটা হজম করবে বলে ভেবেছিস? ও যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন বাপের খুনের বদলা নেবার কথা ভাববে। আইনের হাত থেকে বেঁচে যেতে পারিস, কিন্তু ওর হাত থেকে কলকাতায় ফিরে গিয়েও নিস্তার পাবি না।'

অতীশ চুপ করে গেল। এটা সে ভাবেনি। এবং মনে হয়েছিল ছেলেটা ওর বাপের কাজকর্মের জন্যে

অনুতপ্ত। যশোবন্ত তাকে ভর দেখাচ্ছে না তো! খুব অস্বস্তি হচ্ছিল অতীশের। কি করবে ঠাণ্ড করছে পারছিল না।

শোভনলাল বিশাল বাড়ি বানিয়েছিল। বাড়ির বাইরে লন, গেট। সেই গেট দিয়ে দুটো গাড়ি ঢুকে খামতেই পেছনের গাড়ির লোক ঝটপট বেরিয়ে পজিশন নিয়ে নিল। অতীশ বুঝল—এরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র।

খবর পেয়ে সুন্দরলাল বেরিয়ে এল শুকনো মুখে। যশোবন্ত ওর কাঁধে হাত রাখল, ‘ঘাবড়াবার কিছু নেই ভাই। আগর তোমার মায়ের সঙ্গে দু মিনিটের জন্যে দেখা করতে চাই—শেষ দু মিনিট। তুমি ঠেকে আসতে বল।’

সুন্দরলাল মাথা নাড়ল, ‘এ সবে মধ্য ঝুঁকে টানছেন কেন?’

‘দরকার আছে। মনে রেখো ওঁর ইচ্ছা আমার মায়ের ইচ্ছা—যাও।’

বসার ঘরে ওদের দুজনকে বসিয়ে সুন্দরলাল ভেতরে চলে গেল। মিনিট খানেক বাদে ফিরে এল সে। পেছনে সাদা পোশাকপরা একজন বয়স্ক মহিলা এবং একটি অল্পবয়সী মেয়ে। অতীশ তাকাল। সুন্দরলালের মাকে সে এর আগে একবারই দেখেছিল। কলকাতায় গিয়েছিল শোভনলালের সঙ্গে। বনানীর সঙ্গেও তখন আলাপ হয়েছিল। ভদ্রমহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন, কথা বললেন না।

যশোবন্ত বলল, ‘অতীশ, ভাবীর কাছে ‘ক্ষমা চা।’

‘ক্ষমা? অতীশ এটা আশা করেনি। স্বামীকে খুন করে তার বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে কেউ কখনও ‘ক্ষমা চেয়েছে? তবু সে উঠল। হাতজোড় করে বলল, ‘যা হয়ে গিয়েছে তাঁর জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত। এরকম যে ঘটবে তা আমি নির্ভেই জানতাম না। আপনার স্বামী আমাকে সর্বস্বান্ত করছেন জেনে আমি মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। তারপর থেকে আমি অনুতাপে জুলছি। আপনি আমাকে ‘ক্ষমা করবেন। যে ‘ক্ষতি আপনার হোল তা পূর্ণ হবে না। কিন্তু যদি কখনও কোন ব্যাপারে আমার সাহায্য দরকার হয় জানবেন আমি তৈরি।’

ভদ্রমহিলা তেমনি পাথরের মত দাঁড়িয়ে। অতীশ হঠাৎই আবেগে আক্রান্ত হল। তার মনে হল সে নিজের মনের কথা বলতে পেরেছে। সুন্দরলালকে অতীশ বলল, ‘তুমি আমার ছেলের মত। আমি তোমার ‘ক্ষতি করেছি—বল, কি শাস্তি দেবে?’

এবার মহিলা কথা বললেন, ‘শাস্তি দেবার ও কেউ নয়। মাথার ওপরে যিনি আছেন তিনি যা ভাল মনে করেন তাই হবে।’

কথাগুলো বলে ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেলেন। যশোবন্ত উঠে দাঁড়াল, ‘ঠিক আছে, এবার যাওয়া যাক।’

অতীশ লক্ষ্য করল সুন্দরলাল তাদের এগিয়ে দিতে এল না। ছেলেটার দিকে তাকাতো তার সাহস হচ্ছিল না—কিরকম শীত-শীত করছিল।

গাড়িতে উঠে যশোবন্ত বলল, ‘হয়তো বালির বাঁধ নিয়ে জল আটকাবার চেষ্টা, তবু চেষ্টাটা করে রাখা হল। তুই আর কলকাতায় থাকিস না।’

‘সেকি। কোথায় যাব?’

‘যেখানে হোক।’

‘আশ্চর্য! সেখানে গিয়ে আমার চলবে কি করে?’

‘নতুন কোন ব্যবসা শুরু কর। তোর অতীশ রায় আইডেন্টিটি নষ্ট করে ফ্যাল।’

‘আর আমার স্ত্রী?’

‘তিনি যদি তোর সঙ্গে যেতে রাজী হন, তাহলে কোন সমস্যা নেই।’

‘ব্যবসা শুরু কর বললেই করা যায় না। ব্যবসা কিসের, ক্যাপিটাল কত লাগবে এসব সমস্যা রয়েছে। না, এ হয় না।’

‘না হলে তোর জীবন কিন্তু যে কোন মুহূর্তে বিপর্য হতে পারে। পুলিশ হয়তো কেসটা নিয়ে ঝামেলা করবে না, কিন্তু সুন্দরলাল তোকে ছাড়বে না। একটা পথ অবশ্য আছে—।’ যশোবন্ত থামল।

‘কি পথ?’

‘সুন্দরলালকেও শেষ করে দেওয়া। ওর ভাই নেই, বিয়েও করেনি তাই প্রতিশোধ নিতে কেউ কলকাতায় যাবে না।’ যশোবন্ত বলল।

‘পাগলের মত কথা বলিস না!’

‘তাহলে তুই এক কাজ কর। মেঘালয়ে চলে যা।’

‘মেঘালয়ে?’

‘ঠা, ওখানে আমি দুটো হোটেল খুলতে যাচ্ছি—তুই আমার ওয়াকিং পার্টনার হয়ে যোগ দে। ব্যাপারটা তুই আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না।’

‘মেঘালয়ের কোথায়?’

‘শিলং-এর হোটেল তৈরি হয়ে গেছে। এমানেই চালু হবে। আর একটা নাইট দেখা হয়েছে—প্লান অ্যাক্রুড করলেই কাজ শুরু করব।’

অতীশ ভাবল। কলকাতায় ফিরে গেলে অনেক অনিশ্চয়তা। শোভনলাল তার গ্রফিটের টাকা মেরে চলে গেল। নতুন করে আর শুরু করা তার পক্ষে কি সম্ভব হবে? তার চেয়ে যশোবন্তের প্রস্তাব অনেক লোভনীয়। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘ঠিক আছে, আমি জান লড়িয়ে দেব—কিন্তু আমার পার্সেন্টেজ কি হবে?’

‘আমার সেভেনটি, তোর থার্টি।’ হাত বাড়াল যশোবন্ত।

অতীশ হাত মেনালো, ‘ডান!’

দিল্লীতে পৌঁছে হোটেলে উঠল অতীশ যশোবন্ত। সেই পুরনো গেস্ট হাউসে নিয়ে এল। প্রথম করলে জবাব দিল, ‘হোটেলের চেয়ে খারাপ থাকবি না। শোন, তুই কাল সকালের ফ্লাইটেই গৌহাটি চলে যাবি। ওখানে তোকে নিতে একজন আসবে। সে অবশ্য জানে আমি যাচ্ছি। আমি তোর পরিচয় দিয়ে কাগজপত্র তৈরি করে দেব।’

‘কালই?’ চমকে গেল অতীশ।

‘কেন, এখানে কি রাজকাজ তোর আছে?’

‘আছে—’

‘সেটা কি, বল?’

‘তোকে বলা যাবে না। আমি একজনের কাছে ঋণী, ঋণটা চুকিয়ে দিতে চাই।’

‘তা যদি বলিস, ঋণ তো আমার কাছেও আছে। তুই না গেলে অন্য কাউকে পাঠাতে হবে। সেক্ষেত্রে অফারটা আর থাকবে না।’

অতীশ সূধার মুখ মনে করল। সে যদি ওই কাজ না করে, তাহলে সুধা বৃচ্ছন্দে কাপুরকে ডেকে নতুন স্টেটমেন্ট দিতে পারে। সমস্যাটোর কথা যশোবন্তকে বলাও যাচ্ছে না। সে ভাবল সূধার কাছে কয়েকদিন সময় চাইবে—গৌহাটি থেকে ফিরে এসে—! অতীশ মাথা নাড়ল, ‘ঠিক আছে। ব্যবসার ডিউ হবে না?’

‘আলবৎ হবে। রাজী?’

‘রাজী।’

‘শোন, যে লোকটা এয়ারপোর্টে আমাকে নিতে আসবে তাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। শিলং-এর হোটেলটা তৈরির দায়িত্ব ওকে দিয়েছিলাম। কথা ছিল ও আমার ওয়াকিং পার্টনার হবে। হোটেলটা তৈরি করতে যা খরচ হয়েছে তার ওপর বারো লাখ ও ভালে দিয়েছে। আমি ওকে সাবধান করেছি কিন্তু ও স্বীকার করেনি। এই যে আমি কাল হাটেলে যাচ্ছি সেটা ওর ভাল লাগছে না। গৌহাটি থেকে শিলং অনেকটা রাস্তা। পথে কোন অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেলে কিছু করার নেই।’

‘তার মানে?’

‘আমার বদলে তুই যাচ্ছিস—আমি চাই অ্যাকসিডেন্টটা হোক।’

‘কিভাবে?’

‘সেটা তোকে ভেবে বের করতে হবে।’

‘তার মানে তুই লোকটাকে খুন করতে বলছিস?’

‘তুই আর আমি তাই জানবো, লোকে জানবে—অ্যাকসিডেন্ট।’

‘অসম্ভব।’ চিৎকার করে উঠল অতীশ।

‘চিৎকার করছিস কেন?’

‘তোরা কি ভেবেছিস? রাগের মাথায় আমি একটা খুন করে ফেলেছি বলে—না, অসম্ভব। যশোকন্ত, আমি পেশাদারী খুনী নই!’

‘আমি জানি।’

‘তাহলে?’

‘আমার উপকার করবি না? ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তে কাউকে খুন করানো আমার পক্ষে সহজ কাজ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি চাই না অন্য কাউকে দিয়ে কাজটা করাতে—সেই লোকটা সাক্ষী থেকে যাবে, ওটা খুব বিস্তী ব্যাপার। তুই যদি কাজটা করিস তাহলে কোন দৃষ্টিভঙ্গি থাকে না। তাছাড়া তোকে পার্টনার করতে হলে ওর যাওয়া দরকার।’

‘অসম্ভব।’

‘এমন ভাব করছিস যেন তুই সতীসাবিত্রী! আমি যে এত করলাম তার কোন দাম তোর কাছে নেই? নিজের স্বার্থ আগে দেখছিস?’

অতীশ দুহাতে মুখ ঢেকে বসে রইল।

যশোবন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, ‘তখন তুই তোরা বললি—আর কে তোকে এমন কাজ করতে বলছে?’

‘সুধা।’ মুখ-ফসকে বেরিয়ে গেল।

‘সুধা? কে সুধা?’

‘কিবেনলালের খার্ড ওয়াইফ।’

‘ওহো! সাবাস। সেই মহিলার সঙ্গে এত দোস্তি তোর কি করে হল?’

‘হয়েছে। মহিলা কাপুরুষ আমায় বিরুদ্ধে বলতে পারতেন, আমার হাতে যে শোভনলালের ব্রিফকেস ছিল সেটা উনি দেখেছেন। বলেননি—আমাকে বাঁচিয়েছেন। তার বদলে ওই কাজটা করে দিতে হবে।’

‘কবে?’

‘তারিখটা বলেনি।’

‘টেলিফোনে জিজ্ঞাসা কর।’

‘তারপর?’

‘তারপর দেখা যাবে।’ যশোবন্ত বেরিয়ে গেল।

রাত দশটার পর ফোন করল অতীশ। তৃতীয়বার রিঙ হবার পর সুধা ধরল।

‘আমি অতীশ।’

‘আরে! আজ সারাদিন আপনি কোথায় ছিলেন?’

‘একটু কাজে বেরিয়েছিলাম।’ অতীশ গভীর গলায় বলল, ‘কবে যাচ্ছ?’

‘নাঃ, যাওয়া হবে না।’ সুধা খুব স্বাভাবিক গলায় বলল। অতীশের মনে হল তার ফুসফুসে নতুন বাতাস লাগল। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার?’

‘আপনাকে আমি আজ তিনবার ওই হোটেলে ফোন করেছি। আমার স্বামী খুব অসুস্থ। আজ সারাদিন আমি নার্সিংহোমে ছিলাম। ওর কিডনি ফেইল করেছে। লিবার তেমন কাজ করছে না। ডাক্তাররা বলেছেন খুব চেষ্টা করছেন, কিন্তু—।’

‘তাহলে আপনাদের যাওয়া হচ্ছে না?’

‘এই অবস্থায় কেউ যায়? গতকাল বিকেল থেকে ওর কী যন্ত্রণা, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।’

‘তাহলে—?’

একটা হাসি কানে এল। আলতো করে ‘গুড নাইট’ বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল সুধা। অতীশ চোখ বন্ধ করল। একটা পাহাড় যেন সামনে থেকে সরে গেল।

গেস্টহাউসের বিছানায় গুয়েও ঘুম আসছিল না। শোভনলাল যখন তাকে বঞ্চিত করার জন্যে মরীয়া হয়েছিল তখন তার মনে হয়েছিল আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। সেইসময় রিভলবার দেখে তার বোধবুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল—এখন সেই আত্মহত্যা তাকে করতে হচ্ছে। একটা খুন করার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে আর একটা খুন করে। যতই আপত্তি করুক কেউ গুনবে না। এটা আত্মহত্যা ছাড়া

আর কি? শরীর থাকবে কিন্তু প্রত্যেকবার মরে বাঁচতে হবে। আগামীকাল যশোবন্ত তাকে গৌহাটি পাঠাবেই। পথে তাকে একটা লোককে খুন করতে হবে। আশ্চর্য! অতীশ ঘুমতে পারছিল না।

যশোবন্ত এল ভোরবেলায়। সঙ্গে একটা ফাইল। অতীশকে কাগজপত্র বোঝাতে লাগল সে। কিছুই মাথায় ঢুকছিল না তার। জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোর?'

'গৌহাটি যাওয়ার আগে আমি একবার কলকাতায় যেতে চাই।'

'কেন?'

'আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে।'

'সেটা শিলং থেকেও যেতে পারিস।'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল অতীশ, 'আমি কি তোর চাকর যে যা বলবি তাই শুনতে হবে?'

'সাবাস! হ্যাঁ, যা বলবি তাই শুনতে হবে তোকে।'

'নো—আর নয়। আমাকে আমার মত থাকতে দে।'

'তাহলে তুই গৌহাটি যাচ্ছিস না?'

'না।'

'আমার ওয়ার্কিং পার্টনার হরি দাস?'

'প্রীত, আমাকে ছেড়ে দে।'

'যদি না দিই?'

অসহায় চোখে তাকাল অতীশ। মুহূর্তেই তার কাছে যশোবন্তের মুখ বদলে শোভনলালের হয়ে গেল। শোভনলালও ওই ভঙ্গিতে কথা বলেছিল তার সঙ্গে।

'দিবি না?' হিসহিস শব্দ বের হল কথাগুলোর সঙ্গে।

'না। তাহলে আমি পুলিশের কাছে সারেভার করব।'

'না, সেটা করতে দেব না। তুই এখন আমার অনেক কিছু জেনে গিয়েছিস। পুলিশ সেসব কথা তোর পেট থেকে টেনে বের করবে। আর সারেভার যদি করতেই হয় খুনের দিন করলি না কেন? অনেক ঝামেলা বেঁচে যেত তাতে। আমি তোর কারবার দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। সুধা ব্ল্যাকমেল করছে বলে তার স্বামীকে খুন করতে রাজী হলি, আর আমার বেলায় মেজাজ দেখাচ্ছিস।'

'সুধার স্বামী এখন নানিরহোয়ে। হয়তো বাঁচবে না।'

'তাই সুধা তোকে রেহাই দিয়েছে। ঠিক আছে। তুই আমার কথা রাখ—একবার শিলং যা। তোকে কোন অ্যাকসিডেন্ট করতে হবে না। শিলঙে গিয়ে যদি তোর সব দেখেওনে ভাল লাগে, তাহলে আমাকে ফোন করিস। রাজী হলে আমি সেখানে গিয়ে তোর সঙ্গে কন্টাক্ট ফাইন্যাল করব।'

'কাউকে খুন করতে হবে না?'

'না—প্রমিস!'

ঘণ্টা দুই বাদে অতীশ ইন্ডিয়ান এয়ার লাইসেন্সের বিমানে অনেক হালকা মনে বসেছিল। রামকৃষ্ণদেব নাকি বলেছিলেন, সবসময় মাথা নিচু করে না থেকে মাঝে মাঝে ফণা তুলে ফাঁস করো। সেটা করতেই যশোবন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এখন সে সত্যিকারের বন্ধুর মত ব্যবহার করেছে। শিলঙে যদি সব ভাল লাগে, তাহলে কাজ শুরু করতে আপত্তি করবে কেন সে?

গৌহাটি এয়ারপোর্টের দরজায় সে নিজের নাম লেখা কার্ড হাতে নিয়ে এক ভদ্রলোককে দেখতে পেল। সে কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি অতীশ রায়।'

'আসুন।'

ভদ্রলোক মধ্যবয়সী। ভাল স্বাস্থ্য। ওঁর গাড়িতে সুটকেস রেখে সে গাড়িতে উঠল। ভদ্রলোক গাড়ি চালাচ্ছেন। গাড়ি চলতে শুরু করলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এর আগে এখান থেকে বাই রোড শিলং গিয়েছেন?'

'না।'

'আমার নাম দ্বিবেদী। রিলাক্স করুন। আপনার খবর আজ সকালে পেয়েছি।'

অতীশ বুঝতে পারল এই লোকটাকে খুন করতে বলেছিল যশোবন্ত। এখন অবশ্য সেসব কথা উঠছে

না। মাথা এলিয়ে দিন নে। এবং তখনই খেয়াল হল সুখার দেওয়া ছুরির বায়টা তার ঝাঁপকেটে রয়েছে। ওটার আর কোন দরকার নেই, কিন্তু জিনিসটা এত সুন্দর বলে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয়নি।

দ্বিবেদী কোন কথা বলছিল না। সমতল ছাড়িয়ে গাড়ি এখন পাহাড়ে উঠছে। ওপর থেকে গাড়ি নামার যেন শেষ নেই। দ্বিবেদী ভালই চালাচ্ছে। একটাও কথা হয়নি গৌহাটি ছাড়ার আগে। হঠাৎ গাড়ি পিচের পথ ছেড়ে বাদিকের একটা ফালি ভ্রমিতে উঠে গেল। অতীশ তাকাতেই দ্বিবেদী বলল, 'জলবিয়োগ।'

দ্বিবেদী নেমে যেতেই গাড়িটা পেছনে গড়াতে লাগল। বেগতিক দেখে অতীশ দরজা খুলে নেমে পড়তে চাইল, কিন্তু ততক্ষণে দ্বিবেদী উলটোদিক থেকে ঘুরে এসে তার দরজা চেপে ধরেছে। অতীশ চিৎকার করে উঠল। গাড়ি গড়িয়ে চলেছে। এবার আরও দ্রুত। প্রচণ্ড শক্তিতে দরজা খুলতে চেষ্টা করে না পেরে সে হাত বাড়িয়ে দ্বিবেদীর জামাগেঞ্জি আঁকড়ে ধরল জানলা দিয়ে। একটা প্রবল ঝাঁকুনি, অতীশ দেখল ভয়াবহ মুখে দ্বিবেদী তার ওপর আছড়ে পড়েছে। শব্দ হচ্ছে। গাড়ি গড়িয়ে যাচ্ছে ধাক্কা খেতে খেতে অতল খাদে।

দিল্লীতে খবর এল বিকেল নাগাদ। যশোবন্ত খবরটা শুনে খুবই দুঃখিত হল। শিলঙ-এর জন্যে নতুন লোক খুঁজতে হবে তাকে। তারপর কাপুরকে ফোন করল, 'কাপুর সাহেব, এইমাত্র খবর পেলাম শিলঙ-এর পাহাড়ে একটা মোটর অ্যাকসিডেন্টে আমার দুই বন্ধু মারা গিয়েছে। তাদের একজন আপনার অতীশ রায়—অতএব আপনাকে আর দৃষ্টিস্তা করতে হবে না।'

কাপুর বলল, 'মনে হচ্ছে আপনিও দৃষ্টিস্তামুক্ত হলেন!'

যশোবন্ত হাসল, 'একটা ঢেউ গেল, দুটো ঢেউ গেল—কিন্তু আমাদের কি মুক্তি আছে কাপুরসাহেব? আল্লাই হয়তো নতুন ঢেউ আসবে! শুভবাই।'

হৃদয় আছে যার

[প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৪]

pathagor.net

pathagar.net

সমুদ্রের ধারে বসে থাকতে চমৎকার লাগে নীলের। সাদা ফেনার ঢেউগুলো ছাড়িয়ে নীল থেকে সবুজ হয়ে যাওয়া সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন সময় কেটে যায় তা নিজেই টের পায় না। এ দিকের সমুদ্রের ধারে হাঁটার মতো সুন্দর বিচ নেই। উঁচু নিচু বালি এবং পাথর, মাঝেমাঝে টিলা আর বুনা কাঁটার কোপ টারিস্টদের আকর্ষণ কমিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। উটকো লোকের মুখোমুখি হতে হবে না বলে জায়গাটাকে পছন্দ হয়েছিল নীলের। সে যখন এখানে এসেছিল তখন এই টিলার ওপর বাড়িটিতে থাকতেন এক শিল্পী এবং তাঁর স্ত্রী। দুজনেই কেরালিয়ান। যেহেতু এখানে কোনও হোটেল নেই তাই পেছনের জেলেদের বস্তিতে রাত কাটাতে গিয়েছিল নীল। তার কাঁধে ত্রিপলের ব্যাগ, পরনে চেক শার্ট আর জিনস, পায়ে ভারী রাবারের জুতো। এক বৃদ্ধ জেলে তাকে নিয়ে গিয়েছিল কেরালিয়ান দম্পতির কাছে। ওঁরা সাদরে তাকে থাকতে দিয়েছিলেন সেই রাতটায়।

সেই রাতটায়! ভাবলেই এখনও অপ্রস্তুতি হয় নীলের। সে রাত চাঁদের ছিল। চাঁদ আর সমুদ্রের সোহাগের রাত। শিল্পীর সঙ্গে সমুদ্রের দিকে ডেকে বসে সন্ধ্যা থেকে মদ্যপান করছিল নীল। ভদ্রলোক দিশি মদ খেতে পছন্দ করেন। অভ্যাস না থাকলেও নীল সঙ্গ দিচ্ছিল। ওঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে খাবার করে আনছিলেন। চাঁদকে হোঁয়ার জন্যে ঢেউগুলো ক্রমশ মরীয়া হয়ে উঠছিল। শিল্পী বলছিলেন, ‘আপনি ভাবতে পারেন একটা কচ্ছপকে মানুষের চেয়ে অনেক বেশি আত্ম-ঈশ্বর দিয়েছেন। হোয়াই? ওই কচ্ছপের কোনও কন্ট্রিবিউশন নেই। আর মানুষ ঈশ্বরকে জন্ম দিয়েছে। বোধহয় এ কারণে ঈশ্বর মানুষকে ভয় পান। বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে খুব আপত্তি তাঁর। এই যে চাঁদ, আজ থেকে তিরিশ বছর পরে দেখার কোন চান নেই আমার। কারণ একশ বছরের বেশি আমি বাঁচতে পারি না। কিন্তু দেখব না কেন? হোয়াই?’

নীল বলেছিল, ‘আপনি শিল্পী। আর পাঁচজন যা পারে না, আপনি তা পারবেন। আপনার শিল্পের মাধ্যমে আপনি বেঁচে থাকবেন।’

‘জানি না। আবার এর উলটোটাও হয়। খুব ভাল কিছু দেখলে আমার মাঝে মাঝে মরে যেতেও ইচ্ছে করে। ওই যে চাঁদের আলো সমুদ্রের গায়ে পড়ে যেখানটায় চিকচিক করছে সেখানটায় কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয় এর বেশি জীবন আমাকে কিছুই দিতে পারবে না। তাই ওইখানে গিয়ে যদি চিরদিনের জন্যে গুয়ে পড়তে পারতাম!’

রাত আরও বাড়লে শিল্পীপত্নীর তাড়ায় খাওয়াদাওয়া সেরে বাইরের ঘরে গুয়ে পড়েছিল নীল। ওরাও ভেতরের ঘরে আলো নিভিয়েছিল। কিন্তু নীলের ঘুম আসছিল না। সে দরজা খুলে ডেকে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামনে সমুদ্র। ওই সমুদ্রটাকে খুব করুণ দেখাচ্ছিল সে সময়।

চূপচাপ কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সে জানে না, হঠাৎ চিংকার কানে যেতে তার ইঁশ এল। চিংকার ভেসে এসেছিল ভেতর থেকে। শিল্পীপত্নীর গলা মনে করে সে ভেতরে চলে এল। ওঁদের ঘরের দরজা তখন বন্ধ। সে বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি হয়েছে? ম্যাডাম, কি হয়েছে?’

একটু বাদে দরজা খুললেন মহিলা! উদ্ভ্রান্তের মতো তাকিয়েই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। নীল ঘরে ঢুকেই দেখতে পেল শিল্পী গুয়ে আছেন মেঝের ওপর চিং হয়ে। নীল ছুটে গেল পাশে। ভদ্রলোক স্থির হয়ে আছেন, মুখে কোনও বিকৃতি নেই। নীল কয়েকবার ডাকল। ‘সাদা না পেতে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘এখানে ডাক্তার কোথায় থাকেন?’

‘বাসস্ট্যান্ডের কাছে।’ শ্রোতা কেঁদে উঠেছিলেন।

বাসস্ট্যান্ড মাইল দেড়েক দূরে। শূন্য বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে চাঁদের আলোয় ছুটে যাচ্ছিল নীল। হঠাৎ সমুদ্রের জলে দৃষ্টি যেতেই সে থমকে গিয়েছিল। চাঁদ সরেছে, জলের একটি জায়গা এখন চকচক করছে। প্রথম রাতে ওইরকম একটা জায়গায় শিল্পী চিরদিনের জন্যে গুয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। একটা মানুষ ওইভাবে মৃত্যুকামনা করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেল? এটা আত্মহত্যা নয় তো?

ডাক্তারকে ঘুম থেকে তুলতে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন এত রাতে তাঁর পক্ষে অতদূরে যাওয়া সম্ভব নয়। নীলের মেজাজ বিগড়ে গেল। দীর্ঘকাল জাহাঞ্জে চাকরি করে যে রুক্ষতা তাকে ঘিরে রেখেছিল সেটা পরিয়ে ফেলতে সে এতদিন চেষ্টা করছিল, কিন্তু এখন আর সেটা পারল না। তার পেশীবহুল হাত দিয়ে ডাক্তারের কবজি চেপে ধরে বলেছিল, ‘আপনি যদি না যান তাহলে আপনাকে খুন করতে বাধ্য হব। আমি জাহাজী মানুষ, যা বলি তাই করি।’

হাতের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ডাক্তার সুড়সুড় করে এসেছিলেন পেছন পেছন। ভোরের একটু আগে শিল্পীর নাড়ি দেখে, বুকে স্টেথো চেপে মাথা নেড়েছিলেন, ‘অনেক আগেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে। কিছুই করার নেই। আমি ডেথ নার্টিককেট লিখে দিচ্ছি।’ কনফন করে কাগজে কয়েক লাইন লিখে ডাক্তার বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

ছড়িয়ে পড়ল নীল। শিল্পীর মেয়েরা কেবলমাত্র থাকে। তাদের খবর দেওয়ার জন্যে টেলিগ্রাম করা হল। জেলে-গ্রামের ব্যঙ্গরা সামনে বসে রইল চুপচাপ। সন্ধে হয়ে আসছে যখন, তখন শিল্পীর শরীরে বিকৃতি দেখা গেল। শিল্পীপত্নীর অনুমতি নিয়ে তাঁর শরীরের সৎকার করা হল।

মেয়েরা এল পরের দিন দুপুরে। অনেকপ্রহ কালামাটির পর তারা স্থির করল মাকে নিয়ে কেবলমাত্র চলে যাবে। একজন প্রৌঢ়ার পক্ষে এ রকম নির্জন জায়গায় একা থাকা সম্ভব নয়। আর তখনই ইচ্ছেটা ছোবল মাবল। নীল খুব নম্র গলায় জানতে চাইল, ওই বাড়িটার ব্যাপারে ওরা কি ভাবছে?

মেয়েরা জানাল খন্ডের পেলে তারা এফুনি বিক্রি করে দেবে। তাদের বাবার একা থাকার উদ্ভট বাসনার প্রতিবাদ অনেকবার করেছিল তারা, তিনি শোনেননি। তাই এখন বাড়িটাকে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই।

নীল বিনীতভাবে বলল, ‘যতদিন আপনাদের বিক্রি করতে না পারছেন ততদিন যদি আমাকে ভাড়া দেন, এতে বাড়িটা হাতবদল হল না, তুলে আপনাদের বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হবে আর আমার পক্ষেও—’

এক মেয়ে বলল, ‘ভাইলে আপনিই কিনে নিন না কেন?’

নীল বলল, ‘এখনই আমি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। এখানে কয়েকমাস থাকার সুযোগ হলে আমি ভেবে দেখব কিনতে পারব কিনা।’

ওরা রাজি হয়ে গেল। সামান্য ভাড়ায় ওরা নীলকে বাড়িটা ভাড়া দিয়ে মাকে নিয়ে ফিরে গেল কেবলমাত্র। যেসব জিনিস নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় তা রেখে গেল এই বাড়িতে।

জীবনের অনেকটা সময় যার সমুদ্রের গভীরে জাহাজে জাহাজে কেটেছে, তীরে বসে চেউ দেখতে তার ভাল লাগার কথা নয়। কিন্তু নীলের মন বসে গেল। সারাদিন ডেকে বসে চেউ-এর অবিরাম যাওয়া-আসা দেখতে দেখতে সে অনেক ক্ষত ভুলতে লাগল। সভ্য সমাজ, বিশেষ করে কলকাতার ইলিয়ট রোড পাড়ার সেই মানুষগুলোর মুখোশ খুলে পড়া মুখের বীভৎসতা এই নির্জন সাগরবেলায় অনেক পেছনে সরে যাচ্ছিল। যাকে সে সবচেয়ে ভালবাসত তার কাছে ফিরে গিয়ে দেখেছিল, মানুষের লালসার আঙন থেকে বাঁচতে সে তাদের হোঁড়া আঁসিডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ফলে তার সমস্ত শরীর পুড়ে একটি মাংসপিণ্ড হয়ে কোনক্রমে বেঁচে আছে ইলিয়ট রোডের একটি ঘর অন্ধকার করে। অনেক চেষ্টা করেও নীল তার মুখ দেখতে পায়নি। গলার স্বর শুনে তার হৃদয়ে যে আবেগ এসেছিল তাও মর্যাদা পায়নি মেয়েটির কাছে। নিভের দম্ব শরীর এবং মন নিয়ে সে অন্ধকারের খোলসের আড়ালে থাকতে চেয়েছে বাকি জীবন। পুরনো ভালবাসার বাড়ানো হাত স্পর্শ করার মতো আঙুল সে খুঁজে পায়নি—অথবা পেতে চায়নি। প্রচণ্ড অভিমান থেকে ভ্রমে ওঠা আত্মপ্রশ্ন নীলকে প্রায় পাগল করে তুলেছিল। যাদের লালসার শিকার হয়েছিল মেয়েটি তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল প্রাণপণে। কিন্তু তাদের পেছনে যারা রয়েছে তাদের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে আইন এবং পুলিশ। শেষ পর্যন্ত সভ্য সমাজ সম্পর্কে বিতর্কিত হয়ে সে কোথাও হারিয়ে যেতে চেয়েছিল। আর সেই সময় ভাসতে ভাসতে পৌঁছেছিল এই নির্জন সমুদ্রসৈকতে যেখানে কোনও টুরিস্ট উদ্ভাদ না হলে আসে না। যেখানকার অধিবাসীদের একমাত্র জীবিকা মাছ ধরা, সেখানে যে একজন কেবলমাত্র চিত্রশিল্পী তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাস করার জন্যে টিনার ওপর সুন্দর বাড়ি বানিয়ে থাকবেন সেটা কে জানত!

সপ্তে যা টাকা ছিল তাতে কয়েক বছর নিশ্চিন্তে চলে যেত। এখানে খরচও বেশি নয়। প্রতি মাসে স্থানীয় পোস্ট অফিসে গিয়ে কেবলমাত্র ঠিকানায় ভাড়া পাঠায় সে। বাড়িটি কেবলমাত্র পরিকল্পনা মাথা থেকে বীরে বীরে বেরিয়ে গেছে। শিল্পীর মেয়েরাও ওই ব্যাপারে তাকে তাগাদা দিয়ে চিঠি লেখেনি।

নীলের দৈনন্দিন খরচের অনেকটাই যায় মদ কিনতে। স্থানীয় জেলবস্তিতে একরকমের দিশি মদ তৈরি হয় যা এখন নীলের জেগে থাকার সমস্ত সঙ্গী হয়ে উঠেছে। মদটি খুব কড়া নয়—বিয়ার এবং হুইস্কির মাঝামাঝি স্বাদ। গ্রামের লোকই বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়।

মাসভিনেক বাদে নীল ব্যবসায় নামল। সে লক্ষ্য করেছে পাইকারের লোকজন এসে অভাবের সময় স্থানীয় জেলেদের অগ্রিম টাকা দিয়ে যায়। শর্ত হল, সারাবছর ওরা যে মাছ ধরবে তা পাইকার নিয়ে নেবে এবং টাকাটা ওই ভাবে শোধ হবে। যেহেতু অগ্রিম টাকা নিচ্ছে, তাই ধরা মাছের দাম নিয়ে কোনও দরকষাকষি করা চলবে না। টাকা নেওয়ার সময় যে বাজারদর থাকবে তার থেকে কিঞ্চিৎ কমে সারাবছর ধরে মাছ দিয়ে যেতে হবে। এই দেওয়াটা অবশ্যই ওজন করে হবে। একমাত্র অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে না থাকলে প্রত্যেককে মাছ ধরতে যেতে হবে। ধরা মাছ পাইকারকে ছাড়া অন্য কাউকে বিক্রি করা যাবে না।

ফলে এরা যখন মাছ ধরে তখন দাঁতে দাঁত চেপে থাকে। যতদিন অগ্রিম নেওয়া টাকা শোধ না হয় ততদিন শুধু হা-হতাশ করে ওরা। একেবারে শেষের দিকে কিছু টাকা ঘরে আসে। শুধা মরসুমে ওই যে অগ্রিমের টোপ তা এরা এড়াতে পারে না। বেশ কিছু নগদ টাকার লোভ অভাবের সময় এড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই টাকা সারাবছরের জন্যে রেখে দেওয়া গরিব মানুষগুলোর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।

এই পাইকাররা থাকে শহরে। বাজারের কাছে ঘর ভাড়া করে ওদের কর্মচারীরা থাকে। খুব গোলমাল না হলে পাইকারদের সমুদ্রের ধারে আসার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মাছের ব্যবসায় তাদের লাভ ক্রমশ বেড়ে যেতে থাকে। নৌকো এবং জালের দায়িত্ব এই জেলেদের। সেগুলোকে দুরবস্থা থেকে মুক্ত করতে টাকা দরকার। তার জন্যেও পাইকারের লোক টাকার খলি নিয়ে সব সময় দাঁড়িয়ে আছে। যত পারো ধার নাও, মাছ ধরে শোধ কর। ভোরবেলায় যখন ক্রান্ত জেলেরা নৌকো-ভর্তি মাছ নিয়ে বালিতে পা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই মাছের দখল নিয়ে নেয় পাইকারের লোকজন। কয়েকদিন সেই সময় জলের ধারে দাঁড়িয়ে নীল লক্ষ্য করেছে, মাছের ওজনের বেলায় ব্যাপক কারচুপি চলছে। এই লোকগুলোকে দুদিক থেকে মেরে ফেলতে টান্ডাওয়ালা ব্যবসায়ীরা সক্রিয়।

নীল ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল। তার মনে হচ্ছিল এই মানুষগুলোকে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু তার নিজের কাছে পাইকারদের সঙ্গে নড়াই করার মতো টাকা নেই। এক বৃদ্ধ জেলে, যার পক্ষে আর সক্রিয়ভাবে মাছ ধরা সম্ভব নয়, তার সঙ্গে কথা বলল নীল। সে নৌকো এবং জালের জন্যে টাকা দেবে। ওরা মাছ ধরে আনলে তার অর্ধেক সে নেবে অর্ধেক যারা ধরবে তাদের হবে। বৃদ্ধ প্রথমে উৎসাহী হয়েছিল—তারপর মিইয়ে গেল। জেলেবন্দির সবকটা মানুষই পাইকারের কাছে ঋণবন্দী। তাদের পক্ষে অন্য কারও জন্যে মাছ ধরা সম্ভব নয়, নিজের জন্যেও নয়।

এই ব্যবহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা দরকার, কিন্তু কি ভাবে সেটা সম্ভব ভাবতে পারছিল না নীল। এই পৃথিবীর সর্বত্র কালো হাত তার শক্তিশালী ছায়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে যত চেষ্টাই কর সেই হাত তোমাকে তা থাকতে দেবে না।

হঠাৎ নীলের মনে হল এই জেলেরা যদি একত্রিত হয়, যদি ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাছ না ধরে দলগতভাবে মাছ ধরে? ইংরেজিতে যাকে কো-অপারেটিভ সিস্টেম বলে—সেই পথে যদি এদের চালানো যায় তাহলে হয়তো এরা পাইকারের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে পারে।

সকালবেলায় সেজেগুজে দরজায় তাল দিলে নীল বের হল। বের হওয়ার আগে এক টোক পান করে নিল সে। সামান্য এক টোক, কিন্তু মানসিক শক্তি বেশ বেড়ে যায় এতে—যদিও মুখে বিশ্রি গন্ধ পাক যায়। কি আর করা যাবে!

স্বাস্থ্যবান দীর্ঘদেহ, হাঁটাচলায় তৎপর ভাব, নীলকে আর পাঁচজন থেকে আলাদা করে বলেই বাস টার্মিনাসের লোকরা তাকে প্রথম দিনেই চিনে ফেলেছিল। তার ওপর মাঝরাতে গায়ের জোরে ডাকারকে তুলে নেওয়ার ঘটনাটা অনেক ডালপালা যোগ করে ছড়িয়েছে বলে ওর সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের আগ্রহ বেড়ে গিয়েছিল। তারা গায়ে পড়ে আলাপ করতে গিয়ে বেদম নিরাশ হয়েছিল। নীলের নিরাসক্ত ভঙ্গি জানিয়ে দিয়েছিল সে বাড়তি কথা বলতে উৎসাহী নয়। তখন সন্দেহ তৈরি হল। হয়তো জেলপালানো আসামী অথবা খুন করে হাওয়া হয়ে যাওয়া খুনী সমুদ্রের গায়ে ওই বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে, এ রকম কথা চাউর হল। কিন্তু নীলের নির্লিপ্ত ভাব সেই উদ্বেগনার আগুনেও জ্বল ঢেলে দিল শেষ পর্যন্ত। আজ সকালে নীল যখন বাসে চেপে শহরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল তখন আর এক প্রহু গুজবের জন্ম হল।

শহরটি ছোট। দু-তিনজনকে জিজ্ঞাসা করে নীল হাজির হল একটি ব্যাঙ্কে। পিওনকে বলল সে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। পিওন জানান, হেড অফিসের লোক এসেছে, ম্যাডাম এখন ব্যস্ত আছেন, দেখা হবে না।

নীল বলল, 'আমি ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই, ম্যাডামের সঙ্গে নয়। খুব জরুরি ব্যাপার।'

পিওন বলল, 'এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার একজন মহিলা। তাঁকে সবাই ম্যাডাম বলে থাকে। খুব কড়া মানুষ। উনি আসার পর দু-নয়রী ব্যাপার একদম বন্ধ। কিন্তু তিনি এত ব্যস্ত যে বাইরের লোকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবেন না।'

নীলের মাথা গরম হয়ে গেল। চকিতে বাঁ হাতের মুঠোয় লোকটার জামার কলার ধরে ঝাঁকানি দিল সে— 'আমি অনেকদূর থেকে এই কথা শোনার জন্যে বাসভাড়া খরচ করে আসিনি। তোমার ম্যানেজারকে চাকরি দেওয়া হয়েছে জনসেবা করার জন্যে, বুঝলে? যাও, এবার গিয়ে ম্যানেজারকে খবর দাও—জলদি।'

হাত আলগা করতেই লোকটা ছুটল। তারপরেই সে ফিরে এল, 'আসুন।'

ব্যাঙ্কের অন্যান্য কর্মচারীরা কাছ থামিয়ে দৃশ্যটি দেখছিল। নীল চুকতেই তারা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু কেউ মুখ খোলার আগেই লোকটা পিওনের পেছন পেছন ম্যানেজারের ঘরে চুকে গেল। ঢোকার আগে দেখল কাঠের ফলকে লেখা আছে কণিকা গুপ্ত।

টেবিলের উলটোদিকে গভীর ঘুমে বে মহিলা বসে আছেন তিনি দেখতে মন্দ নন। সিনেমায় নায়কের বোন অথবা শিক্ষয়িত্রীর রোল প্লেয়ে যেতে পারেন সহজেই। তাঁর উলটোদিকে একটি টাকমাথার লোক বসে আছে। নীল টোকমাথার উদ্ভ্রমহিলা কড়া গলায় ধমকে উঠলেন, 'আপনি ওর গায়ে হাত তুলেছেন?'

'গায়ে নয়, জামায় হাত দিয়েছি।'

'কি ভেবেছেন আপনি? এখানে গুপ্তামি করতে এসেছেন? আপনাকে আমি পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি, তা জানেন?'

নীল মাথা নাড়ল, 'ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারা অনেক কিছু করতে পারে।'

'হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট?' ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

'দেখুন মশাই, হেড অফিসের লোক এসেছে বলে আপনি এমন ব্যস্ত যে কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না এই খবরটা রেডিওতে প্রচার করা উচিত ছিল। তাহলে আমি সমুদ্রের ধার থেকে এতটা পথ বাসে চেপে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতাম না।' নীল বলল।

টোকোমাথার লোকটি বলল, 'তাই বলে আপনি একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারীর গায়ে হাত তুলতে পারেন না।'

'আমি কারও গায়ে হাত তুলিনি। লোকটা যে ভঙ্গিতে কথা বলছিল তাতে ওর জামার কলার না ধরে পারিনি। এটা যদি অন্যায় বলে মনে করেন, তাহলে সেটা স্বীকার করতেই হয়।'

টোকো লোকটা উঠে দাঁড়াল, 'ম্যাডাম, আপনি ওর সঙ্গে কথা শেষ করুন। আমি পাঁচ মিনিটের জন্যে ঘুরে আসছি।' লোকটি বেরিয়ে গেল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আপনি বসতে পারেন। যা বলার তাড়াতাড়ি বলুন।'

নীল বলল, 'পাঁচ মিনিট তো সময় আছে, আমার বক্তব্য খুব বেশি নয়। আমি থাকি পানসায়র, সমুদ্রের ধারে যে-জায়গাটা এখনও ডেভলপ করেনি সেখানে। ওখানে একটি জেলে বস্তু আছে। প্রতিদিন বেশ কয়েক হাজার টাকার মাছ এই জেলেরা ধরে, কিন্তু সে-সবই পাইকারের হাতে চলে যায়। তাদের লোক অগ্রিম দিয়ে জেলেরা কিনে রেখেছে। এই জেলেরা যদি নিজেদের মধ্যে কো-অপারেটিভ করে মাছ ধরে তাহলে ব্যাঙ্ক কি তাদের অল্প সুদে ধার দেবে?'

ভদ্রমহিলা শুনছিলেন চুপচাপ, এবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম?'

'নীল।'

'নীল কি? টাইটেল?'

নীল কাঁধ নাচাল, 'আমি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। নীল মুরহেড।'

'এই জেলেরা সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি?'

'আমি ওদের কাছেই থাকি।'

'এত ভাল বাংলা বলেন কি করে?'

'আমি কলকাতায় জন্মেছি। বড় হয়েছি। ম্যাডাম, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কথা বললে পাঁচ মিনিট

সময় শেষ হয়ে যাবে। ওই জেলেদের বাঁচাবার জন্যে অল্প সুদে টাকা পাওয়া দরকার, নইলে প্রতিবছর পাইকাররা ওদের রক্ত চুষে ছিবড়ে করে দেবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু ওদের যে টাকা দেওয়া হবে তা ফেরত পাওয়ার গ্যারান্টি কে দেবে? ব্যাঙ্ক লোন দেয় কোনও কিছু গচ্ছিত রেখে অথবা গ্যারাণ্টারের অ্যাকাউন্টের ওপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে ওই জেলেদের লোন দেওয়ার ব্যাপারে যেসব নিয়ম আছে তা পালন করুন।'

'আশ্চর্য! গচ্ছিত রাখার মতো কোনও মূল্যবান জিনিস ওদের নেই। গ্যারাণ্টার পাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ওরা রোজ যে মাছ ধরবে তাই তো গ্যারাণ্টারের কাজ করে। জল থেকে মাছ তোলামাত্র বিক্রি হয়ে যায়—সেই বিক্রির টাকার একটা অংশ প্রতিদিন আপনারা পেয়ে যাবেন নগদ টাকায়, এতে কোনও ঝুঁকি থাকছে না।'

'অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের পক্ষে প্রতিদিন সমুদ্রের ধারে গিয়ে টাকা কালেক্ট করা সম্ভব নয়। আমাদের সেই ব্যবস্থা নেই।'

'ও। কিন্তু ওরা যদি কো-অপারেটিভ তৈরি করে, তাহলে সেই কো-অপারেটিভ আইনমারফিক রেজিস্ট্রি করানো হবে। রেজিস্টার্ড কো-অপারেটিভকে লোন দিতে ব্যাঙ্কের আপত্তি হবে কেন? কারণ কো-অপারেটিভের মেম্বাররা সরকারের কাছে বাঁধা থাকছে।'

ভদ্রমহিলা এবার হাসলেন, 'আপনি দেখছি সব আইন জেনে আমার কাছে এসেছেন। ঠিক আছে, আপনারা আগে আইনসম্পন্ন কাজগুলো শেষ করে আমাদের কাছে আবেদন করুন, আমি ভেবে দেখব কি করা যায়।'

নীল মাথা নাড়ল, 'না, এতে ওদের বিপদ আরও বেড়ে যাবে।'

'কি রকম?'

'আপনাকে বলেছি ওরা আপাদমস্তক পাইকারের কাছে শীধা পড়ে আছে। কো-অপারেটিভ তৈরি হচ্ছে জানলেই পাইকাররা ওদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে। নিজেদের মোটা মুনাফা বন্ধ হয়ে যাক তা ওরা চাইবে না। তারপরে যদি আপনারা পিছিয়ে যান, তাহলে কোনদিন ওরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আপনার প্রতিশ্রুতি পেলে গোপনে কাজ শুরু করা হবে।'

'আপনি কি ওদের সঙ্গে আছেন?'

'হ্যাঁ। তবে আমি কো-অপারেটিভের সদস্য হচ্ছি না। যারা রাত জেগে ভালে নেমে মাছ ধরে তারাই সদস্য হবে।'

'কত টাকা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার চাইছেন আপনারা?'

'মোট চল্লিশটি পরিবারকে মাথা পিছু দশ হাজার করে ধার দেয় পাইকাররা, অর্থাৎ এক হাজারের কম টাকায় ওদের মাস চালাতে হয়। অথচ ওরা যে মাছ ধরে তা বিক্রি করলে মাসে অন্তত ছয় হাজার টাকা রোজগার হতে পারত। আপনি ছয় লক্ষ টাকা ধার দিন, সুদসমেত ওই ধার পাঁচ বছরে শোধ করে দেওয়া হবে।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'এই পরিমাণ টাকা ধার দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।'

'তাহলে?' নীল মিইয়ে গেল।

'আপনাদের আবেদন পেলে আমি সেটা হেড অফিসে পাঠিয়ে দিতে পারি। হেড অফিস অনুমোদন করলে ওই টাকা কো-অপারেটিভ পেতে পারে।'

'হেড অফিস কি অনুমোদন করবে?'

'এটা নির্ভর করছে টাকাটা ফিরে আসবে কিনা তার বাস্তব রিপোর্টের ওপর। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে, এসবের পেছনে আপনার কি স্বার্থ থাকছে?'

'স্বার্থ? আমার?' নীল হেসে উঠল, 'এই প্রশ্ন আপনি করতেই পারেন। আমি মানুষের অতি সাধারণ সামাজিক দায় থেকে আপনার কাছে এই প্রস্তাব এনেছি। এখন এ কথা বিশ্বাস করা বা না করা আপনার ওপর নির্ভর করছে।'

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন 'ঠিক আছে, কিন্তু যা আমার হাতে নেই তার সম্পর্কে কোনও কথা আমি দিতে পারি না। আপনারা আবেদন করুন, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা করবেন?'

ভদ্রমহিলা তাকালেন, 'হ্যাঁ।'

নীল উঠে দাঁড়াল, 'অনেক ধন্যবাদ মিনেস গুপ্তা।'

ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'আপনি ভুল করছেন, আমার নাম কনিকা গুপ্তা। আমার হাতে এই লোহার বাল্য দেখে বিবাহিতা ভাবার কোনও কারণ নেই।'

রাস্তার নেমে সিগারেট ধরান নীল। অনেকক্ষণ কোনও নেশা করা হয়নি। সকাল থেকে এক ফোঁটা মদ পেটে পড়েনি। এখানে দিশি মদের ঠেক কোথায় আছে খুঁজে বের করা দরকার। কিন্তু না, তাকে দ্বিতীয় কাজটা করতে হবে। ব্যাকের সুন্দরী ম্যানেজার যখন কথা দিয়েছেন চেষ্টা করবেন, তখন পরের কাজটা খুব জরুরি হয়ে উঠেছে। একটা রিকশা নিল সে। কিন্তু রিকশায় বসেই জিভে যে প্রশ্ন এসে গেল সেটা করার ইচ্ছে ছিল না। রিকশাওয়ালা তাকাল, 'দিশি না বিলাইতি?'

'বিলিতি মদ বসে খাওয়ার ব্যবস্থা আছে এখানে?'

'জী।'

'তাহলে সেখানেই নিয়ে চল।'

নীল নিভেকে বোঝাল এক গ্লাস মদ খেলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। উলটে শরীর চনমনে হয়ে উঠবে। ঠিকঠাক লোকটাকে খুঁজে বের করতে কাজে লাগবে। যে বাড়িটার সামনে রিকশাওয়ালা থামল সেটা একেবারে ফাঁকা জায়গায়। বেশ বড়সড় বাড়িটার অবস্থা এখন জীর্ণ। মালিকের অর্থাভাব ওর দেওয়াল দেখলেই বোঝা যায়। দশটা টাকা নিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, 'সোজা ভেতরে চলে যান—পেয়ে যাবেন।'

আজকাল চট করে কাউকে বিশ্বাস করতে অনুবিধে হয়। তবু নীল হাঁটল। প্যাসেঞ্জ দিয়ে হাঁটতেই তার নাক টের গেল। মদের গন্ধ বাতাসে উঠছে। রিকশাওয়ালা মিথ্যে বলেনি। হঠাৎ বণ্ডামার্কী একটা লোক সামনে এসে দাঁড়াল, 'কি চাই?'

'এখানে যেজনো সবাই আসে তাই চাই।' নীল ভবাব দিল।

'কোথায় থাকা হয়?'

'বাঃ, এর পর রেশনকার্ড দেখতে চাইবে নাকি?'

'অজানা লোককে এখানে ঢুকতে দেওয়া হয় না।'

সেই সময় ভেতরে গোলমাল হচ্ছে বোঝা গেল। আর একটা বণ্ডামার্কী লোক রোগা বেঁটে একটি মানুষকে প্রায় পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এসে ছুঁড়ে ফেলল মাটিতে, 'এই শেষবার, আবার যদি তোকে এখানে দেখি তাহলে মাটিতে পুঁতে ফেলব!'

'তুমি—তুমি, আমার গায়ে হাত তুললে? তুমি জানো আমি কে?' রোগা লোকটা মাটি থেকে উঠতে উঠতে চেঁচিয়ে কথাগুলো বলল।

'ছোঃ! তোর মত উকিল আমি অনেক দেখেছি।'

নীলের সামনে দাঁড়ানো লোকটা তার নঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'আরে আমার প্রথম থেকে সন্দেহ হচ্ছিল। এক গ্লাস মদ নিয়ে দু-ঘন্টা ধরে এর কাছে ওর কাছে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে, ফিসফিস করে কথা বলছে। কি বলছে জানো? মদ খেয়ো না, মদ খুব খারাপ জিনিস—ওধু তোমার সংসার ডুবিয়ে দেবে না, তোমার লিভার পচিয়ে দেবে। বোঝ! শাল্য আমাদের বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে!'

দ্বিতীয় লোকটি হাত তুলল, 'আবার যদি এদিকে দেখি তো জ্যান্ত ছাড়ব না!'

'তুমি জানো আমি কে? আমি উকিল—ওকালতি করি। তোমাকে কাঠগড়ায় তুলব।'

এবার প্রথম লোকটি এগিয়ে গেল, 'এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। এগু আগে একবার বাজারে বেশ্যাদের তুলে দিতে গিয়ে জোর মার খেয়েছিলে তুমি, তাই না? তাতেও শিক্ষা হয়নি? আরে এখানে তোমার বাবার বাবাদের টিকি বাঁধা আছে—বা ফোট! তারপর নীলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কেটে পড়ুন। এটা প্রাইভেট জায়গা। কাকে ঢুকতে দেব সেটা আমাদের ওপর নির্ভর করে।' লোকটা ভেতরে চলে গেল।

নীল এবার উকিলের দিকে তাকাল, 'আপনি আমার বারোটা বাজালেন!'

'কেন আমি কি করলাম?' পিটিপিট করল উকিলের চোখদুটো।

'আপনি ঝামেলা পাকালেন বলে ওরা আমাকে ঢুকতে দিল না!'

এবার একগাল হাসল উকিল, 'ভগবান যা করেন ভালর জন্যেই। এই যে আপনার পেটে আজ মদ পড়ল না, কত উপকার হল বলুন তো! মদ হল এক সর্বনেশে নেশা। আত্মহত্যা করলে তো মিটে গেল, মদ তিল তিল করে আত্মহত্যা করায়—তার যন্ত্রণা খুব খারাপ!'

'আপনি ওকালতি করেন, না সমাজসংস্কারক?'

'আমি মানুষের ভাল চাই। বাবা টাকা খরচ করে ওকালতি পড়িয়েছিলেন। উকিল হয়ে কোর্টে দাঁড়িয়ে দেখলাম মিথ্যে কথা না বলতে পারলে, সাক্ষীদের দিয়ে মিথ্যে না বলতে পারলে আমি জীবনে কোনও কেস জিততে পারব না। নিজেকে প্রমাণ করলাম, আমার কি করা উচিত? উত্তর যাই হোক না কেন, মল্লেরা আমাকে ছেড়ে পালান। যাক গে, চলি। এখন শুধু মামলার কাগজপত্র লিখে ডালভাতের জোগাড় করি, সেই কাজ পড়ে আছে।'

উকিল রাস্তার দিকে পা বাড়াতে নীল তার সঙ্গ নিল। নীল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি থানায় যাচ্ছেন না কেন? আপনি চান লোকে মদ্যপান না করুক, থানায় গিয়ে নালিশ করুন এদের বিরুদ্ধে!'

'কোনও লাভ হবে না। এরা একটা লাইসেন্স বের করে রেখেছে, তাছাড়া থানা-পুলিশ এদের হাতের মুঠোয়। ভাল কাজ করা খুব সহজ নয় মশাই।'

'আপনি ভাল করতে কাজ ভালবাসেন?'

'আমি একা লোক মশাই। পৃথিবীতে যে কদিন থাকব কিছু ভাল কাজ না করে গেলে ভগবানকে কি কেফিয়ত দেব?' উকিল বসন্ত

'বাঃ, ভাল হল। আপনার সঙ্গে ডাক্তারি কথা আছে। কোথাও একটু বস। যাক।' নীল চারপাশে তাকাল। দূরে রাস্তার ধারে বাঁখারির বেড়া দেওয়া চায়ের দোকান চোখে পড়ল। সে উকিলকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে বেঞ্চিতে বসে থকুম দিল, 'দুটো চা।'

'কী ব্যাপার বলুন তো?' উকিলের চোখ পিটপিট করল।

'ভগবান যা করেন তা ভালর জন্যে।' উকিলের গলা নকল করল নীল, 'আমি যদি মদ খেতে না আসতাম তাহলে আপনার দেখা পেতাম না। লোকটা যদি প্রথমেই আমাকে ঢুকতে দিত, তাহলেও দেখা পেতাম না। আপনাকে ঝামেলা করার জন্যে ওই মুহুর্তে বের করে না দিলেও তাই হত। আমার নাম নীল—আপনার?'

'হরিহর পট্টবর্ধন।'

'বাঃ! আপনার মত মানুষের দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।'

'ইয়াকি করছেন?'

'ছি ছি। নিন, চা নিন।' চায়ের গ্রাস হাতে নিয়ে নীল বলল, 'আপনাকে ব্যাপারটা বলি, একটু মন দিয়ে শুনুন।' নীল তার পরিকল্পনার কথা বলল। কি ভাবে জেলেরা শোধিত হচ্ছে, তাদের বাঁচানোর জন্যে কো-অপারেটিভ সংস্থা তৈরি করে ব্যাকের কাছে ঋণ নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই।

হরিহর বলল, 'আরে, এই সমস্যার সমাধান করতে সরকারই উদ্যোগী হয়েছে। কৃষিজীবী, মৎস্যজীবীদের রক্ষা করতে সরকারই কো-অপারেটিভ করতে বলছে।'

'হয়তো! কিন্তু এখনও পর্যন্ত পানসায়রে কোনও সরকারী কর্মচারী যায়নি।'

'কিংবা গেলেও ওই পাইকাররা তাদের কিনে নিয়েছে।' হরিহর বলল।

'অসম্ভব নয়। আপনাকে এদের সাহায্য করতে হবে। কো-অপারেটিভ তৈরি করতে গেলে যা যা করা উচিত তা আপনি কি করতে পারবেন?'

'কি রকম?' একটি আইনসঙ্গত কো-অপারেটিভ সংস্থা আপনি তৈরি করে দিন। যা কাগজপত্র তৈরি করতে হয় তা করে দিন। সরকারের কাছে সে সব ভ্রমা দিয়ে রেজিস্ট্রি করিয়ে দিন।'

'এ তো ভালো কথা, ভালো কাজ। করতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু কিছু টাকা খরচ হবে, বিনিয়োগ করতে হবে। আপনি কি করতে পারবেন?'

'খরচ যা হবার তা করা হবে।'

'আপনার ওই গরিব জেলেরা টাকা দেবে?'

'না। ওরা কোথায় টাকা পাবে? হাজার পাঁচ-দশ আমি দিতে পারি।'

‘না, আপনার দানের টাকায় কো-অপারেটিভ হলে ওদের মর্যাদা বাড়বে না। আপনি ধার দিতে পারেন, ব্যাঙ্কের লোন শোধ করার সময় এই টাকাও শোধ করবে।’

‘আপনার পারিশ্রমিক এবার বলুন?’

হরিহর হাসল, ‘আপনি ওই গরিব মানুষদের জন্যে অত টাকা খরচ করতে পারেন, আর আমি বিনা পারিশ্রমিকে কাজটা করে দিতে পারব না।’

‘ওউ। জেলোদের দিয়ে সইসাবুদ যা করাবার তা আমি করিয়ে নেব। কিন্তু খবরটা যেন জ্ঞানাজানি না হয়ে যায়, কারণ পাইকাররা ক্ষেপে যাবে।’

‘খুব গোপনে করতে হবে তো? ঠিক আছে, কেউ টেরটি পাবে না।’ হরিহর বলল, ‘পানসায়রে গিয়ে কোথায় খোঁজ করতে হবে?’

‘জেলোবস্তির ওপাশে টিলার ওপর বাড়িতে আমি থাকি।’ নীল বলল।

চোখ বন্ধ করে ব্যাপারটা বুঝে নিল হরিহর, তারপর জিজ্ঞাসা করল, ‘ওরকম জায়গায় নীলবাবু কর্মটা কি করেন?’

‘কিছু না। জমালো টাকা যতদিন থাকবে ততদিন কিছু করব না।’

‘পরিবার?’

‘দূর! ওসব ধান্নায় আমি নেই।’

‘আমি, এই ধরুন, আজ হুঁস সোমবার—মসল, বৃধ, বৃহস্পতি ওখানে পৌঁছে যাব। আপনি কি বিশ্বাস করে আমাকে এই যাকে বলে শ’পাঁচেক টাকা এখন দিতে পারবেন? না, থাক। যা খরচ হবে তা বৃহস্পতিবার ওখানে গেলে দিয়ে দেবেন।’

‘তাহলে আপনাকে এখন বিশ্বাস করা উচিত নয় বলছেন?’

‘তা একপ্রকার—আপনি আমার ঠিকানা জানেন না, যে নামটা বলেছি তা যে বানানো নয় তারই বা প্রমাণ কি? আচ্ছা, কি নাম হবে কো-অপারেটিভের?’

‘নামটা আপনিই দিন না।’

হরিহর আবার চোখ বন্ধ করল, ‘উঁ উঁ—এই ধরুন, পানসায়র মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি। সব কিছু কভার করা হয়ে গেল—আঁা, চলবে না?’

‘খুব ভাল নাম। বাংলায় আমি এরকম নাম ভাবতেই পারতাম না।’

‘তাহলে এখন বিদায় হই?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘নীলবাবু, ভারি ভাল লাগল আলাপ করে। তবে একটা অনুরোধ, মদ্যপান করবেন না। অতি খারাপ নেশা ওটা।’ হরিহর হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল।

নীলের মনে হল লোকটার ওপর আস্থা রাখা যায়। নইলে বৃহস্পতিবার বিকেলে আবার এখানে আসতে হবে। সে আবার রিক্সা নিয়ে সরকারী সমবায় দপ্তরে গেল। সেখান থেকে খোঁজখবর নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে আসতে আসতে প্রায় বিকেল। এখন পানসায়রে ফিরে গিয়ে জেলোদের বোঝাতে হবে। এই বোঝানোর ব্যাপারটা খুব সহজ কাজ হবে না। লোকগুলো এখনও স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেবেনি। একটা পদ্ধতি থেকে নতুন আর একটা পদ্ধতিতে যেতে ওরা ভয় পেতে পারে, সেই সঙ্গে সঙ্কোচও। যে কয়েকজন তরুণের সঙ্গে নীলের আলাপ আছে তাদের আগে বোঝাতে হবে।

বাসের জন্যে বেশ কিছু লোক অপেক্ষা করছিল। নীলের মনে হল অনেকদিন বাদে সে বহুসময় মদ্যপান না করে আছে। হরিহর মর্ত্তমান বিবেকের মত আজ উদয় হল। সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে ছিল, এইসময় একটা জীপ দ্রুত সামনে দিয়ে ছুটে যেতে যেতে সশব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াল। নীল চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখল জীপ গিছিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল, সতর্ক হও। চট করে ভিড়ের আড়ালে সরে গেল সে। তারপর পান-সিগারেটের দোকানের আড়াল নিয়ে অনেকটা দূরে গাছের পাশে চলে এল। জীপ থেকে দুটো লোক নেমে চারপাশে তাকাতে লাগল। তারপর ড্রাইভারের পাশে বসা মোটা লোকটাকে কিছু বলল। মোটা লোকটা মাথা নেড়ে আঙুল তুলে সেই জায়গাটা দেখাল যেখানে একটু আগে নীল দাঁড়িয়েছিল। মোটা লোকটাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না নীল। নিচে নেমে দাঁড়ানো লোকদুটোকে সে চেনে না। এবার লোকদুটো আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। নীল এবার নিশ্চিত হল ওরা তাকেই খুঁজছে।

লোকদুটো পানের দোকান পর্যন্ত চলে এসেছিল, এই সময় বাস এল। বাস আসতেই ভিড়টা দৌড়ঝাঁপ করে তার পেটে ঢুকে পড়ল। অসহায়ের মতো বাসটাকে চলে যেতে দেখল নীল। কিন্তু জীপ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। লোক দুটো ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই কাউকে না পাওয়ার কথা বলছে। এবার মোটা লোকটা ইশারা করতেই ওরা জীপে উঠে পড়ল, জীপ চলে গেল।

এতক্ষণে নীল নিশ্চিত হল ওরা তাকেই খুঁজছিল। কিন্তু এরা কারা? পাইকার? অসম্ভব! এত দ্রুত পাইকাররা খবর পেতে পারে না। কণিকা ওপুা নিশ্চয়ই সে চলে আসার পর টেলিফোন তুলে কোনও পাইকারকে জানিয়ে দেবেন না কি উদ্দেশ্যে সে শহরে এসেছে। আর হরিহর উকিনকে দু-নম্বরী লোক বলে ভাবার কোনও কারণ এখনও হয়নি। এরকম ভাবতেই নিজেকে গালাগাল দিল নীল। এত দ্রুত সম্পূর্ণ অচেনা দুজন মানুষকে সে বিশ্বাস করছে কোন যুক্তিতে? যেখানে চেনাপরিচিত মানুষগুলোই বিশ্বাসঘাতকতার ছুরি আঙিনে নুকিয়ে রাখে, পৃথিবীর মানুষগুলো সম্পর্কে অস্থির হয়ে যখন তাকে চলে আসতে হয়েছে এই নির্জনতায়, তখন আলটপকা এদের ভাল ভেবে নেওয়ার কোনও কারণ নেই। গাছের আড়াল থেকে নীল বেরিয়ে এল।

হঠাৎ তার মনে হল গর্ত খুঁজে নুকিয়ে থেকে কোন লাভ নেই। যাই ঘটুক না কেন তাকে মোকাবিলা করতে হবে। এরকম ভাবতেই অবস্টি কমে গেল অনেকটা। পানের দোকানদার তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি একটু আগে এখানে বাসের জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন না?'

নীল মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, হঠাৎ এমন পেট কামড়ালো—'

'ও। আপনাকে দুটো লোক খুঁজছিল।'

'আমাকে?'

'হ্যাঁ, আপনার জামাপ্যাণ্টের বর্ণনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করছিল জানে জানে। ওরা জীপে করে এসেছিল। শেষ পর্যন্ত না পেয়ে চলে গেল।'

'আপনি লোকগুলোকে চেনেন? এখানকার লোক?'

'না, আগে দেখিনি। আপনি কোথায় যাবেন?'

'পানসায়র।'

'যাঃ, আর তো বাস নেই। যাবেন কি করে? ওটাই লাস্ট বাস ছিল।'

'সেকি।'

পানওয়লা হাসল, 'বড্ড অসময়ে আপনার পেট কামড়িয়েছে। কাল সকাল আটটার আগে কোনও বাস নেই। এখানে জানাশোনা কেউ থাকলে তার বাড়ি চলে যান।'

মাথা নাড়ল নীল। যেন উপদেশটা মান্য করল। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। ভূমি যতই ভাল থাকতে চাও, রাতারাতি তা থাকা যাবে না। অতীত তোমাকে সবসময় তাড়া করবে। নইলে ভয় পেয়ে সে আড়ালে চলে গিয়েছিল কেন? না গেলে ওই বাস্‌এ সে এতক্ষণ পানসায়রের দিকে এগিয়ে যেতে পারত।

রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে। আরও একটু এগোলেই রাস্তাটা গোপালপুরের দিকে বাঁক নিয়েছে। সোজা গেলে পানসায়র। গাড়িগুলো যাচ্ছে গোপালপুরের দিকে। এই সময় একটা মোটরবাইকের আওয়াজ কানে আসতেই নীল পেছনে তাকাল। এখানকার মানুষ মোটরবাইক চালানোর সময় হেলমেট পরে না—পুলিশও কড়াকড়ি করে না। মোটরবাইকের আরোহী তাকে দেখে পাশে এসে দাঁড়াল, 'আপনি পানসায়রে থাকেন না?'

সন্দিক্ধ চোখে তাকাল নীল, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক ধরেছি। আপনাকে আমি ওখানে দেখেছি। মাঝে মাঝে মাছ কেমন জালে পড়ছে দেখতে যাই আমি। তখন আপনাকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। ওইরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় তো ভদ্রলোকদের দেখা যায় না। তা শুনলাম আপনি সেই আর্টিস্টের বাড়ি কিনে নিয়ে আছেন? একেবারে সাধুসন্ন্যাসীর জীবন নাকি?'

লোকটি পানখাওয়া দাঁতে হাসল।

'না, একা থাকতে ভাল লাগে, তাই।'

'আমি হলে মরে যেতাম। নইলে চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেতে হত।'

pathagar.net

রীরে আর রক্ত নেই, অ্যালকোহল পাক যাচ্ছে! আপনার

আর থেকে একটা পাইট বের করে এগিয়ে দিল, 'নিম, গলা

ম তার কখনই ভাল লাগে না, কিন্তু এখন মন্দ লাগল না।

পানসায়রে কিভাবে যাওয়া যায় বলুন তো? ওনলাম লাস্ট

টা ভাড়া করে যেতে পারেন। হেভি চার্জ করবে! আমি যাব

পারেন ততই মঙ্গল। উঠুন!' লোকটা বোতলটা ক্যারিয়ারে

কটোর বাইক চলতে শুরু করল, তারপর গলা তুলে জিজ্ঞাসা

ম সাহেব সাহেব চেহারা বাঙালীর খুব কম হয়!

পানসায়রে কিভাবে যাওয়া যায় বলুন তো? ওনলাম লাস্ট

টা ভাড়া করে যেতে পারেন। হেভি চার্জ করবে! আমি যাব

পারেন ততই মঙ্গল। উঠুন!' লোকটা বোতলটা ক্যারিয়ারে

কটোর বাইক চলতে শুরু করল, তারপর গলা তুলে জিজ্ঞাসা

ম সাহেব সাহেব চেহারা বাঙালীর খুব কম হয়!

পানসায়রে কিভাবে যাওয়া যায় বলুন তো? ওনলাম লাস্ট

টা ভাড়া করে যেতে পারেন। হেভি চার্জ করবে! আমি যাব

পারেন ততই মঙ্গল। উঠুন!' লোকটা বোতলটা ক্যারিয়ারে

কটোর বাইক চলতে শুরু করল, তারপর গলা তুলে জিজ্ঞাসা

ম সাহেব সাহেব চেহারা বাঙালীর খুব কম হয়!

পানসায়রে কিভাবে যাওয়া যায় বলুন তো? ওনলাম লাস্ট

টা ভাড়া করে যেতে পারেন। হেভি চার্জ করবে! আমি যাব

পারেন ততই মঙ্গল। উঠুন!' লোকটা বোতলটা ক্যারিয়ারে

কটোর বাইক চলতে শুরু করল, তারপর গলা তুলে জিজ্ঞাসা

ম সাহেব সাহেব চেহারা বাঙালীর খুব কম হয়!

পানসায়রে কিভাবে যাওয়া যায় বলুন তো? ওনলাম লাস্ট

টা ভাড়া করে যেতে পারেন। হেভি চার্জ করবে! আমি যাব

পারেন ততই মঙ্গল। উঠুন!' লোকটা বোতলটা ক্যারিয়ারে

কটোর বাইক চলতে শুরু করল, তারপর গলা তুলে জিজ্ঞাসা

ম সাহেব সাহেব চেহারা বাঙালীর খুব কম হয়!

পানসায়রে কিভাবে যাওয়া যায় বলুন তো? ওনলাম লাস্ট

টা ভাড়া করে যেতে পারেন। হেভি চার্জ করবে! আমি যাব

পারেন ততই মঙ্গল। উঠুন!' লোকটা বোতলটা ক্যারিয়ারে

কটোর বাইক চলতে শুরু করল, তারপর গলা তুলে জিজ্ঞাসা

ম সাহেব সাহেব চেহারা বাঙালীর খুব কম হয়!

পানসায়রে কিভাবে যাওয়া যায় বলুন তো? ওনলাম লাস্ট

টা ভাড়া করে যেতে পারেন। হেভি চার্জ করবে! আমি যাব

পারেন ততই মঙ্গল। উঠুন!' লোকটা বোতলটা ক্যারিয়ারে

কটোর বাইক চলতে শুরু করল, তারপর গলা তুলে জিজ্ঞাসা

ম সাহেব সাহেব চেহারা বাঙালীর খুব কম হয়!

পানসায়রে কিভাবে যাওয়া যায় বলুন তো? ওনলাম লাস্ট

টা ভাড়া করে যেতে পারেন। হেভি চার্জ করবে! আমি যাব

পারেন ততই মঙ্গল। উঠুন!' লোকটা বোতলটা ক্যারিয়ারে

ছেলেদের দু-চক্ষে দেখতে পারে না। কাজের জন্যে যেটুকু

আমি অকৃতজ্ঞ নই মশাই, বস্ আমাকে খুব স্নেহ করেন—

দিয়েছিলেন। কিন্তু যা সত্যি তা তো বলতেই হবে। মেয়ে

বোকা মেয়েদের খুব পছন্দ করে—কিছু বুঝলেন?' জগদীশ

নীল বলল, 'আমেরিকায় শুনেছি এরকম হয়।'

'দূর মশাই। এটা কি আমেরিকা?' জগদীশ চোঁচালো

'আপনার বস্ কিছু বলেন না?'

'বস্—এর সময় কোথায়? আজ এখানে কাল ভুবনেশ্বর

মুখাই। প্রব্রম হয়েছে কি জানেন, বস্ এই মাছের ব্যবসা

'এতে প্রব্রম কিসের?'

'আরে আপনাকে দেখে তো বুদ্ধিমান বলে মনে

জগদীশ। দু-পাশে শুধু চাষের ক্ষেত। মানুষের কোন

বোতল বের করে গলায় ঢালল জগদীশ। ঢক ঢক করে

তারপর বলল, 'কোকিলার সঙ্গে ব্যবসা করার কথা তো

'কোকিলা' বোতল গলায় ঢালার আগে প্রশ্ন করল

'বস্—এর মেয়ের নাম। আমি কেন আলাদা ব্যবসা কর

নরম লোক। ছেলেদের বেশি ঠকাতে চাই না। বস্ চল

'এটা আপনি অনুমান করছেন। বাস্তবে নাও হতে

'আপনি ওকে চেনেন না। পাঁচ বছর সানফ্রান্সিসকো

নেই।'

বাইক এখন একটি আধা শহরে জায়গা দিয়ে যাচ্ছি

থেকে পানসায়র আধঘন্টার পথ। সন্ধে হয়ে গেছে। অ

'এখানে কোনও হোটেল নেই?' নীল জিজ্ঞাসা কর

হো হো করে হাসল জগদীশ। তারপর বলল, 'আপ

আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আপনি আমার এক বো

এই ব্যাপারটা অনেকবারই লক্ষ্য করেছে নীল। যা

সম্পর্কে ঈশ্বর দুর্বল হয়। তাছাড়া মদ্যপদের মন সময় সম

নিয়ে যাচ্ছে পানসায়রে, তা ওই হঠাৎ বড় হয়ে ওঠা ম

পানসায়র বাসস্টোপে যখন ওরা পৌঁছালো তখন স

এখন একা অতটা পথ ফিরে যেতে হবে।'

নীল বলল, 'সত্যি আমার খারাপ লাগছে।'

জগদীশ কাঁধ নাচাল। তারপর বাইকের পেট থেকে ক

জামাপ্যাট ভাল পরেছেন, ইংরেজি বলতে পারেন?'

'তা একটু পারি।'

'কি রকম? আমাদের স্কুলের ইংরেজির স্যার মহান

কোকিলার মতো খই ফোটান?'

'দূরকমই।' নীল হাসল।

জগদীশ বাইকে বসে নীলের বাহু আঁকড়ে ধরল, 'স

জানো কোনও আফসোস নেই। শালা, কোকিলা ভাবে ই

যখন তখন আপনার বাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে আসি।'

নীল অবস্থিতে পড়ল। লোকটার কাছে নিশ্চয়ই ক

ভবিষ্যতে ঝামেলার জন্যে দরজা খুলে রাখা। সে বলল

আটকে যাবে। সরাসরি রাস্তা নেই।'

প্রিয় আমার—১২

‘অ। আমি মশাই বাবির ওপর বাইক চালিয়ে এতকাল কাটলাম, রাস্তা কি করে করে নিতে হয় আমি জানি। উঠুন।’ ইঞ্জিন চালু করল জগদীশ।

বাধ্য হন নীল। হেডলাইট জ্বালিয়ে জগদীশ বাইক ছোটালো। ইচ্ছে করেই ঘুর শব্দপথ ছেড়ে পায়ের চাপার বলির পথ বাতলে দিচ্ছিল নীল। কিন্তু লোকটা এত মদ খেয়েও বাবির ওপর বাইক চালানোর কৌশল ভেঙেনি। মাঝে তিনবার বলেছে, ‘একটু নামুন। হেভি ওয়েটে ঢাকা বসে গেছে।’

জিলার ওপর বাড়ির সামনে পৌঁছে জগদীশ বলল, ‘আ-চ্ছা! এই বাড়ি? এখানে একজন আর্টিস্ট থাকতো বলে শুনেছি। আর্টিস্টরা পাগল হয় বলে এদিকে আসিনি।’

দরজা খুলে বড় হারিকেন জ্বালানো নীল। জগদীশ বলল, ‘ইলেকট্রিক নেই?’

‘নাঃ। এদিকে লাইন আসেনি।’

‘বাহ্যারে আছে, এদিকে আসবে না কেন? কালই ব্যবস্থা করছি। একাই থাকেন?’

‘হ্যাঁ। বসুন।’

‘একদম একা?’ দুহাত দুদিকে বাড়াল জগদীশ, ‘রান্নাবান্না?’

‘নিজে যা পারি করে নিই। কোন থ্রেম হয় না।’

‘যাচ্ছিলে! মদ আছে বাড়িতে?’

নীল দিশি মদ বের করল। জগদীশ বলল, ‘এঃ। আগে জানলে বিলিতি বোতল আনা যেত—দিশি মালে গন্ধ লাগে না?’

‘প্রথম প্রথম লাগে। তারপর আর টের পাওয়া যায় না।’ নীল হাসল, ‘চলবে না?’

‘অভাবে স্বভাব নষ্ট—দিন!’ গ্লাস নিয়ে ডেকে চলে গেল জগদীশ। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বেড়ে জায়গা মশাই। উচুতে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকানো মন খারাপ হয়ে যায়।’

‘কেন?’

‘কি জানি! শালা নিজেকে ছোট ছোট বলে মনে হয়।’ ঘুরে দাঁড়াল জগদীশ, ‘সত্যি আপনি এখানে একা থাকেন? নো মেয়েছেলে?’

‘নো।’

‘শ্বাকভে পারেন?’

‘এখনও পর্যন্ত কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।’

‘আনি এখানে থাকলে দু’পাশে দুজনকে রাখতাম।’

‘বাঃ, এখানে বুঝি তাদের সহজে পাওয়া যায়?’

‘কোথায় যায় না! মাল ফেললে ববে দিলি থেকে উড়ে আসবে। এই ব্যাপারটায় দেবছি আপনার সঙ্গে কোকিলার খুব ভাল আছে। ওরও পুরুষমানুষের দরকার নেই, আপনারও মেয়েমানুষ চাই না। দিন—এ একদম ভ্রমের মত মাল!’ গ্লাস উচিয়ে ধরল জগদীশ।

কিন্তু ঘটাবানেকের মধ্যেই জগদীশ ডেকে আধশোওয়া হয়ে গেল। এখন ওর পক্ষে বাইক চালানো সম্ভব নয় বুঝে নীল আরও বিপাকে পড়ল। লোকটা এমনিতে খারাপ নয়। কিন্তু অচেনা লোককে সারারাত থাকতে দিলে ভবিষ্যতে একই ঘটনা ঘটাতে পারে। এই এক ঘণ্টা বকবক করে গেছে জগদীশ। ওর বস্-এর অনেক ব্যবসা। মাছ চালান দেওয়া একটা নিত্য ব্যাপার। আগে বস্-এর এক মাসতুতো ভাই ব্যবসাটা দেখত, সে-ই দাদন দিত জেলেদের—চালান পাঠাত দূর দূর অঞ্চলে। যা হত তার অর্ধেক দেখাতো লোকটা। ওর কাছে কাজ শিখেছে জগদীশ কিন্তু মুখ খোলার সাহস ছিল না। একদিন হঠাৎ ওর ডেডবডি পাওয়া গেল—রাস্তায় পড়ে আছে, কোনও গাড়ি চাপা দিয়ে গেছে। শুনে বস্-এর খুব দুঃখপ্রকাশ করল, তারপর যাওয়ার আগে তাকে ডেকে দায়িত্ব দিয়ে বললেন, ‘বাঁচা টাকা হাতে এলে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। কিন্তু সেটা যদি বেশি বেঠিক হয়, তাহলে—নিজের ডেডবডি তো নিজে দেখা যায় না, এইটুকু যা আনন্দের।’ বুঝে গিয়েছিল জগদীশ। তারপর থেকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করেছে। বস্-এর আয় বেড়েছে দ্বিগুণ। শেষ পর্যন্ত বস্-খুশি হয়ে একটা নৌকার মালিকানা দিয়েছে তাকে। নীল বারংবার জ্ঞানতে চেয়েছিল ওই বস্-এর নাম কি? মাতাল হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জগদীশ নাম বলেনি। শেষ পর্যন্ত সে শুয়ে পড়ল ডেকের ওপর। বাধ্য হয়ে নীল শুকে তুলে শুয়ে দিল বাইরের ঘরের তক্তাপোশের ওপর। রাত তখন এগারোটা।

আজকাল রাতে মদ্যপান করলে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। নীল জানে এই ইচ্ছে না করাটা নিজের

অনুখের পূর্বলক্ষণ। আর আজ সারাদিন প্রায় অভূক্ত অবস্থায় ঘোরাঘুরি করে শরীর কাহিল হয়ে পড়েছিল বলে খেতেও ইচ্ছে করছিল না। তবু সামান্য কিছু খেয়ে নিল নীল। এবং তখনই কানে গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ এল। ঝট করে ডেকে চলে আসতেই চোখে পড়ল বালির ওপর দিয়ে ঢেউ-এরর মতো দুলতে দুলতে দুটো হেডলাইট তার বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়িটা যে জীপ তাতে সন্দেহ নেই।

তার কাছে এই কয়মাসে কোনও শহুরে মানুষ আসেনি। জেলেবস্তির লোকজনই এখানে আসা-যাওয়া করছে। তাই এত রাতে জীপ নিয়ে কেউ আসছে দেখে অস্বস্তিতে পড়ল নীল। তারপরেই মনে পড়ল বিকেলে শহরের বাসস্ট্যান্ডে একটি জীপ তাকে দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেই জীপ নয় তো? মনে হওয়ায় নীলের ইন্দ্রিয় সজাগ হল। দ্রুত সে নিচে নেমে ছুটতে লাগল সমুদ্রের দিকে। জীপটা টিলায় উঠছে বলে তার হেডলাইটের আলো এখন আকাশমুখী। নীলের খেয়াল হল, সমুদ্রের ধারে যাওয়া চলবে না। রাত হলেও তার বাড়ির ডেকে দাঁড়ালে যে কেউ আবছা দেখতে পাবে। সে বাঁদিকে সরে একটা বালির জমিটা ঢেউ-এর খাঁজে নিজেকে আড়াল করল। সমুদ্র এখন প্রবল গর্জন করছে, বাতাসের দাপট খুব।

জীপের আওয়াজ থেমে গেছে। ওপর থেকে কোনও শব্দ ভেসে আসছে না। এক দুই করে মিনিট চারেক যাওয়ার পর দুটো আওয়াজ একসঙ্গে কানে এল। জীপ চালু হয়েছে, সেই সঙ্গে মোটরবাইকও। তারপর আওয়াজ দুটো দূরে সরে যাচ্ছিল, নীল বেরিয়ে এসে ওপরে উঠল।

বাড়িটা চূপচাপ। নিচে মোটরবাইক নেই। সতর্কপণে ওপরে উঠল নীল। বাইরে ঘরের তক্তাপোষ শূন্য। জগদীশ নেই। আলো যেমন জ্বলছিল তেমনই জ্বলছে। জিনিসপত্রে কেউ হাত দেয়নি। জগদীশের যে অবস্থা ছিল তাতে তার পক্ষে ঘুম থেকে উঠে বাইক চালিয়ে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তা হলে? যারা এসেছিল তারা কি জগদীশের সন্ধানেই ছিল? জগদীশ যে এখানে এসেছে তা জানতে পারা অসম্ভব নয়, যদি বাসস্ট্যান্ডের কেউ তাকে আর জগদীশকে বাইকে চেপে এ দিকে আসতে দেখে থাকে। কিন্তু কারা জগদীশকে নিয়ে গেল? শহরের বাসস্ট্যান্ডে যারা তার খোঁজ করেছে তাই যদি জীপে চেপে এসে থাকে, তাহলে জগদীশ সম্পর্কে তারা আগ্রহী হবে কেন?

নীল দরজা বন্ধ করল। শোওয়ার ঘরে এসে খাটের নিচে হাত দিতেই রিভলভারটা বেরিয়ে এল। লুকিয়ে রাখার পক্ষে এমন নিরাপদ জায়গা আর পাওয়া যাবে না। পাঁচটা গুলি আছে। এর একটাও যেন ছোঁড়ার দরকার না পড়ে, এমন ভেবেছে প্রতিদিন। কিন্তু এটা সঙ্গে থাকলে আত্মবিশ্বাস বাড়ে। তার মন বলছিল—পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে চলেছে। সে শান্তিতে চূপচাপ থাকতে চাইলেই যে থাকতে পারবে তার আর নিশ্চয়তা কোথায়?

আলো নিভিয়ে দিল নীল। রিভলভার হাতের পাশে রেখে বালিশে মাথা রাখতেই মনে হল কী আরাম! কিন্তু এখন চট করে ঘুম আসবে না। তার নার্ভ খুব টানটান হয়ে আছে। সে নিজেকে বোঝাল—যারা এসেছিল তারা শত্রু নাও হতে পারে। শত্রু হলে এখানে তার জন্যে অপেক্ষা করত। জগদীশকে তুলে নিয়ে যেত না। ভাবনাটা এমন হলেও মন মানছিল না তার। বাইরে সমুদ্রের গর্জন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। সেটা কিছুক্ষণ শুনলে একটা একঘেয়েমি তৈরি হয়। আর সেটা হলে নার্ভ শিথিল হয়ে পড়ে। নীল কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তা সে নিজেই জানে না।

সকাল এল সকালের মতো। বকবকে রোদ নিয়ে আকাশ ঝলমলিয়ে উঠল। এখন মাছ ধরার মরশুম। সারারাত সমুদ্রে বাতি জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে জেলে-নৌকোগুলো ফিরে এসেছিল নূর্য ওঠার আগে। মাছের বিলিব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল নিয়মমত। দড়ি টেনে নৌকোগুলোকে বালির ওপর ঘঘটিয়ে তুলে রাখা হয়েছে জল থেকে অনেকদূরের নিরাপদ জায়গায়। সমুদ্রের ধার এখন শুনসান।

দেরিতে ঘুম ভেঙেছিল নীলের। তৈরি হয়ে চা খেয়ে মনে পড়ল রিভলভারটার কথা। সেটাকে খাটের তলায় আটায় ঢুকিয়ে রাখতে গিয়ে মত পালটালো সে। পকেটে রাখল ওটাকে, এখন সতর্ক থাকা দরকার। যদিও এখানে চোর নেই, চুরিচামারির কথা শোনা যায় না—তবু দরজা বন্ধ করে নিচে নামল নীল। হাঁটতে হাঁটতে জেলেবস্তিতে পৌঁছে গেল।

পুরো বস্তিটার অবস্থা খুব করুণ। পাকা বাড়ি বলতে দুটো। বাকি সবই টিন আর ইটের গাঁথুনি। সকালের এই সময় তাজা যুবক বা প্রৌঢ়দের দেখা পাওয়া ভার। সারারাত জেগে এখন যে যার বিছানায় শরীর

এলিয়ে দিয়েছে। একমাত্র বৃদ্ধেরই বসেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই বস্তির একজন প্রধান আছেন। লোকটার বয়স হলো একেবারে ভেঙে পড়েনি শরীর। অথচ ওর মুখের বিভিন্ন আশুন কখনও নেভে না। একটা খুপড়ির চারের সোকানের নামনে 'খামিতে গোঁড়া' বোঝাতে বসে প্রধান আর কয়েকজন বৃদ্ধের সঙ্গে গল্প করছিল বিড়ি খেতে খেতে। নোকানদার গাল হাত দিয়ে বসে সেই গল্প শুনছিল। বেচারাকে সংসার চলাতে হয় জেলেবস্তির খদ্দেরের ওপর নির্ভর করে। দিলে হুড়ি তাপ চা বিক্রি হলে ধন্য মনে করে নিজেতে।

নীলকে দেখে শুধুন উঠল। কাছে এসে নীল নমস্কার করতাই প্রধান বলল, 'আসুন আসুন সাহেব। সাতসকালে কি মনে করে? কোনও অসুবিধে হয়েছে?' কথা বলার সময় লোকটা জিত দিয়ে বিড়িটা টোটেটর এক কোণে ঢালান বসে দেয়।

নীল হাসল, 'না—কিছু না। রোজ নিজে চা বানিয়ে খাই, আজ ভাবলাম ওঁর হাতের চা খাব। দিন দানা, সবাইকে এক কাপ করে চা দিন।'

'সবাইকে?' নোকানদার খাড়া হয়ে গেল।

নীল বলল, 'হ্যাঁ, আপনাদের চা খেতে আপত্তি নেই জো?'

প্রধান বলল, 'এ কি কথা! আপনি ভালোবেসে খাওয়াচ্ছেন, আপত্তি করতে যাব কেন? দাও ভাই, সবাইকে চা দাও। হ্যাঁ, তারপর খবর কি বলুন?'

'এই চলে যাচ্ছে।' নীল হাসল।

'তাহলে আপনি আমাদের মধ্যেই থেকে গেলেন?'

'ভাই তো মনে হচ্ছে।'

'আমি বলি কি, আপনি কেন হাত পুড়িয়ে রান্না করছেন? বরং সংসারের কাজ ব্যাটাছেলের কি সঙ্গে? আমাদের বাড়িতে একটি বউ আছে, ওর স্বামী দু বছর আগে মাদ্রাসে গিয়ে আর তিনজনের সঙ্গে সমুদ্রে ভেসে গিয়েছে। দশ বছর না গেলে সেয়েটাকে বিধবা বলে ধরা হবে না। আর বিধবা না হলে কিয়ৎ দেওয়া যাবে না। মা-বাপের সংসারে ফিরে এসেছে। ওর বাপ হল এই জনার্দন।' প্রধান খামিতেই বসে হাড়জিরঞ্জিরে একটা মোক হাত তুলে নমস্কার করল। প্রধান বলল, 'মেয়েটি ভাল, তবে স্বামীকে হারিয়ে যা হয়, মাথাটা সবসময় ঠিক রাখতে পারে না। কিন্তু হাতের রান্না খুব ভাল। ওই যে বলে না, অতি বড় ঘরগী না পায় ঘর, ওর ওই অবস্থা। তা শুকে রাখুন। দু বেলা গিয়ে রান্না ঘর পরিষ্কার সব করে দিয়ে আসবে। তা কত মাইনে চাও হে জনার্দন? লক্ষ্য না করে বলে দাও।'

জনার্দন আবার হাতজোড় করল, 'আমি আর কি বলব? সে যদি কিছু রোজগার করে তা হলে সাদা ভাত পেয়েও বেঁচে থাকে যায়। এখন আর দড়ি টানতেও পারি না আর ভাল ফেলার ক্ষমতা নেই। তবে একদিন ছিল যখন আমি ভাল হাতে নিলেই লোকে বলত নৌকো ভরে যাবে—আপনারাই ঠিক করে দিন।'

নীল বিপাকে পড়ল, 'কিন্তু আমার তো ওমন কাজ নেই। একা মানুষ, কখনও খাই কখনও খাই না, বুঝতেই পারছেন আমার অবস্থা—'

প্রধান হাত তুলে ধামিয়ে দিল, 'ওটা ঠিক নয়। এই কসমে বেনিফম করলে শরীর যাবে। আপনি ভাল লোক। আমাদের মধ্যে এসেছেন। আপনি সুস্থ থাকলে আমাদের লাভ। না না, বেশি টাকা দিতে হবে না, এই ধরুন দুশো, কি জনার্দন?'

জনার্দন মাথা নাড়ল, 'যা বলবেন।'

নীল চিন্তা করল। এই মুহূর্তে না বললে সে যে পরিকল্পনা করেছে তা ভেঙে যাবে। সে হেসে বলল, 'আপনাদের মত প্রবীণ মানুষেরা বলছেন যখন তখন আমাকে জাবতেই হবে। আমাকে কয়েকটা দিন সময় দিন।' এই সময় চা এসে গেল। ছোট গ্রাসে ঢিঁনি গোলা চা। নীল দেখল সবাই তাই তৃপ্তি করে খাচ্ছে। নীল বলল, 'বললাম আমার কাছে এসেছিল। ওরা মা কেমন আছে?'

'কোনও খবর নেই বাবু। মাকে বাঁচাবার জন্যে ঘরে যাঁ ছিল সব বিক্রি করেছে। কি আর পেয়েছে তা থেকে—আপনি দয়া করে হাজার টাকা দিয়েছিলেন বলে মাকে ভুবনেশ্বরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে পেরেছে। সেখানে যা খরচ ও টাকায় আর কি হবে।' নিঃশ্বাস ফেলল প্রধান, 'এক পেট বিশে নিয়ে বলে থাকি আমরা, শরীর বিকল হয়ে মরে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় চাই। আমি ঠিক করছি ওঁমন অসুস্থ হলে বাছ খরচ নৌকায় সমুদ্রে চলে যাব, তারপর হাত-পা বেঁধে টুক করে জলে নেমে পড়ব।'

নীল হাসল, 'এটা কোনও সমাধান হল?'

‘আর তো কোনও উপায় নেই!’

‘আছে—আপনারা যদি সবাই এক হন তা হলে উপায় আছে।’

‘আমরা তো এক হয়েই আছি।’

‘আপনারা যা মাছ ধরেন তা যদি নিজেরাই বিক্রি করেন, তা হলে কেমন হয়?’

‘তা কি করে সম্ভব?’

‘যদি সম্ভব হয়?’

‘ওঃ, তা হলে তো কথাই নেই! সবার পাকাবাড়ি হয়ে যাবে, ছেলেমেয়েরা শহরের দুলে পড়তে যাবে, দুধেভাতেমোছে থাকবে সব।’ প্রধানের মুখে সঙ্গে সঙ্গে ছায়া নামল, ‘কিন্তু বাবু, তা সম্ভব নয়। মাথা ডুবে গেছে ঝগে। এ গাঁড়াকালের ঝগ সারাবছর মাছ ধরেও শোধ হয় না।’

‘এ বছরের জন্যে দানদ নিয়েছেন?’

‘না। এখন বেবে কেন—এখন তো মাছ ধরে গণ্ডাবারের ঝগ শোধ করা হচ্ছে। দানদ নেবে মরসুম শেষ হলে যখন ঘরে একটা দানাও থাকবে না।’

‘তখন দানদ নেবেন না।’

‘বাবু আমাদের না খেয়ে মরে যেতে বলছেন?’

‘না।’

‘তাহলে? আমরা খাব কি? এই যে ওরা আমাদের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে, আধপেটা ঝিয়েও বাঁচিয়ে রাখছে যাতে মাছ ধরে দিই, এইভাবেই বিঁচে থাকতে হবে আমাদের।’

‘কিন্তু আপনারা দানদ না নিয়েও আরও ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারেন। ব্যাড আপনাদের ঝগ দেবে। তার সুখ বেশি নয়, মাছ ধরে বিক্রি করে নিজেরের জন্যে টাকা রেখে ব্যাডের ঝগ শোধ করবেন। দেখবেন মরসুমের শেষেও আপনারদের হাতে ভাল টাকা থাকবে।’

‘ব্যাড! ব্যাড আমাদের ঝগ দেবে কেন? পানসায়রে কারও টাকা নেই বলে ব্যাডের অফিস বসেনি। আপনি কি পাগল হয়ে গিয়েছেন বাবু?’

‘না। গতকাল আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে এসেছি, ওরা রাষ্ট্রী আছে। কিন্তু শর্ত হল, আপনাদের এক হতে হবে। সব ঝগ পরিহার একত্রিত হয়ে মাছ ধরতে হবে, বিক্রি করতে হবে। বিক্রির টাকায় ব্যাডের ঝগ শোধ করে নিজেরের মধ্যে বাকি টাকা ভাগ করে নাবেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় সমবায় ব্যবস্থা। ব্যাড আপনাকে ঝগ দেবে না, কিন্তু আপনারা সবাই মিলে একটি সমবায় সংস্থা গঠন করে সরকারের অনুমোদন নিলে ব্যাড সেই সংস্থাকে ঝগ দেবে। আপনাদের নিজেরাই নিজেরের মালিক হয়ে যাবেন।’ নীল বোঝাল। এবার একজন বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, ‘কিন্তু পাহিকাররা কোথায় যাবে?’

‘ওরা প্রয়োজন হলে নগদ টাকা দিয়ে আপনাদের কাছ থেকে মাছ কিনবে।’

‘তা কেন নেবে? এতে তো ওদের লস? দানদ দেবার সময় যে দর বেঁধে দেয় সেই দরে দিতে হবে ওদের। বাজারদর যদি দশ টাকা হয়, তবু তিন টাকায় দিতে হবে। ওরা কিছুতেই রাজি হবে না—কি বল প্রধান?’ বুড়ো জিজ্ঞাসা করল।

‘আপনারা ধোঁহেতু ঘাদন মিচ্ছেন না, তাই ওদের ইচ্ছামত দরে আপনাদের মাছ বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারে না। ওদের সঙ্গে আপনাদের কোনও সম্পর্কই থাকছে না।’ নীল বলল।

‘কিন্তু এতদিনের ব্যবসা এক কথায় ছেড়ে দেওয়ার মানুষ ওরা নয়। ওদের টাকা আছে, ক্রমতা আছে, লোকবল আছে। তিন বছর আগে যদুগোপাল দাদনের টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। যদুকু ওরা ধরতে পারেনি বটে কিন্তু ওর ছেলেকে ধরে বেঁধে বাগির তলায় পুতে দিয়েছিল সবার সামনে। পরে পুলিশ এসে যখন লাস বের করল—তখন আমরা কেউ ভয়ে মুখ খুলিনি। অস্ত সাক্ষী রেখে খুন করা সত্ত্বেও পুলিশ কিছু করতে পেরেছে ওদের?’ প্রধান কণ্ঠস্বরে বলে নীলের দিকে তাকাল।

নীল বলল, ‘আপনি ঠিক বলেছেন, ওরা খুব শক্তিশালী। তাই আপনাদের একত্রিত হতে হবে—সবাই এক হয়ে গেলে ওদের চেয়ে আপনাদের শক্তি বেশি হবে। আপনাদের বয়স হয়েছে, কিন্তু আপনাদের ছেলেমেয়ে নাতিনাতিনিদের কথা ভাবুন। সারাজীবন এদের ব্রিতদাস করে রেখে যাবেন, না স্বাধীনতার স্বাদ দেবেন?’

‘স্বাধীনতাই তো চাই বাবু, কিন্তু ওরা জানতে পারলেই—’

‘ঠিক। জ্ঞানতে দেওয়া চলবে না—আপনারা যে সমবায় করছেন এ কথা আগে যেন ওরা জ্ঞানতে না পারে। শহর থেকে উকিলবাবু সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করে আসবেন। প্রতিটি পরিবার থেকে একজন করে সমবায়ের মেসার হবেন। নাম দেওয়া হবে পানসায়র মৎস্যজীবী সমবায় সংস্থা। যাঁদের বয়স হয়েছে, মাছ ধরতে যেতে পারবেন না, তাঁরা সমবায়ের অফিসে বসে কাজ করবেন, টাকাপয়সার হিসেব রাখবেন।’ নীল উঠে দাঁড়াল। চায়ের দাম মিটিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল, ‘আপনারা মনে জোর আনুন, ব্যাপারটা হয়ে গেলে দেখবেন দিন বদলে যাবে।’

নীল হাঁটতে শুরু করতাই জনার্দন তার পেছন পেছন আসতে লাগল। বালির ওপর দাঁড়িয়ে নীল জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কিছু বলবেন?’

হাত জোড় করল জনার্দন, ‘বাবু, আমার মেয়েটার কাজটা যেন হয়—’

নীল এগিয়ে এল জনার্দনের সামনে, ‘আপনার অর্থকষ্ট বুঝতে পারছি, কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরুন না— সমবায় হয়ে গেলে আর কষ্ট থাকবে না।’

‘সমবায় হলে আমাকে কি ওরা নেবে?’

‘কেন নেবে না?’

‘আমার শরীরে বল নেই, ভাল করে হাঁটতেও পারি না। সংসারে কোনও ব্যাটাছেলে নেই যে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাবে। গত বছর পাটিকারের লোকেরা তাই আমাকে দানন দেয়নি। আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বলে ওখানে পড়ে আছি।’

নীল মেনে নিল কথাটা। যার কোনও ভূমিকা থাকছে না, তাকে অন্যরা সমবায়ে কেন নেবে? কিন্তু এই বুদ্ধকে কি বলা যায়? তাকে চুপ করে থাকতে দেখে জনার্দন বলল, ‘তাই বলছিলাম—’

নীল বলল, ‘আপনাকে একটা কথা বলি। আপনার মেয়ের বয়স নিশ্চয়ই বেশি নয়— আমি ওই টিলার ওপর নির্জন বাড়িতে একা থাকি, আমার কাছে কাজ করতে যাওয়া মেয়ের পক্ষে নিরাপদ নাও হতে পারে। তেমন কিছু ঘটে গেলে—’

জনার্দন মুখ নামাল। আঙুল দিয়ে বালিতে গর্ত করতে লাগল। তারপর বলল, ‘যার মনে কুমতলব আছে সে কখনও মুখে তা প্রকাশ করে না বাবু। আমি বিশ্বাস করি আপনি বদমায়েশ লোক নন, নইলে জেলেবস্তির কথা ভাবতেন না।’

‘আপনার মেয়ে কাজ করতে রাজি হয়েছে?’

‘না রাজি হলে মেয়ে হাড় ভেঙে দেবো না! আপনাকে বলি বাবু, স্বামীকে সমুদ্রে গিলে নেওয়ার পর মেয়েটা শোকে পাগল হয়ে গিয়েছিল। কারও সঙ্গে কথা বলত না, দিনরাত কাঁদত। কিন্তু স্বামীর লাস পাওয়া না যাওয়ায় দশ বছর না গেলে বিধবা বলে ধরাও যাবে না। কিন্তু শাখাসিদুর পরা বন্ধ করল ও নিজেই, শুধু ওর মায়ের জেদ মানতে হাতের লোহা খুলল না। তারপর শোকের প্রভাব কমে গেলে বাইরে বেরুতে শুরু করল, আর তখনই হল সমস্যা!’

‘কি রকম?’ নীল জিজ্ঞাসা করল।

‘বাবু, আমাদের পেটে ভাত না পড়লেও শরীরে যৌবন থাকে। তার টানে হোক হোক করতে লাগল বদমাশ ছেলের দল। আইবুড়ো যেমন ছিল বিয়েওয়ালার বাদ যায়নি। ওর মা বিড়ি বাঁধে, ও নিজেও পারে, সেই বিড়ি পৌছে দিতে যেত বাসস্ট্যান্ডের দোকানে। সেখানে তো ছোবল মারার সাপ ছড়িয়ে আছে— এদের সামলাতে গিয়ে মেয়ের চরিত্রটা বদলে গেল। বেশি হাসতে লাগল, চালচলন চোখে পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি জোর করে বাড়িতে বসিয়ে রেখেছি। কিন্তু মেয়েটা ভাল, রাগাতান্না ভাল করে।’ জনার্দন হাত জোড় করল।

নীল বলল, ‘ঠিক আছে। সব তো গুনলাম—আমি জানাব।’

জনার্দনকে বিদায় দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবনাটা ভেবে ফেলল নীল। একটা মেয়ে এসে তার জন্যে রাঁধলে টাকা দিতে তো হবেই, কিন্তু তাকে সে কি করে বলবে শুধু রেঁধে যাও, খেতে পাবে না! এটা হয় না। আর আজকের বাজারে একজন বয়স্ক লোককে খাওয়ানো মানে খরচ দেড়গুণ বেড়ে যেতে বাধ্য। তা ছাড়া নিজের জন্যে সে যা হোক কিছু করে নিতে পারে কিন্তু আর একটা লোক রাঁধবে খাবে যখন তখন নিত্য বাজার করতেই হবে। জনার্দন যখন মেয়েকে বাসস্ট্যান্ডের কাছে পাঠায় না তখন নীলও তাকে যেতে বলতে পারে না। বাজারটা ওইখানেই। ফলে রোজ না হোক, একদিন অন্তর তাকে ছুঁতে হবে

বাজারে। অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু এসব বলা যাবে না। একটা অন্য অছিলা বেব করতে হবে মেয়েটাকে কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে। সমবায় হলে মেয়েটা যদি মাছ বাছাই, গুজন করা ইত্যাদির কাজে লেগে যায়, তা হলে ওকে সদস্যা করে নিতে বলা যেতে পারে।

বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখল যজ্ঞেশ্বর দাঁড়িয়ে আছে। যজ্ঞেশ্বর নীলের মদ সাপ্লায়ার। যজ্ঞেশ্বরের হাতে একটা প্যাকেট। দেখা হতেই বলল, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি বাবু—আছে?'

'আজ চলে যাবে, তবে বিকেলের দিকে যোগো।'

'এটা নিন।'

'কি এটা?'

'বাচ্চা ভেটকি। কাল খেতে পারেন—ভাজাও। কাল রাতে প্রচুর ভেটকি পড়েছে ভালে—'

'তুমি পেনে কোথায়? পাইকাররা নিতে দিল?'

যজ্ঞেশ্বর বলল, 'ওই আর কি!'

'আহা, খুলেই বলো না!'

যজ্ঞেশ্বর বলল, 'কথায় আছে না, যত ঘোঁরা শক্ত করবে তত ফাঁস আংলা হবে! একেবারে দুটা মাছ ছাড়া ভাল থেকে ঝাড়লেই পাইকাররা যখন সব নিয়ে যায় তখন রাত্তা বের করতে হল। সমুদ্রে মাছ ধরার পর কিছু মাছ বস্তায় ঢুকিয়ে দড়ি দিয়ে মুখ বন্ধ করে নৌকোর পেছন দিক দিয়ে ভালে ভুবিয়ে রাখা হয়। তারপর ভোরবেলা পাড়ের কাছে এনে সেই বস্তার দড়ি খুলে দিয়ে গুণ টেনে নৌকো যখন পাড়ে তোলা হয়েছে, বস্তাটা ভাসতে ভাসতে ঢেউ-এর টানে অল্প ভলে এসে আটকে থাকে। পাইকাররা চলে গেলেই সেটাকে ভাল থেকে ভুলে এনে ভাগ করে নেওয়া হয়।'

নীল বলল, 'কাজটা তোমরা ভাল করছ না! ধরা পড়লে বিপদ হবে।'

যজ্ঞেশ্বর দাম নিতে চায় না কিছুতেই। অতএব কাজ বাড়ল। মাছের আঁশ ছাড়িয়ে কেটে ফেলে ভেটকে নিল নীল। ছোট ভেটকি, ভাজতেই বেশ গন্ধ বের হল। নীল খুশি,—আজকের ব্রেকফাস্ট এটাই। ডেকের ওপর রোদ জমেছে। বাইরের ঘরে প্রেটে মাছভাজা আর গ্লাসে মদ নিয়ে বসল সে। এক টুকরো মাছ খুঁটে দিচ্ছে আর এক টোক মদ গলায় ঢালছে। আহ, কী আরাম! এই ভাবে যদি বাকি জীবন কেটে যায় তা হলে আর কিছু চায় না নীল। কিন্তু সন্ধ্যা যা আছে তাতে বড় জোর বছরখানেক চলাতে পারে। একটা সময়ের রাত্তা খুঁজতেই হবে। জানলা দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল সে। তার পক্ষে জেলেনদের মধ্যে রাত জেগে সমুদ্রে ঘুরে মাছ ধরা অসম্ভব ব্যাপার। সেই দক্ষতাও তার নেই। এখানে সমবায় হয়ে গেলে ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে যাবে। ইঠাং তার মাথায় অন্য মতলব খেলল। পশ্চিম ভারতের অনেক লোককে সমুদ্রের পারে সে দেখেছে ইটুজলে দাঁড়িয়ে চিংড়ির ডিম ধরতে। সমুদ্রে চিংড়ি যে ডিম পাড়ে ডিম ফেটে যে বাচ্চা বের হয়, ঢেউ-এর টানে সেগুলো তীরের দিকে চলে আসে। তার লাগানো তেলোণা খাঁচা ভলে পেতে দরলে সেগুলো অনেক ক্ষুদে জনজ পোকের সঙ্গে আটকে যায়। বেছে নিয়ে সেই ডিম অথবা ডিম ফেটে বের হওয়া মাছ পুকুরে ফেলে চিংড়ি মাছের চাষ করা যায়। এ অঞ্চলে চিংড়ির চাষ হয় না বটে কিন্তু পাশের জেলায় সেটা রমরমিয়ে চলাছে। স্বচ্ছন্দে সেখানে সাপ্লাই দেওয়া যায়। যেসব জেলোয়মে সমবায়ের ক্ষেত্র সুযোগ পাবে না অথবা বয়স্ক পুরুষ এবং নারীদের এই কাজে লাগানো যেতে পারে, এতে ওদের সংসারের সাহায্য হবে।

অনেকটা গাওয়া হয়ে গিয়েছিল, শরীরে ক্লান্তি ছিল তাই ঘুম এসে গেল অজান্তেই। চেয়ারে হেলান দিয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল নীল। ইঠাং কানে খুঁট করে শব্দ পৌঁছাল। অবস্টিটা মুছে ফেলে দিল ঘুম। শব্দটা দ্বিতীয়বার বাজতেই চোখ খুলল নীল খুব বিরক্ত হয়ে। চোখের সামনে খোলা দরজার ফ্রেমে একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। পেছনে গোল থাকায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না সে, নাকি ওখনও ঘুম লেগেছিল চোখে। সে জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

কোনও জবাব এল না। মূর্তিটা সামান্য নড়ল। এবার সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করল নীল। তারপর চোখ রগড়ালো। ছায়ামূর্তি বলে যা মনে হচ্ছিল সে একজন নারী। অত্যন্ত সস্তার একটা শাড়ির আঁচলে মাথা এবং মুখের অনেকটাই ঢাকা। নীল আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই?'

এবারও জবাব এল না।

নীল উঠে সামনে গেল। মেয়েটি যেই হোক বেশ লম্বা। এ অঞ্চলে এমন লম্বা মেয়ে দেখা যায় না। নীল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি কথা বলতে পার না? কি চাই?'

‘কাজ।’ খুব নিচু গলায় জবাব এল।

সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল। এবং রাগও। সে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি কি জনার্দনের মেয়ে? চূপ করে না থেকে জবাব দাও।’

মেয়েটি মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

‘জনার্দন তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?’

মেয়েটি আবার মাথা নেড়ে না বলল।

‘তাহলে তুমি এসেছ কেন? আমি তোমার বাবাকে বলেছিলাম ভেবে দেখব। আর ভেবে দেখলাম আমার কোনও লোকের দরকার নেই।’

এবার মেয়েটি মুখ তুলল। ঘোমটার নিচে তার চিবুক, নাক দেখা গেল। এবং সেই নাকের পাশ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে গেল বুকে।

নীল বিপাকে পড়ল, ‘আশ্চর্য! এতে কান্নার কি আছে?’

‘বাপ বলেছে এখানে কাজ না হলে শ্বশুরবাড়িতে চলে যেতে হবে।’

‘ও। তা ভালই তো। স্বামী নেই বলে শ্বশুরবাড়ির লোক তো তোমার পর নয়। বিয়ের পর তুমি শ্বশুরবাড়িতে থাকতে না?’

‘না। উনি এই বসতিতে ঘর নিয়েছিলেন।’

‘কেন?’

‘অশান্তি ছিল।’

‘তার মানে তুমি শ্বশুরবাড়িতে যাওনি কখনও?’

‘গিয়েছি।’

‘তাহলে আবার যেতে অসুবিধে কি?’

‘আমার ছোট দেওর খারাপ লোক।’

‘কি করে সে?’

‘আগে মাছ ধরত, এখন বাস্ চালায়। কাঁচা পয়সা অনেক। এবার গেলে আমাকে ছাড়বে না। ওর বউটাও বলেছে যেনে নিতে। ভয় পায় খুব।’ সরু গলায় বলল মেয়েটি।

‘তোমার নাম কি?’

‘সুভদ্রা।’

‘শোন, তোমার বাবাকে আমার নাম করে বল, সমবায় হলে তার আর তোমার একটা রোজগারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। একটু ধৈর্য ধরে কদিন থাকুক।’

মেয়েটি আবার মাথা নামাল, ‘বেশি টাকা দিতে হবে না।’

হঠাৎ এক ধরনের মায়ায় আক্রান্ত হল নীল। যতদিন সমবায় না হচ্ছে ততদিন যদি মেয়েটাকে কাজ দেওয়া যায়, তা হলে ওকে দেওরের লালসার সামনে যেতে হবে না। সে জিজ্ঞাসা করল, ‘আমার এখানে বেশি কিছু রান্নার দরকার নেই। সকালে এসে কাজটাজ করে দু’বেলার রান্না শেষ করে চলে যেতে হবে। বিকেলে আসার দরকার নেই। খিচুড়ি রান্না করতে জানো? ওড। এখন খিচুড়ি আর ডিম আলু ভেজে দাও। ওপাশে রান্নার ঘরে কেরোসিন স্টোভ আছে।’

সুভদ্রা আবার মুখ তুলল। তারপর ধীরে ধীরে ঘরের ভেতর দিয়ে এগোতে লাগল। নীল আবার জিজ্ঞাসা করল, ‘বাবাকে না জানিয়ে এসেছ?’

‘হ্যাঁ।’ খুব শান্ত উত্তর।

‘কেন?’

‘বাপ মাকে বলল সব। আপনি নাকি রাজি হচ্ছেন না। আপনি একা থাকেন তাই আমার বিপদ হতে পারে বলেছেন। তাই শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেবেন আজকেই।’

‘তো?’

‘তাই ভাবলাম নিজেই যাই, জিজ্ঞাসা করি।’

‘আমি একা থাকি বলে ভয় পাচ্ছ না?’

‘আমার দেওর তো তার বউ-বাচ্চা নিয়ে থাকে, তবু—।’ সুভদ্রা থেমে গেল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

মদ্যপান বেশি হওয়ায় বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছিল নীল। যখন ঘুম ভাঙল তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বিছানা থেকে বাথরুমের দিকে যেতে দেখতে পেল সুভদ্রা দাঁড়িয়ে আছে জানলায় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। এখন ওর মাথায় ঘোমটা নেই। মেয়েটি সুশ্রী। নীলের মনে পড়ে গেল, সে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘রান্না হয়নি?’

‘হ্যাঁ, খেতে দেব?’

‘কি আশ্চর্য! তুমি এত বেলা পর্যন্ত এখানে আছ কেন? রান্না শেষ হলেই তো চলে যাওয়া উচিত ছিল— যাও, চলে যাও!’

‘খাবেন না?’

‘আমি নিয়ে নেব, আমার জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে না।’

সুভদ্রা এবার দরজার দিকে এগোল। মনে পড়ে যেতে নীল জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি খেয়ে নিয়েছ?’

সুভদ্রা দাঁড়িয়ে গেল। তারপর পেছন ফিরেই মাথা নেড়ে না বলল।

নীল রান্নাঘরে ঢুকে ঢাকনা সরিয়ে দেখল খিচুড়ি যা রান্না হয়েছে তা তার একার পক্ষে দু-বেলা খেয়েও শেষ হবে না। সে সেখান থেকেই চিৎকার করে ডাকল, ‘সুভদ্রা, এদিকে এসো। আমি এত বেশি খাই না। নষ্ট হবে। তুমি খেয়ে যাও।’

‘বেশি তো হয়নি।’

‘সেটা আমার চেয়ে নিশ্চয়ই তুমি বুঝবে না।’

‘তাহলে আমি বাড়িতে নিয়ে যাব?’

‘বাড়িতে?’ সঙ্গে সঙ্গে জন্মদানের মুখ মনে পড়ল নীলের। সুভদ্রার মা-ও আছে সেখানে। প্রথমদিনই বাড়িতে খাবার আসছে দেখলে ওদের আশা বেড়ে যাবে। প্রতিদিন পথ চেয়ে থাকবে। আর যেটুকু নিয়ে যাবে তা ওদের দেওয়ার পর সুভদ্রার ভাগ্যে কিছুই জুটবে না। সে গভীর গলায় বলল, ‘আমি চাই না কেউ উপোস করে আমার জন্যে রান্না করুক। তুমি যদি এখানে চাকরি করতে চাও তো এখানে বসে খেয়ে বাড়ি যাবে।’

দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে খিচুড়ি খেল নীল। একদম আলাদা স্বাদের রান্না। এ রান্না সে এ জন্মে করতে পারত না। সুভদ্রা চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। নীলের মনে হল এমন রান্নার জন্যে ওকে রাখলে লোকসান নেই।

খাওয়া শেষ করে ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল নীল। ইতিমধ্যে ছায়া নেমেছে জলে। টিলায় ছায়া। সমুদ্র এখন বেশ শান্ত। এই সময়ের সমুদ্রকে যৌবন শেষ হয়ে আসা নারীর মত মনে হয়। অথচ সকালের সমুদ্রের অন্য চেহারা—উদ্দাম, কিশোরী থেকে তরুণী হয়ে যাওয়া মেয়ের মত চঞ্চলা।

নীল মুখ ফিরিয়ে দেখল, বালি ভেঙে সাত-আটজন লোক আসছে জেলেবস্তি থেকে। তাদের সামনে প্রধান রয়েছে। ওরা কাছে এলে নীল ডাকল, ‘আসুন।’

ঘরে ঢুকল না কেউ, ডেকের ওপর বসে পড়ল। প্রধান বলল, ‘আপনি যে প্রস্তাব দিয়েছেন তা আলোচনা করে দেখলাম। আমাদের মধ্যে দুটো দল হয়েছে। যুবকরা এক কথায় রাজি। কিন্তু যাদের বয়স হয়েছে, জীবন দেখেছে—তারা ভয় পাচ্ছে।’

নীল বলল, ‘বয়স হলেই যে জীবন দেখবে তার কোনও মানে নেই। এখানেই যাদের জন্ম, জলে জলে যাদের জীবন কটছে, তারা সমুদ্র দেখেছে, তার চরিত্র জানে কিন্তু জীবন দেখার সুযোগ কতটুকু পেয়েছে?’

দলে একটি অচেনা ঐশ্বর্য বসেছিল। সে বলল, ‘কিন্তু এটা করতে গেলে ওরা ছেড়ে দেবে না।’

‘কি করতে পারে ওরা?’

‘কি পারে না? আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে পারে, লাস ফেলে দিতে পারে। ওদের সঙ্গে লড়াই করার কোনও ক্ষমতা আমাদের নেই বাবু।’ ঐশ্বর্য বলল।

‘আপনি যা বলছেন ঠিক এই কথাই পৃথিবীর যেখানে যেখানে র্বৈতে থাকার লড়াই হয়েছে সেখানে কেউ

না কেউ বলেছে। তাই বলে লড়াই থেমে থাকেনি। আর শেষে অত্যাচারিত মানুষের জয় হয়েছে। এটা ঠিক ওরা চাইবে না সমবায় হোক। ওরা ভয় দেখাবে, গায়ে হাত দিতে পারে। সে রকম হলে আপনারা ওদের ছেড়ে দেবেন কেন?’

নতুন থ্রোটটি বলল, ‘বাবু, জলে না নেমে তীরে দাঁড়িয়ে বলা সহজ—টেউ-এর সঙ্গে ওইভাবে লড়াই, নৌকো এইভাবে চালাও! কিন্তু টেউ যখন গিলতে আসে, নৌকোর তলায় এসে যখন টেউ ফেটে যায় তখন ওসব উপদেশ কোনও কাজে লাগে না।’

প্রধান হাত তুলে সবাইকে খামল। থ্রোটের কথায় যুক্তি পেয়ে একটা গুপ্তন উঠেছিল, সেটা শান্ত হল। প্রধান বলল, ‘আসলে আমরা মূর্খ মানুষ। কোনও জ্ঞানগম্য নেই। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন, মানে সমবায়ের একজন হন—তা হলে ভরসা পেতে পারি।’

‘আমি? না না। আমি বাইরের মানুষ। আজ আছি কাল নেই। তা ছাড়া মাছ ধরা আমার জীবিকা নয়। আমি সমবায়ের সদস্য হব কি করে?’ নীল প্রতিবাদ করল।

‘না, বাবু, তা হলে চলবে না। আপনি এখানে থাকুন, মাছ ধরার ব্যাপারে যোগ দিন, সমবায় চালাবার দায়িত্ব নিন—আমরা এটাই চাই।’

প্রধান কথাগুলো বলতেই সবাই হৈ হৈ করে সমর্থন করল। নীল দ্রুত মাথা নাড়ছিল, ওরা সেটা মানতে পারছিল না।

একজন তো বলেই ফেলল, ‘আপনি যদি সমবায়ে আমাদের সঙ্গে না থাকেন তাহলে ধরে নিতে হবে আপনার কোনও মতলব আছে। আমাদের বিপদে ফেলে দূরে সরে যেতে চান।’

শেষ পর্যন্ত নীল বলতে বাধ্য হল, যে ভদ্রলোক শহরে সমবায় তৈরির ব্যাপারে দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলে সে সিদ্ধান্ত নেবে। যদি সে সদস্য হলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় তাহলে সে সেটাই মেনে নেবে। সবাই খুশি হল। এই সময় যজ্ঞেশ্বরকে দেখা গেল মাটির হাঁড়ি নিয়ে এদিকে আসতে। দূর থেকে ডেকের ওপর এত লোক দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর দিক পালটে সমুদ্রের দিকে নেমে গেল। একজন ভিজ্জাসা করল, ‘আরে, ও আমাদের যজ্ঞেশ্বর না? কোথায় যায়?’

‘রাসের হাঁড়ি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে, এদিকে আসতে লজ্জা পাচ্ছে! হেঁ হেঁ!’ আর একজন জবাব দিল।

প্রধান বলল, ‘চল হে, এবার ওঠা যাক। আঁধার নামবে আর একটু পরেই।’ সবাই ডেক থেকে নেমে বালিতে পা দিতে প্রধান আবার নীলের কাছে উঠে এসে বলল, ‘আপনি মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দিলেন বাবু। নইলে শ্বশুরবাড়ি হয়ে ওকে গঞ্জে গিয়ে নাম লেখাতে হত। শুধু বিড়ি বেঁধে একটা পেটও তো ভরে না! খুব ভাল কাজ করেছেন।’

ওরা চলে গেলে যজ্ঞেশ্বর এল, ‘আঃ, একেবারে দল বেঁধে এসেছিল দেখছি! তা কাজের কাজ কিছু হল, নাকি ঝগড়া করেছে গেল!’

‘তুমি ওদের মধ্যে নেই?’ নীল ভিজ্জাসা করল।

‘থাকব না কেন? তবে কাকা বেঁচে থাকতে পরিবারের হয়ে কথা বলার অধিকার তো কারও নেই। অথচ দেখুন, এক পয়সা রোজগার করবে না—শুধু বড় বড় কথা বলবে। যাক, এই নিন মাল। আজ খুব জব্বর হয়েছে।’

বোতলগুলো অন্যত্র চালান করে টাকা দিল নীল। যজ্ঞেশ্বর উদাস হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল, ‘বাবু কি বিয়ে-থা করেননি?’

‘নাঃ।’

‘এক থাকতে কষ্ট হয় না?’

‘কি আর করা যাবে।’

‘তোমন ইচ্ছে হলে শহরে গিয়ে রাত কাটিয়ে আসতে পারেন।’

‘না ভাই, ওসব আমার দ্বারা চলবে না।’

‘এই তো, মাস পাঁচেক বাদে এখানে সমুদ্রের ধারে মেলা বসবে। প্রতি বছর বসে। বেশ ভ্রমজমাট। দুদিন ধরে দোকানপাট, ম্যাজিক, পালাগান—কত শত ব্যাপার! তেনারাও আসেন। ওদের অবশ্য একটা ধারে আলাদা করে দেওয়া হয় হোগলার বেড়া দিয়ে। আপনি বলছেন চলবে না, রাত দুটোর সময় চাদর মুড়ি

দিয়ে ওই প্রধানকে দেখেছি হোণলার ঘরে আতরবালার ঘরে ঢুকতে। ওঃ, সেসময় এখানকার চরিত্রই বদলে যায়। কাল মাছ লাগবে?’

‘না। ওই চোরাই মাছ আর এনা না তুমি।’

যজ্ঞেশ্বর একটু আহত হয়ে চলে গেল। সমুদ্রের ধারে যে মাছ বিক্রি হয় তার সঙ্গে স্থানীয় বাজারের মাছের দামের বিশেষ পার্থক্য নেই। আর বস্তায় লুকিয়ে রাখা মাছ তো ওদের নিজেদের খেতেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। যজ্ঞেশ্বর সেই মাছ বাঁচিয়ে বিক্রি করতে আসছে মানে ওর ভাগেরটা বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে না। ওকে প্রশ্ন দেওয়া ঠিক নয়।

এখন জীবন বেশ শান্তিতে কেটে যাচ্ছে। ভোর হওয়ার আগেই বিছানা থেকে নেমে শার্টস আর গেঞ্জি পরে বালিতে নেমে যায় নীল। যেখানে মাছমারারা নৌকো নিয়ে ফিরে আসে সেখানে তখন পাইকারের লোকজন অপেক্ষা করে। পেছনে বালির ওপাশে তাদের লরি দাঁড়িয়ে আছে। জনাদেশক যত্নমার্কী লোককে নিয়ে কর্মচারীরা মাছ যা ওঠে তুলে নিয়ে যায়। নীল ভেবেছিল জগদীশকে এদের মধ্যে দেখতে পাবে। সে তার বন্-এর হয়ে দেখাশোনা করছে বলেছিল। একটা নৌকার মাছ নেওয়ার স্বাধীনতা বন্ তাকে দিয়েছিল। তাকে দেখতে না পেয়ে নীল ধূতি শার্ট পরা একটি লোককে জিজ্ঞাসা করল, ‘আচ্ছা, জগদীশবাবুর খবর কি?’

‘তার খবরে আপনার কি দরকার?’ লোকটা বিরক্ত হল।

‘আমার সঙ্গে আলাপ ছিল, তাই—’

‘শরীর খারাপ। হাসপাতালে আছে।’ বলে লোকটা নীলের কাছ থেকে সরে গেল।

বৃষ অবাক হল নীল। সেই রাতে লোকটাকে কারা তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেটা অনুমান করে লাভ নেই। যদি ওর বন্-এর লোক হয়, তাহলে ওরা এমন মার মেরেছে যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে জগদীশকে। কিন্তু মারল কেন? জগদীশ তো তার পরিচিত কোনও মানুষের কাছে গিয়ে মদ্যপান করতেই পারে।

বাড়িতে ফিরে এসেই চা পেল নীল। সুভদ্রা ইতিমধ্যে এসে গেছে। চা খাওয়ার পর সুভদ্রা নিচু গলায় বলল, ‘বাজারে যাওয়া দরকার।’

‘ঠিক আছে।’

‘আমি যেতে পারি।’

‘তুমি? না না। ওখানে তোমাকে কারা সব যেন বিরক্ত করে।’

‘এখন করবে না।’

‘কেন? হঠাৎ কি হল?’

‘তখন মাথার ওপর কেউ ছিল না!’

হতভম্ব হয়ে গেল নীল, ‘তুমি যে আমার এখানে কাজ করছ তা ওখানকার লোকজনও জেনে গিয়েছে?’

সুভদ্রা মাথা নিচু করে বলল, ‘না জানলে জানিয়ে দেব।’

ওকে বাজারের টাকা দিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল নীল। এতটা পথ যাতায়াত করতে হল না, এটা কম কথা নয়।

বাজার নিয়ে এল সুভদ্রা। এখন তার লজ্জাসংকোচ অনেকটা কম। মাথায় ঘোমটা প্রায়ই থাকছে না। ঘরের কাজ করছে নিপুণ হাতে।

আজ সাততাড়াভাড়া খেয়ে নিয়ে সুভদ্রাকে বিদায় করতে চাইল সে। জগদীশের ব্যাপারটা তার মাথা থেকে যাচ্ছিল না। সে ঠিক করল শহরের হাসপাতালে গিয়ে জগদীশের সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু অত তাড়াভাড়া সুভদ্রা খেতে চাইছিল না বলে তাকে খাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল সে বাধ্য হয়ে।

শহরের হাসপাতালে পৌঁছালো সে তিনটে নাগাদ। তখন দেখা করার সময় নয়। খবরাখবর নিয়ে নীল জানতে পারল জগদীশ নামের একটা লোক বাইক-অ্যাম্বিডেন্ট করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বেহেড মাতাল হয়ে সে নাকি বাইক চালাচ্ছিল। সোজা রাস্তার পাশের একটা গাছের সঙ্গে বাইক ডিড়িয়ে দিয়েছিল। মাথায় চোট পেয়েছে, হাতও ভেঙেছে।

মফঃস্বলের হাসপাতালে পাহারা কড়া নয়। যে ছিল তাকে ম্যানেজ করে নীল যখন জগদীশের বেডের পাশে চলে এল তখন সে একমাথা ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘুমোচ্ছে। ওর হাতেও প্র্যাস্টার করা হয়েছে। জগদীশের পাশে টুল নিয়ে বসে সে নিচু গলায় ডাকল, 'জগদীশ।'

তিনবার ডাকার পর ঘুম ভাঙল লোকটার। কিন্তু চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'আমি নীল। আমাকে বাইকে বসিয়ে তুমি পানসায়রের সমুদ্রের ধারের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

'ও। পালাও—একুনি পালাও।'

'কেন?'

'জানি না।'

'তোমার এই অবস্থা হল কি করে?'

'আমার খুব নেশা হয়েছিল। ওরা জোর করে বাইকে তুলে দিয়ে চালাতে বলে। আমি কি চালিয়েছি কে জানে!'

'পুলিশ আসেনি?'

'না।'

'তুমি পুলিশের কাছে ওদের নাম বলতে পারবে?'

'না, তুমি যাও!'

নীল উঠে পড়ল। এখন পর্যন্ত এখনকার কারও তার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনও কারণ নেই। অন্তত জগদীশ যেদিন গিয়েছিল সেদিন সমঝোতার কথাও কাউকে সে বলেনি। তাহলে তার সঙ্গে মেশার কারণে ওরা জগদীশের এই অবস্থা করল কেন? জগদীশের এই বসু কে? সেদিন জীপে যে ছিল সে-ই কি বসু? লোকটা কি অতীতে তাকে দেখেছে?

নীল আর ভাবতে পারছিল না। একটা রিকশা নিয়ে সে আদালতচত্বরে হাজির হল। হরিহর উকিলের খোঁজ নিয়ে জানতে পারল আজ সকাল থেকেই সে এখানে আসেনি। একজন বলল, 'দেখুন তো, কোথাও কোন পর-উপকারে লেগে গেছে। আজকাল আর মামলায় মন নেই ওর।'

'বাড়ি কোথায়?'

'এখন বাড়িতে পাবেন না। থাকে একটা মেসে। সেখানে ফেরে রাত নটার পর।'

বাসস্ট্যান্ডের দিকে রিকশায় আসার সময় বাজার এলাকা চোখে পড়ল। কাপড়ের দোকান দেখে রিক্সা থামাল সে। এই কদিন ধরে সে লক্ষ্য করছে সুভদ্রা একই শাড়িজামা পরে কাজে আসছে, হয়তো মেয়েটার দ্বিতীয় পোশাক নেই। অল্প দামের দুটো শাড়ি আর জামা কিনতেই দোকানদার জিজ্ঞাসা করল, 'শায়া বডিস নেবেন না বাবু?'

না বলতে গিয়েও মত পালটালো সে। সায় হল কিন্তু বডিসের মাপ তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। দোকানদার সাহায্য করল, 'মোটো রোগা না মাঝামাঝি?'

'মাঝামাঝি।'

'ওতেই হয়ে যাবে।'

শেষ বাস ধরে পানসায়র ফিরতেই সন্ধ্যা হবো হবো। আজ সাততাড়াতাড়ি যেন আঁধার নামছে। আকাশে অনেকটা গোল হয়ে আসা চাঁদ। শহরে বাসস্ট্যান্ডে চিকেন রোল খেয়েছিল নীল। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল একটা বিলিতি বোতল কিনে নিয়ে এলে হত। ভাবতেই হাসি পেল। এককালে স্বচ হইলিকি বিলিতি আর ইন্ডিয়ান যত দামী মদ হোক, দিশি বলত সে। এখন দিশি নেমে এসেছে চোলাইতে। যে দেশে আছ সে দেশের আচার মানতেই হবে।

দূর থেকেই দেখতে পেল নীল, টিলার ওপর বাড়ির পাশে একটি জীপ দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া ছায়া অন্ধকার সরে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। ক্রমশ জীপের কিছু অংশ চক চক করে উঠল। কে এল তার কাছে? নীল ইতস্তত করল। তার মনে হচ্ছিল বিপদ ওখানে ওৎ পেতে বসে আছে। তার চেয়ে জেলেবস্তিতে গিয়ে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িতে গেলে মোকাবিলা করা যাবে। কিন্তু চিন্তাটা বাড়িল করল সে। আজও বের হবার সময় রিভলভারটা সঙ্গে নিয়েছিল। ওটা থাকলে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যা হবার তা হবে। সে এগোল।

জীপে কেউ নেই। ডেকে ওঠার সিঁড়িতে পা দিয়েই চমকে উঠল সে। দুটো চেয়ার বাইরে বের করে একটায় বসে অন্যটায় পা তুলে দিয়ে যে সিগারেট খাচ্ছে তার বয়স পঁচিশের বেশি ওপাশে নয়। পরনে জিনস আর লাল শার্ট। লম্বা টানটান সিল্কি চুলে বাতাস আরাম পেয়েছে। রোদচশমা এখন মাথার ওপর উঠে গেছে। সে সিঁড়িতে পা দেওয়ামাত্র চোখাচোখি হল। সেই দৃষ্টিতে নীল ঠাণ্ডা সাপের চোখ দেখতে পেল। তাকে দেখেও পা নামাল না মেয়েটি।

ওপরে উঠে নীল জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

মেয়েটি আর একবার সিগারেটে টান দিয়ে ওটা বলিতে ছুঁড়ে ফেলল, 'নাম?'

'ওটা আমার জিজ্ঞাসা করার কথা। আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন।'

'আপনার বাড়ি? এই বাড়িটাকে এতক্ষণে ছাই করে দেওয়া যেত। কিন্তু সেটা করলে এক কেরালিয়ান বৃদ্ধার ক্ষতি হত, আপনার গায়ে লাগত না।'

পা নামিয়ে উঠে দাঁড়াতেই অবাক হল নীল। এই মেয়েটিও লম্বা। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় যেসব মেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের উচ্চতা পাঁচ ফুট আট নয় ইঞ্চির কম নয়। এ যেন ওই দল থেকে এসেছে।

নীল বেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'এই ভ্রাম্যমাণ ছেড়ে আপনাকে চলে যেতে হবে। আমি জীপ নিয়ে এসেছি। বলুন, কোথায় নামিয়ে দেব? প্যাক করে নিন চটপট, আপনাকে পনেরো মিনিট সময় দিচ্ছি।' হাতের চোটায় গাল মুহল মেয়েটি।

নীল হাসল, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

'অবাস্তব প্রশ্ন।'

'এই শরীরে অনেক আঘাতের দাগ আছে। সেগুলো প্রমাণ করে আমি কারও হুকুমের পরোয়া করি না। বসুন ভালভাবে, কথা বলি। কি বলতে চান শুনি। চাঁদ উঠছে। আপনার মত সুন্দরী মহিলার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব খারাপ লাগবে না।' একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল নীল।

মেয়েটা রাগী চোখে তাকাল খানিক, তারপর ধীরে ধীরে ঠোটে হাসি চলকে উঠল, 'মনে হচ্ছে আপনি বুদ্ধিমান। সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার খুব শখ আছে বুঝি?'

কাঁধ নাচালো নীল, 'শখ থাকলেও উপায় নেই। সুন্দরী মেয়ে চোখেই পড়ে না। চোখমুখ ভাল, ফিগার দারুণ, ওইসব লাভণ্য না কি যেন বলে—ঢল ঢল করছে এমন মেয়েকে আমার সুন্দরী বলে মনেই হয় না। ওদের দেখে কোনও উৎসাহ পাই না। চিতাবাঘ আমার কাছে সুন্দর। কেউটে যখন ফণা তুলে দাঁড়ায় তখন তার মতো সুন্দর আর কিছু নেই। যে মেয়ের ঠিকঠাক শরীর থেকে রাগ হুঁইয়ে বের হয়, বুনো ঘোড়ার মত যার মেজাজ, সে-ই আমার কাছে সুন্দরী। আচ্ছা, আপনি বলুন, এরকম মেয়ের দেখা ভারতবর্ষে পাওয়া কি সম্ভব?'

'তাহলে?'

'আজ মনে হচ্ছে দেখা পেরোছি।' নীল হাসল, 'বসুন। আপনার নাম নিশ্চয়ই কোকিলা?' এবার মেয়েটির চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, 'আমার নাম আপনি জ্ঞানলেন কি করে?'

'এ প্রশ্ন অবাস্তব।'

এবার দ্বিতীয় চেয়ার টেনে ডুতোসুদ্ধ পা তুলে দিল কোকিলা, 'আপনি অনেকক্ষণ ধরে চালাকি করে যাচ্ছেন। ইটস এনাক। শুনুন, আপনাকে পানসায়র ছেড়ে যেতে হবে।'

'কেন?'

'আপনি ভেলেগুলোকে ফ্যাপাচ্ছেন।'

'কি রকম?'

'ওদের মাথায় সমবায়ের প্ল্যান আপনি ঢুকিয়েছেন।'

'একবার যখন ঢুকে গেছে তখন আমি চলে গেলেও সেটা থাকবে।'

'না। ওদের ব্রেন কি করে পরিষ্কার করতে হয় সেটা আমাদের জানা আছে।'

'আর আমি যদি না যাই?'

'তাহলে আপনার ডেডবডি সমুদ্রের জলে ভাসবে।'

'বাঃ, চমৎকার দৃশ্য!'

'আপনি ভাবছেন আমি ঠাট্টা করছি?'

‘ওরকম ভাবতে পারলে খারাপ হয় না। ঠাট্টা-ইয়ার্কিতে বন্ধুত্ব গাঢ় হয়।’

‘লুক মিস্টার। আমি আপনাকে শেষবারের মত সতর্ক করছি—’

নীল মাথা নাড়ল, ‘এক মিনিট।’ তারপর ভেতরে গিয়ে বোতল আর দুটো গ্রাস নিয়ে বাইরে এল, ‘আর পাঁচটা মেয়ের মতো আপনি লবঙ্গলতিকা নন—চলবে?’

‘স্ট্রেঞ্জ!’

‘হ্যাঁ। আর একটু বেশি, উদ্ভট বলতে পারেন—আমি একেবারেই তাই।’ নীল গ্রাসে মদ ঢালল, ‘চলবে কি?’

‘এই সব ট্রাস দিশি মদ কোনও ভদ্রলোকে খেতে পারে বলে আমার জ্ঞান ছিল না।’

‘কে ভদ্রলোক? আশি? কে বলেছে আপনাকে? ভদ্রলোকরা হচ্ছেন দুধের সর, আমি হচ্ছি তলাকি। তলাকি জানেন? জানেন না। যে পাত্রে দুধ-ফেটানো হয়, তার তলায় যে দুধ অল্প পুড়ে লেগে গিয়ে থাকে তাকে তলাকি বলে। ছেলেবেলায় সেটা খেতে খুব ভালবাসতাম।’ হাসল নীল, ‘যখন জাহাজে কাজ করতাম তখন স্কচ খেতাম। সিভাস রিগ্যাল, ব্র্যাকলেবেল মায় রয়্যাল স্যালুট পর্যন্ত খেয়েছি। টিন বিয়ার দিয়ে কুলকুচি করেছি। উৎসব হলে শ্যাম্পেন খুলেছি। দোজ ডেজ আর ওভার। আসলে কি জানেন? আপনি যদি বাদ নেওয়ার জন্যে খেতে চান, তাহলে স্কচ ছাড়া অন্য কোনও হাইকি খেতে পারবেন না। এগুলোতে বমি পেয়ে যাবে। কিন্তু যদি নেশা করার জন্যে খেতে চান, খেয়ে বৃন্দ হয়ে থাকতে চান, তাহলে স্কচও যা এই দিশিমাও তা। বরং নেশাটা এতেই জমে ভাল। ক্রিওপেট্রার চেয়ে হরিদাসী পাল অন্ধকারে অনেক বেশি এফেক্টিভ। সরি ম্যাডাম, একটু অম্লীল হয়ে গেল নাকি?’

কোমরে হাত রেখে শুনছিল কোকিলা। কথাগুলো শোনার পর চেয়ার টেনে বসল, ‘শুনুন মশাই, আপনি ভাল কথা বলতে পারেন কিন্তু একথা বুঝতে পারছেন না কেন, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। আমার বাবার যে নেটওয়ার্ক এই সমুদ্রের তীরের সবকটা জায়গায় ছড়িয়ে আছে, আপনি তার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবেন না। এই যে এই বাড়িতে একা থাকেন, একটা গানম্যান পাঠালেই আপনি লাস হয়ে যাবেন। আমার কথা শুনুন, আপনি ইলিয়ট রোডে ফিরে যান।’

গ্রাসে চুমুক দিয়েছিল নীল, বিষম খেল। কপালে কপালে কিছু মদ ছিটকালো। কোনরকমে সামলে ভিজ্ঞাসা করল, ‘মাই গড, ইলিয়ট রোড! ইলিয়টে যাব কেন?’

‘কারণ এখানে আপনার ছেলেবেলা কেটেছে।’ কোকিলা হাসল। এরকম হাসি পৃথিবীর কোনও মেয়ে কি হাসতে পারে? এমন বরফের ছুরির ধার সেই হাসিতে ছড়ানো যা শুধু জ্বালা ধরিয়ে যায়।

নীল চোখ বন্ধ করল। ব্যাপারটা পাইকার বনাম জেলেদের সম্বন্ধে সীমাবদ্ধ নয়। কোকিলার বাবাই কি জগদীশের বসু? আর তাই যদি হয়, সেদিন শহরের বাসস্ট্যাণ্ডে যে লোকটা জীপে বসেছিল সেই লোকটাই কি এই দুজনের মিশ্র রূপ? তাহলে লোকটার সঙ্গে তার কোথাও মোলাকাত হয়েছিল। কোথায়? নীলে চাঁদের দিকে তাকাল। সমুদ্রের ওপর পায় গোল একটি চাঁদ বেলুনের মত ডাসছে। নীল তাকাল কোকিলার দিকে, ‘কয়েক মিনিট এসব আলোচনা বন্ধ থাক। চাঁদটাকে দেখুন। বিউটিফুল। চাঁদের ওপর কোনও গান আপনার জ্ঞান আছে?’

‘কি?’ কোকিলা ঠেটিয়ে উঠল।

‘চাঁদের ওপর একটা গান গান না।’

‘শিট।’

‘খাচ্চলে। আমি ভাবতে পারিনি আপনি এত বেরসিকা।’

কোকিলা কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল, ‘শুনুন, আমাকে অ্যাডমিট করতেই হচ্ছে—আপনার মতো মানুষ আমি আগে দেখিনি। ওইসব জেলেদের সঙ্গে মেলামেশা আপনি ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিয়ে আপনি যদি এখানে কাউকে ডিসটার্ব না করে থাকতে চান, তাহলে বাবাকে বলে সেটা সম্ভব করতে পারি। কিন্তু আপনাকে প্রমিস করতে হবে—’

‘এখানে সমবায় হবে না, তাই তো?’

‘দ্যাটস্ রাইট।’

‘যদি প্রমিস না করি?’

‘তাহলে আপনিও মারা যাবেন আর সমবায়ও হবে না।’

‘তাহলে চ্যালেঞ্জটা রইল।’

ঠিক তখনই আর একটা জীপ হেডলাইট জ্বালিয়ে জ্যোৎস্নাকে ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে এল বাড়িটার পাশে। ঝপঝপ করে গোটাচারেক লোক নেমে দৌড়ে ডেকের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে কোকিলাকে দেখে থেমে গেল।

প্রচণ্ড রেগে গিয়ে কোকিলা দ্বিভাঙ্গা করল, ‘কি চাই? কে তোমাদের এখানে আসতে বলেছে? টেল মি, কেন এসেছ এখানে?’

‘ম্যাডাম, আপনি ফিরে যাচ্ছেন না দেখে ভাবলাম কোনও বিপদ হয়েছে!’

‘আমার বিপদ হবে? এটা ভাবার মত দুঃসাহস তোমাদের হল কি করে?’

‘আপনি বলেছিলেন, লোকটা ফিরে এলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ওকে নিয়ে বোরয়ে যাবেন। প্রায় কুড়ি মিনিট হয়ে যাওয়াতে—!’

‘গো ব্যাক!’ চৈচিয়ে উঠল কোকিলা।

লোকগুলো দ্রুত ফিরে গেল। জীপটা চলে গেল চোখের আড়ালে। আন্তে হাততালি দিল নীল।

‘কি ব্যাপার?’ কোকিলা ঘুরে দাঁড়াল।

‘কি ব্যক্তি! লীডার হবার সবকটা গুণ আপনার আছে।’

‘আপনি তাহলে আমার কথা ভুলবেন না?’

তৃতীয় ধ্রুবে চুমুক দিল নীল, ‘কোকিলা, আপনি এখানে এসে ওদের দেখুন—কি ভয়ঙ্কর গরিব ওরা। প্রতি বছর ওদের শোষণ করে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলেছেন আপনারা। এবার ওদের বাঁচতে দিন। শ্রীদ্ধ!’

‘পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় মেরুদণ্ড ছাড়াই। ওরা তাই। ওদের জন্ম হয়েছে আমাদের জন্যে। যে টাকা ওদের অ্যাডভান্স দেওয়া হয় তা না নেওয়ার হিম্মত ওদের নেই। এই লোকগুলোর জন্যে আমার কোনও সিমপ্যাথি নেই। আপনি ওদের যে প্র্যান দিয়েছিলেন তা ওদের লোকই আমাদের জানিয়ে দিয়েছে। এবার ভেবে দেখুন, কাদের হয়ে আপনি লড়াই করছেন? আপনি আলাদা জাতের পুরুষমানুষ বলে আপনাকে সুযোগ দিতে চেয়েছি আমি। ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করুন।’ কোকিলা বলল।

‘কি বললেন?’ নীল মুখ তুলল, ‘আলাদা জাতের পুরুষমানুষ? বাঃ! কিন্তু কি আলাদা আপনি দেখতে পেলেন আমার মধ্যে?’

‘বড্ড বাক্যে কথা বলেন আপনি। ঠিক আছে, আমার আর কোনও দায় থাকল না—আমি চললাম।’ কোকিলা উঠে দাঁড়াল। সিঁড়ির দিকে এগোল।

‘দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার আমার ব্যাপারে দায় কি করে ছিল?’

কোকিলা কাঁধ নাচাল। তার চুল ঝটকা খেয়ে ঢেউ তুলল। তারপর সে নিচে নেমে জীপের স্টিয়ারিংয়ে বসতেই জীপটা পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটে গেল অন্ধকারে।

নীল নেমে এল নিচে। এরকম মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু তাতে মোহিত হয়ে বসে থাকার সময় এটা নয়। তার খুব আফসোস হচ্ছিল, ভগবানের ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন কোকিলাকে করা হল না। সে ঘুরে বালিয়াড়ির দিকে তাকাতে অবাক হল। জীপের আলো দেখা যাচ্ছে না। শব্দও নেই। এত দ্রুত বালির ওপর দিয়ে ওগুলো উধাও হয়ে যেতে পারে না। তাছাড়া কোকিলার বডিগার্ড হিসেবে যারা অন্য জীপে এসেছিল তাদের তো কাছাকাছি থাকার কথা। হালকা জ্যোৎস্নায় যতটুকু চোখ যায় নীল কিছুই দেখতে পেল না। অবশ্য বালির টিপিগুলো মাঝে মাঝেই যে আড়াল তুলেছে তার পেছনেও জিপদুটো লুকিয়ে থাকতে পারে। এটা মনে হওয়াগাত্র নীল বাড়িটা থেকে সামান্য সরে বালির ওপর হাঁটু মুড়ে বসল। ওরা যদি চলে না গিয়ে থাকে তাহলে অপেক্ষা করছে ফিরে আসার জন্যে। সন্দেহ সঠিক হলে বোকার মতো ওদের হাতে নিজেকে তুলে দেওয়ার কোনও মানে হয় না।

পেছনে সমুদ্র থাকায় ঝ-ঝ করে বাতাস বইছে। বেশ শীত-শীত করছিল নীলের। এতক্ষণ যেটুকু মদ্যপান সে করেছে তার কোন প্রতিক্রিয়া শরীরে নেই। এই ঠাণ্ডা হওয়া তাকে আরও কাবু করছে।

এইসময় চারটে লোককে দেখতে পেল সে। চার ছায়ামূর্তি সন্তর্পণে বালির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। হয় ওরা ওকে আক্রমণ করবে, নয় বাড়িটার গায়ে আঙন লাগিয়ে চলে যাবে। লোকগুলো ডেকে উঠল। তারপর দ্রুত ঘরে ঢুকে গেল।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওরা খুব হতাশ হয়ে বেরিয়ে এল ডেকের ওপর। নীল ডেকের ওপর রেখে

আসা তার মনের গ্লাসটার দিকে তাকাল। জ্যোৎস্নায় চকচক করছে। সেটাকে টিপ করে ট্রিগার টানতেই গ্লাসটা ভেঙে সশব্দে আছড়ে পড়ল ডেকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে চারজন লাফিয়ে উঠল, একপলক গ্লাসের টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে চারজন চোঁ চোঁ করে দৌড় শুরু করল। একটু পরেই দুটো জীপের আলো দ্রুত সরে যেতে দেখল নীল।

ধীরে ধীরে ডেকে উঠে এল সে। এবং তখনই দেখতে পেল ডেকের ওপর একটা ছুরি পড়ে আছে। দশ ইঞ্চি ফলাওয়ালা শব্দ ছুরি। গুলির আওয়াজে ভয় পেয়ে যাওয়ায় হয়তো ওদের কারও হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে যাচ্ছিল নীল, চেয়ারের ওপর চোখ যেতে দাঁড়িয়ে গেল। সেখানে এক প্যাকেট ডানহিল সিগারেট আর লাইটার পড়ে রয়েছে। সরু হিলহিলে লাইটার। অবশ্যই কোকিনা ফেলে গিয়েছে ও-দুটো। তুলে নিয়ে নীল ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

বাংলার গেট পেরিয়ে বাগান, বাগানের ওপাশে গেস্টহাউসের নিচে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশের বড়কর্তা থেকে সরকারি অফিসার, ব্যবসায়ী কয়েকজন এসেছেন নেমস্তম্ভ রাখতে। ভদ্রলোক বছরে অন্তত দুবার এখানে আসেন। আর এলেই এদের ডেকে ভালমন্দ খাবারের আয়োজন করেন। সেই সঙ্গে বিদেশী পানীয়ের ব্যবস্থাও থাকে।

পুলিশ অফিসার বলছিলেন, 'মিস্টার সংপতি, একটা ব্যাপার আমার বোধগম্য হচ্ছে না।'

মিস্টার সংপতি হাসলেন, 'বলুন, কোন্ ব্যাপারটা?'

'আপনার মেয়ে উচ্চশিক্ষিতা, বিদেশে ছিল। সে কেন এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ছয়মাস পড়ে থাকবে? আপনি চলে গেলে সে তো একা হয়ে যাবে।'

মিস্টার সংপতি বললেন, 'পরের প্রশ্নের উত্তর আগে দিই। আমি মেয়েকে এমনভাবে মানুষ করেছি যাতে সে নিজেকে নিরাপদে রাখতে পারে। ও ক্যারাটে জানে, রিডলভারের টিপ অভ্যস্ত। শী ক্যান হ্যান্ডেল এনি সিচুয়েশন। তাছাড়া ও তো একা থাকছে না—আমার কর্মচারীরা থাকছে, ওরা খুবই বিশ্বস্ত। তার ওপর আপনারা আছেন। কি, নেই নাকি?'

'সে তো একশবার। এনি থ্রেম আমাদের জানালেই হল—'

'না। থ্রেম হল আপনারদের জানাবে না ও। নিজেই তার সমাধান করে নেবে। তবে সেটা করতে গিয়ে অল্প বয়স তো, যদি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলে, তাহলে আপনারা দেখবেন। হ্যাঁ, ওকে কেন এখানে ছয়মাস থাকতে বলেছি? ওয়েল, কোকিনা ভারতবর্ষের মেয়ে, ওড়িশা তার দেশ। প্রতিটি নাগরিকের উচিত তার দেশের মাটিকে, দেশের মানুষকে জানা, চেনা। তাছাড়া এখানে যেসব ব্যবসা আমি করে আসছি তার হালহুকিকত সম্পর্কে ও যদি ওয়াকিবহাল না হয়, তাহলে তো অন্ধকারে থাকবে—তাই না?' মিস্টার সংপতি ঘুরে দাঁড়ালেন, 'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, আপনি কিন্তু তখন থেকে একটা ঘইকি ধরে রেখেছেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আসলে আমি ঠিক অভ্যস্ত নই।'

'ও হ্যাঁ। তাহলে নিলেন কেন? এই কে আছ, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে একটা কোন্ড কিছু দাও, গ্লাসটা সরিয়ে নাও।' মিস্টার সংপতি কথা বলতে বলতে দেখলেন দুটো জীপ গেট পেরিয়ে ভেতরে এল। তিনি আশা করেছিলেন কোকিনা সরাসরি পার্টিতে চলে আসবে। কিন্তু পাঁচ মিনিট চলে গেলেও সে যখন এল না তখন অভিযন্ত্রের অনুমতি নিয়ে তিনি ভেতরে চলে এলেন।

কোকিলার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ডাকলেন, 'মামু।'

কোকিনা বেরিয়ে এল। মিস্টার সংপতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে? এনিথিং রং? তোমাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে মামু।'

'নীল ওখানে থাকলে ব্যবসা বন্ধ করতে হবে আমাদের।'

'তাহলে ওকে ওখানে রেখে এলে কেন?'

'বাবা, আমার মনে হয় তোমার ভাবনাচিন্তা একটু পুরনো হয়ে যাচ্ছে।'

'হতে পারে। আমার বয়স হয়েছে। তুমি বোঝালে আমি অবশ্যই বুঝব।'

'লোকটাকে কিনে নাও।'

'কি বলতে চাইছ?'

‘আমি অনেক ভয় দেখিয়েছি, শাসিয়েছি—কিন্তু ও নির্বিকার। ভেবেছিলাম লোকটা কম বোঝে। বেরিয়ে এসে চারজনকে পাঠিয়েছিলাম। তোমার নির্দেশমতো ওরা বাড়িতে ওকে খুঁজে পায়নি। আমাকে সন্দেহ করে ও অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়েছিল। সেখান থেকে গুলি করে মদের গ্লাস ভাঙে। ওরকম যার রিভলভারের হাত, সে ইচ্ছে করলে তোমার লোকদের ওখানেই শুইয়ে দিতে পারত। ওই লোকটাকে শেষ করে দেওয়ার চেয়ে কাজে লাগাতে পারলে বেশি লাভ হবে।’

‘নো।’ মিস্টার সৎপতি মাথা নাড়লেন।

‘বাট হোয়াই?’ কোকিলা গলা তুলল।

‘দ্যাখো, আমি কতগুলো নিয়ম আজ পর্যন্ত মেনে চলেছি। তার একটা হল, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাকে প্রথমেই গুঁড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমি তোমাকে বলেছি—হি ইজ ফ্রম ইলিয়ট রোড, ক্যানকাটা। লোকটা জাহাজে কাজ করত। সেখানে মারপিট করায় ওর চাকরি যায়। ও ফিরে যায় ইলিয়ট রোডে। সেখানে গিয়ে ও কয়েকটা খুনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং গা-ঢাকা দিতে বাধ্য হয়। আমি যদি ওপাশের ঘরে গিয়ে পুলিশ অফিসারকে এই তথ্য দিই, তাহলেই ওকে আজ রাতে হাজতে যেতে হবে। কিন্তু সেটা আমি পছন্দ করি না। আজ পর্যন্ত কাউকে পুলিশের হাতে নিজে তুলে দিইনি।’ মিস্টার সৎপতি ঘুরে দাঁড়ালেন।

‘ওয়েট বাবা! এটাই তো ওকে হাতে রাখার ভাল ওষুধ। ওর অতীত দেখিয়ে ব্র্যাকমেইল করতে পারি আমরা। অন্তত আমাকে আর একবার কথা বলতে দাও। মেরে ফেললে তো হয়েই গেল। তোমার চারপাশে যারা ছুরি অথবা বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ও তাদের থেকে অনেক বেশি বুদ্ধিমান লোক। ব্যাপারটা আর একবার চিন্তা কর—।’ কোকিলা বলল।

মিস্টার সৎপতি কিছুক্ষণ শূন্য চোখে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন, ‘কিন্তু তোমাকে শান্তি পেতে হবে।’

‘মানে?’ চমকে উঠল কোকিলা।

‘কাউকে কোনও কাজে পাঠালে সে যদি ব্যর্থ হয়ে আসে, তাহলে আমি তাকে শান্তি দিই। তুমি ব্যর্থ হয়ে এসেছ—’, মিস্টার সৎপতি গম্ভীরমুখে বললেন।

‘ওয়েল, কি শান্তি দেবে নাও।’

‘আমার কাছে কিছু গেস্ট এসেছেন। তুমি তাদের মিট করো।’

মিস্টার সৎপতি দাঁড়ালেন না। সোজা বাইরের ঘরে না গিয়ে ব্যালকনিতে চলে এলেন। সেখানে তাঁর নিজস্ব দেহরক্ষী দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখছিল বাগানের ওপর। আওয়াজ পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করল।

মিস্টার সৎপতি বললেন, ‘যে চারজন লোক মেমসাহেবের সঙ্গে পানসায়রে গিয়েছিল তাদের আর আমার দরকার নেই—বুঝতে পেরেছ?’

লোকটি দ্রুত মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

মিস্টার সৎপতি আর দাঁড়ালেন না। হাসিমুখে পার্টিতে প্রবেশ করে বললেন, ‘আমি খুব দুঃখিত, আপনাদের একা রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম বলে। আশা করি কোন অসুবিধে হয়নি।’

আজ ঘুম ভাঙল অনেক দেরিতে। গতরাতের ঘটনার পর সত্যক হওয়ার জন্যে দরজা জানলা বন্ধ করে গুয়েছিল নীল। এখন উঠে জানলা খুলে দিতে ঝড়ের মতো হাওয়া লাফিয়ে ঢুকল ঘরে। ঢুকে সব উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল। নীল দেখল সমুদ্রের জলে মেঘের ছায়া পড়েছে। আর সেই কারণে ঢেউগুলোকে এখন বেশ রাগী বলে মনে হচ্ছে। ঝড় উঠলে সমুদ্র যে কি ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে সেই অভিজ্ঞতা নীলের আছে। তবে জলের ওপর দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে লড়াই করা আর তীরের নিরাপদ ছাউনিতে থেকে সেই রূপ দেখা এক ব্যাপার নয়।

এই রাগী ঢেউগুলোকে দেখতে দেখতে তার কোকিলার কথা মনে এল। এই মেয়ে আলাদা। তার দেখা কারও সঙ্গে মিল নেই। আশ্চর্য সে হয়নি যখন কোকিলা ফিরে গিয়ে চারজনকে পাঠিয়েছিল তাকে খুন করার জন্যে। বরং আগ্রহ বেড়ে গিয়েছে তার আবার দেখা করার জন্যে। দেখা তো সহজেই করা যায়। ওই লাইটার আর সিগারেটের প্যাকেট ফিরিয়ে দিতে সে স্বচ্ছন্দে যেতে পারে। শহরে গিয়ে খোঁজ করলে ওরকম মেয়ের ঠিকানা পেতে অসুবিধে হবে না।

নীল দরজা খুলে দেখল ডেকের এক কোণে সুভদ্রা বসে আছে চুপচাপ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে, কখন এসেছ তুমি?'

'সকালে।'

নীল আকস্মিক দিকে তাকাল: মেঘ থাকায় সমস্তটা বোঝা যাচ্ছে না।

সে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে বসে 'আছ, ডাকোনি কেন?'

মাথা নিচু করল সুভদ্রা। মুখে কিছু বলল না।

'এবার থেকে দরজা বন্ধ আছে দেখলে বাড়া দেবে, বুঝেছ?'' নীল সরে দাঁড়াতে সুভদ্রা ভেতরে চলে গেল। নীল দেখল ভাঙা প্রাসাদের টুকরোগুলো এক জায়গায় ভেঙে করে রেখেছে সুভদ্রা।

সে ভেবে এসে দাঁড়াল। শৌ শৌ করে বাতাস বইছে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। তার হঠাৎ মনে হল এই সময় সমুদ্রে স্নান করলে কেমন হয়! বেশি দূরে না গিয়ে কিছুক্ষণ ঢেউগুলোর ওপর ভেসে বেড়ালে মন্দ কি! এখানে এসে সে একটিনারের জন্যও সমুদ্রে স্নান করতে নামেনি।

তা এল, সঙ্গে কিছুটা সেটা খুব আরাম করে খেল নীল। তারপর কাপড়িশ রাখতে ভেতরে এসে প্যাকেটটাকে দেখতে পেয়ে গেল। তুলে ডাকুল, 'সুভদ্রা!'

কয়েক সেকেন্ড বাদে বিচ্ছেদের দরজায় সুভদ্রার শরীরের অর্ধেকটা দেখা গেল। নীল প্যাকেট তুলে নিয়ে বলল, 'এদিকে এসে এটা নাও। তোমার জন্যে এনেছি।'

সুভদ্রা ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে প্যাকেটটা নিল।

নীল বলল, 'আমি তো মেয়েদের ব্যাপার ভাল বুঝি না। তুমি রোজ এক কাপড়জামা পরে আসছ বলে নিয়ে এলাম। ভাল না লাগলে অবশ্য পালটে দেব।'

সুভদ্রা মাথা নাড়ল, 'এগুলো থাক।'

'থাকবে কেন?' নীল বিরক্ত হল, 'তোমার কি অনেক জামাকাপড় আছে?'

'সবাই কথা বলবে।' নিচু গলায় বলল সুভদ্রা।

'অদ্ভুত ব্যাপার! তুমি আমার এখানে কাজ করতে আনো, তোমার জামাকাপড়ের প্রয়োজন, তাই আমি তোমাকে দিচ্ছি—এ নিয়ে অন্য লোকের কথা বলার কি আছে? তোমার বাড়িতে যখন রান্না হয় না, তখন কি তারা খাবার দিতে আসে?'

'সবার সঙ্গে থাকতে হলে এসব কথা শুনতে হয়।'

'না না। তোমার বাবাকে বলো আমার সঙ্গে দেখা করতে। এগুলো মেনে নেওয়া যায় না।'

'আমি যদি এখানে এসে পড়ি?'

অবাক হয়ে তাকাল নীল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'তুমি দেখছি বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে!'

প্যাকেট নিয়ে সুভদ্রা ভেতরে চলে গেল।

মিনিট পনেরো বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়ে নীলের মনে হল সুভদ্রা নয়, অন্য কোনও মহিলা এসেছে এ বাড়িতে। নতুন শাড়ি-জামায় তার চেহারা বদলে গিয়েছে অনেকটা। শুধু চুলগুলোর যদি ঠিকঠাক যত্ন নিত, তাহলে পহরের আধুনিকতা বোঝে চালিয়ে দিতে অসুবিধে হত না। নীলকে দেখে একপাশে সরে দাঁড়াল সে। টেবিলে গম্বলট আর চা দিচ্ছে।

'না, এই সাজে গ্রামে গেলে তোমার বাবার দৃষ্টিশূণ্য আরও বেড়ে যাবে।'

'কেন?' সুভদ্রা চোখ তুলল।

'তোমার বাবা বলেছিল ছেলেবুড়ো তোমাকে একা পেলেই মিষ্টি কথা বলে। এখন তোমাকে যা দেখাচ্ছে তাতে বাকিরাত্ত বাদ যাবে না।' কথাটা বলেই মনে হল বলা উচিত হয়নি। সুভদ্রার সঙ্গে এ ধরনের রসিকতা করা ঠিক নয়।

সুভদ্রা মুখ তুলল। তারপর ঠোঁট টিপে বলল, 'এখন যা দেখাচ্ছে তা বাকি লোকজন কেন এ বাড়ির বাইরে কেউ দেখবে না—তাই বাবার দৃষ্টিশূণ্য বাড়বে না। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

'তা ঠিক।' নীল কথা গোটাতে চাইছিল।

'আপনি এর আগে মেয়েদের জামা কখনও কেনেননি, না?'

'হ্যাঁ, কোন অভিজ্ঞতা নেই। কেন, বেশিক হয়েছো নাকি?'

'না, একদম ঠিক হয়েছে।' বলেই সুভদ্রা সরে গেল সামনে থেকে। ওর যাওয়া দেখল নীল। এই

ভঙ্গিটা মোটেই ভাল নয়। অনাবশ্যক কথা বললে বাজে কথা বলতে হয়। আর তা বললে ভুল বুঝতে পারে মেয়েটা। ভুল বোঝা অস্বাভাবিক নয়। ঠিক-বেঠিক কথাটায় সুভদ্রা অন্তর্ভাসের ইস্তিত বুঝেছে ভেবে খুব খারাপ লাগল নীলের। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। আজ বেশ ঝড়বৃষ্টি হবে। অন্যদিন এসময়ে সমুদ্রে কিছু নৌকো ভাসতে দেখা যায়, আজ তারা নেই। মেঘের ছায়ায় সমুদ্রের জলের চেহারা বদলে গিয়েছে। হাওয়া দাঁড়াতে দিচ্ছে না সোজা হয়ে। নাঃ, এই আবহাওয়ায় স্নান করতে নামা মানে বিপদ ডেকে নিয়ে আসা! নীল চারপাশে তাকাল। শূন্য চরাচরে বালি উড়ছে। কোথাও কোনও মানুষ নেই। সে একটা টিলার আড়ালে এসে দাঁড়াল। হাওয়ার ঝাপটা এখানে দাঁড়ালে এড়ানো যাচ্ছে। বালিও শরীরে ছিটকে আসছে না। হঠাৎ তার চোখে পড়ল—একটা মানুষ অনেকদূরে টলতে টলতে আসছে। হাওয়া ওকে ভালভাবে হাঁটতে দিচ্ছে না। এদিকে আসা মানে তা কাছেই আসা, কিন্তু কে লোকটা?

নীল অপেক্ষা করল। যে পথ দশ মিনিটে আসা যায় সেটা পার হতে কুড়ি মিনিট লাগল লোকটার। কাছে এলে চিনতে পারল সে। হরিহর পট্টবর্ধন। লোকটা সমবায়ের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবে বলেছিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে আসবে ভাবতে পারেনি নীল। সে খুশি হয়ে এগিয়ে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেল। হরিহর এবার ডেকে উঠছে। তারপর ডাকতে লাগল, 'নীলবাবু আছেন? নীলবাবু?'

নীলের কৌতূহল হল। সুভদ্রা একে কি জবাব দেয় জানতে আগ্রহ হচ্ছিল। তৃতীয় বার ডাকের পর সুভদ্রা দরজায় এল। ওর শাড়ি দেখতে পাচ্ছিল নীল, গলা শোনা যাচ্ছে না হাওয়ার জন্য। হরিহর যে খুব অবাক হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছিল। এবার সে চারপাশে তাকাতে লাগল।

নীল টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চিৎকার করল, 'কি খবর হরিহরবাবু?'

'আরে মশাই, এখানে কী দুর্যোগ বাধিয়ে বসে আছেন বলুন তো! এমন বালির ঝড় জীবনে দেখিনি! শহরে বুঝতেই পারিনি এখানে এলে এমন বিপদে পড়তে হবে।' চিৎকার করে কথাগুলো বললেন হরিহর।

তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে নীল বলল, 'ভেতরে চলে আসুন, এখানে কোনও বিপদ নেই।' জানালাগুলো এর মধ্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বালির জন্যে, দরজা খোলা ছিল, মেঝেতে বালি কিচকিচ করছে। সুভদ্রা ভেতরে চলে গেল।

হরিহর বললেন, 'বেড়ে জায়গায় বাড়ি আপনান্ন। ওয়েদার ভাল থাকলে মনে হবে স্বর্গে আছেন। সামনে সমুদ্র—সারা দিন হাওয়া। কিন্তু ওয়েদার খারাপ হলে ভয়ঙ্কর ব্যাপার!'

'কি থাকেন বলুন? আপনি তো মদ্যপান করেন না?'

'আপনারও ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

'আর কি কি করা উচিত বলুন তো?'

'সংভাবে জীবনযাপন করা, মানুষের ভাল হয় এমন কাজ করা।'

'তাহলে তো মঠে গিয়ে থাকলে হয়!'

'কেন, বাড়িতে থেকে সংসারী হয়েও তা করা যায়।'

নীল মাথা নাড়ল। তারপর চিৎকার করে বলল, 'সুভদ্রা, দু'কাপ চা দাও।'

'আপনি বলেছিলেন পরিবার-টরিরবার আপনান্ন নেই—ইনি কে?'

'এর নাম সুভদ্রা। পাশের জেলেদের গ্রামে থাকে। অবস্থা খুব খারাপ। ওকে আমি এ বাড়ির কাজ দিয়েছি অনেক অনুরোধে।'

'জেলের মেয়ে। উর্ষ, দেখে মনে হয়নি।'

'ওকে নিয়ে চিন্তা করার কোনও প্রয়োজন আছে কি?'

'না না, একদম নেই। এসব আপনান্ন ব্যক্তিগত ব্যাপার। আসলে আপনাকে আমার ভাল লেগেছে বলেই আমি চাই না কেউ আপনাকে নিয়ে বাজে কথা বলুক।' হরিহর কান মাথা নাড়ল। তারপর ব্যাং খুলে একতাড়া কাগজ বের করল, 'পানসায়র মৎসজীবী সমবায় সমিতির কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। সমবায়ের সদস্যদের নামের তালিকা, তাদের সই এই আবেদনপত্রের নিচে চাই। সমবায়ের যে সংবিধান দরকার সেটাও করা হয়ে গেছে। এখন এই কাগজগুলো ঠিকঠাক করে রেজিস্ট্রি করাতে হবে।'

নীল বলল, 'বাঃ, আপনি তো অনেক কাজ করে ফেলেছেন!'

'এই কাজগুলো কদিনে শেষ হবে?' হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন।

‘ওয়েদার ভাল হয়ে গেলে আজই খবর দেব। প্রধানকে বললেই সবাইকে পেয়ে যাব। কিন্তু ওদের মধ্যে ক’জন সই করতে পারবে জানি না—টিপ সই চলেবে?’ নীল জিজ্ঞাসা করল।

‘সই থাকাই ভাল। পরে গোলমাল হয় না।’

‘আর একটা কথা, এরা চাইছে আমি যেন সমবায়ের সদস্য হই!’

‘আপনি?’ অবাক হল হরিহর।

‘আমি চাইনি, এখনও চাই না। কিন্তু এরা বলছে আমাকে ছাড়া সাহস পাচ্ছে না।’

‘যাকলো! আমি যে সংবিধান লিখেছি তাতে বলেছি এই সমবায় সমুদ্রে মৎস্যচাষ করে বেঁচে থাকে এমন মানুষদের নিয়ে তৈরি। বহু বছর ধরে উত্তরাধিকারসূত্রে এরা এই কাজ করে আসছে। আপনার নাম এদের মধ্যে ঢোকালে মিথ্যে কথা বলা হবে।’ হরিহরকে বিচলিত দেখাল, ‘আপনি না থাকলে সাহস পাচ্ছে না কেন? এর মধ্যে ভয়ের কি হল?’

‘বাদের কাছে ওরা শুখাসময়ে ধার নেয় তারা বাধা দেবেই বলে ওদের ধারণা। আর ধারণাটা মিথ্যে নয়।’ নীল বলল।

‘কিন্তু আমার মনে হয় আপনার ওদের সঙ্গে সদস্য হয়ে থাকা উচিত হবে না। তাহলে ওরা কোনদিনই স্বাবলম্বী হতে পারবে না। তাছাড়া আপনি সমুদ্রে রাত জেগে মাছ ধরতে যাবেন না, ওদের মতো খাটবেন না। অথচ সমবায়ের সদস্য হিসেবে সমান টাকা নিতে হবে আপনাকে। দুদিন বাদে ওরাই এই নিয়ে কথা বলবে।’ হরিহর বোঝাতে চাইলেন।

এইসময় সুভদ্রা চা নিয়ে এল। হরিহর মুখ তুলে দেখলেন। সুভদ্রা ট্রে নামিয়ে ফিরে গেল রান্নাঘরে। নীলের মনে হল, এই সুভদ্রা জ্বেলের গ্রামের মেয়ে নয়। একটু তালিম দিলে ও শহরে নগরে স্বচ্ছন্দে স্বাভাবিক হয়ে থাকতে পারে।

চায়ে চুমুক দিলেন হরিহর, ‘আপনি এক কাজ করুন। সমবায় ইচ্ছে করলে বাইরের লোককে মাইনে দিয়ে কাজকর্ম দেখাশোনার জন্যে রাখতে পারে। ব্যাপারটা তো বিশাল ব্যাপার, অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে ঠিকঠাক সামলে ওঠা সম্ভব নয়, তাই ওই কাজের জন্যে আপনি থাকুন।’

এইসময় বৃষ্টি নামল। সমুদ্রে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে প্রকৃতির চরিত্র বদলে যায়। নীলের ভেতরটা আনন্দান করে উঠল। বছরতিনেক আগে প্রশান্ত সাগরে ওরা এরকম আবহাওয়ায় পড়েছিল। বড় জাহাজটাকে ভেলার মতো নাড়াচাড়া করছিল বাতাস আর ঢেউ। যে কোনও মুহূর্তেই জাহাজ ডুবে যেতে পারত। অতি বড় নাস্তিকও ভগবানকে ডাকতে বাধ্য হয়েছিল সেইসময়। শুধু সদ্য জাহাজের কাজে আসা একটি তরুণ দরজা আঁকড়ে ধরে কোনমতে দাঁড়িয়েছিল। একটা শব্দও সে উচ্চারণ করেনি। নীল তার কাছে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘কী হে? তুমি মৃত্যুভয় পাচ্ছ না?’

ছেলেটি মাথা নেড়েছিল, ‘না।’

‘যে কোনও মুহূর্তেই জাহাজ ডুবেতে পারে—লাইপ জ্যাকেট পর!’

‘জাহাজ ডুববে না।’

‘কি করে জানলে?’

‘আমার মা বলেছেন—আমি ঠিকঠাক ফিরে যাব। মায়ের কথা কখনও মিথ্যে হয়নি।’

পরম বিশ্বাসে বলেছিল ছেলেটি। খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। না, জাহাজ ডোবেনি। কিন্তু এরকম ঝড়বাদের সমুদ্রে নীলকে খুব টানে। সে চা শেষ না করে দরজা খুলে বাইরে পা দিতেই এলোপাথাড়ি ঝড়ের ঝাপটা টের পেল। মুহূর্তেই ভিজে গেল সর্বাস্ব। জলের ঘন মশারি টাঙানো হয়ে যাওয়ায় সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। বাড়িটা টিলার ওপরে বলে বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে খুব, কিন্তু সমুদ্রের জল উঠে আসতে পারবে না। এই অবধি এলে পৃথিবীর অনেকটাই জলের ওলায় চলে যাবে।

ঘরের ভেতর থেকে হরিহর চিৎকার করলেন, ‘আরে। করছেন কি? পাগল নাকি?’

কিন্তু শন শন হাওয়ার টান, জলের ধাক্কা আর সমুদ্রের গর্জন মিলেমিশে নীলকে অন্য জগতে নিয়ে যাচ্ছিল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘বেরিয়ে আসুন, এনজয় করুন! এরকম আবহাওয়া রোজ পাওয়া যায় না!’

হরিহর বললেন, ‘আমি পাগল হয়ে যাইনি—উঃ!’

হরিহর দেখলেন ভেতর থেকে সুভদ্রা বেরিয়ে এল। খোলা দরজা দিয়ে হু-হু করে জল ঢুকে ঘরের

মেখে ভিড়িয়ে দিচ্ছে। সুভদ্রা দৌড়ে দরজার কাছে গেল। বৃষ্টির জল মুখে গায়ে মেখে তাকাবার চেষ্টা করল। তারপর ঘরের ভেতরের দিকে তাকিয়ে গ্রাম্যগলায় বলে উঠল, 'ওঁকে ফিরিয়ে আনুন—সমুদ্র টেনে নেবে, সমুদ্র খেয়ে নেবে!'

গলার স্বরে এমন আর্তি ছিল যে হরিহর উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। এক পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'নীলবাবু কোথায়? এই তো কথা বলছিলেন!'

'জানি না দেখতে পাচ্ছি না। এইরকম সময়ে সমুদ্র মানুষ খায়। আপনি যান!'

হরিহর আর এক পা এগোলেন। সুভদ্রার শরীরের ফাঁক দিয়ে তিনি বৃষ্টি ঢাকা আকাশ আন্দাজ করলেন, 'আমি কি করে যাব? এই বৃষ্টিতে কিছু দেখতেই পাব না!'

সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে নিল, তারপর দৌড়ে বেরিয়ে এল ডেকে। বেরুতেই হাওয়ার ধাক্কা উপড় হয়ে পড়ে গেল। ভেতরে দাঁড়িয়ে হরিহর তখন চোঁচিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাঁর কোনও কথা সুভদ্রা শুনতে পাচ্ছিল না। হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির কাছে পৌঁছে দেখার চেষ্টা করল সুভদ্রা। দিনদুপুরেই রাত নেমেছে। বৃষ্টি হওয়ায় বাতাসে বালি নৌঁই, কিন্তু জলের ছাঁট বালির চেয়ে বেশি জোরে বিধছে শরীরে। সে নিচে নেমে কোথাও নীলের শরীর দেখতে পেল না। অবশ্য হাত-দুশেকের বেশি তার দৃষ্টি যাচ্ছিল না। সে দৌড়ে টলতে টলতে টিলার আড়ালে চলে এল। এখানে বাতাসের দাপট কম, মাথা খুল পড়ছে। এবং তখনই চোখে পড়ল নীলের শরীরটা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশাল বিশাল ডেউ সমুদ্রের বুক থেকে অনেক ওপরে উঠে আছড়ে পড়ছে বালির ওপর। আর তার টানে সম্মোহিতের মত নীল এগোচ্ছে ডেউ-এর দিকে। চিংকার করল সুভদ্রা। কোনও অর্ধবিশ্ব শব্দ নয়, একটা জান্তব আর্দনাদ। তারপর দৌড়াতে লাগল ঢালু বালি দিয়ে। দু'তিনবার আছাড় খেয়ে সে যখন নীলের কাছে পৌঁছোল তখন হাঁটুজল চারপাশে। দুহাতে নীলকে ধরে টান দিতেই নীল পড়ে গেল জলে। তখনই একটা বিরাট ডেউ ওদের মাথার ওপর দিয়ে আছড়ে পড়ল বালির ওপর। জলের ভেতর পড়ে যাওয়ায় হঠাৎই ঘোর কেটে গেল নীলের। সে অবাক হয়ে দেখল বিধ্বস্ত সুভদ্রা তাকে আঁকড়ে ধরে কেবলই বলে যাচ্ছে, 'ফিরে চলুন, আপনাকে মরতে দেব না!'

এই বৃষ্টির জলেও বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটার মুখ-চোখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। কোনমতে সুভদ্রাকে নিয়ে জলের সীমার বাইরে আসতে পারল নীল। পায়ের তলায় রাগী বাসুকির নিঃশ্বাস নিয়ে ডেউগুলো কেবলই ছোবল মেরে চলেছে। সুভদ্রা বিড়বিড় করে যাচ্ছিল, 'সমুদ্র সব খায়—ওকে খেয়েছে, ওকে খেয়েছে!'

নীল চিংকার করে ডাকল, 'সু-ভ-দ্রা!'

সুভদ্রা চমকে উঠল। বড় বড় চোখে তাকাল। সেই চোখে বৃষ্টির জল জমল। নীল বলল, 'চলে এসো।' তারপর বাতাস ঠেলে ওপরের দিকে উঠতে লাগল।

সমস্ত শরীর চুইয়ে জল পড়ছে, এই অবস্থায় নীল দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে হরিহর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'এ কি মশাই! আপনি—আপনারা পাগল নাকি?'

নীল মাথা নেড়ে ভেতরে ঢুক গেল। সোজা বাথরুমে। মিনিট দুয়েকের মধ্যে সে খাটো প্যান্ট আর গেঞ্জি পরে চলে এল বাইরে। এসে হরিহরের উলটোদিকের চেয়ারে বসল। হরিহর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছিল বলুন তো? এভাবে বৃষ্টির মধ্যে—'

নীল মাথা নাড়ল, 'জানি না, হঠাৎ কিরকম একটা টান অনুভব করলাম—আমার মাথা ব্ল্যাক হয়ে গিয়েছিল। ইন ফ্যাক্ট, সুভদ্রা গিয়ে আমাকে না আটকালে কি হত কে জানে!'

'আমি এরকম ঘটনা শুনেছি, কিন্তু কখনও চোখে দেখিনি। বাপস! এ একেবারে ভূতে পাওয়া!'

'ভূত কিনা জানি না, সমুদ্রে পাওয়া বলতে পারেন!'

'ওই মেয়েটি—ও আপনাকে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে গেল, ও কোথায়?'

'আসছে। হরিহরবাবু, আমি এখন একটু পান করব।'

'পান করবেন? মানে? মদ্যপান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। জলে ভিজ্ঞে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছে।'

'এক কাপ চা খুব কড়া করে বানিয়ে খেয়ে নিন।'

'কড়া চা খেলে আপনাদের উপকার হতে পারে আমার হয় না।' নীল উঠে গিয়ে মদের গ্রাস, বোতল এবং জল নিয়ে ফিরে আসতেই সুভদ্রা দরজায় এল। জলে ভিজ্ঞে তার জামাকাপড় শরীরের সঙ্গে লেপটে

গেছে। আঁচল শরীরে জড়িয়ে কোনমতে হেঁটে সে ভেতরে চলে গেল। আর তার যাওয়া দেখলেন হরিহর বড় বড় চোখ করে। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'একজন অনাখীয়া যুবতী মহিলা বাড়িতে রয়েছে, আর আপনি মদ্যপান করছেন নীলবাবু? এ ভারি অন্যায্য কথা!'

'কেন? আপনি তো আছেন?'

'আমি?'

'হ্যাঁ। মদ্যপান করে আমি মাতাল হয়ে যদি ওকে আক্রমণ করি, তাহলে আপনি বাধা দেবেন। জেলেবস্তিতে গিয়ে লোক ডেকে আনবেন!' গ্রাসে মদ ঢেলে চুমুক দিল নীল।

'এঃ, একেবারে খালি পেটে থাকছেন! ডাইরেক্ট লিভারে গিয়ে হিট করছে। আপনার লিভার পচে যাবে মশাই। আত্মহত্যা—একে আত্মহত্যা ছাড়া কিছু বলে না।' হরিহর চোঁচিয়ে উঠলেন, 'এই যে, কী নাম যেন, নীলবাবুকে সমুদ্রের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে তো খুব ছুটে যাওয়া হল, এদিকে উনি ঘরে বসেই আত্মহত্যা করছেন, এখন বাঁচানোর দরকার নেই? এই যে!'

নীল হাসছিল। হরিহর থামলে বলল, 'ওর নাম সুভদ্রা।'

'ওহে সুভদ্রা—সুভদ্রা?' চোঁচালেন হরিহর।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেও যখন সুভদ্রার দেখা পাওয়া গেল না তখন হরিহর বললেন, 'অতি অভদ্র রমণী। জামাকাপড় দেখে বোঝা যায় না জেলেবস্তির অশিক্ষা ওর মধ্যে আছে। কিন্তু ব্যবহার মানুষের পরিচয় দেয়। যান মশাই, আপনি নিজে গিয়ে কিছু খাবার নিয়ে আসুন।'

'সুভদ্রা আসার পরে আমি রান্নাঘরে ঢুকি না। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কি কথা?'

'আপনি ফিরবেন কি করে? বৃষ্টি আর ঝড় তো সমানে বয়ে চলেছে—শেষ বাস তো দুপুরের পরেই চলে যায়। এখনই রওনা না হলে মুশকিলে পড়বেন।' নীল বলল।

হরিহর স্ত্রি—এর মতো লাফিয়ে উঠে দরজার কাছাকাছি গিয়ে বাইরে উঁকি মারার চেষ্টা করে বললেন, 'ও মশাই, এ যে দেখছি প্রলয় শুরু হয়ে গিয়েছে!'

'তাই তো বললাম।'

'সমুদ্রের জল অনেক উঠে এসেছে।'

'হ্যাঁ, জলোচ্ছ্বাস হয়েছে। বিদেশে গুনেছি পনেরো ফুট ওপরে চলে আসে।'

'তাহলে কি হবে?'

'কি আর হবে? এই বাড়ি যদি সমুদ্র গ্রাস করে নেয় তাহলে একসঙ্গে মরে যাওয়া যাবে। ততক্ষণ আরাম করে বসুন। আসুন।' নীল ডাকল।

হরিহর ফিরে এসে চেয়ারে হতাশ হয়ে বসে পড়লেন। শুধু বৃষ্টি আর বাতাসের শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছে না। ওরা কেউ কথা বলছিল—প্রথম গ্রাস শেষ করে দ্বিতীয় গ্রাস ধরতেই কাতরে উঠলেন হরিহর, 'নীলবাবু!'

'বলুন?'

'আর না খেলে নয়?'

'কেন, অসুবিধে কি হচ্ছে?'

'এর মধ্যেই আপনার মুখের চামড়া কি রকম বদলে গেছে! তার ওপর খালি পেট—'

হরিহরের কথা শেষ না হতেই সুভদ্রা একটা ট্রে নিয়ে এসে টেবিলে রাখল। তাতে দুটো প্রেটে বড় সাইজের ওমলেট রয়েছে।

নীল বলল, 'বাঃ! হরিহরবাবুর দৃষ্টিভঙ্গা বদল হল। সুভদ্রা, আজ প্রলয় হচ্ছে—বেশ জমিয়ে থিচুড়ি করতে পারবে? শুভ! যাও।'

হরিহর আবার বড় চোখে সুভদ্রাকে দেখছিলেন। সে চলে যেতে বললেন, 'কি ব্যাপার মশাই? যখন এসেছিলাম তখন ওকে শহরের মেয়ে বলে মনে হচ্ছিল, এখন একেবারে জেলের ঘরের মেয়ে বলে বোঝা যাচ্ছে। এরকম পরিবর্তন হল কি করে?'

পরিবর্তন নীলের চোখেও পড়েছে। ভেজা জামাকাপড় ছেড়ে সুভদ্রা তার নিজস্ব শাড়ি জামা পরেছে। সেগুলো বহু ব্যবহারে মলিন। শাড়িটিও সম্ভবত খাটো, তাই পরার ধরনও বদলে গেছে। নীলের মনে পড়ল

সে দু-সেট জামাকাপড় এনেছিল—দ্বিতীয় সেট ব্যবহার না করে পুরনো কাপড় পরল কেন সুভদ্রা? এই সময় বাজ পড়ল কোথাও। তার শব্দে চমকে উঠে হরিহর বললেন, ‘এই মরছে!’

‘আপনি ভয় পাচ্ছেন?’

‘তা পাব না? উঃ!’

‘খিচুড়ি হচ্ছে দুপুরে।’

‘আর খিচুড়ি! তার আগে ভেসে না যাই!’

‘তা অবশ্য। আপনি যদি ভেসে যান, আমিও যাব। তাহলে সমবায় হবে না। আর তা যদি হয়, আপনি এক গ্রাস খেয়ে দেখতে পারেন।’ গ্রাসটা উচু করল নীল।

‘গ্রাস? মদ?’

‘হ্যাঁ। এর স্বাদ ভাল করে নিয়েই মরা উচিত। এক গ্রাস মদ ওমলেট দিয়ে খেলে আপনার শরীরের ক্ষতি ক্ষতি হবে না। আর শরীরটা তো যে কোনও মুহূর্তেই সমুদ্রের গর্ভে চলে যেতে পারে!’ নীল চামচে দিয়ে ওমলেট কেটে মুখে দিল।

হরিহর বললেন, ‘আপনি তো ভয়ঙ্কর মানুষ!’

নীল হেসে উঠল হো হো করে।

দুপুরের পরে বৃষ্টি থামল, হাওয়া নয়। খিচুড়িটা মন্দ হয়নি। সুভদ্রাকে কাজ শেষ করে বাড়ি চলে যেতে বলে নীল হরিহরকে নিয়ে বাসের দিকে গেল। ভেজা বালিতে হাঁটতে মন্দ লাগছে না। খালিপায়ে এসেছিল নীল, কিন্তু হরিহরের জুতো বালিমাথা হয়ে গিয়েছে। জেলেবস্তির ভিড় দূর থেকেই চোখে পড়ল। লোকজন উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। ওরা কাছে পৌঁছে দেখল বাড়িবৃষ্টিতে অনেক ঘর উড়ে গিয়েছে। কোঁচ হতে বা আহত হয়নি বটে কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। ওদের দেখে প্রধান এগিয়ে এল সামনে, ‘দেখুন কি অবস্থা! পাইকাব মারছে তাতে আর ভগবান মারছে প্রাণ। এখন এই পরিস্থিতি নতুন করে হোঁচক করতে যে টাকা দরকার তা কোথায় পাবে ওরা?’

নীল মাথা নাড়ল, ‘সবাই মিলে যদি—’

‘সবাই মিলে? বেশি ভাগের তো একই অবস্থা। আর যার সামান্য আছে সে নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে অন্যকে সাহায্য করবে কেন?’

হরিহর বললেন, ‘সমবায় হলে এই সমস্যা থাকবে না।’

প্রধান হরিহরের দিকে তাকাল। নীল পরিচয় করিয়ে দিল, ‘ইনি হরিহরবাবু। শহরে ওয়ালার্ত করেন। খুব পরোপকারী মানুষ। ইনি একটি পয়সা না নিয়ে সমবায়ের সব ব্যয় করে দিয়েছেন। কাগজগত ঠিকি করা থেকে রেজিস্ট্রি করা, সব।’

প্রধান হরিহরকে নমস্কার করল।

হরিহর বললেন, ‘শুনলাম আপনাদের পরিবারের সংখ্যা পাঁচ। পাঁচশটি পরিবার থেকে একজন করে আবেদনপত্রে সই করবেন—সবাই সই করতে পারে তো?’

‘সবাই কি পারে?’

‘দেখবেন, পারলে ভাল হয়।’

এই সময় দূরের ভেজা বালির ওপর দিয়ে একটা জীপ আব তার পেছনে বিশাল ট্রাকটকে আসতে দেখা গেল। প্রধান বলল, ‘হয়ে গেল বাবু!’

‘কি হল?’

নীল প্রশ্ন করামাত্র জেলেগ্রামের বেশির ভাগ মানুষ উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, ‘আসছে, আসছে!’

ভিড় দুটো ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতেই গাড়ি দুটো মাঝখানে এসে দাঁড়াল। নীল অবাক হয়ে দেখল মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় জগদীশ বসে আছে ড্রাইভারের পাশে। জিপের পেছন থেকে জনামেরক হাছাবান লোক লাফিয়ে নেমে ভিড় সরাসরে লাগল। প্রধান এগিয়ে যেতে দুর্বল গলায় জগদীশ জিজ্ঞাসা করল, ‘দিকর কম ক্ষতি হয়েছে বাড়ে?’

প্রধান উত্তর দেবার আগে জনসাধারণ একসঙ্গে তাদের ক্ষতির পরিমাণ জানাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে জগদীশ হাত তুলতে তারা একসময় চুপ করল। জগদীশ বলল, ‘মালিক আপনাদের বিপদের কথা ভেবে চাল ভাল আনু পাঠিয়ে দিয়েছেন।’

সঙ্গে সঙ্গে যেন উচ্ছ্বাসের বাঁধ ভাঙল। সবাই চিৎকার করতে করতে ট্রাকের দিকে ছুটল। রক্ষীরা তাদের বাধা দিচ্ছিল। জগদীশ প্রধানকে বলল, 'আপনাদের মধ্যে যাদের ঘর ঝড়ে ভেঙেছে তাদের পরিবার পিছু তিনশ টাকা মালিক পাঠিয়ে দিয়েছেন। লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বনুন সবাইকে।'

প্রধান কি বলবে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু অন্যান্যরা যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল তারা 'টাকা দিচ্ছে টাকা দিচ্ছে' বলে চৈতাতেই লাইন পড়ে গেল জীপের সামনে। টিপসই দিয়ে প্রত্যেকে টাকা নিতে লাগল। সেটা শেষ হয়ে গেলে ট্রাক থেকে কয়েকটা বস্তা নিচে নামিয়ে দেওয়া হল। কয়েকজন যুবক সেটা বিতরণের দায়িত্ব নিয়ে নিল।

হরিহর নিচু গলায় বললেন, 'ব্যাপারটা ভাল হল না।'

নীল চূপচাপ দেখছিল। এবার এগিয়ে গেল জীপের পাশে, 'জগদীশবাবু যে! এর মধ্যে হাসপাতাল আপনাকে ছেড়ে দিল? আমি সেদিন দেখে এলাম আপনি খুব অসুস্থ!'

জগদীশ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে ড্রাইভারকে বলল, 'ফিরে চল।'

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার জীপ চালু করল। ক্লান্ত জগদীশ চোখ বন্ধ করল। দুটো গাড়ি ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল।

তাস্তব হয়ে গিয়েছিল নীল। জগদীশ যেন তাকে চিনতেই পারল না। অথচ জগদীশকে ভয়ঙ্করভাবে আহত করেছে ওর মালিকের লোকজন। এবং অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থাতেও মালিকের আদেশে ওকে এখানে রিলিফের নামে দান নিয়ে আসিতে হয়েছে।

হরিহর দৌড়ে এল নীলের কাছে। সেখানে দাঁড়িয়ে প্রধান খান-বিতরণ দেখছিল চূপচাপ। হরিহর জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা যে খাতায় টিপসই দেওয়ালো, সেখানে কি লেখা ছিল?'

প্রধান নিজে টাকা নেয়নি। সে টাকা নিয়েছে এমন লোককে খুঁজতেই জনার্দনকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকল, 'ও জনার্দন, কোন্ শর্তে টাকা নিলে তোমরা?'

'শর্ত আবার কি? গায়ে পড়ে টাকা দিতে এসেছে, নিয়ে নিলাম।'

'নেবার সময় মনে হল না টিপসই দিচ্ছ? সেখানে কি লেখা আছে তা জানা দরকার—অভাব বলে নিজেকে বিক্রি করে টাকা নেবে?' হরিহর টেচিয়ে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় ভ্রমল জনার্দনের মুখে। কথটা চাউর হতে সময় লাগল না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুটো দল হয়ে গেল। দলে ভারী যারা তারা বলতে লাগল, 'ঝড়ে ঘর ভেঙেছে, ঘরে খাবার নেই—এখন আর শর্ত নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি লাভ? এই যে নিজে থেকে শহর থেকে গাড়ি পাঠিয়ে খাবার আর টাকা পৌছে দিল, এর কোনও মূল্য নেই?'

আর একজন রুখে দাঁড়াল নীলের সামনে, 'আপনি দিতেন টাকা? চালডাল দিতেন? দুদিনের জন্যে এসেছেন, সময় হলেই এখান থেকে উড়ে যাবেন—আপনার কি? যে আমাদের বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে তার চড়াচাপড় খেতে আমাদের আপত্তি নেই।'

নীল বুঝল এই সময় কথা বলে কোনও লাভ হবে না। হরিহর কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, নীল তাকে থামিয়ে দিল, 'থাক হরিহরবাবু। পরে কথা হবে। কিন্তু আপনি ফিরবেন কি করে? এখন তো বাস নেই। ইস, বুদ্ধি করে যদি খালি ট্রাকে চেপে শহরে ফিরে যেতেন, তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।'

'আমার জন্যে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না তো মশাই। উঃ, রাগে শরীর জ্বলে যাচ্ছে আমার। কী ভয়ঙ্কর বুদ্ধি! ঝড়জলের খবর পেয়েই বুঝে গেছে এই হল মওকা, এই সব পাঠিয়ে কিনে নিল গ্রামটাকে।' হরিহর বললেন।

প্রধানকে খুব গভীর দেখাচ্ছিল, 'একটা কথা ভুল বললেন। পুরো গ্রামটা কিনতে পারেনি। আমার মতো বেশ কয়েকজন টাকা নেয়নি।'

হরিহর বললেন, 'কিন্তু ওরা এক দুই করে পচিশজনকে তিনশো করে টাকা দিয়েছে। হয়তো দেখবেন লিখে রেখেছে তিন হাজার। আগামী মরগুনের সমস্ত মাহের বিনিময়ে ওই টাকা নিচ্ছি—এই রকম লেখা আছে।'

সেই উদ্ধত যুবক বলল, 'অসম্ভব। এরকম ডাকাতি কেউ করতে পারে না।'

হরিহর বললেন, 'কয়লা খেয়েছ, যখন আঙুরা হাগবে তখন টের পাবে ভাই! প্রধানমশাই, কত লোক টিপসই দিয়ে টাকা নেয়নি তার সন্ধান করুন তো?'

প্রধান কাজটা আরম্ভ করলেন। দেখা গেল পনেরোটি পরিবারের পঁচিশজন মানুষ টাকা নিয়েছে। অর্থাৎ কোনও কোনও পরিবারের একাধিক ব্যক্তি তিনশো করে পেয়েছে। দশটি পরিবারের লোক টাকা নেয়নি। তারা প্রধানের জন্যে অপেক্ষা করছিল। প্রধান টাকা নিলে তারাও নিত।

হরিহর বললেন, ‘আপনারা বুদ্ধিমান বলেই ভাগ্যবান। সামনের বছরের জন্যে নিজেদের বিক্রি করে দিলেন না। কিন্তু নীলবাবু, ওরা কেন প্রতিটি পরিবার থেকে একজন ডাকল না? এমনকি প্রধান টাকা নিচ্ছে না দেখেও তাকে নিতে বাধ্য করল না কেন?’

নীলের চোখের সামনে জগদীশের মুখ ডেসে উঠল। জগদীশ কি ইচ্ছে করেই এই কাণ্ডটা করে গেল? মালিককে পঁচিশজনের টিপসই দেখাবে, অথচ দশটি পরিবারকে বাঁচিয়ে দেবে? কে জানে? নীল বলল, ‘ভুল তো মানুষ মাড়েরই হয়। কিন্তু হরিহরবাবু, এই দশজনকে নিয়ে কি সমবায় তৈরি করা যায়?’

‘আলবত যায়। ভাই সব, আপনাদের একটি আবেদন-পত্রে সই করতে হবে। এই সই করার বিনিময়ে আপনারা এখনই নগদ কিছু পাবেন না, কিন্তু সামনের মরশুম থেকে আপনাদের আর খাওয়া-পরা অभाव থাকবে না। সারাজীবনের জন্যে নিজেরাই নিজেদের মালিক হবেন—আপনারা রাজি?’

একজন টাকা না নেওয়া ষ্ট্রট বলল, ‘কিন্তু সামনেই গুখা মরসুম। ঘরে দানা নেই বললেই চলে। এই সময় খাব কি? পাইকার তো এখনই টাকা দেয়।’

‘একটু কষ্ট করুন। এই এক মাসের মধ্যে আপনাদের দশজন কিছু কিছু টাকা নিজেদের সংসার চালাতে ভাগ করে নেবেন। সমবায় আইনসম্মত হওয়ার পর ব্যাঙ্ক আপনাদের ধার দেবে। সেই ধারের টাকার কিছুটা দিয়ে সংসার চালাবেন, বাকিটা লাগাবেন নৌকো জাল মেরামত করতে, চিকিৎসা করতে। নীলবাবু সেনসব আপনাদের বুঝিয়ে দেবেন।’ হরিহর তাঁর ব্যাগ থেকে নীলকে দেখানো কাগজ বের করলেন। নীল অবাক হল। এই কাগজপত্র তাকে দেখাতে বের করেছিলেন হরিহর। টেবিলে ছিল। এখানে আসার সময় কোন ফাঁকে আবার তুলে নিয়ে এসেছেন।

হরিহর বললেন, আসুন, আগে নাম বলুন, আমি নাম ইংরেজিতে লিখে দিচ্ছি, তারপর আপনারা সেই নামের পাশে সই করুন।’

একজন জিজ্ঞাসা করল, ‘টিপসই চলবে না?’

‘উপায় না থাকলে চলবে।’

দশজন লোক প্রধানকে সামনে রেখে লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল। যারা টাকা নিয়েছিল তাদের মধ্যে গুপ্তন উঠল। একজন এগিয়ে এসে বলল, ‘আমরা সই করব না কেন? আমরাও সমবায়ে থাকতে চাই।’

হরিহর বললেন, ‘আপনারা কোন্ শর্তে টাকা নিয়েছেন না জানলে সমবায়ের সদস্য হতে পারবেন না। ওরা যদি বলে আপনি সামনের মরশুমে আপনার ধরা মাছ ওদের দিতে টাকা নিয়ে চুক্তি করেছেন তাহলে সমবায়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। আগে ঝোঁজ করুন। দেখুন কি লিখে রেখেছে। যদি এরকম কিছু না লেখা থাকে তাহলে স্বচ্ছন্দে সদস্য হতে পারেন। সমবায়ের সদস্য যে কোনও সময়ে বাড়ানো যায়।’

যে লোকটি পাইকারের প্রশংসা করছিল, সে বলল, ‘ওরা শালা মরবে! পাইকার জানতে পারলে গুণ্ডা লেলিয়ে দেবে—ঢাল তালোয়ার নেই এই অবস্থায় কি লড়াই করা যায়?’

নীল প্রধানকে ডেকে বলল, ‘গুনুন, আপনি যদি মনে করেন ওরা আপনাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে, তাহলে সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ না পাওয়া পর্যন্ত কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে এই দশজন চলে যেতে পারে। একবার ঋণ পেয়ে গেলে ওরা আর কিছু করতে পারবে না। অবশ্য আপনারা যদি এখানে থেকে দলবদ্ধভাবে ওদের মোকাবিলা করেন তাহলে ওরা কিছু করতে সাহস পাবে না।’

‘কোথায় আর যাব বলুন! আত্মীয় বলতে যারা আছে তাদেরও তো একই অবস্থা। যা হবার তো এখানেই হোক।’ প্রধান বলল।

সইসাবুদ এবং টিপসই করিয়ে হরিহর বললেন, ‘নীলবাবু, আপনি কিন্তু কাগজপত্র দেখে নিলেন না। আমি কালই ফাইল করব।’

‘আইনের ব্যাপার, দেখে আমি কি বুঝব বলুন? কিন্তু আপনাকে তো কিছু টাকা দিতে হবে—কত?’ নীল জিজ্ঞাসা করল।

‘এসব দেখে আমার শরীর জ্বলছে। যা লাগবে তা আমিই আপাতত ম্যানেজ করে নেব। রেজেষ্ট্রি হয়ে গেলে আপনি না হয় দিয়ে দেবেন।’

‘কবে দেখা করব?’

‘দেখুন, তদবির করেও দিন সাতকের আগে কিছু করতে পারব বলে মনে হয় না।’

‘তাহলে সাতদিন বাদেই শহরে যাব। কোথায় দেখা পাব আপনার?’

অনেকক্ষণ চিন্তা করে বার, সময় এবং জায়গা বললেন হরিহর। তারপর বললেন, ‘আচ্ছা, তাহলে আমি বিদায় নিই!’

‘বিদায় নেবেন মানে? যাবেন কি করে?’ নীল অবাক হল।

মিটিমিটি হাসলেন হরিহর, ‘আসার সময় খোঁজ নিয়ে এসেছি। ফিশারিস ডিপার্টমেন্টের একটা গাড়ি ঠিক বিকেল পাঁচটায় ভুবনেশ্বরে যাবে। আমি শহরে নেমে পড়ব। আরে মশাই, পেশায় উকিল তো! হাজারটা শকুন মরে একটা উকিল হয়।’ বলেই জিভ কাটলেন হরিহর।

‘কি হল?’ নীল জিজ্ঞাসা করল।

‘শোনা কথা বলা ঠিক হল না। দেশবন্ধু উকিল ছিলেন, তাঁর আত্মীয় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, ডিনিও উকিল, জ্যোতি বসু ওকালতি পাশ করেছেন। এঁরা সব প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ। এসব উপমা এঁদের ক্ষেত্রে খাটে না। আমি বরং বলি, হাজার শকুন মরলে আমার মতো বেকার উকিল হয়। আচ্ছা, চলি!’ হাঁটা শুরু করলেন হরিহর। কিন্তু কয়েক পা গিয়ে পাঁড়িয়ে পড়লেন।

নীল ঠেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘কিছু বলবেন?’

মাথা নাড়লেন হরিহর, ‘নীল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার?’

গলা খাদে নামিয়ে হরিহর বললেন, ‘ভাই নীলবাবু, একটা অনুরোধ রাখবেন? মদ্যপান করা ছেড়ে দিন। খুব খারাপ নেশা। আচ্ছা চলি।’

নীল তাকিয়ে থাকল দূরে সরে যাওয়া মানুষটার দিকে। এ বয়স পর্যন্ত সে অনেক অনেক মানুষ দেখেছে, কিন্তু হরিহরের বিকল্প কেউ নেই।

নীল বাড়িতে ফিরে এসে দেখল দয়াজা ভেজালো, সুভদ্রা চলে গিয়েছে। সে ভেতরে ঢুকল। ঘর অন্ধকার হয়ে আসছে। সে জানলা খুলে দিল। হাওয়ায় উড়িয়ে দিল ঘরের বন্ধ আবহাওয়া। রান্নাঘরের সামনে গিয়ে সে অবাক হল। সুভদ্রা তার ভিজে নতুন কাপড়জামা অন্তর্বাস ওই অল্প জায়গায় নোলে দিয়েছে। খুব সপ্তপণে সে অন্তর্বাস জামার আড়ালে রেখেছে। এইটুকুতে মেয়েটির সন্তোষ এবং সত্ৰমবোধের পরিচয় পেয়ে খুব ভাল লাগল নীলের।

ক্রমশ সন্ধে নামল। বৃষ্টি না ঝরলেও আকাশ মেঘে থমথমে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসে যাচ্ছে। সমুদ্র তেমনিই অশান্ত, বেপরোয়া। ডেকে চেয়ার নিয়ে এল নীল। দিশি মদের বোতল ঘরে রয়েছে, সেটা তুলতেই হরিহরের মুখ মনে পড়ল। শালা, লোকটা যেন বিবেকের মত ভেসে বেড়াচ্ছে! ঠিক তখনই হাওয়া এবং সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে ইঞ্জিনের আওয়াজ কানে এল। কোন্ গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ। নীল দ্রুত ডেকে চলে এল। বালির ওপর দিয়ে একটা জীপের দুটো হেডলাইট কাঁপতে কাঁপতে এই বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। একটাই জীপ। নীল সোজা হল। রিভলভারটা দ্রুত বের করে সে ঘরের মধ্যে চেয়ার টেনে বসল, যেখান থেকে ডেকে ওঠার সিঁড়িটা দেখা যায়। সন্ধে পেরিয়ে যাওয়া এই সময়ে কোন ভদ্রলোকের তার কাছে আসার কথা নয়। যিনি আসছেন তার অভ্যর্থনার জন্যে সে প্রস্তুত হয়ে রইল।

জীপের আওয়াজটা বাড়ির পাশে এসে থামল। তারপর সিঁড়ি থেকে একটি কণ্ঠস্বর সোচ্চার হল, ‘আপনি কি বাড়িতে আছেন নীলবাবু?’

নীল এটা আশা করেনি। কণ্ঠস্বর কোকিলার।

নীল গলা তুলল, ‘হ্যাঁ, আছি। কি ব্যাপার?’

‘আরে, এমন ভাবে কথা বলছেন যেন আমি এসে অনায়াস করেছি!’

‘সেদিন ফিরে গিয়ে যখন খুনীদের পাঠিয়েছিলেন তখন আপনাকে সাদর ভালবাসা জানাবার কি কোনও কারণ আছে?’ নীল জিজ্ঞাসা করল।

‘দূর মশাই! যা অতীত তা আপনি ধরে বসে আছেন কেন? আসুন, বেরিয়ে আসুন—কোথায় আপনি?’ কোকিলা জিজ্ঞাসা করল।

নীলের খেয়াল হল। সে বাড়িতে ফিরে আলো জ্বালানি। যখন ফিরেছিল তখন ছায়ামাখা আলো ঘরে

ছিল। নীল বলল, 'আপনি যদি একা থাকেন তাহলে স্বচ্ছন্দে দরজার সামনে চলে আসুন। কিন্তু কোনও চালাকির চেষ্টা করবেন না। আসুন চটপট।'

কোকিলা ধীরে ধীরে দরজার সামনে এসে বলল, 'বাঃ, চমৎকার নাটক করেন আপনি! আমি আপনার জন্যে কচ নিয়ে এলাম আর—আরে আলো না জ্বালিয়ে বসে আছেন কেন?'

'আপনি সত্যি একা?'

'কি আশ্চর্য!'

নীল উঠল। আলো জ্বালল। তারপর বলল, 'আসুন।'

কোকিলা ঘরে এল। তার হাতে ক্যারিবাগ। পরনে টকটকে লাল মিডি আর চেক ব্লাউজ। একদম বিদেশিনী বলে মনে হচ্ছে।

ব্যাগ টেবিলে রেখে কোকিলা জিজ্ঞাসা করল, 'খুব রেগে গিয়েছেন, না?'

'আমার অবস্থায় আপনি থাকলে কি করতেন?'

'রেগে যেতাম!'

নীল মাথা নাড়ল। তারপর সন্তর্পণে দরজায় গিয়ে বাইরে তাকাল। সেখানে এখন নিশ্চিহ্ন অন্ধকার। কোকিলার সঙ্গে কেউ থাকলেও তা জানার উপায় নেই। এবার বেশ জোরে হেসে উঠল কোকিলা, 'আমি কাউকে সঙ্গে আনিনি। প্রমিস!'

দরজা থেকে সরে এসে এমন জায়গায় চেয়ার টেনে নীল বলল যাতে কেউ দরজায় এলেই তার চোখে পড়ে যায়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার কি উদ্দেশ্যে এসেছেন?'

কাঁধ নাচাল কোকিলা, 'আরে আমাকে বসতে বলবেন তো!'

'বসুন।'

টেবিলের উলটোদিকের চেয়ারে সশব্দে বসে পড়ল কোকিলা, 'আজ সারাদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেছে এখানে, তাই না?'

'সেটা হওয়ায় আপনাদের সুবিধে হয়েছে।' নীল বলল।

কপালে ভাঁজ ফেলল কোকিলা, 'বুঝলাম না।'

নীল হাল ছেড়ে দিলে। তারপর হালকা হওয়ার জন্যে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথেকে আসছেন?'

'কেন? শহর থেকে? ও, ওখানে বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ঝড় হয়নি!'

'আপনি যে এভাবে হটহট গাড়ি চালিয়ে একা চলে আসছেন, আপনার বাবা কিছু বলেন না?'

'বাবা জানেন আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারি। তাছাড়া আপনি তো বাঘ ভালুক নন। নীল, আপনাকে একটা কথা বলি—যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আসুন আমরা বন্ধু হয়ে যাই, ঠিক আছে?' কোকিলা চোখের কোণে তাকাল।

'কি রকম?'

'আপনি আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ করেন।'

'আপনাদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ। বাবা কয়েকদিনের মধ্যে এখান থেকে চলে যাবেন। ওঁর অন্য ব্যবসা আছে। আমাদের এই কোস্ট লাইনের মাছের ব্যবসার দায়িত্ব দিয়েছেন। শুধু এই একটা পানসায়র তো নয়, আমার খুব পরিশ্রম হবে—আপনি যদি আমার কিছু দায়িত্ব শেয়ার করেন তাহলে বেঁচে যাই।' কোকিলা বলল।

'এতে আমার কি লাভ?'

'ও সিওর। যতদূর বুঝছি আপনি এখানে রেস্ট নিচ্ছেন। রোজগারের কোনও চেষ্টাই করছেন না। একটা অফার দিচ্ছি, এখান থেকে যা মাছ উঠবে টেন পার্সেন্টের দাম আপনি কমিশন হিসেবে পাবেন। টাকার পরিমাণটা কি আন্দাজ করতে পারেন?'

'না। কিন্তু কেন দেবেন?'

'আপনার সার্ভিসের জন্যে।'

'সেটা ছাড়াই আপনার বাবা দীর্ঘকাল তাঁর ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। যেখানেই তিনি থাকুন কোথাও তাঁর ব্যবসা আটকে যাচ্ছে না। এখন খামোকা দিতে যাবেন কেন? এই প্রস্তাব আপনি ওঁকে দিলে আপনাকে ইনএফিসিয়েন্ট ভাবতে পারেন।'

‘নো স্যার! প্রত্যেক মানুষের বয়স বাড়লে একটু নরম ভাব এসে যায়। তাছাড়া আগে যেসব প্রত্নম ছিল না এখন সেসব ডেভলপ করছে।’

‘যেমন?’

‘এই মাছ-মাররা সোজা পথে চলছে না।’

‘কি করে আশা করেন? আপনারা বছরের পর বছর ওদের এক্সপ্লয়েট করবেন, ওদের অভাবের সুযোগ নেবেন, এ তো চলতে পারে না। একসময় ওরা কথা বলবেই।’

‘বলুক। ওয়েলকাম! কিন্তু সেটা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বলুক। অন্যের শেখানো কথা যেন না আওড়ায়।’ কোকিলা সোজা হয়ে বসল।

‘প্রত্যেক মানুষকেই অন্যের কাছ থেকে কথা শিখতে হয়।’

‘তাই নাকি? তা সেই কথা শেখার পরেও আচরণ পালটায় না কেন?’

‘ম্যাডাম! আজ যখন বাড়জলে ওদের অনেকের ঘর ভাঙল, খাবার নষ্ট হল—ঠিক তখনই আপনারা ট্রাকে করে খাবার আর টাকা পাঠিয়েছিলেন। ওই প্রচণ্ড হত্যাশার সময় ওরা শেখা কথা বলতে পারল না। ওদের অবস্থা জানা থাকায় আপনারা এক্সপ্লয়েট করলেন।’

‘এই ব্যাপারটা আমি জানতাম না নীল। কিন্তু ওরা নিয়েছে কেন?’

‘ওই বললাম—অভাব।’

‘কেশ, যদি এই খাবার আর টাকা না আসত তাহলে কি হত? কিভাবে বাঁচত ওরা? কুকুর-বেড়ালের মতো ওদের ছেলেমেয়েরা কষ্ট পেত, হয়তো না খেয়ে মরত। আপনি সেইটে সমর্থন করছেন?’ কোকিলা হেসে উঠল, ‘হয় না, না মশাই। থিওরি আর প্র্যাকটিসের মধ্যে প্রচুর তফাৎ। যদি বাবা ওসব পাঠিয়ে থাকেন তাহলে বলব এই পঁচিশঘর মাছমারা বেঁচে গেল। বাবার প্রতি সদয় কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কোকিলা গলার স্বর পালটালো, ‘আপনি ওদের উপকার করতে চান? ভাল কথা। আমার সঙ্গে কাজ করলেও তো সেটা করা যেতে পারে? যাক এসব কথা পরে বললেও চলবে। এবার অন্য কথা বলুন। এখন দারুণ বাতাস বইছে।’

নীল তাকাল। ব্যাগটা রয়েছে টেবিলের ওপর। সেই চাহনি লক্ষ্য করে কোকিলা ব্যাগের মুখ খুলল। একটা বড় শিভাস রিগ্যালের বোতল বের করল, ‘আশা করি বলবেন না এই জিনিস খেতে খুব খারাপ লাগে আপনার।’

‘এটা কেন নিয়ে এসেছেন?’

‘আপনাকে ঘুম দিতে নয়, বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে।’

‘এ জিনিস এখানে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। আপনি নিজে কেনেননি। নিশ্চয়ই আপনার বাবার কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ তিনি জানেন ওটা আমাকে দিতে আপনি এখানে এসেছেন। ব্যাপারটা আমার কাছে কি স্বস্তিকর?’

‘দূর মশাই! কে দিচ্ছে, কেন দিচ্ছে এসব খোঁজখবর নিয়ে কি হবে? একটু বোহেমিয়ান হন না! যত আপনি প্রশ্ন করবেন তত সমস্যা বাড়বে!’

‘আপনাকে এখান থেকে একা ফিরতে হবে ম্যাডাম।’

‘নিশ্চয়ই। এক পেগ স্কচ খেলে সেটা পারব না বলে আপনার ধারণা হচ্ছে নাকি?’

‘আপনি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আপনার বাবা অপেক্ষা করবেন।’

কোকিলা তাকাল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সোজা এগিয়ে এল নীলের সামনে। পাশের চেয়ারটায় একটা পা জুতোসুদ্ধ তুলে দিয়ে বলল, ‘যে ভদ্রলোক এখানে নেই তাঁর কথা তুলে যেতে পারছেন না? আমি অ্যাডাল্ট। বিদেশে একা ছিলাম। আপনি কি আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করবেন না আমি চলে যাব?’

নীল মাথা নাড়ল, ‘আমি অ্যাডমিট করছি আপনার মতো মেয়েকে আমি কখনও মিট করিনি। আমেরিকান সিনেমায় হয়তো দেখতে পাওয়া যায়।’

নীল উঠল। টেবিলের কাছে গিয়ে শিভাস রিগ্যালের বোতলটা তুলে ধরল। কোকিলা পা নামিয়ে একটা পাক দিল। তারপর দ্বিধাসা করল, ‘বেডরুম কটা?’

‘গ্যাসে স্কচ ঢালতে ঢালতে নীল জবাব দিল, ‘দুটো।’

‘অন্যটায় কে থাকে?’

‘হাওয়া।’

‘বাঃ, ওইটে কিচেন? আরে এখানে শাড়ি শুকোচ্ছে যে! আপনার সঙ্গে কোনও মহিলা থাকেন নাকি? আমি শুনেছিলাম আপনি এখানে একাই থাকেন!’ কোকিলা ঘুরে দাঁড়াল।

‘ঠিকই শুনেছেন। যে মহিলা জেলেবন্দি থেকে রোজ সকালে এসে আমার রান্না করে দেয়, ঘর পরিষ্কার করে, ওগুলো তার।’

‘শাড়ির রঙ দেখে মনে হচ্ছে মহিলার বয়স বেশি নয়।’

‘ও নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি।’

‘কিন্তু শাড়ি-স্রামা ভিজল কি করে?’

‘আজকের ঝড়ঝুটির কথা আপনার অজানা নয়।’ নীল বলল, ‘আসুন।’

কোকিলা জুতোয় শব্দ তুলে কাছে এসে গ্রাস নিল, ‘হইন্সি অন্যরকম না হলে ভাল লাগে না। বিশেষ করে স্কচ হলে তো কথাই নেই।’

‘সরি, বরফ আপনাকে দিতে পারছি না। চিয়াঁস।’

‘চিয়াঁস। আমাদের বন্ধুত্ব আমৃত্যু হোক।’ গ্রাস ওপরে তুলেই নামিয়ে নিল কোকিলা। তারপর সরে গেল জানলার কাছে। অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘অভাব মানুষের বুদ্ধি লোপ করে দেয়, এ ব্যাপারটা মানে?’

গ্রাসে চুমুক দিল নীল। দীর্ঘকাল দিশি খেতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া জিভে আলাদা আরাম হল না। অথচ একসময়, জাহাজে কাজ করার সময়ে, শিভাস পেলে একটা উৎসবের আমেজ তৈরি হয়ে যেত।

‘আপনি কথাটা শুনতে পাননি?’ কোকিলা ঘুরে দাঁড়াল।

অন্ধকার আকাশকে জানলার ফ্রেমে রেখে দাঁড়িয়ে আছে কোকিলা। নীলের মনে হল অসামান্য দৃশ্য। সে বলল, ‘সরি, বলুন! ও ঠ্যা, শুনেছি। কথাটা কারও কারও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তারা দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে।’

‘আমি দারিদ্র্য বলিনি। অভাব—অভাব বলেছি। যে বিদেশি সিগারেট খেতে অভ্যস্ত সে এমন জায়গায় যদি পৌঁছায় যেখানে দিশি সিগারেটও পাওয়া যায় না, তাহলে তাকে বিড়ি খেতে দেখা যায়। বাধ্য হয়েই খায়।’

‘আপনি কি বলতে চাইছেন?’

‘আপনি পুরুষমানুষ। একজন যুবতী মেয়ে আপনার কাছে কাজ করতে আসছে। স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। কিন্তু আপনি এমন ভঙ্গিতে কথা বললেন যেন সে দূর কোন গ্রহের প্রাণী। কাজের লোক মাত্র।’

‘বাঃ কোকিলা। বিদেশে থেকে এসেও আপনার মানসিকতা এদেশীয় মহিলাদের বেশির ভাগের সঙ্গে কোনও তফাত নেই। ওই শাড়ি দেখেই আপনি সন্দেহ শুরু করে দিলেন। এই যে আপনি হইন্সির বোতল নিয়ে সজ্জাবেলায় একা আমার কাছে এসেছেন, এ খবর জানলে যে কেউ ওই একই কথা ভাববে।’

‘আরে আপনি রেগে গেলেন নাকি? আমি কোনও আঘাত করার জন্যে আপনাকে কথাটা বলিনি। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে—সে কার সঙ্গে সম্পর্ক করবে।’ কোকিলা বলল, ‘দূর, এসে অবধি আমরা শুধু ঝগড়াই করে যাচ্ছি। বসুন, আড্ডা মারি।’

দুই চুমুকে গ্রাস খালি করে আবার ঢালল নীল, ‘আপনার ভাইবোন নেই?’

‘নাঃ।’

‘বিয়ে করছেন না কেন?’

‘কোনও কিছু মানুষ প্রয়োজনে করে। এখনও ওই প্রয়োজনটা বোধ করিনি। আপনি বিয়ে করেছেন? মনে হয় করেছেন।’

‘তাই নাকি?’

‘ঠ্যা, বিবাহিত পুরুষরা খুব সন্দিক্ত হয়, সতর্ক হয়ে কথা বলে।’

অনেকক্ষণ পরে হাসল নীল, ‘না ম্যাডাম। যাকে বিয়ে করতে পারতাম, জাহাজ থেকে ফিরে এসে দেখলাম সে বেঁচে আছে মড়ার মতো। কিছু লোকের লালসা ওকে আসিডে পুড়িয়ে দিয়েছে। নিজেকে এমনভাবে গুটিয়ে নিয়েছে যে আমাকে স্বীকার করতে চাইল না। আপনার বাবা বোধহয় এসব কাহিনী জানেন।’

‘কি করে মনে হল?’

‘আপনি আমার অতীতের কথা জানেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ইলিয়ট রোডের কথা আপনি বলেছিলেন।
আচ্ছা, কি জানেন বলুন তো আমার সম্পর্কে আপনারা?’

‘আমি কিছুই জানি না। বাবার কথা ছেড়ে দিন! আর কোনও মেয়ের সঙ্গে—’

‘না, অস্বীকার করব না। কিন্তু সেগুলো দানা বাঁধেনি।’

‘কেন?’

‘হয়তো আমার স্বভাবে সেটা নেই।’

‘তা তো বুঝতেই পারছি। এখানে একা আপনার ভাল লাগছে?’

‘দারুণ।’ নীল লক্ষ্য করছিল কোকিলা মাত্র দুবার চুমুক দিয়েছে গ্রাসে। খুব সামান্য হইকি তার পেটে
গিয়েছে। এ ব্যাপারে যে ও খুব সতর্ক তা বোঝাই যাচ্ছে। নীল হেসে বলল, ‘ম্যাডাম, আপনি ড্রিং না
নিলেই পারতেন।’

‘কেন?’

‘ওভাবে গ্রাস হাতে ধরে রাখলে স্কচকে অপমান করা হয়।’

‘আপনি আমাকে তাভাতে চাইছেন?’

‘মোটাই না। যার যা সম্ভব হয় না তার তা না করাই ভাল।’

চোখ ছোট করে তাকাল কোকিলা। তারপর এক চুমুকে গ্রাস শেষ করে বলল, ‘হয়েছে? আপনি খুশি?
ইচ্ছে করলে আর এক গ্রাস দিতে পারেন।’

‘না, আপনাকে অনেকদূর একা যেতে হবে।’

‘আরে মশাই, আমার উপর ভরসা রাখুন।’ নিজেই দ্বিতীয়বার গ্রাস ভরে নিল কোকিলা। তারপর বলল,
‘যাঃ, সিগারেটের প্যাকেট গাড়িতে ফেলে এসেছি।’

নীল উঠে সেল্ফে তুলে রাখা প্যাকেট আর লাইটার নিয়ে এসে এগিয়ে দিল, ‘সেদিন এ দুটো ফেলে
গিয়েছিলেন।’

‘আচ্ছা! থ্যাঙ্ক ইউ।’ ফস্ করে সিগারেট ধরাল কোকিলা। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ‘তা হলে এখন
থেকে আমরা বন্ধু?’

‘আপনি ওটা মিন করছেন না?’

‘তার মানে?’

‘আপনি ব্যবসার কথা মাথায় রেখে বলছেন?’

‘নট অ্যাট অল! চুলোয় যাক ব্যবসা—আমি মন থেকে বলছি।’

‘তাহলে বন্ধু।’ নীল মাথা নাড়ল।

আবার চুমুক দিল কোকিলা—‘আমার না কিছুই ভাল লাগে না। কি নেই আমার? এডরিথিং। টাকা গাড়ি
বাড়ি স্বাধীনতা—সব আছে। তবু এত লোনলি লাগে! ওয়েল, আর্জ উটি। আপনাকে আমার খুব ভাল
লেগেছে নীল।’ গ্রাস শেষ করে উঠে দাঁড়াল কোকিলা। কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল, ‘আমাকে
এখন যেতে হবে। তাহলে আপনার কথা নিয়ে যাচ্ছি, তাই তো?’

নীল লক্ষ্য করল কোকিলার গলার স্বর এর মধ্যেই জড়িয়ে এসেছে। সে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল,
‘আপনি কি ঠিকঠাক গাড়ি চালাতে পারবেন?’

‘হোয়াট ডু ইউ মিন? আমি মাতাল হয়ে গিয়েছি?’ হেসে উঠল কোকিলা, ‘নো নীল, আই অ্যাম নট
দ্যাট নার্ভস। পরন্তু, না কাল—কাল ভোরেই আমি মাছমারাদের ফেরার সময় এখানে আসব। আমাদের
ম্যানেজার কমপ্লেন করছে সমুদ্রে নাকি এখন জাল ফেললেও তেমন মাছ উঠছে না। গুড নাইট।’

কোকিলা ডেকে নেমে চারপাশে তাকাল। নীল ওর পাশে এসে দাঁড়াল, ‘এইদিকে সিঁড়ি।’

কোকিলা বিরক্ত হল, ‘ওঃ নীল! আমি জানি সিঁড়িটা কোথায়।’

এখন আকাশে আরও মেঘ জমেছে। ফলে চারপাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না। বালির ওপর দিয়ে কোনওরকমে
পা ফেলে জিপের কাছে চলে এল কোকিলা। তারপর বিড়বিড় করল, ‘চাবিটা।’

‘এই যে।’ অফকারেই নীল ড্যাশবোর্ডে ঝুলে থাকা চাবি দেখিয়ে দিল। দিয়ে বলল, ‘ভেজা বালির ওপর

অন্ধকারে গাড়ি চালানো বেশ শক্ত ব্যাপার। আপনি আমাকে চালাতে দিন, বাসসট্যান্ডের কাছে পিচের রাস্তায় পৌঁছে গেলে আপনি চালাবেন।'

'কী বোকার মতো কথা! আচ্ছা উঠে আসুন। আমি ঠিকঠাক চালাচ্ছি কিনা দেখে ভবিষ্যতে মুখ বন্ধ রাখবেন।' সিটে বসে ইঞ্জিন চালু করল কোকিলা, 'উঠে আসুন।'

নীলের মনে হল, অন্তত পিচের রাস্তা পর্যন্ত মেয়েটার সঙ্গে যাওয়া উচিত। সে পাশের সিটে বসতেই কোকিলা এত জোরে ব্যাক গিয়ারে চালানো যে চমকে বলে উঠল, 'আরে আস্তে! বালিতে ঢাকা ফর্সে যেতে পারে!'

'চোরাবালি তো নয়, ভয় পাচ্ছেন কেন?' গাড়ি ঘুরিয়ে বালির ওপর দিয়ে তীব্রগতিতে চালাতে লাগল কোকিলা। গাড়ি সোজা থাকছে না, নীল চিৎকার করল, 'কি হচ্ছে?'

'আগে বলুন, আপনি আমার বন্ধু হবেন?'

'আশ্চর্য। এটা কি ওই প্রশ্ন করার সময়? গাড়ি স্টো করুন।'

'নো—আগে বলুন!'

'না, আমি কোনও উত্তর দিতে পারব না।'

'কেন? আমি খুব খারাপ?'

'ও কোকিলা, প্লীজ!'

'বেশ তাহলে তাই হোক।'

নীল দেখল পলকেই গাড়ি ঘুরিয়ে সমুদ্রমুখী হল কোকিলা। বালির ওপর দিয়ে চালু পথে নেমে যেতে লাগল জলের দিকে।

'এ কি করছেন? জলে পড়ে যাবে গাড়ি!'

'তাই তো যাচ্ছি। আপনাকে নিয়ে সোজা সমুদ্রের গভীরে, সেখান থেকে পাতালে—আঃ।' কোকিলার চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি খেমে গেল চাকার দুপাশে বালি ছড়িয়ে। জলের একটু আগে মরীয়া হয়ে নীল ব্রেকে ডান পায়ের চাপ দিয়েছে। সেইসময় কোকিলার পায়ের চাপ পড়তে পারে। ধীপ আচমকা খেমে যাওয়ায় স্টিয়ারিংয়ে মাথা ঠুকে গিয়েছিল কোকিলার। সে মুখ তুলে দেখল হেডলাইটের আলোয় গড়িয়ে আসা ডেউলোকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। সে পাশ ফিরে তাকাতেই নীল চৈতন্যে উঠল, 'আপনার মরার শখ হতে পারে—আমার নেই। নেশা না হলে কোনও মানুষ এমন পাগলামি করতে পারে না। নামুন ওখান থেকে, আমি চালাব।'

কোকিলা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ দু-হাতে নীলের মুখ কাছে টেনে নিয়ে এসে চুমু খেল। নীল বাধা দিতে গিয়েও পারল না। তিনবার চুম্বনের পর কোকিলা বলল, 'তুমি সত্যি আলাদা। একটু অবশ্য বাবা-বাবা ভাব আছে তোমার মধ্যে, আমার অবশ্য সেটাও দরকার।'

নীল কিছু বলার আগেই কোকিলা হেডলাইটের সুইচ অফ করে দিল। দিয়ে বলল, 'তুমি একটু নেমে দাঁড়াবে?'

'কেন?'

'প্লীজ, প্রশ্ন করো না।' কোকিলা ভেজা বালির ওপর নামল।

অগত্যা বাধ্য হয়ে নীল নিচে নামল। চারপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কোকিলা ডাকল, 'আমি এখানে।' শব্দ শুনে নীল এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

আচমকা দুহাতে নীলকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রাখল কোকিলা, 'কোনও কথা বোলো না। চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তোমাকে অনুভব করতে চাই।'

সেই নির্জন সাগরবেলায় যখন গভীর—গভীরতর অন্ধকার চারদিক গ্রাস করে নিচ্ছিল, যখন ডেউদের আশ্বাসন গায়ে মেখে নোনা বাতাস মাতলামি করে যাচ্ছিল, জলের দাপটে গৃহহীন হয়ে ওপরে উঠে যাওয়া লাল কাঁকড়ার দলও যখন পলাতক, তখন দুটি নারীপুরুষ কোও পুরাকালের মূর্তির মতো সময় স্তব্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল একত্রিত হয়ে। কোনও কথা নেই, কোনও শব্দ নেই, শুধু অস্তিত্বের কোন্ গহন স্তর থেকে একটা তৃপ্তির অনুভূতি পরস্পরকে গ্রাস করে নিচ্ছিল অনাম্যাসে। কোকিলার মনে হচ্ছিল এমন আনন্দ কখনও পায়নি সে। নীলের মনে হল, যদি এ ভুলও হয় তবে এই ভুলের জন্যে পৃথিবীতে বারংবার ফিরে আসা যায়।

ঠিক সেইসময় ওপরে বালির তটভূমিতে শব্দ বাজল। এক নয়, একাধিক গাড়ির আওয়াজ। কোকিলা ত্রুস্ত গলায় বলল, 'কি ব্যাপার?'

ওরা বিচিহ্ন হল। নীল বলল, 'এত রাতে এদিকে গাড়ি আসার কথা নয়।'

ওরা দ্রুত ওপরে উঠে আসতেই দেখতে পেল খানিকটা দূর দিয়ে দুটো গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে চলেছে।

নীল বলল, 'ওরা আমার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। তার মানে তোমার সন্ধানে এসেছে ওরা। তুমি কি সময় দিয়ে এসেছিলে?'

'না, বিশ্বাস কর—আমি ওদের সঙ্গে আনিনি। মাই গড! বাবা—বাবা ওদের পাঠিয়েছে! তার মানে, বাবা কি আমাকে অবিশ্বাস করছে?'

'না। তোমার বিপদ হতে পারে ভেবে ওদের পাঠানো হয়েছে।'

গাড়িগুলো ধীরে ধীরে অনেকটা এগিয়ে গেলে নীল বলল, 'চল।'

'কোথায়?'

'ওরা ফিরে আসার আগেই আমাদের যেতে হবে।'

ব্যাক গিয়ারে গাড়ি খানিকটা পিছিয়ে নিয়ে ওপরে উঠে নীল যতটা দ্রুত পারে চালাতে লাগল। পাশে বসে কোকিলা ঘাড় ঘুরিয়ে আরও দূরে সরে যাওয়া গাড়ি দুটোকে দেখছিল। ওদের হেডলাইট দূর থেকেও দেখা যাচ্ছে। নীল জীপ চালিয়েই আলো না জ্বেলে। ওরা গাড়ি না থামানো পর্যন্ত জীপের আওয়াজ পাবে না। একসময় কোকিলা বলল, 'ওরা থেমে গেছে।'

'তার মানে বাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছে। টিলার ওপর উঠেছে বলে তুমি ওদের দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু এই জীপের শব্দ ওরা পাবে না।' শেষ পর্যন্ত নীল বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি চলে এল। আঙ্গ বাদলের রাত বলে কোনও মানুষ পথে নেই, দোকানগুলোরও ঝাঁপ বন্ধ। জায়গাটা পার হতে আলো জ্বালতে হল। খানিকটা এগিয়ে জীপ থামালো নীল, 'তুমি কি এখন চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে?'

'পারব।'

নীল নেমে দাঁড়াল। কোকিলা সিট পালটালো। তারপর হাত বাড়াল, 'নীল, আই লাভ ইউ!'

হঠাৎ নীল আবেগে আক্রান্ত হল। এগিয়ে গিয়ে কোকিলার কপালে চুমু খেল। তারপর বলল, 'গুড নাইট ডার্লিং!'

কোকিলার জীপ বেরিয়ে গেল। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নীল লক্ষ্য করল, জীপের চাকা একটুও এবেরেকৈ যাচ্ছে না। সে নিশ্চিত হল।

খুব সতর্ক হয়ে রাস্তার বাঁ দিক ধরে হেঁটে বাসস্ট্যান্ড পেরিয়ে বালির চরে চলে এল নীল এবং তখনই দেখতে পেল হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়িদুটো ফিরে আসছে। সে দ্রুত দৌড়ে অনেকটা দূরে সরে এসে বালির ওপর শুয়ে পড়ল। এটা ফিরে যাওয়ার পথ নয়। জানা না থাকলে জীপের মুখ এদিকে ঘুরবে না। এটা ফিরে যাওয়ার পথ নয়, অতএব হেডলাইটের আলো তার ওপর পড়ার সম্ভাবনাও নেই।

গাড়িদুটো ধীরে ধীরে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে যেতে সে উঠে দাঁড়াল। এখন অনেকটা পথ তাকে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু নীলের এখন হাঁটতে ভাল লাগছিল। কোকিলার শরীরের ঘ্রাণ গায়ে মেখে ওই অন্ধকারে সে হেঁটে চলেছিল একা। পাশে গর্জ্বে চলা সমুদ্র যেন ঈর্ষায় উদ্ভ্রাণ।

বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত চিন্তায় পড়ল নীল। সে যখন বেরিয়েছিল তখন ঘরে আলো জ্বলছিল। এখন অন্ধকার। অর্থাৎ ওরা আলো নিভিয়ে দিয়েছে অথবা ভেঙে ফেলেছে। কিন্তু কেউ অথবা কয়েকজন যদি ভেতরে থেকে যায় তাহলে ওপরে উঠলে অসহায় অবস্থায় ধরা দিতে হবে। নীল টিলার আড়ালে চলে এল। যদিও আলো না জ্বললে সে কিছুই দেখতে পাবে না—কিন্তু তাকেও কারও সামনে পড়তে হবে না। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়, হাঁটাও হয়েছিল অনেকটা, নীল বালির টিলায় হেলান দিয়ে বসে পড়ল।

কখন ঘুম এসেছিল তার জানা নেই, হঠাৎ গায়ে বৃষ্টির জল পড়তেই সে চোখ খুলল। বৃষ্টি আসছে আবার। এখানে বসে থাকলে ভিজতে হবে সারারাত। সে দ্রুত উঠে পড়ে দৌড়ে ডেকে ওঠার সিঁড়ির নিচে চলে এল। তারপর কোমর থেকে রিভলভার বের করে সতর্কপণে ওপরে উঠতে লাগল। ইতিমধ্যে বৃষ্টিতে সে ভিজে যাচ্ছিল। দরজাটা হাট করে খোলা রয়েছে। ইচ্ছে করে সমুদ্রের দিকে তাক করে শুনি হুঁড়ল সে। দাক্ষণ শব্দটার কোন প্রতিক্রিয়া এল না ঘরের ভেতর থেকে। নিচু হয়ে রিভলভার তাক করে ঘরের ভেতর

চুকল সে। না, কেউ কোনও শব্দ করল না। একটু একটু করে নীল নিশ্চিত হল বাড়িতে কেউ নেই। বাইরের দরজা বন্ধ করে সে দেশলাই জ্বালল। বড় আলো পড়ে আছে মাটিতে। তার কাঁচ ভেঙে চৌচির। রান্নাঘর থেকে দ্বিতীয় আলো বের করে জ্বালল সে। বাইরের ঘর আলোকিত হলে সে হতভম্ব হয়ে গেল। তখনই করে গেছে ওরা ঘরটাকে।

স্কটের বোতল ভেঙেছে, জিনিসপত্র ছড়িয়ে রয়েছে চারধারে। সাজানো বাগানে বুনো মোষ ঢুকলে যে অবস্থা হয় এ বাড়ির অবস্থা তেমনই। আজ এই রাতে ঘর পরিষ্কার করার কোনও বাসনা নীলের হল না। হঠাৎ ক্রান্তি তাকে আক্রমণ করল। এমন কি ফ্রিজ খুলে খাবার বের করে গরম করে খেতেও তার ইচ্ছে হচ্ছিল না।

নীল ধীরে ধীরে শোওয়ার ঘরে ঢুকে ওই পোশাকেই বিছানায় লুটিয়ে পড়ল। তার মনে হচ্ছিল এখানে থাকলে সে যে কোনও মুহূর্তেই মরে যেতে পারে। এই যে লোকগুলো এসেছিল, ওদের কথা কোকিলা কি জানত না? ও বলেছে—জানত না। ওকে কি বিশ্বাস করা যায়? বিশ্বাস করবে কি?

যেন গভীর কুমোর তলা থেকে কোনও অদৃশ্য শক্তি তাকে টেনে টেনে ওপরে তুলছিল। নীল এবার অস্পষ্ট শব্দ শুনল। ঘুম এবং নিরুদ্বেগের মধ্যে দুলতে দুলতে সে দ্বিতীয়বার শব্দ পেল।

নীল চোখ খুলল। নিদ্রা-স্নাগরণের মধ্যে শব্দ নিয়ে ধন্দে পড়তেই সে আবার শব্দ শুনতে পেল। এবার আর কোনও ভুল নেই। সে হাতুড়ালো। তারপর খেমান হল, রিভলভারটাকে আলো জ্বালাবার সময় রান্নাঘরে রেখে এসেছে। নীল দ্রুত গিয়ে সেটাকে অধিকার করল। তারপর ধীরে ধীরে বাইরের ঘরের দরজায় পৌঁছালো। এবং তখনই নিচু গলায় কথা শুনতে পেল। একটি নারী-কণ্ঠ যেন কিছু বলছে। নারী-কণ্ঠ কোথেকে আসবে? কোকিলা কি ওদের সঙ্গে ফিরে এল? বিশ্বাসের শেষ স্তম্ভ যেন ধসে পড়ছিল। নীল উচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, ‘কে—কে ওখানে?’

‘আমি!’ খুব দুর্বল, কাঁপা গলায় একটি নারীকণ্ঠ জানান দিল।

‘আমি কে?’

‘আন্তে সুভদ্রা।’

প্রচণ্ড চমকে গেল নীল—সুভদ্রা?

সে দরজা খুলে দেখল সুভদ্রা দাঁড়িয়ে আছে।

‘কি ব্যাপার? এত রাতে?’ খুব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল নীল।

‘আন্তে একটু আগে এদিক থেকে বন্দুকের আওয়াজ হয়েছিল—’

‘হয়েছিল তো, তোমার কি? এত রাতে তুমি কেন একা এলে?’

‘আন্তে একা আসিনি। মা সঙ্গে এসেছে।’

‘বুটি হচ্ছে না?’

‘না।’ সুভদ্রা বলল, ‘আমার খুব ভয় করছিল তাই—’

‘মা কোথায়?’

‘নিচে। আমি যাই।’

‘দাঁড়াও। এসেছ যখন তখন কাচগুলো তুলে দিয়ে যাও।’

‘কাচ?’

‘গ্রাস আর আলোর কাচ ভেঙেছে।’ নীল সরে এল দরজা থেকে। সুভদ্রা ঢুকল। দ্বিতীয় আলোটার আয়ু তখন কমে এসেছে। একটা ঝাঁটা দিয়ে সে ভাঙা কাচ ছড়ো করল। নীল দেখল এখন ওর পরনে সেই একই শাড়ি এবং জামা। কিন্তু মেয়েটা ভাল। নইলে এই গভীর রাতে গুলির আওয়াজ পেয়ে তার কিছু হয়েছে এই ভয় পেয়ে দেখতে আসত না। এইটুকু ভেবে আবার তাকাতেই সে নিচু হয়ে ঝাঁট দেওয়া সুভদ্রার বাঁকানো শরীরের অভিনব মুদ্রা দেখতে পেল। ভারী নিতম্ব এবং সরু কোমর সমস্ত দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করে যৌবনকে ধন্য করে রেখেছে। সে নিচু গলায় বলল, ‘সুভদ্রা।’

সুভদ্রা চমকে ফিরে তাকাল। তার চোখে বিস্ময়।

‘তুমি চলে যাও সুভদ্রা। আর এক মুহূর্তও এখানে থেকো না—দ্রীজ।’

সুভদ্রা সোজা হয়ে দাঁড়াল, কি করবে বুঝতে পারছিল না সে।

নীল এবার চিংকার করে উঠল, ‘গেট আউট। চলে যাও—আমি কি বলছি তা কি শুনতে পাচ্ছ না?’

কোন যেমনই নামকে পাঠিয়ে দেবে। মইনে দিয়ে নেব। আর কখনও এখানে পা দেবে না তুমি—যাও!’

ফ্যালফ্যাল করে আঁকিতে থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল সুভদ্রা।

মিনিটখানেক লাগল নিভেতে শান্ত করতে। এবং তারপরেই একরাশ লজ্জা ঝাঁপিয়ে পড়ল চতুর্দিক ভরে। ‘কি ছি ছি! এ কি বরষা নে? নোড়ে ডেকে চলে এল নীল। অন্ধকার বাসুবেলায় এখন কাউকে দেখা যাচ্ছে না। পোড়ানো ছুটে গিলে কোনও লাভ নেই, সে কেন নিভের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলোছিল। সুভদ্রাও ভাবলো শরীরে একটি বিশেষ ভঙ্গি আচরণ তার শরীরে মনে আঝেড়ান তুলল কেন? কখন আজ রাতেই একটি বেড়া বাঁধে চুপা করে বসেছে—অই লাভ হইট।’

অন্ধ সন্ধ্যার দৃশ্য ভাঙল নীলের। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরে তীব্র যন্ত্রণা আর উজ্জ্বল অনুভব করল সে। পাশে কোনও চাকর বা পালকে। কপালে হাত রেখে দুইদল জ্বরের মাত্রা কম নয়। কখন হল? যেমন করে হল? কোন মাগরাতে সুভদ্রা চলে যাওয়ার পর সে অনেকক্ষণ সমুদ্রের ধারে বসেছিল। নিরের দৃতধর্মের জন্যে অনুশোচনা হয়েছিল—তখনই জলো বাতাসে শরীর আক্রান্ত হয়েছিল?

কোনমতে উঠে নীল টলতে টলতে টয়লেটে গেল। মুখে-গায়ে জল দিতে সামান্য আরাম। সে আবার ঘর ফিরে বিছানার দিকে এগিয়েই মনে হল ওষুধ খাওয়া দরকার। অথচ বাড়িতে একটাও ওষুধ নেই। অসুস্থ রোগে সমুদ্র থেকে ফিরে এসে যদি একটু মদ্যপান করত, তাহলে এই জ্বরটা আসত না। অ্যালকোহল এসব ব্যাপিকে ঠেকিয়ে রাখে। এখন এক পাত্র খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো জ্বর কমে যেতে পারে। বাইরের দরজা কোনমতে এসেও দরজা পাগটানো সে। না, একা এই বাড়িতে মরে পড়ে থাকতে রাজি নয় সে।

কখনও কখনও জেলিপাড়ার বাচ্চাগুলো সমুদ্রের এদিকে খেলতে খেলতে চলে আসে। তাদের কাউকে দেখতে গেলে যন্ত্রণারকর ব্যবস্থা দেওয়া যায়। জানলা দিয়ে তাকাল নীল। বৃষ্টি নেই কিন্তু রোদও ওঠেনি। বসোয়াগরের নিম্নচাপ হলে কয়েকদিন এইভাবে কাটে। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলেই হতভম্ব হয়ে গেল। ডেকের এক কোণে সুভদ্রা বসেছিল, দরজা খুলতেই উঠে দাঁড়াল।

‘কি ব্যাপার? তুমি?’ নীল প্রশ্ন না করে পারল না।

সুভদ্রা কবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

‘আপনার ভাবসে কখনও দাঁড়ায় শব্দ করেছিলো?’

‘না!’

‘কখন?’

‘আপনি নাম কলসন।’

মুঠে মনস্তত্ত্ব থেকে উঠে আসা এক দম্পল বাতাস নীলের ওপর আছড়ে পড়তেই তার সর্বাসে ঝাঁটা লাগল, শরত শান্ত করতে লাগল। একটু উল্টে গেল নীল। কোনও কথা না বলে সে ধীরে ধীরে ফিরে গেল দরজার ঘরের এক কোণে ঘাসা ডিভানে। সারা শরীর নেমে দেবার পর মনে হল, পৃথিবীর এখানেই শেষ—কাল সে আরও ঘুমতে পারে।

সুভদ্রা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। নীলের শুইভানে চলে বাতাসটা চোখে পড়লেও সে অপেক্ষা করছিল আচরণের অন্তরে। কিন্তু নীল যখন কিছুই বলল না, তখন সে দরজায় এল। এসেই ডিভানে শোওয়া নীলের পরায়ে ভঙ্গি দেখে নিচুটা আন্দাজ করে অঙ্কুটে বলে উঠল, ‘কি হয়েছে?’

নীল হাত নেড়ে কিছু হয়নি বলতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত ইচ্ছেটাই হল না। সুভদ্রা ছুটে এল নীলের কাছে। একটুও ইতস্তত না করে কপালে হাত রেখে বলে উঠল, ‘উঃ, এ তো অনেক জ্বর। হায় ভগবান!’

নীল শক্তি সঞ্চয় করছিল, ‘তেমন কিছু না, একটু জল দাও।’

সুভদ্রা দ্রুত জল এনে দিল। এক চৌক খাওয়ার পর মুখ ফিরিয়ে নিল নীল। সুভদ্রা বলল, ‘এখান থেকে উঠুন। ঘরে গিয়ে নিচানায়—’ কথা শেষ না করে সে একটু ভাবল। তারপর দ্রুত নীলের শোওয়ার ঘরে গিয়ে বাসনখাত সিঁদোনকে পলক করল। বাসিনা সাজিয়ে রেখে ফিরে এসে বলল, ‘উঠুন।’

নীল মাথা তেনের মত ওঠার চেষ্টা করল। হয়তো সে নিজেই উঠতে পারত কিন্তু সুভদ্রা তার বাহু ধরল। অর্ধ অবলম্বন সাহায্য করল নীলকে। ওর কাঁধের ওপর ভর দিয়ে নীল শোওয়ার ঘরে ঢুকে বিছানায় শরীর

এলিয়ে দিল। বালিশে মাথা তুলে দিয়ে সুভদ্রা ছুটল রান্নাঘরে। বাটিতে জল আর ন্যাকড়া নিয়ে পাশে বসে ওরু করল জলপট্টি দিতে।

বিকেলে জ্বর কমে এল। এই কয়েক ঘণ্টা একটি বারের জন্যেও নীলের পাশ থেকে ওঠেনি সুভদ্রা। মেয়ে বাড়িতে ফিরছে না দেখে জনার্দন এসে হাজির ওই সময়ে। কাণ্ড দেখে সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এখানে কোনও ডাক্তার নেই। বাসস্ট্যান্ডের এক দোকানদার হেমিওপ্যাথি ওষুধ দেয়। লোকে বাধ্য হয়ে সেগুলো খায়। কারও সারে, কারও সারে না। জনার্দন ভাবল তাকেই গিয়ে বলবে জ্বরের কথা।

কিন্তু নীল নিষেধ করল, 'না না। এখন ভাল লাগছে। সুভদ্রা আজ যা করেছে তার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না। যদি আজ রাতে আবার জ্বর আসে তা হলে কাল একটা গাড়ি ভাড়া করে আমাকে শহরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন।'

বাড়িতে তেমন কিছু খাবার নেই। মেয়ের বদলে জনার্দন নিজেই বাসস্ট্যান্ডে যেতে চাইল। তাকে টাকা দিয়ে নীল বলল, 'একবার ফিশারিস ডিপার্টমেন্টের অফিসে যাবেন তো। ওখানে কয়েকজন কর্মী আছেন। অসুখবিসুখ হলে ওঁরা নিশ্চয়ই ওষুধ খান, কাছে থাকতেও পারে। বলবেন জ্বর, মাথাব্যথা আর গা গুলোনো ভাব রয়েছে।'

জনার্দন মাথা নাড়ল, তারপর মেয়ের কাছ থেকে কি আনতে হবে শুনে বেরিয়ে গেল। সুভদ্রা তার পেছন পেছন ডেকে গেল। নীল গুনতে গেল সুভদ্রা বলাছে, 'টাকা ঠিকঠাক খরচ কোরো, বুঝলে।'

জনার্দনের গলা পাওয়া গেল 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

সুভদ্রা ফিরে এলে নীল কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা তোমার স্বামীর ঠিক কি হয়েছিল?'

'কেন?' সুভদ্রা অবাক হল।

'ওনেছিলাম, সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে।'

মাথা নাড়ল সুভদ্রা, 'হ্যাঁ, রাতের বেলায় মাছ ধরতে বেরিয়েছিল। নৌকোয় চারজন ছিল। ছোট নৌকো। আকাশে মেঘ ছিল, সবাই নিষেধ করেছিল বেশি দূরে যেতে। ঝড় যখন উঠল তখন সবাই ফিরে এল, ওই নৌকো এল না।'

কিন্তু নৌকো যে ডুবে গেছে তা কেউ দেখেছে?

'না। কিন্তু না ডুবলে এতকালে কি ফিরে আসত না।' মাথা নাড়ল সুভদ্রা, 'নিজে ডুবে, আমাকেও ডুবিয়ে গেল।'

'এ কথা বলছ কেন? তোমার বয়স অল্প। তুমি নিশ্চয়ই নিজের পায়ের দাঁড়াতে পারবে। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'নিজের পায়ের দাঁড়াতে পারব?'

'হ্যাঁ। তোমার মতো ভাল মেয়ের কখনই খারাপ ভাগ্য হতে পারে না।'

নীল চোখ বন্ধ করল। তার মাথার যন্ত্রণা বাড়ছিল। সুভদ্রা কাছে এল, 'মাথা টিপে দেব?'

'ঠিক আছে।'

'পেট খালি আছে, একটু চা-বিস্কুট খাবেন?'

নীল তাকাল। তার দু চোখ এখনও লাল। হঠাৎ তার খেয়াল হল, যে জামাকাপড় পরে সুভদ্রা কাজে আসে, এখনও তাই পরে আছে। সে বলল, 'ভাল লাগছে না।'

'না খেলে গায়ে বল পাবেন কি করে?'

শায়িত নীল চোখ বন্ধ করল, 'তুমি সেই যে এসেছ—এখনও কাপড় পালটাওনি কেন?'

'ওঃ, মনে ছিল না।'

'যাও, পালটে এসো।'

'না। বাবা এসে দেখবে।'

'দেখবে তো কি হয়েছে?'

'আমার লজ্জা করে।'

'কেন?'

‘আপনি যদি আমাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন তখন মুখ দেখাবো কি করে?’

নীল নিঃশ্বাস ফেলল। সর্বত্র বাঁধনের অঙ্গীকার। এমন কি সাধারণ ভাল লাগা পূর্ণ করতেও দাবির মুখোমুখি হতে হয়। আর সম্পর্ক তৈরি হলে তো কথাই নেই।

সুভদ্রা চা আর বিস্কুট নিয়ে এল। চায়ে চুমুক দিয়ে নীল জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি সারাদিন কিছু খাওনি, না?’

‘বাজারে যাব কি করে, আপনার শরীর খারাপ ছিল।’

‘হুম্। এখন চা খাচ্ছ না কেন?’

‘আমার অভ্যেস নেই।’

‘এই সময়ে চা খাওয়া আমারও অভ্যেস নেই—যাও, চা নিয়ে এসো।’

অগত্যা সুভদ্রা উঠল।

বাজার নিয়ে ফিরে এল জনার্দন, সঙ্গে ওষুধও। ফিশারিজ ডিপার্টমেন্টের এক বাবুকে নীলের অসুখের কথা বলতে তিনি তিনটে ক্রোশিন দিয়েছেন। বলেছেন, এতে জ্বর না কমলে হাসপাতালে যেতে। নীল তখনই একটা খেয়ে গিল। মনে মনে জ্বরল, সুস্থ হয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ এবং দাম দিয়ে আসতে হবে।

জনার্দন বলল, ‘বাবুর মুখে বোধহয় স্বাদ নেই! তুই এ বেলা একটু থিচুড়ি কর, সঙ্গে আলু আর ডিম ভাজা। আমি বসছি।’

‘বসছ মানে?’

‘সঙ্গে নামছে—একা যাবি কি করে? দিনকাল খারাপ।’

‘সে আমি বুঝে নেব। তোমাকে বসতে হবে না। তোমার মতলব আমি জানি।’

‘জানিস তো বলার কি আছে? কতকাল থিচুড়ি খাইনি!’

‘আমি থিচুড়ি রাঁধছি না।’

‘কেন? আমি বললাম বলে?’

‘না। রুগী মানুষের জন্যে হালকা খাবার দরকার। তুমি যাও, গিয়ে মাকে পাঠিয়ে দাও।’

মুখ বেজার করে জনার্দন পা বাড়ানি, পেছন থেকে ডাকল সুভদ্রা, ‘টাকা ফেরত দিলে না?’

‘কিসের টাকা?’ আকাশ থেকে পড়ল জনার্দন।

‘বাঃ, বাজার যা করেছ তাতে তো অর্ধেক টাকা লাগার কথা।’

জনার্দন পিটপিট করে মেয়েকে দেখল, তারপর ইশারায় কাছে ডাকল। সুভদ্রা এগিয়ে এল সামনে। জনার্দন গলা নামিয়ে বলল, ‘আমি হাতেপায়ে ধরেছিলাম বলে বাবু তোকে রেখেছে। আমার ওপর খবরদারি করলে তোর ভাল হবে না বলে দিলাম। তুই এখানে আজ ভালমদ খাবি আর আমরা কি পেটে কিল মেরে পড়ে থাকব? বাবু যদি নিজে টাকার হিসেব চায় তো দেখা যাবে। আমার কাছে চাইতে বলবি আমি দেব। কিন্তু খবরদার, আগবাড়িয়ে বলবি না!’ চোখ রাঙিয়ে কথাগুলো বলে হাঁটতে হাঁটতে জনার্দন মন্তব্য করল, ‘জ্বরের খোরে টাকা দিয়েছে, সেই টাকার কোনও হিসেব থাকে নাকি।’

সুভদ্রা চূপচাপ তার বাবার চলে যাওয়া দেখল। তারপর মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকে দেখল নীল এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। সঙ্গে হয়ে আসছে, ঘরে গাঢ় ছায়া। একটা চাদর নীলের শরীরের ওপর বিছিয়ে দিয়ে সে রান্নাঘরে ঢুকল।

মানুষটা অদ্ভুত। দিনরাত মদ খাচ্ছে কিন্তু মেয়েমানুষকে বিরক্ত করে না। পুরুষমানুষের চোখ দেখলেই বোঝা যায় কার চরিত্র কি রকম। এতদিনে তার এই বোধটুকু হয়েছে। অথচ এই মানুষটা তার ব্যাপারে একদম নির্লিপ্ত। দু-একদিনেই সেটা বুঝে নিশ্চিত হয়েছিল সে। একটু রাগী কিন্তু মনে কোনও পাপ নেই। এর কে কোথায় আছে তা জানার আগ্রহ হয় মাঝেমাঝেই কিন্তু সাহস হয় না। লোকটার নজরও আছে। নইলে শহর থেকে তার জন্যে জামাকাপড় কিনে আনে? বাড়িতে ওই দামের শাড়িজামা সে কখনও পরেনি। ভেতরের জামা দেখে সে অবাক। বিয়ের সময় এখানকার হাট থেকে বা কিনেছিল তা যেমন খেলো তেমন বেটপ। গ্রামে তাদের এসব পরার তেমন চলই নেই। কিন্তু মানুষটা যা কিনেছে তা পরলে শরীরটা কি রকম

হয়ে যায়। টান-টান—মনে জোর এসে যায় শরীর টান-টান হলে, এ খবর তার জানা ছিল না। নিজের বুকের দিকে তাকাতেই লজ্জা করে। অথচ ওই মানুষটা একবারও তার দিকে তাকায়নি। তাকায়নি বলা ঠিক নয়—মা যেমন করে বাচ্চাদের দিকে তাকায় তেমন করে তাকিয়েছে। অথচ তার স্বামী বলত এ শরীরে নাকি মদের নেশা আছে। শরীর-মন খারাপ হলে লোকটা তাকে ছাড়ত না। ক্রমশ ভয় ঢুকে গিয়েছিল মনে—এত খারাপ লাগত তখন। সেটা তো অনেকদিন হয়ে গেল। সঙ্গীদের নিয়ে সমুদ্রের জলে গিয়ে মানুষটা হারিয়ে গেলে তার খুব কষ্ট হয়েছিল। মনে হত, যত খারাপই লাগুক—মানুষটা তো ছিল। আচ্ছা আজ তার কথা ইনি জিজ্ঞেস করলেন কেন?

রান্না শেষ করল সুভদ্রা। রুটি আর ঝোল। হালকা খাবারই ভাল। নীল তখনও ঘুমোচ্ছে। মুখ হাত পা ধুয়ে সে পোশাক পাল্টালো। একবার ভাবল নতুন যে সেট রয়েছে তাই ভাঙে। শেষ পর্যন্ত মত বদলে শুকিয়ে যাওয়া জামাকাপড়ে হাত দিল। এর আগেরবারও লক্ষ্য করেছে—এবারও তাকে একদম অন্যরকম দেখাচ্ছে। শুধু জামাকাপড় বদলে যেতেই এই—মুখে পাউডার নেই, ঠোটে রঙ নেই, চোখে কান্ডল নেই। সে শুনেছে শহরের মেয়েরা নাকি সাজ্জার সময় নকল চুলও পরে। সেসব থাকলে কি যে হত কে জানে!

পায়ে জুড়তা এসে গিয়েছিল। সুভদ্রা নীলের ঘরে কোনমতে এল। এসে আলো জ্বালল। চোখে আলো পড়তেই নীল তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

'আমি।'

'ও, সুভদ্রা! তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।'

'শরীর কি রকম?'

'ভাল। ট্রেনসিন ট্যাবলেট খেয়ে জ্বর চলে গেছে—দ্যাখো ঘামছি!'

সুভদ্রা দেখল। জামা ভিজে গেছে, বালিশও। সে তোয়ালে নিয়ে এসে বলল, 'জামা, খুলতে হবে, নাহলে আবার শরীর খারাপ হবে।'

নীল উঠে বসে জামা খুলল। জামা ভিজে চপচপে। হাত বাড়িয়ে তোয়ালে নিয়ে বুক গলা মুছল। মুখও। সুভদ্রা আর একটি জামা এনে দিয়ে বলল, 'দাঁড়ান।'

সে নীলের পেছনে গিয়ে পিঠ মুছিয়ে দিল। ঠিক তখনই গাড়ির আওয়াজ হল। গাড়ি এসে থামল বাড়ির পাশে। সঙ্গে সঙ্গে নীলের কপালে তাঁজ পড়ল। সুভদ্রার আনা জামা চটপট পরে ফেলে বলল, 'বিপদ হতে পারে। তুমি রান্নাঘরে লুকিয়ে থাকো। যদি কোনও ঝামেলা হয় তাও বের হবে না। পরে প্রধানকে খবর দেবে।'

সে বিছানা থেকে নামতেই সুভদ্রা বাধা দিল, 'একি, আপনার এত শরীর খারাপ, আপনি কোথাও যাবেন না!'

এই সময় জগদীশের গলা পাওয়া গেল, 'নীলবাবু আছেন?'

জগদীশের গলা শুনবে আশা করেনি নীল। সে সুভদ্রাকে ইশারা করল চুপ করে থাকতে। তারপর কোনরকমে বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। জগদীশের মাথায় এখনও ব্যান্ডেজ বাঁধা। কিন্তু সে একা নয়, দরজায় দুজন স্বাস্থ্যবান মানুষ দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করেছে। নীল হাসার চেষ্টা করল, 'আরে জগদীশবাবু! বসুন!'

'আমি এখানে বসতে আসিনি। জরুরি কথা বলতে মালিক আমাকে পাঠিয়েছেন।'

'আমি বসছি, কারণ আমি খুব অসুস্থ। কাল থেকে খুব জ্বরে ভুগছি।'

'তা অবশ্য দেখেই বোঝা যাচ্ছে।' জগদীশ কিন্তু-কিন্তু করল।

চেয়ার টেনে বসে পড়ল নীল। একটু চোখ বন্ধ করল, 'বসে কথা বলুন!'

নিভাত বাধা হয়েই যেন জগদীশ বসল, 'ওনুন। মালিক চান আপনি যেন আর ঝামেলা না বাড়ান। উনি জানতে চান, ওঁর মেয়ে কোকিলা দেবীর বন্ধুত্বের প্রস্তাব আপনি সিরিয়াসলি গ্রহণ করেছেন কিনা?'

'না করে উপায় আছে? কোকিলার মতো মেয়ে কোনও প্রস্তাব দিলে তা অস্বীকার করার ক্ষমতা ডগবানেরও হবে না, আমি কোন্ ছার।'

'তার মানে আপনি প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন?'

'আমি বুঝতে পারছি না একটা কথা, আপনার মালিক তাঁর মেয়েকে বিশ্বাস করেন না? মেয়ের মুখে শোনার পরেও আপনাকে পাঠাতে হল?'

'মালিকের আচরণে কারণ খোঁজা আমার এক্তিয়ারে পড়ে না। তা হলে আপনি ওই জেলেদের সমবায়ের ব্যাপারে নেই। তা হলে আপনি একজন উকিলকে নিয়ে ঝড়ের পরে ত্রাণবন্টনের সময়ে গিয়েছিলেন কেন? যে সব লোক টাকা নেয় তাদের দিয়ে আবেদনপত্রে সই করিয়েছিলেন কেন?'

'এত খবর পেয়েছেন আর এটা কি আপনার মালিক পাননি যে তাঁর মেয়ে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন এসবের অনেক পরে!'

জগদীশ পেছনে দাঁড়ানো লোকদুটোর দিকে তাকাল। নীল জিজ্ঞাসা করল, 'এরা কারা?'

'মালিকের লোক।'

'আপনাকে তিনি কথা বলতে পাঠিয়েছেন—না এদের?'

'আমাকে।'

'তাহলে এরা এখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ওদের নেমে যেতে বলুন।'

'ওরা থাকলে আপনার কি অসুবিধে হবে?'

'আমি আর একটিও কথা বলব না।' নীল বলল, 'বন্ধু হিসেবে যদি আমি আপনার মালিকের মেয়ের সম্মান না পাই তা হলে কথা বলে লাভ কি?'

অগত্যা জগদীশ বলল, 'তোমরা নিচে নেমে দাঁড়াও।'

'কিন্তু বস্ বলেছেন সঙ্গে থাকতে।'

'তাহলে উনি কথা বলবেন না—বস্ খুশি হবেন তাতে?'

লোক দুটো পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর নিচে নেমে গেল।

নীল নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাকসিডেন্ট হল কি করে?'

জগদীশ উচ্চ গলায় প্রশ্ন করল, 'গতরাত্রে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'জাহান্নামে!' বলেই নিচু গলায় বলল, 'উত্তর দিন।'

'সেটা কোথায়?' উচ্চ গলায় প্রশ্ন করে কপালে হাত ঝোঁয়ালো জগদীশ। বলতে চাইলে তার দুর্ভাগ্য।

'স্বর্গের একটু আগে। নতুন বান্দবীর সঙ্গে সমুদ্রের ধারে হাঁটছিলাম।'

'নতুন বান্দবী?'

'বাঃ, কোকিলার প্রস্তাব গ্রহণ করামাত্র সে আমার বান্দবী হয়ে গেল না! বোকা-বোকা প্রশ্ন করার আগে একটু ভাবুন। কোকিলা কেমন আছে?'

'ভাল নেই। ওঁর খুব জ্বর এসেছে।'

'মাই গড! কী মিল? আমারও কাল থেকে জ্বর এসেছে!'

'আপনি একটা চিঠি লিখুন। হরিহর উকিলকে বলুন সে যেন আর সমবায় নিয়ে মাথা না ঘামায়। সেইসঙ্গে জেলেদের প্রধানকে বলবেন তাদের যদি টাকার দরকার থাকে তা হলে আগামীকাল ম্যানেজারবাবুকে জানিয়ে দিতে।'

'দেখুন মশাই, কোকিলা আমার কাছে বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। আমি যদি সেটা গ্রহণ করি, তাহলে সে আমার বন্ধু। সেই সূত্রে তার বাবাকেও বন্ধু বলে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু উনি তো আমার ওপর ওঁর হুকুম চাপিয়ে দিচ্ছেন। বন্ধু কি বন্ধুকে হুকুম করে?' নীল উষ্ম হল।

হঠাৎ জগদীশ পকেট থেকে ছোট কাগজ আর কলম বের করে লিখতে লাগল। নীল বলা শেষ করামাত্র জিজ্ঞাসা করল, 'তা হলে আপনি এই সব কাজ করবেন না, এটা ফাইনাল?'

'একদম। হরিহরের নাম যখন জেনে গিয়েছেন তখন তাকে খুঁজে বের করতে আপনাদের অসুবিধা হবে না। লোকটা ধূর্ত নয়, মালিককে বলুন ওকে চিরকালের মত চূপ করিয়ে দিতে। আর কোনও কথা আছে? আমার শরীর খুব খারাপ—আর কথা বলতে ভাল লাগছে না!'

কাগজটা ভাঁজ করে টেবিলে রেখে জগদীশ উঠে দাঁড়াল, 'আপনি যা বললেন তা মালিককে জানিয়ে দেব। আচ্ছা নমস্কার।' জগদীশ বেরিয়ে গেল। আর তারপরেই জীপের ইঞ্জিন শব্দ করে ধীরে ধীরে দূরে চলে গেল।

নীল হাত বাড়িয়ে কাগজটা তুলে ভাঁজ খুলল, 'আমার কোনও উপায় নেই। আপনি যদি বাঁচতে চান তা হলে এখনই এখান থেকে চলে যান। কোকিলা এক সাপিনীর নাম। কাগজটা পুড়িয়ে না ফেললে আমি মারা পড়ব।'

নীল মাথা নাড়ল। তারপর কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। আর তখনই রুটি আর কোল
এনে দিল সুভদ্রা, 'খোয়ে নিন।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ। সারাদিন যাওয়া হয়নি।'

'তুমিও গেয়ে নাও। যাও।'

সুভদ্রা চলে গেলে নীল খেয়ে নিল। তা হলে কোকিলারও ভ্রম হয়েছে। একে কি বলা যায়? ওর খুব
ইচ্ছা হল, যদি এই মুহূর্তে কোকিলার পাশে যেতে পারত। দুমু সে এর আগেও খেয়েছে, কিন্তু কোনও মেয়ে
কোকিলার মত ভিত্তির ব্যবহার করেনি। ভ্রমতপ্ত জিত নাকি বেশি সক্রিয় হয়। নীলের খুব নিঃশব্দে কাগজ
বের হল। ভগদীশ লিখেছে, কোকিলা এক সাপিনীর নাম। সে যদি কোলোদের পাশ পেতে পারে আসে,
কোকিলার প্রভাবে মেনে কাজ করে, তা হলে তাদের সম্পর্ক অনেকদিন থাকবে। কিন্তু এ না হলে হালকা
যেতে হবেই। আচ্ছা ছোবলও তো এক ধরনের চূষন।

ট্যালেন্ট থেকে বেরিয়ে আর হাঁটতে পারছিল না সে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল, এ না এটা বাঁচতে যে
নিবাপদ নয়। অণ্ডত রাতের বেলায় জেগে নয়ই। ভগদীশ বসু-এর কাছে রিপোর্ট করতে গিয়ে। তোমার
হয়ে ওঠা পর্যন্ত ভদ্রলোক কি অপেক্ষা করবেন? আজ রাতেই যদি তাকে শেষ করে দেওয়া যায়--নীল
নিভের বিছানায় চলে গেল। মা, অসহায় হয়ে ওদের হাতে ঘরা দিতে সে কখনই পারবে না। হরিহরের
কাফ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাকে বাঁচতেই হবে।

বাইরের দরজায় শব্দ হল। সুভদ্রার গলা পাওয়া গেল, 'কেন?'

'মানি!'

'কেন? মা? এতটা?'

'কেমন আছে?'

'ভাল। মা!'

'এক খাবারও পারবে না?'

'আমার ইচ্ছে নেই। ঘান্টা দুই হল, এক ঘান্টাও খাবার পাবে না।'

'কিন্তু তুমি আকবি কি করে?'

'কেন?'

'রাগে এখানে যদিও ভোর খদ্যাম হবে। পঞ্চায়েত ছেড়ে কথা বলবে না। এ কথা কি তুমি জানিস
না?'

'আশ্চর্য! সারাদিন এ বাড়িতে ওর কাজে ইদাম। তুমিই জানি, যেটা দেখে তুমি তুমি খাবার পাবে
দেখ রাতের বেলায়।'

'তাই তো নিয়ম।'

'তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো?'

'আমি?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার কাব্য রচনা করবে।'

'ককক। একটা মানুষ অসুখে কষ্ট পাচ্ছে জেনেও যদি রচনা করে তা হলে ককক কক। তুমি জানিস তো
মা?'

'তাহলে বলে আসতে হবে। তুমি এই আনাকাপড় কোথায় পোনে?'

'কেন? খরাপ লাগছে?'

'খুব ভাল। তোকে অন্যরকম লাগছে।'

'কি রকম?'

'খুব সুন্দর। হ্যাঁরে, তোকে বুড়ি ওর খুব পছন্দ হয়েছে?'

'গ্যেৎ! উনি ও রকম লোক নন।'

'তাহলে?'

‘তাহলে আবার কি? ভূমি খেয়ে এসেছ?’

‘হ্যাঁ। তোর বাবা কোথেকে টাকা পেয়েছিল আজ—’

‘উনি বাজার করতে দিয়েছিলেন, সেই টাকা থেকে যা ফেরত এসেছিল তা নিজের কাছে রেখে দিয়েছে বাবা। এত লজ্জা লাগে!’

সুভদ্রা কথা শেষ করামাত্র নীলের গলা ভেসে এল, ‘সুভদ্রা?’

সুভদ্রা দৌড়ে দরজায় গেল।

নীল বলল, ‘তোমার মা এসেছে?’

‘হ্যাঁ।’

‘ভূমি ওর সঙ্গে বাড়িতে যাও। আজ আর দরকার নেই।’

‘আপনার শরীরে এখনও জ্বর আছে!’

‘থাকতে দাও—যা বললাম তাই করো।’

‘আমি থাকলে অসুবিধা হবে?’

‘হ্যাঁ।’

চমকে তাকাল সুভদ্রা। নীল দেখল মেয়েটার দু-চোখ জলে ভরে গেল। সে মুখ ফিরিয়ে নিল। ওকে ব্যাখ্যা করে বলার মতো ধৈর্য ওর এখন নেই।

হঠাৎ সুভদ্রা অদ্ভুত গলায় বলল, ‘আমি যাব না!’

‘তার মানে?’

‘আমি, আপনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত থাকব।’

‘কেন? কেন আমার সমস্যা বাড়িচ্ছ?’

‘আমি সমস্যা বাড়িচ্ছি না।’

‘ওরা আজ রাতে আমাকে খুন করতে আসতে পারে!’

‘কারা?’

‘একটু আগে যারা এসেছিল। যারা চায় না তোমাদের গ্রামে সমবায় হোক। এ সময় তোমার থাকা ঠিক নয়।’

‘আপনি কোথায় যাবেন?’

‘আমি? টিলার ওধারে বৈশানে বাতাস কম সেখানে চাদর নিয়ে রাত কাটিয়ে দেব। দিনের বেলায় কোনও ভয় নেই।’

সুভদ্রার মুখ হাসিতে ভরে গেল, ‘ও, এই ব্যাপার! চলুন—’

‘কোথায়?’

‘এখান থেকে একটু দূরে একটা ভাঙা লাইটহাউস আছে। কেউ যায় না সেখানে। তার একটা ঘর একদম পরিষ্কার। আপনি যদি ওখানে গিয়ে থাকেন, কেউ টের পাবে না।’

‘তাই নাকি? আমি যেতে পারব?’

‘আমি নিয়ে যাব আপনাকে।’ দ্রুত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল সুভদ্রা। কস্মল চাদর বালিশ তো বটেই, হাতের কাছে বা যা পেল সব নিয়ে নিল।

এ বাড়িতে নীল আসার পর কখনও তাল্লা দেওয়া হয়নি—আজ হল। মায়ের হাতে ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে সুভদ্রা সন্তর্পণে নীলকে নিয়ে নিচে নামল। আজও আকাশে মেঘ, আলো নেই কোথাও। চারপাশে নিশিচ্ছ অন্ধকার। দূ-হাত দূরের মানুষও দেখা যাচ্ছে না।

আজ বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু গতদিন ভিজে ভিজে বালির শরীর শুক হয়ে গিয়েছে। এখন গলায় যে ডেজ, মনে যে অহঙ্কার তার সঙ্গে হাত মেলাতে চাইছে না শরীর।

সুভদ্রার দুটো হাত, শেষ পর্যন্ত শরীর প্রায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল নীলকে। কেউ কোনও কথা বলছিল না। অন্ধকার যত ঘন হোক, দেখার ইচ্ছে এবল হলে চোখ আলো খুঁজে পায়।

এক-দুই করে কত সময় গেল নীল জানে না। এখানে আসার পর টিলার পর টিলা—তারপরে যে বাতিল বাতিঘর পড়েছিল অবহেলায়, তা সে জানত না।

ধাপে ধাপে ওপরে উঠে, ভাঙাচোরা পাথরের খাঁজ সামলে সুভদ্রা নীলকে নিয়ে যে ঘরে পৌঁছলো সেটি

ছিন্নছিন্ন, পরিষ্কার। বিছানা পাতা হল, বালিশও সাজানো হল। সুভদ্রা নীলকে শুইয়ে দিল। তারপর তার মাকে বলল, 'যাও, বাবাকে বলে এসো।'

'এখানে থাকবি তোরা?'

'হ্যাঁ, কেন?'

'বাতিঘরে ভূত আছে, জানিস না?'

'মানুষ ভূতের চেয়ে ওরা কী খুব ভয়ঙ্কর মা!'

মেছেতে পাতা বিছানায় শুয়ে নীল চোখ বন্ধ করেছিল। হঠাৎ আলো জ্বলতে সে চোখ খুলল। দেখল সুভদ্রা মোমবাতি জ্বালল। নীল দেখল সামনে পাথরের দেওয়াল। সে ফিসফিস করে বলল, 'আলো নিভিয়ে দাও, কেউ যেন জানতে না পারে আমরা এখানে আছি।'

'এই আলো বাইরে থেকে দেখা যাবে না।'

'কি জানি—'

সুভদ্রা নীলের মাথার পাশে বসল। তারপর তার কপালে হাত রাখল। নিচু গলায় বলল, 'জ্বর এখনও রয়েছে।'

'তুমি কখন ঘুমাবে?'

'মা আসুক।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে। আমার একটু ছাড়িয়ে ধর।'

একটু সময় নিল সুভদ্রা। তারপর দু-হাতে নীলের মাথা কোলে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে কপালে হাত বোলাতে লাগল। নীলের মনে হল, কী আরাম। এখানে শীতল সামুদ্রিক বাতাস ঢুকতে পারছে না। ফলে একটা ওম তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

নীল চোখ খুলল। তার সামনে মোমবাতির আলোয় উদ্ভত দুই যৌবনের অহঙ্কার স্থির হয়ে আছে। সে ডাকল, 'সুভদ্রা!'

সুভদ্রা বলল, 'হঁ!'

'আমি তোমাকে হেঁব?'

নীল প্রশ্নটা করতেই কেঁপে উঠল সুভদ্রা। তারপর বসখসে গলায় বলল, 'আপনি ঘুমান। আপনার শরীর খারাপ।'

নীল ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম আসছিল না। সুভদ্রা তারপর সযত্নে কোলে মাথা নিয়ে বসে আছে। নীল হাত উঠল। সুভদ্রা কাঁটা হয়ে বসেছিল। নীলের হাত তার বুক ছাড়িয়ে চিবুকে গিয়ে পৌঁছল। নীল বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি খুব ভাল—খুব ভাল সুভদ্রা।'

নীল ঘুমিয়ে পড়ল। তার শরীর এখন অবশ। সেই অচৈতন্য শরীর কোলে নিয়ে বসে প্রহর গুনছিল সুভদ্রা। এই লোকটাকে তার ভাল লাগছে। এই লোকটা তাকে অসম্মান করেনি একবারও। এই লোকটার জন্যে সে সব কিছু করতে পারে। ঘুমন্ত মানুষটার মাথা এইবার বালিশে নামিয়ে দেওয়া উচিত, মায়ের ফিরে আসার সময় হয়ে গিয়েছে।

মাথাটা নামাতে যেতেই নীল সামান্য নড়ল। আর সেই কম্পনে সুভদ্রা সংক্ৰামিত হল। তার মাথা ধীরে ধীরে নিচে নেমে এল। নীলের দুই চোটে তার চোঁট অমৃতের সন্ধান করল। কিন্তু ব্যাপারটা যখন একতরফা—তখন চৈতন্য ফিরে আসতে সময় লাগল না। গহীন ক্লান্তির তলায় ডুবে গিয়ে নীল জানতেও পারল না—ভালবাসা এখনও বেঁচে আছে।

তার যখন ঘুম ভাঙল তখন রোদ উঠেছে কয়েকদিন পরে। সে চোখ মেলে দেখল সুভদ্রা ঘুমিয়ে আছে, তার পাশে শুয়ে আছে তার মা। নীল সন্তর্পণে উঠল। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে দেখল পুরো বাতিঘরটা ভাঙাচোরা। হয়তো একসময় সমুদ্রে যেসব জাহাজ পথ হারাতো তাদের আলো দেখিয়ে এই বাতিঘর সাহায্য করত তীরে পৌঁছতে—এখন এই বাতিঘর বাতিল। এ অঞ্চলে কোনও বাতিঘর নেই। কোনও জাহাজ এদিকে নোঙর করতে আসে না আর।

নীল বাইরে এল। বালি স্থির, তার ওপরে নতুন সূর্যের আলো খেলা করে যাচ্ছে। নীল হাঁটছিল। তার

শরীর এখন বেশ ঝরঝরে। চড়াই উৎরাই ভেঙে সে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেল টিলার ওপর বাড়িটাতে। দরজার তালা ভাঙা—যেন হাজার ক্ষাপা মোঘ ঢুকেছিল এই বাড়িতে!

পুরো বাড়িটা লণ্ডভণ্ড। চেয়ার টেবিল ওলটানো—দুটোই ভাঙা, খাট বিছানার দিকে তাকানো যাচ্ছে না—ওরা তাকে না পেয়ে মনের রাগ মিটিয়েছে জিনিসপত্রের ওপর।

নীল ডেকে এসে দাঁড়াল। সমুদ্র সূর্যকে পেয়ে আজ কী দারুণ নরম, শান্ত! কে বলাবে গতকালও এর অন্য রূপ ছিল!

চোখেমুখে ভোরের আলো মেখে নীল ভাবল এবার কিছু করা দরকার। এতদিন সে একতরফা এই অত্যাচার সহ্য করে এসেছে, পালটা আঘাত না করলে ওদের সাহস আরও বেড়ে যাবে।

হঠাৎ সামুদ্রিক আওয়াজ ছাপিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। দূরে বহু মানুষ একসঙ্গে চিৎকার করছে। ডেকে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে চিৎকার ভেসে আসছে সেদিকটা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু যারা চিৎকার করছে তারা খুব উত্তেজিত—এটা বোঝা যাচ্ছিল। এই ভোর-ভোর সময় এমন ব্যাপার এখানে অভিনব। নীল দ্রুত ডেক থেকে নামতে গিয়ে বুঝতে পারল তার মাথা ঘুরে যাচ্ছে, পা টলছে। চক্ৰিশ ঘণ্টার জ্বর তার শক্তি কেড়ে নিয়েছে অনেকটাই। সে বীরে বীরে স্নানার চেষ্টা করতেই দেখল সুভদ্রা আসছে, সঙ্গে তার মা নেই।

নীল তাকে বলল, 'দ্যাখো তো, কিসের গোলমাল হচ্ছে এদিকে!'

সুভদ্রা আওয়াজটা শুনল, তারপর বলল, 'আমি চা করে দিয়ে যাই!'

'চা পরে হবে—যা বলছি তাই করো!'

সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রা চলে গেল। নীল সিঁড়িতে পা রেখে ডেকের ওপর বসে পড়ল। শরীর সত্যি কাহিল হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি সেরে না উঠলে সে কিছুই করতে পারবে না। এইটুকু হাঁটাচলা করতেই মনে হচ্ছে ওয়ে পড়লে ভাল লাগবে। এই শরীর নিয়ে সে কী করে লড়বে? এই সময় যজ্ঞেশ্বরকে দৌড়তে দৌড়তে আসতে দেখল নীল। মনে পড়ল, যজ্ঞেশ্বর দুদিন তার কাছে মদ বিক্রি করতে আসেনি। খুব উত্তেজিত হয়ে, যজ্ঞেশ্বর টেঁচাতে লাগল, 'সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে বাবু, ধনেগ্রাণে সব গেছি আমরা! এখন কি হবে কেউ বলতে পারছে না!'

'কি হয়েছে?'

'আজ সমুদ্র থেকে ফিরেছি অল্প মাহ নিয়ে। এখন মাহ তেমন পড়ছে না। মরসুম শেষ। এই নিয়ে পাইকাররা ঝামেলা করছিল। ওরা বলছিল আমরা নাকি ইচ্ছে করে বেশি মাহ ধরছি না। এই সময় খতীন জিজ্ঞাসা করেছিল—ঝড়জলের দিনে যে কাগজে টিপসই দিয়ে আমরা টাকা নিয়েছি তাতে কি লেখা ছিল? প্রশ্ন শুনে ওরা চুপ করে গেল। মাহ নিয়ে গাড়ির দিকে এগোচ্ছিল, আমরা গিয়ে চেপে ধরলাম। শেষ পর্যন্ত ওদের একজন বলল, “জাল নৌকো বিক্রি করে দিয়েছিস?” মানুষজন খুব ক্ষেপে গিয়েছে—যারা টাকা নেয়নি সেদিন তারা খুব হাসছে। আমাদের এখন কি হবে বাবু? যজ্ঞেশ্বর কৈশে ফেলল।

'প্রধান কোথায়?'

'প্রধান ওখানে। সে সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। আপনি চলুন—'

'আমি গিয়ে কী করব?'

'আমরা ওই কটা লোককে আটকে রাখতে চাই। যতক্ষণ না টিপসই করা কাগজ আমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে ততক্ষণ ওদের ছেড়ে দেওয়া হবে না।' খুব জোরের সঙ্গে বলল যজ্ঞেশ্বর।

'বাঃ, চমৎকার! ওদের আটকে রাখলে এরপরে যারা আসবে তাদের সঙ্গে তোমরা পারবে? আর তারা না এসে যদি পুলিশ আসে তো সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে কোমরে দড়ি বেঁধে! তখন কি হবে?' নীল জিজ্ঞাসা করল।

'যা হয় হোক, ওই কাগজ আমাদের চাই।'

'বেশ, ওই একই কথা ওইরকম কাগজে লিখে অন্য কারও টিপসই মেরে যদি তোমাদের দিয়ে দেয় তা হলে কি তোমরা বুঝতে পারবে—কোনটা আসল কোনটা নকল?'

এবার থিতিয়ে গেল যজ্ঞেশ্বর। তারপর বলল, 'লেখাটা অনেকেই পড়তে পারবে, কিন্তু টিপসই চিনব কী করে? নিজেরটাই তো চিনি না!'

'তা হলে আর ঝামেলা করো না, ওদের ছেড়ে দাও।'

'কিন্তু আমাদের কি হবে?'

‘যখন টাকা নিয়েছিলে তখন এ কথা মনে রাখা উচিত ছিল।’

‘তখন বুঝিনি বাবু। অভাবের সময় কেউ হাতে তুলে দিচ্ছে দেখলে হাত ওটিয়ে বসে থাকি কী করে?’

যজ্ঞেশ্বর কথা শেষ করামাত্র বন্দুকের আওয়াজ ভেসে এল। নীল উঠে দাঁড়ান। ধীরে ধীরে সে টিলার এপাশে এসে দাঁড়ান। অনেক দূরে সমুদ্রের তীর থেকে মানুষজন ছুটছে। ভয়ে পালাচ্ছে সব। দ্বিতীয়বার গুলির আওয়াজ হল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নৌকা ফেলে জেলের দল হাওয়া গেল গেল। নীল দেখল সুভদ্রা দৌড়তে দৌড়তে আসছে। বাতাসে তার কাপড় আলুখানু। খোঁপা খুলে যাওয়ায় চুল উড়ছে। তার পরনে এখনও নীলের কিনে দেওয়া পোশাক। যজ্ঞেশ্বর বিস্ফারিত চোখে তাকে দেখে বলল, ‘আমাদের সুভদ্রা না?’

সুভদ্রা কাছে এসে যজ্ঞেশ্বরকে দেখে বিস্ফারিত হয়ে বলল, ‘ওরা গুলি করেছে। দুজন মরে গিয়েছে। বারা ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল তারা কাগজ ফেরত চাইছিল বলে গুলি করেছে।’

নীল বলল, ‘ঠিক আছে। তুমি বাড়িতে যাও।’

কথাটা শোনামাত্র সুভদ্রা শান্ত হয়ে গেল আচমকা। যজ্ঞেশ্বরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে সে হনহন করে চলে গেল।

যজ্ঞেশ্বর তার যাওয়া দেখল, ‘আমি চিনতে পারিনি প্রথমটায়। ও যে একেবারে পালটে গিয়েছে।’

‘তুমি ওর সম্পর্কে আলোচনা করতে এখানে আসোনি যজ্ঞেশ্বর।’ নীল গভীর হয়ে কথাগুলো বলে দেখল কয়েকজন মানুষ বালি ভেঙে টিলার দিকে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি হতে সে প্রধানকে চিনতে পারল।

কাছাকাছি হয়ে প্রধান বলল, ‘আমাদের দুজনকে ওদের গুলিতে প্রাণ দিতে হল বাবু। আমরা এখন খানায় যাব—আপনি চলুন।’

‘আমার যেতে আপত্তি নেই—কিন্তু আমার শরীর একদম অচল। দু-দিন খুব জ্বরে ভুগেছি। এত দূর হাঁটা অসম্ভব ব্যাপার।’ নীল বলল।

ভিড়ের একজন বলল, ‘ভ্যান রিকশা নিয়ে আসছি বাবু—তাতে চলুন।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু ওরা গুলি চালান কেন?’

‘সুবল উত্তেজিত হয়ে ওদের ধাক্কা দিয়েছিল—ব্যাস।’

‘ডেডবন্ডি কোথায়?’

প্রধান বলল, ‘নিশ্চয়ই ওখানে পড়ে আছে। গুলি চলার পর সবাই পালিয়েছে—। ফিরে দেখার সময় পাইনি। চোখের সামনে দু-দুটো জোয়ান বালিতে পড়ে স্থির হয়ে গেল।’

‘ডেডবন্ডি যেমন আছে তেমন থাকবে। কেউ হাত দেবেন না।’

‘কেন?’

‘পুলিশ আগে দেখুক, তারপর—’

কেউ একজন দৌড়তে দৌড়তে আসছিল। তাকে দেখে নীল থেমে গেল। লোকটি কাছে এসে চিৎকার করে বলল, ‘সুবলদের শরীর ওরা ট্রাকে তুলে নিয়ে গেল মাছের সপে।’

প্রধান বলে উঠল, ‘সে কি?’

নীল বলল, ‘বাঃ, চমৎকার!’

প্রধা জিজ্ঞাসা করল, ‘তার মানে?’

‘এখন আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন না ওরা গুলি করে দুজনকে মেরেছে।’

‘কি যা-তা বলছেন? সবার সামনে ওরা গুলি করেছে—সবাই দেখেছে!’

‘কিন্তু প্রমাণ কোথায়? আর যারা এখন দেখছে তারা কাঠগড়ায় উঠে যদি বলে কিছুই দ্যাখেনি—তখন? গুলির ভয়ে পালিয়ে এসে খুব ভুল করেছ তোমরা। কতজনকে ওরা মারত? উদ্ভেজনার বশে দুজন মানুষকে মেরে ফেলে ওরা কি নিজেরাই ভয় পায়নি?’

সেই লোকটি বলল, ‘ভা হলে ভ্যানরিকশা নিয়ে আসি!’

প্রধান বলল, ‘হ্যাঁ।’

নীল বলল, ‘কাল রাতে ওরা এসে আমার বাড়ির সব কিছু ভেঙে চুরমার করেছে।’

‘সে কী? কখন?’ প্রধান জিজ্ঞাসা করল।

‘রাহে। আমার সৌভাগ্য যে, ওদের আমার সময়টায় আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। ওরা এবার মরীয়া হয়ে উঠেছে। আপনারা ঠিক করুন কি করবেন!’

‘কি করব মানে?’

‘আগামীকাল আবার মাছ ধরে ওদের হাতে দেবেন?’

সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের সবাই, এমন কি যজ্ঞেশ্বরও, বলে উঠল, ‘কফলো না। আর ওদের জন্যে মাছ ধরব না—ওরা আগে দুটো প্রাণ ফিরিয়ে দিক তারপর ভাবা যাবে।’

‘কিন্তু আইনত মরসুমের শেষ দিন পর্যন্ত তোমরা মাছ ধরতে বাধ্য।’

প্রধান বলল, ‘স্যাঁ। কিন্তু ওই আইন যখন হয়েছিল তখন আমাদের দু’জন মানুষকে ওরা মেরে ফেলেনি। যা হয় হোক, সুবিচার না পাওয়া পর্যন্ত আমরা মাছ ধরব না।’

‘আপনারা এই সিদ্ধান্তে অটল হয়ে থাকতে পারবেন?’ নীল জিজ্ঞাসা করল।

‘থাকতেই হবে বাবু, নইলে একে একে সবাইকে মেরে ফেলবে ওরা। এতদিন ভাতে মারছিল—আজ প্রাণে মারল। আর কতদিন সহ্য করব আমরা?’ প্রধান বলল।

নীল প্রধানকে ডাকল, ‘আপনি আমার সঙ্গে একটু আসুন।’

নীলের হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল, প্রধান এগিয়ে এসে ধরতে চাইল। ‘না না, আমি একাই পারব। এইটুকুনি তো! বড্ড কাহিল করে দিয়েছে জুরটা।’

ডেকের ওপরে উঠে নীল দেখল সুভদ্রা ভাঙা আসবাব এক জায়গায় জড়ো করে ফেলেছে এর মধ্যে। সেগুলো দেখে প্রধান বলল, ‘একি!’

‘ওদের কীর্তি। আমাকে না পেয়ে এদের ওপর ঝাল মিটিয়েছে। আপনাকে কোথায় বসতে বলব জানি না—ওনুন, আপনাদের বেঁচে থাকার যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। সমবায় করতেই হবে। কিন্তু যারা টাকা নিয়েছিল, যাদের সঙ্গে আজ ওদের ঝামেলা হয়েছে তাদের ইচ্ছে থাকলেও সমবায়ের সদস্য করা যাবে না। আইনে আটকে যাবে। তবে তারা সমবায়ের অধীনে কাজ করতে পারে কিনা তা উকিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করে নেবেন। আমি ব্যাকে গিয়ে কথা বলেছি—ওরা চেষ্টা করবে টাকা দিতে। আমি ভেবেছিলাম যতক্ষণ সব ঠিকঠাক মিটে না যাচ্ছে ততক্ষণ আমি চুপ করে থাকব। কিন্তু ওরা একের পর এক আক্রমণ করে যাচ্ছে আমার ওপরে, তাই এখানে বসে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি হরিহরবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমি না থাকলে—’ নীল একটানা কথাগুলো বলে যাচ্ছিল—একটু থামল।

‘আপনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন?’ প্রধান প্রশ্নটা করামাত্র ভেতরে কাপল্লের শব্দ হল। নীল তাকিয়ে দেখল ঘরের মাঝখানে সুভদ্রা বড় চোখে তাকে দেখছে, পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। নীল বলল, ‘এসো সুভদ্রা, চা দিয়ে যাও।’

কোনরকমে দু-কাপ চা দুজনের হাতে পৌঁছে দিয়ে দৌড়ে ফিরে গেল সুভদ্রা। সেটা লক্ষ্য করে প্রধান বলল, ‘আপনার কাছে কাজ পেয়ে মেয়েটা বেঁচে গিয়েছিল বাবু।’

‘আমি যে চলে যাচ্ছি, একেবারে চলে যাচ্ছি তা ভাবছেন কেন?’

‘তা হলে?’

‘সমবায়ের ব্যাপারে সব সময় কথা বলতে হয়তো আমি থাকব না।’

ওরা যখন চা শেষ করেছে তখন ওপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর উত্তেজিত গলা পাওয়া গেল। প্রধান ডাকতেই তারা জানাল, ‘পুলিশ এসেছে—পুলিশ এসেছে!’

প্রধান বলল, ‘যাক। আপনাকে কষ্ট করে থানায় যেতে হবে না। পুলিশই এসে গেছে।’

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাটা জানা গেল। পুলিশ একটা বড় ভ্যান নিয়ে এসেছে। যারা সমুদ্রতীরে ঝামেলা করেছিল পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। বেথড়ক লাঠি চালিয়ে ওরা মানুষগুলোকে লাইনে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করছে কারা কারা হামলা করেছে। ওরা জানতে পেরেছে যারা বড়জলের বিকলে টাকা নিয়েছিল হামলাকারীরা তারাই। ওদেরই ওরা ধরছে। এসব খবর পানিয়ে আসা কয়েকজন প্রধানকে জানাতেই সে দলবল নিয়ে চলে গেল। যাওয়ার আগে নীল তাকে বলল, ‘মাথা ঠাণ্ডা করে রাখবেন। পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা করে কোনও লাভ নেই। ওদের শক্তি অনেক। আর এখানে ওরা এসেছে পাইকারদের উসকানিতে—সাবধান।’

ওরা চলে গেলে নীলের মনে হল একটু গুয়ে নিলে ভাল লাগবে। সে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে বিছানায় চলে এল। বালিশে শরীর এলিয়ে দিয়ে বুঝল ওটার ওপরেও অত্যাচার চালানো হয়েছিল, সুভদ্রা কোনরকমে ম্যানেজ করেছে।

পরপর যে ঘটনাগুলো ঘটল তা ঘটা স্বাভাবিক। যারা শোষণ করে তারা পৃথিবীর সব দেশেই এই একভাবেই কাজ করে। পুলিশের সঙ্গে তাদের হুদ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করা বৃথা। কিন্তু কোকিলা কোথায়? তার জ্বর কি এখনও সারেনি? মেয়েটা তার সঙ্গে যে আচরণ করে গিয়েছে তাতে এমন ঘটনা ঘটায় কথা নয়। এই নিরীহ গরিব মানুষগুলোকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে, মিথ্যে মামলায় গারদে পুরে রাখবে—তার ফলে ভয় পেয়ে যাবে যারা গ্রামে থাকবে। তখন তাদের দিয়ে যা ইচ্ছে করাতে কোনও অসুবিধা হবে না।

দরজার শব্দ হল। নীল চোখ খুলল। সুভদ্রা দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে আবার পুরনো পোশাক। নীল জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার? বাজারে যাবে? কিছু নেই?'

'আপনি চলে যাচ্ছেন?' কাঁপা গলা সুভদ্রার।

'কে বলল এ কথা?'

'আপনি চলে যাচ্ছেন?'

'দূর পাগল! আমি কোথায় যাব?'

'প্রধান বলল, আমি গুনেছি।'

'কদিন আমি এখানে থাকব না। দেখছ তো, কাল রাতে এখানে থাকলে আমার অবস্থা কি হত? এখানে থাকলে ওরা আমাকে মারতে আসবেই।'

'আপনাকে ওরা মারবে কেন?'

'কারণ ওদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে তোমার গ্রামের লোকদের আমি বলেছি—'

'তার জন্যে চলে যেতে হবে কেন?'

'এখানে থাকব?'

'এখানে কেন, কাল রাতে যেখানে ছিলেন সেখানে থাকলে আমি সব কাজ করে দেব। কেউ জানতে পারবে না আপনি ওখানে আছেন।'

'এ কথা তোমার মনে হচ্ছে। কাল রাতে এ বাড়িতে ছিলাম না, অথচ সকাল হতেই এখানে রয়েছে— তা হলে কোথায় ছিলাম? হয় তোমাদের গ্রামে নয় সমুদ্রের ধারে কোথাও। ওরা খোঁজ করতে শুরু করলে জানতেই পারবে লাইটহাউসের কথা।'

'কিন্তু না—আপনি যাবেন না।' কেঁদে ফেলল সুভদ্রা।

'আরে! তুমি কীদছ কেন?'

'আপনি চলে গেলে—'

'আমি চলে গেলে তোমার খরাপ লাগবে?'

'আপনি বুঝবেন না—'

'দাঁড়াও—' তোমার বাবাকে বলব একটা ভাল ছেলে খুঁজতে, আমি দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেব।'

সুভদ্রা ছিটকে সরে গেল। নীল উঠল, ভাবল মেয়েটাকে সাহুনা দেবে—কিন্তু মত পালটে ধীরে ধীরে ডেকে এসে দাঁড়াতেই জীপটা চলে এল বাড়ির পাশে। জীপ থেকে একজন ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার নেমে এলেন, 'এ বাড়িতে আপনি থাকেন?'

'হ্যাঁ, আসুন।'

জীপের অন্যান্য পুলিশদের ইশারা করে অপেক্ষা করতে বলে অফিসার উঠে এলেন ডেকে, 'আপনার নাম নীল?'

'হ্যাঁ। আপনাকে বসতে দেওয়ার মতো চেয়ার আমার বাড়িতে আর নেই—'

'মানে?'

'গতরাতে আমি একটু বেরিয়েছিলাম, ওই সময় এ বাড়িতে হামলা হয়েছিল—'

'কারা হামলা করেছিল?'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

‘থানায় রিপোর্ট করেছেন?’

‘না। আমার শরীর খুব অসুস্থ বলে যেতে পারিনি।’

‘অসুস্থ?’

‘হ্যাঁ।’

‘অথচ এখানকার বোকা লোকদের ফ্যাপাচ্ছেন!’

‘ফ্যাপাচ্ছি? আমি?’

‘এতদিন ওরা মাছ ধরে শান্তিতে বাস করত। অভাব নিশ্চয়ই ছিল—কিন্তু অশান্তি ছিল না। আপনি এখানে আসার পর ওদের উসকে দিচ্ছেন।’

‘এসব অভিযোগ কি কেউ করেছে?’

‘হ্যাঁ। যারা মাছের ব্যবসা করে তারাই বলেছে।’

‘অদ্ভুত!’

‘যেন খুব অবাক হয়ে গেলেন?’

‘কি বলব বলুন, দু-দিন আগে এই অঞ্চলের মাছের একমাত্র ব্যবসায়ীর মেয়ে, যিনি ভবিষ্যতের মালিক, আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে গেলেন, বন্ধুত্ব প্রতিশ্রুতি করলেন—অথচ আপনি বলছেন ওঁরাই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।’

‘মালিকের মেয়ে? কোকিলা দেবী?’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ। উনি প্রায়ই আসেন, দাঁড়ান—’ নীল ঘরে ঢুকে তাক থেকে কোকিলার ফেলে যাওয়া দামী লাইটের আর বিদেশী সিগারেট এনে পুলিশ অফিসারের হাতে দিল, ‘এগুলো কোকিলা দেবীর। শেষবার এসে ফেলে গিয়েছিল।’

অফিসার জিনিস দুটো দেখলেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল, ‘উনি যে এখানে এসেছেন তা ওঁর বাবা জানেন?’

‘এ প্রশ্ন করলে ওঁকে ছোট করা হয় অফিসার।’

‘হুম, আপনার বাড়ি কোথায়?’

‘একসময় কলকাতায় থাকতাম আমরা—’

‘থাকতাম মানে?’

‘মা-বাবা মারা যাওয়ার পর এখন সেখানে কেউ নেই। ভাড়াবাড়িতে ছিলাম—’

‘এখানে আপনার চলে কি করে?’

‘আমি বেশ কিছুকাল জাহাজে চাকরি করেছি, তার টাকা জমালো ছিল।’

‘আপনার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস আছে—’

‘আমার বিরুদ্ধে? আমি তো জানি না।’

‘আমি আপনাকে থানায় নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু এ দুটো জিনিস আমাকে একটু চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। আমাকে না জানিয়ে আপনি কোথাও যাবেন না—’

‘সরি অফিসার, আসাকে শহরে যেতেই হবে।’

‘শহরে? বেশ জেলার বাইরে যাবেন না।’

‘অফিসার? একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?’ নীল বলল, ‘একটু আগে বালির চরে পাইকারের লোকেরা দু-জন মানুষকে খুন করে ডেডবডি নিয়ে গিয়েছে। আপনি কি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন?’

‘খুন করেছে? আপনাকে কে বলল?’

‘এরাই। এদের চোখের সামনে গুলি করে মেরেছে।’

‘কই, কেউ তো বলেনি এ কথা।’

‘ভয়ে বলেনি। আপনার লোক ওদের অ্যারেস্ট করেছে কোন্ অভিযোগে?’

‘ওরা মাছ না দিয়ে মারপিট করেছে—’

‘এত সাহস এদের কী করে হবে ভাবলেন না?’

‘দেখুন মশাই, আমি বুঝতে পারছি আপনি ডেপুটারাস লোক, এদের উসকে দিচ্ছেন—কিন্তু মিস কোকিলার অভ্যুত্থাত দেখানোর এখাত্তা আপনি বেঁচে গেলেন।’ অফিসার দ্রুত নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। ভীপটা মুখ

ঘুরিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার নিয়ে যেতে ভদ্রলোক ভোলেননি।

বারোজনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। যজ্ঞেশ্বর বেঁচে গেল কারণ সে গ্রামে না গিয়ে সমুদ্রের ধারে পালিয়ে গিয়েছিল। গ্রামে ঘুরে এসে যজ্ঞেশ্বরই খবরটা দিল—দিয়ে জানতে চাইল, মদ লাগবে কিনা।

নীল মাথা নাড়ল। নোকাটাকে তার সহ্য হচ্ছিল না। তাছাড়া শরীরটাও মদ খেতে তেমন উৎসুক নয়। সে যজ্ঞেশ্বরকে বলল, ‘প্রধানকে গিয়ে বল, থানায় গিয়ে খুলের রিপোর্ট করতে। এই ডায়েরিটা করে বিকেলে বেন আমার সঙ্গে দেখা করে।’

যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি ওদের সঙ্গে যাবেন না?’

‘আমার শরীর ভাল না—আর ওদের সঙ্গে বলছি কেন, তুমিও প্রধানের সঙ্গে যাবে।’

‘আমি গেলে যদি ওরা ধরে?’

‘বারোজনকে ধরেছে, তোমাকে ধরলে তেরোজন হবে। এতে ক্ষতি কিছু হবে না।’

এখন জ্বর নেই। খেতে ইচ্ছে করছে না কিছুই। নীল বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়ল। একমাত্র ডেউয়ের শব্দ ছাড়া কোথাও কোনও আওয়াজ নেই, বাতাসও শান্ত।

হানীয়ে ডাক্তার বললেন, ‘কোনও ভয় নেই স্যার। পরিশ্রম আর টেনশন থেকে জ্বর এসেছিল—অ্যান্টিবায়োটিকের কোর্স শেষ হলে ঠিক হয়ে যাবে।’

সংপতি বলল, ‘এখনই আবার পরিশ্রম করা উচিত হবে?’

‘না না, একটু রেস্টে থাকা উচিত।’

‘তা হলে আপনি ওকে বলুন কোথাও চেষ্টা যেতে। এখানে থাকলে ওর রেস্ট হবে না ডাক্তার। চলুন।’ সংপতি ডাক্তারকে নিয়ে কোকিলার ঘরে ঢুকলেন। কোকিলা তখন চেয়ারে বসেছিল। সামনে টিভি খোলা।

‘তুমি আবার উঠে বসলে কেন?’ সংপতি জিজ্ঞাসা করলেন।

‘আজ ভাল লাগছে বাবা।’

‘ডাক্তারবাবু তোমাকে পরীক্ষা করবেন। বিছানায় যাও।’

কোকিলা গুয়ে পড়লে ডাক্তার স্টেথো দিয়ে দেখলেন, নাড়ি টিপলেন—তারপর বললেন, ‘ওযুধ কাজ করেছে। আর কোনও ভয় নেই।’

কোকিলা বলল, ‘খ্যাঙ্ক ইউ।’

সংপতি জানতে চাইলেন, ‘তা হলে কাল থেকে ও বেরতে পারবে?’

ডাক্তার অবাক হয়ে তাকালেন। তারপরেই সামলে নিয়ে বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, ‘নো। এখন রেস্ট দরকার। নইলে আবার জ্বর ফিরে আসবে। আমি সাজেস্ট করছি কোথাও গিয়ে দিন দশেক থেকে আসতে। চেষ্টা দরকার।’

‘চেষ্টা?’ সংপতি বললেন, ‘তা হলে—’

কোকিলা মাথা নাড়ল, ‘না—আমি ঠিক আছি।’

ডাক্তার বললেন, ‘তোমার ব্যাপারটা আমি ভাল বুঝি মা।’

‘আমার ব্যাপার আমাকেই বুঝতে দিন।’ কোকিলা বলল।

সংপতি ধমক দিলেন, ‘এ কী রকম কথা? একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাজেশন তুমি উড়িয়ে দিচ্ছ? উনি যখন বলছেন চেষ্টা যাওয়া দরকার তখন তুমি যাবে। ভারতবর্ষের মধ্যে হলে সিমলায় যেতে পার—আমি ভুবনেশ্বর থেকে প্লেনের টিকেট বুক করতে বলছি চণ্ডীগড়ের, অবশ্য বিদেশে যেতে ইচ্ছে হলে আপত্তি নেই।’

‘আমার বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।’

‘কোকিলা, তুমি বাইরের লোকের সামনে মিসবিহেভ করছ। ঠিক আছে ডাক্তার, আপনি এখন যেতে পারেন।’ সংপতি মাথা নড়তেই ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। বিছানার পাশের চেয়ারে বসলেন সংপতি, ‘দ্যাখো কোকিলা, তুমি এতদিন যা করছ তাতে আমি কোনও আপত্তি করিনি। আমার এত বড় ব্যবসা তোমার হাতে ছেড়ে দেব। মাহের ব্যবসা আমার খুব সামান্য ব্যাপার। আমার অন্য যে ব্যবসাসবুলো আছে সেগুলোর কথা তোমার মনে রাখা দরকার। সিমলায় আমি যে গ্রী স্টার হোটেল করছি সেটা প্রায় শেষ

হয়ে এসেছে। তোমার যাওয়া দরকার। তুমি প্রণ করতে পার, আমার মোট আয়ের খুব সামান্য অংশ যখন মাহের ব্যবসা থেকে হয় তখন এটার পেছনে আমি সময় দিই কেন? কারণ এটা আমার পৈতৃক ব্যবসা। আমার ঠাকুরা শুরু করেছিলেন। তিনি ঠিক যেভাবে ব্যবসা শুরু করেছিলেন তাতে তেমন লাভ হত না। বাবা ব্যবসার প্যাটার্ন পালটান। লাভ শুরু হয়। আমি বাবার পথ থেকে সরতে চাই না—আভারস্ট্যান্ড?’

‘না।’

‘ওয়েল, নীল নামক লোকটি এখানে থেকে মাহমারাদের উসকে দিচ্ছে—ওরা যে আমার নাকের ওপর হামলা করার সাহস পেয়েছে তা ওরই জন্যে। খবর নিয়ে জেনেছি এই লোকটির অতীত ভদ্রলোকের মতো নয়। না, পুলিশের কেস নেই কিন্তু হতে পারত। এই লোকটাকে আমি এখান থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, তুমি ওকে ম্যানেজ করতে চাইলে—কোকিলা, সাপকে কখনও ম্যানেজ করা যায় না। পুলিশ ওকে আরেস্ট করতে গিয়েছিল, ও তোমার রেখে আসা লাইটার আর সিগারেটের প্যাকেট দিয়ে পুলিশকে ব্ল্যাকমেল করতে পেরেছে। তুমি আর ওর সঙ্গে দেখা করবে না।’

‘কারণ?’

‘এর পরেও তুমি কারণ জিজ্ঞাসা করছ?’

‘ও আমাকে প্রমিস করেছে বন্ধু হবে বলে—’

‘কার বন্ধু?’ তোমার?’

‘আমাদের।’

‘বাজে কথা। ও আজি লোকগুলোকে খেপিয়ে দিয়েছে—’

‘তা হলে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।’

‘নো। আমি জগদীশকে চাপ দিয়ে পাঠিয়েছিলাম ওর কাছে—ও কোনও সহযোগিতাই করেনি। তুমি গিয়ে আর কি নতুন কথা বলবে? বরং সিমলায় গিয়ে হোটেলটা দ্যাখো, রেস্টে নাও—তারপর কথা হবে।’

‘এটাই তোমার শেষ কথা?’

‘হ্যাঁ।’ সংপতি উঠে দাঁড়ালেন, ‘এরপর জেদ ধরলে আমার মনে হবে তুমি ইমোশনালি কথা বলছ। ব্যবসার ব্যাপারে ওটা আমি একদম পছন্দ করি না। ওর জন্যে একটা মেয়ে অ্যাসিডে পুড়ে মাংসপিণ্ড হয়ে বেঁচে আছে। এরকম ঘটনা যাতে আর না ঘটে বাবা হিসাবে সেটা দেখা আমার কর্তব্য।’ সংপতি চলে গেলেন।

দুপুরের পেরিয়ে ঘুম ভাঙতেই নীলের মনে হল থিদেতে পেট জ্বলে যাচ্ছে। সে চিংকার করল, ‘সুভদ্রা, সুভদ্রা!’

সুভদ্রা ছুটে এল। নীল বলল, ‘খেতে দাও। খুব থিদে পেয়েছে।’

‘বাথরুমে যাবেন না?’

‘যাচ্ছি। তুমি খাবার বাড়া।’

খাওয়া শেষ হলে মনে হল শরীর এখন অনেক ঝরঝরে। সে লক্ষ্য করল সুভদ্রা আবার তার দেওয়া পোশাক পরেছে। সে মনে মনে হাসল। মেয়েটার অভিমান ওর পোশাক দেখে বোঝা যায়। খাওয়াদাওয়া হলে সুভদ্রা জিজ্ঞাসা করল, ‘আজ রাতে কোথায় থাকবেন?’

‘ভাবছি। এখানে থাকা যাবে না। কিন্তু—’

‘আমাদের বাড়িতে আপনার অসুবিধা হবে?’

‘না। ওখানে গেলে খবরটা চাপা থাকবে না।’ নীল ভাবল, ‘আজ্ঞা চল তো—লাইটহাউসটাকে দিনের আলোর দেখে আসি!’

সুভদ্রা খুশি হল।

সমুদ্রের ধার দিয়ে ওরা লাইটহাউসে পৌঁছল। এভাবে আসায় দূর থেকেও কেউ ওদের দেখতে পায়নি। নীল দেখল একেবারেই ভেঙে পড়েছে লাইটহাউসটা। যে ঘরে কাল রাতে ওরা ছিল সেটা কোনমতে খাড়া আছে। কিন্তু খানিকটা সিঁড়ি খাড়া আছে, তারপর সোজা খাড়া পাথরের ওপর ছাদওয়াল। একটা ঘর যার চারপাশে বুকসমান দেওয়াল। বোধহয় ওখানে দাঁড়িয়ে এককালে সমুদ্রের ওপর নজর রাখা হত। চেষ্টা করলে ওইখানে ওঠা অসম্ভব হবে না। সুবিধা হল কেউ যদি আক্রমণ করতে আসে, তাহলে সে সহজে

সৌছতে পারবে না। নীচ থেকে গুলি ছুঁড়েও কোনও লাভ হবে না। আবার ওপর থেকে আত্মরক্ষার বাড়তি সুবিধা পাবে সে।

নীল জিজ্ঞাসা করল, 'ওপরে উঠেছ কখনও?'

সুভদ্রা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, ওই পাথরটার ওপর পা রেখে ওঠা যায়।'

নীল বলল, 'ঠিক আছে, এখানেই থাকা যাবে।'

'মা ওপরে উঠতে পারবে না।'

'মা? মায়ের কথা আসছে কেন?'

'বাঃ, আমি থাকলে তো মা সঙ্গে থাকবে।'

'তোমাকে থাকতে হবে?'

'তাহলে আপনি ঘুমিয়ে পড়লে কে পাহারা দেবে?'

'তা ঠিক।'

'আমি মাকে বলব, ওই ঘরে থাকতে।'

'তাই? ওপরে তোমাকে একা পেয়ে যদি আমি অত্যাচার করি?' নীল হাসতে হাসতে বলতেই মুখ নামাল সুভদ্রা। নীল জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'আপনি সেসব কখনও করবেন না।'

'কেন? আমি কি সম্রাসী?'

'আপনি তার চেয়েও বেশি।'

কথটা শুনে হঠাৎ নীলের খুব ইচ্ছে করল সুভদ্রাকে স্পর্শ করতে। সে কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারছিল না। নীল হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল নীলের পায়ে, 'আমাকে আপনি ছেড়ে কোথায়ও যাবেন না। আপনার পায়ে পড়ি আমাকে জায়গা দিন।'

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংবরণ করল নীল। মুহূর্তের দুর্বল মনটাকে ঝটপট ঢেকে ফেলল গাভীরে। বলল, 'ঠিক আছে। ওই—অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে হয়ে গেলেই আমাকে এখানে আসতে হবে—ওঠ।'

সুভদ্রা উঠল। চট করে আঁচলে চোখ মুছল।

ওরা লাইটহাউস থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের ধার দিয়ে আসতে না আসতেই মানুষের গলা পেল। কেউ চিংকার করে ডাকছে। টিলার ওপর উঠতেই জনার্দনকে দেখা গেল—দুটো হাত মুখের দু-পাশে দেওয়াল করে চোঁচাচ্ছে, 'অ-সু-ভ-দ্রা-রে।'

সুভদ্রা দৌড়ে গেল খানিকটা, 'কী হয়েছে? ও বাবা, চোঁচাচ্ছে কেন?'

পাশ ফিরে মেয়েকে দেখতে পেয়ে জনার্দন হাতছানি দিল, 'তাড়াতাড়ি আয় হতভাগী, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আমি ডেকে ডেকে মরছি।'

'কেন কী হয়েছে?'

'যা হয়েছে তা তুই নিজের চোখে দ্যাখ্ গিয়ে—যা বাড়ি যা।'

'বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। যা যা—জলদি।'

বলার ধরনে এমন ব্যস্ততা ছিল যে সুভদ্রা ছুটতে বাধা হল। এবার জনার্দন নীলের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'ভগবান আছেন বাবু!' সে দু-হাত জড়ো করে নমস্কার করল।

নীল কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল তোমার?'

'একটু আগে টেলিগ্রাম এসেছে বাবু। যিনি নিয়ে এসেছিলেন তিনিই পড়ে শোনালেন। আমার জামাই বেঁচে আছে। মাদ্রাজ থেকে রওনা হয়েছে। ভুবনেশ্বর হয়ে এখানে আসছে। ওঃ, মেয়েটা বিধবা হয়নি বাবু! লোকটা বলল খবরটা নাকি রেডিওতে বলেছে। নৌকো থেকে কারা যেন উদ্ধার করে জাহাজে তুলেছিল। সেখানেই কাজ করেছে। এতদিন পরে সেই জাহাজ মাদ্রাজে নামিয়ে দিয়েছে ওদের। সত্য-মিথ্যা জানিনে, তবে টেলিগ্রামে লিখেছে—বেঁচে আছি, ভাল আছি, মাদ্রাজ থেকে রওনা হচ্ছি।' আবার প্রশ্ন করল জনার্দন, 'আমার দুঃখের দিন শেষ। এবার সে এসে যদি এখানে না থাকতে চায়, বউ নিয়ে তার গ্রামে চলে যেতে চায় আমি আটকাবো না। কী বলো বাবু?' জনার্দন বকবক করছিল।

এই সময় প্রধানদের আসতে দেখা গেল। তারা এলে জনার্দন প্রায় কোলাকুলি করা শুরু করল। জামাই

এলে খাওয়াতে হবে এই ধরনের আবদারে পূর্ণ সম্মতি জানাল জনার্দন। তারপর বলল, 'তোমরা কাজের কথা বল। আমার ভাল খবর কিন্তু গ্রামের তো সর্বনাশ হবার উপক্রম হয়েছে। আমি যাই। ও হ্যাঁ বাবু, একটা কথা ছিল!'

'বল।'

'জামাই আসছে। বুঝতেই পারছেন, সে কখনও চাইবে না মেয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করুক। তার ওপর আপনি একা ব্যাটা ছেলে—অবশ্য আমি জানি কেউ না কেউ কথাটা তার কানে তুলে দেবেই, কিন্তু সে নিজের চোখে দেখুক ওর মা চাইছে না।' জনার্দন হাতজোড় করে বলল। তার মুখচোখে সত্যিকারের প্রার্থনা।

প্রধান বলল, 'তুমি নিশ্চিত থাকো জনার্দন। আমি তাকে বুঝিয়ে বলব। কি অবস্থায় তোমার মেয়েকে কাজ করতে হয়েছে, আমি অনুরোধ করেছি বলে নীলবাবু রাজি হয়েছিলেন, সব বুঝিয়ে বলব। আর নীলবাবু যে মানুষ হিসাবে দেবতার মতো এ কথা তো তোমার মেয়ে তার মাকে বলেছে—বলেনি?'

'তা ঠিক। তবু তার না আসাই ভাল।'

'বেশ পাঠিয়ে না।' প্রধান ঘুরে দাঁড়াল, 'যজ্ঞেশ্বর ভাল রাঁধে। তাকে বলব, সে এসে আপনার রান্না করে দেবে।'

নীল বলল, 'না। তার কোনও দরকার নেই। সুভদ্রার ব্যাপারে আমি আগেই আপত্তি করেছিলাম, আপনার অনুরোধ এড়াতে পারিনি। আমার লোকের দরকার নেই। যাকগে, থানায় গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। বড়বাবু ডায়েরি নিলেন না।'

'নিল না?'

'হ্যাঁ। বললেন—কে খুন করেছে তার নাম বলতে হবে। ডেডবডি কোথায় তা দেখাতে হবে, তবেই তিনি ডায়েরি নেবেন।'

'আপনারা চাপ দিলেন না?'

'দিয়েছিলাম। উনি ওঁর বড়কর্তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন। তারপর বললেন, ফলস ডায়েরি করলে আমাদের নাকি জেল হয়ে যাবে। আমাদের ওপর দয়া করে তিনি ডায়েরি নিচ্ছেন না।' প্রধান বলল।

'বেশ আমি কাল ওঁর সঙ্গে দেখা করব। আপনি গ্রামের সবাইকে বলুন একত্রিত হতে। ওরা যত লোভ দেখাক, কেউ যেন ফাঁদে না পা দেয়। আর আজ রাতে কেউ যেন মাছ ধরতে না যায়।'

'সেটা ঠিক হয়ে গেছে। আজ রাতে কোনও নৌকো জলে নামবে না।'

'কিন্তু যেসব মানুষ মাছ ধরতে যায় তারা যেন গ্রামে না থাকে।'

'মানে?'

'নৌকো জলে না পড়লে ওরা খোঁজ করতে আসতে পারে। আপনি তাদের বলুন বাড়ির বাইরে কোনও নিরাপদ জায়গায় রাত্রিবাস করতে।'

'আমাদের তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই বাবু।'

'সেকি! এতবড় সমুদ্র, এই বালিয়াড়ি—জায়গার অভাব কি? তার ওপর এখন বৃষ্টি নেই! সন্ধ্যা হলেই ওদের সরে যেতে বলুন, ভোর হবার কিছু পরে ওরা ফিরে আসতে পারে।' নীল বলল।

প্রধান তার দলবল নিয়ে যখন চলে গেল তখন সূর্যদেব পাটে বসেছেন। নীল বাড়িতে এল। ডেকে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল। হির সমুদ্র। ছায়া ঘন হওয়ায় জলের রঙ এখন প্রায় কালচে। সুভদ্রার স্বামী ফিরে আসছে! যে মেয়েটা একটু আগে তার পায়ে পড়ে কাকুতিমিনতি করেছে, এই খবরটা পাওয়ার পর সে নিশ্চয়ই লজ্জিত হবে। যে স্বামীকে সে মৃত বলে ভেবেছিল—সে ফিরে এলে ওর মন পালটে যাবে।

সুভদ্রা সুন্দরী নয় কিন্তু অত অভাবের মধ্যে থেকেও স্বাস্থ্যবতী। ওকে ইচ্ছে করলেই শয়নদঙ্গী করতে পারত নীল। কিন্তু আজ বিকেলের আগে সেই ইচ্ছে কখনও তীব্র হয়নি তার। সুভদ্রা যখন ঘর মুছত, যখন বিশেষ মুদ্রায় তার নিতম্ব উল্লিখিত হত, তখন এক ধরনের উত্তেজনার শিকার হত নীল। কিন্তু সেটা সাময়িক। মেয়েটাকে সে পবিত্র মায়ার চোখে দেখে এসেছিল এতকাল। কিন্তু আজ বাড়িল লাইটহাউসে এক বিশেষ মুহূর্তে সে অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু পায়ে পড়ে সুভদ্রা নিজের চারপাশে লক্ষ্যগণ্ডী তৈরি করে নিয়েছিল। স্বামী ফিরে আসছে—আর নিজেকে অসহায় বলে মনে করবে না সুভদ্রা। আর কখনও তাকে ছেড়ে না যাওয়ার মিনতি করবে না সে।

ব্যাগ ওছিয়ে নিল নীল। রাতের খাবার যা সুভদ্রা তৈরি করে দিয়েছে, টুকিটাকি জিনিষ—টর্চ এবং রিভলভার নিয়ে সন্দের অন্ধকারে সে রওনা হল। লাইটহাউসে পৌঁছে নিশ্চিত হয়ে সুভদ্রার দেখানো পাথরে পা রেখে রেখে ওপরে উঠে গেল নীল। লাইটহাউসের শেষ ধাপে চারদিক ঘেরা আধপ্রাচীরের মধ্যে পৌঁছে নিজে থেকে অনেকটা নিরাপদ মনে করল সে। এখানে দাঁড়িয়ে বালির ওপর অনেকটা নজর রাখা যায়। যদি কেউ বদমতলবে এখানে আসে, ওপরে ওঠার আগেই সে তার নজরে পড়ে যাবে।

ব্যাগ রেখে ওছিয়ে বসল নীল। যারা তার খোঁজে আসবে তারা কেউ মাঝরাতের আগে এখানে পৌঁছাতে পারবে না। ততক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। দুপুরে ঘুমোনের পর শরীর ঝরঝরে হয়েছিল, কিন্তু এখন অসুস্থ অবসাদ তাকে আক্রমণ করছে। নীল সময় নষ্ট করল না।

ঘুমের গভীরে কেউ বেন তাকে সতর্ক করল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রতিরোধ এক ঝটকায় সরিয়ে সে সোজা হয়ে বসল। রিভলভার হাতে নিয়ে সে উবু হয়ে বসল। সামনে প্রাচীরের শেষ। সামান্য ঝুঁকে নিচে তাকাতেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি চোখে পড়ল। নিচ থেকে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। ট্রিগার টিপলেই সহজে মরে যাবে লোকটা। কিন্তু ও নিশ্চয়ই একা আসেনি। ওর সঙ্গীদের খোঁজার চেষ্টা করল নীল। ওপর থেকে কাউকে দেখতে পেল না সে। ভাঙা সিমেন্টের ব্র্যাবের আড়াল সামনে।

ভাল করে লক্ষ্য করল নীল। আকাশে আজ হালকা মেঘ। কিন্তু চোখ ধাতু হতেই তার মুখ থেকে শব্দটা ছিটকে এল, 'কে? কে এখানে?'

'আন্তে আমি।'

'সুভদ্রা?'

'হঁ।'

'সেকি! তুমি কেন এসেছ?'

কোনও উত্তর এল না নীচ থেকে। মেয়েটা ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। নীল সময় নষ্ট না করে রিভলভার কোমরে গুঁজে নেমে এল নীচে। সুভদ্রার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'এত রাত্রে এখানে এসে তুমি মোটেই ভাল করেনি—কি দরকার তোমার?'

এবার সুভদ্রা কাঁদল। শব্দ করে। বাতাস সেই কান্না কোথাও বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল না।

'আঃ, কি হয়েছে বলবে তো?'

'আমাকে আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

'কোথায়?'

'যেখানে চলে যাচ্ছেন। আপনি যা বলবেন সব করব।'

'আশ্চর্য! তোমার হারানো স্বামী আসছে, এখন তোমার আনন্দে থাকার কথা—আর তুমি কি বলছ? পাগল হয়ে গেলে নাকি?'

'না। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন।'

'কেন? তুমি তোমার স্বামীকে চাও না?'

'না।'

'সেকি? কেন?'

'আমার ওপর অত্যাচার করত। বাবা যে টাকা দেবে বলেছিল তা দিতে পারেনি বলে মারত। একটুও দয়ামায়া নেই ওর। এই এতদিন ছিল না—আমাকে সন্দেহ করবে, মারবে।'

'আমি প্রধানকে বলব ওকে বুঝিয়ে বলতে।'

'প্রধান? আমার বাবার কথাই শোনে না সে।'

'কিন্তু সে ফিরে আসছে শুনে তোমার বাবা তো খুব খুশি হয়েছে।'

'হবেই তো—মাথার ওপর থেকে আমাকে নামিয়ে দিতে পারছে।'

'তুমি তোমার স্বামীকে তাহলে ভালবাস না?'

'না।'

'সুভদ্রা, আমার সঙ্গে গেলে লোকে তোমার নামে খারাপ কথা বলবে। তোমার মা-বাবা কারও কাছে মুখ দেখাতে পারবে না, এ কথা ভেবেছ?'

'মা রাজি আছে।'

‘তার মানে?’

‘ওই তো, মা আমার সঙ্গে এসেছে। আপনি মাকে জিজ্ঞাসা করুন।’

নীল অবাক হয়ে গেল। যখন কোনও মা তার মেয়েকে জামাই-এর বদলে অনাথী পুরুষের হাতে তুলে দিতে চান—তখন অবশ্যই তিনি মেয়ের সুখের কথা ভাবেন। নীল মনে মনে মাথা নাড়ল, না না, সে ভাড়িয়ে যাচ্ছে। এতে মেয়েটির উপকার করার বদলে অপকারই করা হবে। সারাজীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেঁয়ে দেওয়া হবে ওকে।

সে হঠাৎ গভীর গলায় বলল, ‘এসব পাগলামি ছেড়ে এখনই বাড়িতে ফিরে যাও। নইলে আমি গ্রামের লোকজনদের ডেকে বলব মাঝরাত্র তুমি এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছ।’

সুভদ্রা অবাক চোখে তাকাল। যেন তার ভাবনাচিন্তার সঙ্গে এই কথা, কথা বলার ধরন, কিছুই মিলে না। মুখ নামাল সে। কয়েক মুহূর্ত পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেন কোনমতে শরীরটা টেনে নিয়ে ফিরে চলল। দূরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল ওর মা, কি বলল শোনা গেল না—নীল দেখল দুই নারীমূর্তি চুপচাপ চলে যাচ্ছে দূরে।

নীলের কষ্ট হচ্ছিল। মেয়েটা বুঝল না—ওনের মতো মেয়ের সঙ্গে খেলা করা যায় না। কোথায় নিয়ে যেত সে সুভদ্রাকে? দুদিন, দশদিন—তারপর নিশ্চয়ই বোঝা মনে হত। তার জীবনযাপনের ধরনের সঙ্গে ও কোনদিন মানানসই হত না। যে জাহাজী জীবন ছেড়ে সে মাটিতে চলে এসেছিল, সেই জাহাজে চাকরি নিয়ে যদি সে ফিরে যায় তা হলে কোথায় থাকত মেয়েটা? তা ছাড়া সমুদ্রের এমন নির্জন তীরে একাকী দাঁড়িয়ে থাকা বাংলায় যাকে মানায়, তাকে শহরের ব্যস্ততায় বোঝা বলে মনে হবে। আজকের অভিমান যেদিন কেটে যাবে, সেদিন মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবলে হয়তো তার এই ব্যবহারের জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করবে।

রাতটা কেটে গেল নির্বিশেষে। ভোর হতেই নেমে এল নীল। সমুদ্রে কোনও নৌকো নেই। অর্থাৎ জেলে ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত করতে পেরেছে। এই ধর্মঘটের খবর অন্যান্য সমুদ্রতীরে পৌঁছালে প্রতিক্রিয়া হবেই। নীলের মনে পড়ল, হরিহর উকিল সেই যে গেল আর তার কোনও খবর নেই! আজ তাকে শহরে যেতেই হবে!

ডেকে উঠে অবাক হয়ে গেল নীল। দুটো শাড়ি জামা অন্তর্বাস সুন্দর করে তাজ করে দরজার সামনে রেখে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এগুলো ফিরিয়ে দিয়ে গেছে সুভদ্রা। নীলের মনে হল ঠিকই করেছে। এসব দেখলে ওর স্বামী আরও সন্দিক্ত হত। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত বাস্তবে ফিরে এসেছে বলে ভাল লাগল তার।

টাকাপয়সা যা এ বাড়িতে লুকনো ছিল তার বেশির ভাগটাই ট্রাভেলার্স থেকে। সে সব সঙ্গে নিয়ে দরজায় তালা দিয়ে বের হল নীল কাঁধে কোলা ফেলে। প্রথমে ইঁটতে ইঁটতে জেলদের গ্রামে পৌঁছাল। সেখানে আজ ভগ্ননা চলছে জোর। শূন্য ট্রাক নিয়ে ফিরে গিয়েছে পাইকারের লোকজন। মাছ না পেয়ে ওরা একটাও কথা বলেনি। কাল রাত্রে গার্য ঘরে আত্মগোপন করেছিল তারা ফিরে এসেছে। গতরাতে কোনও হামলা হয়নি বলে রীতিমত হতাশ হয়েছে তারা। নীল চা খেল দোকান থেকে। সেই সময় প্রধান এসে বলল, ‘ডেডবডি পাওয়া গিয়েছে!’

‘কোথায়?’

‘শহরে যাওয়ার পথের ওপর পড়েছিল। গাড়ি ধাক্কা মেরেছে। পুলিশ বলেছে অ্যান্ড্রিভেট দুই-ন মরে গিয়েছে। শরীরে মদের গন্ধ ছিল।’

নীল ঠোঁট কামড়াল।

প্রধানের পাশে দাঁড়ানো একজন বলল, ‘আমরা বললাম চোখের সামনে গুলি করে মেরেছে কিন্তু পুলিশ বিশ্বাসই করতে চাইল না। বলল শহরের মর্গে বডি আছে, কি সব হবে—তারপর চাইলে দিয়ে দেবে।’

নীল বলল, ‘এ ব্যাপারে কি করা যায় বুঝতে পারছি না। শহরের বড় অফিসারদের জানালে লাভ হবে বলে মনে হয় না। আমি শহরে যাচ্ছি। আপনারা এমন কিছু করবেন না, যাতে ওরা সুযোগ পেয়ে যায়।’

এই সময় দেখা গেল একজন লোক বালি ভেঙে আসতে আসতে হাত নাড়ছে। কাছে এলে নীল বলল, ‘আরে! উকিলবাবু আসছেন!’

হরিহর কাছে এসে বলল, ‘মিষ্টি পাওয়ান ভাইসব। ভাল খবর আছে।’

নীল জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর?'

হরিহর ব্যাগ থেকে ভাঁজকরা কাগজ বের করল, 'পানসায়র মৎসজীবী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। এই দিন দলিলপত্র। এবারে সমবায় চালু করে দিন।'

নীল কাগজগুলোর ওপর চোখ বোলালে। সে আনন্দে জড়িয়ে ধরল হরিহরকে। আনন্দের ছোঁয়া নাগল সবার মনে। মানুষজন এ ওকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করতে লাগল। এই সময় যজ্ঞেশ্বর এগিয়ে এসে 'কর্মমুখে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাদের কি হবে?'

নীল বলল, 'আপাতত সমবায়ের অধীনে কাজ করতে পার তোমরা। তবে এই কাগজে কি আছে তা না জানা পর্যন্ত চূপচাপ থাকই ভাল।'

'কি, আমাদের মধ্যে একদল টাকা রোজগার করবে স্বাধীনভাবে আর আমরা সেটা চেয়ে চেয়ে দেখব?' সে ধীরে দাঁড়াল, 'যারা টাকা নিয়েছিলাম টিপসই দিয়ে তারা সবাই চল শহরে। পাইকারদের মালিককে জিজ্ঞাসা করব কি লেখা ছিল কাগজে? টাকা ফেরত দিলে ওরা কাগজ ছিড়ে ফেলবে কিনা। যাবে তোমরা?'

কয়েকজন হ্যাঁ বলে উঠল।

হরিহর ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'আরে ভাই, এসব করলে কোনও লাভ হবে না। আপনাবা বরং আমার সঙ্গে পানায় চলুন। সেখানে গিয়ে ডায়েরি করুন, জোর করে বন্দুক দেখিয়ে ওরা আপনাদের সাদা কাগজে টিপসই করতে বাধ্য করেছে—এটা বেআইনি!'

যজ্ঞেশ্বর জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিশ ডায়েরি নেবে?'

'আলবৎ। নিজে প্রক্সি বন্ধ। যাতে নেয় তা আমি দেখব।' হরিহর বলল।

নীল বলল, 'হরিহরবাবু, আপনি এই যে সমবায়ের ব্যাপারে কাজকর্ম করে এলেন, আপনাকে কোনও মাদার পডরে হয়নি বলে মনে হচ্ছে।'

না, কেউ আমাকে কিছু বলেনি। কেন বলুন তো?'

'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি লগদলান, কখন, আমি শহরে গচ্ছি। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম, আজ যখন সমবায় প্রেসিডেন্ট হয়ে গিয়েছে তখন সেটা চাইতে পারি। অতীত নিশ্চিন্তওলো জানা যায়।'

'কেনি হয়ে গেছে নীলবাবু? আমি যে বলে এসেছি স্টা এডফলে ফিরে গেছে। দুপুরে যেটা আসবে সেটাও বলে ব্যাঙ্ক বক ইত্যাদির আগে পৌঁছবেন কিনা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু সমবায়ের একটা অফিসঘর মাদার -' হরিহর বলল।

প্রধান অধ্যক্ষের দিকে তাকাল, 'আব একটা ঘর তোলা দরকার হে!'

নীল বলল, 'কোনও দরকার নেই। আমার বাড়িটা তো পড়ে থাকছে।'

'পড়ে থাকছে মানে?' প্রধান জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি গবেষণা না?'

'যখন আসবে তখন ভেতরের দরজা বন্ধ করে এক বছরের ভাড়া দেওয়া আছে, আপনাদের কোনও 'দুর্ভাগ্য' হবে না।' নীল ভ্রামাত্র মাদার একাংশ খুশি হল।

নীলের কথায় ওরা সবাই টিলার ওপর বড়িয়ে এল; যা কিছু ব্যক্তিগত জিনিস ওর ও অক্ষত ছিল সব ভেতরের দরজা চালান করে দিয়ে নীল বলল, 'আপনাদের বসতে দেওয়ার মতো একটি চেয়ারও অক্ষত রাখি ওরা।'

হরিহর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিভাবে?'

'পাইকারদের চেয়ার, যিনি আসে তাঁর লোকজন ভদ্রলোক আপনাকে বিরক্ত না করবে ও আমাকে খবর করতে সংপর্ক হয়ে থাকেন।'

'কেন?'

'যাচ্ছে আমি এই জেনেভাইদের সাহায্য করছি।'

'নীলবাবু, পরিকল্পনা আপনার মনেছি, কিন্তু ওটাকে বাস্তবায়িত করছি আমি। আমাকে থামিয়ে দিলেই এর উদ্দেশ্য নষ্ট। আমার মত হয় এর পেছনে অন্য কারণ আছে।'

'তার মানে? বি বসতে চাইলেন আপনি?'

'আপন আপনি এত উজ্জ্বল হয়ে কথা বলছেন কেন?'

'আপনি অন্যকিছুর ইঙ্গিত করছেন, বলুন ঠিক কিনা?'

হিস্তের কথা যদি বলেন সেটা তো আপনিই শুরু করেছিলেন। যাকগে, এই ভাঙা চেয়ারটেকিল জোড়া দিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু এইসব কাগজপত্র ভাল জায়গায় রাখা উচিত। আমি প্যাড ছাপিয়ে এনেছি, স্ট্যাম্পও বানিয়েছি। যা খরচ হয়েছে তার বিল দেব, সমবায় রোজগার শুরু করলে যেন শোধ করে দেয়। আমি মশাই গরিব মানুষ, দান করার ক্ষমতা আমার নেই। নিন নীলবাবু, ওগুলো রাখুন।’

ব্যাগ খুলে একটা প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরল হরিহর। নীল বলল, ‘আরে আমি ওগুলো নিয়ে কি করব? প্রধানকে দিন। প্রধান তো সভাপতি। ওঁরই এসবের দায়িত্ব নেওয়া উচিত।’

হরিহর প্রধানের হাতে কাগজপত্র তুলে দিলে সে সবাইকে ডেকে বলল, ‘শোন ভাই, এই যে সমবায় হল, আমরা একত্রিত হলাম, এসব হতে পারতাম না যদি নীলবাবু আমাদের সঙ্গে না থাকতেন। নিজের এই ঘরও তিনি সমবায়ের অফিস করতে ছেড়ে দিচ্ছেন। আমরা তাঁকে ছাড়তে পারি না। সমবায়ের সব কাজকর্ম ওঁর দ্বারাই হবে, কারণ আমাদের পেটে বেশি বিদ্যে নেই।’

সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পড়ল।

হরিহর বলল, ‘আমি এই কথাই বলেছি। উনি সমবায়ের সদস্য হতে পারেন না, কারণ মাছ ধরার ব্যাপারে ওঁর কোনও অভিজ্ঞতা নেই—প্রতিরাতে মাছ ধরতে যাবেনও না। কিন্তু সমবায় কমিটি ওঁকে ম্যানেজার বা সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ করতে পারে। নীলবাবু সেই কাজটা খুব ভালভাবে করতে পারবেন।’

নীল বলল, ‘আপনার আমাকে জড়িয়ে রাখতে চাইছেন?’

সবাই বলল, ‘হ্যাঁ, তাঁরা তাই চাইছে। নীল ওদের সঙ্গে থাকুক সবাই চায়।’

হরিহর বলল, ‘চলুন, দুপুরের বাসে শহরে ফিরে যাই। ব্যাকের ম্যানেজারের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে, কিন্তু লিখিত আবেদনপত্র দেওয়া দরকার—ওঁর নাম কি?’

‘কনিকা গুপ্ত।’

‘ভদ্রমহিলা?’

‘হ্যাঁ।’

‘সাধারণত মেয়েরা ঘুম খায় না। তবে দিনকাল বদলে গিয়েছে। কর্মরত স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, সেই সুবাদে চাকরি পেয়ে বিধবা মহিলাও বলেন, আমরা পেয়ে থাকি! প্রধান, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন—আবেদনপত্রে আপনাকে সই করতে হবে।’

‘কিন্তু এখন গেলে আজ ফেরা যাবে না।’ প্রধান আপত্তি জানাল।

‘আমার একটা মাথা গোঁজার আস্তানা আছে। সেখানে না হয় থেকে যাবেন। এসব কাজে দেরি করতে নেই। ব্যাক বন্ধ হওয়ার আগে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলে আবেদনপত্র টাইপ করিয়ে রাখতে হবে। প্রচুর কাজ বাকি।’

নীল জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি দুপুরে যাবেন তো?’

‘না মশাই, সেটা বেরবার আগে শেষ করে এসেছি।’ ঘড়ি দেখল হরিহর, ‘রাত্না না করা থাকলে বাসস্ট্যান্ডে যে দোকান রয়েছে সেখান থেকেই কিছু কিনে নিয়ে খেয়ে নেবেন।’ হরিহর তাগাদা দিল।

প্রধান কাগজপত্র তুলে দিয়েছিল নীলের হাতে। সেখান থেকে জেরায় কপিগুলো বাইরে রেখে নীল প্রধানকে নিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকল। খাটের নিচের গোপন কুঠুরিতে সেগুলো রেখে জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, ‘একমাত্র আপনি জানলেন, ঠিক আছে?’

ভেলেপাড়ার লোকজন যারা টিলার ওপর বাড়ির সিঁড়িতে পা রাখতে সঙ্কোচ বোধ করত তারা যখন জেনে গেল এখানেই সমবায়ের অফিস হচ্ছে তখন বাড়িটা বাজার হয়ে গেল। এত দ্রুত কোনও পরিবর্তন নজরে পড়েনি নীলের। নিজের যাবতীয় সম্পত্তি ভেতরের ঘরে ঢুকিয়ে তাল্লা বন্ধ করে সে হরিহরকে বলল, ‘এখন রওনা হলে বাস পাওয়া যাবে?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।’

প্রধান জিজ্ঞাসা করল, ‘আমাকে আপনারা সঙ্গে যেতে হবে?’

‘বাঃ, বললাম না—সইসাবুদ তো আপনাকেই করতে হবে!’

‘তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, দু-দশটা টাকা যা বাড়িতে আছে নিয়ে আসি।’

নীল বলল, ‘টাকার জন্যে ভাবতে হবে না। এখন পা চালান, দেরি হয়ে গেছে।’

যেতে যেতে নীল একবার পেছনে তাকান। টিলার ওপর বাড়িটি ঘিরে এখন বেশ ভিড়। আসার সময় সে দেখে এসেছে ইতিমধ্যে উৎসাহীরা রঙ জোগাড় করে লেখা শুরু করেছে—পানসায়র মৎস্যভীষী সমবায় সমিতি। ওপাশে সমুদ্র এখন স্থির। এত স্থির যে ভাবতেই পারা যায় না ওইরকম ভয়ঙ্কর হতে পারে। ওপাশে জেলেপাড়া দেখা যাচ্ছে না। সুভদ্রার স্বামীর আঙ্গাই ফিরে আসার কথা।

বাসন্ট্যান্ডে পৌঁছানোর পর দেখা গেল শহর থেকে বাস এখনও আসেনি। ওই বাসই আবার শহরে ফেরত যায়। অতএব যে সময় হাতে পাওয়া গেল কুটি তরকারি খেয়ে নেওয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট। দাম বেশি নয়, নীল সেটা দিয়ে দিতেই বাস এল। কিছু যাত্রী নামল—তাদের মধ্যে পোস্ট অফিসের লোকও রয়েছে। প্রধানকে দেখে লোকটি এগিয়ে এল, ‘আরে মশাই, আপনাদের ওখানে যাচ্ছিলাম! এরকম বদমাইশির কোনও মানে হয়?’

‘কি হয়েছে?’

‘আপনাদের গ্রামের সুভদ্রাদেবীর নামে একটি টেলিগ্রাম এসেছিল মাদ্রাজ থেকে। আমি সেটা দিয়ে এসেছিলাম তার বাবা জনার্দনবাবুর হাতে। ভাল খবর ছিল, জনার্দনবাবুর সমুদ্রে ভেসে যাওয়া জামাই আবার ফিরে এসে টেলিগ্রাম করেছে। আমিও যেন রেডিওতে ওই খবর শুনেছিলাম বলে মনে হয়েছে—’

‘তাহলে?’

‘টেলিগ্রাম করা হয়েছে তালপুরা গ্রাম থেকে, মাদ্রাজ থেকে নয়। তালপুরা এখান থেকে একঘণ্টার পথ। কোথায় মাদ্রাজ আর কোথায় তালপুরা!’

‘সেকি? তালপুরা জে সুভদ্রার শ্বশুরবাড়ির গ্রাম?’

‘ওই দেখুন—ওরাই বদমায়েশি করল কিনা কে জানে! আপনি একটু জনার্দনবাবুকে বলবেন ব্যাপারটা। এতে আমাদের তো কোনও দোষ নেই—ডাকে যা আসবে তা পৌঁছে দেওয়াই আমাদের ডিউটি। কিন্তু ভুলভ্রান্তি চোখে পড়লে তো চূপ করে থাকতে পারি না!’

প্রধান বলল, ‘ঠিক আছে। ক’দিন যাক—জামাই যদি ফিরে না আসে তখন না হয় আপনার কথা বলা যাবে।’

প্রধানের মুখে খটনাটা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল নীলের। টাকা খরচ করে এই গ্রাম্যমানুষরা এমন ইতর রসিকতা করতে পারে? কি লাভ হল লোকটার?

ওরা যখন শহরে পৌঁছাল তখনও অফিস ছুটি হতে একঘণ্টা দেরি আছে। ব্যাঙ্কে ঢুকতে সেই বেয়ারা বাধা দিতে যাচ্ছিল, চিনতে পেরে বলল, ‘চলে যান, ম্যাডাম আছেন।’

নীল ওদের সঙ্গে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, ‘আসতে পারি?’

কনিকা গুপ্তা কাগজপত্র থেকে মুখ তুললেন, ‘আসুন। কি ব্যাপার?’

নীল বলল, ‘আপনি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছেন না। পানসায়র সমবায় সমিতির জন্যে ব্যাঙ্ক-লেনের ব্যাপারে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম—’

‘মনে পড়েছে। সমবায় তৈরি করতে কত দেরি?’

‘ওটা হয়ে গেছে ম্যাডাম।’ হরিহর বলে উঠলেন।

‘তাই নাকি? এত তাড়াতাড়ি—বাঃ!’

‘তাহলে আবেদনপত্র—’

‘পানসায়র সমবায়ের কোন প্যাড আছে?’

‘আছে।’ নীলকে অবাক করে হরিহর বলল।

‘তাহলে সেই প্যাডে আপনারা কত টাকা এখন চাইছেন এবং কিভাবে তা শোধ করবেন তার বিশদ বিবরণ আমাকে দিয়ে যান। যদি অ্যামাউন্টটা আমার এন্ট্রিয়ারে থাকে, তাহলে ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী যা করার তা করতে বলা হবে—নাহলে ওপরওলায় আমি আলোচনা করব। আজকেই দিতে পারবেন?’

‘আজকেই?’

‘হ্যাঁ। আজ রাতের ট্রেনে ভুবনেশ্বর যাচ্ছি আমি, আপনাদের সুবিধে হবে।’

‘অন্তত ঘণ্টাদেড়েক সময় পাওয়া গেলে—’ হরিহর আবেদন করল।

‘আমি সাতটা পর্যন্ত অফিসে আছি। আপনারা তার মধ্যে ঘুরে আসুন।’

বাইরে বেরিয়ে নীল জিজ্ঞাসা করল, 'কি মশাই, জলজ্যাস্ত মিথো কথা এখন গিলবেন কি করে? প্যাড কে দেবে আপনাকে?'

ততক্ষণে ছুটতে আরম্ভ করেছে হরিহর। খানিকটা যাওয়ার পর যে বাড়িটায় সে ঢুকে পড়ল তার ওপর প্রেস শব্দটি লেখা আছে। হরিহর মালিককে বলল, 'জগন্ময়, আড্ড তোমার কাছে একটা উপকার চাইতে এসেছি ভাই।'

'জগন্ময় বলল, 'বলুন, কি করতে পারি?'

'তোমার টাইপরাইটার নিয়ে বসো। আমি আস্তে আস্তে বলছি আর তুমি টাইপ করে যাও। কোর্টে গিয়ে করালো বড় দেরি হয়ে যাবে। এই নাও কাগজ। আপনার মনে নেই নীলবাবু, আপনাকে বলেছিলাম প্যাড ছাপিয়ে নিয়েছি, স্ট্যাম্পও? হ্যাঁ শুরু কর, দু'দি ম্যানেজার—'

নীল লোকটির দিকে অবাক চোখে তাকাল। স্বার্থহীন কাজে এত মনোযোগ কজন দেয়?

এদের কাজ শেষ করতে খানিক সময় লাগবে। নীল হরিহরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ঠিকানাটা দিন তো মশাই। আমি একটি পাক দিয়ে আপনার ওখানে চলে যাব।'

হরিহর বলল, 'যে কোনও রিকশাওয়ালাকে বলবেন মনসাতলায় যাব। সেখানে পৌঁছে এই হরিহর উকিলের নাম বললে যে কেউ চিনিয়ে দেবে। কিন্তু আপনি ব্যাঙ্কে যাবেন না?'

'আপনারা চাইলে আমি থাকতে পারি। এখন তো শুধু অ্যাপ্লিকেশন পৌঁছে দেওয়া!'

'তা ঠিক। আচ্ছা যান, ধুরে আসুন।'

নীল সোজা হাঁটতে হাঁটতে শহরের বাসটার্মিনাসে চলে এল। একটা চায়ের দোকানে ঢুকে চায়ের অর্ডার দিতেই কানে এল দুজন খুব উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। একজন বলল, 'রাতারাতি এস পি-কে ট্রান্সফার করে নতুন লোককে পাঠাল কেন?'

'আগের এস পি একাই খাচ্ছিল, তার ওপরতলাকে দিচ্ছিল না, তাই।'

'তুই সবসময় খারাপটাই দেখিস। এমন হতে পারে, ভুবনেশ্বরে খবর পৌঁছেছে, সেখান থেকে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে! শুনলাম সবাই তটস্থ হয়ে রয়েছে!'

'ভুল শুনেছিস। বড়বাবু যদি শহরে থাকবে ততদিন ওর বাড়িই পুলিশের হেডকোয়ার্টার্স। এখন আবার মেয়েটাও ব্যবসা দেখছে। অতএব এসব দিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল।'

নীল শেষ পর্যন্ত উঠে এল ওদের পাশে, 'কিছু মনে করবেন না দাদা, আপনাদের এই বড়বাবুর বাড়িটা গণ্য। বলবেন?'

আচমকা লোকদুটোর চোখমুখ পালটে গেল। বেদম ভয় পেয়ে গেল ওরা। দুজনেই একসঙ্গে তোতলাতে লাগল, 'না-না—মানে—আম-রা—'

'আপনাদের কোনও ভয় নেই।'

'না, আমরা কিছু জানি না। সত্যি বলছি, মাইরি বলছি।' দুজনে উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রায় পালিয়ে যাওয়ার মতো দোকান ছেড়ে গেল।

দোকানদার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে জানতে চাইল, 'কি ব্যাপারটা হল মশাই?'

'বুঝত পারছি না।' নীল এগিয়ে গেল দোকানদারের কাছে, 'ওরা বড়বাবু আর তার মেয়ের গল্প করছিল—আমি ঠিকানা জানতে চাইলে ওইভাবে পালিয়ে গেল!'

'আপনি কে?'

'আমি? তেমন কেউ না!'

'থাকেন কোথায়?'

'পাননায়রে।'

'বড়বাবুর ঠিকানা নিয়ে কি করবেন?'

'দেখা করব। শুনে মনে হল খুব ক্ষমতাবান লোক। যদি কোনও কাজকর্ম জুটে যায়, বুঝলেন না?'

'আপনি দয়া করে এখনই এই দোকান থেকে বেরিয়ে যান।'

'কেন ভাই?'

'আপনি যে এসব প্রশ্ন করছেন তা বড়বাবু পছন্দ করবেন না। আমি চাই না, আমার দোকানে আপনার জন্যে হামলা হোক।' হাতজোড় করল দোকানদার।

অগত্যা বেরিয়ে এল নীল। সামনে একটা রিকশা দাঁড়িয়েছিল, সেটায় উঠে বসে সোজা চানাতে বলল। কিছুদূর যেতে না যেতেই বেশ দ্রুত একটি জীপকে ছুটে আসতে দেখল নীল। অর্থাৎ দোকানদারের আশঙ্কা ঠিকই। সে রিকশা থামিয়ে ভাড়া মিটিয়ে হাঁটা শুরু করবে বলে একবার ভাবল। কিন্তু মত পালটে সে রিকশাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'মনসাতলা কতদূর হে?'

'এই তো দুমিনিট! সেখানে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

মনসাতলায় পৌঁছে হরিহর উকিলের খোঁজ নেওয়া মাত্র জানা গেল তিনি বাড়িতে নেই।

'কখন ফিরবেন?'

'সে কেউ বলতে পারে না।' এক বৃদ্ধ বললেন।

'আমাকে তিনি আসতে বলেছিলেন—'

'ও তাই নাকি! তাহলে রিকশা ছেড়ে দিন। আসুন, আমার দাওয়ায় বসুন। এই বাবুকে এক ঘটি জল এনে দে আর চা করতে বল।'

'হরিহর উকিল কি এই বাড়িতেই থাকেন?'

'না না, উনি থাকেন ওই বটগাছের পাশের লাল বাড়িটায়। বাড়িতে মাসি আছেন এখন। বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি। তাই এখানেই বসতে বললাম।'

'তার মানে হরিহর উকিলের অতিথি—মানে আপনাদেরও অতিথি?'

'নিশ্চয়ই। এপাড়ার সবাই আপনাকে থাকতে দেবে খেতে দেবে—যদি হরিহর উকিল বাড়িতে না থাকে। লোকটা আমাদের জন্যে প্রাণ লড়িয়ে দেয়, এটুকু করব না?'

আজ সকালে সামান্য শ্বেদ করেছিল বলে এখন লজ্জা হল নীলের। চা এল। চায়ে চুমুক দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা এই শহরের সবাই থাকে বড়বাবু বলে থাকে তাঁর বাড়িটা কোথায় বলুন তো?'

বৃদ্ধ চটপট চারপাশে তাকিয়ে নিলে, 'আপনি বাইরের লোক?'

'হ্যাঁ।'

'এ প্রশ্ন করবেন না।'

'কেন?'

'অনেক প্রশ্নের উত্তর হয় না, এও তেমন। যাঁর কথা বললেন, তাঁর ইচ্ছাতেই এই শহর চলে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর বাড়ি জানা কি জরুরি?'

'একটু। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আমি যা বললাম তা শোনার পরেও ইচ্ছে হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই।' চা শেষ করল নীল।

'রিকশায় উঠে পুরনো পন্টনে যেতে বলবেন। যেতে যেতেই দেখবেন বিশাল গেট, বাগান, প্রাসাদ, গেটে পাহারাদার। চিনতে ভুল হবে না।'

'তাহলে আমি ঘুরে আসি। একটু বাদে হরিহর আর এক ভদ্রলোক আসবেন। তাঁদের বলবেন আমার জন্যে রাত নটার পর অপেক্ষা না করে খাওয়াদাওয়া করে নিতে।'

'ভাল করলেন বলে। ও বাড়িতে আজ রাতে দুজন অতিথি থাকবে—' বৃদ্ধ যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। নীল দেখল চারপাশে সঙ্কর অঙ্ককার ভালই নেমেছে।

পুরনো পন্টন গুলেই রিকশাওয়ালার মাথা নেড়েছিল। মিনিট পনেরো বাদে নীল সেই বাড়িটা দেখতে পেল। গেটখানা পেছাই। লম্বা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। লোহার গেটের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল আলোয় সাজানো রাস্তা দোতলা বাড়ির গায়ে গিয়ে নেমেছে। বাড়ি পেরিয়ে এল রিকশা। নীল ভেবে পাচ্ছিল না ওই পাঁচিল টপকে কিভাবে ভেতরে যাওয়া সম্ভব? গেট পেরিয়ে সবার অলঙ্কার ঢোকা অসম্ভব ব্যাপার। টেলিফোন—টেলিফোন নিশ্চয়ই ওই বাড়িতে আছে। সে রিকশাওয়াকে বাজারের দিকে যেতে বলল।

একটি পি সিও দেখতে পেয়ে সে রিকশাওয়ালাকে দাঁড়াতে বলল। বুথটায় একটি কিশোর কিছু করার নেই বলে বসে আছে। বড়বাবুর বাড়ির গেটের ওপর লেখা ছিল 'সংপতি ভবন।' সে সোজা টেলিফোন অপারেটরকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোকিলা সংপতির টেলিফোন নাম্বার বলতে পারেন?'

কয়েক সেকেন্ড পরে অপারেটর বলল, 'দুঃখিত স্যার, ওই নামে কোনও টেলিফোন নেই। ভবে ওঁর খাবার নাম্বারে ফোন করলে পেতে পারেন।'

'তাই দিন।'

নাম্বার পেয়ে ডায়াল করতেই সামনে বসা কিশোর বলল, 'দুটো হল।'

রিসিভার তুলল যে সে নিশ্চয় কাজের লোক, 'কাকে চাই?'

'কোকিলাকে দিন। হুজুরি দরকার আছে।'

তারপর নীরবতা। তিন মিনিট যখন পার হয়ে গেল কিশোর বলল, 'তিনটে হল।'

তারপরই কোকিলার গলা, 'হ্যালো! ৫ ইঞ্চি দেয়ার?'

'নীল।'

কয়েকটি মুহূর্ত চূপচাপ। তারপর—'আজ রাত এগারোটায়, ভুবনেশ্বরের হোটেল কোনারকে।'

তারপর লাইন কেটে দিল কোকিলা। তিনটে ফোনের দাম মিটিয়ে দিয়ে সোজা বাসস্ট্যাণ্ডে চলে আসতেই নীল দেখল ভুবনেশ্বরের বাস ছাড়ছে। এখান থেকে ট্রেনে ভুবনেশ্বর যাওয়া যায়। বাসে সময় লাগে প্রায় চারঘণ্টা। গাড়িতে তিন সওয়া তিন। কোকিলা ভুবনেশ্বর যাচ্ছে কেন? ভুবনেশ্বর যাওয়া আর অত রাতে সেখানকার হোটেলে যেতে বৃদ্ধা এক ব্যাপার নয়। তার মানে কি ও বাইরে যাচ্ছে? তাই আজ রাতে দেখা না হলে কি সময় পাওয়া যাবে না?

বাস ভুবনেশ্বরে পৌঁছালো। এগারোটো বাজতে দশে। রিকশা নিয়ে হোটেল কোনারকে পৌঁছে নীল বুঝতে পারল এটি পাঁচ না হলেও চারতারা বিশিষ্ট তো বটেই। রিসেপশনের সামনে দিয়ে হেঁটে সোজা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল সে। উপায় নেই—মূল্য খাই হোক না কেন, সময় কাটানোর জন্যে এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।

রেস্টুরেন্টের সেই টেবিলে ও বসল যেখান থেকে রিসেপশনটা দেখা যায়। সামান্য খাবারের অর্ডার দিয়ে নীল অপেক্ষা করতে লাগল। ঠিক এগারোটায় একটা বড় দল ঢুকল হোটলে। কোকিলাকে দেখতে পেল নীল। বোঝাই যাচ্ছিল কোকিলা স্বস্তিতে নেই। কোকিলার পাশে দাঁড়িয়ে যে বৃদ্ধ কথা বলছেন তাঁকে খুব চেনা বলে মনে হচ্ছিল নীলের। রিসেপশনের খাতায় দলের কেউ নইসাবুদ করল। বেয়ারারা মালপত্র নিয়ে বিদায় হতেই কোকিলা আর বৃদ্ধ লিফটের দিকে এগোলেন। বাকি দলটা এবার হোটেলের বাইরে চলে গেল।

ধীরেসুস্থে খাওয়া সারল নীল। এখন রাত সাড়ে এগারোটো। এই সময় এক বয়স্ক দম্পতি হোটলে এলেন। তাঁদের নামধাম খাতায় লেখার পর বেয়ারা যখন মাল তুলে লিফটের দিকে এগোচ্ছে তখন নীল উঠে দাঁড়াল। দ্রুত বিল মিটিয়ে চেঞ্জের জন্যে অপেক্ষা না করে লিফটের সামনে পৌঁছাতেই দরজা খুলে গেল। বৃদ্ধ দম্পতিকে প্রথমে ঢুকতে দিয়ে সে লিফটে ঢুকে বেয়ারার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'কি, আজ দেখছি তোমার কপাল খুব ভাল!'

'হ্যাঁ, সাব।' লোকটি কপালে আঙুল ছোঁয়াল।

'এর আগে তো বিরাট দল এল।'

'বিরাট না সাব। দুজন। চারশ পাঁচ আর চারশ ছয়। চারশ ছয় তো সাহেবের বাঁধা ঘর।'

তিনতলায় বৃদ্ধদম্পতিকে নিয়ে নেমে গেল বেয়ারা। পাঁচতলায় উঠে লিফট থেকে বের হল নীল। কম নাম্বার দুটো জানা গেল কিন্তু ঘর যদি ওলটপালট হয়ে যায়? করিডোরে রাখা টেলিফোন তুলে সে চারশ পাঁচ টিপতেই কোকিলার গলা পেল—না, কোথাও কোনও গোলমাল নেই।

চারতলায় সিঁড়ি ডেডে নেমে এসে সে চারপাশে তাকাল। টুলিতে খাবার নিয়ে বেয়ারা যাচ্ছে। দুটো ঘরের মাঝখানে টুলি দাঁড় করিয়ে দুই দরজায় নক করল লোকটা। প্রথমে যে ঘরটার দরজা খুলল তাকে সেলাম জানিয়ে বলল, 'ডিনার সাব।'

'ওই দরজায় আবার নক কর।'

বেয়ারা দ্বিতীয় দরজায় নক করল। মিনিটখানেক বাদে দরজা খুলল সামান্য। এ দরজায় দাঁড়ানো বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি আমার সঙ্গে ডিনার করবে?'

'আপার একটু দেরি হবে।'

'ও। মেমসাহেবের ঘরে খাবার রেখে এসো। গুড নাইট! মনে রেখো কাল সকাল ছটায় ফ্লাইট, অন্তত সোওয়া পাঁচটায় বেরিয়ে পড়তে হবে।'

‘ঠিক আছে।’

বেয়ারা দুই ঘরে ট্রেণ্ডো টুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলে দরজা বন্ধ হল। টুলি নিয়ে বেয়ারা লিফটের দিকে আসতেই নীল সিঁড়ির ওপারের ধাপে চলে এল। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল কোকিলাকে ওর বাবা বিশ্বাস করছেন না। করছেন না বলেই সাত তাড়াতাড়ি ধ্রুনে করে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিচ্ছেন। কোকিলার মতো অতি স্মার্ট মেয়েও যে বাবার ঝকুম মানতে বাধ্য হয় তিনি সাধারণ মানুষ নন। এই লোকটিকে তার চেনা মনে হচ্ছে, অথচ কিছুতেই মনে করতে পারছে না। ভাগ্যিস রাত হয়েছে এবং এই হোটেলের বাসিন্দারা লিফটেই নামাওঠা করে তাই দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেও তেমন কোনও বিপদে পড়তে হল না নীলকে।

সে যখন চারতলার প্যাসেঞ্জে পা রেখেছে চারশ পাঁচ নম্বরের দিকে এগোবে বলে, ঠিক তখনই দরজা খুলে গেল চারশ ছয় নম্বরের। দ্রুত পিছিয়ে যেতে অঙ্গের জন্যে বৃদ্ধ তাকে দেখতে পেলেন না। চারশ পাঁচ নম্বরের দরজায় নক করলেন ভদ্রলোক। দ্বিতীয়বার নক করার পর দরজা খুললে তিনি ভেতরে ঢুকলেন, ‘কি, এখনও যাওয়া হয়নি?’

কথোপকথন শোনা গেল না আর। নীল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সংলাপ পৌঁছানো সম্ভবও নয়। বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। ‘ওডনাইট’ বলে নিছের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। যতটা সম্ভব দ্রুত জায়গাটা পেরিয়ে নীল চারশ পাঁচ নম্বরের দরজায় পৌঁছাতে পারল যখন কোকিলা সেটা বন্ধ করতে এসেছে।

দরজা বন্ধ করে দুহাতে নীলকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল কোকিলা। তারপর আলো নেভাল। বিশাল ঘরের ব্যানকনির সামনে চলে গেল নীলের হাত ধরে, ‘আমি আশা করিনি তুমি শেষ পর্যন্ত এখানে আসতে পারবে। ও, কী ভাল লাগছে।’

‘তোমার কি হয়েছিল?’

‘তোমার ওখান থেকে ফিরে ঠাণ্ডা লাগায় ইনফ্লুয়েঞ্জা। আর এখন ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে সন্দেহ করছেন। সিমলায় যে হোটেল বানাচ্ছেন তার তদারকিতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আমাকে, নীল, শ্রীজ তুমি সিমলায় চলে এসো।’

‘উনি তোমার বাবা?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওঁকে আমার খুব চেনা মনে হচ্ছে। আর কিছুতেই মনে করতে পারছি না।’

‘বাবা অনেককম ব্যবসা করছেন। কলকাতার পার্ক স্ট্রীট এলাকায় থেকেছেন কিছুকাল—’

‘পার্ক স্ট্রীট?’

নীলের মনে পড়ল এবার। জাহাজে চাকরি করতে যাওয়ার আগে সে যখন বেকার তখন তার এক বন্ধু কাজের খবর নিয়ে এসেছিল—পার্ক হোটেলে গিয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করলে তিনি সেনিৎ এজেসি দেনেন। বন্ধুকে সুপারিশ করেছে তার পরিচিত এক ভদ্রলোক। কিসের এজেসি না জেনেই নীল গিয়েছিল পার্ক হোটেলে। ভদ্রলোকের নাম দীপক সামতানি। চোস্ত হিন্দিতে কথা বলছিলেন। ওকে দেখে বললেন, ‘খুব ভাল পরিচিতি এবং সিকিউরিটি ছাড়া আমি এজেসি দিই না। আই অ্যাম সরি, তোমাকে আমার লাগছে না।’

নীল জিজ্ঞাসা করেছিল, ‘কিসের এজেসি দিচ্ছেন আপনি?’

মিস্টার সামতানি নীলের বন্ধুকে বললেন, ‘তুমি একে এনেছ? তুমিও চলে যাও—তোমাদের দুজনকেই আমার দরকার নেই।’

ওরা হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে খুব রেগেমেগে পার্ক স্ট্রীট থানায় ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়েছিল। পরে বন্ধুর কাছে খবর পায় পুলিশ গিয়ে ওই নামের কাউকে পায়নি। পুলিশ যাওয়ার আগেই সামতানি উধাও হয়ে যায়। আজ নীলের মনে হল, মিস্টার সামতানি আর সংপতি একই মানুষ—কোনও ভুল নেই। এবং এই মানুষটি যে মারাত্মক তার প্রমাণ সে যখন জাহাজ থেকে ফিরে ইলিয়ট রোডে গিয়েছিল সেই খবরও ওঁর কাছে পৌঁছেছে। যাকে শত্রু বলে ভাবেন তার সব খবর উনি রাখতে ভানবাসেন।

নীলকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত চুমু খেয়ে যাচ্ছিল কোকিলা। নীল হেসে বলল, ‘আমাকে উত্তেজিত করো না খুকি, কারণ এখন তার সময় নয়।’

‘কেন নয়?’

‘পাশের ঘরে তোমার বাবা রয়েছেন। পানসায়রের দুজন মানুষকে ওলি করে মেয়ে লরির তলায় যিনি ফেলে দিতে পারেন, তিনি আমাকে পোলে কি করবেন তা কল্পনাও করতে পারছি না।’

‘তুমি কি এগারেটির আগে এই হোটেল চুকেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘তাহলে বাবা তোমার খবর পাবে না।’

‘উনি কি তোমার সঙ্গে সিমলায় যাচ্ছেন?’

‘না। পানসায়রের জেলেরা স্ট্রাইক করেছে, কিছু প্রব্রম হয়েছে। একজন বিদেশী ব্যবসায়ীর সঙ্গে ফল এই নিয়ে আলোচনা হবে ওবা।’

‘কে ভদ্রলোক?’

‘বাবার মাছের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। মিস্টার মরণান।’

রাত দুটো নাগাদ অনেক বোঝানোর পর ছাড়া পেল নীল। হোটেলের পেছনের দরজা নিয়ে যখন সে বাইরে এল তখন রাত্তা সুনসান। একটা পুলিশের জীপ যাচ্ছিল, হাত তুলে তাকে থামিয়ে বলল, ‘এস পি সাহেবের বাংলাতে যাব।’

জীপের পুলিশ অফিসার বিরক্ত হলেন, ‘আপনি কে?’

‘আমি যেই হই না কেন, নিয়ে গেলে পূরস্কৃত হতে পারেন আর না নিয়ে গেলে ‘হুন এস পি আগামীকাল আপনাকে সানপেড করতে পারেন।’ এখন আপনার যা শব্দনা! নির্বিকার গলায় বলল নীল অফিসার কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গাড়ি থেকে নেমে বললেন।

পাহারাদার পুলিশ চেনা জীপ বেশ অনুমতি দিল। এবার রাত অড়েইটে। শেষবারের জেলের তুলে মনে দিতে বললেন অফিসার। ‘আমি বা আপা, ম্যানটি প্রিন্টের মতো পাহারাদারের দরজা এক ‘হুন এস পি খুবক বাইরের ঘরে এসে জানতে চাইলেন ‘কি সম্পার?’

অফিসার স্যানটি করে বললেন ‘সার, বাইরে ছিলেন। হোটেলের দরজা কয়েক মিনিট আগে খুলে দিয়ে থামিয়ে বলেন আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। কারণ আমাকে বলবেন না, খুব তরুরি ধাপের।’

এস পি নীলের দিকে এতকালেন। নীল বলল, ‘তরুরি বলে সব আপনাকেই বলার।’

এস পি ইশারা করতে ওঁরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নীল বলল, ‘এত রাতে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আমি পানসায়র নামে এক ছোট্ট সমুদ্রের কাছে গ্রামে থাকি। সেখানকার জেলোদের কিনে নিয়ে ব্যবসা করতেন মিস্টার সৎপতি বলে শহরের বনী ব্যবসায়ী। বস্ত্রত ওড়িয়ার সমুদ্রকুলের মাছের ব্যবসার অনেকটাই তাঁর নিয়ন্ত্রণে। জেলেরা শোষিত হচ্ছে দেখে আমি তাদের সমবায় গঠন করে ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের জন্যে আবেদন করতে বলি—’

এস পি বাধা দিলেন, ‘এর মধ্যে পুলিশ আনছে কি করে?’

‘আসছে। সমবায় হচ্ছে বুঝতে পেরে ওরা অত্যাচার আরম্ভ করে। ওদের শোফের ওলিতে দুজন জেলে মারা যায়। তাদের ডেডবডি তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওরা। পরে পুলিশ হুসানয় দুটে’ লোকই নাকি টুক-আকসিডেন্টে মারা গেছে।’

‘এর প্রমাণ দিতে পারবেন?’

‘পানসায়রের সমস্ত জেলে তাদের সোফের সামনে এই দুই জেলে’

‘ঠিক আছে। তবে এই খবরটা আগামীকাল সকালে দিনে একই একদ পেরে।’

‘তা পেরে, কিন্তু আমি শুধু এই খবর দিতে আসিনি।’

‘তাহলে?’

‘এইসব জেলোদের সতি খুব অভাব। তাই ওদের কেউ কেউ মিস্টার সৎপতির কাছে নিজেদের বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে। ত্রমশ আমার মনে হয়েছে এই মাছের ব্যবসায় ওর একটা আইওগন যাব সিমলায় হোটেল, ভারতবর্ষ জুড়ে নানান ব্যবসা, তাকে মাছের মৎস্যমে কেন এখানে আসতে হয় প্রতিবছর?’

সোজা হয়ে দাঁড়াল, ‘আপনার নাম?’

‘নীল মুরহেড।’ নীল হাসল, ‘একসময় আমি জাহাজে কাজ করছি। দেখছি কোনও দেশের ফেস্টলাইনের

কাছে পৌঁছে গেলে, সেই দেশের মাধবরা জেলেরা আমাদের স্বাগত জানাত। ওই হত্যাকাণ্ডের পর পানসায়রের জেলেরা ধর্মঘট করেছে। তারা সমঝ চান না হওয়া পর্যন্ত সমুদ্রে যাবে না।'

'ঠিক। একটু আগে খবর পেয়েছি, অন্য জায়গার জেলেরাও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু মিস্টার মুরহেড, কোনও প্রমাণ হাতে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কিছু করার নেই।'

'প্রমাণের সম্ভাবনা আছে স্যার।'

'কি রকম?'

এখানকার হোটেল কোনরকমে মিস্টার সংপত্তি তাঁর মেয়েকে নিয়ে উঠেছেন। সবাই জানে আগামীকাল ভোরের ফ্লাইটে মেয়েকে ফ্রান্সে এনেছেন তিনি। কিন্তু তিনি এসেছেন স্ট্রাইকের জন্য যে সমস্যা হয়েছে তাই নিয়ে মিস্টার মরগ্যানের সঙ্গে আলাপ করতে। আর আমার ধারণা, মিস্টার মরগ্যান ওই হোটеле এসেছেন।'

'আই সি!'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এস পি-র নেতৃত্বে এক বিরাট পুলিশবাহিনী ঘিরে ফেলল হোটেল কোনরকমের চারপাশ। রিসেপশনের খাতা দেখতে চাইলেন এস পি। মিস্টার এস মরগ্যানের নাম সেখানে পাওয়া গেল। তখনই ভদ্রলোককে ডেকে তোলা হল। পুলিশ দেখে হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। কিন্তু তখনও তাঁর পরনে কাঁচের বেরনোর পোশাক। এস পি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলেন আপনি?'

'কোথাও না—ঘুমিয়েছিলাম।'

'আপনার পাসপোর্ট'

মরগ্যান পাসপোর্ট বের করে দিলে এস পি বললেন, 'মিস্টার সংপত্তি বললেন আপনি এতক্ষণ তাঁর ঘরে ছিলেন!'

'সেকি? ওং, হ্যাঁ ছিলাম। আমরা ব্যবসা-সংক্রান্ত আলোচনা করছিলাম।'

'অনেক পুরনো ব্যবসা? উনি এক্সপোর্ট করেন আর আপনি ইম্পোর্ট?'

'হ্যাঁ।'

'মিস্টার মরগ্যান, কথাগুলো টেপ রেকর্ডে ধরা রইল। আসুন।'

চারতলায় চারশ ছয় নম্বর ঘরের দিকে যেতেই মিস্টার সংপত্তি বেরিয়ে এলেন, 'কি ব্যাপার অফিসার? একজন শান্তিপ্রিয় নাগরিককে কোন অধিকারে বিরক্ত করছেন জানতে পারি কি?'

'নিশ্চয়ই। তার আগে আপনার ঘর আমি সার্চ করব।'

'অবশ্যই। করুন। কিন্তু জানেন না বোধহয়, আমার হাত কতটা লম্বা!'

এস পি হাসলেন। সমস্ত ধর চিরুনি তল্লাসি করেও কিছু পাওয়া গেল না।

এস পি-র মুখ ছোট হয়ে আসছিল। এখন ঘড়িতে পাঁচটা বেজে গেছে। মিস্টার সংপত্তি বললেন, 'আমার মেয়ে ভোরের ফ্লাইটে দিল্লি যাচ্ছে। তাকে সী-অফ করতে কি এয়ারপোর্টে যেতে পারি অফিসার?'

এস পি মাথা নাড়লেন। মিস্টার সংপত্তি সামনের ঘরের দরজায় নক করে বললেন, 'মা চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে। বেয়ারারা স্যুটকেস বয়ে নিয়ে নিচে আসতেই মিস্টার সংপত্তি দেখতে পেলেন মিস্টার মরগ্যানকে পুলিশ হেফাজতে। এবং দেখেও তিনি না দেখার ভান করলেন। এস পি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই ভদ্রলোককে আপনি কি চেনেন?'

'কে ইনি?'

'মিস্টার মরগ্যান।'

'তৈমন কোনও উল্লেখযোগ্য নাম বলে মনে হচ্ছে না।'

'উনি নাকি আপনার সঙ্গে ইম্পোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা করেন!'

'ও তাই নাকি? আপনিই মিস্টার মরগ্যান? চিঠিতে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। মনে হচ্ছে আপনি কোনও প্রক্ৰমে পড়েছেন—ইফ ইউ নিড মাই হেল্প—তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হবে। চল মা।'

'মিস্টার মরগ্যান ক্রেইম করছেন এতক্ষণ উনি আপনার ঘরে ছিলেন!'

'আচ্ছা মিথোবাদী তো লোকটা!'

হঠাৎ নীল এগিয়ে গেল কোকিলার সামনে, 'কোকিলা, একটু আগে ঘুম ভাঙিয়ে কোনও লাগেজ কি তোমার বাবা তোমাকে দিয়েছেন?'

কোকিলা নীরবে 'হ্যাঁ' বলল মাথা নেড়ে।

মিস্টার সংপতি চোঁচিয়ে উঠলেন, 'হু ইজ দিস ম্যান?'

নীল বলল, 'লাগেজটা এস পি সাহেবকে দেখিয়ে দাও, ব্লিজ!'

কোকিলা একটা চামড়ার দামী চৌকো ব্যাগ এস পি-র হাতে তুলে দিল।

এস পি ব্যাগটা খুললেন। ভেতরের জিনিস দেখে বললেন, 'কি ব্যাপার মিস্টার সংপতি? আপনার লম্বা হাত এখন একটু একটু করে খাটো হয়ে আসছে, তাই তো? এই তিনজনকেই স্পেশ্যাল লকআপে আলাদা করে রাখবেন। কাউকে কোনও ফেসিলিটি দেবেন না। আমি একটু পরে যাচ্ছি।' পাশে দাঁড়ানো অন্য অফিসারকে বললেন এস পি।

ওরা যখন মিস্টার সংপতির হাতে হাতকড়া পরাচ্ছে তখন নীল এস পি-কে বলল, 'আমি জানি কোকিলা নির্দোষ। আপনাকে অনুরোধ করছি ওকে ছেড়ে দিতে।'

মাথা নাড়লেন এস পি, 'এত বড় ব্যাপারটা আপনার সাহায্য না পেলে আমি ধরতে পারতাম না, অসুত এত তাড়াতাড়ি তো নয়ই। আমি আপনার নাম পুরস্কারের জন্যে সুপারিশ করব। কিন্তু ওই অনুরোধ আমাকে করবেন না। কয়েক লক্ষ টাকার নিষিদ্ধ ড্রাগ ওই ব্যাগে পাওয়া গিয়েছে আর ব্যাগটা ওঁর কাছে ছিল। আদালতে যদি প্রমাণিত হয় উনি নির্দোষ, তাহলে অবশ্যই ছাড়া পাবেন উনি।'

'তাহলে অসুত হাতকড়া পরাবেন না।'

'ঠিক আছে।'

ওদের পুলিশভ্যানে জোঁলা হল। ভ্যানে ওঠার আগে কোকিলা নীলের দিকে তাকাল। নীল মুখ ঘুরিয়ে নিল। এস পি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাকে কোথাও লিফট দিতে হবে?'

'খুব ভাল হয় যদি ভুবনেশ্বর স্টেশনে নামিয়ে দেন।'

স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে এস পি জিজ্ঞাসা করলেন, 'মনে হচ্ছে বাইরে যাচ্ছেন, কবে ফিরছেন আপনি?'

'দেখি।' নীল বলল, 'যাযাবর পাখি বিশাল আকাশে উড়তে উড়তে যখন ক্লান্ত হয় তখন নেমে পড়ে কোনও দ্বীপে, কোনও দেশে। এ যেন সেইরকম'—যেভাবে এসেছিল ওই পানসায়ারে সেইভাবেই চলে যাওয়া, কোনও এক নতুন জায়গার জন্যে।

সূর্য চলে গেলে

[প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৭]

pathagor.net

pathagar.net

দীপাঘিতার কথা

নবকল্লোল পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় খণ্ডে খণ্ডে এই উপন্যাস লেখার সুযোগ হয়েছিল। সেটা লিখতে গিয়ে মনে হয়েছিল বাঙালি জীবনের একেবারে বর্তমান আটপৌরে দিকটা এখনও ঠিক ঠিক পরিবেশিত হয়নি। বাইরের ঘটনা ঘনঘটা নয়, অন্দরমহলের সুখ-অসুখের কথাবার্তা যার সঙ্গে আমরা প্রতিটি মুহূর্তে জড়িয়ে আছি তার একটা নতুন চেহারা দেওয়া হল। দেখা গেল পাঠকদের সেটা খুব পছন্দ হয়েছে। এবং এই কাহিনীর যে মূল চরিত্র, যার নাম দীপাঘিতা, যে বারংবার ভুল করে আর তার মাগুল গোনো তার দেখা তো চোখ মেললেই পাওয়া যায়। এই আখ্যান সেইসব দীপাঘিতাদের জন্যে, যারা এই কাহিনীতে নিজেদের আবিষ্কার করে, যাতে আবার বড় ভুলের পথে পা না বাড়ায়—

তাই শুরুতেই দীপাঘিতা কথা বলছে, দীপার কথা।

সমরেশ মজুমদার

আমাদের বাড়ির কথা একটু বলে নিই।

আমার বাবা সুধীরঞ্জন মুখার্জী কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরি করেন। উনি আয়কর দপ্তরের ইন্সপেক্টর। আমাদের পাশের বাড়ির দেবুকাবু, যার মেয়ে নীপা, তিনিও বাবার সঙ্গে কাজ করতেন। ইন্সপেক্টর ছিলেন। পরীক্ষা দিয়ে পাস করে এখন অফিসার হয়েছেন। বাবা পরীক্ষা দেননি। যুক্তি দেখান অফিসার হলেই অনেক দায়িত্ব নিতে হবে, অনেক ঝুঁকি। তার চেয়ে এই ভাল আছেন, খাওয়া-পরাতে তো কোনও অভাব হচ্ছে না।

বাবার বিলাস একটাই, গান শোনা। যেখান থেকে পেরেছেন রেকর্ড যোগাড় করেছেন। এখন সব টেপ রেকর্ডারের যুগ শুরু হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, টেপের গান বাবার ভাল লাগে না। আমারও। ওই গান শোনার মুহুর্তে বাবাকে অন্যরকম দেখায়। আমাদের সংসার চালান মা। তাঁর কথা শেষ কথা। সকালে বাবাকে দুধ নিয়ে আসা, বাজার করার পর সংসারের কাজ করতে হয় না। ঠিক দশটায় অফিসে পৌঁছান তিনি। পাশের বাড়ির দেবুকাবু বলেন, ‘সুধীরঞ্জন অফিসে গিয়ে কাঁট না দিলে অফিস চালু হয় না।’ দেবুকাবু বের হন এগারোটা নাগাদ।

শোভনকে যে আমার ভাল লেগেছে একথা বাড়িতে বলার সাহস হয়নি আমার। মাকে তো ভয় পেতাম, মাসিকেও। মাসি মায়ের চেয়ে তিন বছরের ছোট। মেসোমশাইকে নিয়ে বিয়ের পরপরই মাসি আলাদা হয়ে গিয়েছিল। বছরখানেক আগে মেসোমশাই আচমকা মারা যান। হৃদরোগ। ওঁদের একমাত্র ছেলে টুটুল সামনের বার হাম্মার সেকেন্ডারি দেবে। মেসোমশাই-এর যেখানে যা পাওনা ছিল সব যোগাড় করে মাসি পোস্ট অফিসে রেখে প্রতি মাসে যা সুদ পান তাতে ওঁদের দিবা চলে যায়। মেসোমশাই মারা যাওয়ার পর থেকে আমাদের বাড়িতে ওঁর আসা-যাওয়া বেড়েছে। ছেলেকে নিয়ে কখনও কখনও তিন রাত থেকে যান। বাইরের লোক দেখে বুঝবে না মাসি এ বাড়ির মেয়ে নয়। থাকা এক জিনিস ছিল কিন্তু মায়ের প্রশ্নে মাসি আমাদের সংসারের অনেক কিছু ওপর কর্তৃত্ব করতে আরম্ভ করেছেন। শেষ যোটা সেটা হল, ‘দিদি, আমার অবস্থা তো দেখতে পাছ। তাও ভাগ্য ভাল ছিল বলে পেট থেকে ছেলে বেরিয়েছিল। সুধীদার যদি ওরকম কিছু হয়ে যায় তাহলে কি বিপদে পড়বে ভেবে দ্যাখো। তাই বলছিলাম কি, মেয়েটার এবার বিয়ে দাও।’

মা মাথা নেড়েছিল, ‘এসব কথা আমি ভাবি না ভেবেছি। ভাবি। কিন্তু ছট করে তো বিয়ে দেওয়া যায় না। পাল্টা ঘরের ভাল ছেলে চাই।’

‘ভাল ছেলে অনেক আছে। এই তো আমার ভাসুরের শালির ছেলে, একেবারে শীরের টুকরো, বাগবাজারে রেস্টুরেন্ট আছে। ওর সঙ্গে বিয়ে দিলে তোমার মেয়ে পায়ের ওপর পা তুলে থাকবে।’ মাসি বলেছিল। ‘রেস্টুরেন্টের মালিক?’

‘ওমা! ও ব্যবসায়ে তো কাঁচা পয়সা। তবে হ্যাঁ, ছেলের ইচ্ছে ব্যবসাতাকে আরও বাড়ানো। এয়ারকন্ডিশন করে চাইনিজ ফুড বিক্রি করবে। ওসব করতে লাখখানেক টাকা লাগবে। এই বাজারে লাখখানেক এমন কিছু বেশি নয়।’

‘ও বাবা! বরপণ নেবে নাকি?’

‘তুমি তো মেয়েকে খাট, ড্রেসিং টেবিল, ফ্রিজ দিতে। দিতে না?’

‘তোর সুধীদার অত টাকা কোথায়?’

‘বাজে বকো না। ইনকাম ট্যাক্সের ইন্সপেক্টরের টাকা নেই?’

‘তুই অ্যান্ডিন লোকটাকে দেখে এই বুঝলি? অসং পথে কোনও রোজগার উনি করবেন না। একেবারে পুরুষ সতীসাবিত্রী।’

‘আহা! তুমি তো এখনই বিয়ে দিচ্ছ না। মেয়ে গ্র্যাঞ্জুয়েট হোক। এখনও দেড় বছর সময় আছে। সুধীদাকে বল এখন থেকে বাড়তি রোজগার করতে।’

‘আমি বললেই যেন শুনবে।’

‘সত্যি দিদি, সুধীদার ওপর তোমার কোনও কন্ট্রোল নেই। ওই যে সুধীদার বন্ধু দেবুদা, তাকিয়ে দেখেছ? জুতো থেকে চশমা পর্যন্ত কি দামী দামী জিনিস পরেন। ওরকম পারফিউম আমি কোনদিন ব্যবহার করতে পাইনি।’ মাসি চোখ ঘুরিয়েছিল, ‘একই চাকরি তো ওরা করে। দেবুদা যদি পারে তাহলে সুধীদা পারবে না কেন?’

কথাগুলো হচ্ছিল এক রবিবার সকালে। বাবা তখন বাজারে গিয়েছে। এ বাড়িতে শোওয়ার ঘর তিনখানা। তাই একটা নিজের ঘর আছে আমার। সেই ঘরে বসেই ওসব সংলাপ গুনতে পাচ্ছিলাম। রাগে শরীর ভুলছিল। কিন্তু কিছু বলা যাবে না। বললেই মা কুফক্ষেত্র করবে।

এইসময় মাসতুতো ভাই টুটুল এল ঘরে। 'গুনতে পাচ্ছ দিদি?'

'আমার কানে কিছু ঢুকছে না।' আমি বই-এর ওপর থেকে চোখ সরালাম না। টুটুল পাশে এসে বসল, 'বাবা মারা যাওয়ার পর মা একেবারে পালটে গেছে। মাঝে মাঝে আমার অসহ্য বলে মনে হয়।'

আমি এবার না তাকিয়ে পারলাম না। টুটুল বলল, 'এসব কথার জবাব তোমার দেওয়া উচিত। এদের পছন্দ করা কোনও ছেলেকে তুমি বিয়ে করো না।'

আমি হেসে ফেললাম। হঠাৎ মনে হল টুটুল আমার চেয়ে সামান্য ছোট হলেও ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যেতে পারে।

বাবা ফিরল একটু বাদেই। ব্যাগ নামিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, 'বাগরে বাপ! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। শোন, আজ ডিম নিয়ে এসেছি। মাছ ছোঁয়া যাচ্ছে না।'

মা কোনও জবাব দিল না। মাসি বলল, 'আমরা আসি বলে আপনার খরচ বোধহয় বেড়ে গেছে সুখীদা।'

বাবা বলল, 'হি হি। এ কি কথা বলছ তুমি? তোমাদের কি আমরা পর বলে ভেবেছি কখনও? তোমাকেও তো বাজার করতে হয়, দাম কিভাবে বাড়ছে তা তোমারও জানা। তা ওর মধ্যেই মানিয়ে চলতে হবে। মাছের বদলে ডিম, পোস্তের বদলে সাদা সর্ষে। একটু চা দিলো।'

বাবা নিজের ঘরে যেতেই বাইরের দরজায় দেবুকাবুর গলা পাওয়া গেল, 'বউঠান আছেন নাকি?'

মা ত্রস্ত হয়ে বেয়ে এলেন, 'আসুন, আসুন। আজ এ-সময়ে?'

দেবুকাবু ঢুকলেন হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে। এই সকালেই তাঁর পরনে ধোপদূরন্ত পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি।

দেবুকাবু বললেন, 'আর বলবেন না বউঠান, মাথা ঠিক ছিল না, একটা ভুল করে ফেলেছি। আমার রান্না করে যে বুড়িটা তাকে তো চেনেন। যে মাছই রাঁধবে সব এক টেস্ট হয়ে যাবে। আজ বাজারে গিয়ে দেখি গঙ্গায় ধরা ইলিশ এসেছে। প্রায় আড়াই কেজি। লোকাল গঙ্গায় এত বড় মাছ আজকাল ওঠে না। আড়াইশো টাকা কেজি বলেছিল, সাড়ে পাঁচশোয় দিয়ে দিল। লোভে পড়ে কিনে ফেললাম। তারপরেই খেয়াল হল এত ভাল মাছটাকে বুড়ি নষ্ট করবে। তা আপনি যদি গতি করেন।'

'আমি কি করব?'

'যা ইচ্ছে। পাখুরি, ঝাল, ঝোল। তিনি চলে যাওয়ার পর তো আর ভাল রান্নার স্বাদ পাই না।' দেবুকাবু বললেন।

'কি কাণ্ড। আমি কি ভাল রাঁধতে পারি? অবশ্য স্বপ্না এখন এখানে আছে। ওর হাতে এসব ভাল খোলে।

'ওহো। উনি এসেছেন বুঝি? তা ওঁকে যে অনুরোধ করব তার জোর তো আমার নেই। আপনি যা ভাল বোঝেন করুন। আমরা বাগবেটিতে চার পিস পেলেই খুশি হব।'

শোভনা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'এ কি বলছেন! আপনি কিছু ভাববেন না, আমি বেলা বারোটায় মধ্যে আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

স্বপ্নামাসি এবার কথা বলল, 'পাঠিয়ে দেওয়ার দরকার কি দিদি, তুমি বরং ওঁকে দুপুরে এখানেই খেতে বলো।'

'না না!' দেবুকাবু প্রতিবাদ করলেন, 'আজ নয়। মেয়ের পরীক্ষা, সে বাড়ি থেকে আজ বের হবে না। আপনি যে খেতে বললেন তার জন্যে ধন্যবাদ।'

স্বপ্নামাসি বলল, 'পরীক্ষা তো কি হয়েছে। আমাদের দীপাষিতারও তো পরীক্ষা। আধঘণ্টার জন্যে আসতে পারবে না?'

দেবুকাবু বললেন, 'আজ থাক। আপনি যদি ক'দিন থাকেন তাহলে পরে হবে। খাওয়া তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

এইসময় বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাদের বাড়ির ভেতরটা পুরোনো ধরনের। মাঝখানে বাঁধানো উঠানের চারপাশে বারান্দা। যে যার ঘর থেকে বারান্দায় এলে বাড়ির ভেতরটা দেখতে পারে। বাবাকে দেখে দেবুকাবু বললেন, 'ওহে সুখী, মাছটাকে দ্যাখো, গঙ্গায় এমন ইলিশ ইদানীং দেখেছ?'

বাবা ইলিশটাকে দেখলেন। সেটা এখন মায়েস হাতে। বাবা বললেন, 'বাঃ, তুমি আবার মাছ ধরাটা শিখলে কবে?'

দেবুকে বললেন, 'ধরাটা শিখতে হয় না, পকেটে টাকা থাকলেই হয়। আড়াইশো করে কেজি চাইছিল। দরদারি করে অনেক কমিয়েছি।'

বাবার চোখ কপালে উঠল, 'সর্বনাশ! তুমি এত দাম দিয়ে মাছ কিনলে?'

'আশ্চর্য! তুমি দাম দাম করছ, জিনিসটা দেখছ না? আর রোজ রোজ তো এই দামের ইলিশ কিনছি না। আসলে দামটা কিছু না, ভাল জিনিস খাওয়ার মেজাজটাই হল আসল। চলি বউঠান।' দেবুকে এগোলেন।

স্বপ্নামাসি বলল, 'একটু চা খেয়ে যাবেন না?'

'চা?' দেবুকে মাথা নাড়লেন, 'আজ থাক।'

স্বপ্নামাসি বলল, 'আমরা যা বলছি সবই আপনি এড়িয়ে যাচ্ছেন।'

'ও তাই নাকি! তাহলে হোক চা। চল সুধী, তোমার ঘরে গিয়ে বসি।'

দেবুকে আবার ফিরলেন। আমি এতক্ষণ সংলাপ শুনছিলাম, এবার এগিয়ে গেলাম, 'আর কেউ চা খাবে না তো?'

স্বপ্নামাসির গলা খুব মিষ্টি শোনাল, 'ওমা, তুই তো একটু আগে চা করলি। তোকে আর খাটতে হবে না, যা পড়তে যা, আমি কবুত্টি দিদি, আঁশ ছাড়িয়ে ভাল করে ধুয়ে মাছটা কেটো। মাছ কাটার পর ধুলে স্বাদ চলে যায়।'

মা বললেন, 'জানি রে বাবা। আমি তো তোর আগে ভ্রমোছি।'

এখন ওঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কাজে। টুটুলকে দেখলাম বাবার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা আর দেবুকের মধ্যে যেনব কথা হয়েছিল তা পরে আমি টুটুলের কাছে শুনতে পেয়েছিলাম।

বাবা বলেছিলেন, 'দেবু, তুমি জানো আমি এসব পছন্দ করি না, তুমি যা ইচ্ছে তোমার বাড়িতে করো, আমার এখানে কেন?'

'আমি কি করেছি সুধী?'

'এই এত দামের মাছ কেনার সামর্থ্য আমার নেই। তুমি যদি শুধু মাইনের টাকায় জীবনযাপন করতে তাহলে তুমিও কিনতে পারতে না। তুমি কিনতে পারছ অথচ আমি পারছি না, আর পাঁচশনের চোখে আঙুল দিয়ে সেটা দেখাবার দরকার কি।'

দেবুকে হেসেছিলেন, 'দ্যাখো সুধী, কথাটা যখন তুললে তখন বলি। আমরা দুজনে একই সঙ্গে চাকরিতে চুকছিলাম। তুমি পরীক্ষা দিলে না, প্রমোশন পেলে না। অনেকেই পরীক্ষা দেয় না। কিন্তু একবার ভেবে দেখেছ তোমাকে কেন ইন্সপেক্টর হওয়া সত্ত্বেও কোনও এনকায়ারি করতে দেওয়া হয় না? পাবলিকের সঙ্গে সম্পর্ক এমন কোনও কাজের দায়িত্ব তোমাকে অনেক বছর দেওয়া হয় না। কারণ তোমার আদর্শ আদর্শ বাতিল। তুমি ভাল বাস করবে অথচ শরীর ভেজাবে না, বেণী তো দূরের কথা। তোমার চারপাশের সবাই বাড়িঘর বানাচ্ছে, জমি কিনছে আর তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে। আরে কথায় আছে না, রোমে যখন থাকবে তখন রোমানদের আচরণ করবে। এই সরল সত্যটা তুমি বুঝবে কবে জানি না।'

'সবার বুদ্ধি তোমার মতো নয় যে বোঝালেই বুঝে যাবে। তুমি সরকারি চাকরি করছ অথচ পার্টির কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছ। তোমরা যারা ঘুষ নাও তাদের তো ওরা কিনে ফেলেছে। ওদের চাকরবাকর তোমরা। নিজের জানো তোমাদের কবে লজ্জা হবে?'

'হবে না। কারণ একসময় যা ছিল অনায়্য এখন তাই ন্যায়। সমাজ, অর্থনীতি এবং জীবনযাত্রার যে পরিবর্তন হয়েছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওইসব ভ্যালুজও বদলে গেছে। এখন ঘুষ দেওয়া বা নেওয়া অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। আমি ঘুষ নিই তা আমার স্ত্রী জানত, এখন মেয়েও জানে। তোমার স্ত্রী অনুমান করেন না? করলেও আমার সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহার করেন? যা মাইনে পাও তাতে এখন যদি তোমার বাইপাস অপারেশন হয় তাহলে পারবে টাকা যোগাড় করতে? টাকার অভাবে ছটফটিয়ে মরবে। আমার হলে কোনও পরোয়া নেই, কলকাতা কেন, দিল্লী-বম্বেতে গিয়েও করিয়ে আনতে পারব। এই সিকিউরিটি আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। আমি সেটার ব্যবস্থা করব না? তোমার আদর্শ আমাকে বাঁচাবে?'

চা নিয়ে বারান্দায় পৌঁছে স্বপ্নামাসি জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কি করছিল?'

টুটল উত্তর দিল, 'মাছ কাটা দেখছি!'

ঘরে ঢুকে স্বপ্নামাসি বলল, 'খুব ভারী ভারী কথা হচ্ছে নাকি?'

দেবুকে বললেন, 'না না। নাও, চা খাও সুখী।'

স্বপ্নামাসি বলল, 'দেখুন চিনি ঠিক হয়েছে নাকি!'

দেবুকে চুমুক দিয়ে বললেন, 'ফাস্ট ক্লাস।'

স্বপ্নামাসি বলল, 'ছেলের বিশেষ ইচ্ছে পাশ করে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়বে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না জামাইবাবু।'

বাবা বললেন, 'না না। ওটা আবার পড়ার বিষয় নাকি! রেস্টুরেন্টের টেবিল পরিষ্কার করার কাজ। ওকে ইকনমিস্ট অনার্স নিতে বল।'

স্বপ্নামাসি বলল, 'পঁচাশি-নব্বই নম্বর না পেলে অনার্স পাবে কি করে! দেখুন না চেষ্টা করে, কোথাও যদি ভর্তি করে দিতে পারেন।'

'আমি কোথায় দেখব? কোনও কলেজে তো আমার জানাশোনা নেই। দীপা প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছে নিজের চেষ্টায়, নম্বরের জোরে।'

'দীপা ভাল মেয়ে, টুটল তো তেমন নয়।'

হঠাৎ দেবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুখী, ধরো, কোনও কলেজে জানাশোনা আছে। ছেলেটা কম নম্বর পেয়েছে কিন্তু তুমি বললে ওর নিয়ে নেবে। এক্ষেত্রে তুমি ওর হয়ে সুপারিশ করবে তো?'

'স্বপ্নামাসি বলল, 'কীরে! কেন করবে না?'

বাবা কোনও কথা বললেন না, মুখ নিচু করে রইলেন।

দেবুকে বললেন, 'না ম্যাডাম, ও করবে না। ওর আদর্শ ওকে সেটা করতে দেবে না। তবে আপনি চিন্তা করেন না, আমার জানাশোনা আছে। রেজাল্ট বের হওয়া মাত্র আমাকে জানান। তবে আমি বলি কি, ওর যখন ইচ্ছে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ার, ওকে তাই পড়তে দিন। কোনও কাজই ছোট নয়। তাছাড়া চাকরিটায় গ্রাম্যার আছে, ভাল করতে পারলে পয়সা আছে।'

বাবা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, দেবুকে আঙুল তুলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন, 'না, কোনও কথা বলবে না তুমি। নিজে যখন সাহায্য করতে পারবে না তখন বাইরে থেকে জ্ঞান দেওয়ার কোনও অধিকার নেই।' চা শেষ করে দেবুকে উঠলেন, 'কদিন আছেন এখানায়?'

'তিন দিন।'

'আসুন না আমার বাড়িতে। মেয়েটা একা থাকে, দেখলে খুশি হবে।'

স্বপ্নামাসি বলেছিল, 'বেশ তো, দিদিকে বলি।'

স্বপ্না

দিদির বিয়ের পর এ বাড়িতে আমি খুব কমই আসতাম। তারপর আমার বিয়ে হয়ে গেল। দিদির বাড়ি উত্তরে, আমার শ্বশুরবাড়ি দক্ষিণে। ফাঁর সঙ্গে বিয়ে হল তাঁকে আমি আগে চিনতাম না। মাথার ওপর শ্বশুর-শাওড়ি ছিলেন। নতুন বউ-এর সঙ্গে বেশি সময় কাটানো বোধহয় তাঁদের পছন্দ ছিল না বলে আমি রাতে বিছানায় ছাড়া স্বামীকে খুব কমই কাছে পেতাম। তিনি অফিস করেন। বাড়ি ফিরে চা খেয়ে তাস খেলতে চলে যান। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় কোথায়! আমাদের হনিমুন হয়নি।

তারপর টুটল এল। আমাকে বাস্তব রাখতে পেরে তিনি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। আমাকে ছেলে মানুষ করতে হয়েছে, সংসার সামলাতে হয়েছে, শ্বশুর-শাওড়ির সেবা করতে হয়েছে। দিদির বাড়িতে আসতাম মাঝে-মাঝে কয়েক ঘণ্টার জন্যে। শ্বশুর গেলেন, মাস ছয়েকের মধ্যে শাওড়িও। কিন্তু স্বামীর জীবনযাত্রা বদলালো না। সত্যি কথা বলতে কি, এত বছর ওঁর সঙ্গে ঘর করেছি কিন্তু যাকে বলে ভালবাসা তা কখনও বাসতে পারিনি। মনেই আসেনি কখনও। উলটে যখন প্রয়োজনের সময় টাকা চাইতে হত তখন লজ্জা লাগত। টাকা দেওয়ার সময় প্রশ্নের জবাব দিতে হত। তাই উনি যখন চলে গেলেন তখন আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েনি। একটা মানুষ চলে গেল অকালে তার জন্যে যে কষ্ট তার বেশি কিছু হয়নি। বরং

ওঁর প্রভিডেন্স ফাউন্ড, গ্র্যাচুয়িটি, ফ্যামিলি পেনশন এবং ইনসুরেন্সের টাকায় আমার পায়ের তলার মাটি অনেক শক্ত হয়েছে। এই কয়েক মাস আগে কুণ্ডু স্পেশ্যালি আমি টুটুলকে নিয়ে হরিদ্বার-দেবদ্বার ঘুরে এলাম। কি ভাল লেগেছিল! যাওয়ার আগে দিদিকে বলেছিলাম যাওয়ার জন্যে, দিদি রাজী হয়নি।

দিদি কেন রাজী হয়নি তা আমি জানি। জামাইবাবু যা মাইনে পান তাতে সব খরচ সামলে বেড়াতে যাওয়ার মতো টাকা হাতে থাকে না। এই ভবলোক অদ্ভুত। কোনও ঝুঁকি নেবেন না। সরকারি চাকরি করেন কিন্তু কো-অপারেটিভ বা প্রভিডেন্স ফাউন্ডে লোন নেই এমনটা বড় দেখা যায় না।

টুটুলের বাবা মারা যাওয়ার পর দিদি প্রায়ই এ বাড়িতে আসতে বলে। আমি দুই-তিন মাস পরপর একবার আসি। রাত কাটিয়ে চলে যাই। এবার তিনদিন থাকব। ঠিক করে রেখেছিলাম, কাল টুটুলকে বাজারে পাঠাব। জানি, দিদি রাগ করবে। কিন্তু এটুকু আমার করা উচিত।

দিদির ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকলেও আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের কাছে হয়তো স্বাভাবিক। দিদির সঙ্গে জামাইবাবুর যে খুব প্রেম আছে তা আমার কোনদিনও মনে হয়নি। জামাইবাবু সং বিবেকবান মানুষ বলে দিদি বিয়ের পর থেকেই ওঁর মুখের ওপর কথা বলত না। আমার স্বামী দিদিকে বলতেন, 'দাদার নাম পালটে রাখা উচিত ছিল সাধুরঞ্জন।' দিদিরও যেন একটু গর্ব ছিল তখন। জামাইবাবু চিরকাল গান শুনতে ভালবাসতেন। প্রচুর ক্যাসেট আছে এ বাড়িতে। দিদি সেসব রেকর্ড এবং ক্যাসেট যত্ন করে পরিষ্কার রাখত। দীপা বড় হওয়ার পর দিদির মধ্যে পরিবর্তন এল। জামাইবাবুর সমালোচনা করার সুযোগ দিদি হাতছাড়া করত না। এই যে আজ বাড়িতে এসে দীপু, দিদির বড় ছেলেকে দেখছি না, তা নিয়ে জামাইবাবুর কোনও মাথাব্যথা নেই। এর মধ্যে রান্নাঘরে বসে দিদি তার দুশ্চিন্তার কথা জানিয়েছে আমাকে। দীপু নাকি এখন পার্টিতে নাম লিখিয়েছে। লোকাল কমিটি থেকে ওকে কয়েকজনের সঙ্গে একরাতের জন্যে কাকদ্বীপে পাঠিয়েছে। এতে দিদির খুব আপত্তি ছিল। পার্টি যারা করে তাদের ভবিষ্যৎ খুব খারাপ। খুনোখুনি তো নিচের মহলে লেগেই আছে। কিন্তু দীপু দিদিকে বুঝিয়েছে যে বেশিদিন নিচের মহলে পড়ে থাকবে না। যাহোক, এখন ওঘরে জামাইবাবু একা বসে টেপ চালিয়েছেন। দেবব্রত বিশ্বাসের গান। দিদির কানে সেই গান একদম ঢুকছে না। দুবার চোঁচিয়ে বলেছে, 'ছেলেমেয়ে পড়ছে, হাঁশ থাকে না কেন?' আমি যে দিদিকে দীপার বিয়ের কথা বললাম তাতে খুব কাজ হয়েছে বলে মনে হল না। কিন্তু হতেই হবে। নইলে বিধবা হওয়ার পর দিদির যে দুর্দশা হবে তা আমি সহ্য করতে পারব না। দিদি-জামাইবাবুর সম্পর্ক এখন পুকুরের তলায় ভাসে থাকা পাকের মতো। প্রেম-ভালবাসা উথলে পড়ছে একথা অদ্ভুত বলবে না।

রান্নাঘর থেকে দিদি ডাকল, 'স্বপ্না, ইলিশটা তুই করবি?'

আমি এগিয়ে গেলাম, 'কি করি বল তো?'

'মনে হচ্ছে প্রচুর তেল বেরুবে। কিছু ভাজা রাবিস আর ভাপা কর আজ। আগে মাহটা কেটে দেখি কত পিস হয়।'

'পিস বেশি হলে ওঁদের দিয়ে দিয়ো।'

'বেশ তো।'

এইসময় দীপু ঘর থেকে বের হল। ওর পরনে শুধু একটা বারমুড়া। দীপু এখন যুবক, এই রকম পোশাকে ওকে দেখে আমার অন্তঃসিক্তি হল। দেখলাম দিদি কিছু বলছে না। আমায় দেখে দীপু বলল, 'বাড়িতে জব্বর খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে নাকি?'

দিদি বলল, 'এই যে এতক্ষণে বাবুর ঘুম ভাঙল। আমি কিন্তু এখন চা করে দিতে পারব না। গ্যাস খালি নেই।'

'দিও না। কার্তিকদার চায়ের দোকান আছে। ওসব বলে আমাকে ভড়কি দিতে পারবে না।' বাঁকা গলায় কথাগুলো বলে বাথরুমে ঢুকে গেল দীপু।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'দিদি, দীপুর কোনও চাকরি-বাকরি হল?'

'হলে তো বাঁচতাম। এতকাল শুনতাম আইবুড়ো মেয়ের বরস বাড়লে বাপ-মায়ের গলায় কাঁটা হয়ে বসে, এখন দেখছি ছেলের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। কবে যে চাকরি পাবে ভগবান জানেন। আর সেটা না পাওয়ায় ধরনধারণ বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে দিনদিন।' দিদির গলায় রাজ্যের তিক্ততা।

টুটুলকে দিয়ে দেবুবাবুর বাড়িতে ইলিশ পাঠানো হয়েছিল টিফিনকারিয়ার করে। দীপা বা দীপু যেতে রাজী হয়নি। ফিরে এসে টুটুল আমাকে বলল, 'মা, মাছ পেয়ে উনি খুব খুশি হয়েছেন। ওঁর মেয়েটাকে

দেখতে ঠিক ডল পুতুলের মতো। বললেন, মাকে নিয়ে বিকেলে এসো। বোলো, চায়ের নেমস্তন্ন করেছি।' কথাগুলো দিদিকে বললাম। দিদি মুখ বেঁকালো, 'রান্না করে দিয়েছিস তাতেই নেমস্তন্ন, খেয়ে যে কি করবে ঈশ্বর জানেন।'

'তুমি যে কি বল।' আমি প্রতিবাদ করতে চাইলাম।

'কেন বলব না? তোর জামাইবাবুর সঙ্গে এত বন্ধুত্ব অথচ বউ মারা যাওয়ার পর একদিনও আমাকে বাড়িতে যেতে বলেনি।'

'ওঁর স্ত্রী মারা গেছেন কদিন, বছর পাঁচেক, তাই না?'

'না না। সাত বছর হয়ে গেল। মরে গেছে, বলা উচিত নয়, কিন্তু খুব অহকারী ছিল বউটা। স্বামীর ঘুষের টাকার গর্বে মাটিতে পা পড়ত না। কিন্তু হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক, হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে শেষ।'

'মেয়েটার খুব কষ্ট।'

'মনে হয় না। দীপার সঙ্গে তো পড়ত। দীপা বলত, ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে না। শুধু শাড়ি-গয়না আর বিষয়সম্পত্তির গল্প করে।'

'অদ্ভুত তো।'

হঠাৎ দিদির গলার স্বর বদলে গেল, 'যেতে বলেছে, একবার ঘুরে আয়, কখন কাকে কোন্ কাজে লাগবে কেউ বলতে পারে না।'

'আমার আবার কোন কাজে লাগবে?'

'আহা, আমি কি তেজি কথা ভেবে বললাম? দেবু ঠাকুরপো ইচ্ছে করলে দীপুর একটা চাকরি করে দিতে পারে।'

দিদির এইরকম কথাবার্তা আমার ভাল লাগেনি। যাকে মনে মনে অপছন্দ করি তাকে হাতে রাখার মধ্যে বার্থপরতা ছাড়া অন্য কিছু নেই।

দুপুরে একটু শুয়েছিলাম। এটা আমার অনেকদিনের অভ্যাস। চমিশে পড়লেও আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের মতো চেহারায় অকেজো হয়ে যায়নি। দুপুরে ঘুমালে মেদ বাড়ে জানি, কিন্তু না শুয়েও পারি না। সে-কারণে বিকেলে হাঁটতে বের হই। আমার বাড়ির কাছে একটা বড় পার্ক আছে। সেটা তিনবার পাক দিলে দুই কিলোমিটার ঘোরা হয়ে যায়। এই হাঁটতে গিয়ে অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সব। শুনেছি ভোরবেলায় যারা হাঁটে তাদের নাকি একটা ক্লাব আছে। আমি অত ভোরে উঠতে পারি না।

সাতটা চারটে নাগাদ দিদি চা দিল। চা খেতে খেতে বললাম, 'ভাবছি কাল চলে যাব। আমাদের পাড়ায় খুব চুরি হচ্ছে, বাড়ি বন্ধ রাখা ঠিক হবে না।'

'সেকি। এই বললি কদিন থাকবি। নাকি ভাবছিস দিদি-জামাইবাবুর ওপর বেশি চাপ দেওয়া হয়ে যাচ্ছে।' দিদি মুখ গভীর করল।

আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। দিদি যা-ই বলুক কথাটা তো মিথ্যে নয়। এই বাজারে কারও বাড়িতে বেশিদিন থাকা উচিত নয়। দিদি বলল, 'যেমন কথা ছিল তেমন থাক। নইলে ভোর জামাইবাবু কষ্ট পাবে।'

কথা ঘোরাবার জন্যে বললাম, 'চল, একটু হেঁটে আসি।'

দিদি আঁতকে উঠল, 'না বাবা, আমি তোমার মতো স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে পারব না। হাঁটতে যা ব্যথা, হেঁটে আরও বাড়াতে চাই না।'

'কিছু আনতে হবে?'

'আসিস। যোগমায়া মিষ্টান্ন ভাঙারে ভাল সিঙ্গাড়া করে। মাথাপিছু একটা নিয়ে আসিস।' দিদি খুশি হল।

হাঁটার সময় আমি পায়ে কেডস পরি। নিজের বাড়িতে শালোয়ার কামিজ। জামাইবাবুর আবার সেটা পছন্দ নয় বলে সঙ্গে আনিনি। রাতে আমি শাড়ি পরে শুতে পারি না। দিদি দরজা বন্ধ করলে শাড়ি ছেড়ে ম্যাক্সি পরি। দিদির মনে যে সে ইচ্ছে হয় তা আমি জানি। কিন্তু বেচারা সাহস পায় না।

একই হাঁটতে বের হলাম। গলি থেকে বেরিয়ে দু'দিকে তাকালাম। যদিকেই যাই ফেরার সময় যোগমায়া হয়ে ফিরতে হবে। বাঁদিকে হাঁটা শুরু করলাম। দুটো বাড়ি যেতেই মনে হল দোতলার ব্যালকনি থেকে কেউ টেঁচিয়ে আমাকে ডাকছে। নাম ধরে নয়, এই যে এই যে করে। মুখ তুলতেই দেবুবাবুকে দেখতে পেলাম। পাশে খুব ফর্সা একটি মেয়ে হার্ট পরে দাঁড়িয়ে। একটু কাছে এগিয়ে যেতে দেবুবাবুর গলা শুনলাম, 'চলে আসুন, ভেতরে আসুন।'

আমি কি জবাব দেব ভাবছি, উনি আবার বললেন, 'হেলেকে বলে দিয়েছিলাম। আমরা তখন থেকে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

ভাবলাম দু-মিনিট কথা বলে আবার বেরিয়ে পড়ব।

দরজা খুলল মেয়েটি, 'আসুন।'

মেয়েটিকে সত্যি ডল পুতুলের মতো দেখতে। বোঝা যায় কোনরকম কষ্ট ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। একেবারে তুলোর মধ্যে রেখেছেন দেবুবাবু।

'তোমার নাম কি?'

'নীপা।'

'তুমি আমাদের দীপার বন্ধু?'

মেয়েটি হাসল, জবাব দিল না।

মেয়েটি দরজা বন্ধ করলে ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেউ এলে তুমি দরজা খোল?'

নীপা মাথা নাড়ল, 'না। আপনি গেস্ট বলে বাবা খুলতে বলল।'

'তুমি কোথায় পড়ছ?'

'বেথুনে। সেকেন্ড ইয়ার।'

দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন দেবুবাবু। দু'হাত দু-পাশে ছড়িয়ে আহ্বান করলেন, 'আসুন, আসুন। গরিবের বাড়িতে পুষের ধুলো দিলেন বলে অনেক ধন্যবাদ। ওরা কেউ সঙ্গে আসেনি?'

'না। আমি হাঁটতে ঝিরিয়েছিলাম।'

'ভাই নাকি? আপনি রেগুলার হাঁটেন বুঝি! শুভ, শুভ। বসুন।'

তাকিয়ে দেখলাম চারপাশে বৈভব ছড়ানো। দামী দিশি আসবাবের সঙ্গে বিদেশীও আছে। বললাম, 'ওকে দরজা খোলার কষ্ট দিলেন কেন?'

'বাঃ, অতিথিকে সম্মান জানাবে না? এসব তো শেখা উচিত।'

এইসময় টেলিফোন বাজল। নীপা এগোচ্ছিল কিন্তু দেবুবাবু তাকে বাধা দিলেন, 'নো। আমি ধরছি।' দ্রুত এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে বললেন, 'ইয়েস, কাকে চাই? কে বলছে? তোমার নাম তো আগে কখনও শুনিনি। অ। ধরো।' রিসিভারের মুখে হাত চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মামণি, পদ্মবী নামের কাউকে চেনো তুমি?' নীপা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'কিভাবে চেনো?'

'আমার সঙ্গে পড়ে।'

'কথা বল।' রিসিভার টেবিলে রেখে ফিরে এলেন দেবুবাবু। নীপা গিয়ে কথা শুরু করল। দেবুবাবু সামনের সোফায় বসে বললেন, 'আর বলবেন না, এখন রোজ যত বাজে ফোন আসছে। মেয়ে বড় হওয়ামাত্র এই আরম্ভ হয়েছে।'

'কিন্তু প্রথমে তো মেয়ের গলা পেয়েছিলেন।' আমি হাসলাম।

'ও, তাও জানেন না। বদমাইসি করে কোনও মেয়েকে দিয়ে ফোন করায়। নীপা রিসিভার নিলে তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেন। আমাকে এইসব জেরা মেয়ের নিরাপত্তার জন্যে করতে হয়। ওর মা বেঁচে থাকলে এসব করতে হত না।' দেবুবাবু হাসলেন, 'যাক গে, প্রথমেই ধন্যবাদ দিই।' ইলিশ মাছ ব্রিলিয়ান্ট হয়েছিল। খেতে খেতে মায়ের রান্নার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমার স্ত্রী ছিলেন ওয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড কুক অফ দি ওয়ার্ল্ড। আজ অনেকদিন পরে খুব তৃপ্তি করে খেয়েছি। হ্যাঁ, পরে একটা কথা খেয়াল হল।'

'কি কথা?'

'আপনাকে তো রীধতে বলে এলাম, আপনি নিজে যদি না খান তাহলে খুব অন্যায হয়ে গিয়েছে। আপনি কি নিরামিষাশী?'

আমি হাসলাম। 'একদম নয়। স্বামী মারা যাওয়ার পর অবশ্য খেতে চাইনি। যে খেতে ভালবাসত সে-ই তো চলে গেল। তখন টুটুল বলল আমি না খেলে ও থাকবে না। একটা বাচ্চা হলে মাছ-মাংস-ডিম না খেয়ে থাকবে ভাবা যায়! তাই!—'

'ঠিক করেছেন। এই দেখুন আমার স্ত্রী মারা গেলেন, আমি তো সেই নিয়মভঙ্গের দিন থেকেই এসব চালাচ্ছি। আগেকার ওসব নিয়ম এখন চলে না। তাহলে তো সতীদাহপ্রথা চালু করতে হয়।'

‘ঠিক। ছেলের শেষ অবশ্যই অস্ত্রলিখিত্র তাহলে মাস্ট।’

‘ভাবুন তো, আমি মরিনি অথচ মরব তাই নদীর ধারে গিয়ে দিনের পর দিন পড়ে আছি! হরিবল!’

আগে থেকেই হুকুম দেওয়া ছিল। চারজনের দামী খাবারের সঙ্গে চা এল। আমি তাঁকে উঠলাম। জোরজারিতে কিছু মুখে তুলতে হল। হঠাৎ দেবুবাবু নিচু গলায় বললেন, ‘এতক্ষণ কি কথা বলছে বলুন তো!’

মুখ তুলে দেখতে পেলাম নীপা তখনও হেসে কথা বলে যাচ্ছে। দেবুবাবু গলা তুললেন, ‘নো নো, জরুরি ফোন আসতে পারে। টেলিফোন হল ইমার্জেন্সির জন্যে। কথা শেষ করো।’

দেখলাম নীপা চট করে রিসিভার নামিয়ে রেখে একটু এগিয়ে এসে বলল, ‘বাবা, আমি এখন পড়তে যেতে পারি?’

‘যাবে? বেশ যাও।’

নীপা চলে গেলে দেবুবাবু কাঁধ ঝাঁকালেন, ‘এভাবে সামলাতে হচ্ছে!’

‘আপনার কোনও আশ্রয় নেই?’

‘না, কেউ নেই। ওই মেয়ে ছাড়া আমি একা। আবার অনেক কথা তো মোয়েকেও বলা যায় না। আমার এই একাকীত্ব কেউ বুঝবে না।’

আমি হাসলাম, ‘আপনি আমার কথা ভুলে যাচ্ছেন দেবুবাবু।’

‘দেবুবাবু! একি। এত বিদ্রোহী শোনাচ্ছে! আপনি আমাকে দেবুদা বলবেন। বাবু বললে বহুৎ দূরের মানুষ হয়ে যায়। হ্যাঁ, আপনারও তো একই সমস্যা। বউঠান বলেছিলেন শ্বশুর-শাশুড়িও জীবিত নেই। তাই না?’

‘হ্যাঁ। আপনার চেয়ে আমি অনেক ছোট, আমাকে ভূমি বলবেন।’

‘তা তো বটেই, তা তো বটেই। আমি এই শীতে বাহাম হব।’

‘আপনি আমার চেয়ে দশ বছরের বড়।’

‘মাত্র?’ খুব অবাক হলেন দেবুদা, ‘দেখে মনে হয় না তো। ওই হাঁটাহাটি করেন বলে ফিগার ঠিক রেখেছেন।’

‘আমি এবার উঠি?’

‘উঠবেন? এত তাড়াতাড়ি?’

‘বাঃ, অনেকক্ষণ এসেছি তো!’

‘আপনার কাছে অনেকক্ষণ, আমার কাছে তো দেখতে দেখতে সময়টা কেটে গেল। আপনি এলেন বলে অনেকদিন বাদে গুন খুলে কথা বললাম। আনন্দ হচ্ছে। এই যে আমি এত রোজগার করি, ঠাকুরের দয়াতে কোনও অভাব নেই আমার, কিন্তু কি হবে টাকাতে, অ্যা? টাকা সুখ দেয়? নেভার।’

আমার হঠাৎ বদ মতলব এল। বললাম, ‘আপনি জামাইবাবুকে একটু শিখিয়ে দিন না যাতে রোজগার বাড়াতে পারে।’

‘যে জেগে থেকে ঘুমিয়ে থাকে তার ঘুম কে ভাঙবে বলা। এই দ্যাখো, ভূমি বলে ফেললাম। তোমার জামাইবাবুকে দিয়ে কিছু হবে না। বাড়িতে বউ থাকতে কেউ মিশনে যায়?’

‘কেন? এই বয়সে বউ-এর সঙ্গে গল্প করবে?’

‘আলবৎ করবে। বেড়াতে যাবে, সিনেমায় যাবে। গঙ্গায় নৌকো ভাড়া করে ঘুরবে, দু’দিন ছুটি পেলে চাঁদপুর বেড়াতে যাবে। গেছ?’

‘আমি? নাঃ!’

‘তবে! সমুদ্র এই পারের নিচে আবার ওই দুই মাইল দূরে। একা হয়ে যাওয়ার পর আমার সব বন্ধ হয়ে গেছে।’

‘আমি ঠিক করেছি কুণ্ডু স্পেশ্যালি দক্ষিণ ভারতে যাব।’

‘হোয়াই কুণ্ডু? আমার এক ক্লায়েন্ট আছে, এইসব করে, তাকে বলে ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট করিয়ে দেব। ভূমি আর ছেলে?’

‘হ্যাঁ। ডিসকাউন্ট পেলে তো খুব ভাল হয়।’

‘ওদের ছুটির সময় গেলে আমিও যেতে পারি। অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয় না। আমি সঙ্গে গেলে আপত্তি নেই তো?’

‘আপত্তি হবে কেন? দিদি-জামাইবাবুকেও বলি—।’

‘তাহলেই হয়েছে। বলবে, সংসারই চালাতে পারি না, বেড়াতে যাবো কি করে? আমি সাহায্য করতে চাইলে নেবে না। মুশকিল।’

আমি উঠে দাঁড়ালাম, ‘মেয়ের বিয়ে কবে দেবেন?’

‘দিতে তো হবেই। কিন্তু দিলেই একা হয়ে যাব যে। আমি অবশ্য খরচ করতে কার্পণ্য করব না। ওর বিয়ে বাবদ সাত লাখ টাকা আলাদা সরিয়ে রেখেছি অনেকদিন। হে হে। কিন্তু তারপর?’ মাথা দোললেন দেবুদা।

‘আবার সংসার করুন।’

‘এসেছিল। প্রচুর সম্বন্ধ এসেছিল। তোমাকে বলব কি স্বপ্না, বাইশ-ভেইশ বছরের মেয়ের বাপও রাহী ছিল। কিন্তু মুশকিল হল এই ব্যসে মনের মিল না হলে বিয়ে করা বোকামি হবে। অল্পবয়সী মেয়ে এলে ভাববে কবে আমি ছবি হয়ে যাব আর সে সব দখল করবে। আর বেশিবয়েসী মেয়ে হয় বিবাহিতা নয় কোনও কারণে বিয়ে করেনি। বিবাহিতারা তো আমাকে বিয়ে করবে না, অবিবাহিতা মহিলার বয়স হয়ে গেলে কাঠখোটা হয়ে যায়, বুঝলে?’

‘কেন? ডিভোর্সী মেয়ের বিজ্ঞাপন জেঁ কাগজে দেখতে পাই।’

‘ডেপ্‌য়ারস। যে মেয়ে একবার আইন-আদালত ঘুরে এসেছে তাকে আমি খুব ভয় পাই স্বপ্না। এটা শুনে তুমি আবার কিছু মনে করো না।’

দেবুদা আমাকে নিয়ে নিচে নামলেন। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে আমায় দিলেন, ‘এতে বাড়ি আর অফিস দু-জায়গার ফোন আছে। তোমার মনে ইচ্ছে জাগলেই ফোন করো, অ্যাঁ।’

‘ঠিক আছে।’

‘আমি তোমার ফোন নাম্বার জ্ঞানতে চাইছি না।’

‘আমার তো ফোন নেই।’

‘ও। চল, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।’

‘না, না। তার দরকার নেই। আমি যেতে পারব।’

‘তুমি কিন্তু আমাকে একবারও দেবুদা বললে না!’

‘দেবুদা বললে আপনাকে দাদা হিসেবে ভাবতে হয়। সেটা ভাবা যায় কিনা আগে ভেবে দেখি।’ হেসে আমি চলে এসেছিলাম। পরে মনে হয়েছিল এই রসিকতা না করলেই হত। দিদিকে কিছু বলিনি। কিন্তু সে রাতে আমার কোনও টেনশন ছিল না। দেবুবাবু মানুষ হিসেবে মোটেই মন্দ না।

সুধীরঞ্জন

অনেকেই বলে, আমার নাকি কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে থাকি। কথটা সহকর্মীদের মুখে প্রায়ই শুনতে পেতাম। ইদানীং তারা আর এ বিষয়ে কিছু বলে না। আমি যে সরকারি দপ্তরে চাকরি করি সেখানে সবাই মাইনের জন্যে কাজ করে না। মাইনের বাইরে যে অর্থের লোভ তা বিপুল। আমি যখন প্রথম চাকরিতে যোগ দিই তখনও ওই লোভ ছিল তবে আজকের মতো নয়। সেসময় টাকা তারাই নিত যারা কাজ জানতো। ডিপার্টমেন্টের ক্ষতি না করে তারা ক্লায়েন্টকে রাস্তা বলে দিত কি করলে বেশি রিলিফ পাওয়া যায়। এই উপকারের বিনিময়ে তারা টাকা নিত। অফিসাররাও চোখ-কান বুজে ক্লায়েন্টের টাইপ করে আনা অর্ডারে সই করত না। তারা শ্যাম এবং কুল দুই রাখতো। কিন্তু পরের দিকে এসব ব্যাপার উঠে গেল। গতকাল চাকরিতে জন্মেন করেছে এমন ছেলে আজ পার্টির সামনে হাত পেতে বলে, ‘আমরা কিছু পেয়ে থাকি।’

দেবু আর আমি একই সঙ্গে চাকরিতে জন্মেন করি। আমার কাছে মনে হয়েছিল সহকর্মীরা ঘুষ নয় বখশিশ নিচ্ছে। ঘুষ নেওয়াটা যদি বড় ধরনের অপরাধ হয় তাহলে বখশিশ নেওয়াটার মধ্যে সম্মানের কোনও চিহ্ন নেই। আমি এই ব্যাপারটাকে সমর্থন করতাম না। দেবুও প্রথমদিকে আমার সঙ্গে একমত ছিল। তারপর দেবু বদলে গেল। ও ভাল কাজ শিখল, আইনের ফাঁক জেনে নিল। তারপর দু-হাতে বেআইনি

রোজগার আরম্ভ করল। এই সময় থেকে তার সঙ্গে বিবাদ শুরু হল আমার। আমাদের বন্ধুত্ব আমার দিক থেকে জ্বলো হয়ে গেল। সে কিন্তু মাঝে মাঝেই আসে, তার এই আসাটাকে আমি পছন্দ করি না জ্বেনেও আসে। আমার পরিবারে লোভ ঢুকিয়ে দিয়ে যায়।

আমি খুব বা বখশিশ নিচ্ছি না বলে সহকর্মীদের খুব অসুবিধে হতে লাগল। তারা আমাকে বিরক্ত করত। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই বলে ব্যস্ত করত। পরীক্ষা দিয়ে অফিসার হলে আমি শান্তিতে থাকতে পারতাম না। আমার অর্ডারের বিরুদ্ধে এত অ্যাপিল হত যে ওপরওয়ালার আমাকে নির্ঘাত অযোগ্য মনে করতেন। তাই পরীক্ষা দিইনি আমি। ফলে মাইনের বাইরে একটা অতিরিক্ত পয়সাও রোজগার নেই আমার। এই টাকায় খেয়ে-পরে ভদ্রভাবে থাকা যায়। কিন্তু তাতে বিলাসিতা করা যায় না। দেবু অত টাকা দামের ইলিশ কিনে বাড়িতে দিয়ে গেল, এটা আমার পক্ষে কেনা অসম্ভব। কিন্তু আমি কি করতে পারি? কোনও কোনও মানুষ স্রোতের বিপরীতে সাঁতরায়। আমিও হয়তো সেইরকমের মানুষ। আমি চেয়েছি আমার ছেলেমেয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচুক। দীপাঘিটার মধ্যে আমি সেই চেষ্টা দেখেছি কিন্তু আমার আক্ষেপ দীপুকে নিয়ে।

সাধারণত রাত দশটায় আমরা খেতে বসি। চেয়ারে বসে জানতে পারলাম দীপু বাড়িতে আছে। খুব অবাক হলাম। এসময় সে কখনও বাড়িতে থাকে না। আমি শুয়ে পড়ার অনেক পরে সে ফেরে। তার মা তাকে প্রশ্ন দেয়। আজ শোভনা তাকে খেতে ডাকতে বুঝলাম বাড়িতে আছে।

দীপু আজ বাইরে যায়নি তার দুটো কারণ হতে পারে। এক, ওর শরীর খারাপ। দুই, বাইরে নিশ্চয়ই কিছু খামেলা হয়েছে তাই বাড়িতে থাকাই সুবিধে মনে করেছে। এই দ্বিতীয় ব্যাপারটা আমার উদ্বেগ বাড়াবে।

দীপা, স্বপ্না, টুটল আর আমি বসেছিলাম। আজকের মেনু রুটি আর আলুর দম। শোভনা এই তরকারিটা চমৎকার করে। দীপুর খাবার নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনও আসেনি সে।

শোভনা বলল, 'দেবু ঠাকুরপোর সঙ্গে ঝগড়া করোনি তো।'

'নাঃ। কেন?'

'তোমার যা মাথা গরম।'

'মাথা আমার ঠিকই আছে।'

'স্বপ্নার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে।'

এই ব্যাপারটা আমি বুঝি না। স্বপ্না গিয়েছে বলে শোভনা খুশি হয়নি বলে আমার মনে হয়েছিল। এখন এমনভাবে কথা বলছে যেন কিছুই মনে করেনি সে। দীপু এল। খালি গা। চেয়ার টেনে বসে বলল, 'আজ আর কিছু করোনি?'

'না। দুপুরে ইলিশ খেয়েছি, রাত্রে হালকা খা।'

'এমন করে বলছ যেন দুপুরে ইলিশ না খেলে তুমি ভারী কিছু করতে। রোজ রোজ এসব খাওয়া যায়?'

স্বপ্না বলল, 'আলুর দম খুব ভাল হয়েছে দীপু।'

দীপু অনিচ্ছায় রুটি ছিঁড়তে লাগল। সেটা দেখে আমি বললাম, 'জিনিসপত্রের দাম কত বেড়েছে খবর রাখিস?'

'তোমাদের মাইনেও বেড়েছে।'

'যা বেড়েছে তার অনেকগুণ দাম বেড়েছে।'

'তোমার সঙ্গে যারা কাজ করে তাদের এই সমস্যা হয় না।'

'কেন হয় না তা জানিস না?'

'জানি। হাজারটা অসতীর মধ্যে একজন যদি সতী হয়ে থাকে তাহলে তার সতীত্বের কোনও মূল্য থাকে না।'

'আশ্চর্য! তুই আমাকে চুরি করতে বলাছিস?'

'আমি কিছুই বলছি না। তোমার উচিত আমাদের ভালমন্দ খাওয়ানো। তোমার সঙ্গে যারা কাজ করে তারা যদি সেটা পারে তাহলে তুমি পারবে না কেন?' দীপু বাঁকা গলায় বলল, 'যুধিষ্ঠিরও অর্ধসত্য বলেছিল।'

স্বপ্না কথা ঘোরাতে চাইল, 'বুঝলি দীপু, তোর যখন চাকরি হয়ে যাবে তখন এই সমস্যা থাকবে না।'

'চাকরি? আমাকে চাকরি কে দেবে?' দীপু হাসল।

‘কেন?’

‘আমার কোনও সলিড মামা আছে? নেই। বাবার ফ্যামিলিতে দ্যাখো, একজন ইনফুয়েন্সিয়াল লোক পাবে না যে পজিশন হোল্ড করছে। এমন ওয়ার্থলেস ফ্যামিলি আমি কোথাও দেখিনি। আমার বন্ধুদের আত্মীয়দের মধ্যে কেউ ভজ, কেউ আই এ এস, কেউ বড় ব্যবসায়ী। আমার কেউ নেই। আর আজকাল ওরকম কেউ না থাকলে চাকরি করার স্বপ্ন না দেখাই ভাল।’

‘তাহলে কি করবি? ব্যবসা?’

‘অসম্ভব। টাকা কোথায়? আমি যদি ছাত্র হিসেবে ব্রিলিয়ান্ট হতাম তাহলে চাকরি পেতাম। আমি নই। কারণ আমার পেডিগ্রি আমাকে ব্রিলিয়ান্ট হতে দেয়নি। আমি ব্যবসায়ী হব না কারণ বাবার ভ্রমো টাকা নেই। অডএব এই খেতে হবে আমাকে।’

আমি ওনছিলাম। রাগে ব্রহ্মাতানু ছলছিল, ‘তুই বংশ তুলে কথা বললি?’

‘অন্যায় বলিনি। তোমার বংশে একজন ডক্টরেট আছে? নেই।’

‘তাহলে তোর বোম কি করে প্রেসিডেন্সিতে পড়ছে?’

‘ওটা অ্যাকসিডেন্ট। বুঝলে মাসি, আমি বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাঁচতে হলে আমাকে রাজনীতি করতে হবে। বুদ্ধি আর শিক্ষা থাকলে এই লাইনে সাইন করা সোজা। প্রথমে পাড়ার নেতা, তারপর জেলার নেতা—বাস, তারপর সামনে খোলা মাঠ। একবার এম-এল-এ হয়ে গেলে আই-এ-এস-রা স্যার স্যার বলে তোয়াজ করবে। তখন টাকা আমার পেছনে দৌড়াবে, আমাকে কিছু করতে হবে না।’

‘আর মন্ত্রী হতে যদি সাঁ পারিস?’ স্বপ্না জিঞ্জেস করল অথাক হয়ে।

‘কোনও অসুবিধে নেই। ওপরতলায় উঠলেই মন্ত্রী যে হবে সে নির্ভর করবে আমার ওপর। তখন নো রিস্ক ফুল গেইন। এ দেশের পাবলিকের হাজারটা সমস্যা। তারা সেই সমস্যার সমাধানের জন্য এলেই পয়সা। বুঝলে, নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন পলিটিস অ্যান্ড ওয়ার।’ দীপুর কথা শেষ হতেই আমার মনে হল বমি হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাতে সামলাতে দেখলাম দীপু উঠে যাচ্ছে।

ঘুম আসছিল না। দীপুর মুখটা আমার কাছে ভয়ঙ্কর লাগছিল। সংসারের সব কাজ সেরে শোভনা এল শুতে। ওকে ভগবান খুব কৃপা করেন। বিছানায় শরীর রাখা মাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ শোভনা নিচু গলায় বলল, ‘তুমি অত উত্তেজিত হয়ে গেলে কেন?’

‘কি বলল তুমি শোননি?’

‘ওনেছি। ও কিন্তু খুব একটা মিথো বলেনি।’

‘তার মানে?’

‘দ্যাখো, আমাদের বংশে তো কোনও নামী মানুষ নেই যে ওকে চাকরি দিতে পারে। তুমিও তো কোনও ক্লায়েন্টকে বলবে না ছেলের চাকরির জন্যে।’

‘কিন্তু তাই বলে বাবার মুখের সামনে বসে ওইসব কথা বলবে?’

‘এটা এম্‌গের ধর্ম। ডাছাড়া ভাবো, ও তো ভুল পথে নাও যেতে পারে।’

‘ভুল পথ নয়? রাজনীতি যারা করে তাদের চরিত্র কি তা রোজ খবরের কাগজে দেখতে পাও না?’

‘তবু মানুষ তো তাদেরই ভোট দেয়। সামান্যসামানি জয়ধ্বনি দেয়। তুমি ভাবো, দীপু মন্ত্রী হয়েছে, তুমি মন্ত্রীর বাবা, তোমার ভাল লাগবে না?’

আমি কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ওকে কি করে বোঝাবো দেবুর সঙ্গে বেশির ভাগ মন্ত্রীর কোনও পার্থক্য নেই!

শোভনার কথা

বিছানায় শুলে একঘুমে রাত কাবার হয়ে যায় আমার, কিন্তু কাল হয়নি। না, দীপুকে নিয়ে দুশ্চিন্তা নয়, ও ছেলে যাহোক নিজের ব্যবস্থা করে নেবে। আমার ভয় হচ্ছিল স্বপ্নকে নিয়ে। ও বিয়ের আগে, পরে এবং বিধবা হয়ে এতবার এ বাড়িতে এসেছে কিন্তু কখনও দেবু ঠাকুরপোর সঙ্গে তেমনভাবে কথাবার্তা বলেনি।

তেমন সুযোগও হয়নি। এবার হল এবং যেচে, অবশ্য ওঁর বাড়িতে হয়নি। সেটা না-হয় ভদ্রতা কিন্তু ফিরে আসার পর ও যেন বারংবার আনমনা হয়ে যাচ্ছিল। আমার ভয়ের কারণ এইটে। দেবু ঠাকুরপো বিপত্তীক, প্রচুর টাকা, অসংপথে পাওয়া টাকা। অবশ্য এখন এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না একমাত্র আমার স্বামী ছাড়া। কিন্তু দেবু ঠাকুরপোর সঙ্গে স্বপ্নার যদি কোনো সম্পর্ক ভেরি হয় তাহলে টুটুলের কি হবে? দেবু ঠাকুরপোরও তো মেয়ে আছে। এই বয়সে এসব হওয়া কি ঠিক? স্বপ্না আমার চেয়ে খুব ছোট নয়। কই, আমার মনে তো প্রেমভাব আসে না! মনে হচ্ছিল, স্বপ্না যদি কিছু করে তাহলে আমারই বদনাম হবে।

সকালবেলায় দীপা চৈতিয়ে বলল, 'মা, লেটারবক্সে চিঠি এসে পড়ে আছে কেউ দ্যাখোনি?' যেন আমারই দায়িত্ব সব দেখার।

স্বপ্না বলল, 'যা চিঠিটা নিয়ে আয়। দিদি, আজ দুপুরে চলে যাব।'

আমি জবাব দিলাম না। আগে হলে থাকতে বলতাম, আজ বললাম না।

দীপা চিঠি নিয়ে এল, 'বাবার চিঠি।'

আমি কাজ করছিলাম, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কে লিখেছে?'

দীপা খামটার কোনায় চোখ রাখল, 'মিসেস এস রায়।'

'সে আবার কে?' স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল।

মাথা নাড়লাম, 'আমি চিনি না।' তোর বাবা বাজার থেকে আসুক।'

দীপা বলল, 'কুচবিহারের সিলমোহর।'

স্বপ্না বলল, 'জামাইবুঁবুর ছোটবেলা কুচবিহারে কেটেছিল না?'

আমি জবাব দিলাম না। মিসেস এস রায় কে? আমাদের কোনও আত্মীয়ের পদবী রায় বলে শুনিনি।

তিনি বাজার থেকে ফিরলে দীপা চিঠিটা দিল। চিঠিটা বের করে বললেন, 'সন্ধ্যারানী রায়। চিনতে পারছি না তো?'

স্বপ্না বলল, 'সেকি! আপনি চেনেন না?'

উনি চিঠিটা পড়তে পড়তে হাসলেন, 'সোনা। সোনা লিখেছে।'

'কে সোনা?' না জিজ্ঞাসা করে পারলাম না।

'কুচবিহারে আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত। আমি যখন টেনে ও তখন সিন্ধে। অঙ্ক কষতে আসতো। আমি স্কুল ফাইনালের পর চলে আসি। আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। ওর বিয়ে হয়েছিল, বছর তিনেক আগে স্বামী মারা গিয়েছে। মেয়ে বি এ পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু বেচারার হাটের সমস্যা হয়েছে। কলকাতায় আসছে ডাক্তার দেখাতে। অনেক কষ্টে আমার ঠিকানা যোগাড় করে লিখেছে দু-একদিন যদি আমার এখানে থেকে কোথাও উঠে যেতে পারে তাহলে আপত্তি আছে কিনা।'

'কবে আসবে?'

উনি চিঠির দিকে তাকিয়ে চৈতিয়ে উঠলেন, 'আরে। আজই তো ওরা দার্জিলিং মেলে আসছে। দার্জিলিং মেলে কখন আসে?'

দীপু বেরিয়ে এল ঘর থেকে, 'রাইট টাইমে এলে পৌঁছে গেছে।'

উনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনছ, আমি কি করব?'

আমি হাসলাম, 'কি আর করবে?' ওঁদের আসতে দাও, পুরোনো চেনাজানা, আমাদের পক্ষে যতটা সাহায্য করার তা আমরা করব।'

আমার স্বামীর মুখে অদ্ভুত আলো ফুটে উঠল। হঠাৎ মনে হল স্ত্রী হিসেবে এমন মুখ দেখতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।

দীপু

বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে জানি, কিন্তু কিছু করার নেই। একটা মানুষ যদি নিজের সময়টাকে চিনতে না পারে তাহলে তার সঙ্গে মানিয়ে চলা অসম্ভব। বাবা কি ইচ্ছে করলে আমাকে

একটা চাকরি ছুটিয়ে দিতে পারত না? আত্মসম্মান, কৃড়িকে বললে ভদ্রলোকের আত্মসম্মানবোধে লাগবে? চমৎকার কথা। দেবুকা কু বাবার বন্ধু। সমবয়সী হলেও হাবেভাবে কথাবার্তায় মনে হবে অনেক ছোট। কী মালই না কামাচ্ছেন! বাবা ওঁকে বলতে পারত। দেবুকা কু যদি কোনও ক্রায়োটকে ম্যানেজ করে আমার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দিতেন তাহলে বাবার সম্মান নষ্ট হত না। কিন্তু বাবা সেটীও করেনি।

সকালে ঘুম ভাঙার পর এ বাড়িতে একটার পর একটা ঘটনা ঘটতে লাগল। কুচবিহার থেকে ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়েকে নিয়ে এ বাড়িতে আসছেন। ইনি আমাদের কোনরকমের আত্মীয় নন। ছেলেবেলায় বাবা কুচবিহারে থাকত, ওঁরা পাশের বাড়িতে। দীর্ঘকাল বাদে ঠিকানা যোগাড় করে এইভাবে কেউ আসতে পারে কিনা তা নিয়ে গবেষণা করছিল স্বপ্নামাসি। ওঁর বলার ধরন এরকম, ‘কি জানি বাবা। আমি তো পারতাম না। কয়েক যুগ যার খবর রাখলাম না, প্রয়োজনের সময় তার কাছে হাত পাতব কি করে!’

বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠল। দার্জিলিং মেল যদি শিয়ালদা স্টেশনে এসে গিয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে ওরা পথ চিনে আসবে কি করে! যে কখনও কলকাতায় আসেনি তার পক্ষে তো সমস্যা হবেই। তাছাড়া আজ বাবার অফিস আছে। দশটা পাঁচের মধ্যে অফিসে পৌঁছানো বাবার অনেক দিনের অভ্যাস। ওইসময় কেউ আসে না। অশুভ চল্লিশ মিনিট বাবাকে অপেক্ষা করতে হয় সহকর্মীদের জন্যে, তবু যাওয়া চাই।

স্বপ্নামাসি বলল, ‘দিদি, আমি ভাবছি সকালেই চলে যাই।’

‘কেন?’

‘না গো, তোমাদের বাড়িতে গেস্ট আসবে, ওদের তো ঘর দরকার হবে, আমি আগেভাগে চলে গেলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।’

‘আমি তোকে ঠিক বুঝতে পারছি না।’ মা বলল।

‘বোঝার কি আছে? কথাটা কি ভুল বললাম?’

‘যা ইচ্ছে হয় তাই কর। আমার আর ভাল লাগছে না।’ মা বলল।

এইসময় টুটল রাস্তার দিকের জানলা থেকে দ্রুত সরে এসে ঘোষণা করল, ‘এসেছে, এসেছে। দুজন, মা আর মেয়ে।’

বাড়ির সামনে ট্যান্ডি থেমেছিল, আওয়াজটা কেউ লক্ষ্য করেনি। আমার মনে হল এগিয়ে যাওয়া উচিত। বাইরের ঘরের দরজা খুলে রাস্তায় নামতেই দেখতে পেলাম ট্যান্ডিওয়ালা দুটো স্যুটকেস নিচে নামাচ্ছে। সাদা শাড়ি পরে একজন ঐচ্ছা আমার দিকে তাকালেন। তাঁর পাশে যে মেয়েটি সে অতি সুন্দরী। একটু রোগা হলেও লম্বা, মিষ্টি দেখতে।

আমি ওঁদের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, ‘আপনাদের আসার কথা একটু আগে আমরা জেনেছি বলে স্টেশনে যেতে পারিনি।’

‘ও, তাই বুঝি।’ ঐচ্ছা বললেন, ‘কিছু মনে কোরো না, তুমি সুধীদার ছেলে, তাই তো?’

‘কি করে বুঝলেন?’

‘তোমার বাবা ছেলেবেলায় ঠিক এইরকম দেখতে ছিলেন।’

‘আসুন, ভেতরে আসুন।’ আমি স্যুটকেস দুটো তুলে নিলাম। এঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে খরাপ লাগছিল না।

দরজায় দাঁড়িয়ে বাবা অভ্যর্থনা জানাল, ‘এসো এসো। কী অবাক কাণ্ড। চিঠি পেয়ে চমকে গিয়েছিলাম। এখনও আমাকে মনে রেখেছ?’

ঘরে ঢুকে মহিলা হাসলেন, ‘বাঃ, মনে রাখব না? কিন্তু তোমার চেহারা খুব বদলে গেছে সুধীদা। রাস্তায় দেখলে চিনতে পারতাম না।’

‘কেন? খুব বুড়ো হয়ে গেছি?’

‘ঠিক তা নয়, আমি ঠিক বোঝাতে পারব না।’

‘আসলে বয়স হচ্ছে তো। এসো, আলাপ করিয়ে দিই, আমার স্ত্রী শোভনা, মেয়ে দীপায়িতা, ওর মাসি স্বপ্না, এ স্বপ্নার ছেলে টুটল। আর এর কথা একটু আগে হচ্ছিল। এই তোমার মেয়ে?’

ভদ্রমহিলা মেয়েটিকে ইশারা করতে সে এগিয়ে এসে তিনজনকে প্রণাম করল। মা জিজ্ঞাসা করল, ‘কি নাম তোমার?’

‘ইন্দ্রানী।’

‘বাঃ, চমৎকার নাম। ঠিক আছে, শোভনা ওদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে হাত-মুখ ধোয়ার জায়গা দেখিয়ে দাও, তারপর সমস্যা শোনা যাবে।’

মায়ের সঙ্গে ওঁরা ভেতরে চলে গেলে মাসি জিজ্ঞাসা করল, ‘জামাইবাবু, আজ কি আপনি আপনার রেকর্ড ভাঙবেন?’

‘তার মানে?’

‘আজ অফিস যাবেন না?’

‘হ্যাঁ, মুশকিল হল ওরা এসে গেছে যাই কি করে।’

চূপচাপ কথাবার্তা শুনছিলাম, বললাম, ‘ওঁরা তো এসে গেছেন, তোমার আর থাকার কি দরকার? অফিসে যাও।’

বাবা বলল, ‘সেটা কি ভাল দেখাবে। তাছাড়া ওরা এসেছে ডাক্তার দেখাতে, তার ব্যবস্থা না করে অফিসে চলে গেলে—।’ বাবা ধন্দে পড়েছিল।

‘তুমি কোন্ ডাক্তার দেখাবে?’ জিজ্ঞাসা করলাম।

‘আমাদের পাড়ার বটু ডাক্তারের কাছে আগে নিয়ে যাই।’

‘বটু ডাক্তার তো জেনারেল ফিজিসিয়ান, উনি কি বুঝবেন?’

‘বাঃ, স্পেশালিস্টের নাম তো বলতে পারেন।’

‘নামকরা হার্ট স্পেশালিস্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট তুমি চট করে পাবে?’

‘তা অবশ্য, আমার তো তেমন জানাশোনা নেই।’

‘অতএব এ নিয়ে চিন্তা করো না। অফিসে যাও, আমি দেখছি।’

‘তুই কিভাবে দেখবি?’

‘কলকাতা শহরের যে কোনও বিখ্যাত ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেয়ে যাব।’

‘কি করে পাবি?’ স্বপ্নামাসি জিজ্ঞাসা করল।

আমি হাসলাম, ‘কেন্দ্রীয় কমিটি বা জেলা কমিটির দরকার নেই, লোকাল কমিটির সেক্রেটারির একটা চিঠিই যথেষ্ট। কদিন বাদে আমার চিঠিতেই কাজ হবে।’

এইসময় ভদ্রমহিলা আবার দরজায় এলেন, ‘সুধীদা, কুচবিহারে যিনি আমাকে দ্যাখেন তিনি বলেছেন কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার এস কে সেনকে দেখাতে। আমি ওখান থেকে চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু কোনও উত্তর পাইনি।’

বাবা চমকে উঠল, ‘ও বাক্স। ডক্টর সেন তো খুব বাগু ডাক্তার। আমার অফিসের একজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন তিন মাস পরে।’

‘সেকি! তাহলে কি হবে?’ ভদ্রমহিলা মুখে হাত দিলেন।

বাবা বলল, ‘দ্যাখা যাক।’

ভদ্রমহিলা বললেন, ‘আর একটা কথা, বুঝতে পারছি সময় লাগবেই। আমার একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দাও। এভাবে তোমার ওপর চাপিয়ে দিতে খারাপ লাগছে।’

বললাম, ‘আপনি এসব নিয়ে কোনও চিন্তা করবেন না। ডক্টর সেন যদি কলকাতায় থাকেন তাহলে আগামীকালই উনি আপনাকে দেখবেন। আর আমাদের এখানে যদি থাকতে অসুবিধে হয় তাহলে আপনারা দুজনে আমি একটি সরকারি গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দিনে তিরিশ টাকার দিলেই ঘর পাবেন। তবে একজনের নামে তিনদিনের বেশি দেবে না। ওই নাম বদলে বদলে থাকতে হবে।’

‘ওঃ, তুমি আমায় বাঁচালে বাবা। কী দৃষ্টিশক্তি না পড়েছিলাম।’

মিনিট তিনেকের মধ্যে বাবা অফিসে বেরিয়ে গেলেন।

বাইরে বেরিয়েছিলাম। সুভাষদাকে ফোন করে সমস্যার কথা বললাম। সুভাষদা বললেন কোনও চিন্তা নেই, উনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রাখবেন। বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে দেখি দীপা আর ইন্দ্রাণী সেখানে রয়েছে। ইন্দ্রাণী বসেছে চেয়ারে, দীপা আমার বিছানায়। আমায় দেখে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল।

বললাম, ‘উঠছ কেন? বসো। তোমার মায়ের ডাক্তার সমস্যার সমাধান হয়েছে।’

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল, ‘কি রকম?’

‘আগামীকালই উনি তোমার মাকে দেখবেন।’

শুনে ইন্দ্ৰাণীর মুখ উদ্ভল হল। কিন্তু দীপা বলল, ‘এই প্রথম তুই বাড়ির কোনও কাজ এত তাড়াতাড়ি করলি। রেকর্ড!’

রেগে গেলাম, ‘পেছনে লাগা তোদের অভ্যেস। কারও ভাল দেখতে পারিস না।’

ইন্দ্ৰাণী জিজ্ঞাসা করল, ‘কাল কখন?’

‘বিকলে জানতে পারব।’

‘আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব!’

‘আহ, এভাবে বললে কিন্তু খারাপ লাগবে। আচ্ছা, তোমার মায়ের অসুখটা কি? হার্টের ব্যাপার বলছিলেন!’

‘হ্যাঁ। খুব প্যালপিটেশন হয়, সেই সঙ্গে ব্যথা। শুখন ঘুমের ওষুধ খেতে হয়। মায়ের শরীরে এমনভেই রক্ত কম।’

‘কোনও চিন্তা কোরো না, ভাল হয়ে যাবেন।’

ভেতর থেকে মা দীপাকে ডাকতেই সে উঠে দাঁড়াতে ইন্দ্ৰাণী তার সঙ্গী হতে চাইল। বললাম, ‘তুমি বসো না, গল্প করি।’

ইন্দ্ৰাণী বসল কিন্তু দীপা যাওয়ার আগে আড়চোখে তাকিয়ে গেল।

‘তুমি এবার বি এ পরীক্ষা দিয়েছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘এবার?’

‘জানি না। মায়ের শরীরের যে অবস্থা। আমার ইচ্ছে ছিল ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব। কিন্তু সেটা কখনও হয়ে উঠবে কিনা কে জানে?’

মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হল। সত্যি কথা বলতে কি এমন সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে একা ঘরে বসে এই প্রথম কথা বলছি। দীপার মেয়েবন্ধু খুব কম। দেবুকাবুর মেয়ে নীপার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব ঠিক জমে না। আমি কয়েকবার দেবুকাবুর বাড়িতে আগে গিয়ে দেখেছি তিনি মেয়েকে আড়ালে রাখতে চান। আস্ত মনে হল সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে কথা বললে মন ভাল হয়ে যায়।

বললাম, ‘আমি চেষ্টা করব যাতে তুমি এখানে পড়তে পারো।’

‘সত্যি? তাহলে যে কী ভাল হয়।’

এইসময় স্বপ্নামাসি দরজায় এসে দাঁড়াল, ‘ও, তোরা গল্প করছিস।’

কথাটা বলার মধ্যে অন্যরকম সুর ছিল, আমার ভাল লাগল না। তবু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তুমি কিছু বলবে?’

‘না রে, থাক!।’ মুখ ফেরাল স্বপ্নামাসি।

‘কিছু করতে হলে বল!’

‘জিনিসপত্র না থাকলে বাসেই চলে যেতাম, একটা ট্যান্ডি—’

‘তুমি কি চলে যাচ্ছ?’

‘আর থেকে কি করব। তোর পিসি এসে গেছে, তাছাড়া টুটুলের স্কুলও খুলে যাবে। থাক, তোরা দুই ভাইবোনে গল্প কর, আমি টুটুলকে পাঠাই।’ স্বপ্নামাসি যাওয়ার আগে আড়চোখে ইন্দ্ৰাণীকে দেখে গেল।

অগত্যা আমি উঠলাম। মায়ের বেশ আপত্তি ছিল কিন্তু স্বপ্নামাসিকে আটকানো গেল না। ট্যান্ডি ডেকে দিতে জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে ভেতরে যেতে যেতে গুনলাম ইন্দ্ৰাণীর মা জিজ্ঞাসা করছেন, ‘ওঁর কি আজ যাওয়ার কথা ছিল?’

‘যাবে যাবে তো করছিল, খেয়াল হতেই চলে গেল।’

‘আমি এসে পড়লাম বলে ওঁর অসুবিধে হয়নি তো?’

‘না না। নিজের বাড়ি ছেড়ে কতদিন আর লোকে বাইরে থাকে!’

আমাকে অবাধ করে দিয়ে সুভাষদা খবর পাঠালেন ডক্টর সেনের সঙ্গে আজ বিকেল চারটের সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে। সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে যেন আমরা চলে যাই। ডেবেহিলাম ‘এই ব্যাপারটা বাবার ওপর চাপাবো। কিন্তু তাঁর দেখা সাড়ে ছ’টার আগে পাওয়া যাবে না।’

এত ভাড়াভাড়ি ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা হয়ে গেল ভেনে ইন্ড্রাগীর মা অবাক। মাকে আমার নামে একগাদা প্রশংসার কথা শোনাতে মা বলল, 'হ্যাঁ, দীপু অন্যের জন্যে খুব করে।'

শোনামাত্র ভদ্রমহিলার মুখের চেহারা বদলে গেল বলে মনে হল।

ওদের ট্যান্ডি করে না নিয়ে গিয়ে উপায় ছিল না। ট্রাম-বাসে ওঠার অভ্যাস নেই, তার ওপর ইন্ড্রাগীর মায়ের হার্টের অনুখ। পকেট থেকে কিছু টাকা ট্যান্ডিভাড়া বাবদ বেরিয়ে গেল। ইন্ড্রাগীর মা দিতে চাইছিলেন, আমি রাজী হলাম না। ইন্ড্রাগীর সামনে ওঁর কাছে হাত পাততে সম্মানে লাগল।

প্রচুর লোক অপেক্ষায় ছিল কিন্তু ঠিক চারটের সময় আমাদের ডাকা হল। ডাক্তার সেন প্রথমে ইন্ড্রাগীর মায়ের মুখ থেকে বিস্তারিত শুনলেন, রিপোর্ট দেখলেন। তারপর পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করলেন।

চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুচবিহারের ডাক্তাররা শুধু এই ওষুধগুলো দিয়ে এতদিন আপনাকে ফেলে রেখেছিলেন মা?'

ইন্ড্রাগীর মা মাথা নাড়লেন, 'না। ওঁরা অনেকদিন আগেই আমাকে বলেছেন কলকাতায় এসে বড় ডাক্তার দেখাতে। আমারই আনা হয়নি।'

'খুব ভুল করেছেন। আমার যতটুকু ধারণা শুধু মেডিসিনে কাজ হবে না। আপনাকে নার্সিংহোমে থাকতে হবে। কয়েকটা পরীক্ষার পর আমি সিদ্ধান্ত নেব।'

'আপনি কি পেসমেকার বসাতে চান?'

ডাক্তার সেন হাসলেন, 'আমি পরীক্ষাগুলো না দেখে কিছুই বলতে পারব না।'

ইন্ড্রাগীর মা ইতস্তত করলেন, 'ডাক্তারবাবু, এতে কিরকম খরচ হবে?'

'ইনভেস্টিগেশন, নার্সিংহোমে থাকা খুব অল্প হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পেসমেকার অথবা অ্যান্ড্রিওগ্রাফি করতে হয় তাহলে লাখ টাকার ওপর তো নিশ্চয়ই।'

ইন্ড্রাগীর মা বড় বড় শ্বাস নিলেন, 'যদি বাইপাস করতে হয়?'

'দেখুন, এসব তো এখনই একটু বেশি কল্পনা করা হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমি বাইপাস পছন্দ করি না। যাহোক, আপনি আগামীকালই এই নার্সিংহোমে ভর্তি হয়ে যান। এদের চার্জ খুব রিজনেবল।' ডাক্তার একটা প্রেসক্রিপশন লিখলেন। লেখার পর সেটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। আমি দেখলাম নিচে নার্সিংহোমের নাম লেখা আছে।

ইন্ড্রাগীর মা ব্যাণ খুললেন, 'কত দিতে হবে?'

'সুভাষ আপনাদের পাঠিয়েছে, কিছুই দিতে হবে না।'

'না না, সেকি!'

'আপনার সামনে এখন প্রচুর খরচ আছে। আচ্ছা।'

অগত্যা আমরা বেরিয়ে আসছিলাম, ডাক্তার সেন আমাকে ডাকলেন, 'আপনি সুভাষের পরিচিত? একটু বসুন।'

ওরা বেরিয়ে গেলে আমি ফিরে এলাম চেয়ারে। ডাক্তার সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিও কি কুচবিহারে থাকেন?'

'না। আমি কলকাতাতেই থাকি।'

'কে হয় আপনার?'

'একটু দূরসম্পর্কের আত্মীয়।'

'শুনুন, যেটুকু বুঝলাম ওঁর কন্ডিশন ভাল নয়। আগামীকালই ওঁর পরীক্ষাগুলো হয়ে যাওয়া উচিত। দীর্ঘদিন চেপে রেখে রেখে হার্টের অবস্থা খুব খারাপ জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন।'

'ওঁকে আজই ভর্তি করবো!'

'খুব ভাল হয়।'

'একটা কথা, আপনি তো ওঁর ইসিজি করলেন না, প্রেসারও নিলেন না।'

নিজের স্টেথো দেখিয়ে ডাক্তার সেন হাসলেন, 'এই যন্ত্র যখন কথা বলে তখন ওগুলোর তেমন প্রয়োজন হয় না। যদি আজ ভর্তি না করতে পারেন তাহলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে রাখবেন। কোনরকম টেনশন যেন ওঁকে ডিস্টার্ব না করে। ঠিক আছে?'

বাড়ি ফেরার মুখে শুনলাম ইন্ড্রাগীর মা পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে কলকাতায় এসেছেন। এই তাঁর সঞ্চয়

ছিল। এক লাখ টাকার কথা শুনে উনি খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন। বললেন, 'ওষুধ খেয়ে তো আমি খারাপ নেই। চল ইন্ড্রাগী, কুচবিহারে ফিরে যাই।'

ইন্ড্রাগী এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার ফোঁস করে উঠল, 'বাঃ, তুমি অসুখ না সারিয়ে ফিরে যাবে?'

'অত টাকা কোথায় পাব বল?' অসহায় গলায় বললেন ভদ্রমহিলা।

'আমাদের বাড়িটা বিক্রি করে দাও।'

'বাড়ি বিক্রি করব? থাকব কোথায়?'

'বাড়ি ভাড়া করে থাকব।'

'কি যে বলিস! পিতৃপুরুষের বাড়ি, লোকে কি বলবে?'

'লোকে তো টাকা দিতে আসবে না।' ইন্ড্রাগী মাথা নাড়ল, 'অলোকজ্জেরু তো বলেইছে, বাড়ি বিক্রি করলে আমাকে বলিস। অলোকজ্জেরুকে ফোন করলে নিশ্চয়ই টাকা পাঠিয়ে দেবে।'

ইন্ড্রাগীর মা কিছু বললেন না। আমার মনে পড়ল ডাক্তার সেনের কথা, টেনশন করা নিষেধ। কিন্তু কি বলতে পারি আমি?

আমার টাকা নেই। বাবা ঘুষ নেয় না বলে নেই। দেবুকাবুর প্রচুর টাকা কারণ তিনি ঘুষ নেন। কি করা যায়?

বাড়িতে বাবা এসে গিয়েছিল। সব শুনে গুম হয়ে গেল। বুঝতে পারছি বাড়ি বিক্রি করে চিকিৎসা চালাবার প্রস্তাবে বাবা মত দিতে পারছে না। বললাম, 'তুমি যদি দেবুকাবুর মতো রোজগার করতে তাহলে আজ কোনও সমস্যা হত না। দ্যাখো, আদর্শ বড় না মানুষের জীবন বড়?'

আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন ইন্ড্রাগী বা তার মা ছিল না কাছাকাছি। মা বলল, 'ওদের জীবনের জন্যে তোর বাবা আদর্শচ্যুত হবে?'

আমি বললাম, 'ওদের না হয়ে ধরো যদি তোমার এই অবস্থা হত তাহলে কি বলতে?' প্রশ্নটার জবাব মা দিতে পারেনি।

রাত্রে আমি দেবুকাবুর বাড়িতে গেলাম। প্রথমে উনি দেখা করতে চাননি শরীর ভাল নেই বলে। এখন রাত সাড়ে নটা। আমি পার্টি অফিস থেকে আসছি বনায় বাইরের ঘরে এলেন। উনি যে মদ্যপান করেন জানতাম না। ওঁর শরীর থেকে সেইরকম গন্ধ বের হচ্ছিল। বললন, 'কি ব্যাপার, অ্যা?'

'আপনাকে এই সময় বিরক্ত না করে উপায় ছিল না। এক ভদ্রমহিলার হার্টের ট্রিটমেন্টের জন্যে কিছু টাকা দরকার। ওঁদের টাকা নেই, টাকার অভাবে চিকিৎসা না হলে মারা যাবেন। আপনার কাছে সাহায্য চাইছি।'

'এ কি! চিনি না জানি না, সাহায্য করব কেন?'

'বাংলাদেশে বন্যা হলে সুইজারল্যান্ডও সাহায্য পাঠায়, বিনা স্বার্থে।'

'অ। কত লাগবে?'

'এক লাখ।'

'তুমি পাগল হয়েছে? সুখী জানে?'

'আমি পার্টি অফিস থেকে আসছি।'

'অ।' টোক গিললেন দেবুকাবু, 'আমার কাছে অত টাকা কোথায়? আমি তো তোমার বাবার মতো চাকরি করি।'

'কিন্তু আপনি ঘুষ নেন। দু-হাতে, নির্লজ্জের মতো। এত টাকা, কালো টাকার কোনও প্রয়োজন নেই আপনার। মাত্র এক লাখ কালো টাকা যদি ভাল কাজে লাগাতে পারেন তাহলে কিছু পুণ্যসঞ্চয় হতে পারে, তাই না?'

'এসব কি বলছ তুমি?'

'আমি এখন ভদ্রভাবে বলছি। আপনি রাজী না হলে কাল পাড়ায় পোস্টার পড়বে, আপনার বাড়ির সামনে ঘুষ নেওয়ার কারণে বিক্ষোভ দেখানো হবে।'

'তুমি, তুমি ব্র্যাকমেল করছ আমাকে?'

'না। সোজা চাইছি। অনেক কালো টাকা জমিয়েছেন, একটা ভাল কাজে খরচ করুন না। মেয়েকে ডাকুন, ওকে বলছি।'

‘না। ওকে জড়াবে না। কার অসুখ হয়েছে?’

‘আপনি চিনবেন না। বিশ্বাস না হলে কাল অ্যাপেলো নার্সিংহোমে গিয়ে দেখে আসবেন।’ খুব শান্ত গলায় কথা বলছিলেন আমি।

‘দ্যাখো দীপু, আমি দশ হাজার দিতে পারি, তাও এভাবে বলছ বলে দেব। ব্যস, তার বেশি সম্ভব নয়।’ বলেই উত্তেজিত হলেন, ‘কত লোক তো ঘুষ খায়, সবাই তো তোমার বাবার মতো নয়, আমার মতোও আছে, তারাই বেশি, তাদের কাছে না গিয়ে আমার কাছে এসেছ কেন?’

‘কাউকে দিয়ে তো গুরু করতে হয়। আপনি ঘরের লোক তাই আপনাকে দিয়ে গুরু করতে চেয়েছিলাম। ঠিক আছে, কাল যা হবে তার জন্যে আমাকে দায়ী করবেন না।’

‘ঠিক আছে, পঁচিশ নিয়ে যাও।’

‘আপনি খেপেছেন? এক লাখের ওপর খরচ হবে, আমি পঁচিশ নিয়ে কি করব? আপনি ভেবে দেখুন।’ আমি আর দাঁড়িলাম না।

সকালে ইন্দ্রাণীর মাকে নিয়ে গেলাম অ্যাপেলো নার্সিংহোমে। ওঁকে ভর্তি করাতে কত জমা দিতে হবে জানতে গিয়ে দেখি কাউন্টারে দেবুকে দাঁড়িয়ে আছেন।

‘আপনি?’

‘এসে গেলাম, বৃথলে। প্যাকেটটা রাখো, এতে এক লাখ আছে।’ বলে ভদ্রলোক হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে বাবা চিৎকার করে ডাকল, কিন্তু ভদ্রলোক দাঁড়ালেন না।

কাছে এসে বাবা জিজ্ঞাসা করল, ‘দেবু এসেছিল কেন?’

‘টাকা দিতে।’

‘টাকা, কিসের টাকা?’

‘ওঁর চিকিৎসার।’

বাবার মুখের চেহারা হঠাৎ বদলে গেল, ‘সত্যি বলছিস?’ তারপর নিশ্বাস ফেলে বলল, ‘ওঁর সম্পর্কে ধারণাটা বদলে গেল রে। কোনও মানুষের সবটাই একদম খারাপ হতে পারে না।’

আমি নার্সিংহোমে পুরো টাকাটা জমা দিয়ে দিলাম।

ইন্দ্রাণীর কথা

নার্সিংহোমের অপেক্ষাঘরে বসে আমি দীপুদার দিকে তাকিলাম। এই যে একটু আগে দেবুকে এক লক্ষ টাকা মায়ের চিকিৎসার জন্যে জমা দিয়ে গেলেন এর পেছনে নিশ্চয়ই দীপুদার ভূমিকা আছে। কারণ দেবুকে যেন টাকাটা দীপুদার হাতে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারলে বেঁচে যান এমন ভাব ছিল। তিনি আর কারও সঙ্গে কথা বলেননি, এমন কি আমার সঙ্গেও নয়। অথচ মামা তো ওঁর বন্ধু। মামার চিৎকার আমরা সবাই শুনতে পেলাম আর উনি পেলেন না?

ঘটনাগুলো যেন সিনেমার মতো ঘটে গেল। কুচবিহারের ডাক্তাররা বলতেন মায়ের হার্ট দুর্বল, কিন্তু কতটা দুর্বল সেটা বলেননি। একজন বলেছিলেন, ইকোকার্ডিওগ্রাফ না করলে বোঝা যাবে না। ওটা কুচবিহারে করা যায় না। ওষুধ খেয়ে খেয়ে মা যে অসুখটা এতকাল খামা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন তা কে জানত! শেষ পর্যন্ত যখন কলকাতায় আসতেই হল তখন সমস্যা হল থাকার জায়গা নিয়ে। হোটেল থেকে মায়ের চিকিৎসা এই অজানা শহরে কতদিন করা সম্ভব? বাবা মারা যাওয়ার সময় তো কিছুই রেখে যাননি শুধু কুচবিহারের বাড়িটা ছাড়া। মায়ের সামান্য আয়ে হোটেল বেশিদিন থাকা অসম্ভব ব্যাপার। তখনই মা মামার কথা বললেন। মায়ের প্রায়-বাল্যকালের চেনা। দীর্ঘদিন কোনও যোগাযোগ নেই। রাস্তাঘাটে দেখলে ঠিক চিনতে পারবেন কিনা সন্দেহ। সুধীমামা কলকাতার বাড়িতে আসার আগে মা ছিলেন বেশ উত্তেজিত আর আমি ছিলাম আড়ষ্ট। যদি বলেন, চিনতে পারছি না। অথবা ওঁর স্ত্রী যদি আপত্তি করেন? এখানে থাকার কোনও জোর তো আমাদের নেই।

কিন্তু এর উলটোটাই ঘটল। ওঁরা একদিনেই এমন আপন করে নিয়েছেন আমাদের যে অন্য চিন্তা করার

অবকাশ পাইনি। মামা তো মাটির মানুষ। মামীও খুব ভাল। আর দীপাষিতাকে আমার খুব সহজ বলে মনে হয়েছে। আমার চেয়ে সামান্য ছোট হবে ও, কিন্তু আমার মতো মঞ্চস্থলের মেয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারে কত এগিয়ে আছে ওরা। অনেক সপ্রতিভ ও।

দীপুদা গ্র্যাডুয়েট হওয়ার পর চাকরি না পেয়ে নাকি রাজনীতি করছে। এরকম লোকদের সম্পর্কে আমার কোনও ভাল ধারণা নেই। কুচবিস্বাসে দেখেছি কিছু করতে না পারা ছেলেদের রাজনীতি করতে গিয়ে একসময় তুলিয়ে যেতে। দীপুদাকে সেইরকম ভেবে নেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এরা মুখে ভ্রূণ মারে কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরস্ত্র। দীপুদা যেভাবে গায়ে পড়ে আমাদের উপকার করার কথা বলছিল তাতে আমার মনে হয়েছিল আর একটি চলবাজের পাল্লায় পড়তে চলেছি। সুধীমামা আয়করে চাকরি করেন, কতদিন কলকাতায় আছেন, তিনি যা পারবেন না তা দীপুদা পারবে? আর আমাদের সামনে বাবার সঙ্গে যেভাবে কথা বলল সেটা আমার একটুও ভাল লাগেনি।

কিন্তু সবই তো করল। দিনের দিনে ডাক্তার দেখানো, আজ নার্সিংহোমে নিয়ে আসা। কাল ডাক্তার যখন টাকাটার কথা বললেন তখন চোখে সর্ব্বক্ষণ দেখেছিলাম। এত টাকা মায়ের নেই। মা তো চিকিৎসা না করিয়ে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। টেনশনে ওঁর শরীর খারাপ হওয়ার যোগাড়। সুধীমামাও যে কাল অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলেন তা আমি জানি। আমার পাশে শুয়ে দীপাষিতা বলেছিল, আমার যদি টাকা থাকত তোমাদের দিয়ে দিতাম। মাত্র একদিনের আলাপে কেউ একথা বলে? আমি ঠিক করেছিলাম আজ ভোরের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ধরে কুচবিস্বাসে চলে যাব। দিনের ট্রেন, অসুবিধে হবে না। বাবার বন্ধু অলোক জেঠুর কাছে গেলে বাড়ির বিনিময়ে নিশ্চয়ই এক লক্ষ টাকা অগ্রিম পাওয়া যেত। যেতে আসতে হয়তো তিনদিন নষ্ট হত কিন্তু তারপর তো চিকিৎসা হত! কিন্তু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ওনলাম দীপুদা নাকি একটু আগে কাকে ফোন করতে বেরিয়েছে আর তাই মামীমা খুব বিরক্ত হয়েছেন। আমি কিছু বলার আগে দীপুদা ফিরে এল। আমায় দেখে বলল তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে, নার্সিংহোমে যেতে হবে মাকে নিয়ে।

মা টাকার কথা বলতে দীপুদা ঘাড় নাড়িয়ে বলল, 'এখন তো পুরো টাকা লাগছে না, আপনার কাছে যা আছে তাই নিয়ে চলুন।'

আমার খুব সন্দেহ ওই ভোরে দীপুদা দেবুকাবুকে ফোন করে টাকার কথা বলেছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে, বন্ধু নয়, বন্ধুর ছেলে বলামাত্র কেউ এক লক্ষ টাকা বের করে দেয়? কারও বাড়িতে এক লক্ষ টাকা নগদ থাকে? আর দিতে এসে কারও সঙ্গে কথা না বলে দেবুকাবু চলে গেলেন কেন? ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যময়। কিন্তু যেহেতু মায়ের চিকিৎসার জন্যে দেবুকাবু টাকাটা দিয়েছেন তাই ওটা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। তাছাড়া মায়ের আনা পঁচিশ হাজার টাকা আমার সঙ্গে আছে। কথা ছিল, ভর্তির সময় এই টাকাই দেওয়া হবে। আমি বেশি থেকে উঠে দীপুদার কাছে গেলাম। দীপুদার পাশে সুধীমামা দাঁড়িয়ে।

দীপুদা আমার দিকে তাকাল। ব্যাগ থেকে প্যাকেটটা বের করলাম, 'মায়ের টাকাটা!'

দীপুদা অবাক হল, 'কিসের টাকা?'

'যেটা জমা দেওয়ার কথা ছিল!'

'ও! ওটা এখন লাগছে না। লাগলে বলব।' দীপুদা বলল।

সুধীমামা বললে, 'অভূত ঘটনা, বুঝলে! দেবু হঠাৎ এগিয়ে এসে এক লক্ষ টাকা দিয়ে গেল। দীপু ওকে ফোন করে টাকার কথা বলেছিল। দেবুকে আমি পছন্দ করতাম না। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু হলেও চাকরি করতে এসে নীতি বা আদর্শের ধার ধারেনি। অন্যায় পথে টাকা রোজগার করেছে। ঘুষ নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়িয়েছে। সেই লোক যে অনুরোধ পাওয়ামাত্র টাকা দিতে আসবে আমি ভাবিনি।'

বনলাম, 'কিন্তু টাকাটা কিভাবে শোধ দিতে হবে, তা জানা দরকার।'

দীপুদা বলল, 'শোধ যে দিতে হবে তার কোনও মানে নেই। দেবুকাবু তো তাঁর মাইনের টাকা দিয়ে আমাদের সাহায্য করছেন না!'

'সেকি! উনি যেভাবে রোজগার করুন না কেন, ওঁর কাছে আসার পর তো টাকাটা ওঁর টাকাই হয়ে গিয়েছে। আর মা কেন অজানা অচেনা মানুষের কাছ থেকে দান নেবেন?' আমি উত্তেজিত হলাম।

দীপুদা বলল, 'আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল! ঠিক আছে, এ ব্যাপারে পরে দেবুকাবুর সঙ্গে কথা বলা যাবে। এই ব্যাপার নিয়ে এখনই এত উত্তেজিত হওয়ার কোনও মানে হয় না।'

আমি কিন্তু মনে মনে মেনে নিতে পারছিলাম না এই উপদেশ। কেবলই মনে হচ্ছিল এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যা সুধীমামাও জানেন না। একটা ঘূষখোর লোক এক কথায় লক্ষ টাকা দান করতে পারে না। আর দীপুদার কথার ধরনে বুঝতে পারছি এর নেপথ্যে যে গল্প আছে তা এখনই জানাতে চাইছে না।

ডাক্তার সেন ঘণ্টা দুয়েক বাদে আমাদের ডেকে পাঠালেন। তার আগে মাকে ভর্তি করার পর আমাদের ওপরে উঠতে দেওয়া হয়নি। সুধীমামা, আমি আর দীপুদা চেয়ারে বসার পর ডাক্তার সেন বললেন, 'খোলাখুলি বলছি, পেশেন্টের কন্ডিশন ভাল নয়। আমি আজ দুপুরে অ্যাক্সিও করতে চাই। আপনারা তৈরি?'

দীপুদা বলল, 'হ্যাঁ। এক লক্ষ টাকা জমা দেওয়া হয়েছে।'

ডাক্তার সেন বললেন, 'বাঃ, এর মধ্যেই টাকার বোগাড় হয়ে গেল! আপনি ওর মেয়ে?'

আমি মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললাম।

'আপনি অফিসে যান। কাগজপত্রের সই করার দরকার।'

বললাম, 'ডাক্তারবাবু, মা ভাল হয়ে যাবে তো?'

'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তবে বলতেই হবে আপনার মা যদি মাস ছয়েক আগে আসতেন তাহলে অনেক ভাল হত।'

অফিসে গিয়ে ফর্ম ভর্তি করার সময় জানা গেল আজ অপারেশন টেবিল পাওয়া যাচ্ছে না বলে কাল ভোরে মায়ের চিকিৎসা শুরু হবে। চিকিৎসা মানে অ্যাক্সিওগ্রাফি বা অ্যাক্সিওপ্লাস্টিং এবং তারপর বাইপাস। ডাক্তার সেনের এ ব্যাপারে দারুণ সুনাম। আর তাঁকে এত তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্যে আমি দীপুদার প্রতি আরও বেশি কৃতজ্ঞ হলাম।

মায়ের সঙ্গে দেখা করলাম দশটা নাগাদ। মাকে বেশ ভাল দেখাচ্ছিল। বললেন, 'এরা খুব যত্ন করছে রে। একটা নতুন ওষুধ খেয়েছি। খাওয়ার পর বেশ ভাল লেগেছে। রক্ত পরীক্ষা হয়েছে, ইকো-কার্ডিওগ্রাফ করা হয়েছে।'

'তোমাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে মা।'

'দীপুদা জানো এসব সম্ভব হল। ওরা কোথায়?'

'বাইরে।'

'আমার পঁচিশ হাজার টাকা দীপুকে দিয়ে দিয়েছিস?'

'নিতে চেয়েছিলাম, নেয়নি।'

'নেয়নি, কেন?'

'বলেছে, লাগলে নেবো।'

'কি আশ্চর্য! ভর্তি করার সময় ওরা টাকা নেয়নি?'

'নিয়চ্ছে। সেই টাকা দীপুদা ব্যবস্থা করেছে। তুমি এ নিয়ে কোন- চিন্তা কোরো না। আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছি।'

'চিন্তা না করে পারব? আমি যদি মরে যাই আর তোর ওপর এত টাকার বোঝা যদি চাপে, তাহলে? তুই ডাক ওদের।' মায়ের গলায় আদেশ।

অতএব ডাকতেই হল। দীপুদার সঙ্গে সুধীমামা এলেন।

সুধীমামা বললেন, 'কেমন আছ?'

'ভাল।' মা বললেন, 'আপনাদের কত কষ্ট দিচ্ছি।'

'ছি ছি, একথা বলো না। সব পরীক্ষা ভো হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। দীপু, তুমি টাকা কোথায় গেলে?'

দীপুদা আমার দিকে তাকাল একবার। তারপর বলল, 'বাবার বন্ধু দিয়েছেন।'

'কত টাকা?'

'লাখ খানেক।'

'এত! শোধ করব কি করে?'

'আপনি সেরে উঠুন, তারপর দেখা যাবে।'

'আর যদি সেরে না উঠি!'

সুধীমামা বললেন, 'এ কি বলছ তুমি! এখন হার্টের অপারেশন জলভাত হয়ে গিয়েছে। দেবুর টাকাটা দ্বীরে দ্বীরে শোধ করলেই চলবে। ওর ফেরৎ পাওয়ার জন্যে তাড়াহড়ো নেই বলেই জানি।'

'ভদ্রলোককে একবার খবর দেবেন?' মা জিজ্ঞাসা করলেন।

দীপুদা বলল, 'কেন?'

'আমি ওঁকে ধন্যবাদ দেব। উনি আমাদের বাঁচিয়েছেন।'

আমি বললাম, 'তুমি চিন্তা কোরো না মা, আমিই খবর দেব।'

মা বললেন, 'সুধীদা, কবে ছেলেবেলায় ভোমায় দাদা বলে ডাকতাম, সেই সুবাদে উড়ে এসে জুড়ে বসেছি। তবু একটা অনুরোধ করব?'

'বল।'

'আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে মেয়েটাকে কুচবিহারে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা থিতু করে দিয়ে এসো।' মা বললেন।

প্রতিবাদ করলাম, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ মা। আমার কলকাতায় থেকে এম এ পড়ার কথা। তুমিই তো আমাকে এতদিন একথা বলে এসেছ।'

মায়ের নিঃশ্বাস পড়ল, 'কি করে এসব করবি ভাবতে পারছি না।'

আমি বললাম, 'তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো।'

নার্সিংহোম থেকে দীপুদা তার পাটি অফিসে চলে গিয়েছিল। আজ মায়ের জন্যে সুধীমামাকে অফিস কামাই করত হল। তাঁর সঙ্গে দুপুরে বাড়ি ফেরার পথে আমি দেবুকাকুর কথাটা তুললাম। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার মা যখন তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে তখন ওকে খবরটা দেওয়া উচিত।'

কিন্তু এখন যে সময় তাতে দেবুকাকুর বাড়িতে থাকার কথা নয়। অফিসে গিয়ে দেখা করা যায় কিন্তু ছুটি নিয়ে আছেন বলে সুধীমামার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। সুধীমামা উদ্যোগী হয়ে একটা টেলিফোন বুথে ঢুকলেন। মিনিট দশেক চেষ্টা করেও তাঁর অফিসের লাইন পাওয়া গেল না।

সুধীমামা বললেন, 'দেবুর মেয়ে বাড়িতে থাকতে পারে। তুমি তাকেই বলে এসো। বাড়ি ফিরে মেয়ের কাছে শুনলে সে নার্সিংহোমে ইচ্ছে হলে যেতে পারবে।'

দেবুকাকুর বাড়িটা বাইরে থেকে সাধারণ। কিন্তু ভেতরে ঢোকার পর বুঝতে পারলাম বিস্ত কাকে বলে! ওঁর মেয়ে বাড়িতে ছিল। সুধীমামা নাম বললেন, নীপা। ওর বয়স দীপার সমান।

আমি নীপাকে বললাম, 'আমার মা নার্সিংহোমে আছেন। হয়তো আগামীকাল ওঁর অপারেশন হবে। আমরা কুচবিহার থেকে এসে সুধীমামার বাড়িতে উঠেছি। হঠাৎ যে অপারেশন হবে আর এত টাকা লাগবে আন্দাজ করতে পারিনি। দেবুকাকু আমাদের চেনেন না কিন্তু উনি টাকা নিয়ে এগিয়ে না এলে কি হত ভাবতে পারছি না। দীপুদার অনুরোধে উনি মায়ের অপারেশনের জন্যে এক লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এই টাকা কিভাবে শোধ করব তা নিয়ে কথা বলা দরকার। ওঁর অফিসে ফোন করা হয়েছিল কিন্তু লাইন পাওয়া যায়নি। এদিকে মা চাইছেন আজ বিকেলে দেবুকাকুর সঙ্গে একটু কথা বলতে। এই খরবটা কি ওঁকে জানানো যায়?'

আমার কথা নীপা মন দিয়ে শুনছিল। বলল, 'বাবা বাড়ি ফিরলে বলব।'

'ওঁকে টেলিফোনে বলা যায় না?'

'খুব বিপদে না পড়লে ওঁকে টেলিফোন করা বারণ।'

সুধীমামা বললেন, 'এ কিরকম কথা! না না। তুমি আমার নাম করে ওকে ফোন করবে। এটাও তো কম বিপদ নয়!'

আমি বললাম, 'তোমার বাবাকে কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব ভেবে পাচ্ছি না।'

নীপা সুধীমামার দিকে তাকাল, 'বাবা এক লক্ষ টাকা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ মা। আমি শুনে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।' সুধীমামা বললেন, 'তোমার বাবা, তাই সব বলতে পারছি না, কিন্তু এটা অবাক হওয়ার মতো ঘটনা। দীপু আজ ভোরে ফোন করেছিল আর সে টাকা নিয়ে উপস্থিত হল।'

'আজ ভোরে তো কেউ ফোন করেননি!' নীপা বলল।

'কেন? দীপু করেনি?'

‘না তো। আমি তো সাড়ে চারটের সময় উঠে পড়তে বসি। কোনও ফোন আসেনি।’

‘সেকি!’ অনুগানটা বদলে যাওয়ায় সুধীমামা হতভম্ব।

‘দীপুদাদা এসেছিল কাল রাতে। ওহো, না। আমি যখন বাথরুমে গিয়েছিলাম তখন একবার ফোন বেজেছিল!’ নীপার মনে পড়ল।

‘তাই বল। কিন্তু কাল রাত্রেও এসেছিল সে?’

‘হ্যাঁ। বাবার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছিল।’

‘ঝগড়া? কি ব্যাপারে? তুমি শুনেছ কিছ?’ সুধীমামা জিজ্ঞাসা করলেন।

‘না। আমি ভেতরে ছিলাম।’

‘ও। তাহলে ভুল ওনেছ। ঝগড়া হলে কেউ কি অত টাকা দিতে নার্সিংহোমে ছুটে যায়? দেবু তো কথা বলে একটু চেষ্টা করে। এই নিয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে খুব লাগত। আচ্ছা, চলি এখন। বেলা হয়ে গেছে। বাবাকে মনে করে বলবে।’

আমরা ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম। নীপাকে আমার কিরকম নীরস্ত বলে মনে হচ্ছিল। ওর বাবাকে ও খুব ভয় পায়। আমার বাবা নেই। যদি থাকত তাহলে আমি কখনই এত ভয় পেতাম না। কিন্তু গতরাতে যে দীপুদা এ বাড়িতে এসেছিল তা কাউকে বলেনি কেন? সত্যি, যদি ঝগড়া হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই টাকা দেওয়া নিয়েই হয়েছিল। অর্থাৎ দেবুকাবুর মোটেই ইচ্ছে ছিল না এভাবে টাকা দিতে, দীপুদাই জোর করেছে। এসব কথা দীপুদা আমাদের বলেনি। আমার মনে হল, কলকাতার ছেলেমেয়েরা বোধহয় বাড়িতে সব কথা বলে দি। মফঃস্বলের মতো নয়।

দেবু

কাল থেকেই মনমেজাজ বিচড়ে ছিল। সুধীরঞ্জনের ছেলেটাকে জন্মাতে দেখলাম আর সেই কিনা আমাকে শাসিয়ে গেল মুখের ওপর! আমি ঘুষ নিই, দু-নশ্বরী রোজগার করি অতএব আমাকে টাকা দিতে হবে, দশ-বিশ নয়, একেবারে এক লক্ষ! না দিলে মিছিল করবে, বাড়ির গায়ে পোস্টার মারবে, সবাইকে জানিয়ে দেবে যে আমি ঘুষ খাই। এরকম মানসিক অভ্যাস যে সুধীর ছেলে আমার সঙ্গে করবে তা আমি ভাবতে পারিনি। কোন্ যুগে বাস করছি।

আরে, দু-নশ্বরী রোজগার না করে ভালভাবে বেঁচে আছে ক’জন? ঘুষ নিচ্ছে না কে? এই যে আমার অফিস, এখানে চাকরি পেলে লোকে বলবে, বাস, হয়ে গেল, এখন দু-হাতে টাকা কামাবে। কেন বলে? আগে ঘুষের টাকা নাকি বাঁ হাতে নেওয়া হত মাইনের টাকা ডান হাতে। প্রথম প্রথম আমি তাই ভাবতাম। এখন বুঝি দু-হাতে বলতে দু-নশ্বরী টাকা। এক হাতে বেশি নেওয়া সম্ভব নয় বলে দুটো হাতই ব্যবহার করার ব্যাখ্যা দু’হাতে কামানো।

পাড়ায় পুজো বা ফাংশন হলে কর্মকর্তারা এসে বলে, ‘দেবুদা, এবার দশ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন চাই, আর চেকটা যদি ম্যাটারের সঙ্গে না দেন তাহলে মুশকিলে পড়ব! এত খরচা বেড়ে গিয়েছে!’

যারা বলছে তারা নিশ্চয়ই ভাবছে আমি বললেই কোনও আগরওয়ালা অথবা গুপ্তা দশ হাজার টাকার চেক আর বিজ্ঞাপনের ম্যাটার দিয়ে দেবে। কেন? আমি কোন্ হরিদাস? যে দেবে সে বিনিময়ে কি চাইবে তা কি ভাবে না ওরা? যে দশ হাজার দেবে তার তিরিশ হাজার টাকার ট্যাক্স যাতে না হয় তার চেষ্টা করতে হবে আমাকে। অর্থাৎ আমার পাড়ার ছেলেরাই বলছে, দেবুদা তুমি অসৎ হও। নিজে যা খাচ্ছে তার থেকে আমাদেরও একটু শেয়ার দাও। কিন্তু ওরা যে অন্যায়ের শরিক হচ্ছে এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। পুজোর সময় রাস্তার লাইন থেকে হুক করে বিদ্যুৎ নিচ্ছে, পাবলিক সেটাকে বেআইনি বলে না কেন? সবাই তখন চোখ বন্ধ করে থাকতে ভালবাসে।

আরে আমি কাছ জানি। আইনকানুন আমার মুখস্থ। সেটা বাঁচিয়ে তার ফাঁক বলে দিয়ে যদি ক্রায়েন্টের ট্যাক্স বাঁচিয়ে দুটো পয়সা নিই তাহলে তোর গা চড়চড় করছে কেন? তোর বাবা নাহয় সাধু মানুষ। যা মাইনে পায় তাই দিয়ে তোদের সংসার চালায়। কিন্তু কি হল? যে মহিলা নার্সিংহোমে আছে তাকে একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারল? আচ্ছা, তিনি নাহয় অনাথীয়া, বাইরে থেকে এসেছেন, তোর মায়ের যদি

বাইপাস করতে হত তাহলে তোর বাপ কি করত? আমি সৎ নীতিবাগীশ, এক পয়সা ঘুষ নিইনি বলে টাকা জমাতে পারিনি, একথা বললে নার্সিংহোম আর ডাক্তার বিনা পয়সায় অপারেশন করে দিত? তখন তো টাকার জন্যে পাঁচজনের কাছে হাত পাড়তে হবে! তাতে সম্মান বাড়বে বোধহয়!

আজ কাজ করতে ভাল লাগছিল না। কাল রাত্রে ভাল করে ঘুমোতে পারিনি। এক লাখ টাকা আমার কাছে ননি কিন্তু খামোকা দিতে যাব কেন? তার ওপর নিজেদের কারও জন্যে নয়, সুখীর ছেলে চাইতে এল বাইরে থেকে আসা কোন এক মহিলার অপারেশনের জন্যে। মাঝরাতে ভেবেছিলাম দেবো না। কিন্তু ভোরবেলায় মনে হল না দিলে ও যা করবে বলছে তা যদি করে তাহলে পাবলিক হাসবে। হয়তো নতুন বিষয় বলে খবরের কাগজে পোস্টার সমেত আমার বাড়ির ছবি ছেপে দেবে। আর আমার অফিসের কর্তাদের ভাবসাব হল, যা ইচ্ছে তাই করো কিন্তু পাবলিক যেন তোমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন না করে! খবরের কাগজে ছাপা হলে অফিস আমাকে নাসপেন্ড করবে, এনকুয়েরি হবে। অবশ্য দু-তিন বছর পরে সমস্যানে ছাড়া পেয়ে যাব কিন্তু ওই দু-তিন বছর তো মাথা নিচু করে বাড়িতে বসে থাকতে হবে। আর সেই সময়ে যে টাকা নিত্য পকেটে আসার কথা তা অন্যের পকেটে চলে যাবে। এক লক্ষ দান করলে যদি পঞ্চাশ লক্ষ বাঁচানো যায় তাই বুদ্ধিমানের করা উচিত। সকালে তাই টাকাটা নিয়ে গিয়েছিলাম নার্সিংহোমে। ভোরে সুখীর ছেলে ফোন করার সুবিধে হয়েছিল। হুদিসটা পেয়েছিলাম। আমার সন্দেহ ছিল পুরো ব্যাপারটা ছোঁকার বানানো, টাকাটা মোরে দেওয়ার শৃঙ্গা। এই টাকা মোরে দিলে আমি পুলিশের কাছে যেতে পারব না তা নিশ্চয়ই ও জানে। কিন্তু আজ নার্সিংহোমে গিয়ে জানলাম ছেলেটা ফেরেবাজি করেনি। পেপেট ভর্তি হবে। আর আমার চোখের সম্মানেই ওরা এল। সুখী চোঁচাছিল, কিন্তু গুনতে পাইনি ডান করে চলে এসেছি। টাকাটা কেন দিলাম এই প্রশ্নের জবাব দিতে হত। দগদগে যা নিয়ে সাধু সাজার কোন ইচ্ছে আমার হয়নি।

আজ যাদের কেস আমার কাছে ছিল তাদের আমার পিওন ফিরিয়ে দিচ্ছিল। তাকে বলেছি সবাইকে জাণিয়ে দিতে যে আমার শরীর খারাপ। অন্যদিন আসতে। কিন্তু বিলু দত্ত দরজা ঠেলে এল সামনে, 'কেসটা কি দাদা? শরীর কেন খারাপ?'

বিলু দত্ত একটা চীৎ। আমাদের দপ্তরের পিওন থেকে এক নম্বর কর্তার সঙ্গে ওর দইরমে হেরফের নেই। সবাই ওকে বলে উকিলবাবু। কিন্তু থার্ক ডিভিশনে ফুল ফাইন্যাল পাশ করার পর ও আর ওই পথে এগোয়নি। ওকালতি করার কোনও যোগ্যতা ওর নেই। অথচ প্রচুর ফ্রাইন্ট আছে ওর। তাদের অথরাইজড রিপ্রেজেন্টেটিভ হয়ে কেস করতে আসে। কাগজপত্র দিয়ে বলে, কত দিতে হবে? আইন জানে না, জানার দরকারও মনে করে না। খোদ বড়কর্তারা ওকে বিশেষ স্নেহ করেন নানা কারণে। তাদের সবরকম চাহিদা বিলু এক ভুড়িতে মিটিয়ে দেয়। অতএব বিলু মাঝারি বা ছোট কর্তাদের এক কথায় এখান থেকে ওখানে ট্রান্সফার করিয়ে দিতে পারে।

বললাম, 'মেজাজ ভাল নেই বিলু।'

ঘড়ি দেখল বিলু দত্ত, 'টিফিন টাইম হয়ে এসেছে। চল!'

'কোথায়?'

'আরে, চলই না।' বিলু দত্ত হাসল।

অফিসে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। ওর সঙ্গে বের হলাম। বিলুকে লাখ টাকা জন্ম খাওয়ার ঘটনাটা বলা যাবে না। আমাকে এক নম্বরের ধুর ভাববে। মেজাজ খারাপ হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে অন্য গল্প বানাতে হবে।

অফিসের দু-পা বাইরে একটা বড় বার কাম রেস্তোরাঁ। তার বেয়ারা আগাদের চেনে। একটা কোণের টেবিলে আমরা বসতেই চিংকার কানে এল। দুটো টেবিলে গোটা দশেক বাচ্চা মেয়ে চিংকার করছে প্রতিযোগিতা করে। ওরা কাছাকাছি এক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী।

বিলু দত্ত দুটো বিয়ারের অর্ডার দিয়ে বলল, 'কি হয়েছে তা জিজ্ঞাসা করছি না। কিন্তু যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। বিয়ারটা খেয়ে ঠিক করো ওদের মধ্যে কার সঙ্গে গল্প করতে চাও।'

'তার মানে?'

'অন্নবয়সী মেয়ের সঙ্গে গল্প করলে মেজাজ ঠিক হতে বাধ্য।'

'এরা তো স্টুডেন্ট।'

'হ্যাঁ, পাশের নার্সী স্কুলের স্টুডেন্ট।'

‘এরা আমার সঙ্গে গল্প করবে কেন? আমি তো ওদের বাপের বয়সী।’

‘করবে। ফান্ বোঝ? ফানের জন্যে করবে।’

আমি মেয়েদের দেখলাম। সবাই নীপার থেকেও ছোট। বড়জোর পনেরো কি ষোল। এই বার কাম রেস্তোরাঁয় এসে বিয়ার খাচ্ছে, কারও হাতে সিগারেট। হয়তো হঠাৎ স্থূল ছুটি হয়েছে নয়তো ক্লাস পলিয়ে এরা এখানে এসেছে আড্ডা মারতে। কিন্তু এখানে একটা বিয়ারের দাম চল্লিশ টাকা। ওই বয়সে কত টাকা হাতখরচা পায় ওরা? মেয়েরা যে এভাবে নিজেদের নষ্ট করছে তা নিশ্চয় অভিভাবকরা টের পায় না। বিলু দত্ত যতই বলুক ওই কচি মেয়েগুলো আমাকে উৎসাহিত করা দূরের কথা, বিমর্ষ করছিল। মনটা এত বিগড়ে গেল যে ইচ্ছে হচ্ছিল ওদের কাছে গিয়ে ধমকে বাড়ি পাঠিয়ে দিই অথবা রেস্তোরাঁর ম্যানেজারকে শাসাই কেন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ার আর সিগারেট খেতে অ্যালাউ করা হচ্ছে।

‘কিন্তু এসব কিছুই না করে বললাম, দত্ত, তুমি বিয়ার খাও। আমি চলি।’

‘সেকি?’

‘হ্যাঁ। আমার ভাল লাগছে না, আর একদিন হবে।’ চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। দরজা ঠেলার আগে মেয়েদের টেবিলের দিকে তাকাতে যে মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হল তার সঙ্গে নীপার মুখের মিল আছে। হঠাৎ মনে হল, নীপা যদি ওদের মধ্যে বসে থাকত? আমি নিশ্চিত যে কলেজ গিয়ে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে নীপা এসব করার কথা ভাবতে পারে না। কিন্তু আমার জানাটা যদি ঠিক না হয়। এই মেয়েদের বাবারাও তো আমার মতো নিশ্চিত হয়ে আছেন। অল্পত একটা কষ্ট বকের ভেতর তিরতির করতে লাগল। নীপার বাড়িতে থাকার কথা, জ্বায়ে তো? এখানে কোনও টেলিফোন বৃথ নেই। হয় অফিসে ফিরতে হবে নয় রেস্তোরাঁয় ঢুকতে হবে আবার। আমি বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়টাই করলাম। ম্যানেজারের ঘরের দিকে যাওয়ার সময় দেখলাম বিলু দত্তের টেবিলে দুটো মেয়ে এসে গেছে। তারা আমার জন্যে অর্ডার দেওয়া বিয়ারটা খাচ্ছে বোধহয়। বিলু কথা বলছে আর ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ছে। বিলু যে এত মজার কথা বলতে পারে তা জানতাম না। ম্যানেজারের অনুমতি নিয়ে নাম্বার টিপতেই নীপার গলা পেলাম। ‘হ্যালো।’

‘তুমি কি সবসময় টেলিফোনের পাশে বসে থাকো?’

‘না তো।’

‘তাহলে এত তাড়াতাড়ি ফোন ধর কি করে? যাকগে, পড়াশুনা করেছ?’

‘হ্যাঁ। আদ্র সুধীরঞ্জন স্ট্রুট আর ইন্ড্রানীদি এসেছিল।’

‘সে কে?’

‘কুচবিহারে থাকে, সুধীজের আত্মীয়। যার মায়ের অপারেশন হবে।’

‘অ। তা কি বলন?’

‘সেই ভদ্রমহিলা তোমাকে দেখতে চান, নার্সিংহোমে আছেন।’

‘কেন? আমি কে? আমাকে দেখার কি আছে?’

নীপা চূপ করে গেল।

আবার বললাম, ‘কেন কিছু বলেছে?’

‘বোধহয় তুমি এক লক্ষ টাকা দিয়েছ—তাই।’

‘আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ছাড়ছি।’

টেলিফোন রেখে দুটো টাকা দিতে গিয়ে ম্যানেজারকে বললাম, ‘আমি সামনের বাড়িতে বসি। ভারত সরকারের একজন সিনিয়র অফিসার। আপনি একটা অন্যান্য কাজ করছেন। এত অল্পবয়সী স্থূলের মেয়েদের এখানে ড্রিঙ্ক করা ঠিক নয়।’

ভদ্রলোক হাসলেন, ‘দেখুন, বিয়ারকে তো এদেশেই মদ বলা হয়। ওটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। ওরা একা আসে না, দল বেঁধে এসে একটু আনন্দ করে। তাই আমি কিছু বলি না।’

আগি অবাক। তবু বললাম, ‘আর অন্য খদ্দেরদের সঙ্গে গল্প করা?’

‘ওহো। কাদের সঙ্গে গল্প করে? আপনার বয়সী মানুষ তারা। আপনারা কিছু খাওয়ালে ওরা খায়। কিন্তু খদ্দেরদের সঙ্গে বাইরে কোথাও যায় না। একটু মজা আর কি।’

‘আপনি এই মজাটাকে প্রশংসা দিচ্ছেন?’

ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসলেন, ‘স্যার, এই বাচ্চা মেয়েগুলো কলগার্ল বা হোর নয়। এরা সবাই স্টুডেন্ট।’

এখানে এরা কখনই কোনও ইনভিসেট ব্যাপার করে না। একজন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে কথা বললে ওরা খুশি হয় কারণ বাড়িতে ওরা সব পায় শুধু বাবার স্নেহ পায় না। কখনই কোনও ইরং ছেলের সঙ্গে ওদের গল্প করতে দেখবেন না। আপনি আশা করি বুঝতে পেরেছেন।’

চূপচাপ বেরিয়ে এলাম। কে কবে শুনেছে স্নেহ পাওয়ার জন্যে কিছু মেয়ে রেস্তোরাঁয় অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে গল্প করে।

আমি অফিসে ফিরে গেলাম। সম্পূর্ণ অকারণে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটলাম। তারপর নিচে নেমে ড্রাইভারকে বললাম নার্সিংহোমে যেতে। এই ভদ্রমহিলা কে আমি জানি না। কুচবিহারে থাকা কোনও বিবাহিতা ভদ্রমহিলাকে চেনার কথাও নয় আমার। বুঝতে পারছি আমি যে টাকা দিয়েছি একথা প্রচারিত হয়েছে এবং সেই কারণেই ইনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এক্ষেত্রে ওখানে যাওয়ার পর আমি হেঁ হেঁ করা ছাড়া কিছুই করতে পারি না। তবু যাচ্ছি।

এখন ডিক্রিটার্সদের দেখা করার সময় পেরিয়ে গেছে। সুধীর ছেলে বা অন্য কাউকে দেখতে পেলাম না বাইরে অথবা ওয়েটিং রুমে। পেশেন্টকে দেখতে যাওয়ার অনুমতি পেতে আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হল। কাল যার অপারেশন হবে তাকে নিয়ে দৃষ্টিভ্রম থাকে। একজন নার্স আমাকে নিয়ে গেলেন এই কারণে, পেশেন্ট আমার সঙ্গে বিশেষ কোনও কথা বলতে চান। তিনি বললেন, ‘কোনও অবস্থাতেই আপনি পাঁচ মিনিটের বেশি ওঁর কাছে থাকবেন না।’

ভদ্রমহিলা শুয়েছিলেন চোখের ওপর ডান হাতের কনুই। নার্স বললেন, ‘একটু কথা বলুন।’

ভদ্রমহিলা হাত সরললেন চোখের ওপর থেকে। মুখের চেহারা শীর্ণ।

‘আমি দেবু, সুধী আমার বন্ধু।’

ভদ্রমহিলা নীরন্ত হাসি হাসলেন, ‘ও। আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব।’

‘ওকথা থাক।’ আমি খুব নির্লিপ্ত হয়ে বললাম।

‘কিভাবে শোধ করব তা যদি মোয়েকে বলে দেন।’

‘এসব কথা ছোটদের সঙ্গে বলা ঠিক নয়। আপনি সেরে উঠুন, তারপর দেখা যাবে।’

ভদ্রমহিলা একটু চূপ করে থেকে বললেন, ‘আপনি যা করলেন—।’ এইটুকু বলামাত্র তাঁর মুখে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল। ডান হাতে বুক খামচে ধরলেন তিনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কি হল? শরীর খারাপ লাগছে?’

ভদ্রমহিলা কাতরে উঠতেই আমি খুব নার্ভাস হয়ে গেলাম। যে নার্সটি আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়েছিলেন, ঘরের বাইরেই তাঁকে পেলাম। চিৎকার করে বললাম, ‘তাড়াতাড়ি আসুন, পেশেন্টের যন্ত্রণা হচ্ছে।’

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে গেলেন ডেভরে। বেল বাজার শব্দ হল। দ্রুত ছুটে এল আরও কয়েকজন। উঁকি মেরে দেখলাম, ওঁর মুখে অক্সিজেন মাস্ক পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একজন, সম্ভবত ডাক্তার, ইনজেকশন দিচ্ছেন। তারপরেই আমার চোখের সামনে দিয়ে ওঁরা ওঁকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে আমি কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। ওঁদের কথায় শুনতে পাচ্ছিলাম ওঁরা ডক্টর সেনের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এইসময় একজন প্রবীণ ডাক্তারকে দ্রুত ছুটে আসতে দেখলাম। মনে হল ইনিই ডক্টর সেন। এগিয়ে গিয়ে বললাম, ‘ডক্টর, ট্রাই টু সেভ হার।’

‘আপনি?’

‘আমি ওঁদের—।’ কি বলব ভেবে পেলাম না।

ডাক্তার আর দাঁড়ালেন না। আমি বলতে চাইছিলাম, যত টাকা লাগুক আমি আছি, ইউ গো অ্যাহেড। কিন্তু বলতে পারলাম না। কেবলই মনে হচ্ছিল, আমাকে দেখার সময়েই ভদ্রমহিলা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। উনি যা বলছিলেন তা মনে নিলে হয়তো হতেন না। অথচ আমি তো কোনও খারাপ কথা বলিনি।

তারপরই খেয়াল হল। সুধীরপ্লানদের খবর দেওয়া উচিত। ওঁদের বাড়িতে ফোন নেই। খবর দিতে হলে নিজে যেতে হবে। অবশ্য যত বাড়াবাড়ি ভাবছি তত নাও হতে পারে। আর একটু দেখা যাক। আমি নিচে নেমে ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসলাম। রাত দশটা নাগাদ ডক্টর সেন নেমে এলেন। আমি দৌড়ে তাঁর কাছে যেতে তিনি বললেন, ‘খুব খারাপ। খুব খারাপ। এ অবস্থায় যেটুকু করার তা করা হয়েছে। এখন ঈশ্বর যা চাইবেন তাই হবে।’

‘উনি কেমন আছেন?’

‘এখন কোমায় আছেন।’ ডক্টর সেন বিমর্ষ মুখে চলে গেলেন।

কোমায় শব্দটা আমি জানি। মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এখন এখানে থেকে কিছু করার নেই। বাড়ি ফেরার সময় ভাবছিলাম কি করব! আমি যে নার্সিংহোমে গিয়েছি তা কারও জ্ঞানার কথা নয়। নার্সিংহোমের লোকজনও আমার পরিচয় জানে না। অতএব সুধীরপ্রসন্নরা বুঝবে না আমি ওখানে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ মনে হল এ কি ভাবছি আমি? একটা মানুষ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আর আমি নিজেকে লুকোবার চেষ্টা করছি? আমি তো কোনও অন্যায় করিনি অথবা আমার জন্যে মহিলার হার্ট আক্রান্ত হয়নি। তাহলে কেন অকারণ এই পালিয়ে যাওয়া! আমি ড্রাইভারকে বললাম সুধীরপ্রসন্নের বাড়িতে যেতে।

এখন সাড়ে দশটা বাজে। দরজা খুলল সুধী। আমাকে দেখে একটু অবাক এবং সেইসঙ্গে বিরক্ত, ‘এসো। তোমার বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম। তুমি কি নার্সিংহোমে যাওয়ার সময় পেয়েছিলে?’

তখন খেয়াল হল। এরা নার্সিংহোমে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে বলেছিল আমার মেয়েকে। কাল নার্সিংহোমে গেলে শুনতে পেত এক ভদ্রলোক ডিজিটিং আওয়ারের পর এসেছিলেন। সেই লোক যে আমি তা বুঝতে অসুবিধে হত না।

বললাম ‘আমি সেখানে থেকেই আসছি।’

‘ও। কথা হয়েছে?’

‘সুধী, খবর ভাল নয়।’

‘মানে?’

‘ভদ্রমহিলার ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। এখন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে আছেন। আমি ডাক্তার সেনের সঙ্গে কথা বলেছি।’

‘কি বলছ তুমি?’ সুধীরপ্রসন্ন ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

‘হ্যাঁ, ওঁর এখন জ্ঞান নেই।’

‘ডাক্তার, ডাক্তার সেন কি বললেন?’ সুধীরপ্রসন্ন ঘামতে লাগল।

‘এখন ঈশ্বরই একমাত্র বাঁচাতে পারেন।’

আমার কথা শেষ হওয়ামাত্র দরজায় একটা চাপা কান্না শোনা গেল। সুধীর স্ত্রী যে কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন খেয়াল করিনি। সেই কান্না ডেকে নিয়ে এল দীপা এবং আর একটি মেয়েকে। এই মেয়ে যে ইঞ্জিনী তা বুঝলাম। ওরা বারংবার জানতে চাইল কি হয়েছে। সুধীরপ্রসন্ন আঙুল তুলে আমাকে দেখিয়ে দিতে একই কথা আবার বলতে হল।

ইঞ্জিনী ছিটকে চলে এল সামনে, ‘মায়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি?’

অস্বীকার করতে পারলাম না, ‘হ্যাঁ, হয়েছিল।’

‘তখন মা কিরকম ছিল?’

‘নরমাল বলেই মনে হচ্ছিল। দু-চারটে কথা বলার পর যখন চলে আসছি তখন হঠাৎ ওঁর বুকে যন্ত্রণা শুরু হয়। তবে হ্যাঁ, চিকিৎসা শুরু করতে একটুও দেরি হয়নি।’

দীপা ওর বাবার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, ‘আপনার সঙ্গে কি কথা হয়েছে?’

‘আমার পরিচয় পেয়ে উনি বারংবার ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন। বিশ্বাস করো, এই ধন্যবাদ দিতে চাইবেন বলেই আমার ওখানে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলেন কিভাবে টাকাটা শোধ করবেন? আমি বললাম, শোধ করা নিয়ে এখন না চিন্তা করতে। খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথা বলছিলেন। হঠাৎ—।’

ইঞ্জিনী বলল, ‘মামা, আমি নার্সিংহোমে যাব।’

‘এত রাত্রে!’ সুধীর স্ত্রী বললেন।

‘না, মায়ের যদি কিছু হয়ে যায় আমি—।’

সুধী বলল, ‘শান্ত হও মা। দেবু বলছে তাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রাখা হয়েছে। সেখানে তো কাউকে যেতে দেবে না। ভোর হোক, আমিই তোমাকে নিয়ে যাব।’

‘আর মাঝরাত্রে যদি কিছুর থয়োজন হয়? আমরা কেউ নেই, যদি ওরা ওষুধ আনতে বলে? না মামা, আমাকে যেতেই হবে।’

দীপা বলল, ‘ও ঠিক বলেছে বাবা। তুমি আমাদের নার্সিংহোমে পৌঁছে দিয়ে এসো। আমরা দু-জনে ওখানে থাকব।’

সুধীরপ্রদন উঠে দাঁড়াল। স্ত্রীকে বলল, 'আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি। দীপু বাড়ি ফিরলে নার্সিংহোমে যেতে বোলো। ও গেলে আমি ফিরে আসব।'

এতক্ষণ চুপচাপ ওদের কথাবার্তা শুনছিলাম। এবার বললাম, 'আমি ডক্টর সেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, উনি বললেন কোনও প্রয়োজন হবে না। একথা ঠিক, মাকে ওই অবস্থায় নার্সিংহোমে রেখে তুমি ঘুমোতে পারবে না। আমার সঙ্গে গাড়ি আছে, চল।'

ওদের নার্সিংহোমে নামিয়ে দিলাম। বাড়ি ফিরতে ফিরতে মাঝরাত। হঠাৎ মনে হল আমার যদি ওই অবস্থা হয় তাহলে নীপা একা কী করবে? ও তো পৃথিবীর কিছুই জানে না। তখনই ঠিক করলাম, এবার মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

নীপা জেগে ছিল। ও কোনদিন আমার প্রণয় করে না, আজ করল।

বললাম, 'তুই জেগে আছিস আমার মাথায় ছিল না। নইলে ফোন করতাম। খুব খারাপ ব্যাপার। ইন্ড্রানীর মা নার্সিংহোমে যাওয়ার পর খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তখন ওরা কেউ ছিল না। ওদের বাড়িতে খবর দিয়ে নার্সিংহোমে নামিয়ে এলাম।'

নীপা বলল, 'আমার খুব ভয় করছিল।'

'আমার জন্যে? দূর! আমার কিছু হতে না। তবে ফোন করা উচিত ছিল।' আমি হাসলাম, 'খেয়েছিন? খানসনি কেন? যা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়।'

নীপা চলে গেল। এই মেয়ে আমার চিন্তা। ওর যে বয়স সেটা খুব খারাপ। কখন কোন বদ ছেলের পাশায় পড়বে কে জানে? আমি বাড়িতে থাকলে ওর ফোন এলে যাচাই না করে দিই না। কিন্তু যখন থাকি না? আজ রেস্তোরাঁয় যে মেয়েদের দেখেছি তারপর ভয়টা আরও বেড়েছে। না, ওর বিয়ের জন্যে উদ্যোগ নিতে হবে।

মান করে এক পেগ হইকি ঢাললাম। অন্যরাত্রে এতক্ষণ মাল ও ডিনার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। আর প্রচুর দেরি হয়ে গেল। কিন্তু দু-পেগ পেটে না গেলে ঘুম আসবে না। তাছাড়া খুব ক্লান্ত লাগছে। এক পেগ খাওয়ার পর খেয়াল হল। আমি ওদের নার্সিংহোমের দরজায় নামিয়ে দিয়ে এসেছি, ভেতরে গিয়ে পেশেন্টের গবর নিয়ে আসিনি। আসলে অত রাত হয়ে গিয়েছিল আর ওরা গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল আমার আর করার কিছু নেই। দ্বিতীয় পেগ হইকি গ্রাসে ঢেলে কর্ডলেস রিসিভারের বোতাম টিপলাম। সকালে গাইড দেখে নার্সিংহোমের নান্দার আর ঠিকানা জেনে নিয়েছিলাম। টেলিফোন নান্দার আমি চট করে ভুলি না। নার্সিংহোমের রিনেপশনিষ্ট আমার প্রথম শুনে একটু চুপ করে বলল, 'সরি স্যার। পেশেন্ট একটু আগে মারা গিয়েছেন।'

দীপা

আমি এর আগে কখনও কাউকে মারা যেতে দেখিনি। কুচবিহারের পিসিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে সঙ্গে যেতে হয়েছিল কারণ ইন্ড্রানী মুখাণি করেছিল। দাদাই উদ্যোগী হয়েছিল। ওর পার্টের ছেলেরা দল বেঁধে এসেছিল। ইন্ড্রানী এত কাঁদছিল যে আমিও না কঁদে থাকতে পারছিলাম না। ইলেকট্রিক চুম্বিতে দেওয়ার আগে শ্মশানের পুরোহিত যা বা ইন্ড্রানীকে দিয়ে করাল তা শুধু অন্যায় নয় ভয়ঙ্কর। মৃত মায়ের মুখে পিণ্ডি ঠুসে দেওয়া, আগুনের ঝাঁক দেওয়া যে কতখানি বর্বরতা কি কেউ বোঝে না? আমাদের সমাজ-সংস্কারকরা, সরকার, রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে কতদিন থাকবে?

এই কদিন বাড়িতে কেউ ভাল ভাবে কথা বলেনি। এমন গোকার্ড আবহাওয়া কখনও হয়নি। অথচ ভদ্রমহিলা আমাদের কেউ নন। ওঁর সঙ্গে বাবার দেখা হল কত বছর বাদে। কিন্তু এত অল্প সময়ে আমরা ওঁদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি যা ভাবা যায় না। ইন্ড্রানীর জন্যেই বেশি কষ্ট হচ্ছে। বিছানা থেকে উঠতেই চাইছে না। জোর করে খাওয়াতে হচ্ছে। একা হলেই অঝোরে কাঁদছে। ওর মায়ের শ্রদ্ধা এখানকার চৈতন্যমন্দিরে করা হবে আজ। বাবাই সব ব্যবস্থা করেছে।

কিন্তু এর মাঝে কয়েকটা কাণ্ড হয়েছে। প্রথমত, আমি একদম বাড়ি থেকে বেরুতে পারছি না। এখন কলেজ ছুটি কিন্তু লাইব্রেরিতেও যাওয়া হচ্ছে না। আর সেখানে যেতে পারছি না বলেই শোভনের সঙ্গে

দেখা হচ্ছে না। এতদিন শোভনের সঙ্গে দেখা না করে থাকতে আমারও কষ্ট হচ্ছে। আমাদের বাড়িতে ফোন নেই। গত পরশু শোভন আমাদের ক্লাসের সূকন্যাকে পাঠিয়েছিল খবর নিতে। সব জেনে নিয়ে সূকন্যা বলেছে আচ্ছ যেন আমি অবশ্যই শোভনকে ফোন করি। ফোন না পেলে শোভন চলে আসবে। কিন্তু ফোন করতে হলে বাসস্টপের কাছে যেতে হবে। ইন্ড্রাণীকে ছেড়ে কোথাও যেতে মা নিষেধ করেছিল। এখন তো মা বাবা দাদা ওকে নিয়ে চৈতন্যমন্দিরে গিয়েছে। বাড়ি আগলাবার দায়িত্ব আমার ওপর। দরজায় তালা দিয়ে যাই কি করে?

দ্বিতীয় ব্যাপার হল দাদা সন্দেহ করছে পিসির হার্ট আটাকের পেছনে দেবুসূর ভূমিকা আছে। যে মহিলা ভালই ছিলেন, নার্স দাদাকে বলেছে, দেবুসূর যখন বেশ রাগে অনেক অনুরোধ করে দেখা করার অনুমতি পেয়েছিলেন তখন পিসির কোনও অস্বস্তি ছিল না। ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল নার্স শোভেনি। ওদের পাঁচ মিনিট কথা বলার সময় দিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। দাদার অনুমান সেসময় দেবুসূর নিশ্চয়ই পিসিকে এমন কথা বলেছিলেন যা তিনি সহ্য করতে পারেননি। কিন্তু কি বলেছিলেন তার কোনও সাক্ষী না থাকায় পুলিশ-কেস হবে না। একথা শুনে বাবা খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'যে লোকটা এক কথায় লক্ষ টাকা বের করে দেয় সে ব্যক্তিগতভাবে যত অসুস্থ হোক কোনও অসুস্থ মানুষের ওপর মানসিক অত্যাচার করবে না। করলে এ বাড়িতে অত রাতে খবর দিতে আসত না। যার চিকিৎসার জন্যে লোকে টাকা দেয় তার ওপর কেউ দুর্ব্যবহার করে?'

দাদা বলেছিল, 'এক কথায় টাকা দেবুসূর দেয়নি।'

'তাহলে? দিল কেন?'

'ভয় পেয়ে দিয়েছিল। না দিলে বাড়িতে পোস্টার মেয়ে ওর কীর্তির কথা ফাঁস করে দেওয়া হবে বলে দিতে বাধ্য হয়েছিল।'

'তুই এই ভয় ওকে দেখিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ। নইলে টাকাটা পাওয়া যেত না।'

'ছি ছি ছি! তুই লোকটাকে ব্ল্যাকমেল করলি?'

'যা সত্যি তাই বলেছি। মিথ্যা তো চাপিয়ে দিই নি।'

'অন্যায় করেছিস। খুব অন্যায়।' বাবা মানতে পারছিল না।

'চুপ করো তো। তোমার মতো ন্যায়-অন্যায় নিয়ে মাথা ঘামালে পৃথিবীতে কেউ সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারবে না। ওইভাবে টাকা দিতে হয়েছিল বলে সেদিন সকালে দেবুসূর নার্সিংহোমে তুমি ডাকা সত্ত্বেও গুনতে পায়নি। তাড়াহাড়ি পালিয়ে যেতে পেরে খুশি হয়েছিল। তাই রাগে পিসিকে একা পেয়ে নিশ্চয়ই খুব কথা গুনিয়েছিল। টাকা ফেরত দেওয়ার শর্ত দিয়েছিল যা মেনে নেওয়া হয়তো পিসির কাছে অসম্ভব ছিল।' দাদা বলেছিল।

'এসব তোর অনুমান দীপু। শুধু অনুমানের ওপর কারও গায়ে কালি ছিটিয়ে কোনও লাভ নেই। দেবু যে টাকা দিয়েছিল তা যখন কাজে লাগল না তখন ওকে টাকাটা ফেরত দিয়ে দে।'

কথাগুলো হচ্ছিল বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ইন্ড্রাণী যে ঘরে বসে গুনতে পাচ্ছে কেউ ভাবেনি। ইন্ড্রাণী উঠে এসেছিল দরজায়, 'মামা, দেবুসূর টাকা আমি এ মাসেই শোধ করে দেব। মায়ের কাজ হয়ে গেলে কুচবিহারে ফিরে গিয়ে আমি বাড়ি বিক্রি করে টাকা আনব। আপনি এই কটা দিন ওর কাছে সময় নিন।'

বাবা কিছু বলতে পারেনি। ওর মুখ দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল।

তৃতীয় সমস্যাটা মায়ের। শুধু কি মায়ের? এই পরিবারেরও। কিন্তু সমস্যাটার কথা আমার মাথায় আসেনি। বাবা বা দাদারও নয়। গতকাল ছাদে কাপড় তুলতে গিয়েছিলাম। দেখি মা ছাদে উঠে এসেছে। ইদানীং শরীর ভারী হওয়ায় মা ছাদে ওঠে না। মা যেভাবে এসে দাঁড়াল তাতে বুঝতে অসুবিধে হল না কিছু বলতে চাই।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিছু বলবে?'

'কি আর বলবে? কাল আমরা বাড়িতে থাকব না, দয়া করে দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে না, খুব চুরিচামারি হচ্ছে।' মা বলেছিল।

ইদানীং এ পাড়ায় চুরি হয়েছে বলে গুনিনি।

'আমি অনেকদিন বাড়িতে বন্দী হয়ে আছি।'

‘বন্দী আবার কি। এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেলে একটু সংযমে থাকতে হয়। আমরা সবাই নিরামিষ খাচ্ছি, কেন খাচ্ছি।’

‘খরচ কমে যাচ্ছে।’

‘নিরামিষে বেশি খরচ হয়। আমি ভাবছি অন্য কথা।’

মাকে চূপ করতে দেখে বুঝতে পারলাম এবার আসল কথাটা বলবে। অনেকদিন একসঙ্গে বাস করলে ভঙ্গি দেখে মানুষকে বোঝা যায়।

‘তোমার বাবার তো কোনও বিষয়জ্ঞান নেই। ইন্দ্রাণীরা পুরোনো সূত্র ধরে এসেছিল এ বাড়িতে, ওর মায়ের চিকিৎসার পর ফিরে যেত, এসব জানি। কিন্তু ওর মা চলে যাওয়ার পর তো সমস্যা হল।’ মা চূপ করল।

‘কি সমস্যা?’ আমি বুঝতে পারলাম না।

‘কুচবিহারে ওর নিজের কেউ নেই। এখন যদি মেয়েটা এখানে থেকে যায়?’

‘থাকবে কেন?’

‘সেই কথাটাই তো বলছি। দু-তিন মাস থাকুক, বিপদে পড়েছে, কিন্তু পাকাপাকি থাকলে মুশকিল। একটা মানুষের খাওয়ার খরচ তো কম নয়। তাছাড়া নিজের মেয়েকে নিয়ে ভাবনায় মরছি, আর একটা আইবুড়ো মেয়ে যদি ঘাড়ের ওপর থাকে তাহলে কি করে সামলাবো?’

‘তার মানে? আমি তোমার ঘাড়ের ওপর আছি?’

‘যতক্ষণ তোমার একটা হিম্মে না হচ্ছে ততক্ষণ কাঁটা হয়ে আছি। একথা এখন তুই বুঝবি না, মা হওয়ার পরে বুঝবি।’

‘কিন্তু ইন্দ্রাণী তো কলকাতার ইউনিভার্সিটিতে পড়বে এমন প্ল্যান করেছিল।’

‘তার মা কুচবিহার থেকে টাকা পাঠাতো, সে হোস্টেলে থাকত। এখন তো এখানে থেকে পড়বে।’

‘আমাকে এসব কথা বলেনি।’

‘তোকে কি করে বলবে? তোমার বাবা ওর কানে ঢোকাচ্ছে। কাল বলছিল, তুমি একদম ভাববে না মা। তোমার মায়ের শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করতেই হবে। দীপা আছে, তুমি ওর সঙ্গে থেকে ইউনিভার্সিটিতে পড়বে।’

‘ইন্দ্রাণী কি বলল?’

‘সে অবশ্য কিছু বলেনি। কাঁদছিল। অবশ্য নিচু গলায় কিছু বললে আমি শুনতে পাইনি।’

‘তুমি বাবার সঙ্গে কথা বলো।’

‘বলেছি। কি বলেছে জানিস? তুমি এত নিষ্ঠুর হয়ে না শোভনা। মেয়েটা সদ্য মাতৃহারী, ওর কেউ নেই। তুমিই তো ওকে রোজ সাতুনা দিচ্ছ। তাহলে? আরে লোকটাকে কি করে বোঝাই ক’দিনের জন্যে সাতুনা দিচ্ছি এতে যেমন কোনও ফাঁকি নেই তেমনি আর একটা মানুষের বোঝা টেনে সংসার চালাতেও যে আমি পারব না।’ মা বলল।

‘দাদাকে বল।’

‘পাগল। তিনি তো শুনলে মারতে আসবেন হয়তো। নিজে একটা পরসা দেয় না, সংসারের কোনও কাজে আসে না, অথচ দু’বেলা ওর খোঁজ নিচ্ছে।’

‘কর?’

মা এমন চোখে তাকাল যেন আমাকে ভয় করে দেবে। আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না মা। হনহনিয়ে নেমে গেল ছাদ থেকে।

এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। আমি মাকে সমর্থন করতে পারছি না, আবার খরচের কথা ভাবলে মনে হচ্ছে মায়ের ভয় পাওয়াটা অমূলক নয়। বাবা যা টাকা দেয় মাকে তো তার মধ্যেই চালাতে হয়। মাসের শেষে দাদা যে খাওয়া নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝামেলা করে সেটা কি কারণে তা সবার জানা। ইন্দ্রাণীর মতো মিষ্টি মেয়ে এ বাড়িতে থাকলে তো ভালই হয় কিন্তু তার চেয়ে ভাল হয় ও কলকাতায় পড়তে এলে যদি হোস্টেলে গিয়ে থাকে।

আগের রাতে তরকারি রান্না করে রেখেছিল মা, বলেছিল, চৈতন্যমন্দির থেকে ফিরতে যদি দেরি হয় তাহলে ভাতটা করে রাখতে। আমি অবশ্য রান্নাঘরে সচরাচর ঢুকি না, কিন্তু একটু-আধটু রান্না পারি। শোভন

বলেছে ওদের বাড়িতে গেলে আমাকে নাকি রান্না করতে হবে না। ওদের বংশের বউরা রান্নাঘরে ঢোকে না। ঠাকুরের হাতে খেয়ে জীবন কাটায়।

বেল বাজল। অল্প শব্দ করে থেমে গেল। মা-বাবা ইন্ড্রাণীকে নিয়ে বেরিয়েছে মাত্র ঘন্টাখানেক আগে। এত ত্যাগত্যাগি ওদের ফেরার কথা নয়। অন্তত ঘন্টা চারেক লাগে বলে শুনেছি। হয়তো কোনও জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গেছে বলে দাদা ফিরেছে। কিন্তু দাদা তো অমন চোরের মতো বেল বাজাবে না। বাড়িতে কেউ নেই যদিও তবু এখন তো দিনের বেলা। আমি দরজা খুললাম।

খুলে হাঁ হয়ে গেলাম। শোভন দাঁড়িয়ে হাসছে।

‘এ কি? তুমি?’

‘সকালে ফোন করলে না বলে চলে এলাম।’

‘আশ্চর্য! এখন কি সকাল শেষ হয়ে গেছে!’ আমি দ্রুত রাস্তাটা দেখে নিলাম। পাড়ার কেউ দেখলেই চিত্তির, ‘ঠিক আছে, আমি বিকেলে ফোন করব।’

‘এক গ্লাস জল খাওয়াবে, গলা শুকিয়ে গিয়েছে।’

কেউ জল খেতে চাইলে না বলি কি করে। ওকে বাইরের ঘরে বসিয়ে দরজা বন্ধ করলাম। বুকের ভেতর ড্রাম বাজছিল। দ্রুত ভেতরে গিয়ে জল ঢাললাম গ্লাসে। শোভনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কখনও কফি হাউস বা রেস্তোরাঁ ছাড়া অন্য কোথাও বসে গল্প করিনি। আনন্দ হচ্ছিল, সেইসঙ্গে ভয়ও।

জল খেয়ে শোভন ঝলল, ‘তোমার মা-বাবাকে ডাকো, আলাপ করি।’

‘আলাপ করতে হবে না। তুমি এখন যাও।’ আমি হাসলাম।

‘কেন?’

‘ওরা কেউ বাড়িতে নেই। আমাদের যে আত্মীয়্য মারা গিয়েছেন তাঁর শ্রাদ্ধের জন্যে চৈতন্যমন্দিরে গিয়েছে সবাই। আমি বাড়ি পাহারা দিচ্ছি।’ বললাম।

‘তার মানে বাড়িতে কেউ নেই, তুমি ফাঁকা বাড়িতে একা?’

‘সেইজন্যে তো তোমায় ফোন করতে যেতে পারছিলাম না।’

শোভন কিছু দেখছে দেওয়ালে এমন ভঙ্গিতে আমার পাশে চলে এল। ওখানে একটা স্নানপ্রপাতের ছবি টাঙানো ছিল। হঠাৎ ঘুরে ও আমাকে জড়িয়ে ধরল।

আমি চিৎকার করতে গিয়েও গলা নামাতে পারলাম, ‘এ কি? কি করছ?’

‘আগি আমার প্রেমিকাকে আদর করছি।’ আমার মাথাটা শক্ত করে ধরে ও মুখ নামাতে চাইছিল। আমি প্রবল বাধা দিতে চাইলাম, ‘শোভন, প্লীজ, যে কেউ এখানে চলে আসতে পারে, প্লীজ।’

কিন্তু ততক্ষণে ওর ঠোট আমার ঠোটে পৌঁছে গিয়েছে। একটা নোনতা স্বাদ জিভে যাওয়ামাত্র আমার শরীরের সমস্ত শক্তি যেন এক ফুঁয়ে উধাও হয়ে গেল। শোভন পাগলের মতো আমার ঠোট, গাল, নাক, কপাল, কান, কানের পেছনে চুমু খেয়ে যাচ্ছিল। আশ্চর্য, আমার মনের সমস্ত ভালোলাগা বোধগুলো তুবড়ির মতো ছিটকে আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছিল।

মুখ থেকে গলা, গলা থেকে আর একটু নিচে ওঁর ঠোট নামা মাত্র বিদ্যুৎ প্রবাহিত হল শরীরে। আমি ছিটকে সরে গিয়ে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বললাম, ‘না।’

‘কেন? আমরা তো পরস্পরকে ভালোবাসি?’

‘এটা ভালোবাসা নয়।’

‘বাঃ, এটা ভালোবাসা নয়? শরীর আর মন নিয়েই তো ভালোবাসা।’

‘ওসব বিয়ের পরে। চোরের মতো নয়।’

‘তুমি এত কনজারভেটিভ?’

‘শোভন, প্লীজ, আমরা কেন অসংযমী হচ্ছি?’

‘ও. কে! তুমি যখন বলছ তখন তো আমাকে সাধু হতে হবেই।’

‘তুমি এখন চলে যাও, যে কেউ এলে বিত্রী হবে।’

‘কি আর হবে? বলবে, আমার বন্ধু এসেছিল, ওর সঙ্গে গল্প করছিলাম।’

‘এটা এই মধ্যাহ্ন প্যাডায় চলে না। তবু মা যদি বাড়িতে থাকত তাহলে হত।’

‘বেশ যাচ্ছি, কিন্তু একটা শর্তে।’

‘শর্ত?’

‘হ্যাঁ। একটু আগে আমি তোমাকে চুমু খেয়েছি, তুমি অ্যাকটিভ হওনি। এবার তুমি আমাকে চুমু খাও, আমি চলে যাব। দুহাত দু-দিকে বাড়াল শোভন।

‘শোভন, ব্রীজ, না!’ আমি কাতর গলায় বললাম।

‘দেন, ইউ ডোন্ট লাভ মি!’

‘তা কেন? আমি—, আই লাভ ইউ।’

‘তাহলে এসো তুমি খাও।’

‘তাহলে চলে যাবে?’

‘নিশ্চয়ই।’

‘বেশ যাচ্ছি, কিন্তু তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরবে না।’

‘মানলাম।’

আমার দুটো পা শিরশির করছিল। ক্রোনিরকমে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। শোভন আমার থেকে অন্তত সাত ইঞ্চি লম্বা। ও মুখ না মামালে ঠোঁটের নাগাল পাব কি করে? বললাম, ‘মুখ নামাও।’

শোভন চোখ বন্ধ করে মুখ নামাল। আমি চোখ বঁজ্জে ওকে চুমু খেয়েই দূরে সরে এলাম। শোভন বলল, ‘জিরাকেরা বোধহয় এভাবে চুমু খায়।’

‘এবার যাও।’

‘বাই। বিকেলে বাড়িতে আছি। পারলে ফোন করো।’

‘যদি না করি তাহলে কাল দেখা হবে। কলেক্স যাব।’

দরজা খুলে শোভন চলে গেল। দরজাটা বন্ধ করে আমি অনেকক্ষণ বাইরের ঘরে বসে রইলাম। আমার খুব ভালো লাগছিল। জীবনে এই প্রথম আমি পুরুষের আদর পেলাম। তখন ভয় করছিল, ভালো লাগছিল না, কিন্তু এখন সমস্ত শরীরে অন্য অনুভূতি। একসময় সেই অনুভূতিটাকে লালন করতে করতে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

শোভনা

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান চোখের ওপর আমি দেখিনি। আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। যে চলে গেছে, তা গেছেই, কিন্তু এই মেয়েটার এখন কি হবে? কাল রাতে আবার খোঁজখবর করেছি ওর কাছে। মায়ের মৃত্যুসংবাদ ও দু-একজন আত্মীয়কে জানিয়েছে চিঠি লিখে। কিন্তু শ্রাদ্ধের খবরটা তো জানানো দরকার ছিল। কিন্তু ইচ্ছাশীল মাথা নেড়েছিল, ‘মা বেঁচে থাকতে যারা খবর নিতে একবারও আসেনি বাড়িতে তাদের শ্রাদ্ধের খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই।’

আমি ওর আমাদের বাড়িতে থাকা নিয়ে যত চিন্তা করি না কেন নিজেকে ওখ জায়গায় নিয়ে গেলে খুব অসহায় হয়ে পড়ছি। আমি তো পাগল হয়ে যেতাম। ফেরার সময় ওকে জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম ট্যান্ডিতে। ওর ওপাশে আমার স্বামী। এই লোকটা যতই কাণ্ডজ্ঞানহীন হোক না কেন, কখনও কখনও মনে হয় এরকম মানুষকে স্বামী হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের কথা। যখন ও বেহিসাবী হয় তখন রাগ হয় কিন্তু আজ পর্যন্ত তো কোনও মানুষের খারাপ চেয়েছে এমন ঘটনা চোখে পড়েনি।

তিন-তিনবার বেল বাজানোর পর দীপা দরজা খুলল। ওর বাবা খুব বিপদে হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার? ঘুমোচ্ছিলি?’

মেয়ে কোনও কথা না বলে ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল কিছু হয়েছে। ঘরে ঢুকে সোজা ওর কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম, ‘কি হয়েছে?’

দীপা আমার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল, ‘কিছু হয়নি।’

‘কিছু না হলে তো মুখ অত লাল কেন?’

‘কোথায় লাল?’ দীপা প্রতিবাদ করল, ‘সব ব্যাপারে সর্ব্বের মধ্যে ভূত দ্যাখো! আচ্ছা মুশকিল!’ ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মনে একটা দুশ্চিন্তা খচখচ করতে লাগল। হয়তো আমারই ভুল। কিন্তু কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তার মুখ লাল হয় বলে কখনও শুনিনি। তারপর মনে হল, আমি ইচ্ছে করেই সমস্যা তৈরি করছি হয়তো। এখন দীপাকে সন্দেহ করার মতো কিছু ঘটেনি। ইন্ড্রাণী ঘরে ঢুকল। বললাম, ‘একটু ওয়ে নে।’

‘নাঃ।’

‘তাহলে খেয়ে নে। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে তোকে দিচ্ছি।’ আমি তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে দেখি কোথায় ভাত? সব খাঁ খাঁ করছে।

আমার চিৎকার শুনে দীপা এসে দাঁড়াল। বেশ রোগে গিয়েছিলাম, ‘তোকে কি বলেছিলাম যাওয়ার সময়? মনে আছে?’

ওর কপালে ভাঁজ পড়ল। মাথা নেড়ে না বলল।

‘তোকে ভাতটা করে রাখতে বলিনি?’

‘ও, হ্যাঁ। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।’

‘এইরকম ঘুমিয়ে থাকো, আমি উদ্ধার হয়ে যাব, কেমন?’

‘সব্রে যাও, করে দিচ্ছি।’

‘থাক। একটা কাজ কাউকে বলে গেলে এবাড়ির কেউ সেটা করবে না। আমি না মর্য্য পর্যন্ত আমার হাত জুড়োবে না। যাও, চোখের সামনে থেকে দূর হও।’

খাওয়া-দাওয়ার পর মনে হল ইন্ড্রাণীকে বললে হয় দীপার কি হয়েছে জানতে। খেতে বসার সময়ে এবং তার আগে-পরে ও অন্যদিনের মতো স্বাভাবিকভাবে কারও সঙ্গে কথাই বলল না। কোনও গোলমাল না হলে ও এমন করবে না। ওঁকে বলতে গেলাম, উনি উড়িয়ে দিলেন, ‘তখন বাড়ি ঢোকামাত্র বকাবকি করলে তুমি। কাঁচা ঘুম ভাঙার পর বকুনি শুনতে খুব খারাপ লাগে।’

ও বাইরের ঘরে বসে কাগজ পড়ছিল, আমি আমাদের শোওয়ার ঘরে। ইন্ড্রাণী এল। মেয়েটা খুব ধীর, শান্ত। বললাম, ‘আয় বোস।’

ও বসল না। খাটের বাজু ধরে বলল, ‘মামী, আমি কাল চলে যাব।’

‘চলে যাবি? কোথায়?’ আমি অবাক হলাম।

‘কোথায় আবার? কুচবিহারে।’

‘সেকি? সেখানে এখনই যাওয়ার কি দরকার? আর গিয়ে ওই খালি বাড়িতে তুই একা থাকবি কি করে? যাব বললেই হল?’ আমি ধমকালাম।

‘কিন্তু আমাকে যেতেই হবে মামী।’

‘কেন?’

‘সেবুকাবুর ধারটা শোধ না হওয়া পর্যন্ত মা শান্তি পাবে না।’

‘তার জন্যে এত ভাবছিস কেন? যে জন্যে টাকাটা জমা নিয়েছিল সেটা যখন হয়নি তখন নার্সিংহোম নিশ্চয়ই ফেরত দিয়ে দেবে। দিলে দিয়ে দিবি।’

ইন্ড্রাণী মাথা নাড়ল, ‘কবে দেবে জানি না। দেওয়ার সময় তো খানিকটা কেটে নেবে। কারণ মা ওদের ওখানেই মারা গেছে। তাছাড়া টাকাটা জমা দেওয়া হয়েছিল মায়ের নামে তাই ওরা চেক কি আমার নামে দেবে? জানি না। তবে ক্যাশ দেবে না এটা ঠিক।’

মনে হল মেয়েটা ঠিক বলছে। কিন্তু এসব ব্যাপার তো দিন দশেকের মধ্যেই জানা যেত। এক দিনরাতের চার্জ হিসেবে কটা টাকা কাটতো নার্সিংহোম? ইন্ড্রাণীর কাছে তো মায়ের রেখে যাওয়া পঁচিশ হাজার রয়েছে। সেই ঘাটতিটা তা থেকেই দিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মেয়েটা জেদ ধ’ল, কাল সে কুচবিহারে ফিরে যাবেই।

বাধ্য হয়ে স্বামীকে বললাম। তিনি শুনে চোখ কপালে তুললেন, ‘সেকি? কুচবিহার ঘরের কাছে নাকি? যাব বললেই কি যাওয়া যায়? রিজার্ভেশন পাওয়া যাবে না। তাছাড়া ওর বয়সী মেয়ে একা রাতের ট্রেনে যেতে চাইলেই তো আমি ছেড়ে দিতে পারি না।’

হাঁকডাক করে ইন্ড্রাণীকে ডাকতেই সে এল। সঙ্গে দীপা এবং দীপুও। ওরা বোধহয় ওদের বাবাকে এত উত্তেজিত হয়ে কখনও চিংকার করতে শোনেনি।

‘কি ব্যাপার? তোমার মামীকে কি বলেছ?’ উনি জিজ্ঞাসা করলেন।

‘হ্যাঁ মামা, আমি কাল যেতে চাই।’

‘তুমি যেতে চাও বললেই কি আমরা ছেড়ে দিতে পারি? উইন্ডাউট রিজার্ভেশন ট্রেনে যেতে পারবে? আর সেটা থাকলেও তোমার বয়সী মেয়ের যাওয়া উচিত? না না, একা এভাবে তুমি যাবে না।’ উনি মাথা নাড়লেন।

‘কিছুই হবে না মামা। আমি যদি কাকনজন্ডা এক্সপ্রেসে যাই তাহলে রাত জাগতে হবে না। সন্দের একটু পরেই কুচবিহারে পৌঁছে যাব। আর ওই ট্রেনে রিজার্ভেশন না করলেও বসার জায়গা পাওয়া যায়।’ ইন্ড্রাণী বলল।

‘তোমার এখানে কি অসুবিধে হচ্ছে?’

‘কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু কুচবিহারে গিয়ে বাড়িটার একটা গতি করতে চাই। সেইজন্যে আমার যাওয়া প্রয়োজন।’

‘বেশ তো! তুমি একা অল্পবয়সী মেয়ে এসব কাজ কি করে করবে? এই মাসে আমি কিছুতেই ছুটি পাব না। সামনের মাসে আমি তোমার সঙ্গে যাব। তখন যেয়ো।’

‘অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে মামা। আপনি মিহিমিহি চিন্তা করছেন। বাবার এক বন্ধু আছেন, আমি অলোকজ্জেরু বলি, উনি বাড়িটা কিনতে রাজী আছেন। দামও ঠিক হয়েছিল। কোনও অসুবিধে হবে না, দেখবেন।’

চুপচাপ গুনছিলাম। বললাম, ‘ও। এই ভদ্রলোককে মায়ের মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছিল?’

‘হ্যাঁ। উনি আমাকে খুব রেগে করেন।’

আমার স্বামী বললেন, ‘সব ঠিক আছে বুঝলাম। কিন্তু তোমাকে আমি একা ছাড়তে পারছি না। তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে এসেছিলে এই বাড়িতে, সে আজ নেই, আমার তো তাই কিছু দায়িত্ব থেকেই যায়।’ এইসময় দীপু কথা বলল, ‘যদি চাও তাহলে ট্রেনের রিজার্ভেশন করে দিতে পারি।’

‘পারবি?’ ওর বাবা অস্বাক।

‘এটা কোনও প্রবলেম নয়।’

‘ও। তা ইন্ড্রাণী যখন যাবে বলে গৌ ধরেছে আর আমিও তো ছুটি এখনই পাব না তখন তুই যা, ওকে পৌঁছে দিয়ে আর। সেটা তো পারবি?’

‘এটা না পারার কি আছে? সন্দের পরে পৌঁছাবো, পরের সকালে আবার ট্রেনে উঠবো। মাত্র দুটো দিনের তো মামলা।’ দীপু হাত নাড়ল।

‘তোর যে কবে বুদ্ধি হবে কে জানে!’ ওর বাবা বললেন।

‘কেন?’

‘গুনলি যাচ্ছে বাড়ি বিক্রির ব্যবস্থা করতে। যে রাত্রে পৌঁছাবে সেই রাত্রেই সব হয়ে যাবে? উকিল কাগজ তৈরি করবে, সইসাবুদ হবে, টাকা-পয়সা নেবে, রেজিস্ট্রেশন না হয় পরে হবে কিন্তু এতেই তো কিছু সময় যাবে। আশ্চর্য!’

‘ও। আমি ভেবেছিলাম পৌঁছে দেওয়াটাই প্রবলেম।’

‘আসবে কি করে? একা একা?’

ইন্ড্রাণী বলল, ‘মামা, আমার কোনও সমস্যা হবে না।’

‘চুপ করো তুমি!’ ওর মামা এবার ছেলের দিকে তাকালেন, ‘দিন দুই-তিন লাগতে পারে। মেয়েটাকে যেভাবে নিয়ে যাবে সেইভাবে ফিরিয়ে আনবে। আর রিজার্ভেশন পাওয়া যখন সমস্যা নয় তখন সন্দের ট্রেনে টিকিট কেটো, তাতে ওখানে দিনের বেলায় কাজ করতে পারবে। সারাদিন বসে যাওয়ার চেয়ে রাত্রে শুয়ে যাওয়া ঢের ভালো।’

আমি তাক্তব হয়ে গেলাম। ওর ঘর থেকে চলে যাওয়ামাত্র স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তোমার কি বাস্তবজ্ঞান একদম লোপ পেয়ে গেল?’

‘কেন?’

‘দীপুকে তুমি কি বলে ওর সঙ্গে যেতে বলছ? একটা আইবুড়ো যুবতী মেয়ের সঙ্গে ছেলেকে পাঠাচ্ছ, তোমার কি মতিভ্রম হয়ে গেল?’

‘তুমি মনটাকে একটু বড় কর শোভনা। ওরা যথেষ্ট বড় হয়েছে, কিসে নিজের ভালমন্দ হয় তা ওরা জানে।’

‘তুমি জানো না, ঘি আর আণ্ডন একসঙ্গে রাখতে নেই?’

‘এখানে কে ঘি আর কে আণ্ডন? ইন্দ্রাণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, নম্র স্বভাবের মেয়ে। তোমার ছেলের জন্যে মোহগ্রহ হওয়ার কোনও কারণ ওর নেই। তাছাড়া ওরা যাচ্ছে সেকেন্ড ক্লাসে, হাজারটা লোকের সহযাত্রী হয়ে। ভুলে যেয়ো না।’

‘বাঃ। কুচবিহারে গিয়ে কোথায় থাকবে? ইন্দ্রাণীদের বাড়িতে তো? সেখানে আর কে আছে? ওরা ছাড়া তৃতীয় কোনও প্রাণী থাকবে না। আর কিছুই যদি না হয় তবু আমি ভাবছি মেয়েটার যে দুর্নাম হবে তার দায়িত্ব কে নেবে?’

‘দুর্নাম? কি যা তা বলছ?’

‘ওটা কলকাতা শহর নয়, মফঃস্বল। প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর রাখে। যখন দেখবে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে ইন্দ্রাণী একটা উটকো যুবকের সঙ্গে ফিরে এল তখন লোকে কথা বলতে ছাড়বে? যারা ওদের বাড়ির চৌকাঠ মাড়াতো না সেইসব আত্মীয়রা মায়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে সহানুভূতি জানাবার ছল করে বাড়িতে এসে দীপুর পরিচয় জ্ঞানতে চাইবে।’

এবার স্বামীকে চিন্তিত দেখাল, ‘তা বটে। এইটে আমি ভাবিনি।’

‘তুমি তো কিছুই না ভেবে সব করে ফ্যালো।’

‘তাহলে ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা করি হোটেলের কথা।’

‘কি?’

‘দীপু সঙ্গে যাক, কিন্তু বাড়িতে না থেকে হোটеле থাকবে।’

কি বলব এই মানুষটাকে? দীপুর যাওয়া, হোটেল থেকে থাকে মানে একগাদা খরচের ধাক্কা। সংসার চালাতে একেই হিমসিম খাচ্ছি আমি, তার ওপরে এই বাড়তি খরচ যেতে করা ঠিক? তাছাড়া ইন্দ্রাণী যখন বলছে তার কোনও অসুবিধে হবে না তখন আগবাড়িয়ে এই খরচের মধ্যে যাওয়ার কি দরকার? এ-বাড়িতে তো কোনদিন আমার কথায় কাজ হয় না। বেশি প্রতিবাদ করলে গুনতে হবে আমার মনটা নাকি ছোট!

ইন্দ্রাণীকে নিয়ে এত ব্যস্ততা বাড়ল যে ওকে দিয়ে যে দীপার খোঁজখবর নেব তার কোনও সুযোগই পেলাম না। বিকেলে দীপার গলা পেলাম, ‘আমি একটু বেরুচ্ছি।’

ওর বাবা জানতে চাইল, ‘কখন ফিরছিস?’

‘এই এখনই।’ দীপা চলে গেল।

পাড়ার কারও বাড়িতে যায় না কোনওদিন, অথচ আঙ্গকাল এইরকম পনেরো-কুড়ি মিনিটের জন্যে ঘটহাট বেরিয়ে পড়ে। ছেলেমেয়ে বড় হলে অনেককিছু মনে নিতে হয়, কিছু করার নেই।

আমার কিছুই ভাল লাগছিল না। বিয়ের পর, যখন শাণ্ডি বেঁচে ছিলেন তখন থেকে মনে হত এ বাড়ি আমার নয়। যা কিছু হচ্ছে তা ওঁর ইচ্ছায়। ছেলেমেয়ে হল, ওঁর নামনে বড় হল। উনি চলে গেলেন যখন তখন আমার অনেক ইচ্ছে মরে গেছে। আর বাড়িটা হয়ে গেল ছেলেমেয়ের আর ওদের বাবার। নইলে দীপুকে কেউ ইন্দ্রাণীর সঙ্গে কুচবিহারে পাঠায়? উনি বললেন, ইন্দ্রাণীর দীপুর জন্যে মোহগ্রহ হওয়ার কোনও কারণ নেই! কথাটা গুনতে আমার ভাল লাগেনি। হ্যাঁ, ছেলেটা এখনও চাকরি পায়নি ঠিক, কিন্তু পেয়ে গেলে ওকে ফ্যালনা ভাবার কোনও কারণ নেই।

বেল বাজল। উনি দরজা খুললেন। তারপরেই স্বপ্নার গলা পেলাম। খুব খুশি বলে মনে হচ্ছে। বাইরের ঘরে যেতেই আমাকে দেখে স্বপ্না বলল, ‘আজ তো কাজ করা হল, ভালোভাবে হয়েছে?’

‘হ্যাঁ। তুই এই সময়ে?’

‘বাঃ। তোমার বাড়িতে আসতে হলে সময় দেখতে হবে নাকি?’ স্বপ্না বলল, ‘মনে পড়ল আজ মেয়েটার মায়ের কাজ, ঘুরে আসি।’

‘খুব ভাল করেছে।’ উনি বললেন। ‘টুটল কোথায়?’

‘উনি এখন বড় হচ্ছেন, আমি বললেই আসবে নাকি। তা ইন্দ্রাণী কি কিছুদিন তোমাদের কাছে থাকছে?’

'থাকল কোথায়? কানই কুচবিহারে চলে যাচ্ছে।'
 'ওমা! এত তাড়াতাড়ি? অবশ্য নিজের বাড়ি ছেড়ে পরের বাড়িতে থাকতে ভাল লাগে না।'
 'নিজের বাড়ি? সেখানে নিজের বলতে আছে কে? কেউ নেই। ও বাড়ি বিক্রি করতে যাচ্ছে। দেবু ওর মায়ের চিকিৎসার জন্যে যে টাকা দিয়েছিল তা শোধ করবে।'
 'দেবুদা টাকা দিয়েছিলেন বুঝি? কই বললেন না তো?' স্বপ্না অবাক হল।
 'তাকে বলতে যাবে কেন?' আমি বললাম, 'তোর সঙ্গে দেখা হয়?'
 'না। তবে আজ ও-বাড়িতে গিয়েছিলাম, আসলে হয়েছে কি, ঠাকুরের হাতের রান্না খায় তো ওরা, মেয়েটার জন্যে একটু মাংস রন্ধে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'সর্বনাশ! ওইটুকু আলাপেই তোর দরদ এত উথলে পড়ল?'
 'দরদ আবার কি? দেখুন তো, দিদি কিভাবে কথা বলছে?'
 'কিভাবে আবার বলব? লোকটার বউ মরে গেছে, দু-হাতে টাকা কামাচ্ছে অসৎ পথে, নেশা করে বলে শুনেছি। এমন লোকের সঙ্গে ভাব করতে যাচ্ছিস তুই বিধবা হয়েও, এ বাপু আমি মেনে নিতে পারছি না।'
 স্পষ্ট বলে দিলাম।

উনি বললেন, 'তুমি বড্ড বাঞ্ছা করছ বলছ শোভনা। একটা মানুষ ঘুষ খায় মানে এই নয় যে তার কোনও ভাল দিক থাকবে না। এই যে ও এক লক্ষ টাকা দিল, সেটা?'

স্বপ্না বলল, 'আর দেওয়ার পর আজ আমাকে একবারও বলেননি যে উনি দিয়েছেন। উলটে ইজ্রাণীর মায়েয় মৃত্যু নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করলেন।'

'তা তো করবেই। দীপু সন্দেহ করে যে দেবুঠাকুরপো নার্সিংহোমে গিয়ে ইজ্রাণীর মাকে এমন কিছু বলেছিল যা সহ্য করতে না পেরে ওর হার্ট অ্যাটাকড হয়।'

উনি চোঁচিয়ে উঠলেন, 'আঃ! থামবে তোমরা! কেউ শোনেনি দেবু তাকে কি বলেছিল! আন্দাজে এই অভিযোগ করা ঠিক নয় শোভনা।'

'ঠিক আছে, আজ আমি উঠি।' স্বপ্না উঠে দাঁড়াল।

'উঠি মানে?' আমি ধমক দিলাম, 'এ বাড়িতে এসেই কখনও এভাবে চলে গিয়েছিস!'

'তুমি যা বললে তাতে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় কি।'

'আশ্চর্য! দেবুঠাকুরপোকে কিছু বললে তোরা গায়ে লাগছে কেন? তুই ওর কে?'

সেসময় দীপা ফিরে এল বলে স্বপ্নাকে জবাবটা দিতে হয়নি। কিন্তু আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম। স্বপ্না আমার বোন। পৃথিবীতে ও ছাড়া আমার কোনও ভাইবোন নেই। ভাল বিয়ে হয়েছিল, বাচ্চা হল। তার অনেক পরে ওর স্বামী মারা গেল। ছোটবোন বিধবা হলে বড়বোনের কি ভাল লাগে? তবু ও যখন সব মানিয়ে নিল তখন খুশি হয়েছিলাম। মাছ-মাংস-ডিম খাওয়া আজকাল আর কটা বিধবা বন্ধ করে!

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'এই এলে?'

'হ্যাঁ। তোরা খবর কি? কোথায় গিয়েছিলি?' স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল।

'একটু কাজ ছিল। টুটুল আসেনি?'

'এলে তো দেখতেই পেতিস।'

স্বপ্নার কথা বলার ধরনে বুঝলাম খুব চটে গিয়েছে। অল্প বয়স হলে আনান্দা কথা ছিল, ওর বয়সী মেয়ে যদি নিজের ভালমন্দ বুঝতে না পারে তাহলে কিছু বলার নেই। আবার ও যদি রাগ করে চলে যায় তাহলেও আমার ভাল লাগবে না। আমি দীপাকে বললাম, 'যা, চা করে নিয়ে আয়।'

'আমি চা খাবো না।' স্বপ্না জানাল।

'খুব রেগে আছ মনে হচ্ছে!' দীপা হেসে ভেতরে চলে গেল।

'দেখলি, দীপাও বুঝতে পারল তুই রেগে গিয়েছিস।' আমি হাসলাম।

'আশ্চর্য, তুমি উলটো-পালটা কথা বললে আমি কতকণ সেটা সহ্য করব।'

'ঠিক আছে বাবা, আমার ভুল হয়েছে, এখন শান্ত হয়ে বোস।' আমার কথা শুনে ও, আবার বসল। হঠাৎ মনে হল স্বপ্নাকে ওঁর কাণ্ডের কথা বলি। ও যদি বোঝায় তাহলে উনি মত পালটাতে পারেন। হাজার হোক শালী।

শোনামাত্র স্বপ্না জিজ্ঞাসা করল, 'এত প্রবলেম হচ্ছে কেন?'

‘ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু নয়?’ আমি ওর কথা শুনে অবাক।

‘দ্যাখো দিদি, যাদের তুমি চেনো না, জামাইবাবুর স্মৃতিতে যারা ছিল না তারা এসে আশ্রয় চাইল, তোমরা আশ্রয় দিলে, বড় ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে নার্সিংহোমে ভর্তি করালে। দেবুনা যদি লক্ষ টাকা দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা তোমাদের মুখ চেয়েই দিয়েছেন। আজ শ্রদ্ধ করে এলে তোমরা। অনাথীদের দরদ তো তোমরা রাখোনি। তাহলে দীপু ওকে পৌঁছে দিতে গেলে অস্বস্তি হচ্ছে কেন?’

‘তুই যা বললি তার সব ঠিক। যা করেছি মানুষ হিসেবে করেছি। কিন্তু দুটো আইবুড়ো ছেলেমেয়েকে একসঙ্গে ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক?’ আমি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম।

বাপা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, ‘ঠিক না কেন? তোমার যদি মনে হয় আত্মকালকার ছেলেমেয়েরা খুব বোকা, একা হলেই উলটোপালটা করলে তাহলে খুব ভুল করেছ।’

উনি এতক্ষণ চুপচাপ গুনছিলেন, এবার মুখ খুললেন, ‘এইটাই ওকে বোঝাতে পারছি না স্বপ্না। নিজের ভালমন্দ বোঝার বয়স ওদের হয়েছে।’

পরদিন দুপুরে টিকিট নিয়ে বাড়ি এল দীপু। ‘ওয়েটিং লিস্টে তিনশো জনের নাম, তবু পেয়ে গেলাম।’

‘কি করে পেলি?’

‘চেনাজানা থাকলে সব পাওয়া যায়।’

‘তাহলে চাকরি পাচ্ছিস না কেন?’

‘চাকরি পেতে যে চেনাজানা লাগে তা আমার নেই। তবে পেলো আর চাকরি করব না বলে ঠিক করেছি।’ দীপু চলে যাচ্ছিল সামনে থেকে।

‘দাঁড়া। কি বলছিস তুই? চাকরি ছাড়া তোর চলবে কি করে?’

‘কেন? খবরের কাগজে যেমন উন্নয়ন নেতাদের নাম ছাপা হয় তাদের কেউ তো চাকরি করে না, তাদের চলে কি করে? একটু ওপরের দিকে যারা রাজনীতি করে তারা ট্রেনে চড়ে না বুঝলে? আর দু-একটা বছর শুধু অপেক্ষা করো!’

‘কিন্তু টিকিটের টাকা পেলি কোথায়?’

‘আমরাটা আমি দিয়েছি, ইন্ড্রাণীরাটা ও দিয়েছে। কেন?’

‘না! এমনি বলছিলাম। যাওয়ার আগে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাস।’

‘দরকার হবে না।’

যে ছেলের রোজগার নেই, মাসে যাকে মাত্র একশো টাকা হাতখরচা দিই সে বলল তার কুচবিহার যাওয়া আসা করতে টাকার দরকার হবে না। কয়েক মাস হল ওর চালচলন বদলে গেছে। ও কি রাজনীতি করার জন্যে হাতে কিছু টাকা পাচ্ছে? কে জানে, তবে ইন্ড্রাণী নিজের টিকিটের দাম দিয়েছে বলে আমার ভাল লাগল।

ইন্ড্রাণী

কামরূপ এন্ড্রেশের শ্রীটিয়ার কামরায় আমার বার্থ আর দীপুদার বার্থ পাশাপাশি পড়েনি। আমার আশেপাশের যাত্রীরা একই পরিবারের। বাবা মা পিসি মাসির দল। দীপুদা মাঝে মাঝেই আমার কাছে এসে জানতে চাইছিল কোনও প্রয়োজন আছে কিনা, আমি শেষ পর্যন্ত বললাম, ‘আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না।’

দীপুদা বলল, ‘কষ্ট আবার কি! এক ধায়গায় বসে আছি, বেড়ানো হচ্ছে। শুয়ো পড়লে তো দেখতে আসব না।’ তারপর হেসে বলল, ‘আমি জীবনে প্রথমবার এরকম লং ডিস্ট্যান্সের ট্রেনে উঠলাম, বুঝলে।’

‘তাই?’ আমি হাসলাম।

‘কলকাতার বাইরেও এই প্রথম।’ যেন কথা খুঁজে খুঁজে বের করছিল দীপুদা। শেষ পর্যন্ত চলে গেল দরজার দিকে। আমি বুঝলাম দীপুদার ইচ্ছে হচ্ছে আমার সঙ্গে আড্ডা মারতে। এই ক’দিন খুব কম কথা বলে বলে আমার কিরকম দমবন্ধ হওয়ার গতো অবস্থা। এখন কথা বলতে পারলে আমারও ভাল লাগত। কিন্তু গতকাল থেকে মামীর প্রতিক্রিয়া কিছু আন্দাজে কিছু শুনে যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয়েছে ওর সঙ্গে

কথা কথা কম বললেই উনি খুশি হবেন। হাজার হোক মামা এবং মামী আমাদের পাশে দাঁড়ানোয়—। কিন্তু কি লাভ হল তাতে? মাকে তো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলাম না।

এইরকম ট্রেনে মায়ের পাশে বসে গিয়েছিলাম যাওয়ার সময়। আমাদের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছিল। যার বাড়িতে মা আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি কিরকম ব্যবহার করবেন তা আন্দাজ করতে পারছিলাম না। মা কিছু জোর দিয়ে বলেছিলেন, ‘সুধীদা খুব ভালমানুষ, একটা ব্যবস্থা করবেই।’ তখন একটা সন্দেহ মনে এসেছিল। মা যাকে বহু বছর দ্যাখেননি তাঁর ওপর এই জোর কি করে রাখছেন? মায়ের সঙ্গে ভদ্রলোকের কি সম্পর্ক ছিল তখন? মায়ের বয়স্ফেস্ত? প্রশ্নটা করতে পারিনি আমি সংকোচে।

মামা আমাদের সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করেছেন। মায়ের মৃত্যু ঠেকে খুব কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু ওই প্রশ্নটার উত্তর আমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। তবে তেমন কিছু হলে মামী আমাদের সহজভাবে নিতে পারতেন না। অবশ্য মা বেঁচে থাকার সময় মামী বেশ শীতল ছিলেন, মায়ের মৃত্যুর পর তিনি আমাকে অনেক নিজের করে নিয়েছেন। শুধু মা নেই বলে?

রাত্রি ট্রেনে ঘুম ভালো হয়নি। ভালো হয়নি না বলে প্রায় হয়নি বললে বেশি সত্যি বলা হত। শোওয়ার পরই মনে হচ্ছিল, আমার কেউ নেই। এই বিশাল পৃথিবীতে আমার মাথার ওপর কোনও ছাদ নেই। ধরা যাক, কুচবিহারের বাড়িটা কেউ কিনল না, এই পঁচিশ হাজার যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি কিভাবে বেঁচে থাকব? এই প্রশ্নটা মাথায় জ্বলতেই কাঁপুনি এল শরীরে। সেইসঙ্গে ছটফটানি।

ভোরের দিকে কোন স্টেশনে ট্রেন থেমেছিল। আমি বার্থ থেকে নেমে দরজার কাছে গেলাম। এখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। একটা চায়ের স্টলের সামনে দু-চারজন লোক। তাদের মধ্যে দীপু দাঁড়িয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘চা খাবে?’

বেশ গলা তুলেই বলল যাতে আমি শুনতে পারি। আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।

‘তাহলে এখানে এসো। গরম চা, নিয়ে যেতে পারব না।’

আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘ঘুমোননি?’

‘দূর! ট্রেনে ঘুমোলে জানিটা এমজয় করব কি করে? এই নাও।’

এক ভাঁড় চা এগিয়ে দিল দীপুদা, বেশ গরম, সামলে নিলাম, ‘দেখুন, চা খেতে খেতে ট্রেন না ছেড়ে দেয়!’

‘পরের ট্রেনে যাব।’ দীপুদা হাসল।

‘বা রে! জিনিস পত্র তো চলে যাবে।’

দীপুদা হেসে চার চুমুকে চা শেষ করে ভাঁড়টা ছুঁড়ে দিল উলটোদিকে ট্রেনলাইনে। শব্দ হল। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা ধরাল।

‘কত দাম?’ চা শেষ করে ব্যাগে হাত দিলাম।

‘দিয়ে দেওয়া হয়েছে।’

‘আপনি সিগারেট খান?’

‘হ্যাঁ। আপত্তি আছে?’

‘আমার কেন আপত্তি থাকবে? কদিন বাড়িতে ছিলাম, দেখিনি, তাই।’

‘বাড়িতে সিগারেট খেলে আবার কীর্তন আরম্ভ হয়ে যাবে।’

‘কীর্তন?’

‘এক পয়সাও রাজগার নেই, বেকার, বাবার ঘাড় বড়ি ফেলে আছ, সিগারেট খাওয়ার বেলায় পয়সা জোটে কোথেকে?’ হাসল দীপুদা।

‘মাঃ, এভাবে মামী নিশ্চয়ই কথা বলেন না!’

‘আমাদের বাড়িতে বেকার হয়ে থাকলে তাকে কতগুলো নিয়ম মানতে হবে। সিগারেট খাওয়া বা সিনেমা দেখা চলবে না। সবসময় মুখ গভীর করে রাখতে হবে যাতে সবাই বোঝে মানসিক কষ্টে আছে। চটকদার জামা পরা যাবে না। আর প্রেম করা চলবে না।’

আমি হেসে ফেলতেই ট্রেনের হুইসিল বাজল। পা চানিয়ে উঠে পড়লাম কামরায়। দীপুদাও উঠে বলল, ‘যাও শুয়ে পড়।’

‘এখন শোব কি!’

‘আচ্ছা, তোমার ক’দিন লাগবে কুচবিহারে?’

‘কি জানি! আপনার খুব অসুবিধে হল, না?’

‘ভাট! কোনও কাজ নেই, বাইরে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।’

‘আপনি বললেন প্রেম করা চলবে না, এটা কি কেউ বলেছে?’

‘বলার দরকার নেই। প্রেম করা মানেই খরচ। রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়াতে হবে। সেই টাকা কে দেবে!’

দীপার সুবিধে আছে।’

‘কি রকম?’

‘ওকে খরচ করতে হয় না। মেয়ে তো। উলটে ওকেই খাওয়ায়।’

‘আপনি জানলেন কি করে?’

‘আরে বাবা, আমি সব জানি। একটা বড়লোকের ছোকরার সঙ্গে ও ইন্ডলভ্‌ড্‌ হয়েছে। ছেলেটাকে আমি দূর থেকে দেখেছি, ভাল লাগেনি।’

‘দীপাকে বলোছেন?’

‘নাঃ। যে যার পথে হাঁটুক।’

‘আপনি তাহলে রাজনীতিই করবেন বলে ঠিক করেছেন?’

‘হ্যাঁ। আমার অন্য কিছু করার এলেন নেই। এখন তো কেউ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর রাজনীতি করে না। কিছু টাকা পরিসা পাওয়া যায়। এই যে আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি তা ওই পাওয়া টাকায়। যত ওপরে উঠব তত টাকার অঙ্ক বাড়বে। আমি তো এখন স্নেফ চামচেগিরি করছি।’ দীপু হাসল।

চামচেগিরি শব্দটা খুব খারাপ লাগল। সুধীমামার মতো মানুষের ছেলে এইরকম শব্দ উচ্চারণ করবে কেন? যে সব লোক নিজেকে শ্রদ্ধা করে না তারাই ওইরকম কথা বলতে পারে। আমি আমার জায়গায় চলে গেলাম।

কুচবিহার স্টেশন থেকে বাড়ি এলাম রিকশায়। রিকশাই আমাদের যাতায়াতের সহজ যান। আগার পাশে বসে দীপুদা বলল, ‘বাঃ দারুণ! কেমন রথ-রথ লাগছে।’

‘রথ?’ আমি অবাক।

‘টিভিতে মহাভারত-রামায়ণ দ্যাখানি? কলকাতায় রিকশায় চড়তে আমার একটু ইচ্ছে করে না। পেটের প্রয়োজনে যে মানুষ পিচগলা পথে রিকশা টানছে তার যাত্রী হোক অসুস্থ অথবা বৃদ্ধবৃদ্ধারা। কিন্তু এই সাইকেল রিকশায় আলাদা মেজাজ আছে।’ দীপুদা চারপাশে তাকাল, ‘বাঃ, তোমাদের শহরটা তো বেশ চূপচাপ!’

আমি কিছু বললাম না। রিকশা ছুটছে শহরের মাঝখান দিয়ে। রাস্তার লোকজন তাদের দিকে তাকাচ্ছে। এদের মধ্যে পরিচিত কেউ থাকলে অবাক হয়ে ভাববে ইন্দ্রাণীস সঙ্গে ছেলেটা কে? এই শহরের মানুষ এখনও সেই অর্থ আধুনিক হতে পারে নি। ইদানীং রেস্টুরেন্টের কেবিনে কোনও কোনও ছেলেমেয়ে ঢুকছে বটে কিন্তু অধিকাংশ মেয়েই ওপথে পা বাড়ায় না। রেস্টুরেন্টে কেবিন তৈরির ভাবনাটা কয়েক বছর আগে ছিল না।

বড় রাস্তা ছেড়ে খানিকটা যেতেই আমি রিকশাটাকে দাঁড় করিয়ে বললাম, ‘এই আমাদের বাড়ি।’

‘বাপস্! বিশাল জায়গা, বাগান আছে তোমাদের? কী কাণ্ড!’

রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কাণ্ড কেন?’

‘এরকম বাড়িতে থাকার কথা আমরা কলকাতায় ভাবতেই পারি না।’

গেট পেরিয়ে যখন দরজার তালা খুলছি তখন পাশের বাড়ির খোকাকাকু এসে দাঁড়ালেন, ‘চলে এলে! খবর পেয়েছি। কী খারাপ খবর! ভাবতেই পারছি না।’

খোকাকাকু বিয়ে করেননি। বাবাকে দাদা বলতেন। পাড়ার প্রত্যেক পরিবারের হাঁড়ির খবর রাখা ওর স্বভাব। মা পছন্দ করতেন না বলে এবাড়িতে আসা-যাওয়া বেশি ছিল না। তবু কলকাতায় যাওয়ার আগে মা প্রতিবেশী বলেই ওঁকে বলে গিয়েছিলেন বাড়িটার ওপর একটু নজর রাখতে।

দরজা খুললাম। নুটকেস ভেতরে নিয়ে যেতেই খোকাকাকু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কিভাবে মারা গেল? অপরাধে টেবিলে?’

‘না। তার সুযোগ পাওয়া যায়নি।’

‘ওঃ, তবু ভাল। নইলে একগাদা খরচের ধাক্কায় পড়তে। খবরটা শোনার পর মনে হল কলকাতায় না গেলেই হত। সেই তো চলে যেতে হল, তা এখানে থাকলে এর চেয়ে বেশি কি হত! কাজকর্ম?’

‘হয়ে গেছে।’

‘অ। একে তো চিনলাম না?’

আমি কিছু বলার আগেই দীপদা হাতজোড় করল, ‘আমার নাম দীপক মুখার্জী। কলকাতায় থাকি। ইন্ড্রাণীরা আমাদের বাড়িতে উঠেছিল।’

‘মুখার্জী? আত্মীয় নয়? পৌছাতে আসা হল বুঝি?’

‘হ্যাঁ।’

‘তা ভাল। কিন্তু ফেরার ট্রেন তো দুপুরবেলায়। ইন্ড্রাণীরা না থাকায় এ বাড়ির সব কিছু তো অচল হয়ে আছে। তুমি আমার বাড়িতে চান-টান করে নিতে পারো। নইলে এই অবস্থায় আবার ট্রেনে উঠবে কি করে!’ খোকাকাকু বললেন।

আমি বললাম, ‘আপনাকে এসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে হবে না খোকাকাকু। তাছাড়া উনি আজকেই চলে যাবেন বলে আসেননি। আসুন দীপদা।’ আমি আর দাঁড়ালাম না।

ঘরগুলোর জানলা-দরজা খুলে দেওয়ার পর দেখা গেল এই কদিনে তেমন নোংরা হয়নি। এ বাড়িতে যে মহিলা দু’-বেলা কাজ করতে আসে তাকে খবর দিতে হবে।

স্টোভে চায়ের ভল বসিয়ে আমি বাইরের ঘরে এসে দেখলাম দীপদা চেয়ারে বসে আছে। আমাকে দেখামাত্র ভিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি নাচো?’

আমি দেওয়ালের দিকে তাকালাম। ‘ওটা মায়ের শখ। ভরতনাট্যমের বিভিন্ন মূদ্রায় আমার ছবি দেওয়ালে বাঁধিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছেন মা।’

‘বাঃ! একবারও বলানি তো?’

‘এমন কিছু ব্যাপার নয়। তাছাড়া বলার সুযোগও হয়নি।’

‘কতদিন ধরে শিখছ?’

‘আমার চার বছর বয়স থেকে।’

‘তার মানে তুমি এখন পাকা শিল্পী?’

‘দূর! আপনি উঠুন তো, ওপাশে বাথরুম আছে, মুখ হাত পা ধুয়ে নিন।’

‘কেন?’

‘কেন আবার? চায়ের ভল বসিয়েছি।’

‘চা? সেটা ঠিক আছে। এখন বল, এখানে সস্তার হোটেল কোথায় আছে?’

‘কেন?’

‘বাঃ! আমি থাকব কোথায়? তুমি এ বাড়িতে একা থাকবে, অতএব এখানে আমার থাকা চলবে না। মায়ের দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানো না তো। শুধু মা কেন, ওই যে, একটু আগে তোমার প্রতিবেশী ভদ্রলোক তো ফেরত ট্রেনে আমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। আর সস্তার হোটেল না হলে আমি মারা পড়ব।’ দীপদা হাত তুলল।

আমি হাসলাম, ‘আপনাকে মারা পড়তে হবে না। আপাতত যা বলছি তাই করুন। হাতমুখ ধুয়ে আসুন।’

রান্নাঘরে চলে এলাম। তখনই কানে এল গিড়কি দরজায় শব্দ হচ্ছে। এটা চেনা শব্দ। দ্রুত উঠানে নেমে দরজা খুলতেই গোপালের মা চোঁচিয়ে কেঁদে উঠল। আমি কথা বলতে পারলাম না। গোপালের মা কাঁদছিল আর বলছিল কেন মানুষটাকে আমি কলকাতায় রেখে এলাম। যতই শরীর খারাপ হোক এখানে তো চলেফিরে বেশ বেড়াচ্ছিল। তারপর একটু শান্ত হলে বললাম, ‘তুমি কাঁদছ মাসি, আমার দিকে তাকাও!’

আবার কান্না বাজল, ‘তোমার কথা ভেবেই তো কাঁদছি।’

গোপালের মা এসে যাওয়ায় খুব সুবিধে হল। ওকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে আমাদের শোওয়ার ঘরে এলাম। টেবিলের ঠিক ওপরের দেওয়ালে বাবার ছবি টাঙানো। মা রোজ ওই ছবির নিচে ধূপ জ্বালাতো। আমার বুক মুচড়ে যাচ্ছিল। খাটের ওপর বসে পড়লাম।

‘দিদি!’

গোপালের মা এসে দাঁড়িয়েছে। আমাকেই ভিজ্ঞাসা করল, ‘ওই বাবুটা কে?’

‘আমরা কলকাতায় যাঁরা বাড়িতে উঠেছিলাম, তাঁর ছেলে। সম্পর্কে মায়ের ভাইপো। ওরা মায়ের জন্যে যা করেছে তা কোনদিন ভুলতে পারব না। আমি একা আসছিলাম বলে মামা ওকে জোর করে সঙ্গে পাঠিয়েছেন।’

‘বিপদের সময় মানুষই তো উপকার করে।’

‘চা হয়ে গেছে।’

‘হ্যাঁ। দিয়ে আসব?’

‘হ্যাঁ। চল আমি যাচ্ছি।’

দীপুদা বসেছিল। মুখ দেখে বুঝলাম বাথরুম থেকে ঘুরে এসেছে। গোপালের মা চা-বিস্কুট রাখল। বললাম, ‘বিস্কুট ঠিক আছে তো?’

গোপালের মা বলল, ‘টিনের কৌটোয় ছিল। ঠিক থাকবে না কেন?’

আমি বললাম, ‘দীপুদা, এ হল গোপালের মা। আমার ভাগ্য যে আসামাত্র ও পৌঁছে গিয়েছে।’

চায়ে চুমুক দিয়ে দীপুদা জিজ্ঞাসা করল, ‘হোটেলের নাম বললে না?’

‘বিশ্বাস করুন এখানকার কোন হোটেল সস্তা আর ভাল আমি জানি না।’

‘রিকশাওয়ালারা ঠিক বলতে পারবে, তাই না?’

গোপালের মা জিজ্ঞাসা করল, ‘হোটেল কি হবে দিদি?’

‘দীপুদা এবাড়িতে থাকবে না, তাই।’

‘কেন?’

‘আমি একা আছি, তাই হোটেলে থাকতে চাইছে।’

‘ওমা, এ কি কথা! এখানে এত জায়গা থাকতে হোটেলে থাকবে কেন? তোমরা তো কলকাতা গিয়ে হোটেলে ওঠোনি!’ গোপালের মা বলল।

‘আমি তো একবারও বলিনি হোটেলে উঠতে।’ আমি চায়ের কাপ হাতে নিলাম।

‘তাহলে?’

‘মামী, মানে দীপুদার মা বলেছেন।’

‘তুমি একা থাকবে বলে যদি সংকোচ হয় তাহলে কদিন নাহয় আমি এখানে রাত্রে থাকব।’

‘তুমি থাকবে?’ আমি অবাক। মা ওকে অনেকবার বলেছেন রাত্রে থেকে যেতে কিন্তু নিজের সংসারের দোহাই দিয়ে কখনও রাজী হয়নি।

‘বাঃ, অত উপকার করেছেন ওঁরা আর এখানে এসে হোটেলে থাকবেন কি। শোন, এবেলায় ডিমের ঝোল আর ভাত করে দিচ্ছি। টাকা দিয়ে, রাত্রে বাজার করে আনতে হবে।’ গোপালের মা চলে গেল।

দীপুদা বলল, ‘যাচ্চলে!’

‘আফসোস হচ্ছে?’

‘দূর! আমার কত টাকা বেঁচে গেল।’

চূপচাপ চা খেলাম। দীপুদা জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি হঠাৎ গভীর?’

‘আমার খুব খারাপ লাগছে।’

‘আমি এখানে থাকতে পারি বলে খারাপ লাগছে?’

‘না। আপনি এখানে নিশ্চয়ই থাকবেন। আমি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আপনাকে এখানে থাকতে হলে তৃতীয় একজন মানুষের উপস্থিতির প্রয়োজন হচ্ছে, তার মানে আমি বা আপনি পরস্পরকে বিশ্বাস করতে পারছি না!’

দীপুদা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, ‘ইন্ডাণী, ব্যাপারটা কি আমাদের বিশ্বাস নিয়ে? তোমার এখানকার মানুষজন, আমার মা, এঁরা যাতে সন্তুষ্ট হন তাই তৃতীয় একজন মানুষকে প্রয়োজন হচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো, আমার তরফ থেকে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। আমি জানি তুমি এমন কিছু করবে না যাতে আমি অস্বস্তিতে পড়ি।’

‘আশ্চর্য! আমি সেটা করতে যাব কেন? আপনি আমার উপকার করেছেন, আমার ভাল চান, আপনাকে আমি অস্বস্তিতে ফেলব কেন? তাছাড়া দুটো প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকা মানেই খারাপ কিছু

হওয়া? আপনার যার সঙ্গে কোনও মানসিক সম্পর্ক নেই তার কাছে পৌঁছাতে পারবেন? দীপুদা, আমাদের কি সেই সম্পর্ক?

‘দূর! আমাদের বন্ধুত্ব ছাড়া কোনও সম্পর্কই তৈরি হয়নি।’

‘বন্ধুত্ব?’

‘হ্যাঁ, তাই তো!’

‘বন্ধুত্বের চেয়ে দামী সম্পর্ক কি আর কিছু আছে?’ আমি তাকালাম।

‘না।’

‘তাহলে?’

‘তুমি ঠিকই বলেছ ইন্দ্রাণী। আসলে আমি এত গুরুত্ব দিয়ে ব্যাপারটা ভাবিনি। না, তোমার কাজের লোককে বলো এখানে রাতে থাকার দরকার নেই। আর —’

‘আপনি হোটেল গিয়ে থাকবেন, তাই তো?’

‘হ্যাঁ। তুমি কি করে বুঝলে?’

‘এটাই তো স্বাভাবিক উত্তর।’

‘ইন্দ্রাণী, তুমি এত তলিয়ে ভাবো?’

‘আপনাকে কোথাও গিয়ে থাকতে হবে না। আপনি এখানেই থাকবেন। আমি তৈরি হয়ে নিই। আমাকে এখনই অলোকজেরুর বাড়িতে যেতে হবে।’ আমি উঠে দাঁড়ালাম।

দীপুদা জিজ্ঞাসা করল, ‘অলোকজেরু?’

‘বাবার বন্ধু। এই বাড়ি যিনি কিনতে চেয়েছিলেন।’

‘তুমি এই বাড়ি বিক্রি করে দেবেই?’

‘তাছাড়া আমার উপায় নেই। আমাকে কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতেই হবে। এই পিছুটান রেখে লাভ নেই।’

‘ঠিক আছে। আমি সঙ্গে যাব?’

‘কেন তো!’

আমি চলে এলাম বাথরুমে। মান করতে করতে মনে হল আমি যেন কোথাও পৌঁছে গিয়েছি। মা মারা যাওয়ার পর যে বোধটা একেবারে ছিল না সেই বোধটা ফিরে এসেছে। গভীর জলে সাঁতার কাটার পর প্রথমবার পায়ের আঙুল যখন মাটি স্পর্শ করে তখন যে অনুভূতি হয় ঠিক সেই অনুভূতি এখন আমার।

স্বপ্না

ক’দিন মনে হচ্ছিল, গেলে হয়। এই মনে হওয়াটা যে ভাল নয় তা আমি জানি। দেবদাকে দিদি একদম পছন্দ করে না। জামাইবাবু তো নয়ই। তবু দেবদা ও-বাড়িতে যান। গেলে ওঁরা অবশ্য মুখের ওপর খারাপ ব্যবহার করেন না। আমি অবাক হয়ে ভাবি, দেবদার মতো বুদ্ধিমান মানুষ কি বুঝতে পারে না ওঁদের অপছন্দের কথা?

দেবদার মেয়ে বেথুনে পড়ে, বউ মারা গিয়েছে অনেক আগে। হৈহৈ করা এই মানুষটা নাকি ঘুষ নেয়, মদ খায়। কিন্তু ঘুষখোর এবং মাতাল বলতে যে ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, দেবদার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। আচ্ছা, দেবদা যদি ঘুষ না খেত তাহলে ইন্দ্রাণীর মায়ের চিকিৎসার টাকাটা কি হাসপাতালে জমা পড়ত?

টুটল স্কুলে বেরিয়ে গেলে আমার হাতে অটেল সময়। আজ একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে। তিনি বেঁচে থাকতে আমি কখনও ব্যাঙ্কে যাইনি। তিনি বেঁচে থাকার সময় আমি আর কি করেছি? এই সংসারের পেছনে সমস্ত শক্তি মুখ বুজে খরচ করা ছাড়া জমার ঘরে কিছু নেই। তখন দশটা টাকার দরকার হলে ওঁর কাছে হাত পাতে হত। অন্য ব্যাপারে আর যাই হোক, টাকার ব্যাপারে মানুষটা প্রচণ্ড কণ্ঠুষ ছিল। টাকা চেয়ে না পেলে খুব খারাপ লাগত। নিজেই এত ছোট মনে হত। তাছাড়া বিয়ের বছর তিনেক পর থেকে, টুটল হয়ে গেলে, আমার সম্পর্কে ওঁর সমস্ত কৌতূহল উধাও হয়ে গেল। আমার সব জানা হয়ে গেছে। বউ

হিসেবে আমি বাড়িতেই থাকব এইরকম একটা হুবহাব ঠর মধ্যে এসে গিয়েছিল। আর সেই কারণে ঠর ওপর আমার যে টান থাকা উচিত তা একটু একটু করে কমে যাচ্ছিল। শেষের দিকে আমরা একসঙ্গে থাকতাম দুটো কারণে। এক, আমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না যে একা থাকব। দুই অভ্যেস। অভ্যেসের জন্যে সব কিছু তো মানুষ মেনে নেয় বছরের পর বছর।

এখন আমি স্বাধীন। আমার মাথার ওপরে কেউ নেই। টুটুলের বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ায় অফিস থেকে যে টাকা পাওয়া গিয়েছিল, ইনসিওরেন্স কোম্পানি যা দিয়েছিল তা পোস্টঅফিসে রেখে মাস গেলে যে সুদ পাই তাই দিয়ে দিবা আরামে চলে যায় আমাদের। এখন কাউকে কিছু দিতে চাইলে টাকার জন্যে হাত পাততে হয় না। আমি জানি, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে যেসব স্ত্রী বেঁচে আছে তারা আমাকে দ্রবী করে। কিন্তু স্বামী মারা যাক এটা যেমন আমি চাইনি তরাও চায় না।

ব্যাক ঘুরে মনে হল দিদির বাড়িতে যাওয়া যাক। আজ শনিবার, জামাইবাবুকেও বাড়িতে পাওয়া যাবে। গিয়ে দেখি বাড়ি খমখমে। দিদি আমাকে দেখে যেন একটু অবাক।

দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার গো?'

'কিসের কি ব্যাপার?'

'তোমরা যেন বেশ গভীর!'

'ও। তোর জামাইবাবুর কণ্ড। ইন্ড্রাণী একা কুচবিহারে যেতে পারবে না ভেবে দীপুকে সঙ্গে পাঠিয়ে এখন চিন্তায় পড়েছেন।'

'সুদীপ ইন্ড্রাণীর সঙ্গে কুচবিহারে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ। ওখানে তো মা মরে যাওয়ার পর ওর আর কেউ রইল না। বিয়য়-সম্পত্তির একটা বিলিবিববস্থা করে আসবে। তোর জামাইবাবু বললেন, কোনও অনভিজ্ঞ মেয়ের পক্ষে ওসব একা করা সম্ভব নয়। আজ সকালে ওদের ফেরার কথা ছিল।'

'যাই বলো, দীপুর যাওয়াটা ঠিক হয়নি। ভাল দেখায় না।'

'কে বলবে একথা!' দিদি কথা খোঁচাতে চাইল, 'খেয়ে এসেছিস?'

'হ্যাঁ। তোমরা এত বেলাতেও খাওনি?'

'এই খাব।' দিদি চলে গেল বাথরুমে। এত বেলায় স্নান করতে যাচ্ছে? সাধারণত প্রচুর সময় লাগে বলে দিদি সকাল সকাল স্নান করে নিত।

আমি জামাইবাবুর ঘরে এলাম। সেই একইভাবে ইজিচেয়ারে বসে আছেন। জামাইবাবু মানুষটা একটু বেশি মাত্রায় ভালো। এতটা ভালো যে কেন হলেন? বললাম, 'এখন আর ভেবে কি করবেন? যা হওয়ার তা তো হবেই। ব্যাপারটা আগে ভাবা উচিত ছিল।'

জামাইবাবু নিঃশ্বাস ফেললেন, 'ওর ওপর এতটা আত্মা ছিল যে এমনটা করবে কখনও ভাবিনি। কি যে ওর মাথায় ঢুকল।'

'মাথায় যদি কিছু ঢোকে তা কিন্তু আপনার প্রশ্নে ঢুকেছে।'

'কি বলছ স্বপা? আমি ওকে চিরকাল বলে এসেছি, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াবি, লোকের সম্মান আদায় করবি, তারপর দ্বিগা-গা-র কথা ভাববি। এসব কথা ও একদম ভুলে গেল? জামাইবাবু উঠে বসলেন।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। সুদীপ তো পড়াশুনা কবেই ছেড়ে দিয়েছে। উনি কি ইন্ড্রাণীর কথা বলছেন? কিন্তু ইন্ড্রাণীকে তো কিছুদিন আগেও চিনতেন না। তাহলে? দীপা কি কিছু করেছে? সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল হল, দিদি আমাকে কিছু বলেনি দীপার কথা। দীপার জন্যেই এ বাড়ির আবহাওয়া আজ খমখমে এতক্ষণে বুঝতে পারলাম।

'ছেলে কি করে?'

'আমি জানি না। তোমার দিদিকে জিজ্ঞাসা কর।'

'দিদি বোধহয় বনতে চায়নি।'

'এসব কথা তো সবাইকে বলতে ইচ্ছে করে না।'

'আপনারা যে আমাকে সবাই-এর দলে ফেলেন তা জানতাম না জামাইবাবু।'

'তুমি বুঝতে পারছ না স্বপা, কাল থেকে আমার মাথার ঠিক নেই। এদিকে ওরা যে কুচবিহারে গেল,

আজ সকালে অনেক আগে ট্রেন এসে গেছে। অথচ তাদের দেখা নেই। একটা টেলিগ্রাম করে জানাতে কি অসুবিধে হয়?’

আমি বললাম, ‘জামাইবাবু, আপনারা কি দীপার সঙ্গে কথা বলেছেন?’

‘হ্যাঁ। ছোলেটি এত জোর করছে যে বিয়েতে মত না দিয়ে পারেনি।’

‘বিয়ে তো ঘট করে হয় না। তার জন্যে সময় চাই।’

‘ওরা রেজিস্ট্রি করেছে।’

‘সেকি?’

‘আর কি বলব!’

‘ছেলের বাড়ি কোথায়?’

‘শ্যামনগরে।’

‘ছেলে ভাল হলে আর আপত্তি করে কি করবেন? ওর বাবার সঙ্গে গিয়ে কথা বলুন। নিজে পছন্দ করেছে যখন তখন আপনার তো কোনও দায়িত্ব নেই। ভবিষ্যতে যদি সুখে থাকে তাহলেই আমরা খুশি।’

‘হ্যাঁ, এটাই তো শেষ কথা।’ জামাইবাবু আবার শরীর এলিয়ে দিলেন।

‘দীপা কোথায়?’

‘ওর ঘরে। বাও, কথা বলে দ্যাখো।’

দীপার ঘরের দরজায় এলাম।

বিছানায় উপুড় হয়ে রয়েছে সে। খোলা চুল দেখে বুঝলাম চান করেনি। খাটে না বসে পাশের চেয়ারটা টেনে বসলাম। চেয়ার টানার শব্দে মুখ ফেরাল। দেখলাম চোখ বেশ ফুলে গেছে। কান্নাকাটি চলেছে অনেকক্ষণ।

‘কিরে আজ কলেজ নেই?’

‘যাইনি।’

‘সে কি রে? শরীর খারাপ?’ আমি সহজ হওয়ার চেষ্টা করলাম, ‘তোর মতো সিরিয়াস মেয়ে ওটা বিনা কারণে কামাই করবে না।’

‘কারণটা জেনেই তো এই ঘরে এসেছ।’ দীপা উঠে বসল। আমি খুব অপমানিত বোধ করলাম। এ কি ধরনের কথা! আমি ওর মাসি, ওকে জগ্নাতে দেবেছি, আর আমাকেই ঠেস দিয়ে কথা বলছে। আমার গলার স্বর পালাটে গেল, ‘এমন কাজ করো কেন যার জন্যে এভাবে বিছানায় পড়ে কান্দতে হয়?’

এবার দীপা জবাব দিল না। একটু অপেক্ষা করে বললাম, ‘জামাইবাবু ভীষণ ভেঙে পড়েছেন। কেবলই বলছেন এরকম কাণ্ড তোর কাছ থেকে উনি আশা করেননি। সত্যি তো, তোকে যে রকম সুযোগ-সুবিধে দিয়েছেন, তাকে বা ভালবাসতেন সেটা তুই ভুলে গেলি কি করে?’

‘ভুলে গেছি একথা কে বলল?’

‘নাহলে কাউকে কিছু না বলে একটা মাছওয়ালার ছেলের সঙ্গে প্রেম করে রেজিস্ট্রি করে ফেললি?’

‘মাছওয়ালার ছেলে?’

‘তাই তো শুনলাম, ছেলের বাবা মাছের ব্যবসা করে।’

‘মাছের আড়তের মালিক মানে মাছওয়ালার নয়। কাউকে কিছু না জানিয়ে রেজিস্ট্রি করতে আমি চাইনি। কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে।’

‘বাধ্য করেছে মানে?’ আমি চমকে উঠলাম, ‘তুই কি বলছিস? মেয়েরা কোন্ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে বিয়ে করে?’

চোখ বন্ধ করে দীপা এমনভাবে মাথা দোলাল যেন আমি কোনও অবাস্তব কথা বলছি। দীপা বলল, ‘তুমি ভুল বুঝেছ। শোভন জোর করল। ওর মা পাত্রী দেখছেন একের পর এক। গুজার বলেও ওঁকে খামাতে পারছে না শোভন, তাই।’

‘শোভন কি করে?’

‘ইংরেজি অনার্স নিয়ে পাশ করেছে। এম. এ. পড়ছিল। পড়াশুনায় খুব ভাল। কিন্তু এখন বলছে ব্যবসা করবে।’

‘কি ব্যবসা?’

‘ইম্পোর্ট-এক্সপোর্ট।’

‘এখন তোরা কি চাস?’

‘বাবাকে বলেছি ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলতে।’

‘জামাইবাবু যাবেন বলেছেন?’

‘জানি না।’

‘তুই কি রে? একটা ছেলে তোকে বলল মা পাত্রী দেখছে বলে বিয়ে করো আর তুই রাজী হয়ে গেলি? সে যদি না চায় তাহলে তার মা কি করে অন্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে? তুই বললি পরিস্থিতি তোকে বাধ্য করেছে। এটা কোনও পরিস্থিতি হল? তুই কি পাগল? পড়াশুনা শিখেছিস, ভাল কলোজে পড়িস, তবু তুই অটিপৌরে বোকা বাঙালি মেয়েতুলোর মতো এই ভুল করলি।’

‘ভুল না ঠিক করেছি সেটা আমাকে বুঝতে দাও, ব্লীজ।’

একথার পর আর ওর সঙ্গে কথা বলার কোনও মানে হয় না। বছর পাঁচেক আগে আমাদের পাড়ায় একটি মেয়ে এমন কাণ্ড করেছিল। ছেলেটি ছিল বেকার, অশিক্ষিত, মস্তান। ভালো বাড়ির মেয়েরা যে কি করে এদের প্রতি আকৃষ্ট হয় তা তারাই জানে। রেজেন্ট্রির কথা জানাজানি হওয়ার পর ওর বাবা ওকে মামার বাড়িতে রেখে আসেন। টাকাপয়সা দিয়ে সেই মস্তান ছেলেটিকে ম্যানেজ করে ডিভোর্স-এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রায় বছর দেড়েক লেগে গিয়েছিল কাগজ হাতে পেতে। যেহেতু দু-জনের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না তাই টাকাপয়সা পেয়ে ছেলেটির মন ঘুরে গিয়েছিল আর টাকা নিচ্ছে জানার পর মেয়েটির মন থেকে প্রেম চলে যায়। কিন্তু এই কায়দাটা যে দীপার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তা বুঝতে পারছিলাম।

জামাইবাবুর ঘরে দিদি ছিল। এখন দিদি একটু সহজ। দীপাকে নিয়ে নানান কথার পর ঠিক হল জামাইবাবু আজই ছেলেটির বাড়িতে গিয়ে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। দিদি শুধু মন্তব্য করল, ‘বাপ বেঁচে থাকতে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে, এ কীরকম বাড়ি? এই মহিলা নির্ধাৎ খুব দম্ভাল।’

জামাইবাবু বলেছিলেন, ‘না জেনে মন্তব্য করা ঠিক নয় শোভনা।’

দিদি খেতে বলেছিল কিন্তু খেয়ে এসেছি বলেছিলাম আগাই, আর এখন এই পরিস্থিতিতে খেতে ভাল লাগছিল না। বাড়ি যাব বলে বেরিয়ে এসেছিলাম। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। দীপাকে তো জন্ম থেকে দেখছি। কোলে নিয়ে ঘুরেছি। পড়াশুনায় ওর দাদার চেয়ে ভাল বলে গর্ব ছিল আমাদের। সেই মেয়েটা এবতড় ভুল করল!

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে খেয়াল হল দেবুদার বাড়িটা বেশি দূরে নয়। এখন ভর দুপুর। এসময় কারও বাড়িতে যাওয়া ঠিক নয়। এইসব ভাবছি যখন তখন গাড়ির হর্ন শুনতে পেলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখি অ্যাম্বাসাডার গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে দেবুদা হাসছেন। দেবুদা নিজে গাড়ি চালান জানতাম না। এগিয়ে গিয়ে বললাম, ‘আপনি একশ বছর বাঁচবেন! এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম।’

‘এখানে দাঁড়িয়ে আমার কথা ভাবছ বিশ্বাস করি না।’

‘সত্যি বলছি।’

‘তাহলে কয়েক পা হাঁটলেই তো বাড়িতে পৌঁছে যেতে।’

‘এই অসময়ে কেউ কি কারও বাড়িতে যায়?’

‘বুঝেছি। যাচ্ছ কোথায়?’

‘বাড়ি ফিরব।’

‘উঠে এসো।’ দরজা খুলে দিলেন দেবুদা।

কি যে হল, না ভেবেচিন্তেই উঠে বসলাম। বসতেই নাকে অন্যরকম অন্যরকম গন্ধ এল। বুঝলাম দেবুদা ড্রিঙ্ক করেছেন। গাড়ি চালু করে বললেন, ‘শনি-রবিবার আমার ড্রাইভার আসে না। নিজেই একটু-আধটু চালাই। তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে।’

‘বাড়ি গিয়ে খাব।’ আমার অস্থিতি হচ্ছিল, ‘আপনি কি বাড়ি ফিরছিলেন?’

‘হ্যাঁ। শনিবার সকালে ক্লাবে যাওয়া আমার অভ্যাস। দু-চারজন আসে। একটু বিয়ার কিংবা ভদকা খাওয়া হয়। তারপর বাড়ি ফিরে পেটভরে ভাত খেয়ে টেনে ঘুম।’ হো হো করে হাসলেন দেবুদা। ‘ঘুম ছাড়া আর আমার আছে কি! ভগবান ওই একটি জিনিস দু-হাত ভরে দিতে কার্পণ্য করেননি।’

‘ভগবান আপনাকে অনেক কিছু দিয়েছেন।’

‘না স্বপ্না। এই বাড়ি গাড়ি টাকা আমি উপার্জন করেছি। কেউ আমাকে দয়া করে এসব দেয়নি। আমার ক্ষমতা অনুযায়ী আমি অধিকার করেছি। স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা ছিল না বলে ভগবান তাঁকে কেড়ে নিলেন। যে বয়সে আমি বিপত্নীক হলাম সেটা এমন কিছু বয়স নয়। যাক গেঁ।’

‘আপনি তো বাড়ির দিকে যাচ্ছেন না!’

‘না।’

‘কি আশ্চর্য! আমাকে পৌছে দিতে হবে না। আপনি বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া করুন। যথেষ্ট বেলা হয়ে গেছে।’

‘আমি সকালেই স্নান সেরে নিছি। খিদে পাচ্ছে, তুমিও খাওনি, চল কোথাও বসে আজ দুপুরের খাবারটা খাই।’ গাড়ি চালাতে চালাতে আমার দিকে তাকালেন দেবুদা।

বুঝতে পারলাম মদ্যপান করলেও ওঁর নেশা হয়নি। বললাম, ‘কি দরকার? বাড়িতে তো দু-জনেরই খাবার রাখা আছে।’

‘তুমি বলতে চাইছ বাড়িতে খাবার না থাকলেই লোকে বাইরে খায়?’

‘না, তা ঠিক নয়।’

‘রোজ ভো হয় না। আমার সঙ্গে খেলে নিশ্চয়ই তোমার খুব খরাপ লাগবে না।’

একথার পর আর না বলতে সংকোচ হল। সাহেবপাড়ায় একটা বড় হোটেলের ভেতর গাড়ি রাখলেন দেবুদা। এত বড় হোটেল, চারপাশের আবহাওয়া বেরকম উচুতরের যে আমার এই অটোপৌরে পোশাকে হাঁটতে খুব সংকোচ হচ্ছিল। দেবুদা অবশ্য পাজিমা-পাঞ্জাবি পরে আছেন। সেটা সদ্য পটিভাঙা নয়।

এত দামী রেস্টুরেণ্টে আমি কোনদিন ঢুকিনি। বেয়ারার বদলে স্যুট-টাই-পরা লোক অর্ডার নিতে এল। দেবুদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বল, কি খাবে? আগে একটু হজম করার ব্যবস্থা করা যাক। বিয়ার কিংবা ভদকা?’

আমি আঁতকে উঠলাম, ‘না না—!’

‘ঠিক আছে।’ দেবুদা লোকটিকে বললেন, ‘একটা লার্জ ভদকা উইথ টনিক আর একটা জলজিরা।’ এরপর কি খাবার আমরা খাব তাও বলে দিলেন। সেসব লিখে নিয়ে লোকটা চলে গেলে দেবুদা হাসলেন, ‘তুমি যেভাবে না না বললে তাতে মনে হল ভূত দেখেছ।’

একটু লজ্জা পেলাম। ‘না, মানে আমি ওসব খাইনি কখনও।’

‘ঠিক আছে। জলজিরা খাও, ভাল লাগবে।’

‘আপনি তো আজ ওসব খেয়েছেন।’

‘হ্যাঁ। ক্লাবে দু-বোতল বিয়ার খেয়েছি।’ আবার বললেন, ‘শনিবার সকাল ছাড়া বিয়ার খাই না।’

‘নেশা হয়ে যাবে না?’

‘দূর! তোমার খবর কি? ছেলে কেমন আছে?’

‘ভালো।’

‘তোমাকে আমার কার্ড দিয়েছিলাম, আশা করেছিলাম ফোন করবে।’

উত্তর দিলাম না। শোভন হবে না বলে ফোন করিনি, এ কথাটা বলা যায় না। ভদকা এবং জলজিরা এল। বেশ খেতে জলজিরা।

‘তুমি মাছ-মাংস খাও তো?’

‘নিশ্চয়ই। কেন?’

‘অনেকে এখনও খায় না।’

‘আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছে খান কিনা?’

‘না। ধরেই নেয় পুরুষদের ক্ষেত্রে এই নিয়মটা চালু নয়।’

‘সত্যি, আপনারা আর কতকাল সুযোগ নিয়ে যাবেন।’ হাসলাম।

‘ওই মেয়েটি, কি যেন নাম, ইন্দ্রাণী, হ্যাঁ, ওর খবর কি?’

‘কুচবিহার গেছে। ওর তো ওখানে কেউ নেই, একটা ব্যবস্থা করে আসবে।’

‘একা গেল, না, সুধী গেছে?’

‘জামাইবাবু যায়নি, সুদীপ গেছে।’

‘বাঃ ভাল। তোমার দিদি দেখছি বেশ আধুনিক। স্বপ্না, এবার আমার মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। আর আমার পক্ষে ওকে আগলানো সম্ভব হচ্ছে না।’

আমি কি ভাবব দেব? যদি বলি মেয়ের পড়াশুনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত, তাহলে দীপার কথা মনে আসছে।

আমরা চূপচাপ থেয়ে নিলাম। দেবুদা অবশ্য মাঝে মাঝে একটু-আধটু বসিকতা করে যাচ্ছিলেন। খাওয়া শেষ হলে দেবুদা জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আমি ড্রিক করি এটা তুমি ঠিক পছন্দ করো না, না? কিন্তু জেনো, আমি কখনও মাতাল হওয়ার মতো খাই না। আমার আনন্দের জন্যে আমি কাউকে বিরক্ত করি না।’

‘তাহলে তো ভালোই। তবে আনন্দ পেতে গিয়ে শরীর অসুস্থ যেন না হয়।’

আমরা উঠলাম। দেবুদাকে বললাম, ‘আর আমাকে পৌছে দিতে যেতে হবে না। কোনও একটা বাসস্টপে আমাকে নামিয়ে দিন।’

‘যা বলবে।’

গাড়িতে ওঠার পর কাণ্ডটা ঘটল। কার পার্কিং-এর জন্যে পয়সা নেয় যে ছেলেটা সে এসে বলল, ‘পাঁচ টাকা দিন।’

দেবুদা মাথা নাড়লেন, ‘এত কেন? কর্তৃক্ষণ হলে পাঁচ টাকা দিতে হয়?’

ছেলেটা হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বউদি, দাদাকে বলুন তো ছুটির দিনে দরাদরি না করতে।’

ওর মুখে বউদি শব্দটা শুনে অন্যদিকে মুখ ঘোরলাম। দেবুদা চটপট পাঁচ টাকা দিয়ে বিদায় করলেন, কারণ ছেলেটি তৎক্ষণাৎ অন্য গাড়ির পেছনে ছুটল। গাড়ি চালু করে দেবুদা বললেন, ‘তোমার বোধহয় নিশ্চয়ই পারাপ লাগছে।’

মাথা নাড়লাম, ‘না।’

‘সেকি? সত্যি বলছ?’ দেবুদা অবাক।

‘হ্যাঁ। আমাকে তো অনেকেই বউদি বলে। যে পাড়ায় থাকি সেখানে আমি স্বামীর সুবাদে বউদি বলে পরিচিত। ওঁর অফিসের লোকজনের কেউ কেউ আমাকে বউদি বলেন। আমি অভ্যস্ত।’ কথাগুলো বলে হাসলাম।

বাসস্টপে নামবার আগে দেবুদা আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করলেন ‘একা ফিরতে আমার অসুবিধে হবে কিনা। একাই তো যাতায়াত করি, অসুবিধে হওয়ার প্রায়ই নেই। গাড়ি থেকে নামছি এমন সময় দেবুদা অদ্ভুত গলায় বললেন, ‘তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে স্বপ্না?’

আমি তাকলাম।

দেবুদা বললেন, ‘আমি খুব একা।’ তারপর গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

হঠাৎ ওই বাসস্টপে দাঁড়িয়ে মানুষটার জন্যে আমার খুব কষ্ট হল। মনে হল, ঘুষ নিক আর মদ খাক, মানুষটার ভেতরটা খুব নরম।

মা জননী

এ বাড়ির যা হাল হয়েছে তাতে আমি যেদিকে দেখব না সেদিকটাতে গোলমাল পাকাবে। অথচ বাড়ি বলতে আমি ছাড়া দু’জন মানুষ, শোভন আর তার বাবা। শোভনের বাবাকে আমি দোতলায় উঠতে দিই না। কাছে এলেই আমার নাকে মাছের আঁশটে গন্ধ ধুক করে লাগে। দিনরাত মাছের আড়তে বসে থাকলে শরীর আঁশটে গন্ধময় হবেই। শুধু মাছের গন্ধ হলে এরকম ছিল, সন্দের পর তিনি আহ্নিক বসেন। রান সেরে গায়ে আতর মেখে সিঙ্কের লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরে কার্পেটের ওপর বসে বাংলা মদ গেলাটাকে তিনি আহ্নিক করা বলে মনে করেন। ওটা করতে করতে যতক্ষণ না কথা জড়িয়ে যাচ্ছে, পা টেনে, ততক্ষণ ওই আহ্নিক করা শেষ হবে না। কাছে গেলেই মনে হয় অনগ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসবে। শোভন হওয়া পর্যন্ত কোনমতে ওসব অনাগার সহ্য করেছি। তারপর থেকে আমরা আলাদা। একই বাড়িতে থাকি, আমি ওপরে তিনি নিচে। ওঁর দেখাশোনার জন্যে এখন এলোকেশী আছে। এলোকেশী কালো, মুটকি। গায়ের মেয়ের মতো বোকা বোকা ভাব থাকলেও ভেতরে ভেতরে পাজির পাখাড়া। ওর অত ঘেন্নাপ্রিয় নেই। বাবুর সব

কাজকর্ম ওই করে। আহিকের জিনিসপত্র সাজিয়ে দেয়। ওপর থেকে খাবার নিয়ে যায়। আর মাঝে মাঝে বাবুর কীর্তিকাহিনী শোনাতে আসে। তিনি নাকি ঘুমের ঘোরে আমার নাম বিড়বিড় করে বলেন। কথটা মিথ্যে নয়। এলোকেশীর আগে যেসব মেয়েরা ওই কাজ করত তারাও একই কথা বলেছে আমাকে।

আমার বড়দিদির শ্বশুরবাড়ি বেলঘোরে। দু-বেলা ফোন করে। ওর এক কথা, বাটাছেলেকে ওইভাবে লাগামছাড়া করে রাখিসনি ছোট। হোক কালো, মোটাসোটা, নিচের দরজা বন্ধ করে কি কাণ্ড করছে তার কি ঠিক আছে? এমনি পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করার চেয়ে সাপের ফণায় হাত দেওয়া অনেক ভাল, তার ওপর দিশি মদ খেয়ে মাতাল হওয়া পুরুষমানুষ। তোর এলোকেশী যদি ফেঁসে যায় তাহলে তোরই তো বদনাম হবে।

মেজদিদির বিয়ে হয়েছে বালিগঞ্জে। বেশ বড়লোক ওরা। পাটিতে যায় খুব। গেল মাসে ফোন করেছিল। ওর ওই এক কথা, 'তুই কি করে আছিস ছোট! এমন কি তোর বয়স? স্বামীকে নিচে পাঠিয়ে থাকতে পারিস? আমি বাবা পারব না।'

বলেছিলাম 'তোমার স্বামীর শরীর থেকে এমন গন্ধ বের হলে তুমিও পারতে।'

মেজদিদি বলেছিল, 'তোমার হলে আর একটা পুরুষবন্ধু ছুটিয়ে নিতাম। তিনি নিচের তলায় কাম্বের মেয়ের সঙ্গে কি করছেন তা তো তুই জানিস না, শরীর শান্ত করতে ওরকম কিছু তোর করা উচিত।'

মেজদিদিকে কিছু বলতে পারিনি। মাঝে মাঝে ওরকম ভাবনা আমার মধ্যেও যে আসেনি তা তো নয়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নিচের ভদ্রলোক আর যাই করুন ঝি-এর সঙ্গে ওই অবধি যাবেন না। তাছাড়া তাঁর তো কোনও দোষ নেই। আমিই ওই গন্ধ সহ্য করতে পারি না। মেজদি যখন প্রথম শুনেছিল তখন বলেছিল, 'ন্যাকামো! এক শিশি আতর ঢেলে দিলেই তো বদগন্ধ মিলিয়ে যায়।' কি করে বোঝাব, এটা বলা সহজ, করা খুব কঠিন। তাছাড়া তখন খোকা আমার সঙ্গে লেপটে ছিল। আমার শরীরের চাহিদার চেয়ে মনের আরাম বেশি ছিল। স্বামীর অভাব তাই বুঝতে পারিনি। এর ওপর যোগ হয়েছিল মানুষটার ব্যবহার। এত চিংকার করে কথাবার্তা, এত হামবড়া ভাব আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। এখন খোকা বড় হয়ে গেছে। আর যত বড় হয়েছে তত ও আমার কাছ থেকে সরে গেছে। এখনও সামনাসামনি অবাধ্য হয় না কিন্তু আমি বুঝতে পারছি ওকে এখনই সংসারী করা দরকার। ওর বাবাকে ও কোনদিন সহ্য করতে পারে না। নিতান্ত বাধ্য না হলে কথাও বলে না। খোকা দোতলার রাস্তার দিকের ঘরে ওর মতো থাকে।

এখন বিকেল। একটু আগে গা ধুয়ে পরিপাটি করে চুল বেঁধে পাটভাঙা শাড়ি পরে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। আত্মীয়স্বজনদের বলার পর তিন জায়গা থেকে খোকার জন্যে সম্বন্ধ এসেছে। ওঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার এ বিষয়ে। এইসময়ে ঠাকুর এসে পেছনে দাঁড়াল, 'মা জননী, আজ কি রাঁধব?'

'আমার মাথা। রোজ এক কথা বলতে হয় কেন তোকে? দাদাবাবুর জন্যে মাংস, বড়বাবুর জন্যে কাতলামাছের পেটি আর আমার জন্যে ওই দুটো একটু করে দিবি। বড়বাবুর জলখাবার হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। ময়দা মেখে রেখেছি, এলোই ভেজে দেব।'

'ঠিকমতো দিয়ো। ঠাকুর চলে গেলে দেখলাম এ-বাড়ির কাজের লোক গুরুচরণ নিচের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ তাঁর আসার সময় হয়ে গেছে। এই গুরুচরণ লোকটা এক নম্রের ধড়িবাড়। মুখ দেখলে বোঝা যাবে না।

গাড়িটা এসে ঠিক গেটের মুখে থামতেই গুরুচরণ ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। বিশাল শরীর নিয়ে এ-বাড়ির কর্তা মাটিতে নামতেই গুরুচরণ ছুঁচোর মতো মুখ করে কর্তার বুকোর কাছে গিয়ে গন্ধ শুঁকল।

কর্তাবাবু হাঁক মারলেন, 'কিসের গন্ধ?'

'আপ্তে গুরজালি, গুরজালি মাছ।'

'সাবাস। এই নে একটা টাকা। এলোকেশী কোথায়?'

'সারাদুপুর তো ঘুমাচ্ছিল, এখন কি করছে জানি না।'

'অ্যা? ওই শরীর নিয়ে দুপুরে ঘুমোয়? আর একটু ঘুমোলে তো দরজা কাটতে হবে।' কর্তামশাই এগোলেন। এগোতে এগোতে ওপরের বারান্দার দিকে তাকাতে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। আমি বললাম, 'কথা আছে।'

'আমার সঙ্গে?' বুকে আঙুল ঠেকালেন তিনি।

'তা নয় তো অমুক পাড়ার ভমুকের সঙ্গে?'

‘বলে ফ্যালো।’ তিনি যেন দয়া করলেন, ‘কিন্তু তাই বলে এই অসময়ে পাঁচালি শোনাতে বোসো না। আমার মেজাজ ভাল নেই।’

বারান্দা ছেড়ে সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে এসে দাঁড়ালাম। এখনও নাকে গন্ধটা পৌঁছায়নি। বললাম, ‘খোকার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে।’

‘কার বিয়ে? ও তোমার ছেলের? এর মধ্যেই বিয়ের জন্যে ছটফট করছে নাকি সে? কি অবস্থা! এক পয়সা রোজগার নেই যার তিনি বিয়ে করছেন!’

‘রোজগার নেই মানে? বাড়ির ব্যবসা যার এত বড় তার কি চিন্তা? পেটে বিদ্যো আছে, যে-কোনও সময় রোজগার ইচ্ছে করলেই করতে পারে।’ আমি বললাম।

‘আগে করুক, করে দেখুক। তার আগে আমি কোনও মেয়ের সর্বনাশ করতে পারব না।’ কথাগুলো বলে তিনি ভেতরে ঢুকে গেলেন।

এইসময় এলোকেশী সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল, ‘কর্তাবাবু এসে গেছেন? এখন কি হবে মা জননী!’

‘কেন? হয়েছেটা কি?’

‘কর্তাবাবু বলেছিলেন আফিকের জিনিস আনিয়ে রাখতে, একদম ভুলে গিয়েছিলাম।’

‘আনবি যে, টাকা দিয়েছিল?’

‘হ্যাঁ।’

‘মর তাহলে। নিচে গিয়ে জুতো-পেটা খা।’ আমি ওপরে উঠে এলাম। আমার সমস্ত শরীর জ্বলছিল। কাজের মেয়েকে উনি টাকা দিয়ে যাচ্ছেন, ধাষ্ট্যমোর আর কি কাকি রইল? এই লোকের সঙ্গে আমাকে সংসার করতে হয়? সাথে কি একতলা দোতলায় ভাগাভাগি হয়ে আছি।

ওঁর কথায় বুঝতে পারলাম উনি খোকার বিয়ের ব্যাপারে কিছুই করবেন না। না করুন, আমি তো মরে যাইনি। আমার বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজন কম নেই। তাঁদের অবস্থাও ভাল। তাঁরাই সব করবে আমার জন্যে।

এইসময় এলোকেশী ওপরে ছুটে এল, ‘কর্তাবাবু বাথরুমে। এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছেন। কি বলব?’

‘ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে যখন তাহলে বলে দে অপেক্ষা করতে হবে।’

‘বলেছি।’ এলোকেশী মাথা নাড়ল, ‘বললেন তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। কি ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করায় বললেন, বিয়ে থা-র ব্যাপার।’

‘ওমা, তাই? যা, ওপরে নিয়ে আয়। আর শোন, ওই উজ্জ্বলটাকে বল কর্তাবাবুর কাছে থাকতে, তুই ওঁর জন্যে চা-মিষ্টি ব্যবস্থা কর।’

আমার মাসতুতো বোন বলেছিল এক ভদ্রলোক সম্বন্ধ নিয়ে দেখা করতে আসবেন। তিনিই এসেছেন বুঝতে পেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে ঠিকঠাক করে নিলাম। দোতলায় বসার ঘরে ঢুকতেই এলোকেশী ভদ্রলোককে নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক আমাকে নমস্কার করে বললেন, ‘আমার নাম সুধীরপ্রদন মুখার্জী।’

মুখার্জী শুনে একটু খটকা লাগলেও হেসে বললাম, ‘বসুন।’

ভদ্রলোক বললেন, ‘আমি শোভনের বাবার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু উনি বোধহয় ব্যস্ত রয়েছেন, তাই আপনাকে বিরক্ত করছি।’

‘না না, মোটেই নয়।’ আমি উলটোদিকের চেয়ারে বসলাম। ‘বসুন কি ব্যাপার?’

‘আমি সরকারি চাকরি করি। চাকরিটা মাঝারি ধরনের। আমার একমাত্র মেয়ে দীপাহিতা প্রেসিডেন্সিতে পড়ে। পড়াশুনায় খুব ভাল, চেহারাটিও চোখে পড়ার মতো। আপনার ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় আছে।’ ভদ্রলোক থামলেন।

মুহূর্তে আমার মনে পড়ল সেই মেয়েটির কথা যে খোকার শরীর খারাপের সময় দেখতে এসেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘আপনি কি বলতে চাইছেন?’

‘আমার মেয়ে এবং আপনার ছেলে যখন হির করেছে পরস্পরকে বিবাহ করবে তখন সেটা আমাদেরই দিয়ে দেওয়া উচিত।’

‘কি বলছেন আপনি? আমার ছেলে বিয়ের কথা শুনলেই রেগে যায় আর আপনি বলছেন যে স্থির করেছে আপনার মেয়েকে বিয়ে করবে? পাগল!’

‘আমি ঠিকই বলছি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন।’

‘খোঁজ নেওয়ার কোনও দরকার নেই, আমার ছেলেকে আমি চিনি। আপনি কি করে ভাবলেন বেজাতের একটি মেয়েকে আমি বউ হিসেবে ঘরে আনব?’

‘বেজাতের?’

‘হ্যাঁ, আপনি তো বামুন। বেজাত তো নিশ্চয়ই। আস্পর্ধা! এভাবে মেয়েকে লেলিয়ে দিয়ে বড়লোকের ছেলেকে জামাই করার মতলব থাকলে জেনে যান সেটা কখনও এ বাড়িতে সম্ভব হবে না।’ আমার শরীর হুলছিল।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, ‘এরপর আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার রুচিতে বাধছে। শুধু জেনে রাখুন, আপনাদের বাড়িতে আমি স্বেচ্ছায় আসিনি, আসতে বাধ্য হয়েছি। আপনার সঙ্গে কথা বলার পর মনে হচ্ছে, আমার মেয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে ফেলেছে। কিন্তু আমার তো কিছু করার নেই।’ ভদ্রলোক হনহনিয়ে নেমে গেলেন। যাওয়ার সময় একটা নমস্কারও করলেন না।

চেহারাপর পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছিল আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। অথচ তেজ দেখিয়ে গেল খুব। উনি স্বেচ্ছায় আসেননি, কেউ বাধ্য করেছে। কে করল? খোকা? হঠাৎ কেমন অবস্থি হচ্ছিল। খোকার ইদানীংকার চালচলন কথাবার্তা আমি একদম বুঝতে পারি না। কেমন সাহেবী সাহেবী ঠাটবাট। ওই দীপায়িতা মেয়েটার সঙ্গে কিছু করে বসিনি তো? কারও সঙ্গে যে এ বিষয়ে কথা বলব তার তো কোনও উপায় নেই।

এইসময় ঠাকুর ট্রেতে করে চা-মিষ্টি নিয়ে এল।

‘কি চাই?’

‘ওই যে, এলোকেশী বলল আপনি হুকুম করেছেন।’

‘লাগবে না। নিয়ে যাও। নিচে বাবুর খাবার গিয়েছে?’

‘হ্যাঁ।’

এখন আমি কি করব? না, কোনও অবস্থাতেই ওই বামুনের মেয়েকে এ বাড়িতে আসতে দেব না। যে আইবুড়ো অবস্থায় ছেলেদের গন্ধ শুঁকে বেড়ায় তাকে বাড়িতে ঢোকালে হাড়ির হাল করে ছাড়বে। উঠে খোকার ঘরে গেলাম। খোকা নেই। এলোকেশী এতদিন এই ঘর গোছাতো। খোকা বড় হচ্ছে জেনে বলব-বলব করে শেষ পর্যন্ত বারণ করেছি। তাতে খোকার কি রাগ? চাকরের কাজ নাকি বাবুর পছন্দ নয়। বাপের ওপর এলোকেশীকে নিয়ে যে ভরসা আমি করতে পারি, ছেলেকে নিয়ে পারি না। এখন ওর বয়স আশুনের মতো। যা পাবে তাই পোড়াবে। ওই বামুনের মেয়ের সঙ্গে কতদূর এগিয়েছে তা কে জানে!

আমি কোনদিন যা করি না তাই করলাম। খোকার টেবিল, টেবিলের ড্রয়ার টেনে টেনে দেখতে লাগলাম। যদি তেমন কিছু ঘটে থাকে তাহলে নিশ্চয় চিঠি-ফিট দেখতে পাব। হঠাৎ একেবারে নিচের ড্রয়ারে মোটা খামটা দেখতে পেলাম। খামটার মুখ ফাঁক করতে বুঝলাম ওর মধ্যে বেশ কয়েকটা ছবি আছে। কার ছবি? প্রথমটা বের করতে আমার চক্ষু চড়কগাছ! এ যে ন্যাংটো মেরেমানুষের ছবি। বিব্রী ভঙ্গিতে হাসছে। শরীর ঘুলিয়ে উঠল। দ্বিতীয় ছবিটাও আর একটা মেয়েছেলের, বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাংটো হয়ে। তাড়াতাড়ি ছবি দুটোকে খামে ঢুকিয়ে যেখানে ছিল সেখানে রেখে দিলাম। আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছিল। এ কি ছবি! খোকা এইসব ছবি দ্যাখে! প্রায় দৌড়ে ওই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম।

কিন্তু বস্তি পাচ্ছিলাম না। আমার ছেলে, যাকে চোখের ওপর রেখেছি এতদিন, সে কখন এমন চরিত্রহীন হয়ে গেল? এই ছবিগুলো একটা মেয়ের নয়। কারণ যে দুটো দেখেছি তারা আলাদা মেয়ে। খোকা কি তাদের ওইসব ছবি তুলে এনেছে? নাকি পয়সা খরচ করে কিনেছে? যাই করুক, খোকা যে পাপের পথে চলে যাচ্ছে তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না। আর ওদিকে ঝাঁর ছেলে তিনি এখন নিচের তলায় আয়েস করছেন। লাগু নাকে দুর্গন্ধ, আমি ঠিক করলাম আজ একটা হেস্টনেস্ট করব।

দরজাটা বন্ধ। আমি জোরে জোরে শব্দ করলাম। চাকরটা ছুটে এল, ‘মা জননী, আপনি?’

যেন ভূত দেখছে এমন মুখের চেহারা, বললাম, ‘হ্যাঁ আমি, তোর কি?’

দ্বিতীয়বার আওয়াজ করার পর এলোকেশী দরজা খুলল, ‘আপনি?’

‘কানে আওয়াজ যাচ্ছিল না?’

‘যাচ্ছিল। কিন্তু এসময় দরজা খোলা বারণ।’

‘সর সামনে থেকে।’

এলোকেশী সরে দাঁড়ানোমাত্র আমি ভেতরে পা বাড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে ডক্ করে নাকে দুর্গন্ধ এল। আঁচল চেপে ধরলাম নাকে। বসার ঘর পেরিয়ে এগোতেই দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। মাটিতে আসন পেতে তিনি বাবু হয়ে বসে আছেন সিন্ধুর পাঞ্জাবি-লুঙ্গি পরে। সামনে দিশি মদের বোতল, গ্লাস, খাবার-দাবার। আমায় দেখতে পেয়ে তাঁর চোখ বড় হল, ‘ও, তুমি? পথ ভুলে এলে নাকি?’

‘শোন, তোমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে চাই।’

‘এখন কথা বলার সময় নয় মা জননী। দেখছ তো সাধনায় বসেছি। এলোকেশী কোথায়? অ্যাঁই এলোকেশী, দরজাটা খুললি কেন হারামজাদি?’

‘ওকে ধমকে কোনও লাভ নেই। আমিই খুলতে বলেছি।’

‘অ’ তিনি গ্লাসে চুমুক দিলেন, ‘বেশ। বলো, চটপট বলে ফ্যালো।’

‘খোকার বিয়ে না দিলে বংশের মুখে চুনকালি পড়বে।’

‘কেন? কি করেছে সে?’

‘এক বামুনের মেয়ের সঙ্গে বোধহয় ভাব করেছে। তার বাপ এসেছিল। আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, সত্যি হলোও হতে পারে।’

‘বামুনের মেয়ে? বাঃ! এলোকেশী, জল! তা বিশ্বাস হল কি করে?’

এলোকেশী এসে আর একটা জলের বোতল দিয়ে সামনে থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত চূপ করে থাকলাম, তারপর নিচু গলায় ছবির কথা বললাম।

‘তাই নাকি? বাঃ, ছেলে ভেতরে ভেতরে এত শেয়ানা হয়ে উঠেছে তা তুমি বুঝতে পারনি? আমি অবশ্য ওর মুখ দেখেই বুঝতে পারি গভীর জলে সাঁতার কাটছে। ওর বাপ কোনদিন ন্যাংটো মেয়েছেলের ছবি দ্যাখেনি, ও বাপের ওপর যাচ্ছে। তা কি করতে চাও এখন?’

‘ওর বিয়ে এখনই দিয়ে দিতে চাই।’

‘দাও। তুমি ওপরে বউ নিয়ে থাকো। আমার কি?’

‘তুমি ছেলের বাবা, বিয়ের সময় তোমাকে দাঁড়াতে হবে।’

‘না দাঁড়ালে যদি বংশের অসম্মান হয় তাহলে দাঁড়াব।’

‘মেয়ে দেখতে যাবে তো?’

‘মেয়ে? মেয়ে দেখার কি আছে? বললেই তো, সে নাকি কোন বামুনের মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছে। খামেলা চুকে গেল। তাকেই ঘরে নিয়ে এনো, আমরাও উঁচু জাতে উঠব।’ চুমুক দিলেন গ্লাসে আমার কর্তা।

‘তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কথায় বলে, পালাটি ঘর! মেয়ের বাপের চেহারা দেখেই মনে হল কোনওমতে সংসার চলে। ভিথিরির মেয়েকে বাড়ির বউ করে আনব নাকি? তাতে সংসার থাকবে?’

‘তা সেই ভিথিরির মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলে ভাব করতে গেল কেন?’

‘মতিভ্রম। ওই যে ছবিগুলো এনেছে, সেইরকম ব্যাপার।’

উনি হাত নাড়লেন, ‘আমি এর মধ্যে নেই। যে ছেলে ন্যাংটো মেয়ের ছবি ঘরে রাখে, সে কোনও জ্যাভ মেয়ের সঙ্গে ভাব করে ছেড়ে দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আর সেরকম হলে অন্য কোথাও বিয়ের ব্যবস্থা করা মহাপাপ হবে, বুঝলে? এ বিষয়ে মেয়ের বাপ কি কিছু বলেছে তোমায়? এই যেমন, বিয়ে না দিয়ে উপায় নেই।’

আমি চেপে গেলাম। ভদ্রলোক বলেছিলেন তিনি খেচ্ছায় আমার সঙ্গে কথা বলতে আসেননি, বাধ্য হয়ে এসেছেন। মেয়ে জীবনের বড় ভুলটা করে ফেলেছে। কথাটার মানে কি? স্পষ্ট করে বলেননি কিছু। কিন্তু খোকা যদি তেমন কিছু করে বসে! না, করবে না। করতে পারে না। ভদ্রলোক ওসব কথা বলে আমার ওপর চাপ দিচ্ছিলেন। এসব ঠেকে বললাম না। বললাম, ‘নিজের ছেলের সম্পর্কে ওরকম কুখ্যা বলতে তোমার মুখে আটকাচ্ছে না? সে কিছু করে থাকলে ভদ্রলোক আমাকে ছেড়ে দিতেন? বলতেন না সে কথা?’

‘অ। তাহলে এগিয়ে যাও। কোনও বড়লোকের সুন্দরী পুতুল খুঁজে বের করো যার সঙ্গে তোমরা মা-ব্যাটায় মিলে চমৎকার খেলতে পারবে।’

এরপর আর দাঁড়ানো না। আমাকে চলে আসতে দেখে উনি হাঁক মারলেন, 'এলোকেশী, দরজাটা বন্ধ করে দে।' বলে গান ধরলেন, 'এলোকেশী, সর্বনাশী, হাসিটি তার বড্ড বাসি।' গা ছুলে গেল।

বেকুব্বার সময় এলোকেশীকে বললাম, 'মাতাল হয়ে গেছে, খবরদার কাছে যাবি না।'

'কি যে বলেন মা জননী, উনি আমার বাপের মতন।' এলোকেশী খুব লজ্জা পেল।

ওপরের ঘরে ঢোকামাত্র ফোন বাজল। তুললাম। আহিরিটোলার ছোটমাসি ফোন করেছে, 'হ্যাঁবে, শুনলাম ছেলের জন্যে পাত্রী খুঁজছি।'।

'হ্যাঁগো। দ্যাখো না, ভাল মেয়ে যদি পাও।'

'দেখব কি রে! হাতের কাছে আছে। শোভাবাজারের অবিনাশবাবুকে চিনিস? তুই চিনবি কি করে? আমার ননদের সম্পর্কে জানি। ওঁর মেয়ে আছে। দুধে-আলতা গায়ের রঙ। স্বাস্থ্যও ভাল। শুধু ছেলেবেলায় একবার খুব টাইফয়েড হয়েছিল বলে একটু ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। তা আমাদের ঘরের বউ ঠাণ্ডা হওয়াই ভাল।'

'বয়স কত?'

'কত আর সতেরো-আঠারো। স্বাস্থ্য দেখলে মনে হবে বেশি। কিন্তু আমার চোখের সামনেই তো জন্মেছে, আমি ঠিক বয়েসটাই জানি। বাপের প্রচুর পয়সা।'

'ডাইবোন?'

'নেই। একা মেয়ে। সব কিছু তোর পাবি।'

'কতদূর পড়েছে?'

'আই মলো যা। তুই কতদূর পড়েছিস রে? বিদ্যার জাহাজ ঘরে ঢুকিয়ে শেষে নিজের তার তলায় ডুবে মরবি নাকি? বললাম না, ক্লাস সেডেনে পড়ার সময় টাইফয়েড হয়েছিল। যায় যায় অবস্থা। তারপর স্থুলে যায়নি আর। তবে প্রাইভেটে পরীক্ষা দেবে বলে তৈরি হচ্ছে।' ছোটমাসী বলল।

'আসলে খোকা তো পড়াশুনায় খুব ভাল। ইংরেজিতে অনার্স।'

'রাখ তোর অনার্স। ফুলশয্যা রাতে বউ-এর শরীর দেখার পর আর কোনও বই পড়তে চাইবে না, বলে দিলাম। অসূর্যম্পশ্যা। গায়ের রঙ দেখলে চোখ বড় হয়ে যাবে। ব্যাটাছেলেদের কিসে বশ করতে হয় তা এখনও জানিস না।'

'বেশ, সম্বন্ধ করো।'

'সেইজন্যেই তো ফোন। তার দিদি বলতেই আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। কাল সকালে যাবে তাদের বাড়িতে কথা বলতে। তোর বর কখন বের হয় ব্যবসায়?'

'সকাল আটটায়।'

'তাহলে তার পরে যেতে বলব। ওকে বিশ্বাস নেই, যা সব শুনি।'

টেলিফোন রেখে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নাইবা থাকুক বিদ্যো, ভাল দেখতে হলে খোকা নিশ্চয়ই মজ্ঞে যাবে। আর বড়লোক, একমাত্র মেয়ে, এসব তো আছেই।

এইসময় খোকার গলা পেলাম। চাকরটাকে কিছু বলছে। আমি ধীরেসুস্থে এগিয়ে গেলাম। খোকা ততক্ষণে ঘরে ঢুকেছে। জামা ছাড়ছে।

বললাম, 'তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'বল।' আমার দিকে না তাকিয়ে বলল সে।

'দীপাঙ্কিতার বাবা এসেছিল। তুই নাকি তার সঙ্গে ভাব করেছিস?'

'ভদ্রলোককে আমি চিনিই না যে ভাব করব।' খোকা আমার দিকে পেছন ফিরে কথাগুলো বলল।

'আমি তার কথা বলিনি। আমি কি জানতে চাইছি তা তুই বুঝতে পারছিস!'

'ও দীপা, হ্যাঁ, দীপা আমার বন্ধু।'

'বন্ধু? মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় নাকি?'

'তোমাদের সময়ে হয়তো হয় না, এখন হয়।'

'তা বন্ধু হলে তার বাপ বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসবে কেন?'

'কেউ কেন আসছে তা আমি কি করে বলব?' খোকা ঘুরে দাঁড়াল।

'তিনি নাকি বাধ্য হয়ে এসেছেন। কেন, কি করেছিস তুই?'

'আমি আবার কি করব?'

‘শোন খোকা, কাল সকালে শোভাবাজারের এক ভদ্রলোক আসবেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে সন্ধন নিয়ে। আমি সামনের মাসেই তোর বিয়ে দিয়ে দিতে চাই।’

‘বাঃ, খুব ভাল কথা।’

‘ইয়ার্কি মেরে কোনও লাভ নেই। মেয়ের বাপের অফেল পয়সা। একমাত্র মেয়ে। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ। স্বাস্থ্যও খুব ভাল।’

‘বঁটে না লম্বা?’

‘আমি তুমিকে গেলাম, ‘জিজ্ঞাসা করিনি। নিশ্চয়ই খুব বঁটে নয়।’

‘গান গাইতে জানে?’

‘জিজ্ঞাসা করিনি। ছোটমাসি খবরটা দিল। নিশ্চয়ই জানে।’

‘পড়াশুনা?’

‘বড্ড প্রশ্ন করছিস। আজকাল কেউ পড়াশুনা ছাড়া বড় হয়?’

‘তোমাদের বজ্রাতিরা হয়। টাকা থাকলে আর কিছু চায় না তারা। আমি এখনই তোমাকে হ্যাঁ বলতে পারছি না।’

‘কেন, পারছিস না কেন? তোকে হ্যাঁ বলতেই হবে।’ আমার মাথা গরম হয়ে গেল, ‘সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে এখানেই বিয়ে করতে হবে তোকে। ছি ছি ছি! তুই চোখের সামনে চরিত্রহীন হয়ে বাবি, আমি সহ্য করব না।’

‘যা বাক্য! আমি চরিত্রহীন হয়ে যাচ্ছি?’

‘নিশ্চয়ই! নইলে তোর ড্রয়ারে ওইসব জঘন্য ছবি থাকে?’

‘ও। তুমি আমার ড্রয়ারে হাত দিয়েছ কেন?’

‘বেশ করেছি দিয়েছি। শোন, আমার কথা যদি তুমি না শোন তাহলে এ বাড়ির কোনও কিছু তুমি পাবে না। ওই ভিথিরির মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় গিয়ে থাকতে হবে তোমাকে, এই আমি স্পষ্ট বলে দিলাম।’

কথাগুলো বলে আমি হনহন করে নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

এ ছালা অসহ্য লাগছে। কাউকে যে বলব তার উপায় নেই। দিদিদের বললে তারা এই নিয়ে পাঁচকথা শোনাবে। আমি ঠাকুরঘরে চলে এলাম। চোখ বন্ধ করে মাকালীর মূর্তির সামনে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। মনে মনে মাকে ডেকে গেলাম। মাগো, বিপদতারিণী, তুমি রক্ষা করো।

মন একটু শান্ত হলে চোখ খুলে তাকাতেই চমকে উঠলাম। এ কি দেখছি আমি! খোকার ঘরে খামের ছবির মেয়েমানুষটা তো মায়ের মতো ভসি করে দাঁড়িয়েছিল। ছি ছি ছি! মা, আমার মন থেকে ওই ছবির কথা মুছে দাও! মাগো।

ফোন বাজছে।

উঠলাম। বসার ঘরে গিয়ে ফোন ধরলাম, ‘হ্যালো।’

‘শোভন আছে।’ একটা মেয়ের গলা।

‘কে বলছ?’

‘আমি দীপাশিতা, আপনি কি ওর মা?’

‘হ্যাঁ শোন, আমি চাই না তুমি খোকার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখ।’

‘কিন্তু—!’

‘তোমার বাবা এসেছিলেন। তাঁকে তো আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি। শোননি?’

‘ওনেছি। ওনেই শোভনকে ফোন করতে এলাম। ওকে দিন।’

‘তুমি এমন বেহায়া মেয়ে? আমার কথা কানে যাচ্ছে না?’

‘আপনি আমার ওপর অযথা রাগ করছেন। আপনি যদি ফোন না দেন তাহলে আমাকেই এখন যেতে হবে আপনার বাড়িতে।’

‘ঠিক আছে। দিচ্ছি। জেনে রেখো, এই শেষবার।’ আমি ফোন নামিয়ে চিৎকার করলাম, ‘খোকা, খোকা!’

খোকা দরজায় এসে দাঁড়াল, ‘কি চাই, চোঁচাচ্ছ কেন?’

‘তোর ফোন।’

খোকা এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো!'

আমি ঘর ছেড়ে চলে গেলাম না। খোকাকে বলতে ওনলাম, 'হ্যাঁ। দূর! তুমি এসব কথায় কান দিয়ে না। 'আঁ? ও।' আবার একটু চুপচাপ। তার বলল, 'মাথার ঠিক নেই। তুমি বলে দাও ম্যাক্সিমাম তিনদিন। হ্যাঁ, আমি জেনেই বলছি। কাল কথা হবে। রাখছি।'

ও চলে যাচ্ছিল, আমি ডাকলাম, 'খোকা!'

ও তাকাল। বললাম, 'তুই ওই মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়বি না?'

'আপাতত তো কোনও কারণ দেখছি না।'

'তার মানে আমার কথার কোনও দাম তোর কাছে নেই?'

'অন্যায় কিছু বলে দাম আশা করা বোকামি।'

'কি আছে মেয়েটার? ফর্সা? লম্বা? সুন্দরী? বাবার টাকা আছে?'

'এসব ফালতু কথা।'

'বেশ। তুই যে ওইসব ছবি দেখিস তা মেয়েটা জানে?'

'হ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, আমি ওকে বলব। তোর চরিত্র কত খারাপ তা ওকে জানাব।'

'তুমি এসব করলে আমি এ বাড়িতে থাকব বলে ভেবেছ?'

'যেখানে ইচ্ছে যা।'

হঠাৎ খোকা এগিয়ে এল। দু-হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'তুমি অভিনয় বুঝতে পারো না মা। এত রেগে গেলে শরীর খারাপ হবে তোমার।'

'অভিনয়?' আমার দমবন্ধ হয়ে আসছিল।

'নয়তো কি? একটা ভুল, বুঝতেই পারছ, করে ফেলেছি। সেটাকে সামান্য দিতে সময় লাগবে না? আমি যদি ওর সঙ্গে কথা না বলি তাহলে ও মরিয়া হয়ে একটা অনর্থ বাধাবে। তুমি কিছু ভেবো না।' আমাকে আদর করে খোকা চলে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছালা মিলিয়ে গেল আমার।

সুদীপ

যত সহজে ইন্ড্রাণী ওদের এই কুচবিহারের বাড়ির বিক্রিব্যবস্থা করবে বলে ভেবেছিল তা সম্ভব হল না। প্রথম কথা বাড়িটা ছিল ইন্ড্রাণীর মায়ের নামে। তিনি মারা গেছেন। অতএব উত্তরাধিকারিণী হিসেবে নিজের অধিকার ইন্ড্রাণীকে প্রমাণ করতে হবে প্রথমে। তার নামে সব ট্রান্সফার হওয়ার পর বিক্রির অধিকার পাবে। এটা বলা যত সহজ, করাটা তত নয়। সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে ইন্ড্রাণীর বাবার বন্ধুকে ভালমানুষ বলে মনে হল। তিনিই ওই বাড়ি-ভূমি কিনতে ইচ্ছুক। উকিলের কাছে নিয়ে গিয়ে ইন্ড্রাণীকে দিয়ে ট্রান্সফারের আবেদনপত্র এবং ফর্ম সই করিয়ে বললেন কোনও চিন্তা না করতে। কুচবিহারে থেকে যা করার তিনিই করবেন। উপরন্তু বাড়িটা যখন কিনবেনই তখন অগ্রিম বাবদ দু-লক্ষ টাকা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে দিয়ে দিলেন। এখন বাজার যাচাই করে বিক্রি করতে হলে ইন্ড্রাণীকে কুচবিহারেই পড়ে থাকতে হত। যে টাকা সে মোট পাবে তা ওর কাছে বখেট বলেই মনে হচ্ছে।

দু-রাত ছিলাম আমি ওদের বাড়িতে। এটা সত্যি কথা, আমি এই প্রথম কোনও যুবতী মেয়ের সঙ্গে এতটা সময় একা ছিলাম। আমার খাওয়া-থাকার কোনও অসুবিধে হয়নি। সেরা ঘরে ভাল বিছানা করে দিয়েছিল ইন্ড্রাণী। রাত্রের খাওয়া শেষ হলে ও নিজের ঘরে চলে যেত। সপ্তম এবং নৌজন্য বলায় রেখে একই বাড়িতে অর্ধপরিচিত কোনও যুবকের সঙ্গে ও যখন থাকতে পেরেছে তখন আমিই বা পারব না কেন?

অবশ্য এই কথা আমার কলোলের বন্ধুরা বিশ্বাস করত না। ওরা মনে করে কোনও মেয়েকে একা পাওয়া মানে হাতে স্বর্ণ পাওয়া। ওদের কথাবার্তা আমার ভাল না লাগলেও ওদের সঙ্গে থাকতাম। আমার জীবনে কখনও কোনও মেয়ে আসেনি, এই কথাটা ওরা বিশ্বাস করত না।

ফেরার সময় ইন্ড্রাণী বলল, 'আমাকে একটা থাকার ভাড়াগা যোগাড় করে দিতে পারেন? মেয়েদের হোস্টেল কিংবা মেস?'

'কেন?'

'বাঃ, আর কতকাল আপনাদের বাড়িতে থাকব?'

'তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে?'

'মোটাই নয়। কিন্তু মনে মনে অস্বস্তিতে আছি।'

'তুমি তো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে। তখন হোস্টেল খুঁজলেই তো চলেবে। এত তড়াহুড়ো করার কি আছে?'

ইন্ড্রাণী হেসে বলেছিল, 'আপনি বুঝবেন না।'

আমি ভেবে পেলাম না। এতে বোঝাবুঝির কি আছে? অনায়াসে কোনও পরিবারে দীর্ঘদিন থাকতে পারা যায় না। পেয়িং গেস্ট হলে এক কথা, সেটা আমাদের বাড়িতে সম্ভব নয়।

স্টেশন থেকে সোজা বাড়িতে চলে এলাম। ইন্ড্রাণী ট্যান্ডিভাড়া দিতে চাইছিল, আমি রাজী হলাম না। যদিও আমার পকেটে মাত্র কুড়ি টাকা পড়ে বইল। দরজা খুলল মা, গভীরমুখে। খুলেই বলল, 'আসতে যে দেরি হবে তা জানাতে পারেনি?'

'একটা রাত তো দেরি হয়েছে।' টেলিগ্রাম পাঠালে সেটা আমাদের পরে পৌঁছাতো।' রুফ গলায় জবাব দিলাম।

মা বলল, 'তোমার বাস্তু খুব চিন্তা করছিল।'

'কোনও মানে হয় না।' আমি ভেতরে চলে গেলাম। যাওয়ার সময় শুনলাম মায়ের গলা'র স্বর বদলে গেছে, 'এসো। তোমার কাজ হয়েছে?'

'পুরোটা হয়নি। তবে দু-লক্ষ টাকা আড়ভান পেয়েছি।'

'দু লক্ষ?'' মায়ের গলায় বিস্ময়।

আমি আর দাঁড়ালাম না। আন্ত্র ট্রেন লেট করেছে। এইসময় বাবার বাড়িতে থাকার কথা নয়। অফিসে ফোন করে বৃদ্ধকে খবরটা দিতে হবে। আমি নিজের ঘরে ব্যাগ রেখে উঠানে এলাম। মা আর ইন্ড্রাণী এখনও বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে কথা বলে চলেছে। মাঝে মাঝে মায়ের বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যায়। মেয়েটা যে অতটা ট্রেনজার্নি করে এল সে ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন নেই। কথাটা মনে করিয়ে দিতে গেলে অপব্যাত্যা হবে বলে ওদিকে গেলাম না। এই সময় জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম বাবা তার ইজিচেয়ারে শুয়ে বসেছে। বাবা আজ অফিস যায়নি কেন?

আমি দরজায় দাঁড়াতেই বাবা চোখ তুলল, 'এই এলে?'

'হ্যাঁ। ট্রেন লেট ছিল। সবাই বলল টেলিগ্রাম করলে সেটা আমাদের আগে পৌঁছাবে না, তাই করিনি। ইন্ড্রাণীর কাজ কিছুটা হয়েছে।' আমার যা বলার তা সংক্ষেপে জানিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'অফিসে যাওনি কেন?'

'ইচ্ছে হয়নি।'

হতেই পারে। যে কোনও মানুষের যখন কোনও কিছুতে অনিচ্ছা আসে তখন সে তা নাও করতে পারে। বাবাকে বিনা কারণে কামাই করতে অবশ্য কখনও দেখিনি।

চলে যাচ্ছিলাম, বাবা ডাকল। কয়েক পা এগোতেই বলল, 'বোসো।'

বসলাম। বাবার সঙ্গে এত কাছাকাছি একা বসে ইদনীং কথাবার্তা হয় না। কিরকম অস্বস্তি লাগে। আমি যদি চাকরি বা ব্যবসা করতাম তাহলে বোধহয় লাগত না। রাজনীতি করে করে সেই স্তরে পৌঁছব যখন আমি যা বলব তাতেই কাজ হবে।

'তুমি কি তোমার বোনের কথা কিছু জানতে?'

'বোন? দীপা কি করেছে?' আমি অবাক হলাম।

'সে বিয়ে করেছে।'

'সেকি?'

'হ্যাঁ। রেজেন্সি করেছে। হেলোট ওর থেকে সামান্য বড়। ইংরেজিতে অনার্ন করেছে। বেশ বড়লোক, মাহের বাবসায়ীর একমাত্র ছেলে।'

‘এসব এখনই করতে গেল কেন?’

‘তোমার মা এই প্রশ্ন করেছিল। সে বলেছে ছেলেটি নাকি তাকে বাধ্য করেছে।’

‘বাধ্য করেছে? ও কি বাচ্চা মেয়ে? কে বাধ্য করেছে?’

বাবা উঠে বসল, ‘এসব কথা এখন বলে কোনও লাভ নেই। তোমার মা-মাসি আমাকে বলেছিল ছেলেটির মা-বাবার সঙ্গে কথা বলতে।’

‘তুমি যাবে?’

‘গিয়েছিলাম। এত অপমানিত আমি কখনও হইনি।’

‘তোমাকে অপমান করেছে ছেলের বাবা?’

‘না, তার দেখা পাইনি। বুঝলাম ছেলের মা-ই সব। তিনি তাঁর ছেলের বিয়ে বেজাত বামুনের মেয়ের সঙ্গে দেবেন না। তাঁর ধারণা আমি আমার মেয়েকে লেলিয়ে দিয়েছি তাঁর ছেলেকে ধরার জন্যে। এসব কথা শুনব কখনও ডাবিনি।’

‘দীপাকে বলেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘এরপরে দীপা ওই বাড়ির বউ হতে চাইছে?’

‘আমি জানি না। ছেলেমেয়েদের যখন বড় করা হয় তখন তো বোঝা যায় না ওরা বড় হয়ে কি আচরণ করবে!’ বাবা উঠে দাঁড়াল।

‘এই বিয়ে আমরা ঝেনে নেব?’

‘না নিয়ে উপায় কি।’

‘ওই কথা শোনার পর আমরা কি করে সম্পর্ক রাখতে পারি?’

‘পারি না বলে কোনও কথা নেই। মেয়ের জন্যে বাবা-মাকে কত কিছু সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, কি করে হবে!’

‘কিছুই হবে না। দীপা ও-বাড়িতে যাবে না। রেজেষ্ট্রি করে থাকলে সেটাকে বাতিল করতে হবে। আমি যেমন করে হোক সেটা করতে চেষ্টা করব।’ আমার মাথা গরম হয়ে গেল। দীপা এত বড় ভুল কি করে করল ভাবতে পারছিলাম না।

‘ওসব করে কোনও লাভ হবে না খোকা। ছেলেমেয়ে দু-জনেই প্রাপ্তবয়স্ক। আর আমাকে অপমান করেছেন ছেলের মা, ছেলে নয়। তোমার মাকে নাকি দীপা বলেছে শোভন তাকে নিয়ে আলাদা সংসার করবে। সেফ্রেমে আমাদের কিছু বলার নেই।’

‘ছেলেটার নাম শোভন?’

‘হ্যাঁ।’

‘কি করে সে?’

‘জানি না। বিয়ে যখন করেছে তখন কীকে খাওয়ানোর দায়িত্ব তার। আমি শুধু ভাবছি দীপাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা কেন এভাবে চুরমার হবে? ওর অনেক ওপরে ওঠার কথা। অনেক। পড়াশুনায় এত ভাল মেয়ে এভাবে জীবন শেষ করবে? তুমি পড়াশুনা ভাল ছিলে না, মেনে নিয়েছি। কিন্তু—’

‘আমি দীপার সঙ্গে কথা বলব।’

‘বোলো। কিন্তু ঋগড়াঝটি করার দরকার নেই।’

‘ও কলেজে গিয়েছে?’

‘না। ঘর থেকে বের হচ্ছে না। শুধু আমি ওবাড়ি থেকে ফিরে এলে সব শোনার পর বেরিয়েছিল। তোমার মায়ের অনুমান, ফোন করতে গিয়েছিল।’

আমি উঠে দাঁড়িলাম, ‘বাবা, তুমি এ নিয়ে চিন্তা কোরো না। আমি ওর দাদা। আমি ওকে বুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই বুঝবে।’

বাবা হাসল, ‘তুমি নিশ্চয়ই সংসারী হবে। ছেলেমেয়ের বাবা হলে দেখবে কারও কথায় চিন্তা বন্ধ করা যায় না। সন্তানের জন্যে ওটা নিঃশ্বাসে মিশে থাকে।’

আমি বেরিয়ে এলাম। যে ছোকরার সঙ্গে দীপাকে কলেজ স্ট্রীটে হাঁটতে দেখা যেত সে-ই কি শোভন? ইচ্ছে করলে আমি তাকে প্রচণ্ড শাস্তি দিতে পারি। আমার পরিচিত কিছু নেতার হাতে যেসব অ্যান্টিসোস্যাল

আছে তাদের বলে দিলেই কাজটা নদে নদে হয়ে যাবে। আমি দীপার ঘরের দরজায় দাঁড়াতে দেখলাম ও বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে। চোখ তুলে আমায় দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কখন এলে?'

'অনেকক্ষণ। এসব কি শুনছি?' ঘরে ঢুকলাম আমি।

'ঠিকই শুনেছ।'

'তোমার লজ্জা করছে না দীপা! তোমার জন্যে বাবাকে ওরা এমন অপমান করেছে!'

'খুব খারাপ লাগছে দাদা। আমি ভাবতে পারিনি ভদ্রমহিলা এসব বলবেন। ভাবতে পারলে বাবাকে কখনই যেতে দিতাম না।'

'আর তুই সেই বাড়ির বউ হওয়ার জন্যে রেজেষ্ট্রি করলি?'

'আমি যাকে বিয়ে করেছি সে নিশ্চয়ই বাবাকে অপমান করেনি। আর আমি ওই বাড়িতে গিয়ে উঠছিও না।'

আমি খাটের একপাশে বসলাম, 'দীপা, তুই কেন এমন পাগলামি করছিস?'

'পাগলামি করব কেন? আমি তো ঠিকই আছি।'

'না নেই। তোমার সামনে পরীক্ষা। এসব করলে তোমার পরীক্ষার কারোটা বেজ্ঞে যাবে তা তুই জানিস না? আমি ছেলোটাকে জানি না, তুই জানিস। তাই ও ব্যাপারে কথা বলব না। কিন্তু এমন কি হল যে এত তাড়াহড়ো করে তোদের রেজিস্ট্রি করতে হল? ঠিক আছে ওটা নাহয় ইমোশনালি করে ফেলেছিস, এখনই সব ছেড়েছুড়ে সংসার করছে যেতে হবে তোকে? কয়েকটা বছর অপেক্ষা করে পড়াশুনা শেষ করার মতো ধৈর্য তোদের নেই এটা আমি কিছুতেই মানতে পারছি না।'

'যে ইমোশনের কারণে বিয়েটা করতে হল তারই জন্যে ও সংসারী হতে চাইছে।'

'বোকার মতো কথা। ও কি রোজগার করে?'

'এখনও করে না।'

'বঃ! তাহলে সংসার চালাবি কি করে?' আমি চোঁচিয়ে উঠলাম, 'শুধু হাওয়া খেয়ে কতকাল ইমোশন বাঁচিয়ে রাখতে পারবি তোরা?'

'শুধু হাওয়া খাব কেন? ওর একটা চাকরি পাওয়ার কথা হয়েছে। ওর মতো ব্রিলিয়ান্ট ছেলের চাকরির অভাব হবে না। তাছাড়া আমিও আছি, আমি কিছু করব।'

'তুই কি করবি?'

'কিছু না হোক টিউশনি করতেও তো পারি।'

'তুই নিজেকে নষ্ট করছিস দীপা।'

'এত তাড়াহাড়ি সেকথা তুমি বলতে পারো না।'

আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না, এইসময় ইন্দ্ৰাণী ঘরে ঢুকল। দীপা তাকে দেখে হাসল, 'এসো। তোমার সব কান্ড হয়ে গেছে?'

'কিছুটা। কিন্তু এসব কি করে হল?'

'হয়ে গেল।'

'আমার আন্তরিক অভিনন্দন নাও।' হাত বাড়িয়ে দিল ইন্দ্ৰাণী। দীপা সেই হাত শক্ত করে ধরে বলল, 'ধন্যবাদ।'

'তুমি একেবারে চেপে গিয়েছিলে?'

'চাপার মতো কিছু নয়। হঠাৎই হয়ে গেল।' দীপা বলল।

'বাজে কথা বলিস না।' আমি চোঁচিয়ে উঠলাম। 'সইসাবুদ করতে অনেক আগে থেকে নোটিস দিতে হয়। হঠাৎ হয় না।'

ইন্দ্ৰাণী বলল, 'হয়ে যাওয়ার পর আর এ নিয়ে কথা বলে লাভ আছে?'

আমি উঠে চলে এলাম ঘর থেকে। কিরকম অসহায় লাগছিল। আর এই প্রথম আমি বাবার অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলাম।

মায়ের কাছে বিস্তারিত জানতে পারলাম।

বাড়ির প্রতিক্রিয়া শুনে শোভন নাকি হির করেছেন আগামী পরশুর মধ্যে দীপাকে নিয়ে যাবে। জামসেদপুরে

নাকি ভার চাকরি হওয়ার কথা। গেলেই হয়ে যাবে। এখন মায়ের অভিমত, কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে ওরা যদি সুখে থাকে তাহলে থাক না।

কিন্তু বাড়ির মেয়ে স্বামীর সঙ্গে খালি হাতে চলে যাবে এটা মেনে নেওয়া মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়। অত্যন্ত কিছু ভাল এবং আটপৌরে শাড়ি-জামা, বিজ্ঞানার চাদর, ইত্যাদির সঙ্গে যৎসামান্য হলেও কিছু গয়না না দিলে নিজের কাছেই ছেঁটি হয়ে যাবে মা। অথচ সময় হাতে নেই। ওরা পরণ্ড যদি চলে যায় তাহলে তার আগেই ওসবের ব্যবস্থা করতে হবে। এত তাড়াহাড়া কেনাকাটা করার জন্যে মানসিক প্রস্তুতি ছিল না, ছিল না টাকার যোগাড়ও। তবু বাবা যা পারবে যোগাড় করে আজ বিকেল থেকে মাকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরবে বলে ঠিক ছিল। ইজ্রাণী এসে যাওয়ায় মা ওকে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবছে। কেনাকাটার ব্যাপারে বাবার ধৈর্য কম।

মান করে যাওয়াদাওয়া সেরে আমি পার্টি অফিসে যাওয়ার জন্যে বেরুলাম। হঠাৎ কথটা মাথায় এল। এখন চাকরির যা বাজার হয়েছে তাতে কোনও বিশেষ ব্যাপারে ডিগ্রি না থাকলে ঝট করে কিছু পাওয়া অসম্ভব। যা গুনলাম তাতে মনে হচ্ছে শোভনের ইংরেজি অনার্স ছাড়া কোনও ডিগ্রি নেই। ইংরেজিতে অনার্স পাওয়া হাজার হাজার ছেলে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জামসেদপুরে গেলেই শোভন চাকরি পেয়ে যাবে এই ডিগ্রির দৌলতে এটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। ও এতটা আত্মবিশ্বাসী যে দীপাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে! এটা কি করে সম্ভব? আগে নিজে গিয়ে চাকরিতে যোগ দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে তবেই লোকে বড়কে নিয়ে যায়।

হঠাৎ মনে হতে লগিল এই জামসেদপুরের ব্যাপারটা ভাঁওতা নয় তো? ছেলেটা যদি দু-নম্বরী হয়, তাহলে দীপার কপালে দুঃখ আছে। অথচ দীপাকে কথাগুলো বলা যাচ্ছে না। বললেও এখন বিশ্বাস করবে না। প্রেমের নেশা বোধহয় ড্রাগের চেয়েও কড়া। আমার খুব ইচ্ছে করছিল শোভনের সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা যাচাই করি। সেটা করতে হলে ওর ঠিকানা দরকার হয়।

‘কেমন আছ সুদীপ?’

গলা ওনে দেখলাম করুণাসিন্ধুকাকা আসছেন। হেসে বললাম, ‘চলে যাচ্ছে। আপনাকে অনেকদিন দেখিনি। কেমন আছেন?’

‘আমি তো খারাপ থাকি না। তোমার বাবা-মা?’

‘ভালই ছিলেন এতদিন।’

‘কোনও সমস্যা হয়েছে মনে হচ্ছে, কি ব্যাপার?’

করুণাসিন্ধুকাকা বাবার বন্ধু। আগে প্রায় আসতেন, ইদানীং সময় পান না। সময় না পাওয়ার কারণ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। একসময় অবিভক্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির মেম্বর ছিলেন। স্কুলে পড়াতে। পার্টির জন্যে প্রচুর আত্মত্যাগ করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মতের মিল না হওয়াতে রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যঁারা রাজনীতির ওপরতলার মানুষ তারা ওঁকে চেনেন, অনেকেরই শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু কোনভাবেই সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়াননি। দীপাকেও উনি ভালভাবে জানেন। কিন্তু দীপার এই ব্যাপারটা ওঁকে বলতে অসুবিধে হচ্ছিল। করুণাসিন্ধুকাকা হাসলেন, ‘যাকগে, তুমি তো এখন এলাকার অনেক কিছু দেখাশোনা করছ। তোমাদের সেক্রেটারিকে বলেছিলাম একটা ব্রাড ভোনেশন ক্যাম্প করার জন্যে। মনে হয় সে অন্য ব্যাপারে খুব ব্যস্ত। তুমি একটু উদ্যোগ নেবে?’

আমি হাসলাম, ‘নিশ্চয়ই। আমি আজই ওঁকে বলব। একদিন আসুন না বাড়িতে।’

‘যাব। দীপা কেমন আছে?’

‘ভালই।’ আমি ইতস্তত করলাম, ‘তবে—।’

‘মনে হচ্ছে সমস্যাটা ওকে নিয়েই।’

‘হ্যাঁ। হঠাৎ আমাদের কাউকে কিছু না বলে বিয়ে করেছে সেই করে। ছেলেটির মা ওকে মানতে চাইছে না।’

‘এখনই বিয়ে করে ফেলল মেয়েটা?’

‘কি বলব বলুন? আমি কুচবিহারে গিয়েছিলাম। এসে এই খবর পেলাম। ছেলেটি এখন কিছুই করে না। গুনলাম পরণ্ড জামসেদপুরে যাবে চাকরির জন্যে, সঙ্গে দীপাকে নিয়ে যাবে। এই ব্যাপারটাও আমার ভাল লাগছে না।’

‘না লাগারই কথা। আমি তোমার মা-বাবার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। নিজেরা যা ভালো বুঝেছে তাই করেছে। এখন কোনও উপদেশ দিলে ওদের ভালো লাগবে না। তুমি বরং এক কাজ করো। জামসেদপুরে আমার কিছু জানাশোনা মানুষ আছেন। আমাদের পার্টি যখন ভাগ হয়নি তখনকার কিছু মেসার্স এখন ওখানকার বড় বড় পি আর ও হয়ে রয়েছেন। তেমন প্রয়োজন হলে ওঁদের সাহায্য চাইতে পারি। আচ্ছা চলি।’ করুণাসিদ্ধিকাকা চলে গেলেন।

ওঁকে অনেকক্ষণ পেছন থেকে দেখলাম। এখন আমাদের দলের অনেকেই ওঁকে ঠিক ভালো মনে নেন না। না নেওয়ার কারণ উনি আর পার্টিতে নেই। খারাপ লাগলে মন খুলে বলেন। কিন্তু একথাও ঠিক, কেউ ওঁর সামনে মুখ খোলে না। এইসব মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। বাবা একটা কথা প্রায়ই বলে, মূল্যবোধ। এই শব্দটাই এখন অনেকের কাছে অপরিচিত। দেবুকাঁকু এখন এই পৃথিবীতে একা নন। আমরা অনেকেই কমবেশি তাঁর মতন হয়ে গেছি।

দীপা

আমার সন্তি কোনও উপায় ছিল না। শোভন এমন জোর করেছিল যে সই না করে পারিনি। ও বলেছিল, এখনই সই না করলে ওর ম্মা ওঁকে পাগল করে দেবেন। ও বাড়িতে বলবে, আমাকে বিয়ে করে ফেলেছে— ফলে আর বাড়ি থেকে মেয়ে খোঁজাখুঁজি হবে না। ও নিশ্চিতও থাকতে পারবে। শোভন বড়লোকের একমাত্র ছেলে। অতএব ওর ওপর চাপ আসতেই পারে ভেবে আমি শেষ পর্যন্ত সায় দিয়েছিলাম। আমি জানি এর ফলে আমি বাবা-মাকে খুব দুঃখ দেব। ভেবেছিলাম দুঃখ পেলেও মেয়ের সুখের কথা ভেবে ওঁরা শেষ পর্যন্ত মেনে নেবেন। সই করার সময় একবারও কথা হয়নি যে আমি এখনই শোভনদের বাড়িতে বউ হয়ে যাব। ভেবেছিলাম, পড়া শেষ করার পর ওসব হবে। কিন্তু আমি ভাবিনি শোভন বাড়িতে আমার কথা বলবে না। ও যে সই করেছে এটাও চেপে যাবে! আমি অনেক ভয়ে-সংকোচে মাকে ব্যাপারটা বলেছিলাম। মা হঠাৎ যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল। তারপর কান্নাকাটি, চৈচামেচি। বাবা কিন্তু মায়ের কাছে শোনার পর আমাকে একটাও কথা বলেনি। বাবার সামনে আমি এখনও দাঁড়াইনি। বাবার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

মাসির পরামর্শে বাবা সাততড়াডাড়াড়ি ও-বাড়িতে না গেলে আমি জানতেই পারতাম না শোভন ব্যাপারটা ওখানে চেপে গিয়েছে। ওর মা বাবাকে ওভাবে অপমান করতে পারেন এমন ইস্তিতও শোভন আমাকে দেয়নি। আমি রাগে অন্ধ হয়ে শোভনকে ফোন করেছিলাম। সন্তি যদি ভদ্রমহিলা শোভনকে ফোনটা না দিতেন তাহলে সেদিনই ওদের বাড়িতে হাঙ্গির হতাম। শোভন তিনদিন সময় চেয়েছিল। তিনদিন কীজনো বলছে বুঝতে পারিনি কারণ ও ফোন রেখে দিয়েছিল। পরের দিন ও শম্পাকে পাঠাল আমার কাছে। শম্পা আমার সঙ্গে পড়ে। ওর হাতে চিঠি দিয়েছিল শোভন। মায়ের সঙ্গে খুব ঝামেলা চলেছে। কিন্তু ও ঠিক করেছে আমাকে নিয়ে জামসেদপুরে যাবে। জামসেদপুরে ওর একটা চাকরি প্রায় পাকা হয়ে আছে। যাওয়ার আগে এ ব্যাপারে কথা বলতে আসবে।

ও আমাকে নিয়ে জামসেদপুরে কেন যাবে আমি বুঝতে পারছিলাম না। ও যদি সেখানে গেলে চাকরি পায় তাহলে এখন একাই যাক। চাকরি পাকা হয়ে গেলে তখন আমি যেতে পারি। তাজাভা আমার তো এখনই ওর সঙ্গে সংসার করার কথা নয়। আমার মনে হল, ওর মাকে বোঝাবার জন্যে ও এখনই আমার সঙ্গে থাকতে চায়। ব্যাপারটা ভাবতে খুব ভাল লাগছিল। এই পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না, শুধু আমরা। তবু মনে হচ্ছিল, পড়াশুনাটা শেষ করে গেলেনি ভাল হত। একটু যেন তাড়াহড়ো করে ফেলছি আমরা।

আজ সকালে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ইজ্রাণী এসে উত্তেজিত গলায় খবরটা দিয়েছিল, শোভন এসেছে বাড়িতে। একা নয়, সঙ্গে ওর বন্ধু মৃন্ময়। এই মৃন্ময়কে আমি খুব বেশি দেখিনি। সাধারণ চেহারার নিরীহ ছেলে। শোভন যা বলে তাতেই সায় দেয়। কোনও ব্যক্তিত্ব আছে বলে মনে হয়নি। ইজ্রাণী জানাল, দাদা বাড়িতে নেই, বাবা ওর সঙ্গে কথা বলছে। একটু বাদেই বাবার গলা শুনতে পেলাম, ‘ওগো শুনছ, এদিকে এসো।’

আমাকে কেউ ডাকছে না। শোভনও যদি না ডাকে তাহলে বাইরের ঘরে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিলাম না। ইজ্রাণী চলে গেছে ওখানে। শেষ পর্যন্ত কৌতূহল না সামলাতে পেরে বারান্দার দরজার

পাশে গিয়ে দাঁড়ানাম। ওদের কাউকে আমি দেখতে না পেলেও প্রত্যেকের গলা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম।

শোভন বলছিল, 'আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে, আমার পরিবার সেটা মেনে নিচ্ছে কি নিচ্ছে না তা নিয়ে আপনারা অযথা মাথা ঘামাচ্ছেন।'

বাবা বলল, 'কিন্তু তোমার মায়ের যে অ্যাটিচুড সেদিন দেখলাম—!'

'মা মায়ের মতো। আমরা তো মায়ের সঙ্গে সংসার করতে যাচ্ছি না।'

বাবা বলল, 'এরকম কথা বললে আমাদের কিছু বলার নেই। তবে শুনলাম, তুমি চাকরি করো না। আমার মনে হয়, আগে সেটলুড হও তারপর একটা সামাজিক অনুষ্ঠান করে দীপাকে তোমার নিয়ে যাওয়া উচিত। আমরা সমাজে বাস করি। আত্মীয়স্বজনদের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায় থেকে তোমরা নিশ্চয়ই আমাদের বাঁচাবে।'

শোভন হাসল শব্দ করে, 'কি উলটোপালটা বলছেন! এখন সমাজ কোথায়? আপনার বিপদ হলে কোনও আত্মীয় ছুটে আসে সাহায্য করতে? এখন যে যার সে তার। যাকগে, আমি কাল সকালে ওকে নিয়ে যাব একথা বলতে এসেছি।'

এবার মায়ের গলা শুনলাম, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'জামসেদপুরে।'

'সেখানে চাকরি হবেই?' বাবা জিজ্ঞাসা করল।

'নাহলে যাচ্ছি কেন?'

'বেশ ভে। গিয়ে চাকরি নিয়ে থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে ওকে নিয়ে যাও। বুঝতেই পারছ তাহলে আমরা নিশ্চিত হই।' বাবা বলল।

'আপনাদের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এখন দীপা আমার স্ত্রী। ওকে আমি নিশ্চয়ই বিপদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি না। তাছাড়া ওকে নিয়ে যাওয়ার অধিকার আমার আছে। আপনারা যে কোনও ছুতো তুলে আশা করি বাগড়া দেবেন না। চল মৃদয়।'

'সেকি! তুমি এভাবে উঠে যাচ্ছ, একটু মিষ্টিমুখ।' মা বলে উঠল।

'দূর! আজকাল ওসব কেউ মানে নাকি! মিষ্টি আমি পছন্দ করি না।'

কিছুক্ষণ কোনও কথা হচ্ছিল না। হঠাৎ মায়ের কান্নার আওয়াজ কানে এল। আমি নিঃশব্দে আমার ঘরে ফিরে এলাম। শোভন যে গলায় কথা বলল তা আমার ভাল লাগেনি। কিন্তু ও যা বলতে চেয়েছে তাতে কোনও ভুল ছিল না। কিন্তু বলার ধরনটাই খারাপ। আসলে এটাই ওর ধরন। সবসময় ঔদ্ধত্য ওকে ঘিরে আছে। ওর এই ব্যাপারটা আমাকে খুব আকর্ষণ করেছিল। শেফালিয়ার সম্পর্কে বলতে গিয়ে ও এমন গলায় কথা বলত যেন আর কেউ ওর চেয়ে ভাল বলতে পারবে না। শুনেছি ও নাকি ওদের অধ্যাপককেও চ্যালেঞ্জ করেছিল। ভদ্রলোক স্বীকার করেছিলেন, 'হ্যাঁ, তুমি খুঁটিয়ে পড়েছ।'

স্বভাবটা ওর এরকমই তা মা-বাবাকে কি করে বোঝাই। একবার একটি সুন্দরী বড়লোকের মেয়ে ওর কাছে এসে লবঙ্গলতিকার মতো কথা বলছিল। শোভন আচমকা তাকে বলেছিল, 'ন্যাকামো না করে যা বলতে এসেছ তাই বলে ফ্যালো।' মেয়েটি আর দাঁড়ায়নি। এখন ওকে এ ব্যাপারে বললে ও উত্তর দেবে, 'বাঃ, তোমাকে নিয়ে আসব এই কথাটা আগাম বলতে গিয়েছিলাম। যা মিথ্যে তা তো বলিনি।'

ইন্দ্রাণী ঘরে এল, 'তাহলে তুমি কাল জামসেদপুরে যাচ্ছ?'

আমি জবাব দিলাম না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ইন্দ্রাণী বলল, 'তুমি যা করছ তা ভালভাবে বুঝেই তো করছ?'

'কেন?'

'মামীমা কান্দছেন। শোভনবাবুর কথাবার্তার ধরন কারও ভাল লাগেনি।' ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি তোমার সঙ্গেও ওইভাবে কথা বলেন?'

'কেউ কি ইচ্ছে করলেই স্বভাব পালটাতে পারে?'

'তোমার ভাল লাগে?'

'ও তো অন্যায় কিছু বলে না।'

এইসময় দাদা এসে দাঁড়াল দরজায়, 'শোভন এসেছিল শুনলাম। ইন, আগে যদি জানতাম তাহলে বাড়িতেই থেকে যেতাম।'

‘কি হত তাহলে?’ ইন্ড্রাণী জিজ্ঞাসা করল।

‘ওকে বোঝাতাম।’

ইন্ড্রাণী হাসল, ‘পৃথিবীতে কিছু মানুষ জন্মায় অন্যদের বোঝানোর জন্যে, বুঝবার জন্যে নয়। যাকগে, আমাকে ওই ড্রাফটটা ভাঙাতে যেতে হবে।’

‘কেন?’

‘বাঃ, টাকাটা শোধ করতে হবে না দেবুকাবুকে!’

ওরা অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে স্বস্তি হল। যতই শোভনের পক্ষে বলি না কেন, বাবা-মায়ের সঙ্গে ওইভাবে ওর কথা বলটা আমি নিজেও মানতে পারছি না।

শোভন

এছাড়া কোনও উপায় নেই। দীপাকে আমি ভালবাসি। ও খুব সুন্দরী নয়। বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে নয় কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং রোমান্টিক। বুদ্ধিমতী মেয়েরা নাকি রোমান্টিক হতে পারে না বলে বইপত্তরে পড়তাম। অর্থাৎ রোমান্টিক মেয়েদের বুদ্ধিসূচি কম থাকে। দীপার ক্ষেত্রে এই নিয়মটা বোধহয় মেলেনি।

তাহাড়া মায়ের এই চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপারটাকে আমি মানতে পারিনি। ছেলেবেলা থেকে দেখছি মায়ের ইচ্ছে-অনিচ্ছে আমাদের বাড়িতে শেষ কথা। বাবার সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক যে ভাল নয় তা আমাদের পাড়ার সবাই জানে। মাছ বিক্রি করে একজন প্রচুর রোজগার করে ব্যাংকে রাখছেন। সেই অ্যাকাউন্ট তাঁর একার নয়, মায়ের সঙ্গে। অতএব মা প্রয়োজনীয় টাকা তুলতে পারবে। এটা বাবা কি করে মেনে নিল জানি না। বিকেলে বাড়ি ফিরে দরজা বন্ধ করে একতলার ঘরে বসে বাবা দিশি মদ খায় একথা আমি সেই বালক বয়স থেকে জানি। বাবাকে দেখাশোনা করার জন্যে মা একটি কাজের মেয়ে নিচ্ছে রাখে। সে বাবার সেবায়ত্ন করে, মাল খেয়ে আউট হয়ে গেলে বিছানায় শুইয়ে দেয়। এখন এলোকেশী ওই কাজে আছে। এলোকেশীর ওপর মায়ের খুব ভরসা। কারণ ওই মোটাসোটা কালো মেয়েশরীরে সব আছে শুধু স্নেহ নেই এই তথ্য বোধহয় মায়ের জানা হয়ে গেছে।

এলোকেশী এ বাড়িতে এসেছে বছর এগারো। আমি তখন স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র। ওর আগে পাঁচুর মা আমার দেখাশোনা করত। মা আমাকে কোনদিন সময় দিয়েছে কিনা মনে করতে পারি না। তেরো বছর বয়সে আমি একেবারে নির্বোধ ছিলাম। মায়ের কড়া শাসন, স্কুলের কঠোর নিয়ম মেনে পড়াশুনা ছাড়া আর কিছু জানতাম না। ছেলেবেলা থেকে একা একা বড় হওয়ায় স্কুলেও কারও সঙ্গে তেমন বন্ধুত্ব করতে পারিনি। পাঁচুর মা ছিল বৃদ্ধা। মান করে এলে মাথা মুছিয়ে দিত। পাঁচুর মায়ের পর এলোকেশী এলে মা তাকে বলেছিল, ‘কথা শুনতে না চাইলে আমাকে বলবি।’ এই একটি সূত্র ধরে এলোকেশী আমাকে শাসন করত। আমার চেয়ে বছর দশেকের বড় ছিল সে। ওর নাকি বিয়ে হয়েছিল কিন্তু বাচ্চা না হওয়ায় স্বামী আর নেয় না। আবার বিয়ে করেছে।

সেই তেরো বছর বয়সে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘তোমার বাচ্চা হয়নি কেন?’

‘হয়নি, ভগবান দেয়নি।’ নির্বিকার মুখে বলেছিল সে।

ঘর বাঁট দেওয়ার বা মোছার সময় ও যে ভঙ্গিতে কাছ করত তাতে আমি প্রথম মেয়েদের বুকের অনেকটা দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু তাতে কোনও তাপ-উত্তাপ ছিল না এলোকেশীর। আমি যে দেখছি তা সে উপেক্ষা করে গেল। যেন তার হাত পা মুখের মতো শরীরের ওই অংশ। কয়েকদিন পরে আমাকে বলেছিল, ‘তুমি তো এখনও ব্যাটাছেলে হওনি। ব্যাটাছেলেদের নজর খরাপ হলে ভগবান পাপ দেন।’ তারপর থেকে আমি ওর দিকে লুকিয়ে-চুরিয়ে তাকাতাম না।

তা এখন এলোকেশী বাবার সেবা করে। বাবা তাকে কি চোখে দ্যাখে আমি জানি না, কিন্তু মায়ের বিশ্বাস এলোকেশী কোনও পাপ করবে না। কিন্তু আমার বাবার এইসব ব্যাপার আমি কাউকে বলতে পারি না। বাবার পরিচয় দিতেই আমার লজ্জা লাগে।

মা থাকে তার সাজগোজ নিয়ে। সেই সাহেব বিবি গোলাম মার্কী সাজ। আর ফোন করে মাসিদের। এর নিদে ওর নিদে শোনে প্রাণভরে। দিন কেটে যায়। এখন একটি শ্বেতহস্তিনী আমার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। দীপার ফোন আসার পর খুব চটে গিয়েছিল। আমি অভিনয় করে ম্যানেজ করেছিলাম। পরদিন ভদ্রলোক এলেন। স্ স্ করে কথা বলেন, একেবারে ঘটি। বাবাজীবন বাবাজীবন গুনতে গুনতে মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। মেয়ের ছবি এনেছিলেন। মোটামোটা সাদা চামড়ার বাচ্চা হাতি ছাড়া আর কিছু মনে পড়েনি দেখে। মা ছবি দেখে বলল, 'একটু যেন মোটা।'

ভদ্রলোক বললেন, 'পরিশ্রম করতে হয় না তো। বিয়ের পর দেখবেন রোগা হয়ে যাবে।'

মা তবু খুঁতখুঁত করছিল, 'বিয়ের ভাল গায়ে পড়লে তো মোটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।'

'না না। ওসব আগের দিনে হত। এখন হয় না। তাছাড়া নিজের মেয়ে বলে বলছি না, বাড়ির বউ একটু বাস্তববৃত্তী না হলে মানায় না। কি বল বাবাজীবন?'

মায়ের মুখের চেহারা বদলাল। দেখলাম একটু একটু করে এদিকে ঝুকছেন। তখন আমি বলে ফেললাম, 'তাহলে তো আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হয়।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তুমি তোমার মাকে নিয়ে এসো। কবে আসবে?'

'মা গিয়ে কি করবে? যদি যায় আলোদি যাবে। আপনি ওকে পার্ক স্ট্রীটের একটা রেস্টুরেন্টে পাঠিয়ে দিন। আমরা দু-জনে কথা বলব।'

'সেকি? এ কি বলছ তুমি? বিয়ে-খা হল না, মেয়ে একা রেস্টুরেন্টে বসে তোমার সঙ্গে কথা বলবে? চারদিকে টিটি পড়ে যাবে।' আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক।

অতএব মা স্থির করল আমরা দিন দেখে ওদের বাড়িতে যাব।

এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে মৃন্ময়ের সাহায্য নিতে হল। মৃন্ময় আমার কথা শোনে। বাড়িতে বললাম, 'বেরুচ্ছি।'

মৃন্ময়কে নিয়ে ট্যাক্সিতে যখন দীপাদের বাড়ি পৌঁছলাম তখন সকাল আটটা। ওর বাবাই দরজা খুললেন। বললাম, 'দীপাকে ডেকে দিন। আমরা যাব।'

একটা ছেলে এগিয়ে এল সামনে, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছ?'

'আপনি কে?'

'আমি দীপার দাদা।'

'ও। জামসেদপুরের ট্রেনের বেশি দেরি নেই। ওকে আসতে বলুন।'

'জামসেদপুরে কোথায়?'

'আপনার কি ধারণা দীপাকে আমি ইলোপ করছি?'

এইসময় দীপা এল। মোটামুটি সেজেছে। পেছনে ওর মা আর ইন্দ্রাণী। সঙ্গে সুটকেস। ওর মা কাঁদছিল। বললাম, 'গিয়ে ঠিকানা পাওয়ার পর জানাব।'

হঠাৎ ওর মা বলল, 'তুমি আমার মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছ, অসুস্থ সিঁদুর পরিমে নিয়ে যাও বাবা। আমি শান্তি পাব।'

অতএব পরাতে হল। সামান্য।

একগাদা কান্নাকাটির মধ্যে আমরা সুটকেস নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম। আর শেষমুহুর্তে দীপা কঁদে ফেলল। আমি কিছু বলছিলাম না। নিজে বিয়ে করেও যাওয়ার সময় মেয়েরা কেন যে শব্দ করে কাঁদে!

অনেকটা যাওয়ার পর একটু শান্ত হয়ে দীপা বাইরে তাকাল। তারপর অবাক গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'কেন?'

'এ তো হাওড়া স্টেশনের পথ নয়।'

'বিরিচিতে যাচ্ছি। ওখানে মৃন্ময়ের বাড়ি আছে। একতলায় ভাড়াটে, ওপরটা খালি। আমরা কিছুদিন ওখানেই থাকব। কেউ কামেলা যাতে না করে তাই জামসেদপুরের গল্লটা বানিয়েছিলাম।' আমি সত্যি কথাটা বলে দিলাম।

এ ছাড়া যে আমার কোনও উপায় ছিল না সেটা যতটা সম্ভব কম কথায় বুঝিয়ে বললাম। দীপা চুপচাপ

কাঁদছিল। ভাল করে বুঝিয়ে বললেও কেউ যদি কাঁদে তাহলে আমি কি করতে পারি! আমি মৃন্ময়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

দোতলার তাল্য খুলে মৃন্ময় যখন বলল, 'এইটেতে তোরা থাকতে পারিস। বাবা প্রত্যেক মাসে একবার এসে পরিষ্কার করে যান। তোদের নিশ্চয়ই চারটে ঘর লাগবে না! তাহলে ও দুটো খুলিস না।'

'কেন? কি আছে ওখানে?'

'ডেমন কিছু নয়। বাবার জিনিসপত্র।'

'হ্যাঁ, তোর বাবা কি জট বলতে চলে আসবে নাকি?'

'না না। তোদের কথা তো বাবা জানে।'

খাট-বিছানা থেকে গুরু করে সংসার করতে যা যা লাগে সবই দেখছি এই ফ্ল্যাটে আছে। এমনকি রান্নাঘরেও জিনিসপত্র হাতের কাছে রাখা আছে।

'বাঃ! গ্যাসও আছে?' না বলে পারলাম না।

'আমি কাল এনে দিয়েছি। এখানে শুধু টেলিফোনটাই নেই।'

'কোনও দরকার নেই। ফোন থাকলেই কাউকে করতে ইচ্ছে করবে। আমি চাই না কেউ আমাকে ডিসটার্ব করুক।' বললাম।

'তোরা আজ দুপুরে নিশ্চয়ই বাইরে খাবি?'

প্রশ্নটা শুনে আমি মুখ ঘুরিয়ে দীপার দিকে তাকলাম। সে এই ঘরে ঢোকার পর থেকে একটাও কথা বলেনি। খাটের একপাশে চুপচাপ বসেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে এই ফ্ল্যাট পছন্দ হয়নি! কলকাতায় হলে কত ভাড়া নিত তুমি ভাবতেই পারবে না।'

'আমার অপছন্দ হয়েছে তুমি জানলে কি করে? বেশ ভাল ফ্ল্যাট। কিন্তু আজ আমি রাঁধতে পারব না।'

'কাল?'

'যা পারব তাই খেতে হবে। আমার রান্নার অভ্যেস নেই।' দীপা উঠে রান্নাঘরে গেল, 'বাঃ, চমৎকার!' মৃন্ময় এগিয়ে গেল, 'আপনার যা দরকার বলুন, এনে দিচ্ছি।'

'সেটা রান্না গুরু না করলে বলতে পারব না।'

'ঠিক মোড়েই একটা গুদির দোকান আছে। সব পাবেন। আর বড় রাস্তায় গেলেই একটা পাইস হোটেল পেয়ে যাবেন।' মৃন্ময় জানাল।

দীপা রান্নাঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কেউ চা খাবে?'

আমি ঝটপট বললাম, 'খুব ভাল হয়। কফি নেই?'

মৃন্ময় মাথা নিচু করল। যেন খুব অন্যায় হয়ে গেছে, 'না, নেই।'

মিলিট আটকের মধ্যে চা বানিয়ে এনে দিল দীপা। মন্দ বানায়নি। চা খেতে খেতে মৃন্ময় বলল, 'একটা কথা। এদিকের সবাই তো পার্টিশনের পরে আসা মানুষ। একটু কৌতূহলী। অনেকেই গায়ে পড়ে কথা বলতে আসবে, তোরা যেন এড়িয়ে চলিস। মেলামেশা না করাই ভাল।'

চা শেষ করে মৃন্ময় চলে গেল। দরজা বন্ধ করে দৌড়ে এসে দীপাকে জড়িয়ে ধরলাম। দীপা আপত্তি করল, 'কি হচ্ছে?'

'আমি আমার বউকে জড়িয়ে ধরছি। আদর করব।'

আমার এখন ভাল লাগছে না।'

'কেন?'

'মন ভাল নেই।'

'বাঃ আমার সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করেও মন খারাপ?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দীপা বলল, 'তুমি ওই মিথোটা বললে কেন?'

'কোন মিথো?'

'জামসেদপুরে যাচ্ছ! চাকরি পেয়েছ!'

'উঃ! বলছি তো, ওরকম চাপ না দিলে তোমার বাবা-দাদা সহজে তোমাকে ছেড়ে দিত না। তাছাড়া আমরা এখন স্বামী-স্ত্রী। আমরা কোথায় যাব, থাকব তা নিয়ে ওঁদের এত মাথাব্যথা কেন?'

‘তার মানে তোমার এখন চাকরি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই?’
‘চেষ্টাই করিনি, চেষ্টা করলেই কিছু একটা পেয়ে যাব।’ আমি জোর করেই ওর গালে চুমু খেললাম।
কিন্তু দীপার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার বাড়িতে আমাকে নিয়ে গেলে না কেন?’

‘ও দীপা, এসব তো পরেও জিজ্ঞাসা করতে পারতে।’
‘না, আমি এখনই জানতে চাই।’
‘আমি চাইনি তোমাকে ওরা অপমান করুক। আমার মা তোমাকে বাড়িতে ঢুকতে দিত না। সেটা সহ্য করতে পারতে?’

দীপা আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে মাথা নাড়ল।
‘তবে? এখানে এই ফ্ল্যাটে আমরা শান্তিতে থাকতে পারব।’
‘তোমার বাড়িতে কি বলেছ?’
‘কি ব্যাপারে?’
‘এই এখানে থাকার ব্যাপারে?’
‘কিছুই বলিনি। বললেই তো খামেলা করবে।’
‘তুমি বাড়ির বাইরে না বলে চলে এলে?’
‘না, তা কেন। বলেছি, বাইরে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে যাচ্ছি বলার দরকার মনে করিনি। তুমি আমার বাড়ির ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও দীপা। আমি জানি কিভাবে মাকে ট্যাকল করতে হয়।’
‘তোমার বাবা?’
‘আমার ব্যাপারে ওর কোনও ইন্টারেস্ট নেই।’
‘তুমি সত্যি করে বলো তো, আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা তোমার মাকে কি বলেছ? প্রীজ, মিথ্যে বলবে না।’

একটু ধন্দে পড়লাম। দীপা যেভাবে জিজ্ঞাসা করছে তাতে সত্যি কথা না বললে খুব খারাপ হবে। কিন্তু সত্যি কথাটা শুনেও ওর একটুও ভাল লাগবে না। আমি এগিয়ে গিয়ে ওকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলাম, ‘তোমার বাবা-মাকে যে কথা গর্বের সঙ্গে বলতে পেরেছি সেকথা নিজের মাকে বলব না, এ তুমি ভাবতে পারলে দীপা? উনি সব জানেন।’

দীপা

সারাটা দিন আমরা বাড়ির বাইরে বেরুলাম না। মাঝখানে শুধু একবার শোভন বেরিয়েছিল মিনিট কুড়ির জন্যে। রুটি আর মাংস কিনে এনেছিল। এরকম একটা দিনের জন্যে কত স্বপ্ন দেখেছি।

সন্দের পর বললাম, ‘আমি একটু রান্না করি।’
শোভন আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়েছিল, বলল, ‘আজ না।’
‘কেন?’
‘আজ তুমি কিছুই করবে না। শুধু আমার পাশে থাকবে।’
‘বাঃ, রাগে কিছু খেতে হবে না?’
‘সেটা তখন দেখা যাবে।’

ভাবলাম, তাই হোক। কাল সকাল থেকেই না হয় আমার সাংসারিক জীবন শুরু হবে। দু-জনেই এত পরিশ্রান্ত ছিলাম যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন ঘড়িতে রাত সাড়ে বারোটো। শোভন বাচ্চা ছেলের মতো ঘুমোচ্ছে। তখনই খেয়াল হল রাগে কিছু খাওয়া হয়নি। ঘুম ভাঙায় একটু একটু বিদে পাচ্ছে। কিন্তু এখন নিশ্চয়ই কোনও দোকান খোলা পাওয়া যাবে না। কিছু বানাতে গেলে আমাকেই রান্নাঘরে যেতে হবে। নিঃশব্দে বিছানা থেকে নেমে এক গ্লাস জল খেললাম। একটা রাত না খেলে কোনও ক্ষতি হয় না। শোভনের ঘুম ভাঙুক আমি চাই না। মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে মা জোর করে তুলে খেতে বলত। যত ভাল খাবার হোক সেসময় আমি কোনও স্বাদ পেতাম না। কোনমতে মুখ শুঁজে

শুয়ে পড়ার জন্যে ব্যস্ত হতাম। এখন যদি বাড়িতে খাবার থাকত তাহলে শোভনকে ঘুম থেকে তুললে ওরও একই অবস্থা হবে।

ঘরের আলো জ্বলছিল। সেটাকে নেভাতে জানলার বাইরে পৃথিবীটা চোখে পড়ল। আকাশে তারা জ্বলছে। আমি জানলাম গিয়ে দাঁড়লাম। আর তখনই মনে পড়ল বাবার কথা। বাবা নিশ্চয়ই ভাবছে আমি এখন জামসেদপুরে রয়েছি। এই মিথোটা শোভন যদি না বলত তাহলে কি অনুবিধে হত! মাঝে মাঝে আমি ওকে বুঝতে পারি না।

ভাগ্যিস সকালে ওর ঘুম ভাঙার আগেই আমি উঠতে পেরেছিলাম, তাই গরম চা আর বিস্কুটের প্রেটটা সামনে ধরতে পারলাম।

ও হেসে বলল, 'থ্যাক ইউ। টোস্ট নেই?'

'এখন নেই। পান্ডুরটি নিয়ে এলেই হবে।'

'আমি বাড়িতে এইসময় টোস্ট খাই।'

হেসে বললাম, 'জানা রইল। তোমার অভ্যেসগুলো আমাকে বলে দিয়ো, সব ঠিকঠাক পেয়ে যাবে। দ্যাখো, চা ঠিক হয়েছে কিনা?'

শোভন চুমুক দিল, 'ওউ।'

'তোমার খিদে পায়নি?'

'একটু একটু।'

'আমরা কাল রাতে কিছুই খাইনি।'

'ও, তাই বুঝি! অ্যাঁহসা ঘুমিয়েছি যে টের পাইনি।'

আমরা কিছুক্ষণ গল্প করলাম। মৃন্ময় যা এনে রেখেছে তা দিয়ে দিন দুয়েক রান্না চলবে। ও কি খেতে চায় জিজ্ঞাসা করেই ভয় পেলাম। আমি তো কিছুই রান্নাতে জানি না। মাংসটা পারি। আর সব তো দূর থেকে মাকে দেখে যে আন্দাজ করেছি তার ওপর নির্ভর করতে হবে।

শোভন বলল, 'আমার তো সকাল সকাল খাওয়া অভ্যেস নেই। এদিকে এগারোটা নাগাদ বেরুতে হবেই। ফিরতে বিকেল হয়ে যাবে।'

'কেন?' আমার ভাল লাগল না কথাটা।

'বাঃ, কাজকর্মের চেষ্টা করতে হবে না। পকেটে যা আছে তাতে বড়জোর দেড় মাস চলবে। তার আগেই একটা চাকরি চাই।'

'যদি না পাও?'

হাসল শোভন, 'তুমি আমাকে আন্ডার-এস্টিমেট করছ!'

'মোটাই না। কিন্তু আমি কি করব?'

'কেন? পড়বে। এখান থেকে প্রেসিডেন্সিতে যেতে একটু কষ্ট হবে কিন্তু অনেকেই যাচ্ছে। তাছাড়া ভাল চাকরি পেলে আমরা কলকাতার ভেতরে ফ্ল্যাট ভাড়া করে চলে যাব।' শোভন বলল।

বাড়িতে আটা এনে রেখেছে মৃন্ময়। তাই রুটি, আলু-পেঁয়াজের চচ্চড়ি আর ওমলেট বানালাম। কোনদিন করিনি তো, এটুকুতেই আমার হিমশিম খাওয়ার অবস্থা। তাই খেয়ে চলে গেল শোভন। যাওয়ার আগে বলে গেল সাবধানে থাকতে। সে ছাড়া অন্য কেউ এলে যেন দরজা না খুলি। নতুন জায়গা, কার কি মতলব কে জানে।

শোভন বেরিয়ে যাওয়ামাত্র মনে হল আমার পৃথিবীটা ফাঁকা হয়ে গেল। কেউ নেই। এই দুটো ঘরে আমাকে সারাদিন একা থাকতে হবে। আমি জানলাম গিয়ে দাঁড়লাম। রাস্তাটার একটা চিলতে এখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ আমার খুব কান্না পেয়ে গেল। এই কলকাতায় আমার বাবা-মা-দাদা রয়েছেন। নিশ্চয়ই ওরা আমার জন্যে খুব চিন্তা করছেন। অথচ আমি এখানে একা, ওদের জানাতেও পারছি না। বুকের ভেতর যেন বিশাল পাথর চেপে বসেছে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি শব্দ করে কেঁদে ফেললাম। কেউ ছুটে এল না, দরজায় শব্দ করল না। আমার কান্না কারও কানে পৌঁছাল না। নিঃশব্দ হলো বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলাম। চুপচাপ পড়ে রইলাম অনেকক্ষণ। কিছুটা বাদে মনে হল, আমি কেঁদে মরছি কেন? দরজায় তাল দিয়ে স্বচ্ছন্দে বাইরে বেরুতে পারি। শোভন বলে গিয়েছে বিকেলের আগে ফিরবে না। আমি পাড়ার

কোনও টেলিফোন বৃথ থেকে ফোন করতে পারি। কাকে করব? আমাদের বাড়িতে তো ফোন নেই। দেবুকাবুকে করা যায়। কিন্তু এসময় দেবুকাবু নিশ্চয়ই অফিসে। তাহলে তো ভালই, ওঁর বাড়িতে যে ফোন ধরবে তাকে বলে দেব যে আমাদের বাড়িতে গিয়ে যেন খবরটা দেয় আমি ভাল আছি।

ভাবনাটা মাথায় আনামাত্র আমি লাফিয়ে উঠলাম। শাড়ি পালটে চলে চিরুনি বুলিয়ে আমার বড় ব্যাগ থেকে কয়েনের ব্যাগটা নিয়ে দরজা খুললাম। তাল্য লাগিয়ে দ্রুত রাস্তার নেমে এসে চারপাশে লক্ষ্য করলাম পি সি ও সাইনটা চোখে পড়ে কিনা। হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা দূরে যেতেই সেটা চোখে পড়ল। এখন কোনও খবদের নেই। ছেনেটা আমাকে দেখছিল। হঠাৎ খেয়াল হল দেবুকাবুর নম্বরটা আমার মনে নেই। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'টেলিফোন ডাইরেক্টরি আছে?'

'আছে।' একসঙ্গে দুটো বই বের করে ওপরে রাখল ছেনেটা। আমি খুঁজে খুঁজে নাম বের করে নাম্বারটা দেখলাম। তারপর বুথের ভেতর ঢুকে ডায়াল করে কাঁটা হয়ে রইলাম, দেবুকাবু যেন বাড়িতে না থাকে!

'হ্যালো!' নীপার গলা।

'কে নীপা, আমি নীপা। তুমি কাউকে আমাদের বাড়িতে পাঠাতে পারবে?'

'কেন?'

'আমার মা-বাবাকে বলতে বলবে আমি ফোন করেছিলাম, ভাল আছি।'

'তুমি কোথেকে বলছ?'

আস্তে করে রিনিভার বেশে দিয়ে বোকার মতো জিজ্ঞাসা করলাম, 'কত?' বোকার মতো কারণ আমি তো জানি দুটো টাকা দিতে হবে। ছেনেটা বলল, 'দু টাকা।'

আমি কয়েন বের করছি, সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা পাড়ায় কাল এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কাল দাদা ফোন করতে এসেছিলেন, তখনই বুঝলাম।'

'দাদা মানে?' আমি অবাক।

'আপনার হাজব্যান্ড তো উনি। লম্বা, ফর্সা।'

'হ্যাঁ।' তাড়াতাড়ি কয়েনটা কাউন্টারে রেখে বেরিয়ে এলাম।

দ্রুত ফিরে এলাম ফ্ল্যাটে। এটা কি হল? শোভন কাল একবারই বেরিয়েছিল এবং সেটা খাবার আনতে। ওইসময়ে যে সে ফোন করে এসেছে তা তো বসেনি। কাকে ফোন করল? নিশ্চয়ই নিজের বাড়িতে। একথা না বলার কি আছে।

নিজের জন্যে রান্না করতে ইচ্ছে হল না। ওই রুটি আর আলু-পেঁয়াজের চচ্চড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দরজায় শব্দ হতে ঘুম ভাঙল। ঘড়ি দেখলাম। তিনটে বাজে। এত তাড়াতাড়ি শোভন ফিরে এল। ধড়মড়িয়ে দরজার কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কে?'

'আমি।' এ গলা শোভনের নয়।

'আপনি কে?'

'আরে, আমি মৃণ্ময়।'

যাচ্চলে। মৃণ্ময়ের গলা আমি চিনতে পারিনি! কিন্তু শোভন বলে গেছে ও ছাড়া আর কেউ এলে যেন দরজা না খুলি। অবশ্য মৃণ্ময়ের কথা ভেবে নিশ্চয়ই বলেনি। এটা ওদের বাড়ি, তাছাড়া মৃণ্ময় তো শোভনের খুব অনুগত। আমি দরজা খুললাম।

'কি ব্যাপার? ঘুমোচ্ছিলে তোমরা?' মৃণ্ময় হাসল।

'তোমরা মানে? এসো। তিনি তো সেই সকালে কলকাতায় গেছেন।'

'ওহো! একথা জানলে এতদূরে আসতাম না।'

'তাতে কি হয়েছে। ভেতরে এসো।'

মৃণ্ময় ঢুকলে দরজা বন্ধ করলাম। রান্নাঘরে উঁকি দিল মৃণ্ময়, 'রান্না করেছে?'

'ওই একটু-আধটু।'

'কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না। চা খাবে?'

'না। আমি এসেছিলাম শোভনকে একটা কথা বলতে।'

‘কি কথা?’

‘আমি তো বাবাকে বলিনি তোমরা থাকবে, বলেছি শোভনের এক মামাতো দাদা-বউদি বাইরে থেকে আসছে, তারা থাকবে।’

‘ও জানে?’

‘হ্যাঁ। ও থাকবে বললে বাবার মনে অনেক প্রশ্ন আসত। শোভন আমাকে ভাড়ার কথা বলেছিল কিন্তু বাবা বলেছিলেন, কদিন থাকবে, আদৌ ওখানে থাকতে পারে কিনা দেখুক, তারপর ভাড়ার কথা বলা যাবে। এখন শোভন যদি বাবার সঙ্গে দেখা করে ও-ব্যাপারে কথা বলে আসে তাহলে ভাল হয়। মনে হয় খুব সামান্য, ট্যান্স বেটুকু হয়, ভাড়া দিলে চলবে, শোভনের আত্মীয়ের কাছে বাবা বেশি ভাড়া নিতে চাইবে না।’ মৃণ্ময় হাসল।

‘ঠিক আছে, বলে দেব।’

‘সমস্যাটা কি জানো, শোভনের টেলিফোন নাম্বার আমাদের ডাইরেক্টরির পাতায় লেখা আছে। বাবা যদি ওকে ফোন করে তাহলেই বিপদ।’

‘কেন?’

‘তখনই জানতে পারবে কোনও মামাতো ভাই কলকাতায় বউ নিয়ে আসেনি। আমি যদি মামাতো ভাই না বলে বন্ধু বলতাম তাহলে এই সমস্যাটা হত না।’ মৃণ্ময় দরজার দিকে এগোল, ‘তুমি বলবে পারলে কালই যেন বাবার সঙ্গে দেখা করে। আমি যাচ্ছি।’ মৃণ্ময় দরজা খুলে ওটাকে ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ওরা যে কেন একটর পর একটা মিথ্যা বলে এসেছে তা আমার মাথায় ঢুকছিল না। কাল রাতে শোভন বাড়ির বাইরে ছিল। ওকে নিশ্চয়ই কিছু বলতে হয়েছে। কাল যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তখন স্পষ্ট করে কিছু বলেনি, কিন্তু আমার তখন মনে হয়েছিল এই বিয়ের কথাটা জানিয়ে দিয়েছে বাড়িতে। এখন মনে হচ্ছে, হয়তো জানায়নি। কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি বলে নিশ্চয়ই বেরিয়েছে। কেন এই মিথ্যাচরণ!

শোভন এল সন্দের একটু পরে। এক ভাঁড় কষা মাংস নিয়ে এল সঙ্গে। বলল, ‘এখানকার একটা দোকান দারুণ করে, তাই আনলাম।’

খুশি হলাম। এটা আনায় আজ রাতে রাঁধতে হবে না।

‘কি করলে সারাদিন?’

‘ঘুমোলাম।’ হাসলাম আমি, ‘তুমি?’

‘উঃ! প্রচণ্ড পরিশ্রম গেল। প্রচুর ঘুরতে হয়েছে।’ হাসল শোভন, ‘মনে হচ্ছে সামনের মাসে একটা সুরাহা হয়ে যাবে।’ ও আমাকে ভেঁড়িয়ে ধরতে চাইল।

বললাম, ‘এই, এখন নয়। তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও, আমি চায়ের জল বসাইছি।’

হাই তুলল শোভন। তারপর বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বলল, ‘দূর! আমার এখন চা খেতে ভাল লাগছে না।’

শোভন বাথরুমে ঢুকে গেলে আমার কায়া পেল। ও একবারও জিজ্ঞাসা করল না আমি দুপুরে কি খেয়েছি। সন্ধ্যাবেলায় চা খেয়েছি কিনা তাও ওর জানতে ইচ্ছে করল না। আর সবচেয়ে বড় কথা ওর চেহারা দেখে মনেই হচ্ছে না ও সারাদিন খুব পরিশ্রম করেছে।

আমি চা করলাম না। শোভন বেরিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বললাম, ‘মৃণ্ময় এসেছিল।’

‘কখন?’

‘দুপুরের পরে।’

‘দরজা খুলেছিল?’

‘বাঃ, তোমার বন্ধু, আর এই বাড়িটাও তো ওদের।’

‘কিছু বিশ্বাস নেই।’ শোভন বলল, ‘এসেছিল কেন?’

‘তোমাকে ওর বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে।’

‘কেন?’

‘তুমি তো মিথ্যা কথা বলে এই ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছ। মিথ্যাটা যাতে ধরা না পড়ে তাই ওঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলা উচিত।’

‘কি মিথ্যে? আমার মামাতো ভাই ফ্ল্যাট নিক আর আমি নিই, ওঁর কাছে তো একই ব্যাপার। ঠিক আছে, আমি মৃগ্ময়ের সঙ্গে কথা বলে নেব।’

‘তুমি বাড়িতে কি বলেছ? কোথায় যাচ্ছ?’

‘আমি কাউকে কিছু বলিনি। জবাবদিহি করার প্রয়োজন মনে করিনি।’

‘ওঁরা খোঁজ করবেন না?’

‘বোধহয় না। তোমার কি হয়েছে বলে তো? ফিরে আসা অবধি শুধু প্রশ্নই করে যাচ্ছ! তুমি কি কোনও ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করছ?’

‘বারে! আমি সন্দেহ করতে যাব কেন?’

‘তাহলে?’

‘আসলে এখানে যদি আমাদের থাকতেই হয় তাহলে মৃগ্ময়ের বাবার সঙ্গে দেখা করে ভাড়া-টাড়া ঠিক করে নেওয়া উচিত, তাই না?’

‘বেশ, তাই করব।’ শোভন হাসল।

ওর এই হাসিটা এত মিষ্টি যে আমার মন ভাল হয়ে গেল।

নটবর

সকালে ঘুম ভাঙার পর আমার মাথা কিছুক্ষণ ঝিম ধরে থাকে। রাত্রে আহ্নিক করার সময় কোনও কারণে বিদ্য ঘটলে এটা বেশি হয়। এলোকেশী চা নিয়ে এসে যে মুখ করে দাঁড়াল তাতে বুঝলাম প্রশ্ন করলেই অনেক কাহিনী শুনতে পাব। কিন্তু মাথাটা এমন টিপটিপ করছে যে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। সাধারণত চা খেয়ে স্নান সেরে নটা নাগাদ আমি আড়তে যাই। আড়তের কাজকর্ম তুঙ্গে ওঠে ভোর চারটে থেকে আটটা পর্যন্ত। বিশ্বস্ত কিছু কর্মচারী থাকায় আমাকে এই বয়সে রাত জাগতে হয় না।

‘কিছু বলবি?’ প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

‘খোকাবাবু কালও বাড়িতে ফেরেনি।’

‘বাবু, ভাল। তার মা-জননী কি বলছেন?’

‘খুব কাঁদছেন।’

‘আর কেঁদে কি হবে? আদর দিয়ে বাঁদর করে এখন কেঁদে লাভ কি। সে যে দু-রাত বাড়িতে নেই একথা আমাকে বলার দরকারও মনে করেনি।’

‘বলতে ভয় পাচ্ছেন মা-জননী।’

‘ভয়? আমাকে? আমি পাপোশ হয়ে পড়ে আছি একতলায়। উনি মাথার ওপর ছড়ি যোরাচ্ছেন নিত্যদিন। আমাকে ভয় পাওয়ার মানুষ নন।’ চা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ মনে হল, ছেলে কোথাও গিয়ে খুন করলে পুলিশ আমাকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করবে। কয়েক পা হেঁটে দাঁড়িয়ে গেলাম, ‘অ্যাঁই, আমার গা থেকে কোনও গন্ধ বের হচ্ছে? নাক টেনে শোঁক।’

এলোকেশী মাথা নাড়ল, না।

ওপরে উঠলাম। অনেকদিন পরে ওপরে উঠছি। বসার ঘরে গিয়ে হাঁকলাম, ‘কোথায়?’

তিনি এলেন কয়েক মিনিট পরে। চোখ ফেলা।

‘কোথায় যেতে পারে বলে মনে হয়?’

‘জানি না।’

‘কিরকম মা তুমি?’

‘ডানা গজিয়ে গেলে কেউ আর মায়ের পরোয়া করে?’

‘অ। তাহলে স্বীকার করছ তোমার ছেলের ডানা গজিয়েছে। কিছুই যখন বলে যায়নি তখন—, কোনও সন্দেহ হয়?’

‘একটা মেয়ের সঙ্গে, মানে তার বাপ এসেছিল, ও অবশ্য অস্বীকার করেছে, আমার মনে হয় না তার সঙ্গে কোথাও যেতে পারে!’

‘যা বাব্বা! তোমার ছেলের এই বয়সেই মেয়ের দরকার হল। তা সেই ভদ্রলোকের ঠিকানা কি?’

‘আমি জানি না। ওরা বামুন। আমি রাজী হইনি।’

‘সঙ্গে টাকাপয়সা কত নিয়ে গেছে সত্যি করে বলো!’

‘আমার কাছ থেকে কিছু নেয়নি। দিবা করে বলছি।’

এই সময় টেলিফোন বাজল। কি মনে হতে আমি এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললাম, ‘হ্যালো!’

‘শোভন আছে?’

‘না নেই। কে বলছেন?’

‘আমি ওর বন্ধু মৃণ্ময়ের বাবা। আপনি?’

‘আমি নটবর বলছি।’

‘ও নমস্কার। আমি মৃণ্ময়কে বলেছিলাম যেন শোভন আমার সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু আজ দুপুরে আমাকে মাদ্রাজে যেতে হচ্ছে। তাই ভাবলাম ফোনেই কথা বলে নিই।’

‘আপনি ওকে পাবেন না। ও বাড়িতে নেই।’

‘কোনথায় গেছে?’

‘সেটা জানার চেষ্টা করছি আমরা।’

‘কি মুশকিল! আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। যাহোক, ওর যে দাদা-বউদি আমার বিরাটির ফ্ল্যাটে আছে তা নিশ্চয়ই জানেন আপনি?’

‘ওর দাদা-বউদি! সেরকম কেউ আছে বলে আমি অন্তত শুনিনি।’

‘কি বলছেন নটবরবাবু? আপনার ছেলের দাদা আছে কিনা তা আপনি জানেন না? অবশ্য মামাতো দাদার কথা বলেছে!’

‘বেশ তো। আপনার বিরাটির ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা বলুন, দেখে আসি।’

‘আপনি রসিকতা করছেন। ওদের বলবেন আমি ফিরে এসে ভাড়ার ব্যাপারে কথা বলব।’ ভদ্রলোক হাসলেন। কিন্তু আমি ওর কাছ থেকে ঠিকানাটা জেনে নিলাম।

‘কি বলল?’ মা-জননী জানতে চাইলেন।

‘তোমার ছেলে তার বউকে নিয়ে বিরাটিতে বাসা বেঁধেছে।’

‘কি যা-তা বলছ?’

‘আমি ওরকমই সন্দেহ করছি।’

‘তোমার লজ্জা করছে না নিজের ছেলেকে নিয়ে এমন খারাপ কথা ভাবতে? সে আমাকে না বলে কোনও মেয়েকে নিয়ে থাকতে পারে?’

‘ও, বলে গেলে তুমি বোধহয় আপত্তি করতে না?’

আমি নিচে নেমে এলাম। নেমে দেখলাম এক শ্রীচ ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

‘কি চাই?’

‘আমি দীপার বাবা। সুধীরপ্রদ। আপনি তো শোভনের বাবা?’

‘দীপা কে?’

‘দীপা আমার মেয়ে। শোভন যাকে সই করে বিয়ে করেছে।’

‘বিয়ে করেছে?’

‘হ্যাঁ। আপনি জানেন না?’

‘না।’

‘সেকি?’ ভদ্রলোক অবাক, ‘ও প্রায় জোর করেই দীপাকে নিয়ে জামসেদপুরে চলে গেল। বলে গেল, ওখানে চাকরি পেয়েছে!’

‘জামসেদপুরে? মিথ্যে কথা।’

‘মিথ্যে কথা?’ ভদ্রলোক কাঁপতে লাগলেন, ‘তাহলে?’

‘আপনার মেয়ে একটা প্রতারকের পান্নায় পড়েছে মশাই।’

‘আপনার ছেলে প্রতারক?’

‘আলবৎ। আপনি খোঁজ নেননি?’

‘আমি এ বাড়িতে এসেছিলাম। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি কিন্তু তিনি দীপাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করতে রাজী হননি। ওরা অ্যাডাল্ট। জোর করে যখন যেতে চাইল তখন কি করে আটকাব! ওরা কোথায় আছে তা জানতে না পেরে দীপার মা খুব চিন্তিত। কাল অবশ্য একটা ফোন করেছিল দীপা আমার বন্ধুর বাড়িতে, কিন্তু লাইন কেটে দিয়েছিল।’

‘জামনেদপুর থেকে?’

‘তা বলেনি।’

আমি ঘড়ি দেখলাম। তারপর বললাম, ‘আপনার ঠিকানাটা দিন। আমি আপনাকে আজ বিকেলের মধ্যেই খবর দেব। আপনার স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলবেন। বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন আপনার মেয়ে আমার বাড়ির বউ। কি করে সে?’

‘প্রেসিডেন্সিতে পড়ে।’

‘বাঃ, ওর মতো ভাল মেয়েও এত বড় ভুল করল! যাকগে, ওকে আমি আমার বাড়িতে পূর্ণ মর্যাদায় ফিরিয়ে আনব আপনি নিশ্চিন্তে ফিরে যান।’

ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। আমার ছেলে যদি কুলাঙ্গার হয় তাহলে মেয়েটির তো কোনও দোষ নেই। যে ছেলে বাপের সঙ্গে কথা বলে না, বাপকে দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, দু-পাতা ইংরেজি পড়ে ভাবে সাপের পাঁচ পা দেখেছে সে কুলাঙ্গার ছাড়া কি? কিন্তু ওই মেয়েটিকে দুর্ভাগ্য থেকে উদ্ধার করা আমার কর্তব্য।

জনখাবার খাওয়ার কথা মনে এল না। মাথাটা আরও বেশি ধরেছে। বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় এলোকেশী দাঁত বের করে এল, ‘খবর পাওয়া গিয়েছে।’

‘কি খবর?’

‘খোকাবাবু কাল সারাদিন শোভাবাজারের মা-জননীর দিদির বাড়িতে ছিল। ওখানে থেয়েছে, ঘুমিয়েছে।’

‘তারপর?’

‘বিকেলবেলায় চলে গিয়েছে।’

‘তোমার মা-জননীকে বলবি আমি বউ নিয়ে আসতে যাচ্ছি।’

এলোকেশী ছুটল। বারান্দার বেরুতেই তিনি সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালেন, ‘কোথায় যাচ্ছ?’

‘তোমার ছেলের বউকে নিয়ে আসতে।’

‘খবরদার! এ বাড়িতে কাউকে নিয়ে আসবে না।’

‘বাঃ, বাড়ির বউ বাড়িতে আসবে, তুমি না বলার কে?’

‘না, আমি তাকে কিছুতেই ওপরে উঠতে দেব না। আমার ছেলেকে যে মেয়ে নষ্ট করেছে তার কোনও স্থান এখানে হবে না।’

আমি কথা বাড়িলাম না।

দরজায় শব্দ করলাম। ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় প্রশ্ন এল, ‘কে?’

‘আমি নটবর। দরজা খোল।’

‘আপনি কোথেকে আসছেন?’

‘আমি তোমার স্বগুরুমশাই।’

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। আমার মনে হল এমন লক্ষ্মীমন্ত মিষ্টি মেয়ে এত বড় বোকামি করল! সে আমায় প্রণাম করে মাথায় ঘোমটা দিতে যাচ্ছিল, আমি বললাম, ‘না, মাথা ঢাকার দরকার নেই। সে কোথায়?’

‘বাড়িতে নেই। আসুন।’ সে যে খুশি হয়েছে আবার ভয়ও পাচ্ছে বুঝতে পারলাম।

‘তোমার কোনও ভয় নেই। কিন্তু কাউকে না জানিয়ে এমন করলে কেন?’

ও মুখ নামাল। বললাম, ‘প্রশ্ন করেছি, জবাব দাও।’

‘ও বনল, না করে উপায় নেই। মা চাপ দিচ্ছেন।’

‘বেশ, তোমার বাবাকে মিথ্যে বললে কেন? জামনেদপুরে তো যাওনি।’

‘ও বলেছিল। তাই।’

‘হুম। তোমার স্যুটকেস কোথায়?’

‘কেন?’

‘জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। আমার সঙ্গে যাবে।’

‘কোথায়?’

‘কোথায় মানে? এটা কি তোমার বাড়ি? তোমার যেখানে জায়গা হওয়া উচিত সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব আমি। নিজের বাড়িতে চল।’

‘নিজের বাড়ি?’

‘হ্যাঁ, যেখানে আমি—আমরা থাকি।’

মেয়েটি কঁদে ফেলল।

‘কাদছ কেন?’

‘নাঃ, কিন্তু ও —!’

‘তার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। কান টানলে মাথা আসে। তুমি আমার কথার অবাধ্য হয়ো না। সে তোমাকে এখানে একলা ফেলে রেখে সারাদিন মাসির বাড়িতে গিয়ে আছে আর ঘুমোচ্ছে। ওর কথা চিন্তা না করলেও চলবে। এখানে যা আছে পড়ে থাক, তুমি তোমার নিজের জিনিস নিয়ে চল। এখনই।’

আমার আদেশ অমান্য করতে পারল না মেয়েটি। ও স্যুটকেস গুছিয়ে নিল। ওপরে উনি যদি উঠতে না দেন ক্ষতি নেই, আমি আমার পুত্রবধূকে আমার কাছে নিচের তলাতেই রাখব।

দীপা

ভদ্রলোক ট্যান্সি ডেকে এনেছিলেন। ওঁর নাম নটবর, আমার শ্বশুর। শোভনের মুখে ওই নাম শুনেছি। নিজের বাবাকে অত্যন্ত অপছন্দ করে শোভন! কিন্তু মানুষটিকে দেখে আমার খারাপ লাগল না। ওঁর কথাবার্তায় কর্তৃত্ব যেমন আছে তেমনই একটু মেহর হোয়াও পাচ্ছিলাম। প্রায় ছোর করেই আমাকে গাড়িতে বসেছিলেন। ওঁর ব্যবহারে এমন একটা মেহমিশ্রিত কর্তৃত্ব ছিল যে আমি উপেক্ষা করতে পারিনি।

অন্য কেউ হলে, আমি কিছুতেই বাড়ি তালাবন্ধ করে বের হতাম না। কিন্তু উনি শোভনের বাবা। তারপর ওই কথাটা শুনেলাম, শোভন রোজ এখান থেকে যাচ্ছে চাকরি খোঁজার জন্যে। আমি ভাবতাম, সারাদিন কত পরিশ্রম করে সন্দের পর হতাশ হয়ে ফিরে আসছে সে, অথচ ওর বাবা বললেন, শোভন শোভা তার মাসির বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাকে। মাসি তাকে খাওয়ায়। আমাকে মিথ্যা কথা বলে। আমি রেগে গিয়েছিলাম এত যে শ্বশুরের আদেশ শুনতে ভাল লেগেছিল। কিন্তু গাড়িতে উঠেই মনে হয়েছিল এই ভদ্রলোক সত্যি সত্যি শোভনের বাবা? ও? কলকাতায় এমন অনেক হয়। আমার হঠাৎ ভয় করতে লাগল।

‘বুঝলে বউমা, তোমার শাওড়ির মতো আমি লোকটা খুব খারাপ। মাছের ব্যবসা করি। মাছের আড়তে বসি সারাদিন। আমার গা থেকে তাই আঁশটে গন্ধ বের হয় এবং উনি সেটা সহ্য করতে পাবেন না। আরে ব্যবসাটা কি আমি চালু করেছিলাম? বলো?’ উনি ড্রাইভারের পাশে বসে গলা তুলে প্রশ্ন করে আমার দিকে তাকালেন।

আমি কি বলব? আমি তো কিছুই জানি না। তাই চুপ করে থাকলাম।

‘তোমার শাওড়ির বাবা অনেক খোঁজাবুজি করে আমাকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর মেয়ের স্বামী হিসেবে। আমি গরিব ছাত্র ছিলাম কিন্তু পড়াশুনায় ভাল। এই মাছের আড়ত তিনি ম্যানেজার রেখে চালাতেন। তাঁর দরকার হল এমন এক জামাই—এর যে ম্যানেজারের কাজ করবে। আমি খেটেখুটে ব্যবসাটাকে বড় করেছি, টাকা বানিয়ে দিয়েছি আর তিনি আমার শরীর থেকে আঁশটে গন্ধ পেয়ে হুকুম দিয়েছেন আমি যেন দোতলায় না উঠি! যার জন্যে চুরি করলাম সেই বলল চোর। তা ঠিক আছে, আমি কিছু কম নাকি, উঠব না! নিচের তলাটা নিজের মতন করে নিলাম। ওই মহিলার ছেলের কাছ থেকে তুমি আর কি বেশি ভাল ব্যবহার পেতে পারো? তোমাকে বিয়ে করে কোথায় নিয়ে ফেলে রেখেছে!’ নাক থেকে একটা অশ্রুত শব্দ বের হল ওঁর। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন বোঝা গেল।

শোভনদের বাড়ির সামনে গাড়িটা থামতে তিনি ভাড়া মিটিয়ে দিলেন। দরজা খুলে আমায় বললেন,

‘এসো বউমা।’ এই সময় মোটাসোটা একটা মেয়ে এগিয়ে এল দৌড়তে দৌড়তে। সিঁড়ি ভেঙে কাছে এলে বলল, ‘ওমা, এই তো সে।’

শ্বশুরমশাই গর্জন করলেন, ‘চোপ! নতুন বউ প্রথম বাড়িতে ঢুকেছে, যা শাঁখ নিয়ে আয়, শাঁখ বাজা।’
মেয়েটি কাতর গলায় বলল, ‘কি করে শাঁখ পাবো? মা জননী ওপরে ওঠার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।’
‘চুলায় যাক শাঁখ! এসো বউমা! এসো।’

আমি তাকে অনুসরণ করে একতলার ঘরে ঢুকলাম। বিশাল বাড়ি। অনেক ঘর। যে ঘরে ঢুকলাম তাতে দামী আসবাব আছে, কিন্তু সর্বত্র অবস্থার ছাপ স্পষ্ট। শ্বশুরমশাই বললেন, ‘মা, এই আমার অংশ। এখানে আমি থাকি, ওপরে তিনি। তাঁর সুপুত্র ওপরে থাকেন। তুমি একটু ওখানে বসো।’

বসলাম।

শ্বশুরমশাই হাঁকলেন, ‘এলোকেশী!’

‘বলুন।’

‘ওই ঘরটার দরজা খোল। ভাল করে ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার কর। গুণধর কোথায়? ডাক্তাকে। কোথায় গেল সেই হারামজাদা?’ গলা চড়াই উঠল তাঁর।

এরকম সংলাপ আমাদের বাড়িতে কেউ বলত না। কানে ঠং করে লাগল। আমি শ্বশুরমশাইয়ের দিকে তাকালাম। তাঁর কোনও জবাব নেই। এই সময় কাজের লোক দরজায় এসে দাঁড়াল। খাটো চেহারায় ভালমানুষী ভাব। আমাকে দেখল পিটিপিট করে।

‘এই যে মা জননীর সুখতলা, এতক্ষণে উদয় হয়েছে? যাও এলোকেশীর সঙ্গে ওই ঘর পরিষ্কার করো। এখনই। স্টার্ট!’

গুণধর ছুটল। ওই ঘরে যেন তুলকালাম হতে লাগল। আমি চূপচাপ বসে আমি। শ্বশুরমশাই মধুরস্বরে বললেন, ‘তোমার জন্যে ওই ঘরের ব্যবস্থা হচ্ছে মা। না না, একা থাকতে হবে না। এলোকেশী মাটিতে শোবে। তোমার যখন যা প্রয়োজন ওকে বললেই হবে। দোতলায় যাওয়ার কোনও দরকার নেই। আমার খাবার-দাবার এতকাল ওপর থেকে আসতো। তুমি এসে গেলে, এখন নিচেই রান্নাবান্না হবে। তুমি একটু তদারকি করো, বাস!’

এই সময় দরজায় তিনি এসে দাঁড়ালেন। আমার শাওড়িঠাকরুণ। এককালে সুন্দরী ছিলেন নিশ্চয়ই, গায়ের রং এখনও চোখ টানে। মোটাসোটা চেহারা, মুখটা বেশ বড়, এই সময়েই পাতা কেটে চুল বেঁধেছেন, পরনের শাড়িটিও দামী। বললেন, ‘এসব কি হচ্ছে?’

‘অভিষেক। আমার বউমাকে বনবাসে রেখে এসেছিল তোমার ছেলে, তাকে নিয়ে এসে ঠিক জায়গায় প্রতিষ্ঠা করছি। কোনও আপত্তি আছে?’ শ্বশুর তাকালেন।

‘আলবৎ আছে। কোথাকার কে মেয়ে, বংশের ঠিক নেই, মর্যাদা নেই, তাকে তুমি নিয়ে এলে বাড়িতে? তোমার কি ভীমরতি ধরেছে?’

‘যাকে তোমার ছেলে বিয়ে করে ভাড়া-বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে, তাকে বউ-এর মর্যাদা দিয়ে বাড়িতে আনা কি অন্যায্য?’

‘আমার ছেলে কাউকে বিয়ে করেনি।’

‘একশবার করেছে।’

‘বেশ, এই আমি স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি, এই মেয়ে যেন দোতলায় ওঠার চিন্তা না করে। খোকা এ বাড়িতে থাকলে তার সঙ্গে দেখা না করতে যায়। সেই চেষ্টা করলে আমি কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেব।’

‘বয়ে গেছে। তোমরা মা-ছেলে তোমাদের মতো থাকো, আমাদের বিরক্ত করতে এসো না।’

‘দেখব, দেখব, কতদিন ও তোমার সঙ্গে থাকতে পারে! বিড়ির গন্ধ নাকে গেলে বমি বেরুবে, যদি ভদ্রলোকের মেয়ে হয়।’ চৌট বেঁকালেন মা জননী।

‘অ! তাই!’ শ্বশুরমশাই দ্রুত মাথা নাড়লেন, ‘ঠিক আছে, আদ্র থেকে বিড়ি আর খাব না।’

‘অ্যা, খাবে না? আমি এতবার বলেছি তবু কানে জোলো নি, আর এর জন্যে ছেড়ে দেবে নেশা? হাঁ! বুঝেছি। কিন্তু দিশি মদ? সেটা না খেলে তো ঘুম আনে না!’

‘খাব না!’

‘কি? তুমি ওই বিষগুলো খাবে না?’

কথা না বলে দ্রুত মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন শ্বশুর।

‘ওমা! আমি কোথায় যাব গো! এ মেয়ে এর মধ্যেই তোমাকে কি এমন মন্ত্র করল যে তুমি বদলে গেলো?’ নাকিগলায় ঠেঁচিয়ে উঠলেন শাওড়ি।

‘চোপ!’ ধমকে উঠলেন শ্বশুর।

‘কি? বাইরের মেয়ের সামনে আমাকে চোপ বলা হচ্ছে!’ আবার গলা সপ্তমে উঠল শাওড়ির, ‘আমার বাপের বাড়িতে থেকেই আমাকেই চোখ রাঙাচ্ছ?’

‘একশবার চোখ রাঙাব। আমার বউমার নামে কুকথা বলা হলে আমি চুপ করে বসে থাকব না। তোমার বাপের বাড়ি! তোমার বাপের বাড়িতে কি আমি মাংসা বসে আছি? লাটে ওঠা ব্যবসাতাকে ফুলিয়েছে কে? এই শর্মা! রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের দাম কি পেয়েছি? এই নিচের তলায় থাকার হুকু আমার আছে। অমর এখানে এসে যে চোখ রাঙাবে তাকে হাজারবার আমি চোপ বলব।’

‘তাহলে এই তোমার শেষ কথা?’

‘হ্যাঁ।’

‘ঠিক আছে। এই যে ভালমানুষের মেয়ে, বউমা বলে যে তোমাকে এখানে এনে তুলেছে তার সামনে খালিমাথায় বসে আছ, মা শেখানি ঘোমটা দিতে?’

আমি তড়িঘড়ি আঁচনটা মাথায় তুলে দিলাম।

‘না, দেবে না। ঘোমটা দেওয়ার দরকার নেই। ও আমার মেয়ে। মেয়ে কি বাপের সামনে ঘোমটা দেয়? তুমি দিয়ে না।’

‘তলে তলে জল দেখছি অনেকদূর গড়িয়েছে! এবার পাঁচজনে কুকথা বললে তুমি কি জ্বাব দেবে আমি দেখতে চাই।’ দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন শাওড়ি।

‘দাঁড়াও। মেয়ের সঙ্গে বাবা থাকলে যদি কেউ কুকথা বলে তাহলে জানব তুমিই সেটা শুরু করবে। তাহলে আমার কোনও দায় নেই জ্বাব দেওয়ার।’ শ্বশুরের কথা শেষ হওয়ামাত্র শাওড়ি শরীর বেকিয়ে বেরিয়ে এলেন।

এই সময় এলোকেশী এসে বলল, ‘করে দিয়েছি, একদম পরিষ্কার করে দিয়েছি।’

‘বাথরুম? বাথরুমটা কে করবে?’

‘ওমা, ওই বাথরুম তো কত বছর বন্ধ হয়ে আছে! জমাদার না এলে...!’

‘নিকুটি করেছে জমাদারের! গুণধরকে বল, পরিষ্কার করে দিতে।’

এলোকেশী ছুটল। মনে হচ্ছিল আমাকে কেন্দ্র করে বাড়িতে যেন হলুতুল পড়ে গেছে। কিন্তু শাওড়ির কথাবার্তা শুনে আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। শোভনের মা বলে কিছুতেই মনে হচ্ছিল না। অবশ্য শ্বশুরমশাই-এর কথাবার্তাও শোভনের মতো নয়। অনেক পার্থক্য ওদের। শোভন যেমন মার্জিত এবং শিক্ষিত গলায় কথা বলে, ইনি তার ধার দিয়েও যান না। তবু ওঁর মন যে খুব বড় সেটা ইতিমধ্যে টের পেয়েছিলাম।

শ্বশুরমশাই আমার সামনে এসে কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গি করে বললেন, ‘আমার একতলাটা একেবারে ছনছাড়া করে রেখে দিয়েছে বউমা। এটা গোয়ালঘর নয়, মানুষ থাকে, সেটা এ বাড়ির কেউ মনে রাখে না। যাক, আমার আর কোনও চিন্তা নেই, তুমি এসে গিয়েছ। এখন থেকে তুমিই একতলাটা দেখাশোনা করবে। তবে হ্যাঁ, ভুলেও সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় যাবে না। তাহলে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে। বুঝেছ?’

আমি নীরবে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম। গুণধর ঘরে এল, ‘হয়ে গেছে।’

‘জল আছে কিনা দেখেছিস?’

‘ফোয়ারা ঝরছে কল থেকে।’

‘এলোকেশী কোথায়?’

‘বিছানা ঠিক করছে।’

‘যাও বউমা, ওই ঘরে যাও। এখন থেকে এলোকেশী ছাড়া আর কেউ ওই ঘরে ঢুকবে না। গুণধর, তুই একবার আড়তে যা। গিয়ে বল, আমি বিকেলবেলায় সেখানে যাব।’ হুকুম পাওয়ামাত্র গুণধর ছুটল।

আমি ওই ঘরে গেলাম।

এলোকেশী আমাকে দেখে হাসল, 'এসো গো বউদিমনি। বসো। মা জননীর বাকি শুনে নিশ্চয়ই খুব খাবড়ে গিয়েছ। উনি ওই রকম। কান দিয়ে না।'

আমি খাটে বসে ঘরটিকে দেখলাম। ভালই। আমি বাপের বাড়িতে যে ঘরে থাকতাম তার থেকে অনেক বড়। তিনটে দরজা। একটা দিয়ে আমি ঢুকলাম, দ্বিতীয়টি বোধহয় বাথরুমের কিন্তু তৃতীয়টি বন্ধ থাকায় বুঝতে পারলাম না ওটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়।

এলোকেশী গলা নামাল, 'মা জননীর তো দাদাবাবু-অন্ত প্রাণ। তুমি বাইরে থেকে এসে জুড়ে বসলে তিনি সইবেন কেন?'

'উনি বুঝি ছেলের বিয়ে দিতেন না?'

'দিতেন, অনেক যাচাই করে হাবাবোবা মেয়েকে নিয়ে আসতেন যার বাবা অনেক দেবে খুবে। যে মেয়ে তাঁর ইশারায় উঠবে, বসবে, পেটে বিদ্যে থাকলে কোন মেয়ে তা শুনবে?'

'সেরকম কোনও মেয়ে পাননি?' আমার কৌতূহল হচ্ছিল।

'পেয়েছিলেন। তই তো এত রাগ। একেবারে ওঁর অর্ডার মতো মেয়ে।'

এই সময় শ্বশুরমশাই-এর গলা পাওয়া গেল, 'এলোকেশী! তুই তোর কথা থামাবি? বউমাকে এখন একটু বিশ্রাম করতে দে। ওঁর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে, খাবার-দাবারের ব্যবস্থা কর।'

এলোকেশী ভিত কাটল। তারপর থপথপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমার কি এখন খুশি হওয়া উচিত? শ্বশুরমশাই এত যত্নে আমাকে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছেন, এ বাড়ির বউ হিসেবে এর চেয়ে বেশি সম্মানের আর কি হতে পারে? কিন্তু আমার মনে সন্দেহ ছিল না। শোভন ফিরে গিয়ে দরজায় তাল দেবে নিশ্চয়ই অবাধ হবে। ওর কাছে ডুব্লিকেট চাবি আছে। বাড়িতে ঢুকে কি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে? তারপর ভাববে আমি ওকে ছেড়ে চলে গেছি? তখন কোথায় খোঁজ করবে? আমার বাপের বাড়িতে নিশ্চয়ই নয়। ওদের বলা হয়েছে জামসেদপুরে যাচ্ছি। টার্মিন্ডে ওঠার সময় অনেকেই দেখেছে আমাদের। তাদের কাছে বর্ণনা পেয়ে হয়তো বুঝতে পারবে কার সঙ্গে চলে এসেছি। তাহলে সে নিশ্চয়ই এই বাড়িতে হাজির হবে। হয়ে যদি আমাকে বলে ওর সঙ্গে চলে যেতে, তাহলে আমি কি বলব? আমি কি চলে যাব? শোভন না থাকলে তো এদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ভৈরী হত না। আমাকে মিথ্যে বলে মাসির বাড়িতে দিন কাটানো নিশ্চয়ই অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু শুধু সেজন্যেই ও এখানে এসে ডাকলে কি না বলা যায়?

শোভনের কথা

দরজায় তাল দেবে ডেবেছিলাম দীপা হয়তো কাছেপিঠে গিয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ঘড়িতে যখন আটটা বেজে গেল তখন চিন্তায় পড়লাম। আবিষ্কার করলাম ওর শাড়ি জামাগুলো নেই। তার মানে দীপা আমাকে না জানিয়ে চলে গিয়েছে! অথচ আজ বেরুবার সময় ওর সঙ্গে কোনও বগড়াখাটি হয়নি। ভাল মুডেই ছিল ও। তাহলে? মৃন্ময় কি আবার এসেছিল? মৃন্ময় যদি ওকে জানিয়ে দেয় যে আমি চাকরি না খুঁজে মাসির বাড়িতে গিয়ে রোজ আরাম করি, তাহলে ওর রোগে যাওয়া স্বাভাবিক।

কি করব বুঝতে না পেরে বাড়ি থেকে বের হলাম। দরজায় তাল দিচ্ছি এই সময় মনে হল যদি দীপা স্বেচ্ছায় কোথাও চলে যায়, আমাকে জানানোর প্রয়োজন মনে না করে, তাহলে আমি কেন চিন্তা করব? ওর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেওয়ার কোনও দরকার নেই। বরং মৃন্ময়ের কাছে জানতে চাওয়া যেতে পারে যে সে আমাদের এখানে এসেছিল কি না।

মৃন্ময়ের বাড়িতে গিয়ে দুঃসংবাদটা পেলাম। ও আজ আমাদের ওখানে যায়নি কিন্তু ওর বাবা আমাদের বাড়িতে ফোন করেছিল। শ্রীযুক্ত নটবরের সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছে। আমার কোনও ক্রটি দেখতে গেলে নটবরবাবু খুব খুশি হন এবং খোঁচাবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে তিনি কিছু করেছেন কিনা বুঝতে পারছিলাম না। আমি বাড়ি এলাম।

গুণধর বসেছিল বারান্দায়। আমাকে দেখেই ছুটে এল, 'এয়েছে!' একগাল হাসল সে।

‘কে এসেছে?’

‘নতুন বউন্মিণি। আঃ, মা জননীর সঙ্গে বড়বাবুর কি যুদ্ধ হয়ে গেল!’

‘কি বলছিস তুই?’

‘হ্যাঁ, দাদাবাবু! নড়বাবু গাড়ি করে তাঁকে নিয়ে এসেছেন। একতলার ঘর পরিষ্কার করে সেখানে রেখেছেন। মা জননী পঞ্চাশ কথা শুনিয়ে গিয়েছেন তাঁকে। বলেছেন, বউন্মিণি যেন কখনও ওপরে না ওঠেন। আজ নিচেই রান্নাবান্না হয়েছে।’

‘কে করল?’

‘এলোকেনী। তার তো খুব মজা।’

‘হম!’

আমি কথা না বাড়িয়ে দ্রুত ওপরে চলে এলাম। এবং সঙ্গে সঙ্গে মাতৃদেবীর সামনে পড়ে গেলাম। ‘অ্যাঁ দাঁড়া!’

আমি দাঁড়ালাম, ‘তুমি আগে আমার কথা শোন, তারপর...।’

‘আমি কোনও কথা শুনব না। তুই এত বড় মিথ্যাবাদী! ছি ছি ছি! তোকে আমি বুকে ধরে বড় করলাম আর তুই আমার কাছেই মিথ্যে বললি? আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে।’

‘মা, তুমি আমাকে ভুল বুঝছ।’

‘ভুল বুঝছি? তুই ওই মেয়েমানুষটাকে বিয়ে করিসনি?’

‘হ্যাঁ, ওটা হঠাৎ হয়ে গিয়েছে।’

‘হঠাৎ হয়ে গিয়েছে! কি করে বিয়ে করেছিস? কালীঘাটে না সই করে?’

‘সই করে।’

‘তাহলে সেটা হঠাৎ হয়?’ মা জননী খেপে গেলেন, ‘আমাকে তুই শেখাতে এসেছিস? ওসব করতে হলে আগে থেকে ব্যবস্থা করতে হয় না?’

‘নাগো, টাকা দিলে সব হয়ে যায়।’

‘আমাকে বর্ণোছলি কোথায় কোন্ কাজে যাচ্ছিস, অথচ তুই তখন ওই মেয়েছেলেটার সঙ্গে ফুর্তি করছিস বাড়ি ভাড়া নিয়ে! ম্যাগো!’

‘মোট্টেই ফুর্তি করিনি। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর ও কিছুতেই বাপের বাড়িতে থাকতে চাইছিল না। এদিকে এখানেও আনা যাবে না। তখন বাধ্য হয়ে—।’

‘তা সেখানেই থাকলে পারতিস। ইস্! তোর মাসির কাছে শুনলাম রোজ ও বাড়িতে গিয়ে খেতিস আর ঘুমোতিস! আমি জানতেই পারিনি!’

‘মা, খুব অন্যায় হয়ে গিয়েছে।’

‘এখন তোর বাপ মেয়েমানুষটাকে এনে তুলেছে নিজের কাছে। একতলার ঘর পরিষ্কার করে তাকে এ বাড়ির বউ করা হয়েছে।’

‘নেশার ঘোরে করেছে হয়তো!’

‘নেশা? সেই লোকটা নেশা করা ছেড়ে দিয়েছে ওই মেয়েমানুষটার জন্যে!’

‘সেকি?’ চমকে উঠলাম আমি।

‘আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে গো? যে মানুষটাকে হাজারবার বলেও আমি নেশা ছাড়াতে পারিনি, সে বাইরের মেয়ের কথায় ছেড়ে দিল? নিশ্চয়ই তুচ্ছতাক জানে। তোকে তো তুচ্ছ করেছেই, তোর বাবাকেও করেছে।’ মা জননী চোখ বন্ধ করল।

ব্যাপারটা আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সন্ধ্যার পর মানুষটাকে মদ এবং বিড়ি ছাড়া কখনও থাকতে কেউ দেখিনি। মদ মানে একেবারে দিশি মদ। কথাবার্তায় সেই ধারা, একেবারে গ্রাম্য গন্ধ। দীপার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর হঠাৎ ভোল পালটাল কি করে?

বললাম, ‘মা, এখন আমি কি করব?’

‘যা ইচ্ছে তাই করো। যখন ওই মেয়েমানুষটার সঙ্গে গিয়েছিলে তখন কি জিজ্ঞাসা করেছ?’

‘হঠাৎ হয়ে গেছে, আমি তো তোমাকে বলছি।’

মা জননী আমার দিকে তাকান, ‘আমি তোকে বিশ্বাস করি না।’

'শেষবার করো। লাস্ট টাইম। তারপর আর তোমাকে কিছু বলব না।'

'বেশ। এ বাড়িতে থাকতে হলে, আমার ছেলে হয়ে থাকতে হলে তোমাকে একতলার ঘরে যেন কখনও না দেখি।' গভীর মুখে বলল মা জননী।

'আমি তোমাকে কথা দিছি একতলার ঘরে যাব না।'

'ওই মেয়েছেলেটার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না।'

'আশ্চর্য! একতলার ঘরে না গেলে সম্পর্ক হবে কি করে?'

'আমি তোমার বিয়ে যেখানে ঠিক করেছিলাম সেখানেই বিয়ে দেব।'

'এখানেই হবে মুশকিল।'

'মুশকিল মানে?'

'আমাকে জেলে যেতে হতে পারে। তোমাকেও।'

'একি সর্বনেশে কথা! জেলে কেন যাবি?'

'ওধু আমি নই, বললাম তো, তোমাকেও যেতে হবে। এখনকার আইনে বিয়ের পর ডিভোর্স না হওয়া অবধি কেউ আর বিয়ে করতে পারে না। করলে জেল হয়।'

'হায় ভগবান! তাহলে কি হবে?' স্থায়ী হাত দিল মা জননী।

'আমি দেখছি। তুমি কোনও চিন্তা করো না। একটা উপায় খুঁজে বের করবই।'

আমি চলে এলাম আমার ঘরে। সত্যি বলতে কি, এই ঘরে পা দিয়েই মনে হল নিজের জায়গায় ফিরে এলাম। ভামাকাপড় পাল্টে চিৎকার করলাম, 'এলোকেশী?'

তিনবার ডাকবার পর গুণধর ছুটে এল, 'ডাকছেন বাবু?'

'তোমার নাম এলোকেশী?'

'তাকে তো আর পাবেন না! তার এখন তেল হয়েছে!'

'ডেল হয়েছে মানে?'

'সে এখন আলাদা হয়ে গেছে। বড়বাবু বলেছেন, নতুন বউদিমনি ছাড়া আর কারও কাজ করবে না সে। তাতে তার দেমাক বেড়ে গেছে। দোতলায় আর উঠছে না। আমি একটা কথা বলতে গিয়েছিলাম, মুখঝামটা দিল, 'তুমি কথা বোলো না, তুমি ওপরতলার লোক। বুঝুন দাদাবাবু?'

নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করলাম, 'সে কি করছে?'

'কে দাদাবাবু?'

'ওই যে, যার কথা বললি, নতুন বউদিমনি!'

'আমি তো আর ভেতরে ঢুকতে পারছি না যে দেখতে পাব। ওই ও পাশের ঘরটা পরিদ্রাৱ করে দিয়েছি, ওখানেই তিনি থাকবেন।'

'কোন্ ঘরটা?'

'ওই যে, বারান্দার কোণের ঘরটা!'

'যা এখান থেকে।'

মনটা ক্রমশ তেতো হয়ে গেল। একই বাড়িতে আছি তবু আমরা দুজন দুটো তলাতে। কিন্তু মা জননীকে ত্যাগিয়ে কিছু করা যাবে না। দীপা নিশ্চয়ই জেনে গেছে সে বাড়িতে ফিরে এসেছে। নটবর ওকে একতলায় নিয়ে এসেছে যখন দোতলায় ভোলার ব্যবস্থা করতেই হবে।

'খোকা!' দরজায় মা জননী।

'হ্যাঁ, মা।' আমি উঠে দাঁড়লাম।

'তুই আবার আমাকে মিথ্যে বলছিন?'

'কখন বললাম?'

'একটু আগে বললি ডিভোর্স না হলে বিয়ে করলে জেলে যেতে হয়।'

'এক বিন্দু মিথ্যে নয় মা।'

'তাহলে ধর্মেন্দ্র জেলে যায়নি কেন?'

'কে ধর্মেন্দ্র?'

'ওঃ! সিনেমা করে। সিনেমা লাইনের লোকজনদের জন্যে কি আলাদা আইন?'

আমি হকচকিয়ে গেলাম। মা যে এসব খরব রাখে তা কে জানতো? নিশ্চয়ই মাসিদের কারও সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছে, দেখান থেকেই জেনেছে।

বললাম, 'হয়তো ওঁর স্ত্রী আপত্তি করেনি তাই আইন কিছু বলেনি।'

'আবার মিথ্যে বলছিস?'

'না মা! স্ত্রীর যদি দম্ভাতি থাকে, স্ত্রী যদি পুলিশের কাছে না যায় তাহলে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে কি সেটা হবে?'

'তাহলে?'

'আমি তো বললাম, পথ একটা বের করবই। তুমি আমাকে ভাবতে দাও।'

মা জননী মুখ ব্যাজার করে চলে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কিছুতে ঘুম আসছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল দীপা নিচের ঘরে শুয়ে আছে। গুণধর যা বলল তাকে ওর ঘরে যাওয়া যেতে পারে। কোণের ঘরটার একটা দরজা আছে বারান্দার দিকে।

রাত আর একটু বাড়লে বুঝতে পারলাম এই বাড়ির কেউ জেগে নেই। নিঃশব্দে দরজা খুলে বের হলাম। চারদার অন্ধকার। পা টিপে টিপে নিচে নামলাম। একতলার কোথাও আলো নেই। বারান্দা পেরিয়ে শেষ ঘরটার দরজার সামনে পৌঁছে নিঃশ্বাস নিলাম। একটু বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। মা জননী টের পেলে আর কোনদিন বিশ্বাস করবে না। কিন্তু মন মানল না। দরজায় মৃদু শব্দ করলাম। শব্দটাকে যেন নিজেই ঠিক শুনতে পেরিলাম না। ফলে আর একটু জোরে আওয়াজটা করতে হল। কেউ সাড়া দিল না। দীপার ঘুমটা ঠিক কেমন তা আমি এখনও বুঝতে পারিনি। এবার আওয়াজটা বেশ জোরে হয়ে যেতে আমি চমকে ওপর দিকে তাকালাম। না, ওপরে আলো জ্বলেনি, কিন্তু শব্দ হচ্ছে। ছিটকিনি খুলছে দীপা। আমি উদ্বেজিত হলাম। যেই দরজাটা খুলে গেল অমনি দু-হাতে ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফটানো চিৎকার উঠল, 'ওরে মারে। কে রে। ওরে মারে?'

দীপার গলা পেলাম, 'কি হয়েছে? কি হয়েছে?'

ভুলটা বুঝতে পেরে দু-হাত দিয়ে ঠেলে দিলাম এলোকেশীকে। সে টলতে টলতে ভেতরে পড়ে যেতেই আমি ছুটলাম। সোজা ওপরে উঠে নিজের ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। নিচে তখন তুমুল চিৎকার চলছে, 'চোর, চোর। চোর এসেছে।' চিৎকারটা এলোকেশীর।

বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছিল। চোর চোর চিৎকার শুনে সেটা কমল। এলোকেশী তাহলে আমাকে চিনতে পারেনি? কিন্তু ও দরজা খোলার আগে কোনও প্রশ্ন করেনি কেন? এলোকেশী কি অন্য কাউকে আশা করেছিল? চিন্তাটা মাথা থেকে সরে গেল পিড়মোবের চিৎকারে, 'কি হয়েছে? কি হয়েছে? এই এলোকেশী।'

'বড়বাবু, চোর এসেছিল।'

'চোর? এ বাড়িতে চোর? কি করে বুঝলি?'

'আম্মে, দরজায় শব্দ করছিল। আমি দরজা খুলতেই ঠেলে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। ওরে বাবারে, আমি কোথায় যাব? এলোকেশী চিৎকার করল।

'আই চোপ! দরজায় শব্দ করলে তুই কেন খুলতে গেলি?'

'ঘুমের ঘোরে বুঝতে পারিনি।'

'ঘুমের ঘোরে? তোকে আমি বলেছি বউমার যেন ক্ষতি না হয় তাই 'দেখবি।' উনি চোরকে দরজা খুলে নেমস্তম্ব খাওয়াচ্ছেন! পিড়মোব চিৎকার করলেন, 'যে তোকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তার চেহারা কি রকম?'

'অন্ধকারে দেখতে পাইনি।' এলোকেশীর জবাব।

'এই চোর বাইরে থেকে আসেনি। আমি বিশ্বাস করি না। গুণধর, গুণধর কোথায়?'

'গুণধর নয় বড়বাবু।' বলে উঠল এলোকেশী।

'সে যে নয় তুই বুঝলি কি করে?'

'গুণধরের চেয়ে অনেক লম্বা। আর গুণধরের গায়ে অত জোর নেই।'

গুণধরের গলা শুনতে পেলাম, 'কি বড়বাবু?'

‘তুই নিচে নেমেছিনি?’

‘না বড়বাবু। আমি তো এতক্ষণ ঘুমোচ্ছিলাম।’

‘ওপরে সবাই যে যার বিছানায় আছে?’

‘মা জননী তো দরজা বন্ধ করে শোন, দেখব কি করে?’

‘আঃ, মা জননীর কথা জিজ্ঞেস করছে কে? সেই হতভাগা কোথায়?’

খুব রাগ হয়ে গেল। ঝি-চাকরের কাছে আমাকে হতভাগা বলা হচ্ছে! ইচ্ছে করছিল নিচে নেমে প্রতিবাদ করি। মা জননী কোথায়?

‘ঠিক আছে! শোন এলোকেশী। আজ থেকে ওই ঘরের এদিকের দরজাটা যেন কখনই খোলা না হয়। কাল সকালে আমি লোক ডাকিয়ে সিল করে দেব। যতসব হ্যাঁচড়ামি। কার শিক্ষা দেখতে হবে তো!’

নিচের দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হল। শেষ কথাটাও তো মা জননীর কানে গেল না। গেলে সারারাত ধরে যুদ্ধ চলতো। এই দুজনের যুদ্ধ হলে এখন আর আমার কোনও লাভ হবে না। আজ যে ধরা পড়িনি সেটা আমার কপাল। কিন্তু দীপাকে যে করেই হোক ওপরে নিয়ে আসতে হবে।

মা জননীর কথা

ও কি সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। ছেলেটাকে যে কি ক’রে আবার আগের জায়গায় নিয়ে যাই! রাত্রে ঘুমের ওষুধ না খেলে ঘুম আসে না। সকালে ঘুম ভাঙামাত্র গুণধর ব্যাপারটা জানাল। উনি যে একাই লাঠি ঘুরিয়েছেন তা শুধু আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়েছিলাম বলে।

খোকার ঘরে গেলাম। সে ঘুমোচ্ছে। নিচে চোর এসেছিল কিন্তু সে নাকি ঘরেই শুয়েছিল। এই সময় আবার গুণধর বলল, ‘বড়বাবু জানতে চাইছিলেন দাদাবাবু ঘরে আছে কিনা।’ মাথা গরম হয়ে গেল। তখনই ছুটে যেতাম কিন্তু নেহাত এখন তাঁর আড়তে যাওয়ার সময়। এখন ঝামেলা হলে সারাদিনের কাজকর্মে ব্যাঘাত হবে, তাই গেলাম না। আমি খোকােকে ডেকে তুললাম, ‘কাল বাড়িতে চোর এসেছিল?’

‘কই? কখন?’ খোকা অবাক হয়ে গেল।

‘মাঝরাত্তিরে কেউ ভাল করে দ্যাখেনি আর উনি চৌকিয়ে পাড়া মাথায় করেছিলেন।’

‘ওঁর তো ওই স্বভাব।’ খোকা আবার গুয়ে পড়ল।

ওর মুখ দেখে মনে হল আমার মতোই অবস্থা। ঘটনাটা টেরই পায়নি।

চা খেতে খেতে খোকােকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কি করবি, ভাবলি?’

‘হ্যাঁ, ভেবেছি।’

‘কি ভাবলি?’

‘দীপাকে বোঝাতে হবে।’

‘তার মানে?’ চৌকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

‘এই তো তোমার দোষ। না শুনেই রেগে যাও।’ খোকা বলল, ‘তোমার কথামতো বিশ্লেষণ করতে কি সহজে অনুমতি দেবে? তার চেয়ে ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যদি ডিভোর্সে রাজী করানো যায় তাহলেই সব সমস্যার সমাধান।’

‘ডিভোর্সে রাজী করাব আর এমনিতে রাজী হবে না?’

‘ধরো হল। এখন হল, এক বছর বাসে মন বদলে গেল, তখন?’

‘হঁ! কিভাবে ডিভোর্সে রাজী করাবি?’

‘দ্যাখো মা, ওরও তো এরকম ব্যাপার ভাল লাগছে না, তবে নিশ্চয়ই এখন আমার ওপর রেগে আছে। তাই বলি কি, ওকে ওপরে নিয়ে এসো।’

‘সর্বনাশ! তুই বলছিস কি খোকা?’

‘ঠিক বলছি। ওকে ওপরে নিয়ে এলে দু-দিনেই এখান থেকে পালাতে চাইবে। নিচে তোমার স্বামীর আদরযত্নে আছে, ভালই থাকবে যতদিন থাকতে চায়।’

‘এখানে নিয়ে এলে পালাতে চাইবে কেন?’

‘বাঃ, এ বাড়ির কোনও নিয়মই তো জানে না! পান থেকে চুন খসলেই তুমি ওকে শিক্ষা দেবে। সেটা শেখাও ওর পক্ষে অসম্ভব হবে।’

‘ওপরে নিয়ে এলে ও কি তোর ঘরে থাকবে?’

‘নোটো তুমি যা বলবে তাই হবে।’

‘আমি চাই না তোরা একসঙ্গে থাকিস।’

‘বেশ।’

‘তোর অন্য কোনও মন্তব্য নেই তো?’

‘মা, তুমি আমাকে সন্দেহ করছ?’

‘না করে উপায় কি? তুমি যা কাজ করেছ তাতে সন্দেহ ছাড়া এখন অন্য কিছু মনে আসে না। এখন কি করে খবরটা পাঠাই?’

‘কেন গুণধরকে বলো, এলোকেশীকে ডেকে দেবে।’

‘এলোকেশী কি করবে? সে যদি রাবী না হয়?’

‘আমার বউ কি তাঁর প্রপাতি যে তিন্দি যা বলবেন তাই হবে!’

‘আঃ, আমার সামনে বউ-বউ করিসনি খোকা।’

হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তা এল। সুধীরপ্রদত্তবাবুকে খবর পাঠালে কিরকম হয়? তিনি এলে ওই অজুহাতে মেয়েটাকে ওপরে ডেকে আনা যায়। নিজের মনে মাথা নাড়লাম। মানুষটাকে আমি জানি। সুধীরপ্রদত্তবাবুকে বলবে নিচে যেতে। তারপর ওঁর কাছে আমার নামে রাজ্যের কুকথা বলবেন।

তার চেয়ে আমার বোনদের নাম করে ডাকলে কি হয়! তিনি তাঁর শ্যালিকাদের পছন্দ করেন না। অতএব নিচে ডাকবেন না। মাস-শাওড়িরা আশীর্বাদ করতে আসছে, করলে সামাজিক স্বীকৃতি পাবে। এটা বোধহয় তিনি নস্যাৎ করতে পারবেন না।

চা খাওয়ার পর গুণধরকে দিয়ে খবর পাঠালাম। আড়তে যাওয়ার আগে কথা বলতে চাই। আমাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

ডাক এল। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওঁর চেহারা দেখে মনে হল একরাতেই বেশ শুকিয়েছেন। বললেন, ‘সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই আমার।’

‘আমার বয়ে গেছে তোমার সময় নষ্ট করতে। তোমার শালীরা আসবে।’

‘কেন? তাদের এখানে কি দরকার?’

‘তোমার ছেলের বউ-এর মুখ দেখতে চায় তারা।’

‘হঠাৎ এত সুবুদ্ধি! এ যে দেখছি, মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি।’

‘চিরকালই তাই। তা এখন কি বলব?’

বুঝলাম খুব চিন্তায় পড়েছেন। মুখ তুলে বললেন, ‘তুমিই তাহলে ওকে বউ বলে স্বীকার করছ? ভাবতে বেশ অবাক লাগছে!’

‘কি আর করা যাবে! দশচক্র ভগবানকেও ভূত হতে হয়।’

‘ভগবান! হাঁ!’ তিনি নাক দিয়ে একটা শব্দ বের করলেন, ‘কখন আসবে?’

‘দুপুরবেলা।’

‘ওটা কি কারও বাড়িতে আসার সময় হল?’

‘বোনের বাড়িতে কেউ পাঁজি দেখে আসে বলে শুনি।’

‘এতকাল তো তাদের দেখা পাইনি। ঠিক আছে, নিচে আসার দরকার নেই। তারা এলে এলোকেশীকে বোলো বউমাকে ডেকে নিতে। এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে যা কিছু দেখাদেখি করে নেবে।’

‘ওমা একি কথা! বারান্দায় দাঁড়িয়ে? ছি ছি ছি!’

‘অসম্ভব। আমি চাই না ওরা ভেতরে ঢুকুক। আর তুমি তো বউমাকে ওপরে উঠতে দেবে না বলেই দিয়েছ। অন্য কোনও উপায় নেই।’

‘বাইরের লোক তো নয়, নিজের আত্মীয়। তাদের সামনে তো আমি আমার মানসম্মান খোয়াতে পারি না। আসুক ওপরে।’

‘আচ্ছা!’ মাথা নাড়লেন, তিনি, ‘কিন্তু পাঁচ মিনিট, তার বেশি নয়। এলোকেশী!’

এলোকেশী ছুটে এল।

‘উনি খবর দিলে ঠিক পাঁচ মিনিটের জন্য ওপরে নিয়ে যাবি বউমাকে।’

‘আন্তে!’ মাথা দোলান এলোকেশী।

তিনি বেরিয়ে গেলেন আড়তে।

দুপুরবেলায় মৃন্ময় ডাকতে এল খোকারে। তার সঙ্গে একটু বচসা হল খোকার। তারপর সে মৃন্ময়ের সঙ্গে কোথাও চলে গেল। আমি দেখলাম এই সুযোগ। গুণধরকে দিয়ে খবর পাঠালাম। মিনিট কুড়ি পরে দেখলাম এলোকেশী তাকে নিয়ে ওপরে উঠছে। কাছে এসে এলোকেশী বলল, ‘এখনও তো কেউ আসেনি—’

‘তাতে তোর কি? ভীষণ মুখ বেড়েছে, না?’

‘বড়বাবু বলে গেছে যেন বউদিমণি পাঁচ মিনিটের বেশি না থাকে।’

‘কৈফিয়ৎ দেওয়ার হলে আমিই দেব। তুই এখন যা।’

এলোকেশী ভয়ে ভয়ে মেয়েটাকে দেখল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঘোমটাটা খোঁপার ওপর। আজকালকার চেহারা। শরীরে কোনও স্নায়বিক অবস্থা নেই, কাঠি কাঠি করে রেখেছে শরীরটাকে, টি.ভি.তে যেমন দেখি।

‘কি হল, গেলি?’ আমি প্রশ্নকালেই এলোকেশী বেরিয়ে গেল।

‘তোমার নাম দীপা?’

মাথা নাড়ল সে।

‘তোমার এত আত্মপার্থী যে বাবা-মাকে না জানিয়ে আমাদের অনুমতি না নিয়ে বিয়ে করেছে?’ রাগটা প্রকাশ করেই বুঝলাম ভুল হল। এখন এইরকম কথা বলা উচিত হয়। তাই বললাম, ‘করেই যখন ফেলেছ তখন ওখানে বসো।’

সে বসল।

‘বলিহারি তোমার! আগেকার দিনে বউমা শ্বশুরের মুখ দেখতো না আর তুমি ওই ব্যাটাছেলের সঙ্গে একতলায় রয়েছ?’

‘উনি আমার শ্বশুরমশাই, বাবা।’

‘বাবা! কোন্ কালে তুমি বাবা বলে ডাকতে ওঁকে? নিজের বাপ ভাই দাদা ছাড়া পুরুষমানুষকে চিতায় না পোড়া পর্যন্ত বিশ্বাস করতে নেই। হঃ!’ বলে ফেললাম।

‘এলোকেশী ছিল।’

‘ওর ঘটে কোনও বুদ্ধি আছে? কাল সত্যি চোর এসেছিল?’

‘চোর কিনা জানি না, তবে একজন এসেছিল।’

‘কে সে?’

‘আমি দেখতে পাইনি।’

‘কাউকে সন্দেহ করো?’

‘আমি তো এখানকার কাউকে চিনি না।’

‘হুম্। শোন, তুমি মেয়েমানুষ, তোমার নিচে থাকা উচিত নয়।’

মেয়েটা এবার আমার দিকে তাকাল।

‘তুমি আজ থেকে ওপরে থাকবে।’

‘ওপরে?’

‘হ্যাঁ, বাড়ির বউ একতলায় শ্বশুরের সঙ্গে থাকছে, এরপরে নিন্দায় কান পাতা যাবে না। ওই মানুষটার তো পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগ আর রাগ। বাস্তববুদ্ধি একেবারেই নেই।’ আমি উঠে দাঁড়ালাম, ‘এসো আমার সঙ্গে।’

দোতলার একদিকে খোকার ঘর। ঠিক তার বিপরীত দিকে আমার শোওয়ার ঘরের পাশে একটা ছোট ঘর ছিল। সেখানে নিয়ে গেলাম তাকে। বললাম, ‘এখন থেকে এটাই তোমার ঘর। এখানেই থাকবে তুমি।’ সে মাথা নাড়ল বাধ্য মেয়ের মতো, ‘ওনাকে বলব।’

‘কাকে?’

‘শ্বশুরমশাইকে।’

‘তোমাকে কিছু বলতে হবে না। যা বলার তা আমিই বলব। আর হ্যাঁ, অকারণে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাবে না। খোকা ডাকলেও না।’ কঠিন গলায় বললাম।

‘কেন?’

এই প্রশ্নটা আমি আশা করিনি। এ মেয়ে দেখছি সহজে নোমাবে না। অতএব বলতে হল, ‘পুরুষমানুষকে বিশ্বাস না করার কথা বলেছি। তোমার যদি এখন কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে বাকি জীবনটায় জুলেপুড়ে মরবে।’

‘আপনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি না।’

‘তুমি বুঝতে পারছ না? তোমার পেটে বাচ্চা এলে কি হবে ভাবতে পারছ? আমি তোমার উপকার করার জন্যে এসব বলছি।’ কথা বলেই মনে পড়ে গেল, ‘যেখানে খোকার সঙ্গে ছিলে সেখানে কোনও গোলমাল হয়নি তো?’

‘জানি না।’

‘আমার কি! হলে নিজেই মরবে। যাও ঘরে যাও।’

বাড়ি ফিরে উনি ঠেঁচিয়েছিলেন স্বপ্ন। তারপর গুণধরকে দিয়ে বাংলা মদ আর বিড়ি আনিয়েছিলেন। ভেবেছিলাম ওপরে এসে তাঁর রঙটাকে আদেশ করবেন নিচে যেতে। করেননি। হয়তো চকিশ ঘন্টা নেশা না করে শরীর কাহিল হয়েছিল, এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে ফেললেন তিনি, অত্যন্ত ঘোড়েল লোক তো!

দীপার কথা

এ আমি কোথায় এসে পড়লাম? এই বাড়িতে ঢোকার পর যে ভদ্রমহিলা কুৎসিত ভাষায় আমার সম্পর্কে কথা বলেছিলেন তিনি আবার আমাকে ওপরে ডেকে নিয়ে এসে থাকার ঘর দেখিয়ে দিলেন? শ্বশুরমশাইকে যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম তাতে স্পষ্ট যে ওঁর মনে মারপ্যাচ নেই। আমাকে যতটা সম্ভব যত্নে রাখতে চেয়েছিলেন। স্ত্রীর ওপরে ওঁর প্রচণ্ড রাগ তা সবাই জানে কিন্তু ছেলের বউকে বাড়ি নিয়ে এসে সম্মান দেওয়ার মধ্যে যে বড় মনের পরিচয় দেওয়া এটা বোধহয় কেউ বুঝতে পারে না। আমার শাশুড়ি যখন আমাকে ওপরে ডাকিয়ে নিয়ে এসে এখানে থাকার আদেশ জানানালেন তখন সত্যি সত্যি আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমাকে কেন্দ্র করে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে যায়। শ্বশুরমশাই বাড়িতে ফিরে খবরটা জানতে পেরে লঙ্কাকাণ্ড না করে বসেন। তিনি সেটা গুরুত্ব করেছিলেন কিন্তু বেশিদূর এগোননি। শাশুড়ি আবার দরজায় এসে গুনিয়েছিলেন, ‘ঘঃ, বউমার ওপর কত দরদ জানা আছে, নইলে গুণধরকে আবার বাংলা মদ আনতে পাঠায়।’

আমার মনে হয়েছিল কেন আনাবেন না? আমি ওখানে থাকলে ওসব গল্প সহ্য করতে পারব না বলে তিনি এতদিনকার নেশা এককথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। কখন দিতে পারে? আমি যখন ওপরে আছি তখন তিনি কেন অভ্যাস বদলাবেন? এই ভদ্রমহিলা যে অকারণে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করেন তা তো বুঝতেই পারছি।

কিন্তু আমি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি শোভনের ব্যবহার দেখে। তার বাবা নিষেধ করেছে, মাও চাইছে না, কিন্তু আমরা তো নিজেদের ভালবেসে বিয়ে করেছি। ওর কোনও দায়িত্ব নেই? এই যে আমি ওকে না বলে শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে এখানে চলে এসেছি, হ্যাঁ, এর জন্যে তো ও বিরক্ত হতেই পারে। বিরক্ত হয়ে যদি সে ওই বাড়ি থেকে চলে যেত তাহলে ওকে বুঝতে পারতাম। তা না করে ও সেই রাত থেকেই এ বাড়িতে বহাল ভবিষ্যতে আছে। অথচ আমার কোনও খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। নিজে না যাক, এলোকেশীর হাতে একটা চিঠি পাঠাতে পারত। আর এলোকেশী ওর যা গল্প আমাকে শোনাল তা তো আরও চমকপ্রদ। বাবার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই, মায়ের আঁচলের তলায় মানুষ। তা নিয়ে আমি অবশ্যই মাথা ঘামাচ্ছি না। মা-ছেলের সম্পর্ক তাদের থাক। কিন্তু এত প্রেম যেখানে, জোর করে তাড়াহুড়ো করে

যে আমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করল, সে এমন সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে? কাল রাতে চোর এসেছিল এ বাড়িতে। এলোকেশী দরজা খোলামাত্র তাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনেছিল। সে চিৎকার করতে ঠেলে ফেলে দিয়ে পানিয়েছে। কোনও চোর চুরি করতে এসে কাউকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানে? যদি না সেই চোর যে দরজা খুলছে তার ঘনিষ্ঠ কেউ না হয়, কিন্তু এলোকেশী আমাকে দিবা দিয়ে বলেছে লোকটা তার কোনও চেনামানুষ নয়। তাহলে? আমার মনে সন্দেহটা এসেছিল। শোভন নয় তো? কিন্তু শোভন যদি হয় তাহলে কি করে সে ভাবল যে দরজায় টোকা দিলেই আমি তাকে খুলে দেব? এখন ওর যা স্বভাব দেখছি তাতে এই কাজটা ওর পক্ষে করা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

যদি শোভনই হয় তবে তা থেকে প্রমাণ হয় না যে সে আমার সম্পর্কে খুব ভাবছে। ভাবলে চোরের মতো মাঝরাতে সে যেত না।

তবু এখানে যখন থাকতে বললেন ওর মা তখন আমি একটু খুশিই হয়েছিলাম। ভদ্রমহিলার কথাবার্তা, ব্যবহার অত্যন্ত নিম্নরুচির হওয়া সত্ত্বেও মনে হয়েছিল দোতলাতে তো শোভন থাকে। অতএব ওর সঙ্গে দেখা হবেই। যদিও আমাকে যে ঘরটি দেওয়া হয়েছে তা একদম ওর উলটোদিকে, তবু। আমার শাওড়ি যে শশুরমশাইয়ের কাছে মিথ্যে বলে আমাকে ওপরে তুলেছিলেন সেটা তো বোঝা গেল সন্ধের পর। তাঁর কোনও বোন আমাকে দেখতে এলেন নী। তাহলে আমাকে ওপরে তুলে নিয়ে আসার কারণ কি? আমি বুঝতে পারছিলাম না। উনি যে স্কুলের সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেবেন না এটা স্পষ্টই বলে দিয়েছেন।

একটু আগে শোভনের গলা পেলাম। মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। যেন কোনও ব্যাপারে সে বিরক্ত হয়েছে। মায়ের গলাও ক্রিশ চড়া। আমি চূপচাপ খাটে বসে থাকলাম। আমার রাতের পাবার ঘরেই দেওয়া হল। আরও রাত হলে শাওড়ি এলেন দরজায়, 'শোওয়ার সময় দরজায় খিল তুলে শোবে। আমার গলা না পেলে ভুলেও খুলবে না। কথাটা মনে থাকে যেন।'

আদেশ মান্য করলাম। এ ছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। অবশ্য এসব সহ্য না করে আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারি। কেউ আমাকে আটকাতে পারে না। কিন্তু আমাকে যেতে হবে বাবা-মায়ের কাছে। গিয়ে কি বলব? কেন ফিরে এলাম? এটা এমন একটা কারণ যে কাউকে বুঝিয়েও বোঝানো যাবে না। আমি যেভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম তাতে শুধুমাত্র এই ঘটনার জন্য ফিরে যাওয়ার কোনও মুখ আমার নেই।

সকাল হল। বাথরুমটা এই ঘরের লাগোয়া বলে কোনও অসুবিধে হল না। কিন্তু এতক্ষণ এই ঘরে বসে থাকা যায়। কোনও টিভি বা রেডিও নেই। খবরের কাগজ অথবা বই নেই। কিভাবে সময় কাটেবে আমার? এই ঘরের বাইরের পৃথিবীতে কত কি ঘটে যাচ্ছে তার কিছুই আমি জানি না। এই সময় শাওড়ি এলেন দরজায়, 'তোমার কি চা খাওয়ার বদ অভ্যাস আছে?'

অভ্যাসটাকে যখন বদ বলছেন তখন হ্যাঁ বলি কি করে। বললাম, 'নেশা নেই।'

'যাক ভাল। তোমার বাপ-মা জানে যে এ বাড়িতে চলে এসেছ?'

'বোধহয় না।'

'তুমি কিরকম মেয়ে যে ওদের কথা চিন্তা করো না? নাকি ওরা তোমাকে একদম খরচের খাতায় নিয়ে ফেলেছেন?' শাওড়ির গলায় বিদ্রূপ।

এরকম কথার সঙ্গে আমি কখনই পরিচিত ছিলাম না। চূপ করে রইলাম।

'যাকগে। সংসারের কাজকর্ম কিছু জানা আছে?'

'কি করতে হবে বলুন?'

'খোকাকে তো রেঁধে খাইয়েছ, তা সেই রান্না কি সে মুখে তুলেছে?'

'তাকেই ভিজ্ঞাসা করে দেখুন।' আমার খুব রাগ হয়ে যাচ্ছিল।

'তুমি একটু নরম গলায় কথা বলতে পারো না?' শাওড়ি ঝাঁকিয়ে উঠলেন, 'আমার হয়েছে জানা। মাঝে মাঝে মনে হয় সব ছেড়েছুড়ে কোথাও চলে যাই।'

উনি চলে গেলেন। এই রকম মহিলা কি বিবাগী হতে পারেন?

শোভনের কথা

ঘুম ভেঙেছিল অনেকক্ষণ। গুণধর চা দিয়ে গেছে। এ বাড়িতে শুধু আমার জন্যেই চা হয়। চা খেতে খেতে ভাবছিলাম গোটা রাত আমি আর দীপা একই তলায় কাটলাম অথচ ওর সেবা পেলাম না। মাঝরাতে ওর ঘরে বাওয়ার কথা মনে এসেছিল কিন্তু আমি জানি মা ওকে দরজায় খিল দিতে বাধ্য করেছে। একটু শব্দ হলেই মহিলার ঘুম ভাঙবে। খুব খারাপ লাগছিল। এই সময় মা জননী দরজায় এল, 'খোকা!'

আমি তাকালাম। মা জননীর মুখ থমথমে, 'তুই কি করতে চাস বল!'

'কি ব্যাপারে?' আমি বুঝতে পারলাম না।

'এই মেয়েটাকে কিভাবে মাথা থেকে নামাবি?'

চারের কাপ রেখে দিলাম, 'দ্যাখো মা, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্টে যা বলা হয়েছে তাতে ডিভোর্স পাওয়া সহজ নয়। ধরো তোমার স্বামী তোমাকে ডিভোর্স করতে চায়, পারবে? পারবে না। প্রথম কথা তাকে প্রমাণ করতে হবে তুমি রোগগ্রস্ত। কুষ্ঠ হয়েছে, এইডস হয়েছে অথবা উন্মাদ। অথবা প্রমাণ করতে হবে তুমি ব্যভিচার করছ। ভদ্রলোক পারবেন এর বে কোনও একটা কোর্টে গিয়ে প্রমাণ করতে? পারবেন না।'

'তাহলে?' মা জননীর চোখ বড় হয়ে গেল।

'একটাই উপায় আছে। শ্রী যদি মিউচুয়াল ডিভোর্সে রাজী হয়। সে যদি বলে বিয়ে ভেঙে দিতে তার কোনও আপত্তি নেই তাহলেই সম্ভব।'

'ও বাবা! এ মেয়ে কি রাজী হবে? কিরকম কাটকেটে কথা বলে?'

'তুমি যদি ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো তাহলে কিছুতেই রাজী হবে না। দীপা হল সেই ধরনের মেয়ে যারা শক্তের যম। কিন্তু নরম ব্যবহার করো, ভাল সম্পর্ক রাখো, তাহলে তুমি যা বলবে তাই ওনবে।'

মা জননী যেন ধক্ষে পড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'তা আমাকে কি করতে হবে?'

'তা আমি জানি না। তুমি ভেবে দ্যাখো। আমি যদি সুযোগ পেতাম তাহলে ধীরে ধীরে ওকে বুঝিয়ে বলতাম। রাজী করিয়ে ফেলতাম ডিভোর্সের জন্যে।' গভীর হয়ে বললাম।

'রাজী করাতে পারবি?' মা জননীর গলায় সন্দেহ।

'এ কি বলছ তুমি? এটুকু পারব না?'

'তা কদিন লাগবে তার মতিগতি ফেরাতে?'

'ধরো মাস ছ'য়েক।'

'অসম্ভব। অতদিন আমি অপেক্ষা করতে পারব না।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, তাড়াহুড়া করলে ও যদি প্র্যান্টা বুঝে ফেলে তাহলে বিগড়ে যাবে। তারপর দুজনে মিলে দরখাস্ত করতে হবে, কোর্টেও তো সময় লাগবে।'

'না, তোমাকে তিন মাসের মধ্যে যা করার করতে হবে।'

'বেশ। আমি আশ্রয় চেষ্টা করব।'

মা জননী চলে গেল। তার ঠিক দশ মিনিট পরে ফিরে এল দীপাকে সঙ্গে নিয়ে, 'আমি ওকে বললাম, তুমি হয়তো খারাপ ভাবছ আমাকে। কিন্তু কোনও অনুষ্ঠান হল না। পাঁচজনে এসে খেয়ে গেল না অথচ বাড়িতে বউ ঘুরঘুর করছে, আত্মীয়স্বজনরা কি বলবে? তাই তোমাকে ওই ঘরে থাকতে বলেছিলাম। কিন্তু পরে মনে হল, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে, আর কত লুকিয়ে রাখব। যাও, এই তোমার স্বামীর ঘর। তবে একটা কথা, আমরা কেউ দিনের বেলায় স্বামীর ঘরে পা ছড়িয়ে বসে কখনও গল্প করিনি। বাড়ির কাজকর্ম শেষ হলে রাতের বেলায় স্বামীর ঘরে ঢুকতাম। তুমিও তাই করবে।'

কথাগুলো বলে মা জননী চলে গেল হনহনিয়ে। বুঝলাম, কাজটা করতে তার খুব খারাপ লাগল। ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে করতে হল।

দীপা দাঁড়িয়েছিল দরজায়। আমাকে দেখছিল সে। ওই দৃষ্টিতে অস্বস্তি হল। সেটা কাটাতে বললাম, 'এসো।'

সে ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসে পড়ল।

বললাম, 'তুমি যে অমন ছুট করে ওর সঙ্গে চলে আসবে ভাবতে পারিনি।'

'উনি আমাকে জোর করে নিয়ে এসেছিলেন।'

‘তুমি তো ওঁকে চিনতে না। যদি বাজে লোক হত?’

দীপা মুখ ফেরাল, ‘তুমি যে চাকরি খোজার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাসির বাড়িতে গিয়ে শুয়ে থাকতে, এ আমি ভাবতেও পারিনি।’

‘দূর! একদিন পাঁচ মিনিটের জন্যে গিরেছিলাম আর তাই ফেনিয়ে গল্প ওনিয়োগে তোমাকে।’ বলেই গলার স্বর নামালাম, ‘দীপা, আমার জন্যে তোমাকে খুব কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে, না?’

দীপা ভাবাব দিল না।

‘ঠিক আছে। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে কেউ আর অপমান করবে না।’

‘একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, পরশু রাতে তুমি নিচে গিয়েছিলে?’

‘আমি? না তো! কেন?’

‘না, এমন।’

‘ও সেই চোর আসার ব্যাপারটা! আমি কেন চোরের মতো যাব?’

নিঃশ্বাস ফেলল দীপা, ‘শোন, তোমার সব কিছু আমি মেনে নিতে পারি, শুধু তুমি আমার কাছে কখনও মিথ্যে কথা বলো না। শ্রীজ!’

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম মিথ্যে কথা বলব না। আসলে আমি মিথ্যে কথা বলতে চাই না। কিন্তু কখনও কখনও না বলেও পারা যায় না। কিন্তু এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। আমি দীপার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তার ওপর যে অভিযোচনার হয়েছে তার জন্যে অনেকবার ক্ষমা চাইলাম।

শেষ পর্যন্ত দীপা একটু সহজ হল। জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার মা কি চান বল তো?’

‘মায়ের বেশিদূর পড়াশুনা নেই। কি বলতে কি বলেন। কিছু মনে কোরো না তুমি।’

‘আমি পড়াশুনার কথা বলছি না, আমার কাছ থেকে কি চাইছেন উনি? প্রথমে আমাকে এ বাড়িতে ঢুকতেই দিচ্ছিলেন না। তোমার বাবা একতলায় আমাকে থাকতে বলেছিলেন বলে তাঁকে যা-তা বলেছেন। আবার পরের দিন আমাকে ওপরে তুলে এনে একটা ঘরে প্রায় বন্দী করে রেখেছিলেন। তোমার সঙ্গে দেখা না করার নির্দেশ ছিল। আবার আত্ম একেবারে অন্য রূপ, নিজে এই ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেছেন অথচ বললেন, ‘দিনের বেলায় আমি এখানে থাকতে পারব না।’ দীপা একটানা বলে গেল।

‘অদ্ভুত!’ আমিও মুক্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

‘শোভন, আমার পক্ষে এসব সহ্য করা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ছে। আমার নার্ভ নিচ্ছে না।’

‘শ্রীজ দীপা, শ্রীজ।’

‘বিয়ের আগে এসব সহ্য করার কথা আমি কল্পনাও করতাম না। এই কলকাতা শহরে এমন আদিম ব্যবস্থা কোনও পরিবারে চালু থাকতে পারে তা ভাবতেও পারিনি, তোমাকে দেখে কখনও মনেই হয়নি তুমি, তুমি—।’ দীপার গলা কঁপে উঠল।

ঠিক তখন দরজায় শব্দ হল। আমাকে এরকম পরিস্থিতি থেকে যেন মুক্তি দিল ওই শব্দটা। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কে? কে ওখানে?’

‘আমি।’ এলোকেশীর গলা।

‘কি চাই?’

‘বউদিমণির সঙ্গে কথা আছে।’

‘ভেতরে এলেই তো হয়।’

ততক্ষণে দীপা চোখ মুছে নিয়েছে। এলোকেশী ভেতরে এল। ‘বউদিমণি, বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি কোনও অসুবিধা হচ্ছে ওপরে এসে?’

ওনে মাথা গরম হয়ে গেল, ‘কেন? ভাল না থাকলে তিনি কি করবেন?’

‘বউদিমণিকে বলেছেন আমার সঙ্গে নিচে চলে আসতে।’

দীপা বলল, ‘তুমি ওঁকে আমার প্রণাম জানিয়ে। বোলো, আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। যদি হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাঁকে জানাবো।’

এলোকেশী ঘাড় নেড়ে চলে যেতেই আমি চটপট এগিয়ে গিয়ে দীপাকে জড়িয়ে ধরলাম। ছটফটিয়ে উঠল দীপা, ‘না, না...।’

‘কেন না?’ আমি জোর করলাম।

‘ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে গিয়ে মাঝরাতের আগে যদি এই ঘরে না ঢুকতে পারি তাহলে এসব করার কোনও অধিকার তোমার নেই। তোমার ক্রীতদাসী হয়ে থাকার জন্যে নিশ্চয়ই আমরা বিয়ে করিনি। আমি দ্বীপের মর্যাদা চাই।’ দীপা শব্দ গলায় বলল।

আমি ওকে ছেড়ে দিলাম। খুব অসহায় লাগছিল নিজেকে। দীপা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কোথায় যাচ্ছ?’

‘তোমার মায়ের আদেশ পালন করছি।’

‘না, তুমি যাবে না। এখানে বসো। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।’ দীপাকে হাত ধরে নিয়ে এলাম চেয়ারের কাছে। ও খুব অবাক হয়েছে। আমি হাসলাম, তারপর বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

মা জননীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম তাঁর মুখে হাসি, টেলিফোনে কথা বলছে, ‘ঠিক বলেছিস। আমার তো মাথা ঝারাপ হয়ে যাচ্ছিল। আচ্ছ, একবার জিজ্ঞাসা করে নিস তো, ডিভোর্স করতে হলে কি কি করতে হয়। আর হ্যাঁ, এসব কথা কাউকে বলার দরকার নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি, তুই কাউকে বলবি না।’ রিসিভার নামিয়ে রেখে মা জননী আমাকে দেখতে পেল, ‘আবার কি হল?’

‘তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে।’ বললাম।

‘কেন? কি হয়েছে?’ ওর কপালে ভাঁজ পড়ল।

‘তুমি কি সত্যি চাও ডিভোর্সটি হয়ে যাক?’

‘ওমা, একি কথা! তুই ছোট সাতকাণ্ড পড়ার পর জিজ্ঞাসা করছিস সীতা রামের কে হয়? অদ্ভুত ছেলে তো! আমি তোমার মাসিকি বলে দিলাম যে ডিভোর্স হবেই।’ মা জননী যেন ককিয়ে উঠলেন।

বললাম, ‘তুমি তো নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারছ।’

‘তার মানে?’

‘একেই মেয়েটা আমাদের ওপর চটে গিয়েছে। তোমার স্বামীর চিংকার-চঁচামেটি শুনে এমনিতেই বিগড়ে গিয়েছিল। তার ওপর তুমি একরাত বন্দী করে রাখলে। এখন বলছ সারাদিন সে আমার ঘরে ঢুকতে পারবে না। এতে তো আমার পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে মা!’

‘কেন? কেন তা হবে?’ মা জননীকে খুব চিত্তিত দেখাল।

‘বাঃ, ও আমার কথা শুনবে? ডিভোর্সের ব্যাপারে একদম বঁকে বসবে।’ আমি গলা নরম করলাম, ‘কোনো ভেতরে যা করা যায় না তা মিষ্টি কথায় করা সম্ভব।’

মা জননী বিছানায় বসলেন, ‘তা তুই আমাকে কি করতে বলিস?’

‘ওর ওপর কোনও বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিও না। শুধু একতলায় যেতে পারবে না তোমার অনুমতি ছাড়া। যেমন ইচ্ছে থাকুক। মা বাবার সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে হলে তোমাকে বললে তুমি তাদের খবর দিতে পারো। দেখো, পরিস্থিতিটা বদলে যাবে।’

‘এসব করলে সে ডিভোর্সে মত দেবে?’

‘ওটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও।’

‘কদিন লাগবে তা ঠিক করে বল।’

‘ধরো ছয় মাস।’ বললাম আমি।

‘অসম্ভব। তোকে তো আগেও বলেছি, অতদিন অপেক্ষা করতে পারব না।’

‘বেশ চার মাস। চার মাস সময় দাও আমাকে। আমি তার মধ্যে বুঝিয়ে রাজী করাবো।’

‘ততদিন সে দিনরাত তোর ঘরে পড়ে থাকবে?’

‘দিনরাত কেন? মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে গল্প করবে।’

‘বয়ে গেছে আমার গল্প করতে!’ মা জননী ঠোট বঁকালেন।

আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল।

ঘরে ফিরে এসে দু-হাত বাড়িলাম দীপার দিকে। সে বসে ছিল চুপচাপ, আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করল, ‘কি ব্যাপার?’

‘তোমাকে আর কোথাও যেতে হবে না। তুমি এই ঘরে আমার কাছে থাকবে।’

‘সত্যি বলছ?’

‘ইয়েস্।’

সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এল দীপা। দু-হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

ভেবেছিলাম সময়টা বেশ সুখেই কাটবে। আমি এখন দীপার সঙ্গে খুব প্রেম করছি। আমাদের ঘরে মা জননী একেবারেই চোকে না। কিন্তু দীপা প্রায় যে কথাটা বলছে সেটা শুনে আমার ভাল লাগছে না। দুপুরে খেয়েদেয়ে একটা বই নিয়ে শুয়েছি, অমনি কানের কাছে বকবক করতে লাগল, 'কেন সময় নষ্ট করছ? যাও না, একটা চাকরির চেষ্টা করো না। আর কতকাল বাবা-মায়ের ঘাড় আমাকে নিয়ে বসে থাকবে?'

বিরক্ত হয়ে বলেছি, 'লোকে চাকরি করে কি জানো?' টাকার জন্যে তো? তুমি জানো আমাদের কত টাকা আছে? ভাবতেও পারবে না। বাবা-মা চলে গেলে ওইসব টাকার মালিক তো আমিই। মিছিমিছি চাকরি করতে যাব কেন?'

'তার মানে তুমি নিজের যোগ্যতায় কিছু করতে চাও না?' দীপা জিজ্ঞাসা করেছিল।

এই কথাবার্তা শুড়শুড়ি দেয় সেটিমেন্টকে। আমার রাগ হয়ে যায়। রাগ হলে প্রেম করা যায় না। তখন দীপাকে শত্রু বলে মনে হয়। কিন্তু আমি চাইলে একটা পাতি কেরানীর চাকরি এখনই পেতে পারি। কিন্তু সেটা করার জন্যে কি আমি জন্মেছি? দীপা বলে, কোনও চাকরিই নাকি ছোট নয়। তাহলে একদা কেরানী কেন তার ছেলেকে কেরানী হিসেবে ভাবতে পারে না? কেন বড় চাকরির স্বপ্ন ছেলের জন্যে দ্যাখে?

হঠাৎ সুন্দরের কথা মনে পড়ল। আমার সঙ্গে পড়ত। ওদের বাড়ি রাঁচির কাছে। কিন্তু চমৎকার বাংলা বলে। কলকাতায় ক্যামাক স্ট্রিটে ফ্ল্যাট। রাঁচিতে ওদের বিশাল ব্যবসা। সুন্দর প্রায়ই বলত, 'বস্, এসো তোমাদের আমাদের একটা ব্যবসা করি।'

এখন মনে হল, চাকরির চেয়ে ব্যবসা অনেক ভাল। নিজেই নিজের মালিক। অতএব দীপার গল্পনা থেকে বাঁচবার জন্যে সুন্দরকে ফোন করলাম। আমার গলা শুনে সে লাফিয়ে উঠল। সেদিনই দেখা করতে বলল।

ছাত্রাবস্থায় ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে আমি কয়েকবার গিয়েছি। তখন ওর মা থাকতেন ওর সঙ্গে। এখন দেখলাম একাই থাকে চাকর নিয়ে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'ঠিক সময়ে এসেছ বস্। আমি এক্সপোর্টের ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছি। হেভি প্রফিট। কিন্তু একার পক্ষে সামলানো টাফ হবে। তুমি আমার পার্টনার হয়ে যাও।'

'আমাকে কত টাকা ইনভেস্ট করতে হবে?'

'একটা টাকাও নয়। তুমি আমার ওয়ার্কিং পার্টনার। টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট তোমার সেভেনটি ফাইভ আমার। প্রায় পঞ্চাশ লাখ ঢালবো আমি।'

রাছী হয়ে গেলাম। সেলিব্রেট করতে স্কচ বের করল সুন্দর। আমি মদ খাই না। নটবরবাবুকে দেখে মদের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নেই। কিন্তু তিনি খান দিশি মদ আর এ খোদ স্কটল্যান্ডের। সুন্দর দুঃখ পেতে পারে ভেবে এক পেগ খেলাম। গল্প করতে করতে সুন্দরকে দীপার কথা বললাম। শুনে লাফিয়ে উঠল, 'বস্ বিয়ে করেছ, আমাকে নেমস্তন্ন করোনি?' অতএব সব ব্যাপার খুলে বলতে হল তাকে। সে বুঝতে পারল। বলল, 'তাহলে নিয়ে এসো তোমার বউকে। বোলো, আমি তোমাদের এই গরিবখানায় নেমস্তন্ন করছি। আরে এখন থেকে আমরা পার্টনার। শুধু ব্যবসা কেন, পার্সোনাল লাইফেও আমাদের মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত নয়।' ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বিয়ে করোনি কেন? সে জবাব দিয়েছিল, মনের মতো মেয়ে পাচ্ছি না ভাই।

বাড়িতে এসে দীপাকে সব বললাম। খুব খুশি হল সে। আমি যে সক্রিয় হতে চলেছি, নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই এতে ওর খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু দীপাকে নিয়ে কি করে বাড়ি থেকে বের হই? শেষ পর্যন্ত ভেবেচিন্তে প্ল্যান তৈরি করলাম। মা জননীকে গিয়ে বললাম, 'মা, আজ উকিলবাড়িতে যেতে হবে।'

'উকিলবাড়ি কেন?' মা জননী বুঝতে পারেনি।

'বাঃ, ডিভোর্সের দরখাস্ত করতে হবে না?'

সঙ্গে সঙ্গে হাসি ফুটল মুখে, 'ও তাই বল! সে রাছী হয়েছে?'

'না হয়ে উপায় আছে! কিন্তু ওকেও যেতে হবে সঙ্গে।'

'কেন? ওর যাওয়ার দরকার কি?'

'দুজনে একসঙ্গে আবেদন করা হচ্ছে। উকিলবাবু ওর মুখ থেকেও সেটা শুনে চান। তারপর তাঁর সামনে বসে ওকে সহী করতে হবে।'

‘এটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।’

‘তাহলে ডিভোর্স হবে না।’

‘বেশ! নিয়ে যা। সাবধানে যাবি। বেশি দেরি করবি না।’

‘উকিলবাবুর চেয়ারে ভিড় না থাকলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। এখন শ’ তিনেক টাকা দাও। দরখাস্ত টাইপ করতে, ভ্রমা দিতে খরচ লাগবে। উকিলবাবুর ফি পরে দিলে হবে।’ আমি হাত পাতলাম।

অত্যন্ত অনিচ্ছায় মা জননী টাকা বের করে দিলেন। বললাম, ‘তোমার নামে পাছে বদনাম হয় তাই ওকে বলেছি এসব কথা কাউকে না বলতে। তুমি আবার আগবাড়িয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করে বসো না।’

মা জননী বলল, ‘বাবা, তোর দেখছি খুব সাংসারিক বুদ্ধি হয়েছে।’

খুব সেজেছিল দীপা। ভার্গ্যস বেরুবার সময় মা জননী ঠাকুরঘরে ছিল, নইলে নির্ঘাৎ সন্দেহ করত। আমি ট্যান্ড্রি নিলাম। এসময় দীপাকে আদর করতে খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু দীপা সরে বসে বলল, ‘ট্যান্ড্রিতে একদম অসভ্যতা করবে না।’

সুন্দরের বাড়ি দেখে দীপা প্রবাক হল, ‘ওরে বাবা, কি সুন্দর বাড়ি।’

‘বড়লোক কিন্তু অহকার নেই।’ ওকে আশ্বস্ত করলাম।

কাজের লোক দরজা খুলে আমাদের বসাল। চারপাশের আসবাবে শুধু বিপুল নয়, রুচিরও পরিচয় রয়েছে। একটু বাদে সুন্দর একটি দু-হাত দু-পাশে ছড়িয়ে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, ‘শোভনের জন্যে আমি গর্বিত।’

‘কেন?’ দীপা জিজ্ঞাসা করল।

‘এখন আমার মনে পড়ছে। কলেজের অন্যতম সুন্দরীকে সে দখল করেছে।’

দীপা প্রতিবাদ করল, ‘দখল বলছেন কেন? যার প্রাণ নেই তাকেই দখল করা যায়।’

‘ওহো, আমার বাংলাটা মাপ করে দিন। কি খাবেন বলুন?’

বললাম, ‘যা ইচ্ছে।’

‘তাহলে দানী ভিনিস বের করি। আপনি খাবেন তো?’

‘কি সেটা?’

‘স্ট্রচ।’ সুন্দর বলল।

‘না না। আমি ওসব খাই না।’ মাথা নাড়ল দীপা।

‘এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন? স্বামীর উপযুক্ত সঙ্গিনী হওয়া দরকার। শোভনকে এখন ব্যবসার জন্যে কত পার্টিতে যেতে হবে। তখন কি করবেন?’

‘পার্টিতে গেলেই কি মদ খেতে হবে? আর আমি না খেলে যদি ওর উপযুক্ত না হই তাহলে জানবেন সেরকম হওয়াব কোনও বাসনা আমার নেই।’ দীপা জানাল।

‘ও-কে, ও-কে বাবা। আপনার জন্যে একটা কোস্ট ড্রিঙ্ক আনছি।’

দীপার সামনে মদ খেতে একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে মনে ঠিক করলাম পরে ওকে বুঝিয়ে বলব। এ-সে মদ নয়। তাছাড়া ব্যবসাপত্র করতে গেলে এসব খেতেই হয়। দীপার জন্যে ঠাণ্ডা পানীয় এল। আমরা এনোয়েলো গল্প করছিলাম। সুন্দর সব আমেরিকা থেকে এসেছে। ওখানকার গল্প বলছিল সে। এইসব করতে করতে আমাদের তিন পেগ খাওয়া হয়ে গিয়েছে। সুন্দর বলল, ‘আমেরিকা থেকে ফেরার সময় আমি প্যারিস হয়ে এলাম। সেখান থেকে দুটো ছবি কিনেছি। রেয়ার ছবি। দেখবেন?’

দীপা আমার দিকে তাকাল। আমার উঠতে ইচ্ছে করছিল না। ছবির ব্যাপারে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। বললাম, ‘আমি এখানেই থাকি। তুমি দেখে এসো।’

দেখলাম অনিচ্ছাসত্ত্বেও দীপা উঠল। আমি কাজুবাদাম মুখে দিলাম।

দীপার কথা

আমি কখনও শোভনকে মদ খেতে দেখিনি। কদিন আগে ওর মুখে একটু অন্যরকম গন্ধ পেয়েছিলাম, যেদিন

সে সুন্দরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এখন বুঝতে পারছি সেই রাত্রেও ও এখান থেকে মদ খেয়ে গিয়েছে। ওর বাবাকে ওরা সমালোচনা করে। হ্যাঁ, তিনি স্কচ খান না, কিন্তু ব্যাপারটা তো একই। সুন্দরকে আমার খুব খারাপ লাগছিল না। ওকে আমি কলেজে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু ওই মদ খাওয়া নিয়ে জোরাজুরি করা ছাড়া ওর ব্যবহার খুব মার্জিত। কথাবার্তায় বেশ মার্জিত ভাব।

সুন্দর আমাকে নিয়ে এল আর একটা ঘর পেরিয়ে যেখানে, সেখানে নীল আলো জ্বলছে। দেওয়ালে দুটো ছবি টাঙানো। ছবি দুটোর ওপর বেশ জোরালো আলো ফেলল সুন্দর সুইচ টিপে।

সুন্দর বলল, 'দেখুন। কেমন লাগছে বলুন।'

ছবি দুটোর দিকে তাকিয়ে আমি হতভম্ব। দুটো নারী-পুরুষ অত্যন্ত হীনভাবে নগ্নাবস্থায় পরস্পরকে আক্রমণ করেছে। কোনরকম শিল্পসৌন্দর্যের বিন্দুমাত্র এদের মধ্যে নেই। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। সমস্ত শরীর যিনযিন করল। সুন্দর ভিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে?'

'এখানে থেকে চলুন।'

'কেন?'

'আপনার ঝুটিকে আমি সমর্থন করতে পারছি না।'

'কেন? এই তো লীবন।' সুন্দর হঠাৎ আমার কাঁধে হাত রেখে তার দিকে টেনে নিয়ে গেল। 'ফরাসী মেয়ের ফিগারটা দেখেছেন?'

আমি ছটকে সরে এলাম। শব্দ করে হাসল সুন্দর, 'কি হল? ইটস নাথিং ব্যাট ফান! এসো, আমরা একটু মজা করি।'

'আপনি যে এরকম করবেন আমি ভাবতেও পারিনি।' খুব রেগে গিয়েছিলাম আমি।

'আমি তো কিছুই করিনি। তুমি শোভনের বউ। শোভন আমার পার্টনার হতে চলেছে। তাই তোমার সঙ্গে একটু ফান আমি নিশ্চয়ই করতে পারি। আমার টাকা, ও ওয়াকিং পার্টনার উইদাউট এনি এক্সপেরিয়েন্স। আমরা তিনজন তো এক হয়ে যেতে পারি।' সুন্দর হেসে কথাগুলো বলছিল।

'আপনি এই ঘর থেকে চলুন, নইলে আমি জোর করে বেরিয়ে যাব।'

'সেটা তোমার স্বামী বোধহয় পছন্দ করবে না। বেশ, প্রথমদিন বেশি কিছু চাইছি না, শুধু দু-হাতে জড়িয়ে তোমাকে একটা গ্র্যান্ড কিসি দিতে চাই।' দু'হাত ছড়াল সুন্দর। তারপর এগিয়ে আসতে লাগল চোটে হাসি রেখে।

শরীরের সব শক্তি একত্রিত করে ওকে ধাক্কা মারলাম, হয়তো সতর্ক ছিল না তাই পড়ে গেল সুন্দর। আমি দৌড়লাম। বাইরের ঘরে এসে দেখলাম শোভনের মাথা ঝুঁকে পড়েছে। ঘরে কে ঢুকল না ঢুকল তা ওর খেয়াল নেই। বুঝলাম এই মুহূর্তে ওর কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে দরজা খুলে বাইরে চলে এলাম। নিচে নেমে রাস্তা দিয়ে আন্ধার মতো ছুটে চলেছিলাম কিছুক্ষণ। কেবলই ভয় হচ্ছিল ওরা এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ওখানে। যেহেতু সাহেবপাড়া এবং রাত হয়েছে তাই রাস্তায় লোক তেমন ছিল না। খারা ছিল তার অবাক হয়ে দেখছিল। শেষ পর্যন্ত সাহস ফিরে আসতেই আমি ইটতে ইটতে বাসরাস্তায় চলে এলাম। এবং তখনই খেয়াল হল আমার ব্যাগটা শোভনের সামনের টেবিলে পড়ে আছে। সুন্দরের সঙ্গে ভেতরের ঘরে যাওয়ার সময় আমি ওটা নিয়ে যাইনি।

এখন আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। জায়গাটাও ভাল করে চিনতে পারছি না। শেষ পর্যন্ত একজন পুলিশ অফিসারকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলাম। তাঁকে যতটা পারি সংক্ষেপে সব বললাম। ভদ্রলোক খুব অবাক হলেন। 'আপনি আমার সঙ্গে থানায় চলুন। ব্যাপারটা ডায়েরি করা দরকার।'

'ডায়েরি?' আমি খতমত হয়ে গেলাম।

'হ্যাঁ, এটা মারাত্মক অপরাধ। অবশ্য আপনি কি প্রমাণ করতে পারবেন?'

মাথা নাড়লাম, 'আমি জানি না।'

'আপনার বাপের বাড়ি কোথায়?'

'আমি ওখানে যাব না। আপনি ব্লীজ বউবাজারে পৌঁছে দিন।'

'সেখানে কে থাকে?'

'আমার শওরবাড়ি।'

অফিসার অবাক হল, 'এর পরেও আপনি শ্বশুরবাড়িতে যাবেন? বেশ যান।' ভদ্রলোক হাত তুলে একটা বাসকে দাঁড় করালেন। 'এই একে বউবাজারে নামিয়ে দিয়ে। টিকিট চাইবে না। বুঝতে পেরেছ?'

দরজায় দাঁড়ানো কন্ডাক্টর মাথা নাড়ল, 'ঠিক আছে স্যার।'

'যান, উঠে পড়ুন।'

আমি শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এসেছিলাম রাত সাড়ে নটা নাগাদ। আমাকে একা ফিরতে দেখে গুণধরও অবাক হয়েছিল। ওপরে উঠতেই শাওড়ির নামনে পড়লাম, 'এই যে, তুমি একা কেন? সে কোথায়?'

মাথা নিচু করে বললাম, 'আসছে।'

'উকিল কি বলল?'

প্রশ্নটার মানে আমি বুঝতে পারলাম না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি চোখ ওলটালেন, 'ওহো, তোমাকে তো এসব কথা জিজ্ঞাসা করা বাবে না।'

আমি ঘরে চলে এলাম। সমস্ত শরীর ঘামে ভিজ্রে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শোভন এটা কি করল? ও কি জেনেগুনো আমাকে ওখানে নিয়ে গেল? ওর বন্ধুর মতলব ও কি জানত? না, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। হয়তো মন এবং শরীরের ওপর ধকল এতটাই হয়েছিল যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল যন্ত্রণায়। আমার মাথার চুলগুলো কেউ উপড়ে ফেলছে।

'আঃ!' চিৎকার করলাম আমি।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঠান করে চড় পড়ল আমার গালে। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। শোভন তাতে খুশি হল না। আবার টেনে তুলল আমাকে। অকথ্য গালাগাল করতে লাগল আমার চুলের মুঠি ধরে। কোনওরকমে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি, তুমি আমাকে মারছ?'

জড়ানো গলায় সে বলল, 'কেন চলে এসেছিস, মাণী? কেন সুন্দরকে তুই মেরেছিস? ও তো তোর কাঁধে হাত রেখেছিল, তাতেই তোর ইচ্ছাত চলে গেল? আমার ভবিষ্যতের বারোটা বাজাতে চাইছিস তুই? এত বড় আত্মপর্দা!'

আমি পাথর হয়ে গেলাম। এ আমি কাকে দেখছি? যে শোভন পরিচ্ছন্ন ইংরেজি বলত, বায়রনের কবিতা যার মুখস্থ থাকত, তার মুখে এই ভাষা? এই কদর্ব লোকটিকে আমি বিয়ে করেছি? এর জন্যে আমি বাড়ির সবাইকে আঘাত করেছি?

এই সময় দরজার ওপারে শাওড়ির গলা শোনা গেল, 'কি হয়েছে রে, ও খোকা!' এত মিষ্টি গলায় কথা বলতে ওঁকে এখন পর্যন্ত গুনিনি। শোভন আমাকে ছেড়ে দিল। 'আমার কথার অব্যাহত হয়েছিল তাই শাসন করলাম।'

'বেশ করেছিস।' শাওড়ি খুশি হয়ে চলে গেলেন।

সারাটা রাত আমি জেগে কাটিয়েছিলাম। শোভন শুয়ে পড়েছিল খাটে। এমনভাবে শুয়েছিল যেন আমি ঘরে নেই। খাটে শোওয়ার ইচ্ছে আমার বিন্দুমাত্র ছিল না। ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়েছিলাম আমি। কেবলই কান্না আসছিল। মনে হচ্ছিল আত্মহত্যা করি। আমার কৃতকর্মের জন্যে আমিই দায়ী। এই অবস্থায় বাবার সামনে কি করে দাঁড়াব? বাবার মুখটা মনে পড়ল। আমাকে কী ভালবাসত বাবা! আমি যদি আত্মহত্যা করি তাহলে বাবা কি সহ্য করতে পারবে?

সকালে ঘুম থেকে উঠে একটাও কথা না বলে শোভন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাথরুম থেকে ঘুরে এসে আমি বসার ঘরে যেতেই শুনলাম, 'আমাকে এখনই রাঁচি যেতে হবে।'

মা জননী খবরের কাগজ পড়ছিলেন চোখে চশমা এঁটে, 'কেন?'

'ব্যবসার কাছে।'

'কি ব্যবসা?'

'সুন্দরের সঙ্গে আজই শুরু করব। এক্সপোর্টের ব্যবসা।'

'আমি কিন্তু টাকা দেব না।'

'আশ্চর্য, আমি কি তোমার কাছে টাকা চেয়েছি?'

'তাহলে ভাল। কবে ফিরবে?'

'তিন-চার দিন হবে। হাজার দুয়েক দাও, হাতে রাখা উচিত।'

ও চলে গেল। যাওয়ার সময় আমাকে একটাও কথা বলল না। ও যদি আমার কাছে ক্ষমা চাইতো, নিজের কাজের জন্যে লজ্জিত হত তাহলে আমি জানি না কি করতাম। কিন্তু ও কিছুই করল না।

সকালবেলায় আমাকে কেউ চা বা জলখাবার দিচ্ছে না। কাল রাত্রেও আমি কিছু খাইনি। পেটটা গোলাছিল। বমি বমি পাচ্ছিল। দৌড়ে শোওয়ার ঘরে চলে এলাম। শেষ পর্যন্ত বাথরুমে গিয়ে বমি করতে হল। তেতো স্বাদ, পিঙ্গল উঠল কিছুটা। ব্যথা শুরু হল।

‘ওমা, তুমি বমি করছ?’ এলোকেশী বাথরুমের দরজায়।

কোনরকমে তার দিকে তাকলাম। অদ্ভুত হেসে সে চলে গেল।

ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম দশ মিনিট পরে। শাণ্ডি দরজায় এলেন, ‘শোন!’

ঘরের মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়েছিলাম, ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম।

‘বিয়ে তো বেশিদিন হয়নি, তাহলে এই কারণে খোকা বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে? ছি ছি ছি! তুমি না ভদ্রলোকের মেয়ে! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। শোন, এ বাড়িতে একদিন থাকো আর পাঁচ মাস থাকো, আমি যা বলব তাই তোমাকে শুনতে হবে।’ সজোরে কথাগুলো বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

উনি কি বলতে চাইছেন আমি বুঝতেই পারলাম না। ধীরে ধীরে উঠে দরজায় গিয়ে দাঁড়লাম। উনি ফোন করছেন। চাইলেও ফোনে কথা বলার সময় গলা নামাতে পারেন না। উনি বলছেন, ‘তোকে কি বলব, শোনামাত্র মাথা ঘুরছে আমার! তুলে তুলে কোথায় গিয়েছে ওরা! হাঁসারে, জিজ্ঞাসা করেছি, একটাও কথা বলল না। পেটে কিল মারলেও ওর মুখ থেকে কথা বের করতে পারবি না। সবে দেড়মাস হয়েছে, খোকা উকিলবাবুর সঙ্গে কথা বলে এসেছে। আর সাড়ে চার মাসের মধ্যে ডিভোর্স পেয়ে যাওয়ার কথা। তখন যদি পেটে ছয়মাসের বাচ্চা থাকে তাহলে কোর্ট ডিভোর্স দেবে? সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। তাই বলেছিলাম কি, তুই আমাকে বাঁচা। হাঁসারে, তোর ননদকে যেখান থেকে করিয়ে এনেছিলি তার ঠিকানা দে। দাঁড়া আমি কাগজ কলম নিই।’ শাণ্ডিকে কাগজ-কলম নিয়ে রিসিভার গালে রেখে লিখতে দেখলাম। ‘ঠিক আছে! আগে থেকে কথা বলার দরকার নেই তো? ভালো। না না, খোকার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব না। আমি এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি এলোকেশীকে দিয়ে।’

রিসিভার নামিয়ে তিনি চিংকার করে এলোকেশীকে ডাকলেন। এলোকেশী ছুটে এলে ইশারায় তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে।

একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে, কিন্তু ব্যাপারটা কি নিয়ে তা আমার মাথায় ঢুকছে না। ডিভোর্সের কথা, ছয়মাসের বাচ্চার কথা উনি কি বললেন?

পনেরো মিনিট বাদে শাণ্ডি এলেন দরজায়, ‘শোন, তুমি তো বমি করেছ, নিশ্চয়ই শরীর খারাপ হয়েছে। খোকা বাড়িতে নেই, শরীর আরও খারাপ হলে সে আমাকেই পাঁচ কথা শোনাবে।’

‘না, আমার শরীর খারাপ হয়নি।’

‘ওঃ! সেটা ডাক্তার ভাল বুঝবে। তুমি ডাক্তারের কাছে যাবে। এখনই এলোকেশী তোমাকে নিয়ে যাবে। খুব ভালো ডাক্তার। তিনি যা বলবেন তাই শুনবে। তৈরি হয়ে নাও।’ আদেশ জানিয়ে শাণ্ডি চলে গেলেন।

এলোকেশী এল আমার কাছে। বলল, ‘ওমা, এখনও রেডি হওনি।’

‘একবার বমি হয়েছিল অ্যাসিড হয়ে যাওয়ায়, তার জন্যে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে কেন, তা আমি বুঝতে পারছি না।’

‘আহা, হকুম হয়েছে যখন তখন চল, ঘুরেই আসি।’ এলোকেশী বলল, ‘এখন থেকে বেশি দূরে নয়। রিকশায় যাব।’

অগত্যা যেতে হল। এলোকেশী বসার পর রিকশায় ভায়াগা থ্রায় নেই বললেই চলে, তবু বসতে হল। হঠাৎ এলোকেশী জিজ্ঞাসা করল, ‘তুমি আর খোকাবাবু এই বাড়ির বাইরেও দেখা করতে? একা একা?’

‘কেন বল তো?’ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

‘না হলে এত তাড়াতাড়ি তো এমন হয় না।’ এলোকেশী হাসি চাপতে চেষ্টা করল।

‘আমার কি হয়েছে বলে তোমাদের মনে হচ্ছে?’

‘কিছু হয়নি, এখন চুপচাপ বসে থাকো।’

এবার আন্দাজ করতে পারলাম। শাণ্ডি নিশ্চয়ই ভেবেছেন আমি মা হতে চলেছি। ওই বমি করার কথা শুনেই বোধহয় তাঁর এমন ধারণা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বোনকে টেলিফোন করে পরামর্শ চেয়েছেন। তিনি

তাকে পরিচিত ডাক্তারের কাছে আমাকে পাঠাতে বলেছেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার! কিন্তু ডাক্তার তো প্রশ্ন করলেই বুঝতে পারবেন সেসব কিছুই হয়নি। এটা নেহাতই অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ার কারণে ঘটেছে। খবরটা শুনে ভদ্রমহিলা খুশি হবেন কি হবেন না বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে হবেন। কারণ পেটে ছয়মাসের বাচ্চা থাকলে ডিভোর্সের অনুবিধের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন। এই ডিভোর্সের ব্যাপারটা কি? উনি কি চাইছেন ওঁর ছেলে আমাকে ডিভোর্স করুক? কিন্তু শোভন তো এ ব্যাপারে একটাও কথা আমাকে বলেনি?

কাল রাত্রে কথা মনে এল। ভয়ঙ্কর বীভৎস রাত। যে কোনও মেয়ের জীবনে ওই রাত এলে তার চোখে আর কোনও স্বপ্ন থাকে না। কাল রাত্রে মনে হয়েছিল আত্মহত্যা করব। এখন সেটা ভেবেছি বলেই খারাপ লাগছে! কার জন্যে আত্মহত্যা করব? শোভনের জন্যে? ওর কাছে ওই স্বপ্তর মতো ব্যবহার পেয়েছি বলে? যে মানুষ ব্যবসায় পার্টনার হবে বলে বন্ধুর কাছে স্ত্রীকে পৌঁছে দিতে পারে তার জন্য নিজে কে ছোট করব? কিন্তু না করে যে ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসব তারও পথ তো পাচ্ছি না। বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো কোন মুখ নিয়ে? আর একটা উপায় আছে, সেটা হল শ্বশুরমশাইকে সব কথা বলা। তিনি স্ত্রী-ছেলের প্রতি অসম্মত।

মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এলোকেশী, এই যে তুমি এসেছ তোমার বড়বাবু নিশ্চয় জানেন না। তোমার তো ওপরের কাজ করার কথা নয়!'

'সে যদি তুমি নিচে ছিলে। এখন আমাকে দু-দিক সামলাতে হচ্ছে।'

'ও আচ্ছা, তোমাদের মা জননী ডিভোর্সের কথা বলছিল?'

'ওমা, তোমার ব্যাপার আর তুমি জানো না?'

'আমার ব্যাপার?'

'হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে খোকাবাবুর কথা হয়ে গেছে তোমরা মিলেমিশে আলাদা হয়ে যাবে। তাই তো কাল উকিলবাড়িতে গিয়েছিলে।'

আমি হতভম্ব। শোভন এসব কথা বলেছে তার মাকে? ভাবা যায়? বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ানো, রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলা, সিনেমা দেখতে যাওয়ার মধ্যে যেটুকু মেলামেশা তাতে কোনও ছেলের বভাব-চরিত্র যে কিছুতেই বোঝা যায় না এটা যদি কেউ আমাকে আগে বলে দিত।

রিকশা এসে দাঁড়াল একটা গলির মধ্যে। নামনেই একটা বাড়ির গেট। গেটের ভেতরের বারান্দায় কিছু মানুষ ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ওপরের সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, 'নিউ লাইফ নার্সিংহোম।'

আমার বেশ মজা লাগছিল। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে এলোকেশী ভেতরে এল। বারান্দার ভিড় পেরিয়ে সরু প্যাসেজ দিয়ে আমরা যে ঘরে বসলাম সেটা যেমন নোংরা তেমনি অন্ধকার। সেখানে বেঞ্চির ওপর গোটা আস্টেক বিভিন্ন বয়সী মেয়ে বসে আছে। চম্পিশ থেকে চৌদ্দ তাদের বয়স। নার্সের ইউনিফর্ম পরা একজন এগিয়ে এল, 'কোনও প্রেসক্রিপশন আছে?'

এলোকেশী তার কানে কানে ফিসফিস করে কিছু বলল।

নার্সটি আমাকে দেখল, 'এর হবে?'

মাথা নাড়ল এলোকেশী, হ্যাঁ।

'আজ বড্ড ভিড়। কিন্তু যার নাম বললেন তাতে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। কতদিন?'

'বেশি না।'

'ঠিক আছে। নামটা বলুন।'

এলোকেশী নার্সকে আমার নাম বলতে সে লিখে নিয়ে চলে গেল।

আমরা একটা বেঞ্চিতে বসলাম।

এলোকেশী চুপ করে আছে। আমার খুব মজা লাগছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করবে আমাকে?'

'মা জননী যে জন্য পাঠিয়েছেন।' বলেই এলোকেশী গলা নামাল, 'এই নার্সিংহোমের সঙ্গে মা জননীর বোনের জানাশোনা আছে।'

'কি জন্যে পাঠিয়েছেন?'

হঠাৎ এলোকেশীর মুখ শক্ত হল, 'আমাকে দোষ দিয়ে না বউদিমি। আমি হকুম মানছি, পরের বাড়ি চাকরি করি।'

'ওঁর ছেলে জানে?'

‘না। এখানে এসে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে।’

‘কেন?’

‘আমি তো কোনদিন বাচ্চার মা হতে পারব না। তাই তোমার পেট থেকে ওরা সেই সর্বনাশ করবে ভাবতেই বুকের ভেতরটা কি রকম করছে।’

‘তাহলে আমাকে বাড়ি থেকে নিয়ে এলে কেন?’

‘অন্য কোনও উপায় ছিল না। তারপর ভাবলাম, বাড়ি থেকে বেরিয়ে হয়তো মাথায় কোনও বুদ্ধি আনতে পারে। এল না। তাই এখানে নিয়ে এসেছি।’

‘তোমার যদি খারাপই লাগে তাহলে ফিরে চল।’

‘সর্বনাশ! আমাকে মা জননী মেরে ফেলবে।’ চোখ বড় করল এলোকেশী।

‘ভাঁকে গিয়ে বলো যা চেয়েছেন তা হয়ে গেছে।’ হাসলাম আমি।

‘ওমা, ওসব কি এত তাড়াতাড়ি হয়ে যায়? মা জননী তো বললেন, ভোদের বাড়ি ফিরতে বিকেল হবে, ততক্ষণ আমি যেন নার্সিংহোম থেকে না বের হই।’

‘তাহলে চল আমরা সিনেমায় যাই। নুন শো দেখে ম্যাটিনি দেখব। তারপর সন্ধ্যাবেলায় না হয় ফিরে যাওয়া যাবে।’

‘তারপরে?’ চোখ বড় হয়ে গেল এলোকেশীর।

‘তারপর আবার কি?’

‘কদিন বাদে তোমাকে দেখেই তো উনি বুঝতে পারবেন। তখন কি হবে? ওরে বাবা, আমাকে মেরে শেষ করে দেবেন।’ আঁতকে উঠল এলোকেশী।

‘তার আগে তুমি বড়বাবুকে সব কথা খুলে বলো। তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে বাঁচাবেন। তাঁর মনে তো দয়ামায়া আছে।’

‘তা অবশ্য—।’ এলোকেশীর মাথায় দুর্ভাবনা এল। ‘কিন্তু মা জননী যদি এই এখানে ফোন করে জানানতে চান?’

আমি উঠে দাঁড়লাম, ‘চল আমরা ভেতরটা দেখে আসি।’

‘কেন।’

‘আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, চল—।’

অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুসরণ করল এলোকেশী। পাশেই সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই চিৎকার শোনা গেল। দু’তিনজনের গলা, গোঙাচ্ছে। সিঁড়ি দেওয়ালের চেহারা খুব নোংরা। যে ঘর থেকে শব্দ ভেসে আসছিল সেখান থেকে একজন জাঁদরেল মহিলার গলা শোনা গেল, ‘ফুর্তি করার সময় মনে ছিল না যে বেধে যেতে পারে! এখন ন্যাকামো হচ্ছে! চুপ, সব চুপ।’

জানলা দিয়ে দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। একটা মাঝারি খাটে দুজন শুয়ে আছে। দুজনেই গোঙাচ্ছে। কিরকম অস্থির হয়ে গেল শরীরটা, বমি পেতে লাগল। আমি কোনও কথা না বলে নিচে নামতে লাগলাম। পেছন পেছন এলোকেশী। এই সময় সেই নার্সটিকে দেখা গেল। নিচ থেকে উঠে এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ‘আপনাদের জন্যে ফোন এসেছিল।’

‘কে করেছিল?’

‘আপনার বাড়ি থেকে। আমি বলেছি একটু দেরি হবে।’

‘আচ্ছা, আপনারা কোনও টেস্ট করাবেন না?’

‘টেস্ট!’

‘হ্যাঁ। টেস্ট। যেসব করিয়ে পেশেন্টরা এখানে আসে। আপনি করাননি?’

‘না।’ মাথা নাড়লাম আমি।

‘তার মানে আপনাদের ক্ষেত্রে কোনও সংশয় নেই। ঠিক আছে। আপনারা ওপরে কোথায় গিয়েছিলেন?’ বললাম, ‘দেখতে।’

‘আশ্চর্য! ওপরে দেখার কি আছে? যান নিচে যান।’

‘আপনারা কি বাস্তবের মতো এখানে এইসব কাণ্ড করে থাকেন?’

‘মানে?’

‘এই নোংরার মধ্যে মেয়েদের অবস্থা তো পশুদের চেয়ে খারাপ করে রেখেছেন।’

‘খুব বড় বড় কথা বলছেন ভাই। যেমন ওড় ঢালবেন তেমন স্বাদ হবে। যাদের টাকের জোর নেই তারা কোথায় যাবে? অতই যদি নাক উঁচু হয় তাহলে বড় নার্সিংহোমে যান না!’ নার্সটি কর্কশ গলায় বলল।

আর কথা না বাড়িয়ে নিচে নেমে এলাম। আমাকে গলির দিকে যেতে দেখে এলোকেশী ছুটে এল, ‘ওমা কোথায় যাচ্ছ?’

‘জানি না।’

‘না জানলে হবে? আচ্ছা এই জায়গাটা তোমার খারাপ লাগছে একথা মা জননীকে বললে তিনি গুনবেন? তাঁর বোনের কথায় তো এখানে পাঠিয়েছেন তোমাকে। মাথা গরম কোরো না। এসো, ভেতরে বসবে চল।’

‘এলোকেশী, ভূমি বাড়ি ফিরে যাও।’

‘মানে?’

‘তোমার মা জননীকে বোলো তিনি স্বচ্ছন্দে তাঁর ছেলের বিয়ে দিতে পারেন ওঁর পছন্দমতো মেয়ের সঙ্গে। আমি কোনও আপত্তি করব না। আমার পক্ষে আর ওই বাড়িতে ফেরা সম্ভব নয়। ওখানে পা রাখতে আমার ঘোরা করছে।’

‘ও। কিন্তু তোমার পেটে—’

‘কিছু নেই। কেউ নেই। ভগবান তো শুধু খারাপ করেন না, একটু ভালও মানুষের জন্যে করেন। ওই বাড়ির রক্ত নিয়ে আমার পেটে কেউ আসেনি, তোমার মা জননীকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলো।’

‘কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ বউদিমণি?’

‘প্লীজ ওই নামে আর আমাকে ডেকো না। আমার নাম দীপা।’

বেশ জোরে নিজের নামটা উচ্চারণ করতেই শরীরে যেন শক্তি ফিরে পেলাম। আমি হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ খুব হালকা লাগছিল নিজেকে। কোথায় যাচ্ছি জানি না, মাথাতেও নেই। হঠাৎ দেখলাম রাস্তাটা চেনা। আমাদের কলেজ সামনে। কফিহাউস ডানদিকে। বাবার মুখ মনে পড়ল। আমি যদি এখন ফিরে গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়াই, যদি বলি, ‘বাবা, আমি আবার নতুন করে জীবনটা শুরু করতে চাই,’ তাহলে তিনি কি করবেন? কি বলবেন?

আমি জানি ওঁর বুক থেকে একটা বিশাল পাথর নেমে যাবে।

pathagar.net

সহজপূর কত দূর

| প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৪০২ |

pathagar.net

pathagar.net

জায়গাটার নাম ছিল সহজবাড়ি। এইসব অঞ্চলে বেশিরভাগ জায়গার নাম 'বাড়ি' অথবা 'ওড়ি' দিয়ে শেষ হয়। যেমন, পলাশওড়ি অথবা ময়নাওড়ি। কিন্তু সহজবাড়ি শব্দটি যাঁর মাথায় প্রথম এসেছিল এবং তিনি এই জায়গার নাম হিসেবে সেটাকে কাজে লাগিয়েছিলেন, তা এখনও ভাবতে অদ্ভুত লাগে। লোকমুখে কখন 'বাড়ি' 'পুর' হয়ে গেল, জানা নেই।

নামের মতো জায়গাটাও সহজ, সাদাসিধে। দু-পাশে মাঠঘাট, জঙ্গল রেখে একটা চা-বাগানের বুক চিরে পিচের চওড়া রাস্তাটা সহজপুরের ভেতর ঢুকে বোড়ার পায়ের নালের মতো বেকে চলে গিয়েছে। ওই রাস্তার দু-ধারেই যত বাড়িঘর, দোকানপাট, এমন কি রবিবারের হাটও ওইখানেই। শোনা যায় সহজপুরের পশ্চিম মাত্র সওয়া-শো বছর আগে। আশপাশে সাহেবরা চা-বাগান তৈরি করেছিলেন তখন। সেই চা-বাগানে যেসব জিনিস প্রয়োজন তা জোগান দেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা হাজির হয়েছিলেন। সাহেবদের বাগানের ভেতর বাইরের লোকদের থাকা নিষেধ। তাই জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি, প্রয়োজনের দোকান গজিয়ে উঠল।

এসব অনেককাল আগেকার কথা। সাতচল্লিশের স্বাধীনতার আগে সহজপুরের কোনও পরিবর্তন হয়নি। ইলেকট্রিকের ব্যবহার করার সুযোগ পায়নি ওখানকার বাসিন্দারা। চা-বাগানগুলোতে জেনারেটর চলত। আর সন্ধে হলেই সহজপুরের ওপর ঝুপঝুপ অন্ধকার। তখন হারিকেন অথবা হাজাক সম্ভব। যদিও সহজপুরে তখন অনেক কাঠচেরাই-এর কারখানা বসে গিয়েছে, তিন-তিনটে স্টেশনারি দোকান, মোড়ের মাথায় পেট্রল পাম্প এবং ব্রিজের গায়ে কিছু দোকান বসে গিয়েছে। সমস্ত বাস ওই মোড়ে দাঁড়ায় বলে তিনটে চা-কচুরির দোকান চালু হয়েছে। হরিদার দই এর মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। যাকে বলে রমরমে ঠিক তা নয়, তবু জীবন নড়াচড়া করছে এখানে। তবে ভাল জামাপ্যাট থেকে ঘড়ি, আংটি কিনতে মানুষকে যেতে হয় পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরের শহরে। স্কুলে পড়তে হলে আট-দশ মাইল দূরের গঞ্জের স্কুলে অথবা শহরে।

সহজপুরের একমাত্র প্রাইমারি স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিখ্যাত কাঠের ব্যবসায়ী হরদেব মুখার্জি। ভদ্রলোক, শোনা যায়, মুড়ি বিক্রি করতে এসেছিলেন সহজপুরে। নিজের কৃতিত্বে শেষ পর্যন্ত বিরাট কাঠের ব্যবসায়ী হন। বিনিময়ে তিনি ওই স্কুল এবং একটি কালীমন্দির তৈরি করে দিয়েছেন সহজপুরে। হরদেব মুখার্জি গত হওয়ার পর স্কুল চালাবার জন্য একটা কমিটি হয়েছে। ক্লাস গ্রী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পাবে এখানকার ছেলেরা। সাকুল্যে পনেরো কি ষোলোজন ছাত্র হয়। বৃদ্ধ দিনুমাষ্টার আর পাশের চা-বাগানের বড়বাবুর মেয়ে যুথিকা তাদের পড়ায়। দিনুমাষ্টারের ছেলেমেয়ে নেই। স্কুলের পাশেই তাঁকে থাকার জায়গা দেওয়া হয়েছে। যা বেতন পান তাতে কোনমতে ভাতে-ভাত করে দেন তাঁর স্ত্রী। যুথিকা হাতখরচ বাবদ মাসে কুড়িটা টাকা পান। তবে এ নিয়ে এঁদের কোনও আশ্রয় নেই। সেই উনিশশো বাহাম সালে ষোলোজন ছাত্রের স্কুল-ফি-র টাকায় যে তাঁদের ওই বেতনও হয় না এটা তাঁরা বুঝতেন। আর বুঝতেন বলেই অমানুষিক পরিশ্রম করতেন দিনুমাষ্টারের স্ত্রী কমলামাসিমা। ওই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন সহজপুরে। বড়ি, আচার থেকে পাঁপড় বানাতে তাঁর জুড়ি ছিল না কেউ। অনেকেই থোক টাকা ধরে দিতেন, আর তিনি অর্ডার অনুযায়ী বানিয়ে দিতেন। জিনিসের মান এত ভাল ছিল যে, কাজটা করে তাঁর কত লাভ থাকত এ নিয়ে সংশয় রয়েছে।

তখন সহজপুরের মানুষেরা পরস্পরকে চিনতেন। ওঁদের জীবনে কোনও টেনশন ছিল না। সন্ধ্যাবেলা স্কুলের পাশে ক্লাবঘরে সবাই আড্ডা মারতে আসতেন। বিস্তারিত ও বিস্তৃতির মেলামেশায় কোনও বাধা ছিল না। রাজনীতি মাথাচাড়া দেয়নি। আর চা-বাগানের অর্থানুকূল্যে বেড়ে ওঠা জনপদ বলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের আঁচ সহজপুরে পৌঁছলেও তা দানা বাঁধেনি।

॥ ২ ॥

স্বাধীনতার পর সহজপুরের জনসংখ্যা আচমকা বেড়ে গেল। পূর্ববঙ্গের মানুষেরা এসে কলোনি গড়লেন।

যে যাঁর মতো ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করে ওখানকার মানুষ হয়ে গেলেন। ফলে দিনুমাস্টারের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বেড়ে গেল। ওঁর পক্ষে একজন দিদিমণিকে সঙ্গে নিয়ে স্কুল চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ল। এই সময় স্কুল কমিটি ঠিক করলেন স্কুলের আয়তন বাড়াতে হবে। চাঁদা তুলে নতুন স্কুলবাড়ি তৈরি হল। স্কুল প্রহিয়ারি পর্যায়ে থাকলেও নতুন মাস্টারের প্রয়োজন হয়ে গড়ল।

সেদিন সকাল থেকেই আকাশের মুখভার। সহজপুরে বৃষ্টি নামলে একটানা দিনতিনেক চলে। আবার মেঘ মাথার ওপর বুলছে অথচ বৃষ্টি হচ্ছে না, এমন ঘটনা ওখানে স্বাভাবিক। সকাল থেকেই সূর্যদেবের দেখা নেই। ছায়া-ছায়া চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে পান চিৎখিলেন ভবেন গোস্বামী। চা-বাগানগুলোতে জ্বালানি কাঠ সাপ্লাই দেওয়া তাঁর ব্যবসা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে নিলামে গাছ কাটার অধিকার নিয়ে নিশ্চিন্তে সারা বছর ব্যবসা করেন। ইদানীং কথাবার্তায় ঈষৎ অহঙ্কার প্রকাশ পাচ্ছে।

থুক করে পানের পিক ফেলে ভবেন গোস্বামী চৌচিয়ে বললেন, “ও ফটিক, দোকানে বসে কী করছ? এই বর্ষায় পান খাবে, লোক কোথায়? এসো, এখানে এসো।”

ফটিক তার পান-সিগারেটের দোকানে মাঝে মাঝে বসেছিল, ডাক শুনে অলস চোখে ভবেনকে দেখল। লোকটার মাথায় সর্বক্ষণ মতলব খেলছে। চটিয়ে লাভ নেই। ধীরে ধীরে দোকান ছেড়ে রাস্তায় নেমে এল। এসে বলল, “জল না পড়লে কী বর্ষা বলা যায়?”

“জল পড়বে না বলছ? মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। জল গায়ে লাগলে তেনারা জঙ্গলে ঢুকে কাঠ কাটবেন না, এদিকে আদ্বাই চুয়াবাড়ি টি-গার্ডেনে দু’লরি কাঠ দেওয়ার কথা। কাল সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে গিয়েছিলে নাকি হে?” গলা নামালেন ভবেন গোস্বামী।

“সন্ধ্যাবেলায় দোকান বন্ধ করলে আর কোথায় যাব, ওখানেই যাই।”

“আমি যাইনি। গেলে একেবারে প্রেসিডেন্ট হয়ে যাব।”

“প্রেসিডেন্ট!” হকচকিয়ে গেল ফটিক।

“হ্যাঁ। আমি কি কারও চেয়ে কমতি আছি? আমি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হলে সহজপুরের চেহারা একদম পালটে দেব। পূজোর সময় চার রাতে চার-চারটে নাটক। বড় রেডিও কিনে বসাব ক্লাবে। বড়দিনের সময় সবাইকে নিয়ে বিনিপয়সার বনভোজন।” ভবেন গোস্বামী মাথা দোলালেন।

“কিন্তু বলরামদাদাকে সবাই মানে, ওঁর বাবা স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা।”

“ওই তো মুশকিল! বলরামদাদাকে আমিও পায়ে হাত দিয়ে পেম্বাম করি। কিন্তু এখন নতুন রক্ত দরকার। বাবা কিছু করেছিলেন বলে ছেলেকে চিরকাল মাথায় তুলব, এ হতে পারে না। প্রতিবার মুখে মুখে ঠিক হয়ে যায় কমিটি। এবার ইলেকশন করতে হবে।”

“ইলেকশন?”

“হ্যাঁ। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। আমার বাবা চার্লিস ছিলেন বলেই আমি ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হতে পারি না। তুমি শুধু আজ ক্লাবে গিয়ে ইলেকশনের কথাটা তুলবে, বাস।”

“আমি?”

“শোনো ফটিক, গত পূজোর নাটকেও তোমাকে রবি ভাল রোল দেয়নি। অথচ পাঁচুর চেয়ে নামিকার রোল তুমি ঢের ভাল করতে পারবে। আমি প্রেসিডেন্ট হলে তোমার মসল।”

ফটিক যখন মাথা চুলকাচ্ছে তখন আলিপুরদুয়ারের বাস এসে বাসস্ট্যান্ডে থামল। সঙ্গে সঙ্গে চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকানের কর্মচারীরা চৌচিয়ে করে খন্দের ডাকতে শুরু করল। বাস থেকে কয়েকজন যাত্রী নামল। তাদের মধ্যে একজন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ, হাতে টিনের স্টেকেস। বয়স বড়জোর পঁচিশ। রোগা মাঝারি উচ্চতার মানুষটি মাটিতে স্টেকেস নামিয়ে নসির ডিবে বের করে দুই টিপ দুই নাকে গুঁঁজল। তারপর রঙিন রুমালে নাক মুছে এগিয়ে এল ভবেন গোস্বামী এবং ফটিকের দিকে।

“নমস্কার।”

“নমস্কার।” ভবেন গভীর গলায় সাড়া দিলেন।

“এখানকার স্কুল কোনদিকে?”

“দিনুমান্টার আপনার কেউ হয়?”

“না তো! এ-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?”

“তাহলে স্কুলে আপনার কী প্রয়োজন?”

“আমি স্কুলের হেডমাস্টার এবং স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।”

ভবেন গোস্বামী তাকালেন। ইদানীং কমিটি থেকে সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করা হয়েছে। সরকারি লোক এখানে এসে দেখাশোনা করে সমুদ্র হলে সেই সাহায্য পাওয়া যাবে। তাঁর মনে হল এই সেই লোক। আর মনে হওয়ামাত্র তিনি হাতজোড় করে বললেন, “আরে কী সৌভাগ্য! আসুন, আসুন। আগে আমার গরিবখানায় চলুন, হাত-মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর ওসব হবে।”

“আপনি বোধ হয় আমাকে ভুল ভাবছেন!”

“ভুল?” খতমত দেখাল ভবেন গোস্বামীকে।

“আমি কেউকেটা নই। এখানে এসেছি চাকরির সন্ধানে।”

“অ!” ভবেন সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, “কী পাশ?”

“গ্র্যান্ডুরেট হওয়ার পর নানাকারণে পড়াশুনা হয়নি।”

“গ্র্যান্ডুরেট? তা এত জায়গা থাকতে সহজপূরে এলে কাজ পাওয়া যাবে কে বলল? এখানকার স্কুলের দিনুমান্টারের সেক্স ভাতের খুশি জোটে না। যত্ন সব!” ভবেন গোস্বামী আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে নিজের বাড়ির দিকে ফিরে গেলেন।

বাসটা চলে গেল। ফটিক লোকটিকে দেখছিল। ভবেন গোস্বামীর ওপর সে অসমুদ্র ছিল এবং আগন্তকের সঙ্গে ভবেন খারাপ ব্যবহার করেছে বলে তার মনে হল একটু ভাল ব্যবহার করা দরকার। সে বলল, “আপনার নাম জানতে পারি?”

“সূর্য সেনগুপ্ত। আচ্ছা উনি আমার ওপর অসমুদ্র হলেন কেন?”

ফটিক মাথা নাড়ল, “না না। ওঁর কথা বলার ধরন ওই রকম। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। দোকানে বসে কথা বলা যাবে।”

ফটিক দোকানের দিকে এগোলো। সে লক্ষ্য করেছে একটু আগে যে বাসটা এসেছিল তার কোনও যাত্রীই পান বা সিগারেটের জন্য তার দোকানে পা দেয়নি। অথচ গতকালই সে প্রচুর পরিমাণে সিগারেট শহর থেকে আনিয়েছে। তার মনে হল ভবেন গোস্বামী খুব অপয়া মানুষ। আজ সারাদিনই বিক্রি খারাপ হবে। এখন এই নতুন লোকটাকে দোকানের সামনে বসালে যদি ভবেনের প্রভাব কাটানো যায় সেই আশায় দোকানের সামনে মাটিতে পোতা ঝাঁশের বেঞ্চিতে সে যত্ন করে নবাগতকে বসাল। তারপর চায়ের দোকানদারকে ধকুম করল এক কাপ চা পৌঁছে দিয়ে যেতে।

জুত করে বসে ফটিক জিজ্ঞেস করল, “আপনার বাড়ি কোথায়?”

“একসময় পূর্ববঙ্গে ছিল। দেশভাগের পর এখানে-ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছি।”

“কোন জেলা?”

“ঢাকা, বিক্রমপুর।” সূর্য সেনগুপ্ত জবাব দিল।

ফটিকের মুখে হাসি ফুটল। উচ্ছ্বসিত গলায় সে জানাল তারও দেশ বিক্রমপুরে। অবশ্য ভাগাভাগির অনেক আগেই সে এখানে চলে এসেছিল এক বন্ধুর পরামর্শে। এসেছিল বলেই চৌমাথায় গুছিয়ে বসতে পেরেছে। ৫-৫ করে সহজপূরের জমিজায়গার দাম বাড়ছে। তবে তাকে সাহায্য করেছিলেন বলরাম মুখার্জি। যাকে বলে দেবতুল্য লোক, ঠিক তাই। স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্টও উনি। ফটিক পরামর্শ দিল, “আপনি সোজা বলরাম মুখার্জির বাড়িতে চলে যান। উনি হ্যাঁ বললে সেটা আর না হবে না।”

চা শেষ করে সূর্য উঠে দাঁড়াতেই ফটিক বলল, “তা একদিনে কথা পাকা নাও হতে পারে, সেফেদ্রে থাকা হবে কোথায়? সহজপূরে তো হোটেল-কোটেল নেই।”

“ওসব না ভেবেই চলে এসেছি।” সূর্য হাসল।

“ঠিক আছে। ঘুরে আসুন। আমার গরিবখানায় নাহয় ক’দিন মাথা গুঁজবেন। কষ্ট হবে কিন্তু।”

সূর্য মাথা নাড়ল, “ভালবেসে কেউ যদি কিছু দেয়, তা যতই সামান্য হোক, আমার কাছে অসামান্য। তাহলে আমার বাগ্গটা এখানে রইল।”

“দোকানের ভেতর ভুলে দিন।”

সূর্য চলে গেলে ফটিকের মনে হল, কাজটা ঠিক হল না বোধ হয়। প্রথমত, উটকো লোক, যেচে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আবার কোনও বিপদ না হয়! তার ওপর ভবেন গোস্বামী কীভাবে ব্যাপারটাকে নেবেন তাও চিন্তার বিষয়। সূর্যকে যে তিনি পছন্দ করেননি তা স্পষ্ট বোঝা গেল। কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যে এসব চিন্তা করার সুযোগ ফটিক পেল না। দূর-দূরান্তের বাস এসে খামছে আর যাত্রীরা পটাপট সিগারেট আর পান কিনছে। গতকাল সারাদিনে যা বিক্রি হয়নি তা এক ঘণ্টায় হয়ে গেল। একটু হালকা হতেই ফটিকের মনে হল সূর্য তার পক্ষে খুব পয়া। এই লোকটা থাকলে তার ব্যবসা আরও বাড়বে।

সহরপুরের শাশানে মাঝে মাঝে একটা সাধু এসে বসে। ক’দিন থাকে। কাউকে শেকড় অথবা পাথর দেয় না, ভবিষ্যদ্বাণীও করে না। বলে, ফল যদি চাও তা হলে কর্ম করো। কর্ম করবে না অথচ ফলভোগ করবে, তা কী হয়! পাথর গয়না করে পরলেই যদি ভাগ্য খুলে যায়, তা হলে তো সবার ফিরত! আসলে মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু হল মানুষ। তেমনই সবচেয়ে নিষ্ঠুর শত্রুও মানুষ। খারাপ মানুষের সংস্পর্শে যাও, তুমি শেষ হয়ে যাবে। আরও কোনও কোনও মানুষের সংস্পর্শে এলে দেখবে তোমার ভাল হচ্ছে। এরা হীরে-চুনি-পাম্মার চেয়েও দামী। ফটিকের মনে হল, সূর্য তার কাছে সেইরকম মানুষ। মনে হওয়ায়ই আর-একটা বাস পৌঁছালো চৌমাথায়। সঙ্গে-সঙ্গে যাত্রীদের ক’জন নেমে এল তার দোকানে, বললে, পান দিন খয়ের ছাড়া। একটা সিগারেট সেধি ভাই। ফটিকের হাত চলতে লাগল।

এখানে রোজ মজ পাওয়া যায় না। ডিম নিয়ে যেতে হবে। নইলে সূর্যর খেতে অসুবিধে হবে।

কাঠের গেটের ওপাশে যে ন্যাড়া জমি, সেখানে দুটো ছেলে উবু হয়ে বসেছিল। আঙুলে মার্বেল নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে অন্যের মার্বেলকে আঘাত করবে বলে যে প্রস্তুত, তার মুখটি ভারি মিষ্টি। সূর্য চূপচাপ লক্ষ্য করছিল। প্রায় বারো ফুট দূরত্বে গিয়ে ছেলেটির মার্বেল লক্ষ্যবস্তু স্পর্শ করতে পারল না মাত্র এক চুলের জন্য। ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, “ধূস!” তারপর গেটের দিকে তাকিয়ে কপালে ভাঁজ ফেলল।

সূর্য হাসল, “এদিকে এসো।”

“না।” ছেলেটি দ্রুত মাথা নড়ল।

“না কেন!” সূর্য অবাক।

“আপনি যে বাজে লোক না, তার প্রমাণ কী? এখানে কী দরকার?”

সূর্য জিজ্ঞেস করল, “এটা তোমাকে কে শিখিয়েছেন?”

“মা।”

“মাকে তুমি খুব ভালোবাসো, তাই না?”

“কী কথা! মাকে কে না ভালবাসে! আপনি কাকে চান?”

“বলরাম মুখার্জি। তোমার কে হন উনি?”

ছেলেটি তার সঙ্গীকে বলল, “আই বাপি, ওঁকে দাদুর কাছে নিয়ে যা তো।”

বাপি শরীর বেকাল, “তোর দাদু, তুই যা।”

“তাহলে ওলিতে হাত দিবি না। আচ্ছা, আমি দাগ দিয়ে যাচ্ছি।” ছেলেটি দৌড়ে দুটো মার্বেলের চারপাশে বৃত্ত ঐঁকে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে বাপি বলে উঠল, “আমি তোমার সঙ্গে খেলব না। তুই আমাকে অবিশ্বাস করেছিস, চোদ্দো ভেবেছিস—তোমার সঙ্গে কখনও খেলব না।”

“আরে, আমি কখন তোকে চোদ্দো ভাবলাম?”

‘তা হলে তুই বৃত্ত আঁকলি কেন? যাতে আমি ওলির জায়গা পালটাতে না পারি, তাই তো? একে কি সন্দেহ করা বলে না? আপনি বলুন!’ বাপি সূর্যর দিকে তাকাল।

সূর্য ফাঁপরে পড়ল, “আমি এই খেলার নিয়মকানুন ঠিক জানি না, তবে ফ্রেন্ডলি খেলায় দাগ না দেওয়াই উচিত ছিল।”

“কোনটা উচিত সেটা আমি বুঝব। না খেলিস না খেলিস, আমি একাই খেলব। অস্তু কাউকে পরোয়া করে না।” বলতে বলতে সে নিজের গুলির সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে বাপি হনহনিয়ে গেট খুলে বেরিয়ে গেল।

সূর্য দেখল অস্তু এমন ভাব করে আবার মার্বেল তার আঙুলে তুলে টিপ করছে যেন কিছুই হয়নি। এবার ওলিটা লক্ষ্যে আঘাত করতাই অস্তুর মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল, “হেরে যাবে বুঝে ভয় পেয়ে পালান!” তারপর বড় বড় পা ফেলে থিডকি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। একটু বাদেই সামনের দরজা খুলে কাছের লোক বেরিয়ে এল। সূর্য তাকে জানাল বলরামবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বলরামবাবু নামলেন প্রায় আধঘণ্টা পরে। এতটা সময় বাইরের ঘরের বেক্ষিতে সূর্য একা বসে ছিল না। সে এ-ঘরে ঢোকান পর আরও তিনজন এসেছেন। তাঁরা স্থানীয় বাসিন্দা। পরস্পরকে চেনেন। যে আলোচনা চলছিল তা থেকে বোঝা গেল, বলরামবাবুর সব ভাল কিন্তু রাত জেগে বই পড়া আর বেলা করে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস উনি কখনও ছাড়তে পারবেন না। প্রতি রাতে তাঁর একটা করে বই চাই। এত বই মানুষটা কোথায় রাখেন তা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা চলল। সূর্য বুঝতে পারছিল, তাকে নিয়ে তিনজন কৌতূহলী হয়ে পড়েছেন। সে যে সহজপূরে নবাগত, এ বিষয়ে ওঁরা নিঃসন্দেহ।

বলরামবাবুর বয়স হয়েছে। কিন্তু এখনও তিনি সোজা। ফর্সা, মোটামোটা, পাকা চুলের মানুষটি ঘরে ঢুকে বললেন, “নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখিনি আপনাদের।”

তিনজনের একজন দৃষ্টি মাথা নাড়ল, “না না, এ কিছু নয়। কাল কত রাতে ঘুমোলে?”

“তিনটে কুড়ি। শেষটা জমল না। কোথা হতে কী হল বোঝা গেল না, গল্পের গোরু সোজা উঠে গেল! মোহন সিরিজ আর পড়া যাচ্ছে না।” চেয়ারে বসলেন বলরামবাবু।

সূর্য হেসে ফেলল শব্দ করে। এবং সেটা ঠিক হয়নি বুঝে গভীর হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ।

“হাসির কী হল?” বলরামবাবু বিরক্ত হলেন।

“দস্যু মোহন, মানে মোহন সিরিজ আপনি নিয়মিত পড়েন?”

“হ্যাঁ। সবকটা আছে আমার কাছে। কেন, পড়া কি অপরাধ?”

“অপরাধ নয়, তবে সময়ের অপচয়। এই যেমন এখন মনে হচ্ছে আপনার!”

“তা হোক। আমি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়তে ভালবাসি। হেমন, দীনের থেকে স্বপনকুমার পর্যন্ত সব পড়ি। নীহার গুপ্ত, শরদিন্দু—কেউ বাদ নেই। তবু মোহন সিরিজের শুরুতে একটা চনমনে ভাব থাকে, যা অস্বীকার করা যায় না।” বলরামবাবু বললেন।

“আপনি শার্লক হোমস পড়েছেন?”

“না।”

সূর্য তার ব্যাগ থেকে একটা পেপারব্যাগ বের করে টেবিলে রাখল। বলরাম ছৌঁ মেরে বই তুলে বললেন, “এ তো ইংরেজিতে লেখা! ইংরেজি বই পড়া আমার পোয়াবে না।”

সূর্য মাথা নাড়ল, “আপনি একটু কষ্ট করে পড়া শুরু করুন, দেখবেন ছাড়তে পারছেন না। তখন এক সমুদ্রের স্বপ্নান পেয়ে যাবেন।”

প্রস্তাবটা মনঃপূত হচ্ছিল না বলরামবাবুর। তিনি অশিক্ষিত নন, কিন্তু কখনই ইংরেজি গল্প-উপন্যাস পড়েননি। এর কারণ ইংরেজি বিদ্বেষ নয়, শ্রেফ ইচ্ছে হয়নি, তাই। এখন পাতা ওলটাতে লাগলেন। এই সময় ওপাশে বসা তিন ভদ্রলোকের একজন বললেন, “আমরা তিনজন একই উদ্দেশ্যে এসেছি।”

“বলুন!” বই বন্ধ করে বললেন বলরামবাবু।

“আমাদের তিনজনের ছেল পরস্পরের বন্ধু, আপনি তো জানেন। পূজোর সময়, থিয়েটারের সময় কী পরিমাণ খাটাখাটি করে তা সবাই জানে। ওদের একটা হিম্মে করে দিন।”

“কী বলতে চাইছেন একটু পরিষ্কার করে বলুন।”

“এই যে লাস্ট মিটিং—এ ঠিক হল, রবিবারের হাটে যারা দোকান দেবে তাদের কাছ থেকে কর তোলা হবে। সহজপূরে কোনও মিউনিসিপ্যালিটি নেই, আছে উন্নয়ন পরিষদ। তার আবার কোনও কর্মচারী নেই। কর তুলতে তো লোক দরকার হবে। তাই বলেছিলাম ওদের যদি সেই কাজে লাগানো যায়!”

“খুব ভাল কথা। কিন্তু ওরা তো এখনও পড়ছে। বীরপাড়ার স্কুলে যায়।”

দ্বিতীয়জন বললেন, “আর স্কুল! ক্লাস নাইনেই দু-বছর হয়ে গেল। তা ছাড়া রবিবারে তো স্কুল থাকে না। এখন থেকে রোজগার শুরু করুক। ভবেন গোস্বামী তার নিজের লোক চোকাতে চাইছে, তাই আগেভাগে আপনাকে বলতে এলাম।”

“কিন্তু এসব তো প্রস্তাব পর্যায়ে আছে। আমরা ছেলেশাসকের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। তিনি যদি অনুমোদন করেন, তাহলেই লোক নিয়োগ করা হবে। ঠিক আছে, আপনারা বলে গেলেন, আমি শুনলাম, ঠিক সময়ে আপনাদের কথা উন্নয়ন পরিষদে বলব।”

বলরামবাবুর ওই কথায় তিনজন যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন। এই সময় ভেতর থেকে কাজের লোক চা নিয়ে এল। সঙ্গে বিস্কুট। তিনজন কথা না বলে সেগুলো ধ্বংস করতে লাগলেন। বলরামবাবু বললেন, “আপনি খান!”

সূর্য বলল, “আমি একটু আগে চা খেয়েছি।”

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলরামবাবুর যেন মনে পড়ল, “আপনাকে তো আগে দেখিনি!”

“না। আমি এখানে একটু আগে এসেছি। এসে শুনলাম আপনি এখানকার স্কুলের প্রেসিডেন্ট। তাই আপনার কাছে আবেদন নিয়ে এসেছি।” সূর্য স্পষ্ট গলায় বলল। বলরামবাবু কোনও কথা না বলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

সূর্য বলল, “শুনলাম আপনারা স্কুলটাকে বাড়াতে চান। আমি এখানে শিক্ষকতা করার সুযোগ চাইছি। আমি একজন গ্র্যাডুয়েট। বাংলায় স্নাতক।” সে ব্যাগ থেকে কিছু কাগজপত্র বের করে সামনে রাখল, “এগুলোতে আমার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য আছে।”

বলরামবাবু কাগজগুলোতে চোখ বোলালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি এখানে আদ্র এসেছেন বললেন, থাকবেন কোথায়? মাস্টারমশাইদের জন্যে আমরা কোনও বাসা দিতে পারব না!”

“একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এত ভদ্রলোকেরা এখানে থাকেন...।”

“দেখুন, আপনি আগামীকাল সকাল দশটায় স্কুলে আসুন।”

“অনেক ধন্যবাদ।” সূর্য উঠে দাঁড়াল।

“আপনার বইটা!” বলরামবাবু এগিয়ে দিলেন।

“ওটা আদ্র রাত্রে পড়ে দেখুন না। ভাল না লাগলে কাল আপনার সঙ্গে দেখা তো হচ্ছেই।”

॥ ৩ ॥

ফটিকের বাড়িটা সহজপুরের একপ্রান্তে। সেখান থেকেই জঙ্গলের শুরু। আদ্র থেকে তিরিশ বছর আগে ওই অঞ্চলে কোনও মানুষের বাস ছিল না। দেশভাগের পর যাঁরা এসেছেন তাঁরাই বাড়ি করেছেন। তবু বিস্তার জঙ্গল রয়েছে উত্তরে। বাড়িটা কাঠের। এই অঞ্চলের কাঠ সস্তা। নীচে একটা রান্নাঘর আর ভাঁড়ারঘর। সেখানে ফটিকের দোকানের জিনিসপত্রও থাকে। ওদের দুটো শোওয়ার ঘর। ফটিকের মা এখনও সক্ষম। তিনিই রান্না করেন। দুপুরের খাবার থালায় সাজিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে ওদের খাওয়া দেখছিলেন। ছেলে সম্পূর্ণ অজানা একজনকে বাড়িতে ধরে এনে খাওয়াচ্ছে বলে তিনি একটুও অবাক হননি। বরং নবাগতর খাওয়ার ধরন দেখে মনে হয়েছে রান্না ওর ভাল লেগেছে, আর এতে তিনি খুশিই হয়েছে।

খাওয়া প্রায় শেষ করে ফটিক জিজ্ঞেস করল, “মায়ের রান্না কীরকম লাগল?”

সূর্য চোখ বন্ধ করে ডিম চিবোতে চিবোতে বলল, “অমৃত।”

ফটিকের মা বললেন, “কিছুই তো করিনি বাবা! বাড়িতে কে আছেন?”

সূর্য চোখ খুলল, “কেউ নেই মা। ছেচমিশের দামায় সবাইকে হারিয়েছি আমি। খুব ভেঙে পড়েছিলাম সে-সময়, তারপর মনে হল পৃথিবীতে এত মানুষ, আমি তো একা নই। ওই অবস্থায় পড়াশোনা শেষ করলাম। তারপর—।” সূর্য ঠোট কামড়াল।

“খাক। প্রত্যেকেরই তো এক অবস্থা। কেন যে দেশভাগ হল! ভূমিজমা, পুকুর, ভিটে সব ছেড়ে ওই

ফটিকের কাছে চলে এলাম আমি। কয়েকজন রাজনীতি করে, আর সাধারণ মানুষ তার শিকার হয়।” ফটিকের মা বললেন।

“কিন্তু জানো মা, সূর্য আসার পর আমার দোকানের বিক্রি বেড়ে গেছে। ও খুব পয়া আমার কাছে। আমি ওকে চাকরির জন্যে বলরামবাবুর কাছে যেতে বলেছিলাম, যা গুনলাম তাতে মনে হচ্ছে ওর চাকরিটা হয়ে যাবে।”

সূর্য আপত্তি করল, “উনি কিন্তু একটুও ভরসা দেননি!”

ফটিক মাথা নাড়ল, “আমার কথা মিলিয়ে দাখো। আচ্ছা তুমি তা হলে বিশ্রাম করো, আমি গিয়ে দোকান খুলি। রাত আটটায় দোকান বন্ধ করে ফিরব।”

“আমি বিশ্রাম করব মানে?”

“তুমি আর কোথায় যাবে? এখানে তো কাউকে চেনো না! কাল সকালে স্কুলে যেতে হলে আঙ এখানেই থাকতে হবে। আমাদের এখানেই না হয় থাকো।” ফটিক উঠে পড়ল।

ফটিকের মা বললেন, “ঠিকই তো। তুমি আবার কোথায় যাবে? ফটিক আমার সঙ্গে শোয়, ওই খালি ঘরে তুমি থাকলে কোনও অসুবিধে হবে না।”

ভবেন গোস্বামী বললেন, “কুছু পার্টিফিকেট দেখলে চলবে না। লোকটার স্বভাব-চরিত্র কীরকম, তাও জানতে হবে। যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে ভারতবর্ষে ওর কোনও ঘরবাড়ি নেই। যাকে বলে একেবারে উটকো, তাই। এই সূর্য সেনগুপ্ত কি ভারতবর্ষের নাগরিক?”

চিন্তা পাল জিজ্ঞেস করলেন, “বাঙালি যখন, তখন তো নাগরিকই হবেন।”

“দূর মশাই। বাঙালিরা তো পূর্ব পাকিস্তানেও থাকে। এমন হতে পারে, লোকটা এখনও এখানকার নাগরিকত্ব পায়নি? পাকিস্তানের স্পাই!” পান মুখে দিলেন ভবেন গোস্বামী।

হরিপদ সাহা প্রতিবাদ করলেন, “এ কেমন কথা! আমি আটচল্লিশ সালে এসেছি এদেশে, আমার কাছে কোনও প্রমাণ নেই যাতে নিজেকে নাগরিক বলতে পারি!”

“আপনি বাহ্যিক সালে ভোট দেননি?”

“না। তখন ভোটের লিস্টে আমার নাম ওঠেনি।”

“ডেপুটারাস ব্যাপার!”

চিন্তা পাল বললেন, “কলেনির সকলের একই অবস্থা। আপনাদের ওই ভোটের লিস্ট হয়েছিল অনেক আগে। তাই বলে আমরা ভারতীয় নই, আপনি বলতে পারেন না।”

বলরামবাবু চূপচাপ গুনছিলেন। এবার বললেন, “ভবেনবাবু, পূর্ব পাকিস্তান থেকে এখনও অনেক মানুষ এদেশে আসছেন। ভারত সরকার সেটা মেনে নিয়েছেন। এটা জাতীয় সমস্যা হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনি দেখুন ভদ্রলোকের যোগ্যতা আছে কিনা। কথা বলে মনে হয়েছে উনি শিক্ষিত, রুচিসম্পন্ন। আপনারা ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। সহজপূরের ছেলেমেয়েদের জন্যে ওঁর মতন মানুষ দরকার বলে আমি মনে করি।” কথা শেষ করে বলরামবাবু একজনকে নির্দেশ দিলেন সূর্যকে ডেকে আনতে।

নতুন তৈরি স্কুলভবনের হেডমাস্টারের ঘরে সভা বসেছিল। কমিটির সমস্ত সদস্যদের সঙ্গে বর্তমান হেডমাস্টার দিনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও চূপচাপ বসেছিলেন। তাঁকে সহজপূরের মানুষ দিনুমাস্টার বলে ডাকে। বয়স হয়েছে ঢের। কিন্তু তাঁর প্রতি এখানকার মানুষের শ্রদ্ধা রয়েছে বলেই তিনি এখনও আছেন।

সূর্য ঘরে ঢুকে সবাইকে নমস্কার করল। ভবেন গোস্বামী জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি ভারতীয়?”

“নিশ্চয়ই।”

“তার কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন?”

“না। এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মতো আমার কাছেও কোনও কাগজ নেই।”

বলরামবাবু এবার কথা বললেন, “প্রশ্ন উঠছে আপনার পরিচিতি নিয়ে। আপনার অতীত পরীক্ষা করার কোনও উপায় আমাদের নেই। স্কুলে যেসব শিশু আপনার সংস্পর্শে আসবে তাদের পিতামাতার কাছে আমরা কী কৈফিয়ত দেব, যদি আপনার কাজকর্ম খারাপ হয়?”

“আমাকে তখন বরখাস্ত করবেন আপনারা।”

“বেশ। আপনি কীরকম মাইনে আশা করছেন?”

“জীবনধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন, তার বেশি আমি চাই না।”

“আপনি তো আবার বইপত্র কেনেন, সেটাও আপনার জীবনধারণের অঙ্গ। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ইনি শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, স্কুলের হেডমাস্টারমশাই। আমাদের স্কুল এখনও প্রাইমারি পর্যায়ে আছে। তবে এ-বছর ছাত্রসংখ্যা প্রায় সত্তর হবে বলে মনে হচ্ছে। আপনাকে আমরা সাময়িকভাবে শিক্ষকপদে নিয়োগ করছি। হেডমাস্টারমশাই যদি আপনার কাজে সন্তুষ্ট হন, তাহলে ছ’মাস পরে আপনি পাকাপাকিভাবে বহাল হবেন। আপাতত আপনি মাসে পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক হিসেবে পাবেন। যদি রাজি থাকেন তাহলে একটু পরে হেডমাস্টারমশাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।” বলরামবাবু মাথা নাড়লেন।

ভবেন গোস্বামীর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ব্যাপারটা তিনি পছন্দ করছেন না। সূর্য চলে যাওয়ার আগে জানতে চাইলেন সে সহজপুরে কোথায় উঠেছে। সূর্য উত্তর দিতে ভদ্রলোক খুব অবাক হয়ে গিয়ে বললেন, “ফটিক বাড়িতে হোটেল খুলেছে ধানতাম না তো! বাঃ!”

সূর্য সবিনয়ে বলল, “উনি আমাকে সাময়িক আশ্রয় দিয়েছেন, হোটেল খোলেননি।”

আজ স্কুল কোনও কারণে বন্ধ। বহিরে বেরিয়ে এসে সূর্য একাই দাঁড়িয়েছিল। নতুন স্কুলবাড়িতে মোট চারটে ঘর। সামনে একটা ময়দারি মাঠ। ওপাশে বাড়িঘর রয়েছে, অর্থাৎ স্কুলটা বসতির ভেতরেই। একটু বাদে মিটিং ডেঙে গেল। সন্দেহেরা যে বার মতো বেরিয়ে গেলে সে আবার ঘরে ঢুকে দেখল দিনুমাস্টার সেই একই চেয়ারে বসে আছেন, খরে কেউ নেই।

সূর্য নমস্কার করল, “আমি কাজ করতে চাই হেডমাস্টারমশাই।”

“এ তো খুব আনন্দের কথা। বোসো বাবা।” দিনুমাস্টার মাথা দোললেন।

এই ‘বাবা’ ডাকটা খুব লাগল সূর্যর। দিনুমাস্টার বললেন, “এই স্কুল বড় হচ্ছে, ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে, এটা যে কী আনন্দের খবর তা বোঝাতে পারব না। মুশকিল হল, আমার একার পক্ষে তো সামলানো সম্ভব নয়। মৃত্যিকা আছে অবশ্য, কিন্তু তার বিদ্যে তো বেশি নয়। অবশ্য বিদ্যে থাকলেই হবে না, শিশুদের পড়াতে মমতার দরকার, ধৈর্যের প্রয়োজন। তা তুমি যখন এসে গেছ তখন আমার বল বাড়ল। তবে আমারও বয়স বাড়ছে, ক’দিন পারব জানি না।”

“আপনি এখানেই থাকেন?”

“পাশেই বাড়ি। ওটা অবশ্য বলরামবাবুর বাবা আমাকে দান করেন। অনেককাল আগের কথা। সন্তানাদি নেই, বুড়োবুড়ি থাকি। তোমার প্রিয় কবিতা কী?” আচমকা প্রসঙ্গ পালটালেন দিনুমাস্টার।

সূর্য সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, “চট করে বলা মুশকিল। অনেক কবিতাই একসঙ্গে ভালো লাগে। যেমন সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র।”

“ছাড়পত্র! কবিতাটি বলতে পারবে?”

সূর্য আবৃত্তি করল। দিনুমাস্টার চুপচাপ শুনলেন। শেষ হলে বললেন, “বাঃ, চমৎকার আবৃত্তি করো তো! তা কবিতাটি ভালো, কিন্তু তোমার মনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোনও কবিতা এল না?”

“নিশ্চয়। তবে সুকান্ত সরাসরি যে-কথা বলেছেন তা আমার কাছে অনেক বেশি কাজের। যেসব মানুষ দুর্বল, অত্যাচারিত, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন উনি।”

“কেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেননি, ‘যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো?’”

“হ্যাঁ, লিখেছেন। কিন্তু সেটা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে। আর সুকান্ত লিখেছেন, ‘যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জপ্তান, এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।’ এখানে তিনি কারও কাছে আবেদন করেননি, নিজের কর্তব্য করেছেন।” সূর্য বলল।

দিনুমাস্টার ঝুঁকে বসলেন, “কিন্তু কোনটা বেশি কবিতা হয়েছে?”

সূর্য স্বীকার করল, “রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন, অবশ্যই।”

দিনুমাস্টারের মুখে হাসি ফুটল, “বাঃ!”

দিনুমাস্টারকে ভাল লাগল সূর্যর। পুরনো ঘরানার মানুষ। ওঁর সময়ে যা ভাল সব আয়ত্ত করেছেন, যদিও এই সময়ের সঙ্গে ঠিক ভাল রাখতে পারেন না। একটু বাদে যুথিকা এল। তিনজনে মিলে ঠিক হল কীভাবে ক্লাস নেওয়া হবে। পড়ানোর বিষয় ঠিক হল। দেখা গেল দিনুমাস্টার সূর্যর কোনও প্রস্তাবেই আপত্তি করছেন না।

সূর্য চলে গেলে যুথিকা তাঁকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি হাসলেন, “ওরা নতুন যুগের খবর নিয়ে এসেছে, ওদের কথা ভো শোনা দরকার! তা ছাড়া ছেলোটো যা বলছে তা ভো আমার ভালই লাগছে। প্রত্যেকদিন স্কুল গুরুর আগে সবাই মিলে প্রার্থনাসঙ্গীত গাওয়া উচিত।”

“তা হলে কী গান গাওয়া হবে তা আপনি ঠিক করুন।”

দিনুমাস্টার মাথা নাড়লেন, “গানের ব্যাপারে আমার ধারণা বড় কম যুথিকা। তোমরা ভো গাওটাও, পাচজনের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করো। তবে ব্যাপারটা কিন্তু খুব ভাল।”

দুপুরে যেতে এসে ফটিক খবরটা পেয়ে খুব খুশি। তার ধারণা, সূর্য বলরামবাবুর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছিল বলে চাকরিটা হল। পঞ্চাশ টাকা মাইনে হিসেবে এমন কিছু নয়, আবার খারাপও বলা যায় না। ফটিক ইন্টারভিউ-এর ব্যাপারে বিশদ জানতে চাইলে সূর্য সবর খুব প্রশংসা করল। দিনুমাস্টারকে তার বেশ ভাল লেগেছে। শুধু ভবেন গোহাঙ্গী তাঁকে কেন স্বাভাবিকভাবে নিতে পারেননি, সেটা মাথায় ঢুকছে না। ভবেন গোহাঙ্গী ফটিক সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা সূর্য ইচ্ছে করেই বলল না। খামোকা ওঁদের সম্পর্ক নষ্ট করে লাভ কী?

ফটিক হেসে বলল, “ভবেননা ওইরকম লোক। প্রথম আলাপের সময় কাউকে ভালভাবে নিতে পারে না। পরে যখন ভাল লেগে যাবে তখন তোমাকে ছাড়া তার চলবে না, দেখো।”

সূর্য ফটিকের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, “এখানে দশ-পনেরো টাকায় ঘর ভাড়া চাই।”

“ও, চাকরি পাওয়ায় রাবলস্বী হওয়ার চিন্তা! খোঁজো, ঘর পেলে চলে যোয়ো, আমার কী।” ফটিক কথাগুলো বলে দোকানে চলে গেল।

সূর্য চুপচাপ জানলা দিয়ে ভঙ্গল দেখল। বাড়িটার পেছন থেকেই ভঙ্গলের গুরু। হঠাৎ ভঙ্গল তাকে আকর্ষণ করতে লাগল।

॥ ৪ ॥

এখন ঠিক বিকেল নয়, আবার দুপুরও বলা চলে না। পিচের যে সরু পথ ভঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সিঁথির মতো চলে গিয়েছে, সেটা ধরেই হাঁটছিল সূর্য। চারপাশে কোনও জনমানব নেই। দু-পাশে গাছে গাছে পাখির আওয়াজ আর মাঝে-মাঝেই ভাল থেকে ডালে লাফিয়ে পড়া বানরের আওয়াজ। ডুয়ার্সের এই ভঙ্গলে হিংস্র প্রাণী থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু দিনের এমন সময়ে তারা লুকিয়েই থাকে।

হঠাৎ একটা চমৎকার পাখি নজরে এল। পাখিটার লেজ সোনালি, শরীরও তাই, শুধু দু-পাশে গাঢ় নীলের ছোপ খানিকটা। সূর্যকে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে ডেকে উঠল পাখিটা। এমন পাখি সে কখনও দ্যাখেনি। সে এগিয়ে যেতে, রাস্তার পাশের গাছ ছেড়ে ওটা উড়ে গেল ভেতরে।

সূর্য একটা পায়ে-চলা-পথ দেখতে পেয়ে পাখিটাকে অনুসরণ করতে লাগল। লেজ বেশ লম্বা বলে স্বচ্ছন্দে উড়ে যেতে অসুবিধে হচ্ছিল পাখিটার। কিন্তু ক্রমশ গাছের মগডালে চলে যাওয়ায় সে সূর্যর কাছ থেকে নিজেই লুকেতে পারল। এখানে গাছ আকাশছোঁয়া লম্বা আর ছাতার মতো পাতায় ভরা ভাল বিছিয়ে এ ওকে ছুঁয়েছে। ফলে মাটিতে সূর্যের আলো পৌঁছয় না। হতশ হয়ে ওপর থেকে চোখ নামিয়ে নিল সূর্য। এবং তখনই তার কানে শব্দ বাজল—ঠক্ ঠক্ ঠক্! ভঙ্গলের মধ্যে এই শব্দ কোনও ভঙ্গল করতে পারে না।

কৌতূহলী হয়ে সূর্য এগোল। পায়ে-চলা-পথটা দিয়ে এবার হাঁটা মুশকিল হয়ে উঠেছে। দু-পাশের বোপঝাড় বেশ ঘন হয়ে পথ আটকাচ্ছে। ক্রমশ শব্দ স্পষ্টতর হল। তারপর ওদের দেখতে পেল সূর্য। একটা বিশাল গাছ পড়ে আছে চিত হয়ে। চারজন লোক তার অনেকটাই কেটে ফেলেছে। সেই গাছ কাটার

আওয়াজই তার কানে গিয়েছে। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে সূর্য ওদের লক্ষ্য করল। চারজন ছাড়া আরও একজন খানিকটা দূরে ছাতি মাথায় দাঁড়িয়ে। লোকটা হাঁক দিল, “হাত চালা, ভালদি। রাতে গাড়ি আসবে। তার মধ্যে যদি কাজ শেষ না হয় তাহলে তোদের জ্যান্ত খেয়ে নেবে!”

শ্রমিকেরা কোনও কথা না বলে কাজ করতে লাগল। সূর্য এতক্ষণ মনে করছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা গাছ কাটছে প্রয়োজনে। এখন মনে হল ব্যাপারটা তা নয়, লোকটার কথার মধ্যে গোপন কিছু করার ভাব স্পষ্ট। ভ্রমের কাঠ কেটে এনে বিক্রি করা বেআইনি কাজ। এরা সেই দলের লোকজন। এখন এদের সামনে যাওয়া ঠিক হবে না। বরং সহজপূরে ফিরে গিয়ে পাঁচজনকে জানিয়ে দেওয়াই ঠিক হবে। সে চুপিচুপি যে পথে ঢুকেছিল সেই পথে ভ্রমল থেকে বেরিয়ে পিচের রাস্তায় ফিরে এল।

এখন প্রায় বিকেল। ছায়া ঘন হয়ে গেছে। সূর্য দ্রুত হাঁটছিল। এই সময় পেছনে গাড়ির আওয়াজ হল। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল একটা কালো অস্টিন গাড়ি উলটোদিক থেকে আসছে। গাড়িটা তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে থেমে গেল। কৌতূহলী হয়ে সূর্য এগিয়ে যেতেই পেছনের সিটে ভবেন গোস্বামীকে দেখতে পেল। ভবেন গোস্বামী ভিক্সেস করলেন, “এই যে মাস্টার, এখানে কী করা হচ্ছে?”

“একটু বেড়াতে এসেছিলাম।” সূর্য বলল।

“খালি হাতে ভ্রমলে বেড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ওঠা হোক।” দরজা খুলে দিলেন ভবেন গোস্বামী। সূর্য এড়াতে পারল না। গাড়ি চলেতে শুরু করলে তিনি বললেন, “কায়দাকানুন তো ভালই জানা আছে, নইলে উটকো লোক হয়েও ফটিকের বাড়িতে জায়গা পাওয়া যায়। বলরামদাকে বই পড়িয়ে চাকরিতে ঢোকা গেল! ভাল, ভাল!”

“আপনি কি আমাকে অপছন্দ করছেন?”

“কে বলল?”

“আমার মনে হচ্ছে।”

“এই মনে হওয়া ব্যাপারটা খুব খারাপ। প্রমাণ ছাড়া কোনও জিনিস বিশ্বাস করা বোকামি। আমার তো বুদ্ধিমানদের খুব ভাল লাগে। তা ভ্রমলে কী দেখা হল?”

সূর্যর মনে হল, ফটিকের কথাই ঠিক। প্রথম আলাপে রুক্ষ মনে হয়। মানুষ ভাল না হলে তাকে ডেকে গাড়িতে তুলবে কেন? সে ভ্রমলের ভেতরে কাঠ কাটা লোকগুলোর খবর ভবেন গোস্বামীকে দিল। শুনে ভবেন চোখ বন্ধ করল, “দ্যাখো ভাই, তোমাকে তুমি বলছি, বয়সে অনেক ছোট। তুমি এখানে নতুন এসেছ, কাউকে চেনো না। তোমার কী দরকার, কোথায় কী হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর? ভ্রমলের ভেতর যদি কেউ লুকিয়ে কোনও অন্যায় করে, তবে সে তৈরি হয়েই নেমেছে, নাকি গলাতে গেলে দেখবে তোমার নাকটাই কাটা যাচ্ছে!”

“কিন্তু এটা অন্যায়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জানতে পারলে—।”

“জানো না, একথা তোমাকে কে বলেছে! ধরো কোনও কনস্ট্রাক্টর আইনসম্মতভাবে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে পচিশটা গাছ কাটার অনুমতি নিল, কিন্তু কাটতে গিয়ে ওরা চল্লিশটা গাছ কাটল। প্রতিবাদ করলে বলবে বাকি পনেরোটা গাছ ওরা কাটেনি, প্রমাণ করো! তারপর ফরেস্টের লোকজনদের তুমি পাছ কোথায়, সহজপূরে তো তাদের অফিস এখনও খোলেনি! উলটে তোমার পেছনে লোক লেগে যাবে!” ভবেন গোস্বামী প্রকৃত অভিভাবকের ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেন।

সূর্য একমুগ্ধ হতে পারছিল না। ততক্ষণে সহজপূরের ভেতরে চলে এসেছে গাড়ি। চৌমাথায় পৌঁছে ফটিকের দোকানের সামনে তাকে নিয়ে গাড়ি থেকে নামলেন ভবেন গোস্বামী। এদের দেখে ফটিক অবাক। ভবেন গোস্বামী বললেন, “ওহে, তোমার অতিথি খালি হতে ভ্রমলে ঘোরাঘুরি করছিল! ওকে বললাম, ব্যাপারটা ঠিক নয়। তোমার উচিত ছিল বুঝিয়ে দেওয়া!”

ফটিক ভিক্সেস করল, “ভ্রমলে গিয়েছিলে নাকি?”

সূর্য উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভবেন গোস্বামী বাধা দিয়ে বললেন, “শুধু যাওয়া নয়, একেবারে ভেতরে গিয়ে চোরাই কাঠ কাটার দেখে এসেছেন!”

সঙ্গে সঙ্গে ফটিকের মুখের চেহারা বদলে গেল। ভবেন গোস্বামী বললেন, “চললাম ভাই। পরে একদিন তোমার সঙ্গে গল্প করা যাবে।”

অস্টিন গাড়িটা চলে গেলে সূর্য দেখল ফটিকের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে যারা একটু আগের কথাগুলো শুনেছে তারা নিজদের মধ্যে গুণগুণ করছে। ফটিক দোকানে বসেই তাকে ডাকল, “এখানে এসো। চা খাবে তো? হরিদা, এক কাপ চা আর একটা নিমকি-বিস্কুট!” শেষের হুকুম চিৎকার করে ওপাশের দোকানদারের উদ্দেশ্যে।

সূর্য বেষ্টিতে বসতেই ফটিক উপস্থিত লোকদের কাছে ওর পরিচয় দিল, “আমাদের স্কুলের নতুন মাস্টার। আমার এখানেই উঠেছে। ভাল লোক।”

“ভাল লোক হলে তোমার ওকে সাবধান করে দেওয়া উচিত।” একজন শ্রোট বললেন।

ফটিক বলল, “ওসব ভঙ্গলে-টঙ্গলে গিয়ে কে কী কাটছে, তোমার দেখার দরকার নেই!”

“তোমরা তাহলে অন্যান্যকে সমর্থন করো?” সূর্য পালটা প্রশ্ন করল।

“আমরা কিছুই করি না। যে যার কাজ নিয়ে থাকাটাই ভাল, বুঝলে? তুমি মাস্টারি করতে এসেছ, মাস্টারি করবে। পুলিশের কাজ করতে যাওয়ার দরকার কী তোমার?”

সূর্য আপত্তি করল, “গাছ কেটে ফেললে মানুষের ক্ষতি হয়। তাছাড়া এখন ছাসলের গাছ হল জাতীয় সম্পত্তি। সেই সম্পত্তি যে চুরি করছে আমরা তার প্রতিবাদ করব না?”

ফটিক অন্য লোকদের দিকে ইঙ্গিত চোখে তাকাল, “এ ছেলেকে নিয়ে কী করি বলো তো? শোনো, যখন জানছ আগুনে হাত দিলে পুড়ে যাবে, তখন তুমি সেটা করবে?”

“না, আগুনটাকে এমনভাবে ব্যবহার করব যাতে তা কাজে লাগে।” সূর্য উঠে পড়ল।

॥ ৫ ॥

সহজপুরের স্কুলের ছাত্ররা এরই মধ্যে খবর পেয়ে গিয়েছিল নতুন মাস্টার এসেছে। এতদিন তারা দিনুমাস্টারের শাসন আর যুথিকা দিদিমণির ধমক শুনে এসেছে। কিন্তু সূর্যকে ক্লাসে ঢুকতে দেখে তাদের অনেকেই অবাক হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি অবাক হল অশ্ব নামের সেই বালক, যে সূর্যকে তাদের বাড়িতে দেখেছিল। চাপাগলায় পাশে বসা বাপিকে সে বলল, “সেই লোকটা রে।”

“কোন লোকটা?”

“খাত্! তুই একটা বোকা!”

সূর্য কচিমুখগুলোর দিকে তাকাল। তারপর হেসে বলল, “তোমাদের সঙ্গে আমার আজ প্রথম দেখা, আমাকে তোমরা কি বলে ডাকবে?”

পেছন থেকে কেউ চোঁচিয়ে উঠল, “নতুন মাস্টারমশাই!”

“ঠিক আছে, তাই ডেকো। এই খাতায় তোমাদের নাম লেখা আছে। আমি সেই নাম ডেকে-ডেকে তোমাদের চিনে নেব।”

সূর্য নাম-ডাকা শুরু করল। প্রতিটি ছেলে যখন সাড়া দিচ্ছে, তখন তার মুখ মনে রাখার চেষ্টা করল। অতীন মুখোপাধ্যায় নামটি পড়ার পর সে চোখ তুলতেই গভীর মুখে অশ্ব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “উপস্থিত।” বলেই বসে পড়ল। সূর্য সেটা লক্ষ্য করল।

নাম-ডাকা শেষ হতে সে গল্প বলার ভঙ্গিতে বলল, “আমরা ভারতবর্ষের মানুষ। আমাদের জাতীয় পতাকার রং তোমরা জানো?”

সবাই একসঙ্গে হ্যাঁ বলে উঠল।

“আমাদের জাতীয় সঙ্গীত মুখস্থ বলতে পারবে ক’জন?”

এবার কয়েকজন হাত তুলল। সূর্য লক্ষ্য করল তাদের মধ্যে অশ্ব আছে। সে অশ্বকে সামনে ডেকে আনল, “শোনো, যারা জাতীয় সঙ্গীত জানো না তাদের খুব শিগগির তা জেনে নেওয়া উচিত। জাতীয় সঙ্গীত হল আমাদের মাতৃমন্ত্র। যে-কোনও দেবদেবীর পূজার মন্ত্রের চেয়ে এর মূল্য অনেক বেশি। অতীন তোমাদের লাইনগুলো বলছে, তোমরা লিখে নাও।”

সূর্য ইশারা করতে অশ্ব জিজ্ঞেস করল, “গান গেয়ে বলব?”

“না, কবিতা করে বলো।”

“তাহলে পারব না। কবিতা মুখস্থ করিনি আমি।”

“চেষ্টা করো। মনে করে বললে ঠিক পারবে।”

অস্তু নিতান্ত অনিচ্ছায় বলতে শুরু করল, কিন্তু তৃতীয় লাইনে আটকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ক্রানসক্রমে হাসির ঘল্লাড় উঠল। সূর্য ডাস্টার ঠুকে তাদের থামাল। তারপর গভীর গলায় বলল, “তোমরা যারা হেসেছ তাদের একজন এখানে চলে এসো। অস্তু যা পারেনি তা তোমরা বলে দাও। যদি কেউ না আসে, তা হলে আমি প্রচণ্ড শান্তি দেব।”

সঙ্গে সঙ্গে সবক’টা মুখ গভীর হয়ে নিম্নমুখী হল। সূর্য বলল, ‘তোমরা কি শান্তি চাও?’

কোনও জবাব কেউ দিল না।

“প্রথম দিন, আমি ফমা করলাম। নিজেরা যা পারো না তা কেউ না পারলে কখনও উপহাস কোরো না। কিন্তু জাতীয় সঙ্গীত না বলতে পারাটা লজ্জার। নিজের মাকে মা বলতে যে ছেলে পারে না, তার মতো হতভাগা কেউ নেই। অস্তু, তুমি তোমার জায়গায় যাও। আমি বলে দিচ্ছি, তোমরা লিখে নাও।” সূর্য হাসল।

জাতীয় সঙ্গীত লেখা শেষ হয়ে গেলে স্নেহ বলল, “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট বাহ্যিক লাইনে যে কবিতা লিখেছিলেন তার প্রথম সাতটি লাইন নিয়ে আমাদের জাতীয় সঙ্গীত তৈরি হয়েছে, জাতীয় সঙ্গীত আমাদের জীবন। মনে থাকবে?”

সেদিন সহজপুরের ছেলেমেয়েরা অস্তুত আনন্দে বাড়ি ফিরল। তারা এক নতুন মাস্টারকে পেয়েছে, যিনি একদম অন্যরকম। দিনমাস্টার অথবা যুথিকা দিদিমণির সঙ্গে তাঁর কোনও মিল নেই। যিনি সুদীরামের, সূর্য সেনের গল্প বলেন, বালেশ্বরে বাবা যতীনের যুদ্ধের কথা শোনান, যিনি সুভাষ বোসের আবেদন ‘আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব’ ওদের গুনিয়েছেন। সহজপুরের অনেক বালক সেই রাতে তাদের বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখল তারা রিডলবার অথবা বোমা নিয়ে ইংরেজ শাসকদের মারতে ছুটে যাচ্ছে।

স্বপ্ন ভেঙে গেলে অস্তু বিছানা থেকে পা টিপে-টিপে নেমে পড়ার টেবিলে চলে গেল। টেবিলের ভ্রম্যরে রাখা গুলিগুলোর কথা তার খেয়ালে ছিল না। নতুন মাস্টারের বলা লাইনটা সে পড়ল সেজবাবির আলোয়, জননী জন্মভূমিষ্ট স্বর্গদাপি গরীয়সী। সে মুখ ফিরিয়ে ঠাকুরার দিকে তাকাল। ঠাকুরা অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। সে ওঁর সঙ্গে শোয়। মা এবং বাবা অন্য ঘরে। তার খুব কান্না পেল। বিছানায় গিয়ে ঠাকুরাকে জড়িয়ে ধরে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

“আমাদের দুই মা। এক মা, যিনি আমাদের জন্ম দিয়েছেন; আর এক মা, যিনি জন্মাবার পর আমাদের জায়গা দিয়েছেন। এই দ্বিতীয় মায়ের নাম হল জন্মভূমি—যে মাটিতে আমরা জন্মেছি তোমরা নিশ্চয়ই চাও না, তোমাদের মায়ের দুঃখ পান?”

সঙ্গে সঙ্গে গর্জন উঠল, “না।”

“ঠিক তেমনই জন্মভূমির প্রাণ আছে, তাকে কষ্ট দেওয়াও সন্তানের উচিত নয়।”

সূর্য তাকাল। সে লক্ষ্য করল, কচি কচি মুখগুলোতে এবার বিষয় ফুটে উঠেছে। বাপিকে হাত তুলতে দেখল সে। মাথা নাড়তেই বাপি উঠে দাঁড়াল, “জন্মভূমি যদি মাটি হয়, তাহলে মাটির কী করে প্রাণ থাকবে?”

সূর্য বলল, “খুব ভাল প্রশ্ন। আচ্ছা তোমরা তো জানো, গাছের প্রাণ আছে। জানো তো?”

অস্তু উঠে দাঁড়াল, “আমি জানি। গাছ বড় হয়—তার পাতা, ফুল, ফল হয়। পাথরের মতো নয়। তাই উদ্ভিদকে প্রাণী বলা হয়। কিন্তু মাটি তো পাথরের মতো স্থির হয়ে থাকে!”

“থাকে, কিন্তু মাটির সঙ্গে মায়া মিশে থাকে। ধরো তুমি বেশ কিছুদিনের জন্যে কোথাও বেড়াতে গেলে, হঠাৎ তোমার মন-কেমন করতে লাগল। ইচ্ছে হল তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে নিজের জায়গায়। সেই জায়গার গাছপালা, মাঠ, ঘর-বাড়ি, নদীর কথা মনে পড়তে লাগল। তুমি ফিরে এসে যেই সেখানকার মাটিতে পা রাখলে, তমনি মনে হল নিজের জায়গায় এলে। তা হলে যে তোমাকে টানে, যার জন্যে তুমি

টান অনুভব করা, তার নিশ্চয়ই প্রাণ আছে। এই প্রাণ চোখে দেখা যায় না, অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম তোমরা কি শুনেছ?"

অস্তু, বাপি একসঙ্গে বলে উঠল, "ছবি দেখেছি। বুড়ো, পাকা দাড়ি।"

সূর্য হেসে ফেলল, "উনি একজন মহান মানুষ ছিলেন। এই যে আমরা বাংলাভাষায় কথা বলি তার জন্মদাতা যদি বিদ্যাসাগর, তা হলে রবীন্দ্রনাথ তাকে বড় করেছেন। উনি কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস লিখেছেন আমাদের জন্যে, তোমাদের জন্যে। ওঁর কোনও কবিতা তোমরা পড়েনি?"

সবাই চুপচাপ। আগ্রহ প্রত্যেকের, কারণ এর আগে কেউ ওদের এভাবে ক্লাস নেননি!

সূর্য বলল, "আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে-বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে।"

সঙ্গে সঙ্গে অস্তুর মনে পড়ে গেল, এই কবিতা সে বাড়িতে মুখে মুখে শুনে মুখস্থ করেছিল কিছুদিন আগে! মা তাকে অনেক ছড়া এবং কবিতা মুখস্থ করাতেন একসময়। মনে পড়ে যাওয়ায় সে বাকিটা গড়গড়িয়ে বলে যেতে লাগল।

কিছুক্ষণ শোনার পর সূর্য তাকে থামতে ইঙ্গিত করে বলল, "বাঃ! এই তো জানো, অথচ কবিতাটা কার লেখা তা জানতে চাওনি কেন? হ্যাঁ, এই মল্লিকবি লিখেছেন, 'ও আমার দেশের মাটি তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা'। তিনি দেশ, তাঁর জন্মভূমিকে মারের চেহারা কল্পনা করেছিলেন। আমরা যেমন নিজের মাকে প্রণাম করি, তেমনি তিনি দেশকে মা গল্পে প্রণাম করেছেন। যে-কোনও মানুষের সেটাই করা উচিত। ইংরেজরা দুশো বছর আমাদের মাকে বলী করে রেখেছিল। সেই মাকে বিদেশীদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা শহিদ হয়েছেন। তোমরা বড় হলে ফুদিরাম, বাবা যতীন, সূর্য সেন, সুভাষচন্দ্রের কাহিনী পড়বে এবং জানবে, কী করে তাঁরা নিজের উৎসর্গ করেছিলেন দেশ-মায়ের পায়ে। তোমরা কি কখনও 'বন্দে মাতরম্' শুনেছ?"

সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসরুম কাঁপিয়ে ধ্বনি উঠল, "হ্যাঁ।"

"সাহিত্যসভাট বন্ধিমচন্দ্র দেশমাতাকে বন্দনা করে যে গান লিখেছিলেন তার শুরু হয়েছিল বন্দে মাতরম্ দিয়ে। বন্দে মাতরম্ মানে মাকে প্রণাম।"

স্কুল ছুটি হয়ে গেলে সূর্য দিনুমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখল সেখানে ভবেন গোস্বামী বসে আছেন। দিনুমাস্টার বললেন, "ছাত্ররা দেখছি তোমার খুব ন্যাওটা হয়ে পড়েছে।"

সূর্য জবাব দিল না, একটু হাসল মাত্র।

ভবেন গোস্বামী বললেন, "আপনার পড়ানো শুনছিলাম। ইংরেজ আমল হলে বিপ্লব প্রচার করছেন বলে এতক্ষণে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যেত। তা আমি বলি কি, ওইসব কটি-কটি মাথায় রাজনীতি না চুকিয়ে যোগ, বিরোধ, গুণ, ভাগ শেখানোই উচিত, কি বলেন মাস্টারমশাই?"

"অল্প ওদের শেখানো হয়।" দিনুমাস্টার জবাব দিলেন, "আর সূর্য যেটা করছে সেটা তো ভালই। আমরা যে দেশের মানুষ সেই দেশ সম্পর্কে কিছু না জেনে বড় হওয়া তো জড়-জানোয়ারের শামিল! আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী শিশুদের জানা দরকার।"

"সে আপনারা দু-এক কথায় গান্ধীজীর গল্পো শুনিতে দেবেন, তাতেই হয়ে যাবে। জাতির জনক বলে কথা! আমাদের রুদ্রপতি, প্রধানমন্ত্রী হলেন গান্ধীজীর সাক্ষাৎ শিষ্য। যাক গে, আপনি আজ সন্ধেবেলায় আমার বাড়িতে আসুন।"

"আমি?" সূর্য অবাক হল।

"হ্যাঁ। আমি ভাইপোকে দিয়ে খবর পাঠাতে পারতাম কিন্তু ভাবলাম নিজেই বলে যাই। আচ্ছা, চলি।" ভবেন গোস্বামী প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

সূর্য ভ্রিঙ্গেস করল, "কি ব্যাপার বলুন তো?"

'আমি জানি না বাবা। সহজপুরের সব মানুষকে আমি বুঝতে পারি, শুধু একে—।'

'ওঁর ভাইপো কে?'

"শিবনাথ। তাকে দ্যাখানি?"

সূর্য মাথা নেড়ে না বলতে দিনুমান্টার দরজায় উকিঝুঁকি মারা ছেলের দলের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়লেন, “এই দ্যাখ তো শিবনাথ আছে কিনা, থাকলে ডেকে আন।”

দলটাকে পেছনে রেখে শিবনাথ এল। ওইটুকুনি ছেলের মুখচোখের ভাব বড়দের মতন। সূর্যর মনে পড়ল না একে। অবশ্য এই ক’দিনে সব ছাত্রকে সে চিনে ওঠেনি।

“আমাকে ডেকেছেন?” শিবনাথ দিনুমান্টারের সামনে দাঁড়াল।

দিনুমান্টার ভিজ্জেস করলেন, “পড়াশোনা কেমন হচ্ছে বাবা?”

“হচ্ছে না।” চটজলদি জবাব এল।

“সে কি!”

“আমার মাথায় গোবর পোরা আছে, কিছু ঢুকছে না।”

“আহা, তা বললে কি চলে। গোবর বের করতে হবে।”

“জ্যাঠা গোবর পরিষ্কার করার লোক ডেকেছে, দেখি।”

“সে আবার কে?”

“জ্যাঠা তো এসেছিল স্কুলে। যাওয়ার সময় আমায় বলে গেল, আজ থেকে লোক রাখছি, তোর মাথা একেবারে সাফ করে দেবে। আমাকে ডেকেছেন কেন?”

“ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোমার?”

সূর্যর দিকে তাকাল শিবনাথ। তারপর বলল, “আজ সন্ধ্যাবেলায় করে নেব। যাচ্ছি।” দলবল নিয়ে যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল সে।

দিনুমান্টার মাথা নড়ালেন, “আমার খুব সৌভাগ্য, এরকম ছেলে স্কুলে আর কেউ নেই।”

সূর্য বলল, “ভবেনবাবু কি একে পড়ানোর জন্যে আমাকে বাড়িতে যেতে বললেন?”

“তাই মনে হচ্ছে। তবে কাজটা নিলে তোমার রোজগার মন্দ হবে না। তার ওপর ভালমন্দ খাবার পাবে। উনি মানুষকে খাওয়াতে ভালবাসেন।”

“কিন্তু মান্টারমশাই, আমি তো টিউশনি করব না।”

“সে কি? কেন?”

“যেসব ছাত্রকে আমি স্কুলে পড়াব, তাদের বাড়িতে গিয়ে টাকা নিয়ে পড়াব না। আমি তাদের ভালভাবে পড়াব বলে মাইনে নিচ্ছি, আবার বাড়িতে গিয়ে পড়িয়ে টাকা নেওয়া মানে আমি নিশ্চয়ই স্কুলে ফাঁকি দিচ্ছি। এমন কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।” সূর্য দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ল।

দিনুমান্টার যেন অদ্ভুত কিছু দর্শন করছেন এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিলেন। শেষ পর্যন্ত বললেন, “ধন্য। তুমি ধন্য সূর্য। যে আদর্শের কথা এককালে শুনতাম, তোমার মধ্যে তার প্রতিফলন দেখছি। আমার মন ভরে গেল হে। জয়ী হও।”

স্কুল শেষ হলে কিছু কাজকর্ম থাকেই। সেগুলো সেরে বেরুতে যাওয়ার সময় ছেলের দল সূর্যকে ঘিরে ফেলে। তারা গল্প শুনতে চায়। এরই মধ্যে তারা বাড়িতে গিয়ে জলখাবার খেয়ে এসেছে। অতএব সূর্য তাদের নিয়ে মাঠের মাঝখানে বসে পড়ে। গল্প শোনার দলের মধ্যে রয়েছে অস্থ এবং বাপি। মার্বেল খেলার নেশা তাদের মাথায় উঠেছে।

সূর্য তাদের বলে, “আমি নিশ্চয়ই তোমাদের গল্প বলব, কিন্তু তার সঙ্গে তোমাদের রোজ একটা করে কবিতা শুনতে হবে এবং সেটা যতক্ষণ সবার মুখস্থ না হচ্ছে ততক্ষণ আমরা চেষ্টা করে যাব। রাজি আছে?”

সবাই একসঙ্গে চোঁচিয়ে বলল, রাজি আছে।

“এর সঙ্গে একটা মজার খেলা বলব। আমি প্রতিদিন তোমাদের একটা নতুন শব্দ বলব। তোমাদের পরের দিন এসেই সেই শব্দটা আমাকে বলতে হবে। মনে থাকবে? আচ্ছা, শুরু করা যাক। বাংলা ভাষায় প্রথম অক্ষর হল অ। অ মানে না—অঞ্চলী। অঞ্চলী শব্দটা মনে রাখবে। অঞ্চলী শব্দের মানে হল ঋণশূন্য বা ঋণমুক্ত। ঋণ মানে ধার। দোকান থেকে কোনও জিনিস টাকা না দিয়ে নিয়ে এলে, তার মানে ধারে আনলে। কেউ কারও কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিল, মানে ঋণ করল। বুঝতে পেরেছ? কাল শব্দটা

আমাকে এসে বলবে। রোজ যদি আমরা একটা করে নতুন শব্দ শুনি এবং শিখি, তা হলে একবছর পর আমাদের কয়েকশো শব্দ শেখা হয়ে যাবে। তাই না? সূর্য হাসিমুখে বলে যাচ্ছিল।

সন্দের মুখে সূর্য ভবেন গোস্বামীর বাড়িতে গেল। নতুন জামগা হলেও ওই বাড়ি চিনিয়ে দেওয়ার লোকের অভাব সহজপুরে নেই। বাড়ির সামনে পৌঁছে সূর্য প্রচণ্ড জোরে রেডিও বাজতে শুনল। কেউ এত জোরে রেডিও শোনে? সে একটি কাজের লোককে দেখতে পেয়ে ভবেনবাবুকে খবর দিতে বলল। লোকটি তাকে না চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করল, “বাবুকে ‘কে এসেছে’ বলব?”

“বলবে, সূর্যবাবু এসেছে। স্কুলের মাস্টার।”

কাজের লোকটি চলে গেল। রেডিওতে কেউ এখন চাষাবাদ নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। এই বক্তৃতা শুনতে ইচ্ছুক এমন লোক কি এ বাড়িতে আছে?

মিনিট দশেক পরে শিবনাথ বেরিয়ে এল, “ও, আপনি? আমি ভাবলাম কে ডাকে? জ্যাঠার কাছে অনেকে সাহায্যের জন্যে আসে তো!”

“তোমার জ্যাঠা জানেন না আমি এসেছি?”

“জ্যাঠার খুব মাথা ধরেছে, মাথা টেপা হচ্ছে। আপনাকে বলতে হল।” এক নিশ্বাসে প্রায় ঘোষণার ভঙ্গিতে খবরটা জানিয়ে শিবনাথ স্তব্ধ হয়ে গেল।

সূর্য একবার ভাবল ফিরে যাবে। কারও মাথা ধরতেই পারে, কিন্তু কাউকে বাড়িতে ডেকে দেখা না করে মাথা টেপানোটা যে অসভ্যতা, সেই ধারণাও নেই? কিন্তু এখন চলে গেলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। এসেছে যখন, তখন শেষ দেখেই যাওয়া যাক।

আধঘণ্টা বাদে ভবেন গোস্বামী বেরিয়ে এলেন, “আরে আসুন, আসুন! দাঁড়িয়ে আছেন নাকি তখন থেকে? ওই হতভাগাটা আপনাকে বসতেও বলেনি? একদম বানর হয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। ওই ওর জন্যে আপনাকে ডেকেছি, ওটাকে মানুষ করতে হবে আপনাকে। ভেতরে আসুন।”

বিনা বাক্যব্যয়ে সূর্য অনুসরণ করল।

কয়েকটা বেতের চেয়ার, টেবিল আর ঘরজোড়া গাফীন্দ্রী, রামকৃষ্ণদেব, জগদ্বরলাল নেহেরুর ছবি। ভবেন গোস্বামী হাঁক দিলেন, “কই, কোথায় গেলে, নতুন মাস্টার এসেছে শিবের জন্যে!”

বলা শেষ হওয়ামাত্র সেই কাজের লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে একজন বয়স্ক মহিলা মাথায় আঁচল দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কাজের লোকটির হাতে কাঠের ট্রে। তাতে তিনটি প্রেটে ফুলকো লুচি, তরকারি আর মিষ্টি সাজানো। সূর্যর সামনের টেবিলে তা নামিয়ে রেখে লোকটি চলে গেল।

সূর্য অবাক হয়ে বলল, “এসব কেন?”

মহিলা মাথার আঁচল আরও টানলেন, “ও কিছু নয়, খেয়ে নিন।”

ভবেন গোস্বামী বললেন, “সেই ভাল। নিন নিন, মুখে পুরুন। আমাদের বাড়িতে মশাই চপ-ফাটলেট চলে না, একেবারে দিশিমেতে খাইদাই। আঃ, হাত গুটিয়ে কেন?”

“আমি একটু আগে জলখাবার খেয়ে এসেছি। এখন তো খেতে পারব না।”

“অ্যাঁ। এ দেখছি আচ্ছা টিটিয়া মাস্টার, ছাত্র তো এ-সবই শিখবে। আরে অনুরোধে লোকে টেকি গেলে, আর এ তো মাত্র কয়েকটা লুচি!” ধমকে উঠলেন ভবেন গোস্বামী।

সঙ্গে সঙ্গে মহিলা বললেন, “প্রথম দিন এ-বাড়িতে এলেন, না খেলে অকল্যাণ হবে যে!”

বলার স্বরে এমন কিছু ছিল যে ফেলতে পারল না সূর্য। খাওয়া শেষ হলেই ভবেন গোস্বামী বললেন, “এখন বলুন, কত টাকা চাই?”

“টাকা!” তখনও খাবার গলা দিয়ে নামছে, প্রশ্ন শুনে চমকে উঠল সূর্য।

“বাঃ, আমার ভাইপোকে আপনি কি বিনিপয়সায় পড়াবেন?”

“আমি তো টাকা নিয়েই ওকে পড়াচ্ছি। ও স্কুলে পড়ে, ওকে পড়বার দায়িত্ব আমার, আর এজন্যেই আপনারা আমাকে মাইনে দিচ্ছেন, তাই না?”

“আরে সে তো মশাই স্কুলে! সেখানে যা হয় তা তো জানি। আপনি বাড়িতে এসে আলাদা করে ওকে পড়াবেন, আর সেইজন্যে টাকা দেব, বুঝলেন? টিউশনির ব্যাপারটা জানেন না আপনি?”

“দেখুন, এত নিচু ক্লাসে স্কুলে গিয়ে যদি ও কিছু না শেখে, আবার যদি ওকে বাড়িতে পড়াতে হয়, তা হলে ধরে নিতে হবে আমরা স্কুলে ফাঁকি দিচ্ছি। যেহেতু আমি তা মনে করি না, তাই আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, স্কুলে মন দিয়ে পড়লেই ওর হয়ে যাবে, বাড়িতে টিউটর রাখার দরকার নেই।”

ভবেন গোস্বামী স্ত্রীর দিকে তাকালেন, “বাপের জন্মে এমন কথা ওনিনি! শুনুন মাস্টার, এ হল আমার ভাইপো, কিন্তু নিজের ছেলের চেয়ে বেশি। ওর মা আঁতুড়ঘরেই মারা যান। আমার স্ত্রীই ওকে বড় করছেন। আমি চাই ওকে আপনি বাড়িতে এসে পড়াবেন। মাগনা-মাগনি নয়, আপনাকে আমি মাসে পনেরো টাকা করে দেব এবং ফ্রি জলখাবার পাবেন।”

“যদি প্রয়োজন হয়, তা হলে নিশ্চয়ই আমি বাড়িতে এসে ওকে মাঝে মাঝে পড়িয়ে যাব, কিন্তু টাকা নিতে পারব না। আমাকে মার্জনা করবেন।” সূর্য উঠে দাঁড়াল।

“আপনি আমার মুখের ওপর না বললেন?”

“আমি আপনাকে অপমান করিনি। আমার অক্ষমতার কথাই বলেছি।”

“অতুত! আপনার টাকার দরকার নেই?”

“আছে। তবে স্কুল থেকে যা পাব, তাই চলে যাবে। আচ্ছা নমস্কার।”

রাত্রে খাবার সময় ফটিককে সমস্ত ঘটনা বলল সূর্য। ফটিক হতভম্ব, “তুমি কি!”

“কেন?”

“যেচে আসা মা-লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে দিলে? মাস গেলে কড়কড়ে পনেরোটা টাকা বলে কথা!”

“ওকে টাকা নিয়ে পড়াতে গেলে অন্য ছাত্রদের বঞ্চনা করা হত।”

‘তোমাকে দিয়ে চলবে না। অসম্ভব।’ ফটিক বিরক্ত হল।

ফটিকের মা বললেন, “কিন্তু ও তো ঠিক কথাই বলছে!”

“তুমি বুঝবে না। তাহাড়া ভবেন গোস্বামীর বাড়ি গিয়ে লুচি খেয়ে তার মুখের ওপর না বলে আসার পরিণাম কি, তা জানো? সাপের লেজের পা দিয়েছ কখনও? এবার দিলে। তকে-তকে থাকবে কি করে তোমাকে সহজপুর থেকে তাড়ানো যায়।” ফটিক বলল।

“আমি যতক্ষণ অনায়াস না করছি, ততক্ষণ ওসব নিয়ে ভাবছ কেন?” সূর্য হাসল।

পরদিন স্কুলে গিয়েই দিনুমাস্টারকে বলে শিবনাথের ক্লাসে চলে এল সে। রোল কল করার পরে সে বলল, “শিবনাথ, তুমি এদিকে এসো।”

শিবনাথ বসেছিল পেছনদিকে, অন্য ছাত্রদের আড়ালে। ডাক শুনে অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল।

“তোমাকে সামনে আসতে বলছি—এসো।”

“আমি এখানে তো বেশ ভাল আছি।”

“তুমি যাতে আরও ভাল থাকো, তাই এখানে আসবে।”

অত্যন্ত অনিচ্ছায় শিবনাথ পা বাড়াল। সামনে এসে দাঁড়িয়ে ডিঙ্কেস করল, “কি করতে হবে?”

সূর্য লক্ষ্য করল ওর দুটো হাত পকেটে ঢোকানো রয়েছে। সে বলল, “গতকাল আমি ক্লাসে তোমাদের যা পড়িয়েছিলাম তা সবাইকে তুমি বলবে। বলো।”

“আপনি যা পড়িয়েছিলেন তা আমি বলব কেন?”

“আমি তোমাকে আদেশ করছি, তাই বলবে।”

“না। আপনার কাজ আমি করব না। মাইনে নেবেন আপনি, আর আমি মাগনা পড়াব?”

সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র হইহই করে উঠল। তারা বেশ মজা পেয়েছে শিবনাথের কথা শুনে। সূর্যর ইচ্ছে করছিল ঠাস করে ছোঁড়াটার গালে চড় মারতে। নিজেই অনেক চেষ্টায় সামলাল সে।

“বেশ। তুমি দেখছি অনেক কিছু জেনে গেছ। তোমার পকেটে কি?”

“কিছু না।”

“পকেট থেকে হাত বের করো।”

“কেন?”

“আমি বলছি তা করবে। মুখে-মুখে তর্ক কোরো না।”

“যদি আমি বের না করি?”

“তা হলে এমন শাস্তি দেব, যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। বের করো হাত!” ধমকে উঠল সূর্য। সেটা এত জোরে ছিল যে শিবনাথ ঘাবড়ে গিয়ে হাত বের করে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে দু-পকেট থেকে দুটো নেংটি ইঁদুর লাফিয়ে নীচে পড়ল। ক্লাসসুদ্ধ ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে উঠল। ইঁদুর দুটো ততক্ষণে পালিয়ে গিয়েছে চোখের আড়ালে।

“ইঁদুর এনেছিলে কেন?”

শিবনাথ জবাব দিল না। ঘাড় শক্ত করে মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

“শোনো শিবনাথ, তোমার গার্জেনরা চান তুমি পড়শোনা করো, তুমি চাও না?”

“না।”

“কেন?”

“আমার পড়তে ভাল লাগে না।”

“কি করতে ভাল লাগে?”

শিবনাথ সূর্যর মুখের দিকে তাকাল। তার কি করতে ভাল লাগে, এমন প্রশ্ন কেউ তাকে কখনও করেনি। সে হাত দুলিয়ে বলল, “বললেই যেন করতে দেবেন।”

“তুমি বললেই দ্যাখো না।” সূর্যর হঠাৎ মনে হল ছেলেটাকে বোঝা দরকার।

শিবনাথ মাথা নাড়ল, “না।”

“তোমার যেটা ভাল লাগে সেটা বলতে কি অসুবিধে হচ্ছে?”

“মিছিমিছি বলব কেন? হবে না তো।”

এবার ক্লাসের অন্য ছেলেরা শিবনাথকে অনুরোধ করতে লাগল মনের কথা খুলে বলার জন্য। চোখ বন্ধ করল শিবনাথ। হয়তো ওইভাবে একটু ভেবে নিল। তারপর বলল, “আমার ‘জয় মা কালী’ বাস্‌এর ড্রাইভার হতে ইচ্ছে করে। আমি কয়েকদিন আগে ওই বাস্‌এ চেপে আলিপুরদুয়ার গিয়েছিলাম। ওঃ, কি জোরে চালাচ্ছিল। সব বাস্‌কে হারিয়ে দিচ্ছিল।”

সূর্য হাসল, “এই কথা। এর জন্যে এত সঙ্কোচ করছিলেন। জানো, আমারও তোমার বয়সে ওইরকম ইচ্ছে হত। তবে বাস্‌এর ড্রাইভার নয়, রেলগাড়ির ড্রাইভার হব, কত দেশ ঘুরব। কিন্তু বড় হয়ে জানলাম, রেলগাড়িতে যারা ওঠে তারা কেউ ড্রাইভারের কথা মনে রাখতে না। আর রোজ এক পথে যাওয়া-আসা করতে করতে ড্রাইভারের মন একঘেয়েমিতে ভরে যায়। কথা বললে জানতে পারবে তোমার এই ‘জয় মা কালী’ বাস্‌এর ড্রাইভারও একই কথা বলবেন। তবু তুমি যদি ড্রাইভার হতে চাও, তাহলে তার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু তার জন্যে তোমাকে কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।”

শিবনাথ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে যে সূর্যর বক্তব্য মানছে না এটা বোঝা গেল। সূর্য গলার স্বর নরম করল, “ঠিক আছে শিবনাথ, আমি আজ আবার তোমার বাড়িতে যাব। তোমার জ্যাঠাকে বলব বাস্‌এর ড্রাইভারি করতে দিতে। পৃথিবীতে কোনও কাজই ছোট নয়। বাস্‌এর ড্রাইভার যদি না থাকত, তাহলে আমরা কোথাও যেতে পারতাম না। এটাই বঙ্গব।”

“না, আপনাকে বলতে হবে না।”

“কেন?”

“জ্যাঠা রেগে যাবেন। রেগে গেলে আমার পিঠে বেত মারবেন।”

“তাহলে নিশ্চয়ই বলব না। কিন্তু উনি কি কোনওদিন তোমাকে বেত মেরেছেন?”

“মারতে চান, কিন্তু জেঠির জন্যে পারেন না।”

“ঠিক আছে, পরে এ-নিম্নে তোমার সঙ্গে আলোচনা করব। আমরা আজ অনেকখানি সময় কথা বলেছি, তোমার বন্ধুদের পড়াশোনা কিছুই হয়নি, ওরা নিশ্চয়ই আমার ওপর খুব রেগে যাচ্ছে। তুমি ওই বেঞ্চিতে বোসো।” সূর্য হাত বাড়িয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেওয়ায় শিবনাথকে প্রথম বেঞ্চিতেই বসতে হল।

এর পরেই সূর্য পড়ানোতে ডুবে গেল। অস্ত্র এবং বাপি যেভাবে সাড়া দিচ্ছে, শিবনাথ তা করছে না।

কিছুক্ষণ লক্ষ্য করার পর সে আচমকা পড়ার বিষয় পরিবর্তন করে শিবনাথকে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা শিবনাথ, একটা লোক তোমার সঙ্গে অনায়াস ব্যবহার করেছে, তুমি খুব রেগে গিয়ে তাকে ঘুষি মারলে। ঘুষিটা লোকটার নাকে লাগল খুব জোরে। তখন কি হবে?”

শিবনাথ উঠে দাঁড়াল, “রক্ত বের হবে!”

“চমৎকার। রক্ত বের হবে—রক্তের রং কি?”

“লাল।”

“তুমি রক্ত দেখেছ?”

“কত!”

সূর্য এবার সমস্ত ক্লাসকে জিজ্ঞেস করল, “তোমরা কে কত রক্ত দেখেছ?”

একটি ছেলে উঠে দাঁড়াল, “আমি দেখেছি দু’বার। আমার পা কেটে গিয়েছিল, গলগল করে লাল রক্ত বেরিয়েছিল।”

“তাই? রক্তের রং লাল হয় কেন?”

কেউ উঠে দাঁড়াল না। সূর্য সমস্ত ক্লাসের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত শিবনাথকে প্রশ্নটা করল।

শিবনাথ বলল, “রক্তের মধ্যে সাদা জল আর লাল জল আছে। লাল জল থাকায় রক্ত লাল দেখায়।”

“ও! খুব ভাল উত্তর। তবু জল নয়, রক্ত-লোহিত মানে লাল কণিকা, আর সাদা মানে শ্বেত কণিকার মিশ্রণে তৈরি। সাদার সঙ্গে লাল মিশলে সেটা লালই দেখায়। শিবনাথ ঠিকই বলেছে।”

॥ ৬ ॥

সেদিন স্কুলের শেষে শিবনাথকে দেখা গেল মাঠের মাঝখানে সূর্যর গল্প বলার আসরে হাজির হতে। কোনও কথা না বলে সে একপাশে বসে ছিল। সূর্য তাকে ডাকল, “জানো শিবনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন তোমরা আমাদের রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। নেতাজী একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। ইংরেজরা যখন আমাদের পরাধীন করে রেখেছিল তখন নেতাজী এই ডাক দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের মানুষের কাছে তিনি রক্ত চেয়েছিলেন। এই রক্ত দান করার কিন্তু অন্য মানে। নিজের কথা না ভেবে, পরিবারের কথা না ভেবে, দেশকে স্বাধীন করার জন্যে যারা ইংরেজের বন্দুকের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের অনেকেই হত কিংবা আহত হয়েছে, রক্ত ঝরেছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র সেই আহ্বান করেছিলেন, যাতে সমস্ত মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতার জন্যে। তাই স্বাধীনতা মানে তখন লোকে যা বুঝত, সুভাষচন্দ্র তা অন্যরকম ভাবে বোঝালেন। এঁদের কথা তুমি যত জানবে তত মনে হবে তোমারও দেশের জন্যে কিছু করা দরকার।”

অস্ত্র জিজ্ঞেস করল, “দেশ তো মাটি, ঘাস, গাছপালা! তার জন্যে কি করতে পারি?”

“হ্যাঁ, আর-একটু আছে। দেশ মানে সেই মাটিতে যারা বাস করে তারাও। অর্থাৎ মানুষ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, দেশের সব মানুষ তাঁর ভাই। এমন কী যারা খুব সাধারণ কাজ করেন বলে আমরা মনে করি তাঁরাও। তোমরা দেখবে আমাদের দেশের কিছু মানুষ নানারকম ভাল খাবার খায়, ভাল পোশাক করে, বেশ আরামে থাকে। এগুলো হয় তারা, নয় তাদের পূর্বপুরুষ অর্জন করেছেন বলেই তারা ভোগ করতে পারছে। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ লেখাপড়া জানে না, ভাল খেতে পায় না। অন্যায়ের থাকে প্রায়ই, এমন লোক প্রচুর। তারা বৃষ্টি কিংবা শীতে কষ্ট পায়, পরনে পোশাক নেই। এই দরিদ্র মানুষেরা আমাদের দেশেরই মানুষ। তাই তারা কষ্টে থাকবে, আর কয়েকজন আরামে থাকবে, এইভাবে তো একটা দেশ বড় হতে পারে না, ভাল হতে পারে না! দুর্গাপূজোর সময় তোমরা যখন নতুন জামাপ্যান্ট পরে ঠাকুর দেখতে যাও, তখন কিছু ছেলেমেয়ে ছেঁড়া পোশাক পরে মুখ কালো করে দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের দেখে তোমাদের কষ্ট হয় না? সবাই মিলে যদি আনন্দ করতে পারতাম, কী ভাল হত!”

শিবনাথ জিজ্ঞেস করল, “ওদের বাবার টাকা নেই, জামা-কাপড় কিনবে কী করে?”

অস্ত্র মাথা নাড়ল, “কেন টাকা নেই?”

শিবনাথ জবাব দিল, “বাঃ, যা পায় তাই দিয়ে ভাল খেয়ে ফেলে। নতুন জামা কিনবে কী করে?”

সূর্য বলল, “শিবনাথ ঠিকই বলেছে। কিন্তু তোমরা তাদের উপকার করতে পারো।”

শিবনাথ অবাক। “আমরা জামা দিয়ে দেব!”

“দু-একটা নিশ্চয়ই দিতে পারো। কিন্তু তার চেয়ে বড় উপকার তোমাদের করতে হবে। এখন থেকে প্রত্যেকে, অসুস্থ দুজন গরিব ছেলে যারা পড়াশোনা করে না, অক্ষর চেনে না, তাদের সেটা চেনাতে হবে। ওদের মধ্যে পড়াশোনার ইচ্ছে জাগিয়ে দিতে হবে। একদম অশিক্ষিত হয়ে বড় হলে ওরা যে কাজ পায় তার টাকায় কোনমতে খাওয়া ভোটে, তার বেশি কিছু হয় না। কিন্তু একটু-আধটু পড়াশোনা করলে ওরা পরে অনেক বেশি রোজগার করতে পারবে। দেশের সেবার কথা হচ্ছিল না? এইভাবেই তোমরা দেশসেবা করতে পারো। যারা অক্ষর চেনে না তারা কখনও রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে পারবে না। দেশ-বিদেশের কত খবর তারা জানতে পারবে না। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মতো তারা বেঁচে থাকবে। তোমরা সাহায্য করলে অক্ষর দূর হয়ে যাবে ওদের চোখ থেকে।”

শিবনাথ জিজ্ঞেস করল, “আমরাই তো ক্লাস ওয়ানে পড়ি, আমরা কি শেখাব?”

“তোমরা অ-আ-ক-খ জানো। এক-দুই জানে। যোগ, বিয়োগ করতে শিখেছ। ঠিক যেভাবে তোমরা শুরু করেছিলে, সেইভাবে ওদের শেখাবে।” সূর্য বোঝাল।

ছেলেমেয়েদের কিছুক্ষণের জন্য চিন্তিত দেখাল। শেষ পর্যন্ত অসুস্থ প্রশ্ন করল, “কিন্তু কোথায় গিয়ে পড়াব? ওদের বাড়িতে গেলে মা খুব রাগ করবে।”

সূর্য হাসল, “হ্যাঁ, সেটা একটা সমস্যা। এক কাজ করো, ওদের তোমরা স্কুলে নিয়ে এসো। স্কুলের পর খোলাধুলো শেষ করে রোজ আধঘন্টা করে তোমরা পড়াবে। কে কে পড়াবে ঠিক করে নাও।”

ছাত্রদের দেখা নেই, তবু মাস্টারমশাইরা এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারাও যে পড়াতে পারে, এটা নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারছিল না। মাস্টারমশাই নির্বাচনও পরীক্ষা দিয়ে হল। যারা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সঠিক বলতে পারল, তারা মাস্টারের পদ পেয়ে গেল। সূর্য দেখল, এ-ব্যাপারে শিবনাথ প্রায় নেতার ভূমিকা নিয়েছে। অস্তুর সঙ্গে তার বেশ সমঝোতা হয়ে গেছে।

শিবনাথ সূর্যকে প্রশ্ন করল, “কিন্তু ওদের বই দেব কোথেকে?”

অসুস্থ মনে করিয়ে দিল, “কেন, আমাদের বর্ণপরিচয়, ধারাপাত বইগুলো তো আছে! ওগুলো আর পড়ি না বলে বাড়িতেই পড়ে আছে।”

“বেশ, কি দিয়ে লিখবে? পেন্সিল আর খাতা?” বাপি সমস্যাটার কথা বলল।

শিবনাথ বলল, “আমাদের ছোট হয়ে যাওয়া পেন্সিল ওদের দিয়ে দেব, আর প্রত্যেকে মায়ের কাছ থেকে একটা করে খাতা চেয়ে নেব।”

অতএব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। এবার ছাত্রের খোঁজে বেরোবে সবাই। আগামী সোমবার থেকে শুরু করতে হবে নিরক্ষরদের অক্ষর চেনাবার কাজ।

সহজপুরের মানুষ অবাক হয়ে গুনল, স্কুলের শিশুরা নিরক্ষরদের পড়াবে! নতুন মাস্টার তাদের এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। স্কুলের পর ছেলেরা দলবঁধে কুলি-কামিন অথবা ওই শ্রেণীর মানুষের ঘরে ঘরে যাচ্ছে, আর তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসতে বলছে বিকেলবেলায়। বাচ্চারা আসছে বলে গরিব মানুষগুলো অবাক হচ্ছে, কেউ-কেউ কৌতূহলীও।

সোমবার বিকেলে দেখা গেল অসুস্থ তিরিশটি শিশু এবং বালক স্কুলের মাঠে হাজির, যারা কোনদিন স্কুলে ঢোকার কথা ভাবেনি। শিবনাথ তাদের তিনভাগে ভাগ করে মাঠের তিন জায়গায় বসিয়ে নাম লিখে নিচ্ছে। ইচ্ছে করেই সূর্য ওদের কাছে যায়নি। ছেলেগুলো যে এতটা উদ্বুদ্ধ হবে, তা সে নিজেরও কল্পনা করেনি।

দিনুমাস্টার তার পাশে এসে দাঁড়ালেন, “কী কাণ্ড!”

“সূর্য বলল, “আমার খুব ভাল লাগছে।”

“ঠিকই। তবে এই উৎসাহ ক’দিন থাকবে, তা বোঝা যাচ্ছে না।”

“কাউকে তো শুরু করতে হয়। ওরা করেছে, এটাই বড় কথা।”

সূর্য দেখল শিবনাথ আর অশু তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে শিবনাথ বলল, “আপনি আসবেন না?”

সূর্য মাথা নাড়ল, “আমরা তো আছি। বেশ তো করছ তোমরা, অসুবিধে হলে ডেকো।”

শিবনাথ জিজ্ঞেস করল, “প্রথম দিন থেকেই কি লেখাব?”

সূর্য বলল, “না। আগে মুখস্থ করাও, তারপর অক্ষরগুলো চেনাবে। তখন লেখার ব্যবস্থা হবে।”

শিবনাথ চলে গেল।

দিনুমাস্টার বললে, “বিস্ময়!”

“কেন এ-কথা?”

“এই ছেলেটি অত্যন্ত বিস্ময়। একে নিয়ে আমি তিতিবিরক্ত হতাম। ভবেনবাবুর ভাইপো বলে শাসন করার ক্ষমতা আমার ছিল না। সেই ছেলেকে দিয়ে তুমি এসব করছ, ভাবতে অবাক লাগছে!”

“আসলে ওরা কেউ কখনও দায়িত্ব পায়নি। হয়তো সাময়িক, কিন্তু এই নিয়ে মেতে থাকবে কিছুদিন। মন্দ কি! আর এদের মধ্যে থেকে দু-একজন সিরিয়াস হলেও হতে পারে তো!”

এই সময় আওয়াজ উঠল। বালক-শিক্ষকরা চোঁচিয়ে ‘অ’ বলছে, আর তার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। নাঠের তিনটি জটলা থেকে এই আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে। স্বরবর্ণগুলো যেন বেলুনের মতো আকাশে উড়ছে। আর এই দৃশ্য দেখার জন্য সহজপুরের অনেক মানুষ স্কুলের সামনে জড়ো হয়েছেন। তাঁদের মুখে মজা দেখান্য় আনন্দ।

হঠাৎ দেখা গেল বলরামবাবু স্কুলে আসছেন। খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখলেন তিনি। দিনুমাস্টার এবং সূর্য এগিয়ে গেল তাঁর কাছে। দিনুমাস্টার বলল, “এ-সবই সূর্যর মাথা থেকে এসেছে।”

বলরামবাবু বললেন, “চমৎকার! কিন্তু মুখস্থ করালেই হবে না, এদের তো অক্ষর চেনাতে হবে, নইলে যেটা জিভে বলছে সেটা কি, তা জানতেই পারবে না।”

সূর্য বলল, “আজ প্রথম দিন। ওদের সমস্ত ব্যাপারটাই মজা পাওয়ার মধ্যে আছে। স্বরবর্ণগুলো জীবনে প্রথমবার উচ্চরণ করছে। এটা সড়গড় হয়ে গেলে অক্ষর চেনাব।”

“কীভাবে?”

“ব্ল্যাকবোর্ডের দরকার হবে।”

“স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করলে কমিটির অনুমতি নিতে হবে। তখন কমিটি বলতে পারে, এই ছেলেমেয়েরা সরাসরি স্কুলে ভর্তি হচ্ছে না কেন?”

“স্কুলে ভর্তি হওয়ার মতো সঙ্গতি ওদের না-বাবার নেই। আমরা একটা মানসিকতা তৈরি করার চেষ্টা করছি, এরপর যদি কোনও শিশু স্কুলে ভর্তি হতে চায়, সেটাই তো আমাদের কাম্য হওয়া উচিত—আপনার কি সেটা মনে হয় না?” সূর্য প্রশ্ন করল।

“আমার কি মনে হয়, তা নাই-বা বললাম, আমি স্কুল-কমিটির কথা বলছি। আপনারা আরও কয়েকটা দিন দেখুন, তিনটে ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। স্কুলের-গুলো নিতে হবে না।”

সহজপুরে আর অশিক্ষিত ছেলেমেয়ে থাকবে না। সবাই লেখাপড়া শিখে সাহেব হয়ে যাবে। মোট বওয়ার, বাড়ির কাজ করার লোক পাওয়া যাবে না। কিছু-কিছু মানুষ এইসব কথা বলে বাগ করতে আরম্ভ করলেন। তা সত্ত্বেও আগ্রহ বাড়তে লাগল সাধারণ মানুষের। প্রথম দুদিন যারা আসেনি তারাও আসতে লাগল নবীন স্কুলে। এখন শুধু স্বরবর্ণ নয়, শিবনাথ অশু আর বাপির শৈশবে শেখা ছড়াগুলো মুখস্থ করাতে লাগল ওদের। তাঁতির বাড়ি থেকে ফীরনদীর কূঙ্গ—কচি কচি গলায় কলকল করতে লাগল। যেদিন ক্লাস নেওয়ার কথা নয়, সেদিনও শিশুরা এসে জড়ো হয় মাঠে।

একদিন সূর্য ক্লাস নিচ্ছিল। ‘কুমোর পাড়ার গোবর গাড়ি’ কবিতাটি সে পড়াচ্ছিল। বাংলার গ্রামের সুন্দর ছবি যেন আঁকা হয়ে যাচ্ছিল ছেলেদের চোখের সামনে। বংশীবদনের ভাগনে মদন কেন হেঁটে যাচ্ছে, তার মামা কেন তাকে গাড়িতে তুলে নিচ্ছে না, হাঁড়ি-কলসিতে বোঝাই হলো একটুও কি জায়গা থাকবে না—এমন প্রশ্ন কেউ-কেউ তাকে করছে। হঠাৎ জানলার বাইরে গাছের ডাল থেকে হাসি ভেসে এল। ওরা

দেখল সেখানে তিনটে বালক বসে আছে। শিবনাথ জানলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “এই, তোরা ওখানে কি করছিস?”

“পড়া শুনিছি।”

“নাম, ভাড়াভাড়ি নাম গাছ থেকে!” ধমকে বলল শিবনাথ।

“কেন? আমরা কি করেছি?” বালক প্রতিবাদ করল।

এবার সূর্য এগিয়ে গেল, “আমরা এখানে পড়াশোনা করছি। তোমরা যদি ওখানে বসে থাকো, তাহলে সবার নজর বারংবার তোমাদের ওপর চলে যাবে, পড়া হবে না।”

“পড়া মানে আপনি যা বললেন, তাই বলা তো? ও আমিও পারব।”

“পারব মানে?” সূর্য অবাক।

সঙ্গে সঙ্গে ডালে দুলতে দুলতে বালকটি সূর্যকে নকল করে বলতে লাগল, “কুমোর পাড়ার গোবর গাড়ি বোঝাই করা কলসি হাঁড়ি, গাড়ি চালায় বংশীবদন, সঙ্গে যে যার ভাগ্নে মদন, হাট বসেছে শুক্রবারে, বন্দীগণ্ডে পদ্মাপাড়ে।”

“তুমি এই কবিতা এর আগে শুনেছ?” সূর্য সন্দেহ করল।

“কী করে শুনব? আপনি বলছিলেন, তাই মনে নিয়ে ফেললাম!”

সূর্য চমৎকৃত। কী সুন্দর বুলি বলল ছেলেটা নিজের অজান্তেই—“মনে নিয়ে ফেললাম”!

সে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা বলো তো, বংশীবদন গাড়ি চালাচ্ছে কিন্তু ভাগ্নে মদন পেছন-পেছন হেঁটে যাচ্ছে কেন?”

ছেলেটা চোখ বন্ধ করে একটু ভাবল, তারপর বলল, “মদন তো সঙ্গে যাচ্ছে, হেঁটে যাচ্ছে নেই তো? সঙ্গে যাওয়া মানে গাড়িতে বসে যাওয়া!”

ক্রাসের ভেতর বাপি বলে উঠল, “হ্যাঁ রে, তাই তো!”

ছেলেটি মাথা নাড়ল, “তবে পেছন-পেছন যাওয়াই ঠিক। গোবর গাড়ি নিশ্চয়ই, কী?”

সূর্য বলল, “গ্রামে তো গোবর গাড়ি হবেই!”

“তাহলে হাঁড়ি-কলসি বোঝাই হয়ে আছে তো, যদি পড়ে যায় তাহি দেখার জন্যে পেছনে একজন থাকে। কথটা হবে গাড়ি চালায় বংশীবদন পেছনে যায় ভাগ্নে মদন।”

“তোমার নাম কি?”

“ফুদিরাম।” বলেই বালক নীচে লাফিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে অনুসরণ করল সঙ্গীরা।

সূর্য ঠোট কামড়াল। তারপর ঘুরে ক্রাসের ছাএদের জিজ্ঞেস করল, “ওকে তোমরা চেনো?”

কয়েকটা হাত উঠল। আগে সবাই একসঙ্গে কথা বলত, এই নিঃবচন সূর্য চালু করেছে। সে ইশারা করতে ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “ও মাছ বিক্রি করে।”

“মাছ?”

বাপি বলে উঠল, “হ্যাঁ, মাস্টারমশাই। ফরেস্টের ঝরনায় মাছ ধরে নিয়ে এসে বিকেনে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বিক্রি করে। ছোট ছোট মাছ, বেশি কাঁটা বলে মা কেনেন না!”

“ও থাকে কোথায়?”

“ফরেস্টের কাছে।”

সেদিন ক্রাসের পরেও সূর্যর ঘোরটা গেল না। একটা আট-দশ বছরের বালক, যার জীবিকা ঝরনা থেকে মাছ বিক্রি করা, সে কয়েকবার ওনেই একটা কবিতার অনেক লাইনই শুধু বলেনি, ব্যাখ্যা করে তার চোখও খুলে দিয়েছে। অথচ তাকে পোনাত্তে সূর্য কবিতা আবৃত্তি করেনি। ‘সঙ্গে যে যায় ভাগ্নে মদন’ কখনও মন থেকে মুছবে না, লাইনটা রক্তে মিশে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যদি ফুদিরামের ব্যাখ্যা শুনতেন, তাহলে কি ‘সঙ্গে’র বদলে ‘পেছনে’ লিখতেন? যে পেছনে যায় সে তো সঙ্গেও চলেছে! তবে? কিন্তু সঙ্গে যাওয়া মানে হেঁটে যাওয়া কে বলল? এটাও ঠিক। কিন্তু কবিতাটি পড়লে চোখের সামনে ছবি ভাসে, মামা গোবর গাড়ি চালাচ্ছে আর ভাগ্নে পেছন-পেছন যাচ্ছে। কেন?

সহজপুরের বাইরে কিছু ফাঁকা জমি ছিল। তারপরেই জঙ্গলের গুরু। দেশভাগের পর সেই জমিতে ঘর-বাড়ি হলেও এখনও তেমন ঘনবসতি হয়নি। ঘুরতে ঘুরতে সূর্য একে-ওকে জিঙ্কেস করছিল ফুদিরামের কথা। শেষ পর্যন্ত যে বাড়িটার সন্ধান সে পেল তাকে বাড়ি বলা কতটা সম্ভব তা নিয়ে তর্ক হতে পারে। বাইরে থেকে ডাকতে একজন মধ্যবয়সিনী বেরিয়ে এলেন। সূর্যকে চিনতে না পেরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বললেন, “ফুদি বাড়ি নেই।”

“ও! আপনি কি ওর মা?”

মহিলা মাথা নাড়লেন। সূর্য লক্ষ্য করল মহিলার শাড়ির রং হয়তো সাদা ছিল, এখন ময়লা জমে বিবর্ণ হয়েছে। ইনি বিধবা, তার মানে ফুদিরামের বাবা বেঁচে নেই।

সে বলল, “আপনি আমাকে চিনবেন না। এখানকার খুলে আমি পড়াই। লোকে নতুন মাস্টার বলে ডাকে আমাকে; ফুদিরামকে বলবেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। আমি ফটিকবাবুর বাড়িতে থাকি।”

“সে কি কোনও অন্যান্য করেছে?”

“না, না।” হেসে ফেলল সূর্য, “আপনার ছেলে খুবই ভাল। খুব বুদ্ধিমান। আমি চাই ও পড়াশোনা করুক। ওর কথাবার্তা, স্মরণশক্তি অনেক ছেলের থেকে ঢের ভাল। ওই ব্যাপারে কথা বলতেই এসেছি।”

“কখন পড়বে?”

“দুই বে সময়ে হয় সেই সময় যাবে। ভর্তির ব্যবস্থা আমি করে নেব।”

“তা হলে আমরা খাব কি? আমার শরীর খারাপ, ঘরের বাইরে যেতে ভয় করে। ফুদি মাছ ধরে এনে বিক্রি করে বলে সংসার চলে। ও যদি দুই যায় তাহলে মাছ ধরবে কখন?”

“আপনাদের বাড়িতে আর কেউ নেই?”

“থাকলে কি ওইটুকু ছেলেকে মাছ ধরতে বনেবাদাড়ে পাঠাই?”

বাড়িতে ফেরার সময় সূর্য ভেবে পাচ্ছিল না, কী করে এর সমাধান করা সম্ভব? বিকেলে যাদের অক্ষর-পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাদের দলে ফুদিরামের মতো ছেলে বেশিদিন থাকতে পারে না। কিন্তু তারপর? তা ছাড়া হয়তো বিকেলবেলায় সে মাছ বিক্রি করতে দরজায়-দরজায় ঘোরে। ওই ছেলেটা আর তার মাকে যদি সাহায্য দেওয়া যেত, তা হলে—!

কিন্তু এভাবে কে দেবে সাহায্য? ক’দিন দেবে? ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ পরিবারের এমন উজ্জ্বল শিশুরা ওধু অর্থনৈতিক কারণে অকালেই ঝরে যাচ্ছে! মন বড় খারাপ হয়ে গেল তার।

সন্ধ্যার মুখে হারিকেনের আলোয় সুকান্ত ভট্টাচার্য পড়ছিল সূর্য। সুকান্ত তার খুব প্রিয় কবি। পড়তে পড়তে মাঝে-মাঝেই রক্ত গরম হয়ে যায়। প্রতিবাদের ভাষা কবির কলমে চমৎকার!

এই সময় কচিগলায় ডাক ভেসে এল, “মাস্টারমশাই! ও মাস্টারমশাই!”

ফটিকের মায়ের গলা শোনা গেল, “কে রে?”

এখন ফটিক দোকানে। তার মা রান্না নিয়ে ব্যস্ত। বাইরে বেরিয়ে এসে সূর্য ফুদিরামকে দেখতে পেয়ে বলল, “এসো।”

মা বললেন, “আপনি ডাকছেন। তখন অন্যান্য করে ফেলেছি, আর হবে না!”

ছেলেটিকে ঘরে নিয়ে এসে বসাল সূর্য, “আমি তোমাকে ওই কারণে ডেকে পাঠাইনি।”

“ও, তা হলে? মাছ নেবেন বুঝি? কিন্তু আজ মাছ ধরতে যাইনি।”

সূর্যর খুব মজা লাগছিল। সে জিঙ্কেস করল, “কেন?”

“গতকাল মানা করে দিয়েছিল বলে আজ ফরেষ্টে ঢুকিনি।”

“কে মানা করেছিল? ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট?”

“না, না। যারা কাঠ কাটে তারা।”

“তারা নিষেধ করলে তুমি গুনবে কেন? নিষেধ করার তারা কে?”

বালকের মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। এই হাসি বোঝাল, বয়সের তুলনায় অনেক বেশি অভিজ্ঞতা তার হয়ে গিয়েছে। মাথা নেড়ে বলল, “জঙ্গলে ওরাই সব। আমি ছোট, তাই মেনে নিছি। আগে বড় হয়ে যাই, তারপর—।”

“তারপর কি করবে?”

“ওদের কথা শুনব না।”

“ওবা শুধু আজ তোমাকে জঙ্গলে যেতে নিষেধ করেছে?”

“আঙ আর কাল।”

“কেন মানা করেছিল জানো?”

“ওরা গাছ কাটবে, তাই।”

সূর্যর মনে হল বেআইনি গাছ কাটার কোন সাক্ষী রাখতে চায় না বলে কিছু অসৎ লোক এই বালককে নিষেধ করেছে। সে বলল, “কাল তো ফুল ছুটি, তুমি আমাকে জঙ্গলে নিয়ে যাবে?”

“কেন?”

“তুমি মাছ ধরবে, আমি দেখব।”

“আমি ঝরনায়-ঝরনায় ঘুরি, আপনি পারবেন?”

“খুব পারব।”

“কিন্তু কাল তো যেতে মানা!”

“আমি তোমার সঙ্গে থাকব, ভয় কি?”

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। তারপর হাত বাড়িয়ে সুকান্তর বইটা নিল, “এই বই ওর পড়ে?”

কাদের কথা বলছে অনুমান করে সূর্য বলল, “না। তবে বড় হয়ে নিশ্চয়ই পড়বে।”

“এই লোকটা কে?”

“হুঁনি কবি, এই বই লিখেছেন। এর নাম সুকান্ত ভট্টাচার্য।”

ফুদিরাম অন্ধের মতো বইটা হাতড়াল, “কি সুন্দর দেখতে!”

সূর্য বইটা নিল, “তুমি কবিতা শুনবে? শোনো। যে শিশু ভূমিষ্ঠ হল আশ্রয়...।”

মধুমুখের মতো শুনে গেল ফুদিরাম, “আবার পড়ুন না!”

সূর্য প্রথম লাইন থেকে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোট নাড়তে লাগল ফুদিরাম। তৃতীয়বার পড়ার পর ছেলেটা গড়গড় করে বলে যেতে লাগল। ঠিক যেভাবে পড়েছিল সূর্য, যেখানে যেমন থেমেছিল, ঠিক সেইরকম আবৃত্তি করে গেল।

দু-হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল সূর্য। এমন স্মরণশক্তি সে কখনও কারও মধ্যে নাথাকেনি। সূর্য শুনেছে বিবেকানন্দের নাকি অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল। কিন্তু নিরক্ষর একটি বালক যে ক্ষমতার অধিকারী, তা সমস্ত জগৎকে জানানো দরকার। কিন্তু কীভাবে?

সূর্য ফুদিরামকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, “তুই এখন থেকে আমার কাছে পড়বি? পড়তে তোর ইচ্ছে করে না?”

ফুদিরাম নীরবে মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ।”

উৎসাহিত হয়ে সূর্য বলল, “তুই দিনের বেলায় যা করিস তা কর, সন্ধ্যার সময় আমার কাছে চলে আসবি। আমি তোকে লেখাপড়া শেখাব। তোকে কোনও ফুলে ভর্তি হতে হবে না, একেবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবি প্রাইভেটে। সেইভাবে তোকে তৈরি করব আমি। হ্যাঁ রে, তুই আমার কথা শুনে চলবি?”

ফুদিরাম অবাক চোখে উত্তেজিত সূর্যকে দেখছিল। কবিতাটা বলতে পেরেছে শুনে নতুন মাস্টার এরকম উত্তেজিত হয়েছে কেন, এটাই বুঝতে পারছিল না সে। এরকম তো সে অনেক কিছু করতে পারে! কান পেতে শুনে পাখির ডাক এমন নকল করতে পারে যে অন্য পাখিবাও বোকা বনে যায়। শুধু পাখির ডাক কেন, যে-কোনও শব্দ সে ঘবহ নকল করতে পারে। এটা যে কোনও বাহাদুরি তা তো এতদিন জানা ছিল না! নতুন মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে সে না বলতে পারল না।

সূর্য একটা স্টেট টেনে তাতে ‘অ’ অক্ষরটা লিখল। লিখে বলল, “এই হল অ। আমাদের বাংলা ভাষার প্রথম অক্ষর। এটার ওপর চক দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে নীচে লেখ তো!”

ফুদিরাম চেষ্টা করল। মিনিট পনেরোর কসরতে দেখা গেল, কিছুতেই অ-এর আদল আসছে না! যে

ছেলে দু-তিনবার শুনে একটা বড় কবিতা আওড়াতে পারে, সে দেখে-দেখে অ অক্ষর লিখতে পারছে না কেন?

হঠাৎ সূর্যর মাথায় একটা চিন্তা খেলল। সে স্নেটের ওপর ছোট্ট লম্বা সোজা লাইন টানল। টেনে বলল, “লেখ!”

এবার একেবারেই পারল ফুদিরাম। সূর্য বলল, “ইংরেজিতে একে বলে আই। এবার আই-এর সোজা পা দিলাম, হয়ে গেল এল।”

দেখা গেল এবার ফুদিরামের অনুবিধে হচ্ছে না। আই, এল, টি, এফ, ই একবার দেখে চমৎকার লিখে গেল সে। শুধু তাই নয়, স্নেট মুছে সূর্য যখন তাকে স্মৃতি থেকে লিখতে বলল তখন তার একটুও ভুল হল না। সূর্য বুকল সরলরেখায় ফুদিরামের কোনও অনুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু হাত ঘুরিয়ে গোল পাকাতে গেলেই গোলমান। ছেলেবেলায় সে এ বি সি করে ইংরেজি শিখেছে। যদি আই থেকে শুরু করা হত তা হলে শিখতে কম সময় লাগত।

সূর্য বলল, “ফুদিরামবাবু, তুমি বাঙালি, বাংলা তোমার ভাষা, বাংলা অক্ষর আগে শিখতে হবে। ইংরেজিটা যেমন পারছ, বাংলাও তেমনই পারতে হবে।”

ফুদিরাম একটু নিশ্চিন্ত গলায় বলল, “ইংরেজির মতো করে বাংলা শেখা যায় না?”

“না। দুটো ভাষা আলাদা।” কথাটা বলল বটে, কিন্তু মনে এল ইংরেজির নিয়মকানুন বাংলা থেকে ঢের সোজা। একটায় বিজ্ঞান-যুক্তি আছে, অন্যটায় অনুমানের মিশেল প্রচুর।

“তা হলে আমি বাংলা শিখব না, ইংরেজি শিখব।”

“অ্যাঁ!” সূর্য অবাক, “তা হলে বাংলা বইগুলো কি করে পড়বে? কবে পড়বে?” সূর্য স্নেটে একটা গোম্মা আঁকল, “দ্যাখো তো, এটা পারো কিনা?”

দু-বারের চেয়ে একটা আকৃতি ফুটল স্নেটে, যাকে গোম্মা বলা যেতে পারে। গোম্মার মাথা মুছে ডান দিকে আর-একটা ছোট্ট গোম্মা বসিয়ে সূর্য ফুদিরামকে তা চেনাল। সেটা সড়গড় হলে অ লিখতে অনুবিধে হল না। অ থেকে আ-এ পৌঁছে সেদিনের মতো ছুটি। বোঝা যাচ্ছিল এর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছে ছেলেটা। ছাড়া পেয়ে খুব খুশি।

রাত্রে ফটিক বাড়ি ফিরে সূর্যকে জিজ্ঞেস করল, “কি হে মাস্টার, ভোটে দাঁড়াবে নাকি?”

“তার মানে?”

“সবাই যে রেটে তোমার প্রশংসা করছে, তাতে ভোটে দাঁড়ালে জিতে যেতেও পারো। তবে কেউ-কেউ তোমার নিন্দেও করেছে।”

“নিন্দে কেন?”

“গরিবদের তুমি লেখাপড়া শেখাতে চাইছ, ওরা লেখাপড়া শিখলে ওদের কাজগুলো করা করবে? আর এ-ব্যাপারে তুমি কাজে লাগাচ্ছ বাবুদের বাড়ির ছেলেদের। তোমার জন্যে গলা ফুলিয়ে টিংকার করে পড়িয়ে তাদের কি লাভ হচ্ছে? তাদের নিজেদের পড়াশোনা তো গোম্মায় যাচ্ছে, এই আর কি!” ফটিক জ্ঞানল।

সূর্য বলল, “গোম্মায় যাচ্ছে কিনা সেটা পরীক্ষা না করলে তো বোঝা যাবে না! তা ছাড়া বলরামবাবুও আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন!”

“সেটাই হয়েছে কাল! আচ্ছা তুমি কি কমিউনিস্ট?” ফটিকের যেন বিষয়টা মনে পড়ে গেল।

“কমিউনিস্ট?” হেসে ফেলল সূর্য, “হলে আপত্তি আছে?”

“আঃ, মজা নয়। সহজপুরে সবাই কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। কমিউনিস্টরা বিদেশীদের আপন করে, এখানে তাদের কেউ পছন্দ করে না। যদি সবাই জানতে পারে তুমি কমিউনিস্ট, তাহলে এখানে আর টিকতে পারবে না। হাসি নয়, এটাই সত্যি কথা।”

“কথাটা কে বলল?”

“ভবেন গোস্বামী। আজ বিকেলে মোড়ের মাথায় তোমাকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সহজপুরে তোমার

আগে কেউ এসব কাজ করেনি। প্রশংসাই হচ্ছিল, হঠাৎ ভবেন গোস্বামী বললেন, ‘আমার সন্দেহ হচ্ছে হোকরা কমিউনিস্ট! পুলিশের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এখানে পালিয়ে এসেছে!’

‘বিশেষত্ব প্রমাণ করল, ‘এ-কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন?’

‘তা ভবেন গোস্বামী বললেন,’ ‘দেখছ না, ছোটলোক বড়লোক এক করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এরপর বলবে আপনার প্রচুর আছে আর ওদের কিছু নেই, এ হতে পারে না, দিয়ে দিন ওদের অর্ধেক।’

‘কথাটার প্রতিবাদ অবশ্য কেউ-কেউ করছিল কিন্তু সূর্যর অতীত কেউ জানে না বলে স্পষ্ট হতে পারেনি। ভবেন গোস্বামী গল্প করছে, কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ম হল যেখানে তাদের কোনও সংগঠন নেই সেখানে ছদ্মবেশে একটা কর্মীকে ছড়িয়ে দেওয়া। সেই লোকের কাজ হল কচি-কচি মাথা চিবিয়ে খাওয়া। বাচ্চাদের হাত করতে পারলে বড়রাও হাতে আসবে।’

সূর্য চূপচাপ ফটিকের কথা শুনছিল, শোনার পর জিজ্ঞেস করল, ‘‘তাহলে তো আমাকে এ-বাড়ি থেকে চলে যেতে হয়।’’

ফটিক অবাক হল, ‘‘কেন?’’

‘‘তুমি তো আমাকে থাকতে দিতে পারো না?’’

‘‘কেন? তুমি কি কমিউনিস্ট?’’

‘‘না। সত্যিকারের কমিউনিস্ট হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আচ্ছা ফটিক, একজন কমিউনিস্ট খারাপ মানুষ, এ-কথা তোমাকে যে বলেছে তার কাছে কখনও জানতে চেরেছ, কেন খারাপ? কমিউনিস্ট চায় সমস্ত মানুষের সমান অধিকার। ধনী এবং দরিদ্র বলে কেউ থাকবে না। সবাই সুস্থ হয়ে বাঁচুক, এটাই তাদের লক্ষ্য। তা হলে?’’

ফটিক মাথা নাড়ল, ‘‘তা হলে গরমেন্ট ওদের ধরে ধরে জেলে পুরছিল কেন? কেন ওদের দলকে বাতিল করেছিল? কেন পুলিশের ভয়ে ওরা লুকিয়ে পড়েছিল? দেশের ঠাকুরকে ভুলে ওরা কেন বিদেশীদের পুজো করে? সুভাষচন্দ্রকে গালাগাল দেয়, গান্ধীজীকে অপমান করে, এমন কি বন্দেমাতরম্ বলে না! এরা কি নিজের দেশকে ভালবাসে?’’

সূর্যর খুব মজা লাগছিল উদ্ভেজনা দেখে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে কিছুদিন আগে। কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং তারা দেশের শত্রু—এই বলে তাদের কাজকর্মের ওপর সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তখন অনেক নেতাই আত্মগোপন করেছিলেন। এখন অবশ্য আর নিষেধাজ্ঞা নেই, তবু দেশের অনেক মানুষ তাদের সন্দেহের চোখে দ্যাখে। ফটিক তাদের একজন।

সূর্য জিজ্ঞেস করল, ‘‘আমাকে কি করতে হবে বলো?’’

‘‘তোমাকে বলতে হবে তুমি কমিউনিস্ট নও।’’

‘‘তুমি বললে কমিউনিস্টরা বন্দেমাতরম্ বলে না, অথচ আমি ছাত্রদের বন্দেমাতরম্ বলতে শেখাই, তার মানে বুঝিয়ে দিয়েছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের শহীদদের গল্প বলি। তা হলে?’’

‘‘হ্যাঁ, সেটাও ঠিক।’’ ফটিককে একটু বিভ্রান্ত দেখাল।

‘‘আমি আমার দেশকে ভালবাসি। দেশের মানুষের উন্নতি চাই। কিন্তু শুধু ভালবাসা দিয়ে কাউকে উন্নত করা যায় না, তার জন্যে একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি চাই। কংগ্রেস একটা সেটিমেন্টের নাম, যে সেটিমেন্ট দেশকে ভালবাসতে, দেশের জন্যে আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু কীভাবে দেশকে গড়ে তুলতে হয়, তা শেখায়নি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না পেলে কোনও দেশ সত্যিকারের স্বাধীন হয় না। দেশের একদল লোক প্রচুর অর্থ নিয়ে বাস করবে আর বাকিরা নিঃস্ব হবে, এমন দেশ কখনও বড় হতে পারে না। সেই দিক চিন্তা করলে কমিউনিজমের মূল তত্ত্ব আমাদের দেশের পক্ষে অনেক বেশি প্রকৃতি বলে আমি মনে করি। তবে সেটাকে আমাদের দেশের সঙ্গে মানানসই করে নিতে হবে। যা ভাল তাকে ভাল বলতেই হবে ফটিক।’’ সূর্য দৃঢ় গলায় বলল।

‘‘তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।’’ ফটিক বলল।

‘‘বিবেকানন্দের নাম শুনেছ?’’

‘‘বাঃ, শুনব না? রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য!’’

“তিনি কি কমিউনিস্ট ছিলেন?”

“খ্যাত, কি উলটোপালটা বলছ!”

“তোমাদের ভবেন গোস্বামীকে গিয়ে বলো, একজন ঘোষণা করেছে—সমাজ যাদের এতদিন পতিত করে রেখেছিল সেই পতিতদের ভাই বলতে হবে,—দেখো উনি তৎক্ষণাৎ লোকটাকে কমিউনিস্ট বলবেন! বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন, তিনি ভগবানকে খুঁজে পেয়েছিলেন জীবের মধ্যে। ওঁর চোখে বিবেকানন্দও কমিউনিস্ট! তা হলে আমার কমিউনিস্ট হতে অসুবিধে কী!” সূর্য থামল, “ভয় পাচ্ছ কেন, তুমি আমাকে আশ্রয় দিয়েছ বন্ধুর মতো, তোমার কোনও ক্ষতি হোক আমি চাইব না, আমি অন্য কোথাও ঘরভাড়া করে চলে যাব।”

“থাক, আর দয়া দেখাতে হবে না! আমি বুঝতে পারিনি বলে ওসব কথা বলেছি। তোমার মতো আমার পেটে বিদো থাকলে নিশ্চয়ই বলতাম না। তুমি মাস্টার আর আমি পান-সিগারেটের দোকানদার, তফাত তো হবেই। হ্যাঁ, ঘরভাড়া করে চলে যাওয়ার মতলব ছাড়া। ভবেন গোস্বামী আবার কিছু বললে আমি এবার ঠিক জবাব দিতে পারব।”

ফটিক হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

॥ ৮ ॥

দুটো লাঠিতে জালের দুই প্রান্ত শক্ত করে বাঁধা, আর একটি ডেকোণা বাঁশের কাঠিতে জাল আটকানো—ফুদিরাম সেসব নিয়ে সামনে চলছিল, পেছনে সূর্য। বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে ওরা বুনা ঝোপ এড়িয়ে একটা ছোট নদীর গায়ে এসে পড়ল। নদীর ওপারেই গভীর জঙ্গল। বেশ কয়েক মাইল জুড়ে জঙ্গল ক্রমশ এগিয়ে গিয়েছে ভূতানের পাহাড়ে। এর সর্বত্র মানুষের যাতায়াত নেই। হিংস পশুদের অস্তিত্ব প্রায়ই টের পাওয়া যায়, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তারা গোক ছাগল নিয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। ওই জঙ্গলের বুক চিরে ঝোরা অথবা বরনা বয়ে যায় চুপচাপ। ফুদিরাম সেইখানে যায় মাছ ধরতে :

নদীটায় জল কম। নীচের রঙিন পাথর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সূর্য লক্ষ্য করল, ছেনেটা জানে কোন্ জায়গা দিয়ে নদী পার হলে জল তার কোমরের ওপর উঠবে না। জলে নামার আগে একটা গামছা পরে নিয়েছে সে, মাথার ওপর ভাল এবং প্যান্ট উচিয়ে ধরেছে। সূর্যর শরীর লম্বা বলে জল হাঁটুর সামান্য ওপরে উঠল মাত্র। নদী পার হওয়ার সময় সে জিঞ্জেরস করল, “ওদিকে তো পুল ছিল, গেলে না কেন?”

“বাঃ, পুল দিয়ে গেলে সবাই জেনে যাবে না!”

তা অবশ্য ঠিক। আজ ফুদিরামকে কেউ-কেউ নিষেধ করেছে জঙ্গলে ঢুকতে। সূর্যর অনুরোধে সে রাজি হয়েছে নিষেধ অমান্য করতে, ফলে প্রকাশ্যে পা না ফেলে আড়াল তো খুঁজবেই। এ নদী পাহাড়ী, তাই ভাল বেশ ঠাণ্ডা। যেহেতু চওড়ায় বেশি নয়, তাই পা অবশ্য হয়ে গেল না।

জঙ্গলে ঢোকামাত্র পাখিরা চিৎকার করে উঠল। সূর্য লক্ষ্য করল, এইসব জঙ্গলের নীচের অংশে অজস্র লতাপাতা, বুনা ঘাস, ঝোপঝাড় ছড়ানো, কোনও মানুষের পক্ষে স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলা অসম্ভব। কিন্তু মানুষের চলাচলের কারণে সরু পথ ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে। ফুদিরাম সেই চিহ্ন ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। সূর্যকে বারংবার মাথা নিচু করতে হচ্ছিল ডালপাতার আঘাত এড়াতে। পাখিরা চিৎকার করে যাচ্ছে সমানে।

হঠাৎ ফুদিরাম দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মুখের পাশে হাতের আঙুল রেখে অদ্ভুত গলায় পাখির ডাক নকল করতে লাগল। সূর্য অবাধ হয়ে ওনল, পাখিদের প্রতিবাদ কমে আসছে এবং একসময় শান্ত হয়ে গেল। ফুদিরাম এবার তার দিকে তাকিয়ে খুশির হাসি হাসল।

সূর্য জিঞ্জেরস করল, “এটা কি হল?”

“খানি না। তবে গাছে বসা পাখিরা যখন চিৎকার করে তখন বাইরে থেকে উড়ে আসা পাখিদের এমন ডাক ডাকতে শুনেছি। ওই ডাক শুনলে পাখিদের রাগ আর থাকে না।”

ফুদিরাম বলতে শুরু করলে সূর্যর মনে পড়ল এই ছেনেটা যে-কোনও শব্দ কয়েকবার শুনলেই ঠিকঠাক বলে দিতে পারে। তা সে পাখির ডাক হোক অথবা বাংলা কবিতা। চট করে সূর্যর মনে রবীন্দ্রনাথের লাইনগুলো চলে এল, “পাখিরে দিয়েছ গান গায় সেই গান তার বেশি করে না সে দান, আগারে দিয়েছ ঘর আমি তার বেশি করি দান, আমি গাই গান।”

“এই জলে মাছ নেই!” ফুদিরামের গলা কানে যেতেই বাস্তবে ফিরে এল সূর্য। সে দেখল ওরা এক ঝরনার ধারে এসে দাঁড়িয়ে আছে। জল আদৌ গভীর নয়। চওড়াতেও কম। জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে পাশের নদীর দিকে কোনমতে এগিয়ে যাচ্ছে।

ফুদিরাম ঝরনা পার হল। ওর পরামর্শে সূর্যও খালি পায়ে এসেছে। তার কোনও কেড্‌স নেই, থাকলে সেটা পরে এলে আরাম হত। অবশ্য জলে নামার সময় খুলে নিতেই হত।

জঙ্গল এখন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। পায়ে চলার পথটা আর নেই। ফুদিরাম বলল, “এর ভেতরে একটা বড় ঝরনা আছে। একা যেতে আমার ভয় করে বলে সেখানে যাই না। আপনি আজ আছেন তাই সেখানে যেতে পারি। যাবেন?”

“চলো।”

জঙ্গল এদিকে প্রায় অন্ধকার। ঘন ছায়া চারধারে চেপে বসে আছে। সূর্যদেব যে মাথার ওপরে, তা হঠাৎ-হঠাৎ বোঝা যাচ্ছে। সূর্য আশা করছিল এর মধ্যেই মানুষজনের আওয়াজ পাবে। যারা ফুদিরামকে আজ এখানে আসতে নিষেধ করেছে, তাদের নিশ্চয়ই একটা মতলব আছে যার কোনও সাক্ষী রাখতে চায় না। কিন্তু ক্রমশ সে হতাশ হচ্ছিল। মাঝে মাঝে বানরের দুইমি ছাড়া কোনও আওয়াজই পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ ফুদিরাম তাকে ইশারা করল দাঁড়িয়ে পড়তে। তারপর হাত বাড়িয়ে বাঁ দিকটা দেখাল। সূর্য প্রথমে বুঝতে পারেনি, তারপর ঠাণ্ড করত হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠল। সাপ! এতবড় সাপ সে জীবনে দ্যাখেনি। সমস্ত গায়ে শ্যাওলা পড়ে গেছে। চোখ মেলে তাদের দেখছে। এ নির্ঘাত অজগর। সঙ্গে একটা লাঠিও নেই যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা যাবে।

কিন্তু সাপটা নড়ছে না। ফুদিরাম ফিসফিস করে বলল, “একটু আগে কিছু খেয়েছে।”

সূর্য দেখল পেটের কাছটা বেচপ ফুলে আছে। যা খেয়েছে তা এখনও পেটজুড়ে আছে, হজম করতে পারেনি। মানুষ গল্প বলে, অজগর নাকি প্রস্থানে কাছে টেনে গিলে ফেলতে পারে। ব্যাপারটা গল্পই। কিন্তু ওর সামনে পড়ে গেলে এই ফুদিরামকেও যে পেটে চালান করতে সক্ষম তা আকৃতি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ফুদিরাম যতটা দূরত্ব রেখে সম্ভব এগিয়ে গেল। ওটাকে মারা কোন চেষ্টাই করল না। সূর্যর মনে হল, এই জঙ্গলে ওই বাচ্চা ছেলোটোর ওপর তাকে নির্ভর করতে হবে, কারণ ওর অভিজ্ঞতা তার থেকে অনেক বেশি। বই-এর বর্ণমালা সে ফুদিরামকে শেখাতে পারে, কিন্তু জঙ্গলের বর্ণমালা শেখার ব্যাপারে সে ওর ছাত্র।

“তুমি কোন্ ঝরনায় মাছ ধরো?”

“ওপাশে। তিন-তিনটে ঝরনা আছে ওপাশে।”

“এদিকে কেন যাচ্ছ?”

“বললাম না, এদিকে একা আসতে ভয় লাগে।”

“কিন্তু এদিকে যে ঝরনা আছে, তা তুমি জানো?”

“হ্যাঁ। ওই ঝরনাগুলো যে এদিক থেকেই বেরিয়েছে।” বলতে-না-বলতেই ওরা জল দেখতে পেল। চওড়া নয় কিন্তু কোমর পর্যন্ত গভীর জল গভীরভাবে বয়ে যাচ্ছে। তার ওপর গাছগাছালির ডালের ছায়া পড়ায় জলের রং প্রায় কালো দেখাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে ফুদিরামের মুখ হাসিতে ভরে গেল, “মাস্টারমশাই, এই ঝরনায় অনেক মাছ আছে।”

“কি করে বুঝলে?” সূর্য জলের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে পারল না।

সঙ্গে সঙ্গে কাছে লেগে গেল ফুদিরাম। লাঠি দুটো জলের দু-পাশে পুঁতে ফেলতেই জালটা হুড়িয়ে গেল জলে। এখন তিরতিরে স্রোত জাল ভেদ করে বয়ে যাচ্ছে। জালের প্রান্ত যাতে মাটি ছুঁয়ে থাকে সেই চেষ্টা করে ফুদিরাম পাড় ধরে হেঁটে গেল কিছুটা। এখন ওর পরনে গামছা। মুখচোখ পাকা শিকারির মতন। এই ছেলে তার মুখে শুনে শুনে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘ছাড়পত্র’ কবিতাটা আবৃত্তি করেছিল, তা কি বিশ্বাস করা যায়? যে অক্ষর চেনে না, সে ‘নবজাতকের জন্যে এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে যাব আমি’ কী দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিল স্মৃতি থেকে। গায়ে কাঁটা ফুটেছিল সূর্যর, আর সেই ছেলে এখন ধূর্ত চিতার মতো উজানে গিয়ে জলে নামছে তেতোগো জাল নিয়ে। বুক ছুঁয়ে গেল জল। সূর্যর দিকে তাকাচ্ছে না সে। জলের ভেতর বৈঠা টানার মতো হাতের তেতোগো কাটিতে আটকানো জাল জলে টানছে আর এগিয়ে আসছে পায়ে-পায়ে।

জল একটু গভীর হতেই ওর গলায় পৌঁছল। শক্তিত হন সূর্য। সাতার জানে তো! নইলে যে ডুবে যাবে! না, আবার জল কম। এবার এক আশ্চর্য দৃশ্য চোখের সামনে! খলবল করতে করতে নানান সাইজের মাছ জল থেকে লাফিয়ে কাঠিঝালে পড়তে লাগল। তারা অবশ্যই চেয়েছিল জাল ডিঙিয়ে ওপারে চলে যেতে, কিন্তু সাথে কুলোল না। একে একে জালবন্দি হতেই ফুদিরাম পৌঁছে গেল ওদের কাছে। একপাশের কাঠি মাটি থেকে তুলে সতর্পণে দুই কাঠি এক করে এপাশে নিয়ে এল জালটা। কমপক্ষে দশ-বারো সের মাছ এখন ঘাসের ওপরে। এই মাছ, যাদের ওজন একপোয়া থেকে তিনপোয়া, অবলীলায় আড়াই টাকা সেরে বিক্রি হয়ে যাবে সহজপুরের হাটে! ছেলেটা যখন মাছ নিয়ে ব্যস্ত তখন সূর্য তাকে জিপ্সেস করল, "আচ্ছা ফুদিরাম নামে আর একজন বিখ্যাত মানুষ ছিলেন, জানো?"

"জানি।" নাহুলোকে কন্দনা করতে করতে ফুদিরাম झবাব দিল গান গেয়ে, "একবার বিনাম দে মা ঘুরে আসি।"

"এ গান তুমি শুনে কোথায়?"

"পুজোর সময় স্কুলের মাঠে যাত্রা হয়েছিল, সেখানে গানটা গেয়েছিল। হরিজ্যাঠা বলেছিল, ওই খুদি ছেলেটা বাচ্চা ছিল বলে বড়রা যা বুঝিয়েছে তাই বুঝেছে। আর একটু বয়স হলে কখনোই বোম মারতে যেত না, ফাঁসিও হত না!"

মাছগুলোর ব্যবস্থা করে ফেলল ফুদিরাম।

"ফুদিরাম দেশকে ভুলিবাসতেন। ইংরেজদের অত্যাচারের প্রতিবাদ তিনি সবসময় করতেন।"

"কি ফাঁসি, হরিজ্যাঠা তো তাই বলল!"

"তুমি হলে কি করত?"

"আমি হলে বোম মারতাম, কিন্তু ধরা পড়তাম না। ধরা না পড়লে ফাঁসি হত না।"

সূর্য অবাক হয়ে থাকাল। "সাবাস, বাংলাদেশ, এ পৃথিবী/অবাক তাকিয়ে রয় / জ্বলে-পুড়ে-মার হারখার তবু / মাথা নোয়াবার নয়।" হঠাৎ সূর্য গলা তুলে বলল, "এবার লোকের ঘরে ঘরে যাবে / সোনালি নয়কো, রঙে রঙিন ধান / দেখবে সকলে সেখানে জ্বলছে / দাউ দাউ করে বাংলাদেশের প্রাণ।"

জ্যাস্ত মাছ হাতে নিয়ে ফুদিরাম বলল, "আপনি কি সুন্দর কথা বলেন!"

সূর্য হাসল, "এ আমার কথা নয়। কাল রাতে বইয়ে যার ছবি দেখলে, তাঁর কথা। যাকগে, অনেক মাছ ধরা হল, আর ভাল ফেলার কি দরকার আছে?"

"কোনও-কোনও দিন এক সেরও হয় না,—আজ যখন প্রথমবারেই এত উঠেছে তখন আর-একবার ধরব। খুব ভাল বিক্রি হবে আজ, মা খুশি হবে।"

"কিন্তু তুমি এত ওজন বয়ে নিয়ে যাবে কি করে?"

"পারব।" ফুদিরাম তার লটবহর নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল झঙ্গল সরিয়ে। জালগুলোকে বর্মের মতো ব্যবহার করছে সে। হঠাৎ অদ্ভুত গলায় একটা পাখি ডেকে উঠল—কুট-কুট-কুট-কু-উ-উ-উ। ওরা চারপাশে তাকিয়েও পাখিটাকে দেখতে পেল না। কয়েক সেকেন্ড বাদে আবার ডাকটা ভেসে এল পাতার আড়াল থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ফুদিরাম নেটাকে নকল করল। অবিকল। তারপরেই ডানা ঝটকাবার আওয়াজ এবং একটা বিশাল পাখি নেমে এল নীচের ডালে, যার লেজের দৈর্ঘ্য অদ্ভুত এক হাত। ঘন নীলের ওপর দুটো হলুদের লাইন টানা শরীর নিয়ে পাখিটা ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল ওদের। ফুদিরাম আবার ডাকটাকে নকল করতে পাখিটা কীরকম রেগে গেল, তার লোম ফুলে উঠল—'ক্কাও' শব্দটাকে ধমকের ভঙ্গিতে ছুঁড়ে দিয়ে লেজ সামলে উড়ে গেল চোখের সামনে থেকে। শব্দটাকে শোনাল অনেকটা 'দূর হও'-এর মতন।

ফুদিরাম হেসে বলল, "রেগে গেছে খুব!"

ঠিক তখন শব্দটা এল। झঙ্গলের ভেতর কোথাও করাত চলছে। করাতের দাঁতের সঙ্গে গাছের ঘর্ষণের আওয়াজ চাপা গোঙানির মতো ছড়িয়ে পড়ছে झঙ্গলের খাঁজে-খাঁজে।

ফুদিরামের হাসি উধাও হয়ে গেল, "ওরা!"

"কারা?"

“যারা আমাকে আসতে নিষেধ করেছিল!”

“কী করে বুঝে?”

“ফরেস্টের লোক কাঠ কাটে কুড়ল দিয়ে, ওরা করাত দিয়ে কাটছে!”

সূর্য কান পেতে শব্দটা কোনদিক দিয়ে আসছে বোঝার চেষ্টা করল। তারপর পা বাড়াল। চাপা গলায় ফুদিরাম বলল, “ওদিকে যাবেন না।”

“না, ওরা যদি অন্যায় করে তা হলে বাধা দেওয়া দরকার।” সূর্য বলল, “তুমি মাছ ধরে এখানে অপেক্ষা করো আমার জন্যে, আমি দেখে আসি।”

“ওরা যদি জানতে পারে আমি আপনাকে নিয়ে এসেছি, তাহলে আর কোনদিন মাছ ধরতে দেবে না। ওরা আমাকে বলেছে ফরেস্ট থেকে মাছ ধরা নাকি অপরাধ।”

সূর্য থমকে দাঁড়াল। ঠিক কথা। ঝরনার মাছ তো ফরেস্টের সম্পদ। শুধু গাছ অথবা জন্তু নয়, মাছ ধরে নিয়ে যাওয়াও অপরাধ বলে গণ্য হওয়া উচিত। তাহলে ফুদিরামের সঙ্গে মাছ ধরতে এসে সে নিজেও অন্যায় করেছে। সে ঠিক করল, ছেলেটাকে নিয়ে রেঞ্জারের কাছে যাবে। ভদ্রলোককে অনুরোধ করতে হবে অনুমতি দিতে। সূর্য বলল, “ঠিক কথা। আশ্রয় যা করেছ, তা তো ধরাই হয়ে গেছে। তুমি আর ভাল ফেলো না—এখানে অপেক্ষা করো, তুমি যে আমাকে নিয়ে এসেছ তা কেউ জানবে না।”

“ওরা ঠিক জানতে পারবে।”

“তা হলে তুমি চলে যাও। সাবধানে যাবে, যাতে কেউ তোমাকে না দ্যাখে।”

“কী করে যাব? সেই সাপটা যে ওখানে আছে!”

“সাপটা এখন তোমাকে কিছু বলবে না। ওর পেটভর্তি খাবার আছে। বনের জীবজন্তু খিদে না থাকলে কাউকে আক্রমণ করে না। তুমি বাড়ি চলে যাও।” সূর্য এমন গলায় বলল যে ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও ফুদিরাম পা বাড়াল। যাওয়ার আগে জলের দিকে করণ চোখে তাকাল সে।

ছেলেটা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর সূর্য শব্দটাকে লক্ষ্য করে এগোতে লাগল। এই ঘন জঙ্গল ভেদ করে হাঁটা খুব মুশকিল। প্রত্যেকটা পা ফেলার আগে দেখে নিতে হচ্ছে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে কিনা। এই জঙ্গলে একটিমাত্র অজগর থাকবে এমন হতেই পারে না, অন্য বিযধর সাপেরাও চূপ করে বসে থাকবে না। এর মধ্যে অনেকবার জামাকাপড় থেকে জৌক সরাতে হয়েছে। দুটো বানর একটা লিচু-ডালে বসেছিল, সূর্যকে দেখেই দাঁত বের করে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল। সূর্য হাত তুলে মারবার ভঙ্গি করতেই দুন্দাড় করে পালাল তারা।

যত এগিয়ে যাচ্ছিল, শব্দটা তত বাড়ছিল। গাছের আড়ালে আড়ালে খানিকটা হাঁটার পর মানুষের গলা কানে এল। কেউ চিৎকার করল, “তাড়াতাড়ি হাত চালা।”

জবাব ভেসে এল, “সন্ধের আগে কাজ হয়ে যাবে। তুমি শুধু জন্তু-ভানোয়ারদের সামলাও।”

এবার হাসির শব্দ, “যা আওয়াজ হচ্ছে, বাঘ-ভালুক এদিকে আসবে না। ভয় হচ্ছে মানুষকে।”

“কেউই আজ জঙ্গলে ঢুকবে না। ঢুকলে খতম হয়ে যাবে।”

আর একটু এগোল সূর্য। মাঝখানে অনেকটা জায়গা ফাঁকা পড়েছিল, অনেকটা ঘন চুলের মাঝখানে টাকের মতো। সেখানে জনাকয়ক লোক কাজ করছে। চারজন করাত দিয়ে কাঠ কাটছে, বাকিরা সেই কাঠের খাঁচা বানাচ্ছে। সূর্য ভেবেছিল এরা জঙ্গল থেকে কাঠ চুরি করতে এসেছে, কিন্তু ব্যাপার সেখাে সেরকম মনে হল না। ইতিমধ্যে দুটো খাঁচা তৈরি হয়ে গিয়েছে, আরও দুটো বানাবার তোড়জোড় চলছে। দু’জন লোকের হাতে বন্দুক, তারা পাহারা দিচ্ছে।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করার পর সে দৃশ্যটা দেখতে পেল। ওপাশের জঙ্গলে হ্যাট-হ্যাট শব্দ ছিটকে উঠল। তারপর যেভাবে লোকে গোরু-ছাগল টেনে নিয়ে যায় দড়ি বেঁধে, সেইভাবে চারজন লোক আটখান; হরিণকে টানতে টানতে নিয়ে এল ফাঁকা জায়গায়।

বন্দুকধারীদের একজন হাসল, “আহা, কী মাংস রে! জিভে জল আসছে।”

“তোমার জিভে যাওয়ার জন্যে এদের ধরা হয়নি। জ্যাঙ্গ পাচার করতে হবে।”

“বাবের বাচ্চাগুলো কোথায়?”

“এখনও গর্তে রেখেছি। বাঘিনীটা টহল মারছে। বেরোবার মুখে একবারে তুলে নেব।”

“নে, তাড়াতাড়ি হাত চালা। সন্দের আগেই গাড়ি এসে যাবে।”

সূর্য দেখল হরিণগুলো ছটফট করছে মুক্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু ওই দড়ির বাঁধন হেঁড়ার শক্তি তাদের নেই। লোকগুলোর চেহারা তার পরিচিত নয়। সহজপুরের সবাইকে সে চেনেও না, এখন ওদের সামনে গিয়ে বীরত্ব দেখানো মানে আত্মহত্যা করা। খাঁচায় বন্দী করে এদের নিয়ে তো ওদের সহজপুর দিয়েই যেতে হবে!

সূর্য ধীরে ধীরে পিছু হাঁটল। হঠাৎ ঠকাস করে কিছু একটা মাথায় এসে লাগতেই তার মুখ থেকে উঃ আওয়াজ ছিটকে বের হল। কপালে হাত দিয়ে মুখ তুলতে সে অভিনব দৃশ্য দেখতে পেল। বিরাট এক বানরের দল গোল-গোল ফল হাতে নিয়ে সামনের গাছগুলোর ডালে ডালে বসে আছে তার দিকে চেয়ে। প্রতিটি মুখ হিংস্র।

“ওখানে একটা আওয়াজ হল মনে হচ্ছে।” চিংকারটা ভেসে এল।

সূর্য বুঝল, এখনই ওরা এদিকে খোঁজ নিতে আসবে। সে চট করে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়তেই কয়েকটা ফল আশেপাশে আছড়ে পড়ল। এই সময় “এদিকে কে আসবে, ভুল গুনেছিস!” বলতে-বলতে ডালপালা সরিয়ে কেউ-কেউ এগিয়ে আসছিল। সূর্য ডেবে পাচ্ছিল না ঝোপ থেকে বের হবে কিনা। হঠাৎ “ওরে বাবা রে, গেছি, মরে গেছি।” বলে চিংকার করতে করতে দুদাড় করে পালিয়ে যাওয়ার শব্দ কানে এল। সূর্য মুখ বের করে দেখল সন্দেরা ডালে-ডালে লাফিয়ে তাড়া করেছে ওদের। তারপরেই বন্যুকের আওয়াজ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বানরগুলো উধাও।

“অ্যাঁ, গুলি করলি কেন? শব্দ হল খেয়াল নেই?”

“আমাকে বানরগুলো টিল মেরে খতম করবে আর আমি চুপচাপ হজম করব।”

“বানরেও টিল মারে, হে হে হে।”

“অ্যাঁ চুপ, কাজ কর চটপট!”

সূর্য দ্রুত হাঁটছিল। মাথার সামনেটা ইতিমধ্যে ফুলে উঠেছে। বাপস! যেহেতু কিছুক্ষণ আগে সে বানর দুটোকে মারার ভয় দেখিয়েছিল, তাই ওরা এভাবে বদলা নিল—ভাষা যায়। মানুষও এত তাড়াতাড়ি একত্রিত হয় কি না সন্দেহ আছে।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে বেশ সময় লাগল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল গাছের আড়ালে আড়ালে অনেক চোখ পাহারা দিচ্ছে, অতএব সতর্ক হয়ে হাঁটা দরকার। এইজন্য যেতে যে সময় লেগেছিল, ফিরতে অনেক বেশি লাগল। দ্বিতীয়ত, সে ক্ষুদিরামের সঙ্গে ঢুকেছিল নদী পার হয়ে, কিন্তু সেই পথ গুলিয়ে ফেলায় ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে সে চলে এসেছিল পিচের রাস্তায়। সহজপুরের দিকে হাঁটার সময় সে গাড়ির আওয়াজ পেতেই মুখ ঘুরিয়ে দেখল সেই কালো অস্টিনটা আসছে। এখন আর নিজেকে আড়াল করার কোনও উপায় নেই। গাড়িটা পাশে এসে দাঁড়াল। সূর্য দেখল ড্রাইভার ছাড়া গাড়িতে আর কেউ নেই। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, “সহজপুরে যাবেন তো? উঠে পড়ুন।”

সূর্য উঠল। ইতিমধ্যে সে বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল। “বেড়াতে এসেছিলেন বুঝি?”

“হ্যাঁ ভাই। জঙ্গলের ভেতর হাঁটতে খুব ভাল লাগে।”

“আসবেন না। এদিকে একটা বাঘিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে, সামনে পড়লে আর দেখতে হবে না। তা আপনার জামা ছিঁড়ল কী করে?” গাড়ি চালাতে চালাতে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল।

সূর্য চমকে নিজের শার্টের দিকে তাকাল। কাঁধের কাছটা ছিঁড়ে গেছে। ড্রাইভারই উত্তর দিল, “জঙ্গলের ভেতরে ঢুকেছিলেন বুঝি? ওটা কাঁটায় হেঁড়া।”

সূর্য কোনও কথা বলল না। কিন্তু বুঝল, ড্রাইভার বেশ মজা পেয়েছে।

সহজপুরের বসতি শুরু হয়েছে যেখানে, সেখানে নেমে পড়ল সূর্য। তার বাসস্থান কাছেই। গাড়িটা চলে যেতে তার মনে হল একবার ক্ষুদিরামের খবর নিয়ে যাওয়া দরকার। তারপর যা করার করা যাবে। সে সোজা ক্ষুদিরামের বাসায় চলে এল। নাম ধরে ডাকতেই তার মা বেরিয়ে এলেন, “সে বাড়ি নেই।”

“কোথায় গিয়েছে?”

“মাছ ধরতে যাবে বলে জাল নিয়ে গেছে।”

“সে কি! মাছ ধরে ফেরেনি?”

“না তো! কেন, কি হয়েছে?”

সূর্য চিত্তায় পড়ল। এই বয়স্কা মহিলাকে কিছু বলা ঠিক হবে না। মুখে বলল, “না, কিছু হয়নি। ও বাড়ি ফিরলে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।”

সূর্য বাড়িতে গেল না। এখন অনেক কাজ বাকি। কিন্তু ফুদিরাম কোথায়? বাড়ি ফিরতে এত দেরি হওয়ার কথা নয়! পথ তার চেনা এবং অনেক আগে সে বেরিয়েছে। ওরা কি তাকে ধরে ফেলেছে? জঙ্গলের ভেতর যা ঘটছে তার কিছুই অবশ্যই ফুদিরাম দ্যাখেনি, তবু অবাধ্য হওয়ার জন্য শাস্তি দিচ্ছে কি? ছেলেটার আর জঙ্গলে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, শুধু তার অনুরোধে গিয়েছিল। অবশ্যি বাড়িতে লাগল সূর্যর।

এখন বিকেল হতে দেরি নেই। স্কুলের মাঠে এসে দেখল, ছুটির দিনেও কিছু ছেলে খেলাধুলো করছে। সে প্রথমে তাদের উপেক্ষা করে চৌমাথায় চলে এল। ফটিক তখন সবে বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে ফিরে দোকান খুলছে। সূর্যকে দেখতে পেয়ে বলল, “কী হে, কোথায় গিয়েছিলে? ভাত খাবে না বলে গেছ?”

সূর্য বলল, “ভাই ফটিক, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। এখনই কিছু করতে হবে।”

“কি সর্বনাশ?” ফটিক দোকান থেকে নেমে এল।

‘সর্বনাশ’ শব্দটা কানে যাওয়ায় আরও কয়েকজন এগিয়ে এল। সূর্য তখন ঘটনাটা জানাল, “জঙ্গল থেকে নিরীহ দাসী পশুদের ধরে চালান করা হচ্ছে, এখনই পুলিশকে জানানো দরকার।”

সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর ফটিক জিজ্ঞেস করল, “তুমি ওদের কাউকে চিনতে পারলে?”

“না। মনে হল সহজপুরের কেউ নয়। দেরি করা উচিত হবে না।”

“কিন্তু থানা তো এখান থেকে অনেক দূর। পুলিশ যে খবর পেলেই আসবে তার নিশ্চয়তা নেই।”

আর-একজন বলল, “এ নিয়ে এত দৃষ্টিভঙ্গি করার কি আছে? কেউ জঙ্গল থেকে কিছু নিয়ে যাচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে ফরেস্ট অফিস আছে। আমরা কেন ঝামেলায় জড়াব।”

দেখা গেল অনেকেই এই বক্তব্যের সমর্থক। সূর্য ফটিককে বলল, “একটা বাচ্চা ছেলে যে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে আর বাড়ি ফেরেনি। মনে হচ্ছে ওরা ওকে আটকে রেখেছে। ওকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না।”

“কোন ছেলে? কি নাম?”

“ফুদিরাম। ফরেস্ট থেকে মাছ ধরে এনে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে বিক্রি করে।”

একজন বলে উঠল, “তা যদি বলেন, সেটাও বেআইনি, অন্যায়!”

সূর্য আর দাঁড়াল না। সে সোজা স্কুলে চলে এল। সহজপুরে থানা নেই, ফরেস্ট অফিসও কাছাকাছি নেই। এখানকার লোকজনদের কথাবার্তাও খুব আশাশ্রুদ নয়।

“মাস্টারমশাই!”

সে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল শিবনাথ আর অমৃত দাঁড়িয়ে আছে।

“আপনার কি হয়েছে মাস্টারমশাই?”

হঠাৎ সূর্যর মনে হল, এরা পারে। বড়রা যে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে, তা এরা করে দেখাতে পারে। সে বলল, “খুব বিপদ, তোমরা আমাকে সাহায্য করবে?”

শিবনাথ অমৃতর দিকে তাকাল। নতুন মাস্টারকে এভাবে কথা বলতে তারা কখনও শোনেনি।

“আমাদের কি করতে হবে?” অমৃত জিজ্ঞেস করল।

ওদের কথা বলতে দেখে অন্য ছেলেরাও খেলা থামিয়ে কাছে চলে এসেছিল। সূর্য বলল, “তোমরা জানো, জঙ্গল হল জাতীয় সম্পত্তি। সাধারণ মানুষের উপকারের জন্যে সরকার ওই জঙ্গলকে সংরক্ষিত করেছেন। যে-দেশে জঙ্গল নেই সে-দেশে বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টি না হলে চাষবাস বন্ধ। এই কারণে জঙ্গলে গিয়ে অনুমতি ছাড়া কাঠ কাটা দণ্ডনীয়। আমাদের জঙ্গলে যেসব জীবজন্তু রয়েছে তাদের সংখ্যা চোরা-শিকারীদের জন্যে কমে যাচ্ছে। এই যে হরিণ, এদের হয়তো কয়েক বছর পর আর কোথাও দেখতেই পাবে না—যদি চোরা-শিকারীদের শিকার বন্ধ করা না যায়। আজ আমি জঙ্গলে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে দেখি কিছু দুট্ট লোক হরিণ, বাঘের বাচ্চা ধরে খাঁচায় ঢোকাচ্ছে। একটু পরেই ওরা সেই খাঁচাসমেত জন্তুদের নিয়ে যাবে বড়লোকদের কাছে বিক্রি করতে। হয়তো দেশের বাইরেও পাঠাতে পারে। আমাদের প্রত্যেকের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো উচিত।” সূর্য কচি-কচি মুখগুলোর দিকে তাকাল, “তোমরা সবাই ফুদিরামকে তো চেনো, তাই না?”

“মাছওয়ালা ফুদিরাম?” অন্ত জানতে চাইল।

“হ্যাঁ, ও মাছ বিক্রি করে। তোমাদের বয়সী একটি ছেলে নিজের এবং মায়ের খাওয়া-পরা চালাবার জন্যে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে মাছ ধরে। পেটের খিদে মেটাতে বেচারি পড়াশোনা করতে পারে না। কিন্তু ছেলেটা খুব ভাল। এই ফুদিরাম আমাকে পথ দেখিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল। বিপদ দেখে আমি তাকে আগেই বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিলাম। কিন্তু সে নিশ্চয় ফিরতে পারেনি, যে করেই হোক তাকে আমাদের উদ্ধার করতে হবে। তোমরা এই বিপদে কি সাহায্য করবে না?”

সবাই চিৎকার করে উঠল, “হ্যাঁ।”

শিবনাথ বলল, “কিন্তু মাস্টারমশাই, আমরা অন্ধকার হয়ে গেলে জঙ্গলে গিয়ে খুঁজব কি করে?”

“না, আমরা জঙ্গলে যাব না। সন্ধ্যা হয়ে গেলেই ওরা এই পথে গাড়িতে থাচাগুলো নিয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে না থাকলে চাপ দিলে জানা যাবে কোথায় ওরা ফুদিরামকে রেখে এসেছে। এখন বুদ্ধি করে ওদের গাড়ি আটকাতে হবে। কিন্তু এত অল্প মানুষের পক্ষে ওদের সঙ্গে পেরে ওঠা যাবে না। ওদের বন্দুক আছে। তোমরা অন্য সবাইকে খবর দাও। বলো, জঙ্গল থেকে নিরীহ হরিণ চুরি হয়ে যাচ্ছে, ফুদিরামকে ধরে রেখেছে, ওদের শাস্তি দিতেই হবে। আধ ঘণ্টার মধ্যে সবাইকে চলে আসতে বলো।” সূর্য বলামাত্র সবাই দূদাড় করে ছুটল।

অন্ত বলল, “মাস্টারমশাই, আমার অনেক মার্বেল আছে, নিয়ে আসব?”

“কি করবে?”

“গুলতিতে মার্বেল পুরে ছুঁড়লে গাড়ির কাচ ভেঙে যাবে।”

সূর্য হেসে ফেলল, “হ্যাঁ, প্রথমে নিশ্চয়ই একটু লড়াই হবে।”

অন্ত ছুটল। শিবনাথ বলল, “মাস্টারমশাই, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।”

“বলো।” ছেলেটার দুইমিমাখা মুখ ভাল লাগল সূর্যর।

শিবনাথ ফিসফিস করে যা বলল, তাতে পূর্ণ সম্মতি দিল সূর্য। এ ছাড়া গাড়ি থামানোর কোনও উপায় নেই। শিবনাথ ব্যবস্থা করতে ছুটল।

এখন ঘন বিকেল। সূর্যর উত্তেজনা বাড়ছিল। যদি সংগঠিত হওয়ার আগেই ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়! নিজেই সে বলল, “মনে হয় না, অপরাধীদের রাতের অন্ধকার সবসময় পছন্দ!”

কিছুক্ষণের মধ্যে পিলপিল করে মানুষ আসতে লাগল। শুধু বালক নয়, পুরুষ এবং মহিলারাও এদের সঙ্গী হয়েছে। সহজপুরে এই দৃশ্য কেউ দ্যাখেনি। যে যা পেরেছে হাতে নিয়ে এসেছে। তা লাঠি অথবা র্বাটি, যাই হোক না কেন। হ্যাঁ, এই মিছিলে সহজপুরের মাতব্বর কেউ নেই। সূর্য সেই জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিল, “আপনারা সবাই পিচের রাস্তায় অপেক্ষা করুন। কোনও ভয় পাবেন না। এত মানুষকে চাপা দিয়ে কোনও ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাবে না। জঙ্গলের ডাকাতরা ফুদিরামকে আটকে রেখেছে, নিরীহ শ্রাণীদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে চড়া দামে বিক্রি করবে বলে, আমরা সহজপুরের মানুষেরা এই অন্যায় কি সহ্য করব?”

সঙ্গে সঙ্গে গর্জন উঠল, “না।”

এই সময় শিবনাথ এসে বলল, “মাস্টারমশাই, কাজ হয়ে গিয়েছে।”

মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। খবর পেয়ে ছুটে আসছে কৌতুহলী হয়ে। শিবনাথকে অনুসরণ করে ফটিক কালভার্টের কাছে গেল। কালভার্ট জুড়ে পেরেক ছাড়ানো হয়ে গেছে। কাঠের মধ্যে পেরেক পুতে কালভার্টের ওপর সোজা করে রাখা হয়েছে। যে-কোনও গাড়ি এই পথে গেলেই তার চাকার বাতাস বেরিয়ে যেতে বাধ্য। সে শিবনাথের পিঠ চাপড়াল, “সাবাশ।”

শিবনাথ লজ্জা পেল যেন, “যখন আমি খুব বদমায়েশি করতাম তখন শিখেছিলাম।”

সূর্য হাসল, “বদমায়েশিটা একদম ছেড়ে দিয়ো না যেন।”

দিন ফুরলো। আলতো পায়ে সন্ধ্যা নামছে। এবং তখনই গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। জঙ্গলের দিক থেকে আওয়াজটা ডেসে আসছে। সূর্য চিৎকার করল, “আপনারা সবাই প্রস্তুত থাকুন। তবে কেউ কালভার্টের কাছে যাবেন না, যতটা সম্ভব দূরে থাকুন।”

একটু বাদেই হেডলাইটের আলো দেখা গেল। দু-দুটো লরি আসছে জঙ্গলের দিক থেকে। বাঁক ঘুরলেই ওরা কালভার্টের ওপর চলে আসবে। সূর্য দেখল কালভার্ট থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে জনতা অপেক্ষা

করছে। লরি দুটো এগিয়ে আসামাত্র সূর্য পিচের রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হুত্ব তুলে খামার জন্য চিৎকার করতে লাগল। হেডলাইটের আলোয় ড্রাইভার অবাক হয়ে তাকেই প্রথম দেখল এবং ব্রেকে আলতো চাপ দিল। কিন্তু ততক্ষণে প্রথম লরিটা উঠে এসেছে কানভার্টের ওপর আর তারপরেই টায়ার পাংচারের আওয়াজ শোনা গেল। গাড়িটা জ্বুথবু হয়ে এগিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে গেল সশব্দে। সঙ্গে সঙ্গে টং শব্দ বাজল। সূর্য বুঝল প্রথম লরির কাচ ভেঙেছে। তারপর আবার আওয়াজ। অন্তর গুলতি অন্ধকার থেকে মার্বেল ছুঁড়ে দিচ্ছে।

এই সময় জনতা হইচই করে ছুটে আসছিল। দ্বিতীয় লরির চাকা ঠিক আছে। কানভার্টে ওঠার আগে তার ড্রাইভার লরি থামিয়ে দিয়েছিল। এই সময় গুলির আওয়াজ শোনা গেল। প্রথম লরির নামনের জানলা দিয়ে গুলি ছুঁড়েছে একজন। সূর্য লাফিয়ে পাদানিতে উঠে তার বন্দুক ধরে টান দিতে লোকটা হুউমাউ করে উঠল। ততক্ষণে জনতা লরির পেছনের দরজা খুলে ফেলেছে। হ্যাঁ, সেখানে খাঁচাওলো রয়েছে। আর খাঁচার পেছনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে ফুদিরাম।

সূর্য তাড়াতাড়ি ওর বাঁধন খুলে দিলেও সে দাঁড়াতে পারছিল না। মুখচোখ ফুলে গিয়েছে মার খেয়ে। এমন সময় সহজপুর থেকে কালো অস্টিন এসে দাঁড়াল ঘটনাস্থলে। গাড়ি থেকে নামলেন ভবেন গোস্বামী, সঙ্গে বলরামবাবু এবং আরও দুজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ আছেন।

ভবেনবাবু জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন, “কি হয়েছে?”

সবাই একসঙ্গে ব্যস্ত বলতে লাগল। ওরা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। সূর্য এগিয়ে গিয়ে বলরামবাবুকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানাতে তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন, “সাবাস! খুব ভাল কাজ করেছে ভাই। মানুষের মতো কাজ করেছে। এই ছেলটিকে এখনই ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও কেউ।”

ভবেন গোস্বামী চিৎকার করে তার ড্রাইভারকে ডাকলেন, “ও বেচারি দাঁড়াতে পারছে না, ওকে গাড়িতে করে নিয়ে যাও ডাক্তারের কাছে। বলরামবাবুর নাম করে বলবে ভাল করে চিকিৎসা করতে।” ফুদিরামকে নিয়ে গাড়ি বেরিয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “এই চোরশিকারিদের ধরা হয়েছে?”

এবং তখনই খোঁজা হল। উত্তেজনার মাঝায় কেউ লক্ষ্য করেনি ড্রাইভার সমেত সবাই অন্ধকারে গা-চাকা দিয়েছে। জনতা যখন খাঁচা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তখনই ওরা স্যুযোগটা নিয়েছে। শুধু যে লোকটা গুলি ছুঁড়েছিল, যার বন্দুক ধরে সূর্য বাধা দিয়েছিল, সে-ই আটকে আছে জনতার হাতে।

লোকটাকে সামনে আনা হল। এর মধ্যে যথেষ্ট চড়-চাপড় পড়েছে ওর ওপর। ভাল করে দাঁড়াতে পারছিল না সে। সবাই মিলে জানাল এই লোকটাই বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ছিল।

ভবেন গোস্বামী বললেন, “তাই নাকি? এত সাহস? বন্দুকটা কোথায়?”

বন্দুকের খোঁজ পড়ল। কিন্তু ওটা পাওয়া গেল না। লরি থেকে নামার সময় লোকটা খালি হাতে নেমেছিল। মনে হয় বন্ধুরা বন্দুক নিয়েই পালিয়েছে।

ভবেন গোস্বামী বলরামবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, “কি করবেন?”

“খানায় খবর পাঠিয়েছি। পুলিশ এসে ব্যবস্থা করবে।”

“কিন্তু বন্দুক না থাকলে প্রমাণ করা যাবে না ও গুলি ছুঁড়েছিল।”

হঠাৎ লোকটা হুউমাউ করে কেঁদে গড়িয়ে পড়ল ভবেন গোস্বামীর পায়ে। ভবেনবাবু একটু পিছিয়ে গিয়ে বললেন, “কেঁদে লাভ নেই। ধরা যখন পড়েছে তখন শাস্তি পেতেই হবে। তবে আমরা কিছু করছি না, আইনমতো ব্যবস্থা হবে।”

বলরামবাবু বললেন, “অসেক ধন্যবাদ মান্যারমশাই। আপনি আজ যা করলেন তাতে আমার খুব গর্ব হচ্ছে। সহজপুরের সবাইকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একত্রিত করেছেন আপনি।”

ভবেন গোস্বামী বললেন, “কথা ঠিকই, তবে এভাবে বাচ্চাদের খেপিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। প্রথম কথা, সন্ধের পর বাচ্চাদের বাড়ির বাইরে থাকা ঠিক নয়। তার ওপর যাদের আটকাতে যাচ্ছে তাদের হাতে বন্দুক রয়েছে। যে-কোনও বাচ্চা খুন হয়ে যেতে পারত, তখন কি হত? ব্যাপারটা সোজা আমাদের এসে বলাটাই উচিত কাজ হত। আপনি কি বলেন?”

বলরামবাবু কিছু বলার আগেই সূর্য জবাব দিল, “আমি চৌমাথায় গিয়ে বয়স্কদের বলেছিলাম, কিন্তু কেউ আমল দেননি। ওই বাচ্চা ছেলটো আর এই জীবদ্বন্দ্বের খাঁচাতে এ-হাড়া আমার কাছে অন্য উপায় ছিল না। ওরা যা করেছে তাতে আমি গর্বিত। বিশেষ করে শিবনাথ এবং অজয়। এই ভবেনবাবু আমাদের সঙ্গে।”

সূর্য ডাকতে ওরা মাথা নিচু করে এগিয়ে এল। সূর্য বলল, “আরে, মাথা নিচু কেন? তোমরা তো আজ বীরের কাজ করেছে, মাথা উচু করো। হ্যাঁ, শিবনাথের বুদ্ধিতে লরির চাকা থেকে হাওয়া বেরিয়ে গেছে আর অস্তুর গুলতি কাচ ফাটিয়েছে।”

ভবেন গোস্বামী হঠাৎ বলে উঠলেন—“তুই—তুই এসব করেছিস?”

তার গলার দ্বারে যে অসন্তোষ ছিল সেটা সবাই বুঝতে পারল। শিবনাথ বলল, “আমি কোনও অন্যায় করিনি। যারা বদমাশ তাদের শাস্তি দিয়েছি।”

সূর্য বলল, “ঠিক কথা। ওই অসহায় প্রাণীদের নিয়ে যারা অবৈধ ব্যবসা করে তারা দেশের শত্রু। ফুদিরামকে হয়তো ওরা মেরে ফেলতে পারত। কিন্তু এবার তোমরা যে-যার বাড়িতে ফিরে যাও। আর কারও এখানে থাকার দরকার নেই।”

ছেলেরা কথা শুনল, কিন্তু বড়রা থেকে গেল কৌতূহলে। পুলিশ চলে এল অল্পসময় পরে। বলরামবাবু ও সি-কে সব বুঝিয়ে বলতে পুলিশ লোকটাকে ভ্যানে তুলে নিল। ঠিক হল, যে লরিটি অক্ষত রয়েছে তাতে করে খাঁচাসমেত ভক্তগুলোকে ভঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে। সেইমতো কাজ শুরু হলে ভিড় ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল।

বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েই সূর্যর মনে পড়ল ফুদিরামের কথা। ওর মা কি জানেন ছেলে হাসপাতালে গিয়েছে! জানলে নিশ্চয় উদ্বিগ্ন হবেন। সে বলরামবাবুকে ব্যাপারটা জানাল। বলরামবাবু বললেন, “ঠিক কথা, কিন্তু এখনি তো বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। হাসপাতাল আঠারো মাইল দূরে। ওঁকে বুঝিয়ে কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি সম্ভব হবে না?”

সূর্য বলল, “হয়তো সম্ভব, কিন্তু আমি আমার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না। ফুদিরাম আমার অনুরোধে ভঙ্গলে গিয়েছিল। ওর অবস্থা এখন কিরকম, ডাক্তার কি বলছেন, সেটা আমার জানা উচিত। আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে।”

ভবেন গোস্বামী বললেন, “আমার গাড়িতে যা তেল আছে একবার হাসপাতাল ঘুরে এলে আর যাওয়া সম্ভব নয়। তাহাড়া ড্রাইভারটা বলছিল ওর ছুর আসছে। ও কি আর যেতে চাইবে?”

সূর্য বলল, “পেট্রোল পাম্প তো সহজপুরেই আছে, বললে কি তেল দেবে না? অবশ্য অসুস্থ হলে অন্য কথা! ঠিক আছে, আমি একটা সাইকেল নিয়ে চলে যাচ্ছি।”

ফটিকের পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের সাইকেল আছে। তিনিও আজ নিজের চোখে সূর্যর কাণ্ড দেখে এসেছেন। অতএব চাওয়ামাত্র সাইকেল দিয়ে দিলেন। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে ফটিকের মায়ের অনুরোধে সূর্যকে কিছু মুখে দিতে হল। সেই সকালের পর এই প্রথম কিছু খাদ্যবস্তু তার পেটে গেল। সূর্য ফটিককে পাঠাল ফুদিরামের মায়ের কাছে, যাতে তিনি বেশি চিন্তা না করেন।

তেমন বুঝলে সে আজ রাতেই ফিরে এসে ফুদিরামের খবর দেবে।

॥ ৯ ॥

নির্জন রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছিল সূর্য। এখন মধ্যরাত। পাকা রাস্তায় একফালি চাঁদের আলো পড়ায় এগিয়ে যেতে অসুবিধে হচ্ছে না। একটু নীত লাগছে, সূর্য জোরে প্যাডেল ঘোরাল।

স্বপ্ন এত যে কাণ্ড ঘটে গেল, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনও বিরাট হাত আছে। যারা ভঙ্গল থেকে জীবজন্তু চুরি করতে এসেছিল তারা কর্মী মাত্র। লোকগুলোর চেহারা এবং কথাবার্তা থেকে এটা স্পষ্ট। পেছনে যে ক্ষমতাবাহী হাত রয়েছে সে ইচ্ছে করলেই ভঙ্গলের দখল দু-দিনের জন্য নিতে পারে। ওই বন্দুকধারীকে ধেরা করলে পুলিশ নিশ্চয় জানতে পারবে, কিন্তু জানতে পারলেও কি কিছু করা সম্ভব, যতক্ষণ প্রমাণ হাতে না আসছে।

তবে আজ তার মনে ভারি আনন্দ। সহজপুরের শিশুদের মনের গঠন তৈরি করতে সে কিছুটা সক্ষম হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ওরা যে এভাবে একত্রিত হয়ে রুখে দাঁড়াতে তা নিজেও সে ভাবতে পারেনি। শুধু নিজেরাই নয়, ওরা বড়দেরও টেনে নিয়ে এসেছে! এটা কম কথা নয়।

আঠারো মাইল রাস্তা দু-ঘণ্টার কম সময়ে পৌঁছে গিয়ে খেয়াল হল, ভোর হতে এখনও ঢের দেরি এবং

এ-সময় হাসপাতালে ঢুকতে দেবে না। মফঃস্বলের হাসপাতাল হলেও এখানে নিয়মকানুন খুব কড়া। দারোয়ান গোছের একজনকে পেয়ে সূর্য অনুরোধ করল—“ফুদিরাম ঘুমোচ্ছে কিনা এবং তার অবস্থা কিরকম, তা নার্সের কাছে থেকে জেনে আসতে। বারংবার অনুরোধ এড়াতে পারল না লোকটা। ফিরে এসে জানাল পেশেন্ট ঘুমোচ্ছে। চিন্তার কোনও কারণ নেই। দেখা করতে হলে সকাল সাড়ে দশটার পর আসতে হবে। সূর্য ফাঁপরে পড়ল। অতক্ষণ এখানে থাকবে কী করে? বরং এখন নহজপুরে ফিরে গিয়ে কাল বাস ধরে এলেই ভাল।

সে আবার সাইকেলে উঠল। দুপাশে ঝোপঝাড়, গাছগাছালি, মাথার ওপর ফালি চাঁদ, সাইকেলের প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতে সে চিৎকার করে গান ধরল, “ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা...”।

শিবনাথের ঘুম ভেঙে গেল কথাবার্তায়। কেউ বা কারা কথা বলছে, কিন্তু যারা কথা বলছে তাদের স্বর নিচু কেন? তার কেমন সন্দেহ হল। পা টিপে টিপে সে বিছানা থেকে নেমে হাঁটতে লাগল। বাড়ির সামনে জ্যাঠার বাড়ি। জ্যাঠা আর ড্রাইভার দাঁড়িয়ে আছেন।

জ্যাঠা জিজ্ঞেস করলেন, “তুই যেতে পারবি না?”

ড্রাইভার বলল, “জ্বরটা বেড়েছে বাবু, তবে আপনি বললে যাব।”

জ্যাঠা একটু চিন্তা করলে, “খাক। আমিই চালাব। এখন রাত্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই, আমি চালাতে পারব। ফটিক, ফটিক!”

শিবনাথ দেখল, চৌমাথার পানের দোকানের মালিক ফটিক অফিসার থেকে এগিয়ে এল, “এটা কি ঠিক হবে? আপনি কখনও চালাই না—।”

“ওঠো তো! কিছু একটা হয়ে গেলে সমস্ত দায় আমার ওপর পড়বে, সেটা আমি হতে দেব না।”

“কিন্তু কিছু একটা হবে কেন?”

“নতুনমাস্টার এখন পথের কাঁটা। তাকে সরিয়ে ফেলার মওকা আছ। একা সাইকেলে গিয়েছে সে— আমার মন কু গাইছে!”

“কিন্তু কার পথের কাঁটা সে?”

“তা তো জানি না। কিন্তু কিছু হলে লোকে আমাকে সন্দেহ করবে। আমি তার সমালোচনা করতাম বলে লোকের মনে আমার কথা আসবে। চলো।”

গাড়িটা বেরিয়ে গেল। শিবনাথ পাথর হয়ে শুনছিল। নতুনমাস্টার কার পথের কাঁটা? কে তাঁকে আড় সরিয়ে ফেলবে? অসম্ভব! সে হতে দেবে না—কখনও না। কিন্তু কি করতে পারে সে? তার আপসোস হচ্ছিল, কেন সে জ্যাঠাকে বলল না তাকে সঙ্গে নিতে! নতুনমাস্টার বলেন বিপদ সামনে এলে একত্রিত হও, দেখবে বিপদকে ভয় করতে পারবে। এত রাতে সেটা কি করে সম্ভব? হঠাৎ অন্তর কথা মনে এল। অন্তরে গিয়ে সব বলবে। অন্ত্র নিশ্চয়ই এখন ঘুমোচ্ছে। ওকে ডাকলে ওর বাবা নিশ্চয়ই রেগে যাবেন। কিন্তু না, লুকিয়ে লুকিয়ে ডাকতে হবে, একটা কিছু করা দরকার। রাত্তায় নেমে পড়ল সে। তখনই খেয়াল হল, কেউ কোথাও ছেগে নেই। ঘন অন্ধকার নয়, চাঁদের আলো রয়েছে। কিন্তু তবু ভয় করছে হাঁটতে। নতুনমাস্টারের শেখানো গানটা সে মনে মনে গাইতে লাগল, “ধনধান্যপুষ্পভরা...”।

অন্তরের বাড়িটার সামনে পৌঁছে বৃকে বল এল। বাড়িটা নিখুঁত। সে গোট খুলে ভেতরে ঢুকে জানলার নীচে দাঁড়িয়ে ডাকল, “অম্ম, এই অম্ম!” কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। ঠিক সেই সময় একটা সাইকেলের আওয়াজ পাওয়া গেল। আরোহী সাইকেল থেকে নেমে গেটের সামনে এসে বেল বাজাল। সঙ্গে সঙ্গে ওপরের একটা জানলা খুলে গেল। আরোহী বলল, “ঠিক আছে।” ওপরের জানলা বন্ধ হয়ে গেল। লোকটা সাইকেল নিয়ে ভেতরে ঢুকল। যেখানে অন্তর মার্বেল খেলে, তার পাশে একটা ঘরের দরজা খুলে সাইকেল-সমেত ঢুকে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল। এই লোকটা কে? কি ঠিক আছে? এত রাতে কোথেকে এল? ওপরের জানলা যে খুলেছিল সে কোনও কথা বলল না কেন? শিবনাথের খুব ভয় করছিল। সে এগিয়ে গিয়ে দরজাটার শেল তুলে দিল নিঃশব্দে, তারপর রাত্তায় বেরিয়ে এল।

কয়েক পা হাঁটতেই একটা বাড়ি থেকে হাঁক ভেসে এল, “কে রে? এত রাতে কে?”

শিবনাথ বলল, “আমি শিবনাথ। ভবেন গোস্বামী আমার জ্যাঠা হন।”

লোকটা বেরিয়ে এল, “আরে তুমি! এখানে কি করছে এখন?”

লোকটাকে চিনতে পারল শিবনাথ। কেরোসিন তেলের দোকানের মালিক। হয়তো প্রাকৃতিক ডাকে সাদা দিতে ঘুম থেকে উঠেছিল। সে বলল, “চোর দেখে এসেছি!”

“চোর? কোথায় চোর?”

“অস্ত্রদের বাড়িতে চুরি হয়েছে।”

“সে কি! অস্ত্র কে?”

শিবনাথ বাড়িটা দেখাতে লোকটা আঁতকে উঠল, “চোরটা ওখানে আছে এখনও?”

“হ্যাঁ, আমি বাইরে থেকে শেকল দিয়ে দিয়েছি।”

“তোমার দেখছি খুব সাহস। কাজটা মোটেই ভাল করোনি। ওরা তোমাকে মেরে ফেলতে পারত। চলো বলরামদাকে ডাকছি—কাকে আটকে রেখেছি দেখছি!” লোকটা ওর হাত ধরল।

“না, এখন নয়। কাল সকালে।”

“আহা, ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তো আছি।” লোকটা বলল।

এই সময় ওপাশের বাড়ি থেকে একজন বলে উঠল, “কি হয়েছে রতনদা? এত রাতে কি করছ?”

“ভবেন্দার ভাইপো চোর ধরেছে বলরামবাবুর বাড়িতে।”

“সে কি!”

কয়েক মিনিটের মধ্যে ভিড় জমে গেল। তিন-চারজন করে জনা-কুড়ি মানুষ ঘুম থেকে উঠে উত্তেজিত হল। শিবনাথের খুব ভয় করছিল। লোকটা যদি ভাল হয়, চোর যদি না হয়। তখন মুখে যা এসেছিল বলে ফেলেছে, এখন কি হবে!

সবাই মিলে যখন বলরামবাবুর বাড়ির দিকে এগোচ্ছে, তখন দূরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল এবং তারপর হেডলাইটের আলো।

গাড়িটা সামনে এসে থামতেই ফটিকের কান্না ভেসে এল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত সহজপুর জেনে গেল নতুনমাস্টার হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে খুন হয়েছেন। ভবেন গোস্থানী এবং ফটিক তাঁর মৃতদেহ রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়ে নিয়ে এসেছেন।

বলরামবাবু হতদস্ত হয়ে ছুটে এলেন, “এ কি! কী করে হল? অ্যাকসিডেন্ট নাকি?”

ভবেন গোস্থানী বললেন, “না, গুলি করে মারা হয়েছে। পথে যেতে একজনকে সাইকেলে আঁসতে দেখেছিলাম, তখন গা করিনি, এখন বুঝতে পারছি সেই খুনী!”

বলরামবাবু ভিজ্ঞেস করলেন, “এত রাতে আপনারা ওদিকে গিয়েছিলেন কেন?”

“এরকম কিছু হতে পারে সন্দেহ হওয়ায় ফটিককে নিয়ে গিয়েছিলাম। একটু আগে যদি যেতে পারতাম! ইন্স!” ভবেন গোস্থানী মাথায় হাত দিলেন।

সূর্যর শরীর নামানো হতেই অস্ত্র এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল পায়ের ওপর। দেখাদেখি শিবনাথও। ভবেন গোস্থানী ভাইপোকে দেখে অবাক, “তুই এখানে এলি কি করে?”

তখন রতন ঘটনাটা বলল। সঙ্গে সঙ্গে জনতার একাংশ ছুটে গেল বলরামবাবুর বাড়ির দিকে। তারপরেই সাইকেল-আরোহীকে ধরে নিয়ে এল তারা। শিবনাথ চৈতন্যে বলল, “চিনতে পেরেছি, চিনতে পেরেছি! এই লোকটা সক্ষ্যেবেলায় লরিডে ছিল!”

পোস্টমর্টেম হওয়ার পর সূর্যর শরীর নিয়ে লরিটা স্কুলের মাঠে চলে এল বিকেলবেলায়। ইতিমধ্যে পুলিশ বলরামবাবুকে গ্রেপ্তার করেছে সেই লোকটি সমেত। বলরামবাবুর মতো মানুষ এত বড় চক্রান্তের নেপথ্যনায়ক, তা কেউ ভাবতেও পারেনি!

সহজপুরের স্কুলের এবং সদ্য-অফর-চেনা বালকেরা সূর্যর মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে শ্মশানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন সূর্যদেব শেষ দিগন্তে। আকাশ লালে লাল। কচি-কচি মুখগুলো কাগায় দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছিল। জীবনে প্রথমবার কোনও মৃত মানুষের শরীর কাঁধে নিয়ে শ্মশানে চলেছে তারা। হঠাৎ শিবনাথের মনে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে সে কান্নাজড়ানো গলায় গেয়ে উঠল, “এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।”

অনেক কান্না একত্রিত হল, “সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।”